তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম প্রকাশ : আষাঢ়, ১৩৬৭

প্রকাশক :
গোপালদাস মজুমদার
ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২ বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

মুদ্রক :
পশুপতি দে
শনিরঞ্জন প্রেস
৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড
কলিকাতা-৩৭

উৎসর্গ

হজরত সারমাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে—

সিন্ধুপ্রদেশে থাট্টা শহরের মধ্য দিয়ে প্রধান সড়ক ধরে চলেছিল একটি বণিকের দল। আরব সাগরের উপর হিন্দুস্থানের পশ্চিম উপকূলে সিন্ধুপ্রদেশের ইতিহাস-বিখ্যাত দেবল নগরীর ধ্বংসাবশেষের পাশে 'কলাচী' তখন একটি ছোট বন্দর। বেশীর ভাগ সমুদ্রগামী বড় বড় মালবাহী নৌকা এসে দাঁড়ায়। দেবল নগরীতেই প্রথম মুসলমান পতাকা উড়েছিল। মুহম্মদ বিন কাসিম প্রথম দেবল নগরী অবরোধ করে অধিকার করেন। সেকালে দেবলই ছিল সিন্ধুপ্রদেশের সব থেকে বড় বন্দর। দেবল ধ্বংস হওয়ার পর থেকে দেবল থেকে ক্রোশ বিশ-পঁচিশ উত্তর-পূর্বে সিন্ধুনদের মোহনা থেকেও কয়েক ক্রোশ উত্তরে সিন্ধুর একটি শাখার উপর থাট্টাই হয়ে উঠেছিল প্রধান বন্দর। থাট্টা অতি প্রাচীন শহরও বটে। দেবল যখন প্রধান ছিল তখন থাট্টার এমন প্রসিদ্ধি ছিল না। থাট্টার উত্তরে 'নিরুন' নগরও তখন ছিল। নিরুনও' একরকম ধ্বংস হয়েছিল বিন কাসিমের হাতে। তারপর থেকে থাট্টার সমৃদ্ধি। থাট্টা এখন বড় বন্দর এবং দক্ষিণ সিন্ধুপ্রদেশের রাজধানীর গুরুত্ব গৌরবেরও অধিকারী হয়েছে। এখানে মুঘল সম্রাটের শুল্কবিভাগের ঘাঁটি, ফৌজদার, কাজী থাকেন।

এর মধ্য দিয়ে যে সড়কটার কথা বলছি সে সড়কটা থাট্টা পার হয়ে চলে গেছে সিন্ধুর মোহনায় ওই কলাচী পর্যন্ত। কলাচীতে পূর্বে বলেছি বড় বড় নৌকা এসে লাগে। এর আশেপাশে সমুদ্রের ধারে অনেকগুলি গুপ্ত ঘাঁটি আছে যেখানে নৌকা এসে লাগে এবং গোপনে মাল খালাস করে দিয়ে চলে যায়। মাল অবশ্য বোঝার মাল নয়; ছোট ছোট কৌটা পেটির মাল। তার মধ্যে বেশী থাকে পারস্য সাগরের দুর্লভ মুক্তা।

থাট্টার ভিতর এই রাস্তা ধরে একজন পারস্যদেশীয় ব্যবসায়ী মহম্মদ সৈয়দ আট-দশটা উট এবং আট-দশজন সওয়ার সিপাহী নিয়ে হায়দ্রাবাদ অঞ্চল থেকে কলাচীর দিকে আসছিলেন। এ ছাড়াও তাঁর দুজন কর্মচারী সঙ্গে ছিল। সকলেই আসছিলেন ঘোড়ায়। কলাচীতে কিছু মাল আসছে তাঁর পারস্য থেকে। বড় নৌকায় আসছে। ইরানের উপকূল পার হয়ে মারকানের (বেলুচিস্তান) নীচে নীচে এসে ভিড়বে এই কলাচীতে। সেই মাল খালাস নেবেন। তাঁর মাল পারস্যদেশের গালিচা।

আজ থেকে প্রায় তিনশো সাড়ে তিনশো বছর আগে। ১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দ—১০৫১।৫২ হিজরী; হিন্দুস্তানে দিল্লীর তক্তে আবুল মজফফর সাহেবউদ্দিন মুহম্মদ সাহেব-ই-কিরান শাহজাহান বাদশাহগাজী তখন বাদশাহ। দেশে তখন মোটামুটি শান্তি বিরজিত। এক দক্ষিণে শাহজাদা ঔরংজেবের সঙ্গে আদিলশাহী কুতুবশাহী সুলতানদের কিছু লড়াই চলছে। এদিকে আফগানিস্তানে লড়াই লেগেই আছে কাবুল কান্দাহার নিয়ে। ইরানের শাহ শাহ আব্বাস আফগানিস্তান ছিনিয়ে নিতে চাচ্ছেন। চাচ্ছেন কেন, নিয়েছিলেন। শাহজাদা ঔরংজেব এসে কাবুল উদ্ধার করেছিলেন। পারস্যের শাহ আব্বাসের প্রতিনিধি আলিমর্দান সাহেবকে সাদরে আহ্বান করে নিজের দরবারে আমীর-উল-উমরা করে নিয়েছেন। তিনিই কান্দাহার কিল্লা মুঘলদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু শীতের সময় আবার শাহ আব্বাস তা ছিনিয়ে নিয়েছেন মুঘলের হাত থেকে। এ ছাড়া বলতে গেলে অশান্তি যুদ্ধ কোথাও নেই। দেশও সমৃদ্ধ। মধ্যে মধ্যে এখানে ওখানে দু'চারটে দুর্ভিক্ষ হয়; ফসল না জন্মালে দুর্ভিক্ষ হবেই, সে সে-মুল্লুকের বাসিন্দাদের গুনাহ; তারা পাপ করে, খুদাতায়লা তাদের সাজা দেন। অন্যথায় সারা মুল্লুকে সমৃদ্ধি। শহর বাজার রোশনাইয়ে মজলিসে নাচাগানায় জমজমাট। বাদশাহের নতুন কিল্লা লালকিল্লার ভিতরে দেওয়ানী আম দেওয়ানী খাসে

দরবারে যারা যায় তারা প্রথমেই অবাক হয় দরবারের গড়নের বাহার দেখে। দেওয়ানী খাসের মাথার চাঁদোয়া রূপোর—দেওয়ালে খিলানে জহরতের নকশা। তারপর ময়ূর সিংহাসন—তক্তে তাউস। সোনার ময়ূরের পেখমে হীরা মণি মুক্তা পান্না নীলা চুনীর আশ্চর্য বাহার। এমন তক্তে তুনিয়ার কোন বাদশা কোন রাজা কোন কালে বসেন নি। মাথার উপরে পারসী বয়েতে লেখা—

অগর্ ফিরদুর্স বার্-র্ রুই জমীনস্ত
হামেনস্ত উ হামেনস্ত উ হামেনস্ত।

অর্থাৎ তুনিয়ায় স্বর্গ বেহেস্ত যদি কোথাও থাকে তা এইখানে এইখানে। এই দরবারে আবার যখন শাহানশাহ এসে বসেন তক্তে তখন তাঁর মাথার তাজের উপর বসানো কোহিনুর হীরাখানা দেখে তুনিয়ার যত বড় যে আমীর হোক না কেন তার বিস্ময়ের আর অবধি থাকে না। এ দেশে এত দৌলত! দৃষ্টি বিহ্বল হয়ে যায়।

সত্যই তখন দেশদেশান্তরের লোকে বলে—দৌলতই তুনিয়া হিন্দুস্তান। তুনিয়ার দৌলত এখানে জমা হয়ে আছে। যত সোনা তত দানা—মণি মুক্তা হীরা পান্নার ছড়াছড়ি। পথে নাকি ছড়ানো আছে। লোভে সাত সমুদ্রে জাহাজ ভাসিয়ে পার হয়ে এসেছে ফিরিঙ্গী কিরিস্তানের মলুক ইউরোপ থেকে সাদা চামড়া আংরেজ পোর্টুগীজ ওলন্দাজ ফরাসী ফিরিঙ্গীরা। দেশ জুড়ে তারা কুঠি খুলে ব্যবসা করছে। ইরান তুরান তুর্কস্তান খোরাসান ইস্পাহান কিরান সিস্তান বাদাকশান আফগানিস্তান বাল্‌খ্ বুখারা সমরকন্দ থেকে তো মুসলমান দলে দলে আসছে আজ প্রায় পাঁচশো বছর ধরে। রুটি রুজগারির জন্যে হাজারে হাজারে আসছে তুঃসাহসী কষ্টসহিষ্ণু সাধারণ মানুষ; সঙ্গে শুধু তলোয়ার। এসে বাদশাহী ফৌজে কাম নেয়। বাদশাহী ফৌজে এদের নোকরী মিলবেই। বাদাকশানী মুঘলাই চাঘতাই খোরাসানী ইরানী তুরানী সিপাহীর কদর খুব

বেশী। শুধু সাধারণ লোক নয়, বড় বড় আমীর আসে। আমীর আসে উমরাহ আসে ওসব মুলুক থেকে—তারা এসে বাদশাহী দপ্তরে সেরেস্তাখানায় কাজ পায়। খেলাত পায় মনসব পায় খেতাব পায়। ক্রমে ক্রমে জায়গীর নিয়ে নবাব বংশ স্থাপন করে। কত জন এ দেশের কত কাফেরের রাজ্য দখল করে নিজেরা বসেছে—সঙ্গে সঙ্গে ইসলামী তমদ্দুন কায়েম করেছে।

ব্যবসাদার আসে।

এ দেশের গোলকুণ্ডার হীরা, পান্না জিলার পান্না, কাশ্মীরের নীলা অত্যন্ত কম দামে কিনে নিয়ে চলে যায় দুনিয়ার বাজারে। পোখরাজ তো অতি সস্তা। এ ছাড়া দানা তো ধূলার দামে বিক্রী হয়। এক রূপেয়াতে কমসে কম চার পাঁচ মণ চাল গম মেলে। ঘি মেলে টাকাতে পাঁচ ছ সের। তা ছাড়া লবঙ্গ দারুচিনি এলাইচি চন্দন রেশম মলমল গালিচা শাল দুশালা এসব জাহাজ বোঝাই হয়ে চলছে পশ্চিমে ফিরিঙ্গী মুলুকে বিলায়েতে—ফরাসী মুলুক থেকে সারা ইয়োরোপ—এদিকে যবদ্বীপ সুমাত্রা মালয় ব্রহ্মদেশ শ্যাম হয়ে দূর চীনদেশ পর্যন্ত।

হিন্দুস্তানের বানিয়াদের হাত থেকে ক্রমে ক্রমে ব্যবসা এসে পড়েছে ইরানী তুরানী ব্যবসাদারদের হাতে। বছর সাল ইরান তুরান থেকে নসীব পরখ করতে কত যে ইরানী তুরানী ব্যবসাদার আসে তার হিসেব নেই। দক্ষিণে নামল তো গোলকুণ্ডা বিজাপুরের দরবার মুসলমানদের জন্যে খোলা। উত্তরে এল তো তামাম হিন্দুস্তানের মালিক দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ বাদশাহ মুঘল বাদশাহের দরবার খোলা। এস—যা পার নজরানা দিয়ে কুর্নিশ করে দাঁড়াও—ফর্মান মিলে যাবে, খেলাতও মিলবে।

তলোয়ারখানা খুলে বাদশাহের পায়ে নামিয়ে কুর্নিশ করো—ফৌজে তোমার কাম মিলবে। নিজের দেশে বিপন্ন হয়ে কত নবাব সুলতান বংশের ছেলে আসছে—তাদের আশ্রয় মিলছে জায়গীর

মিলছে। শায়ের অর্থাৎ কবি এল—পারসী গজল মসনভী কি রুবাই বানিয়ে শাহানসাহেব দরবারে আওড়ালে তো খেলাত মিলল—তন্‌খা বরাদ্দ হয়ে গেল। চিত্রকর এল— সে পেলে আশ্রয়—তন্‌খা।

তাজ্জব দেশ হিন্দুস্তান। ছনিয়ার সেরা তাজ্জবের দেশ। এখানে নসীবের দরওয়াজা স্রিফ একটি আঙুলের টোকায় খুলে যায়—ঢুকিয়ে নেয় তোমাকে আলিবাবার দেখা সেই দৌলতখানায়। কেবল জানা চাই—সেই 'সিসম' মন্ত্রটি জানা চাই।

মহম্মদ সৈয়দও পারস্যের অধিবাসী। তিনি কিছুদিন এসেছেন এই হিন্দুস্তানে তাঁর ভাগ্য অন্বেষণে। তিনি যে জাহাজে এসেছিলেন সে জাহাজে আর একজনও এসেছিল। তার আসল নাম আজ ঢাকা পড়ে গেছে। তার নাম এখন মীরজুমলা। ভাগ্যান্বেষী পারসীক দক্ষিণে হীরা জহরতের ব্যবসা করতে করতে গোলকুণ্ডার কুতুবশাহী দরবারে চাকরি নিয়ে কবজি আর সাহসের জোরে আজ কুতুবশাহের সারা ফৌজের সিপাহসালার, মারবক্সী। মহম্মদ সৈয়দ আজও সামান্য ব্যবসাদার।

মহম্মদ সৈয়দ ওইটে পারেন না। তলোয়ার ধরতে পারেন না তা নয়, ছনিয়াতে কোন্ মর্দানা তলোয়ার ধরতে না পারে? চেষ্টা করলেই পারে। সাহস? সাহসই বা নেই কার? সব মানুষের আছে। ওটা ঢাকা থাকে ঝাঁপির মধ্যে খুলে দিলেই সে হিন্দুস্তানের জঙ্গলের গোখুরার মত মাথা তুলে উঠে গর্জায়।

সাহস তাঁরও আছে। একা কত আঁধিয়ারার রাত্রে তিনি দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছেন। হাতিয়ার সঙ্গে থাকে বটে কিন্তু হাতিয়ারের ভরসা তিনি কোনদিন করেন না। দৌলতেও খুব আকাঙ্ক্ষা নেই। তবে একটা ক্ষোভ জমে আছে মনে। কলিজায় একটা জোর ধাক্কা তিনি খেয়েছেন যার বেদনায় তিনি দৌলত চান। প্রচুর দৌলত তাঁর চাই।

সেই মতলবের তাড়াতেই তিনি ইরানের মত দেশ ছেড়ে—তার গুলাব তার বুলবুলের গান পিছনে ফেলে এসেছেন। এখানে অবশ্য এসে চাঁপা পেয়েছেন গুলে-কমল পেয়েছেন কোয়লা পাপিয়া পেয়েছেন ; এসবে গুলাবের ছুঃখ বুলবুলের অভাব ভোলা যায় কিন্তু এখানে পারসী ভাষার মাধুর্য পুরো পান না। এখানে পারসী বলে বটে লোকে কিন্তু সে পারসী শুনে কানে পীড়া লাগে তাঁর। আর অভাব অনুভব করেন ইরানের স্নফী ও সাঁয়া ফকীর দরবেশদের সঙ্গসুখের।

এখানে মানুষেরা চিনেছে শুধু জমীন জায়গীর আর সোনা রূপা জহরত আর ঔরৎ। খুন আর খারাবি—ছুশমনি আর গোপন সল্লা করে চক্রান্ত এ লেগেই আছে।

আর এ দেশের মানুষ যারা—কাফের—তাদের তো ঠিক বুঝতেই তিনি পারেন না। পুতুল নিয়ে এদের কি মাতামাতি। আপসোস হয় তাঁর। তিনি তো সারাজীবন এই ছুনিয়ার সার সত্য কি তার সন্ধান করতে গিয়েই আজ সব হারিয়ে বসে আছেন। তাতে আপসোস ছিল না। কিন্তু দোস্ত মুখ ফেরালে, মেহমানরা হাসল—সব থেকে শরমের ছুখ পেয়েছিলেন তিনি ঔরৎদের কাছে। ঔরৎরাও তাকে বেওকুফ বলে হেসেছে। তাই তিনি এসেছেন এই হিন্দুস্তানে নসীবের সন্ধানে।

মধ্যে মধ্যে বিগত জীবন মনে পড়ে।

বিচিত্র তাঁর জীবনের ইতিহাস।

পারস্যের অধিবাসী মহম্মদ সৈয়দ। জন্ম তাঁর পারস্যের এক ইহুদী বংশে। সে হিসেবে ব্যবসায়বুদ্ধি তাঁর রক্তের মধ্যে আছে। বাপ-পিতামহ সকলেই ব্যবসা করেছিলেন কিন্তু তাঁর সময়েই সে ব্যবসায়ে প্রচুর ঋণ হয়ে সব বিক্রী হয়ে গেছে। অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনেরা তিরস্কার করেছে নিন্দা করেছে।

বলেছে—বিদ্যা পাণ্ডিত্যের চর্চা আর ব্যবসায়বুদ্ধি দুটি স্বতন্ত্র জিনিস। দুয়ের মধ্যে বিবাদ আছে। এ বার বার বললেও যে শোনে না তার নসীবে এই রকমই ঘটে।

কেউ বলেছে—ইকবালের দোষ। অর্থাৎ গ্রহের ফের। ওর ইকবাল গ্রহ জন্ম থেকেই নিম্নমুখী। না হলে এমন মতিভ্রম হবে কেন!

কথাটা সত্য—ইহুদী ব্যবসায়ী বংশের এই বিচিত্র ছেলেটি বাল্যকাল থেকেই অন্য এক রকমের। বাল্যকাল থেকেই কিছুটা উদাসীন এবং বিদ্যাচর্চায় গাঢ় অনুরাগ ছিল। কি স্বাদ যে সে পেয়েছিল ওর মধ্যে তা ব্যবসায়ী বাপ এবং সাধারণ ইহুদী ঘরে কন্যা বধূ মা তা বুঝতে পারতেন না।

ছেলে তাও কিস্যা কি রুবাই কি গজল কি মসনভী নিয়ে মাতে নি। মেতেছিল হিব্রু ভাষায় রচিত তাদের ধর্মশাস্ত্র নিয়ে। ধর্মশাস্ত্র অবশ্য সকলেই পড়ে, না পড়লে জীবনের গতি কি হবে, কিন্তু তারও মাত্রা আছে। সে মাত্রা এই ছেলেটির ছিল না। পারস্যের কাশানে তাদের সমাজ বেশ সংঘবদ্ধ ছিল—সেখানে তাদের পুরোহিতদের মধ্যে দুজন ধার্মিক এবং রাব্বি অর্থাৎ পণ্ডিত মানুষ ছিলেন। তাঁদের কাছেই সে শিষ্যত্ব নিয়ে পড়াশুনা করত। দেখে মনে হয়েছিল এ ছেলে শেষ পর্যন্ত একজন পুরোহিত হবে। তাতেই কিছুটা সান্ত্বনা ছিল—আবার তাতেই ছিল বেশী ভয় কারণ সারা ইরানে ইসলামী রাজত্ব। সাধারণ ইহুদী যারা ঘর করে সংসার করে ব্যবসা-বাণিজ্য করে, যাদের অর্থের জোর আছে তারা এই রাজধর্মের আক্রোশ থেকে বাঁচতে পারে, কিন্তু পুরোহিতদের বাঁচবার পথ কোথায়? তবুও ইরানের শাহ থেকে আমীর-ওমরাহরা সীয়া তাই রক্ষা। তুরানের মত সুন্নীর রাজত্ব হলে এতদিন 'কাশানের' ইহুদী সমাজ নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। তবে ছেলের ধর্মের দিকে মতি ও গতিতে বাধাই বা দেবেন কি করে?

বিশ বছর বয়স পর্যন্ত হিব্রু ভাষায় তাদের নিজেদের শাস্ত্র পড়তে

পড়তে তার খেয়ালই হোক আর তৃষ্ণাই হোক তারই আকর্ষণে ইলাহী ধর্মশাস্ত্র কোরান পড়বার জন্য উঠে পড়ে লাগল।

বাপ মা বাধা দিয়েছিলেন কিন্তু সে মানে নি। এই সময়েই তাকে নিশ্চিন্ত করে বাপ মা দুজনেই বছরখানেকের মধ্যেই মারা গিয়ে তার পথ নিষ্কণ্টক করে দিয়ে গেলেন! ছেলে ছুটল আপনার পথে আরবের ঘোড়ার মত। কিন্তু দুনিয়ার পথ রাজপথ নয়, সে পথে চড়াই আছে উতরাই আছে, মধ্যে মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য পর্বতশিখরের উচ্চতাও আছে, যার ওপাশেই খদ—যে খদের মধ্যে পড়লে হয় মৃত্যু নয় হাত পা ভেঙে পঙ্গু হয়ে যায় ঘোড়ার সঙ্গে তার আরোহী।

হল তাই, ব্যবসায়ে সে দেউলিয়া হয়ে গেল। তাদের সমাজের লোকে মন্দ কথায় মুখর হয়ে উঠল। এবং গোপনে পরধর্মের স্বাদ গ্রহণের উপযুক্ত ফল ফলল এ কথাও বললে। কিন্তু গোপনে। প্রকাশ্যে এ কথা বলার বিপদ আছে।

কথাগুলি কানে এল তাঁর। এই সাধারণ জ্ঞানহীন অর্থ-সর্বস্ব মানুষগুলির কথা শুনে দুঃখও হল ক্ষোভও হল। ইসলাম শাস্ত্র পড়ার জন্য ঈশ্বর তাঁকে এই শাস্তি দিয়েছেন? হায় হায় হায়! ভাল—দেখবেন আরও কত দুঃখ হয় তাঁর। তারপর একদিন এই উন্মত্ত যুবক—লোকে অন্ততঃ তাই বললে—মোল্লার দরবারে গিয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে বসল।

নতুন নাম হল মহম্মদ সৈয়দ। কাশান ছেড়ে এলেন ইস্পাহানে। সর্বস্বান্ত ফকীরের মতই মসজিদে আশ্রয় নিয়ে কোরান কণ্ঠস্থ করলেন, নিজে হাতে কোরান নকল করলেন; তার সঙ্গে সীয়া ফকীর দরবেশদের দর্শনতত্ত্ব আয়ত্ত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে সুফী মতবাদ। অপূর্ব লাগল। তাঁর শিক্ষাদাতা দুজন মৌলভী ছিলেন পারস্যদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। সেখান থেকে গেলেন মক্কা।

সকলে ভেবেছিল মহম্মদ সৈয়দ শেষ পর্যন্ত ধর্মজীবনই গ্রহণ করবেন। সুন্দর সুপুরুষ সৌম্যদর্শন যুবা। মিষ্টভাষী। চোখে

উদাস দৃষ্টি। তখন তিনি রুবাই মসনভী রচনাতেও খ্যাতি লাভ করেছেন—কিন্তু সবেতেই তাঁর খুদাতায়লার মহিমা কীর্তন। সুতরাং এ ছাড়া আর কোন্ কল্পনা লোকে করতে পারে? মক্কায় হজ থেকে সে ফকীরী নিয়ে ফিরবে এই ধারণাই লোকের হয়েছিল।

মক্কা থেকে ফেরার পথে তাঁর সব গোলমাল হয়ে গেল।

হঠাৎ জীবনে ঘটল একটা ঘটনা। ইরানের উপকূলে নেমে তিনি চলেছিলেন সিরাজ শহরে। শেখ সাদীর জন্মভূমি দর্শন করতে চলেছিলেন। ঘটনা ঘটল পথে।

মহম্মদ সৈয়দের কলিজার মধ্যে ঘটনাটার ছবি যেন আঁকা রয়েছে। তিনি এ নিয়ে পরে গজল তৈরী করেছিলেন। হিন্দুস্তানে এসে পারসী থেকে সে গজল উর্দুতেও তৈরি করেছেন। মধ্যে মধ্যে বয়েতের মত আবৃত্তি করেন—

“খবরে তহয়ুরে ইশক সুন না জন্নুন্ না বারী রহী।
না তু তু রহা না তুমে রহা যো রহী সে বে-খবরী রহী।”

প্রেমের ক্ষমতা আশ্চর্য। প্রেমের খবরে ভাল মন্দ অসুর দেবতা কিছুই থাকে না। তোমাতে আর তুমি থাক না, তোমার মধ্যে যা ছিল সব বে-খবরী হয়ে যায়। বিলকুল হারিয়ে যায়।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে একখানা সুন্দর মুখ।

শেখ সাদীর কবরে সেলাম কুর্নিশ করে ইস্পাহানে ফিরবার পথে সেদিন মহম্মদ সৈয়দ পথের ধারে সরাইখানার ছাদে বসে আপনমনে গজল তৈরি করে গাইছিলেন। কিন্তু কণ্ঠস্বর তাঁর ভাল ছিল না। গাইছিলেন প্রাণের আবেগে। সুফী তত্ত্বের মর্ম তিনি জেনেছিলেন কিন্তু জানার সঙ্গে বুঝা বা বোধের কিছু পার্থক্য আছে। তিনি প্রেম বলতেই ঈশ্বরপ্রেম বলতে চেয়েছিলেন।

হঠাৎ ওপাশের কামরার একটা জাফরি-দেওয়া জানালার ঘুলঘুলি থেকে খুব মিঠা আওয়াজে কেউ বলেছিল—কার প্রেমে তুমি পড়লে

মুসাফির? কে সে ভাগ্যবতী? তবে তোমাতে যে তুমি নাই তা বুঝতে পারছি। এমন মোটা আওয়াজে চীৎকার করছ তা তোমার নিজের কানকে পীড়া তো দিচ্ছেই না এমন কি আরও মানুষ যে তুনিয়ায় আছে তাও তোমার খেয়াল নেই। নারীকণ্ঠ এবং ভারী মিষ্ট সে কণ্ঠস্বর।

চমকে উঠেছিলেন মহম্মদ সৈয়দ।

সঙ্গে সঙ্গে নজরে পড়েছিল আশ্চর্য একখানি সুন্দর মুখ।

জাফরির খানিকটা ভাঙা ছিল, তার মধ্য দিয়ে মুখখানি প্রায় পনের আনাই দেখা যাচ্ছিল।

মুহূর্তে যেন তুনিয়ার এতদিনের চেহারা পালটে গিয়েছিল। সেইখানেই তিনি একটা বেলা বসে ছিলেন, ওই মুখখানি যদি আর একবার দেখা যায়। আর একবার! কিন্তু বসে থাকাই সার হয়েছিল, আর সে মুখ দেখতে পান নি।

ভোরবেলা উঠে তিনি নামাজ পড়ছিলেন সরাইখানায় তখন গোলমাল উঠছে। নামাজ সেরে উঠে ছাদ থেকে দেখেছিলেন একদল মুসাফির চলেছে আপনাদের পথে। উট ঘোড়া পালকি লোকজন। তার মধ্যে বোরকাপরা জন চারেক বিবি। বিবিরা যাচ্ছেন পালকিতে। কালকের সেই মধুর কণ্ঠস্বর এবং সুন্দর মুখের অধিকারিণীও যে তার মধ্যে আছে তাতে আর তাঁর সন্দেহ ছিল না। তিনি ছুটে নেমে এসেছিলেন ছাদ থেকে। এবং সামনের একজন অনুচরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কোথায় যাবে তোমরা?

লোকটা দলের রক্ষীদের একজন। সে তাকে আপাদমস্তক ভাল করে দেখে বলেছিল—আমরা যাব ইস্পাহান।

মহম্মদ সৈয়দ খুব খুশী হয়ে উঠেছিলেন—ইস্পাহান! আমিও যাব ইস্পাহান। আমি একলা রাহী। আমি তোমাদের সঙ্গে যেতে পারি?

সে বলেছিল—সে ওই ওঁকে জিজ্ঞাসা কর। দেখিয়ে দিয়েছিল

যাঁকে তিনি পোশাকেআশাকে সম্ভ্রান্ত এবং ভদ্র, বয়সে প্রৌঢ়। তিনিই সব ব্যবস্থা করছিলেন। মহম্মদ তার কাছে এসে বলেছিলেন—জনাবআলি, একটা আরজি আপনার কাছে পেশ করতে পারি ?

তিনিও তাকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বলেছিলেন—ফরমায়েশ করুন।

মহম্মদ বলেছিলেন—শুনলাম আপনারা ইস্পাহানের যাত্রী। আমিও ইস্পাহান যাব। আমি কি জনাব আলির জলুসের সঙ্গে যেতে পারি ?

তিনি তার পরিচয় জানাতে চেয়েছিলেন। মহম্মদ সৈয়দ অকপট পরিচয় দিয়ে বলেছিলেন—সামান্য মানুষ আমি জনাব আলি; নাম মহম্মদ সৈয়দ, বান্দা খুদাতায়লার। গিয়েছিলাম মক্কাশরীফ। সেখান থেকে ফেরার পথে বন্দরে নেমে এসেছিলাম সিরাজ; শেখ সাদীর কবরে তাঁকে কুর্নিশ করে সালামত দিয়ে এখন ফিরছি ইস্পাহান। আপনারাও ইস্পাহান যাবেন—পথে একা রাহী আমি আপনাদের পিছু পিছু যেতে চাই—এই আর কি।

কথাবার্তার দীপ্তিতে এবং ভঙ্গিনম্রতায় তিনি সন্তুষ্ট হয়ে বলেছিলেন—মক্কায় হজ করে ফিরছেন আপনি—আপনি পুণ্যবান লোক। কথাবার্তায় আপনার সাধু চরিত্রের পরিচয় রয়েছে, কিন্তু হাজীসাহেব, আমি তো ঠিক মালিক নই—আমার হুজুরাইন আছেন —আমি তাঁর নোকর, আমাকে তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে হবে। সবুর করুন, আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি।

বোরকাপরা বিবিসাহেবারা তখনও সরাইখানার বারান্দায় অপেক্ষা করছিলেন; লোকটি সেখানে গিয়ে সব থেকে যিনি দীর্ঘাঙ্গী তাঁর সঙ্গে কথা বললেন এবং ফিরে এসে বললেন—হাঁ। হুজুরাইন সব শুনে হুকুম দিয়েছেন—আপনি আমাদের সঙ্গে আসতে পারেন।

দুখানা পাল্কি। বিবিসাহেবাদের দুজন তাতে সওয়ারী হয়েছিলেন। বাকী দুজন চড়েছিল উটের উপর। বাকী সঙ্গের লোকেরা ঘোড়ায়। তাঁর নিজের ঘোড়া ছিল, সেই ঘোড়ায় চড়ে তিনি চলেছিলেন। তিনি আশ্চর্য একটা উদ্বেগের মত কিছু বুকের মধ্যে অনুভব করেছিলেন। তাঁর দৃষ্টি অহরহ ঘুরছিল ওই অবরুদ্ধ দুইখানা পালকির দিকে।

তিনি যাঁকে দেখেছিলেন তিনি কে এই প্রশ্নের ঔৎসুক্যে মন অধীর হয়ে উঠেছিল। তবে দলের কর্ত্রীটি তিনি নন—এ সম্পর্কে তিনি নিঃসংশয় হয়েছিলেন। তিনি দীর্ঘাঙ্গী এবং সঙ্গে সঙ্গে দেহ তাঁর কিছুটা ভারী। তিনি প্রবীণা বা বয়স্কা এ সত্য বোরকার বাইরে থেকেই তিনি অনুভব করেছিলেন। তাঁর সতৃষ্ণ দৃষ্টি ছিল দ্বিতীয় পালকিটার উপর। উটের সওয়ারী মেয়ে দুটি নিঃসন্দেহে বাঁদী। বাঁদীদের মধ্যেও একজন প্রবীণা। অন্যটি তরুণী। সে এই পালকির তরুণী সওয়ারীটির বাঁদী। কিন্তু যার মুখ তিনি দেখেছেন ভাঙা জাফরির ফাঁক দিয়ে—যার কথা শুনেছেন সে কে!

ওই পালকির মনিব—না ওই বাঁদী!

পথে তিনি প্রথমটা নীরবে একপাশ ধরেই চলেছিলেন।

ক্রমে ওই কর্মচারীটির সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। পরিচয়ও পেয়েছিলেন।

সিরাজের এক ধনাঢ্য ব্যবসায়ীর বিধবা তাঁর কন্যাকে নিয়ে চলেছেন ইস্পাহান। ওই একটিই কন্যা, মায়ের অপর সন্তান নেই। মালিকের মৃত্যু হয়েছে এই বৎসরখানেক। এর মধ্যেই তাঁর সতীনী-পুত্রদের চক্রান্তে তিনি বিপন্ন হয়ে উঠেছেন। কন্যাটি বিবাহযোগ্যা। তার বিবাহের ব্যাপারে চক্রান্ত করে তারা এক কুপাত্রের হাতে তুলে দিতে চায়। তাই হুজুরাইন কন্যাকে নিয়ে চলেছেন ইস্পাহান। সেখানে কোন বড় আমীর বা ওমরাহ বা খোদ শাহ বংশের কোন

শাহজাদার সঙ্গে বিবাহ দেবেন এই তাঁব অভিপ্রায়। ইস্পাহানেও তাঁদের ব্যবসায়ের শাখা ছিল। সেখানে কিছু হিতৈষীও আছে। হুজরাইনের পিত্রালয়ও ইস্পাহানে। কন্যাটি সুন্দরী এবং গুণবতীও বটে। শাহ বংশের হারেমে ঢুকলে হারেমের জলুস বাড়বে বই কমবে না। বিদুষী সংগীতজ্ঞা—অনেক গুণ তাঁর।

মহম্মদ সৈয়দের আর সন্দেহ রইল না। সংগীতজ্ঞা বলেই তাঁর কানে সৈয়দ মহম্মদের কণ্ঠস্বর কর্কশ ঠেকেছিল।

পথে কিন্তু তিনি পিছিয়ে পড়েছিলেন। পাঁচওয়াক্ত নামাজ তিনি ভোলেন নি রূপের আকর্ষণে। পরবর্তী সরাইয়ে যখন তিনি দিনান্তে তাঁদের সঙ্গ পেলেন তখন সন্ধ্যা বেশ কিছুক্ষণ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। সিরাজের ধনী ব্যবসায়ী পত্নীর দল তখন সরাইয়ে বেশ গুছিয়ে বসেছেন। সরাইটিতে বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। একদিকে ধনী সম্ভ্রান্ত লোকেদের জন্য বিশেষ একটি মহল দেওয়া হয়েছে তাঁদের।

তিনি সেখানে পৌঁছুতেই দেখা হল একজন রক্ষীর সঙ্গে। সে তাঁরই প্রতীক্ষা করছিল। বললে—সেলাম সাহেব, আপনার জন্যেই আমি অপেক্ষা করে আছি। আপনার জন্যে আমাদের তরফের সরাইয়ের জায়গা রাখা হয়েছে। আপনাকে সালামত দিয়েছেন।

সৈয়দ মহম্মদ এই অভিজাত বংশের মহিলাটির সৌজন্যে মুগ্ধ হয়েছিলেন। ওখানে যেতেই সাহেবান মহলের কর্মচারী মৈনুদ্দিন সাহেব তাঁকে সমাদর করে নিজের পাশে জায়গা দিয়েছিলেন। বলেছিলেন—হুজুরাইন আপনার এই পথের কষ্টের মধ্যেও ধর্মানুরাগ দেখে খুব খুশী হয়েছেন। বলেছেন—এই বয়সে এমন ধর্মানুরাগ—এঁর যত্ন নিয়ো যেন।

হঠাৎ গান শুনতে পেয়েছিলেন। অপূর্ব সে কণ্ঠস্বর। তাঁর সমস্ত শরীরে রক্তস্রোত যেন তুফান তুলেছিল।

এ—সেই! নিশ্চয় সেই!

তিনি শীলতার প্রশ্নও ভুলে গিয়েছিলেন। জিজ্ঞাসা করেছিলেন—সাহেবজাদী গান করছেন ?

মৈনুদ্দিন বলেছিলেন—না। এ তাঁর বাঁদী। তিনি কি সরাইয়ে বসে গান করতে পারেন।

অপ্রস্তুত হয়েছিলেন সৈয়দ মহম্মদ। বার বার ত্রুটি স্বীকার করে তাঁর কাছে মার্জনা চেয়েছিলেন।

মৈনুদ্দিন বলেছিলেন—তাঁর গান আরও অপূর্ব। আমিও কদাচিৎ শুনেছি—কখনও কখনও হারেমে হুজুরাইনের কাছে যখন জরুরী তলবে গিয়েছি অসময়ে তখন এক-আধদিন শুনেছি। তবে ওর বাল্যকালে শুনেছি; ওকে আমি কন্যার মতই মানুষ করেছি কিনা।

একটু চুপ করে থেকে মৈনুদ্দিন আবার বলেছিলেন—তবে এই বাঁদীটিও ভাল গান গায়। অতি বাল্যকালে ওকে মনিব কিনেছিলেন, সাহেবজাদীর জন্যেই কিনেছিলেন। এ দেশের মেয়ে নয়—হিন্দুস্তানের মেয়ে ; সিন্ধির মেয়ে—নিয়ে এসেছিল গোলামের কারবারীরা। তখন বয়স ওর পাঁচ ছ বছর। ওদেশে কাফেরদের মধ্যে একটা জাত আছে জৈন বলে। তাদের মেয়ে। এ দেশে যখন আসে তখন ওর মরবার হাল—গোস্ খাবে না—এ খাবে না ও খাবে না। কোরবানি জবেহ দেখলে বুক চাপড়ে কাঁদত। এখনও সলিমার গোস্তে খুব রুচি নেই।

হাসলেন মৈনুদ্দিন সাহেব।

সৈয়দ মহম্মদ ভাবছিলেন এই ভ্রান্ত কাফেরদের কথা। এরা যে কতকালে খুদাতায়লার মেহেরবানিতে আসল সত্য আসল ধর্মকে বুঝবে, জানবে, কবে যে এরা মুক্তি পাবে সে জানেন খুদাতায়লা আর পয়গম্বর।

হঠাৎ একদিন ভ্রম ভাঙল সৈয়দ মহম্মদের। তিনি দিনের পর দিন অন্তরঙ্গ হচ্ছিলেন এই দলটির সঙ্গে ; মৈনুদ্দিন মারফত সাহেবাই মহল তাঁর পরিচয় নিয়েছেন প্রশংসা করেছেন। মধ্যে মধ্যে সে

কোরানের ব্যাখ্যা শুনিয়েছেন। শেখ সাদীর গজল শুনিয়েছেন। গুলেস্তা আবৃত্তি করেছেন। তাঁর দর্শনতত্ত্ব শুনিয়েছেন পর্দার এপাশে বসে এবং সতৃষ্ণ সতর্ক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকেছেন যদি পর্দাটা কোন রকমে সরে যায় একবার—যদি সাহেবজাদীকে দেখতে পান। কিন্তু পান নি। অভিজাত ঘরের ব্যবস্থা অত্যন্ত সতর্ক।

হঠাৎ একদিন।

তাঁর ভ্রম ভেঙে গেল। তিনি দেখলেন সেই বাঁদীকে। একটা সরাই থেকে উঠবার সময় যে উটটায় বাঁদীরা চড়েছিল সেই উটটার বদমেজাজ হয়ে গেল। সে ঠিক সওয়ারী উঠবার মুহূর্তটিতেই ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল এবং ছুটতে চাইল। বাঁদী তখনও ঠিক উঠে বসতে পারে নি—সে উলটে পড়ে গেল। বিপর্যস্ত হয়ে খুলে গেল বোরকার ঢাকা। সৈয়দ মহম্মদ দাঁড়িয়েছিলেন একটু দূরে—রক্ষীরা ব্যস্ত ছিল অন্য দিকে—তিনিই ছুটে গিয়ে বাঁদীকে টেনে সরিয়ে নিলেন উটের পায়ের কাছ থেকে। উটটা তখনও চালকের হাতের দড়ির টানে বশ মেনেও মানছে না—পাক খেয়ে ঘুরছে। তার পায়ের চাপে মেয়েটির জখম হবার সম্ভাবনা ছিল।

মেয়েটিকে সবল হাতে পাঁজাকোলা করে তুলে সরিয়ে নিলেন সৈয়দ মহম্মদ। মুখ তখন তার সম্পূর্ণ অনাবৃত।

অবাক হয়ে গেলেন সৈয়দ মহম্মদ। এই তো! এই তো সেই মধুর কণ্ঠ সুন্দর মুখখানির অধিকারিণী!

এরপর থেকে ইস্পাহান পর্যন্ত মধ্যে মধ্যে চকিতের মত বোরকার মুখের ঢাকনা উন্মোচিত হয়েছে তাঁর সামনে। একটু স্মিতহাস্য চকিত কটাক্ষ তিনি প্রতিদান পেয়েছেন।

ইস্পাহানের পথে শেষ সরাইয়ে সেদিন রাত্রে তাঁর ঘুম আসে নি। আজই শেষ দিন! এর পর আর দেখা হবে না! এই মধুর সান্নিধ্যটুকু অনুভব করতে পারবেন না!

সরাই তখন সুষুপ্ত। তিনি নিদ্রাহীন হয়ে শুয়ে থাকতে বিরক্তিবোধ করে বাইরে এসেছিলেন। হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল সরাইখানার উপরতলায় বোরকাহীন সম্পূর্ণ রূপে অনাবৃতমুখ সলিমা দাঁড়িয়ে। পরিপূর্ণ চাঁদের আলো ছিল—সেই আলোয় সে উপরের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছিল। বিষণ্ণ বেদনায় মুখখানি ম্লান হলদে গুলাবের মত মনে হল।

হঠাৎ সে তাঁকে দেখলে। দেখে একটু এগিয়ে এসে ছাদের ধারে দাঁড়িয়ে বললে—মুসাফিব, আজ শেষ সরাইখানা। আর দেখা হবে না!

—সলিমা! এই একটি কথা ছাড়া আর কিছু তিনি বলতে পারেন নি।

—মুসাফির! বিদায়!

এবার সৈয়দ মহম্মদ বলেছিলেন—তোমাকে নইলে আমি বাঁচব না সলিমা—

ম্লান হেসে সলিমা বলেছিল—কিন্তু আমি তো বাঁদী সাহেব!

—আমি তোমাকে মুক্ত করব।

—হায় সাহেব, তোমার কথা তো শুনেছি, খোদাতায়লাকে খুশী করতে তুমি সর্বস্বান্ত হয়ে ফকীর হয়েছ। সবই তোমার বিক্রী হয়ে গেছে। কি দিয়ে আমাকে তুমি কিনবে বল? সাহেব, দুনিয়া এমনিই বটে। এখানে মানুষকে চাইলে খোদাকে হারায়। খোদাকে চাইলে মানুষকে হারায়। আমার মনিব খুবই ভদ্র কিন্তু ব্যবসাদার। আমি হিন্দুস্তানের মেয়ে—সেখানে ছেলেবেলায় বানিয়াদের কথা শুনেছি। সাহেব, আমি পাঁচবছরের মেয়ে—আমাকে মায়ের বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল টাকা দিয়ে। আবার টাকা নিয়ে বেচে দিয়েছিল আরবী গোলামের কারবারীদের হাতে। তুমি চেন না এদের।

আর কথা বলা হয় নি। চকিতে সে চলে গিয়েছিল ঘরের দিকে। তাঁকেও ইশারা করেছিল সরে যেত। তিনি সরে এসে একটা কোণের

অন্ধকারে দাঁড়িয়েছিলেন। কয়েক মুহূর্ত পরে বেরিয়ে এসেছিল প্রবীণা বাঁদী কলিমন। অনেকক্ষণ সে চারিদিক ঘুরে দেখেছিল। তিনি নড়েন নি। দীর্ঘক্ষণ পর কলিমন চলে গেলে তিনি ঘরে এসে সন্তর্পণে শুয়েছিলেন।

ইস্পাহানে ফিরে এসেই তিনি আরম্ভ করেছিলেন ব্যবসা। অর্থ তাঁকে উপার্জন করতেই হবে। করতেই হবে।

পৈতৃক পুরানো ব্যবসায়ের বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। বলেছিলেন—আমি আবার ব্যবসা করব। আপনারা সাহায্য করুন।

তাঁরা হেসেছিলেন, বলেছিলেন—এত বড় পৈতৃক ব্যবসা রাখতে পারলে না। চোখ মেলে চেয়ে দেখলে না। আবার ব্যবসা? বেশ, কর। যতটুকু হয় সাহায্য করব।

তাঁর ইহুদী পৈতৃক আত্মীয়রা সোজা বলেছিল—না। নগদ লেনদেন যতক্ষণ ততক্ষণ ব্যবসা কর, করব। কিন্তু ধার নয়। সে পারব না।

ব্যবসা করতে গিয়ে কিছুদিন পর আবার ধাক্কা খেলেন। লোকসান খেলেন।

ওদিকে সাহেবজাদীর সাদী হয়ে গেল। সাদীর সময় নিমন্ত্রণ তিনি পেয়েছিলেন। তিনি গিয়েওছিলেন। এবং সাহস করে আরজি জানিয়েছিলেন সাহেবা মহলের কাছে মৈনুদ্দিনের মারফত।

তিনি বলেছিলেন—ও বাঁদীর দাম অনেক—তবে হাজার মোহর পেলে সৈয়দ সাহেবকে আমি দিতে পারি। আমার বেটীর সাদীতে আমাকে অনেক বাঁদী দিতে হবে। সে আমাকে কিনতে হচ্ছে। তবে সলিমাকে আমি দেব না—ও আমার কাছেই থাকবে।

রাখবার কারণ আছে। বাঁদী মনিবের প্রতিদ্বন্দ্বিনী হয়ে উঠবে।

তার কাছে দু বছর সময় নিয়ে এসেছিলেন সৈয়দ মহম্মদ। তারপর অনেক ভেবে স্থির করেছিলেন যাবেন হিন্দুস্তান। সেখানে হীরা জহরত মণি মুক্তা পথে ছড়ানো আছে। সোনা রূপা মুঠো ভরে তুলতে পারলেই হয়। তিনি যাবেন হিন্দুস্তান। সেখান থেকে আমীরি দৌলত নিয়ে এসে সলিমাকে মুক্ত করবেন। প্রাসাদ তৈরি করবেন। দুনিয়ায় বেহেস্ত গড়ে বাস করবেন।

সেই এসেছেন হিন্দুস্তান। আজ চার বছর হয়ে গেল। বার বার লোকসান খেয়েছেন আবার লাভও করেছেন। মোটমাট দরিদ্র তিনি আর নন। কিন্তু ইরানে আর ফেরেন নি। কারণ সলিমা আর নেই। সলিমা দুনিয়ার হাটে হারিয়ে গেছে। খবর নিয়েছিলেন—সলিমাকে তিন হাজার আশরফি দামে বিক্রি করে দিয়েছেন সাহেবাই মহল, কিনে নিয়ে গেছে কোন বিদেশী সওদাগর। সে তাকে নিয়ে গেছে কোন এক মুলুকের সুলতানের দরবারে বিক্রি করবে বলে। ইস্পাহান থেকে মৈনুদ্দিন সাহেব তাঁকে পত্র লিখে জানিয়েছিলেন দেড় বছরের মাথায়। সেবার তিনি পারস্য থেকে মুক্তা আর গালিচা আনবার জন্যে বরাত দিয়ে লোক পাঠিয়েছিলেন—তারই মারফত চিঠি পাঠিয়েছিলেন মৈনুদ্দিন সাহেবের কাছে।

তারপর আর তিনি ফেরেন নি। হিন্দুস্তানেই থেকে গেছেন। প্রতিজ্ঞা করেছেন—অর্থ তাঁর চাই, ধনী তাঁকে হতেই হবে। সলিমা হারিয়ে গেছে—অর্থের অভাবে হারিয়ে গেছে। সেই অর্থ তিনি রোজগার করবেনই।

অর্থ তাঁর হয়েছে। অনেক হয়েছে। আরও চাই।

এবার পারস্য থেকে আসছে গালিচা। গালিচা নামবে থাট্টায়। আর একখানা ছোট নৌকো আসছে—তাতে আসবে কতকগুলো কৌটো। তার মধ্যে থাকবে পারস্যের মুক্তা।

তাঁর দলবলকে রেখে তিনি যাবেন কলাচী। জেলে নৌকাতে।

থাট্টার প্রবেশ মুখে হঠাৎ তিনি স্তম্ভিত বিস্ময়ে ঘোড়ার লাগাম টেনে দাঁড়িয়ে গেলেন।

অবিকল—সলিমার মুখ!

অবিকল—সলিমার কণ্ঠস্বর!

কে? কে? এ কে?

সে এক অপূর্ব বালক।

দুই

অবিকল সলিমার মুখ। কিশোর বালক। বারো কি তেরোর বেশী বয়স নয়। এই বয়সে সন্ন্যাসী সাধুর বেশ ধরেছে। পরনে একখানা কৌপীন, কপালে তিলক কাটা, মাথায় মেয়েদের মত লম্বা চুল—সেগুলিকে চূড়ার মত করে বেঁধেছে। কাঁধে একটি ঝোলা। হাতে একটি দণ্ড, সে প্রায় তাঁর সমান উঁচু হবে, আর একটি লোটা। আকাশের দিকে তাকিয়ে পথের ধারে একটি গাছতলায় আর ক'জন বৈরাগী সাধুর সঙ্গে বসে আছে।

ঘোড়ার রাশ টেনে থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন মহম্মদ সৈয়দ। সঙ্গী কর্মচারী ইব্রাহিম এবং দালালটি এদেশী বানিয়া—নাম বিঠ্‌ঠলদাস—তারা বুঝতে পারে নি যে সাহেব এমনভাবে হঠাৎ দাঁড়িয়ে যাবেন, তারা ঘোড়া হাঁকিয়ে খানিকটা পথ এগিয়ে চলে গেল। উটওয়ালারা আসছিল পিছনে—তারা মালিককে এমনভাবে হঠাৎ দাঁড়াতে দেখে উটের লাগাম টেনে থামলে এবং সামনের উটচালক সামনে হাঁকলে—ইব্রাহিম সাহেব!

ইব্রাহিম এবং বিঠ্‌ঠলদাস এবার ঘোড়া থামিয়ে পিছনের দিকে তাকালে। দেখলে মালিক মহম্মদ সৈয়দ প্রায় বেহুঁশের মত ঘোড়ার পিঠে বসে আছেন।

তারা তাড়াতাড়ি ফিরে এল; ইব্রাহিম জিজ্ঞাসা করলে—কি হল হুজুর মালেক?

মহম্মদ সৈয়দ উত্তর দিলেন না। তাঁর চোখের উপর ভাসছে সলিমার মুখ। অবিকল সলিমা। অবিকল।

ইব্রাহিম বললে—জনাব আলি !

মহম্মদ সৈয়দ নেমে পড়লেন ঘোড়া থেকে। এবং এগিয়ে গেলেন ওই গাছতলার দিকে।

সাধুর দল তখন গাছতলায় ভোজনের আয়োজন করতে ব্যস্ত। গাছতলায় একটা দিক সাফা করে নিয়ে পাথরের টুকরো সাজিয়ে উনোন তৈরী হয়ে গেছে, গাছের শুকনো ডালপালা যোগাড় হয়েছে, একটু দূরে জন দুই জোয়ান সাধু বড় পিতলের থালির উপর ময়দায় জল দিয়ে ঠাসতে ব্যস্ত। তারা একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমানকে তাদের দিকে আসতে দেখে একটু চকিত হয়ে পরস্পরের মুখের দিকে তাকালে,—একটা প্রশ্নই শুধু সকলের মুখের ভঙ্গিতে ফুটে উঠেছে।

সিন্ধুদেশ। ১০৫১।৫২ হিজরী। ১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দ। এদেশে মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে যুদ্ধে বিগ্রহে ব্যবসায়ে বাণিজ্যে পরিচয় তখন প্রায় হাজার বছরের কাছাকাছি কালের। কালিফ ওমারের সময় থেকে ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা এখানে হানা দিচ্ছে। তখন হিজরী সালের শতাব্দী পূর্ণ হয় নি। পঞ্চাশ বছর ধরে আক্রমণের পর আক্রমণ চালিয়ে ইবন-আল-বাহাতি মাকরান দখল করে খাস সিন্ধুদেশের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়ায়। মাকরান বেলুচিস্তান তখন সিন্ধুদেশেরই অংশ ছিল। তারপর মহম্মদ-বিন-কাসেম এসে দেবল ধ্বংস করে সিন্ধুদেশ জয় করে নিয়েছে। সুতরাং এ অঞ্চলের লোকেরা মুসলমানদের সঙ্গে সব দিক দিয়ে বিশেষভাবে পরিচিত। একদিকে স্বাভাবিকভাবে কাছাকাছি পাশাপাশি বসবাস করার ফলে সিন্ধু থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত অঞ্চলে মানুষে মানুষে বন্ধুত্ব হয়েছে—সে বন্ধুত্ব অন্তরঙ্গ আত্মীয়তার পর্যায়েও উঠেছে অনেকক্ষেত্রে। রাজা নবাব আমীর ওমরাহদের আপন আপন ফৌজ আছে। সে ফৌজে মুসলমান সিপাহী আছে আবার হিন্দু সিপাহীও আছে। কর্মচারীদের মধ্যে

তাই। মজলিসে জলসায় হিন্দু গায়ক মুসলমান গায়ক গান করেছে। হিন্দু বাঈজী নেচেছে মুসলমান তওয়াইফ নেচেছে। হিন্দু মুসলমান শায়ের গজল মসনভি শুনিয়েছে। হিন্দু মুসলমান পাশাপাশি বসে শুনেছে। হিন্দুর বিয়েতে মুসলমান প্রতিবেশীরা এসেছে—মিষ্টান্ন ফল খেয়েছে—ছুলহা ছুলহিনকে উপহার দিয়েছে। মুসলমান ঘরের সাদীতেও হিন্দুরা এসেছে—আনন্দ করেছে—উপহার দিয়ে ফলমূল মিষ্টান্ন খেয়েছে। হিন্দু প্রতিবেশীর মৃত্যুতে মুসলমানরা চোখের জল ফেলেছে, মুসলমান কেউ মারা গেলে হিন্দুরা কেঁদেছে। মেয়ে মেয়েতে সই পাতিয়েছে। ছেলেতে ছেলেতে দোস্তি।

একদিকে যেমন বসবাসের ফলে হৃদ্যতা হয়েছে তেমনি অন্যদিকে মুসলমানেরা এদেশে রাজার জাত এবং হিন্দুরা প্রজার জাত বলে গভীর বিদ্বেষ ও তীব্র হিংসাও পরস্পরের মধ্যে রয়েছে। আলোর আড়ালে অন্ধকারের মত, দিনের পিছনে রাত্রির মত একটার আড়ালে অন্যটা আত্মগোপন করে থাকে। নিরন্তর সংঘর্ষ আর লেনদেন আমোদ-আহ্লাদের মধ্যে কাছে আসে আবার সরে যায়, সরে যায় আবার কাছে আসে।

তাই যখন অপরিচিত সম্ভ্রান্ত মুসলমানটি গাছতলায় সাধুর দলটির দিকে এগিয়ে এলেন তখন তাদের মনের মধ্যে শঙ্কিত প্রশ্ন না জেগে পারল না।

একজন প্রবীণ সাধু—বোধকরি দলের প্রধানদের একজন—এগিয়ে এসে রাজকীয় প্রথাতেই রাজধর্মাবলম্বী বিশিষ্ট ব্যক্তিকে অভিবাদন করে বললে—সালাম আলায়কুম!

মহম্মদ সৈয়দ হেসে সবিনয়ে হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার করে বললেন—নমস্তে মহারাজজীউ! তারপর বললেন—আলায়কুম সালাম!

মহম্মদ সৈয়দ ধর্মমতে বিচিত্র মানুষ ছিলেন, ইহুদীর ছেলে এবং ইহুদীদের শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত রিব্বানীদের সংস্পর্শ করেছেন বাল্যকাল থেকে,

হিব্রু ভাষা এবং শাস্ত্র পড়াশুনা করে তাতেও তৃষ্ণা মেটে নি বলে আরবী ভাষা শিখে কোরান পড়েছেন ; কোরান তাঁকে বেশী আকৃষ্ট করেছিল বলে ইলাহী ধর্ম গ্রহণ করেছেন ; পারসী ভাষা শিখেছেন, স্থফী তত্ত্ব পড়াশোনা করে তাতে মুগ্ধ হয়েছেন। এমন মন যে মানুষের সে মানুষ হিন্দুস্তানে এসে শুধ্ ব্যবসাই করেন নি—এদেশের কাফেরদের এই পুতুল পূজোর মর্ম বুঝতে চেয়েছেন—ধর্মতত্ত্ব বুঝতে চেষ্টা করেছেন ; তিনি সাধুদের পোশাক দেখে শৈব শাক্ত বৈষ্ণব জৈন সাধুদের ঠিক চিনতে পারেন। এঁদের অভিবাদনপ্রথা অভিবাদনের সম্বোধন শব্দগুলিও জানেন তাই বৈষ্ণব সাধু তাঁকে সালাম আলায় কুম বলে অভিবাদন করলেও তিনি প্রথমে নমস্তে সাধু মহারাজজীউ বলে নমস্কার করে পরে বললেন আলায় কুম সালাম!

সাধুটি আশ্বস্ত হয়ে বিনীত শান্ত কণ্ঠে সমাদর করে বললেন—কি ফরমায়েশ আপনার আমীর সাহেব? আপনার কোন্ সেবায় লাগতে পারি আদেশ করুন। পানির প্রয়োজন?

পথিকের কাছে পথিকের সর্বাগ্রে প্রয়োজন হয় জলের। তারপর খাদ্যের। আর প্রয়োজন হয় দুশমন বদমায়েশের অত্যাচারে আশ্রয়ের। এই সম্ভ্রান্ত আমীর যাঁর সঙ্গে উট রয়েছে কয়েকটা ঘোড়সওয়ার রয়েছে সিপাহী রয়েছে তাঁর আশ্রয়ের প্রয়োজন নেই, খাদ্যেরও না ; প্রয়োজন সম্ভবত জলেরই। জল ফুরিয়ে যায়, কোন কিছু মিশে বদ্গন্ধী বিস্বাদ হয়ে যায়। বিশেষ করে সিন্ধু মুল্লুক—এখানে বিস্তীর্ণ মরুভূমি। অবশ্য সিন্ধু এবং পঞ্চ্ দরিয়ার কল্যাণে এ অঞ্চলটায় সবুজের প্রাধান্য। মরুভূমির তাপ এবং জলের অভাব নেই—তবে এখান থেকে সমুদ্র তো বেশী দূরে নয়—এখানে জোয়ার আসে, অনেক দূর পর্যন্ত, জল এখানে লবণাক্ত। ভাল সুস্বাদ জল চাইতেই মেলে না, ভাল কুয়া দশ বিশটার মধ্যে একটা। সম্ভবতঃ জলই ফুরিয়েছে এঁর।

মহম্মদ সৈয়দ বললেন—না না মহারাজ, জল নয়। তবে তিয়াষ একটা বটে। সেই তিয়াষে মহারাজজীউদের কাছে এলাম। যাকে বলে জানপহছানের তিয়াষ, যে তিয়াষ মেটে মেহমানির ঠাণ্ডি দরিয়ার পানিতে।

গোটা সাধুর দলটি উৎসুক উৎফুল্ল হয়ে উঠল। প্রবীণ সাধুটি বললেন—সুস্বোয়াগতম, আসুন আসুন। আপনি মেহমানির পিয়াসী। আল্লাতায়লার কৃপায় আপনার দিল্ অন্তর আলোর মত উজ্জ্বল, আপনার পায়ের ধূলাতে আমাদের এই পথের ধারের আস্তানা মন্দিরের অঙ্গনের মত পবিত্র হল। আসুন। আমাদের গুরুমহারাজ বসে আছেন গাছের ওদিকে—আসুন।

অল্পবয়সী সাধুদের একজন তাড়াতাড়ি উঠে একখানা আসন নিয়ে পেতে দিলে ওদিকে গুরুমহারাজের সামনে।

গুরুমহারাজটি বৃদ্ধ মানুষ, বয়স অনেক হয়েছে, কিন্তু শক্ত এবং সবল আছেন এখনও। তিনি একখানি আসনের উপর বসে যেন চোখ খুলেই কোন ধ্যানে মগ্ন ছিলেন। বা স্তব্ধ হয়ে বসে ছিলেন।

মহম্মদ সৈয়দ ছেলেটির দিকে বার বার তাকিয়ে দেখছিলেন। আশ্চর্য, এই বাচ্চা ছেলেটি সেই একভাবেই বসে আছে। চোখের দৃষ্টি যেন কোন দূরদূরান্তে দিগন্তের ওপারে কিছুর প্রতি নিবদ্ধ।

সেই মুখ। সেই সলিমার মুখ। অত্যন্ত কাছে এসে দেখেও তিনি কোন পার্থক্য খুঁজে পেলেন না।

নমস্তে বলে অভিবাদন করে আসনে বসলেন মহম্মদ সৈয়দ। গুরুমহারাজ হাত তুলে তাঁদের প্রথামত মঙ্গল কামনা জানালেন। একটু হেসে বললেন—কি বাবা, আপনিও মাতোয়ালা নাকি? পানিয়া ভরণকে লিয়ে গাগরী নিয়ে দরিয়ায় যেতে যেতে পথে ভাটিখানা দেখে বসে গেলেন?

এই সব এদেশের সাধু সন্ত সুফী মহাজনদের এই ধরনের কথাবার্তার বিচিত্র ঢঙ সৈয়দ সাহেবের অজানা নয়, তিনি বোঝেন।

ওমর খৈয়ামের সিরাজী এবং সাকীর গূঢ় অর্থের মাধুর্যের জন্য ওমর খৈয়াম তাঁর মুখস্থ। সাধুমহারাজের কথার গূঢ় অর্থ তিনি বুঝতে ভুল করলেন না।

সাধুমহারাজ তখনও বলে চলেছিলেন—না, আপনার নসীবের কথা জানতে চান? এই দু ধরনের মানুষই তো আমাদের কাছে আসে। পোশাকআশাক দেখে তো মালুম হয় কি আপনি শেঠ মহাজন কিন্তু আপনার ললাট বলে—না—আপনি ওই যা বলেছি তাই।

মহম্মদ সৈয়দ বলতে যাচ্ছিলেন কিছু, কিন্তু হিন্দু দালাল বিঠ্‌ঠলদাস এসে সালাম করে বললে—জনাব আলি, বেলা তো দু পহর পার হতে চলেছে, তা আমরা কি এখানেই খানাপিনার জন্যে আঁট লাগাব? না থাট্টাতে গিয়েই—

মহম্মদ সৈয়দ মুখ তুলে বেলা ঠাওর করবার জন্য একবার আকাশের দিকে তাকালেন। বিঠ্‌ঠলদাস জরুরী কথা বলেছে। এখান থেকে থাট্টা প্রায় ক্রোশভর পথ হবে। বেলা দু'পহরের মাথায় উঠেছে, এবার গড়াতে শুরু করবে। থাট্টা পৌঁছুতে আধ ঘড়ির বেশীই লাগবে। থাট্টার বাজার দু'পহরে একবার ঠাণ্ডা হয়ে যায়, আবার তিন পহরের মাথায় জমতে শুরু করে। সন্ধ্যের মুখে জমে ওঠে। রাত্রি এক প্রহর পর্যন্ত চলে ফলাও কারবার। লেনদেন বিকিকিনি। সেদিক দিয়ে তাঁর অসুবিধে হবে না। থাট্টায় যে মাল তিনি নিয়ে চলেছেন তা রাত্রি পর্যন্ত বিক্রী হয়ে যাবে। তার পরও কলাচী রওনা হলে শেষরাত তক পৌঁছুনো যায়। শেষরাত্রে ইরানী নৌকার পেটির মাল নিয়ে বেরিয়ে ফিরতে কিন্তু সকাল হয়ে যাবে। ভয়টা সেখানে। সকাল হতেই বাদশাহী নোকরেরা যারা মাসুল আদায় করে তারা, সারারাত্রি উপোস করে শকুনেরা যেমন সকালেই আকাশে ডানা মেলে ওড়ে আর তাকিয়ে দেখে কোথায় মুর্দা গিরেছে—কাকেরা যেমন রাস্তায় রাস্তায় নেমে খোঁজে

কোথায় পড়েছে মরা 'চুহা' বাসী খানা তেমনি করে খুঁজে বেড়াবে শিকার। বাইরের লোক দেখলেই ধরবে। বাদশাহী মাসুল—সে দিতে নারাজ কেউ নয় কিন্তু এই সব শকুন কাককে মাসুল দিতে গেলে অবস্থাটা হবে বিলকুল এই হিন্দুদের কুরবানী করা বোকরার মত। মাথাটা নাকি দেবতাকে দেয় কাফেররা আর বাকী ধড়টা ভাগা-ভাগি করে লোকেরা খেয়ে নেয়। এবার পারস্য থেকে যা আসছে তা খুব দুর্লভ জিনিস। আজ বছর কয়েক ধরে চেষ্টা করে কবুতরের ডিমের মত আকারের একটু লালচে রঙের মুক্তা সংগ্রহ করিয়েছেন, সেখানে দফায় দফায় টাকা পাঠিয়েছেন মুক্তাব্যবসায়ীদের। মাপে এক, রঙে এক, এই রকম পঁচিশটা মুক্তা, যাতে একছড়া মালা হতে পারবে। ইচ্ছে আছে এই মালা নিয়ে যাবেন দিল্লীতে বা আগ্রায় খুদ শাহানশাহ সাজাহানের দরবারে। হীরা জহরতের এমন কদর করনেবালা আর দুটি মানুষ নেই দুনিয়ায় আজকার দিনে। তাঁর শিরপেঁচের কোহিনুর দুনিয়ায় কারুর নেই, তাঁর তক্তে তাউসের মত এমন মসনদ এও কারুর নেই। আর তাঁর খাজাঞ্চিখানায় আছে রাশি রাশি সোনা। দাম দিতে কখনও পিছপাও নন। শুধু দামই নয় এমন দুর্লভ জহরতের জন্যে তিনি ইনামও দিয়ে থাকেন।

মহম্মদ সৈয়দ বেলার দিকে তাকিয়ে ভাবছিলেন এখানে দেরি করলে মুশকিল হবে। বিপদ হবে।

জানোয়ারগুলো ধুঁকছে। হাঁ, ওদের বিশ্রামের দরকার। আদমীরাও এখানে বসলে জমে যাবে। উঠতে চাইবে না সেই বিকেল তক। বিঠ্ঠলদাস যতই মোলায়েম করে ভয় এবং সহবতের সঙ্গে কথা বলুক ওরা যে বিরক্ত হয়েছে খানিকটা তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু—

সৈয়দ আবার তাকালেন সেই কিশোরের মুখের দিকে। ঠিক, অবিকল সেই মুখ—সলিমার মুখ। ছেলেটি সেই স্থির দৃষ্টিতে দিগন্তের দিকেই নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে বটে কিন্তু এই মুহূর্তে একটি স্মিতহাস্যরেখা ফুটে উঠেছে তার মুখে। ঠোঁট দুটি ঈষৎ বিস্ফারিত

হয়ে উপরের সারির দু' তিনটি দাঁত দেখা যাচ্ছে; ঠোঁটদুটির দুই কোণে দুটি বাঁকা রেখা জেগে উঠেছে, দুই গালে দুটি টোল পড়েছে; মনে পড়ল সলিমার গালে ঠিক এমনি টোল পড়ত। তবে সলিমার হাসিতে ছিল লাস্য—টোল দুটি হত আরও গভীর। কিন্তু এই মুহূর্তে ছেলেটির মুখে এমন হাসি ফুটল কি করে? ছেলেটি কি পাগল? দেওয়ানা? এই তো একটু আগে ঠিক এমনি ভাবেই তাকিয়ে ছিল—তখন তার দৃষ্টিতে ছিল অসীম উদাসীনতা, সারা মুখে ছিল অন্তহীন বিষণ্ণতা। হঠাৎ কি হল? মনে সে কি পেলে—চোখে সে কি দেখলে যাতে এমন প্রসন্নতায় মেঘের-আবরণ-সরে-যাওয়া চাঁদের মত উজ্জ্বল হয়ে হেসে উঠল?

বিঠ্ঠলদাস উত্তরের অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে আছে। তার পিছনে এবার ইব্রাহিম এসে দাঁড়াল। বললে—উটগুলো বলতে যাচ্ছে।

মহম্মদ সৈয়দ বললেন—এক কাজ কর, তোমরা চলে যাও। থাট্টার আস্তানায় গিয়ে তোমরা খানাপিনা কর। আমার ঘোড়াকে থোড়া পানি দিতে বল সহিসকে। সে থাকুক। আমি কিছুক্ষণ পরেই যাচ্ছি। সে পয়দলে আমার সঙ্গে যাবে।

কথা শেষ করেই তিনি আবার সেই ছেলেটার দিকে তাকালেন। এখনও সে হাসছে। এবার একটু ঘাড়টি যেন বেঁকেছে। ও কি মনে মনে কারুর সঙ্গে কথা বলছে?

বিঠ্ঠলদাস এবং ইব্রাহিম চলে গেল। খুব খুশী হয়েই গেল। মহম্মদ সৈয়দ একটু হাসলেন। মালিক পিছনে রইল, ওরা বাজারে গিয়ে মালের দামের জন্যে যে চামড়ার পেটিটা আছে তার মধ্যে ফুটো করবার অবসর মিলল ওদের। তা হোক। এ ছেলের পরিচয় না নিয়ে তিনি যেতে পারবেন না। শুধু পরিচয়ই নয় একে ছেড়ে যাবারই যেন শক্তি নেই তাঁর। যেতে গেলে কলিজাটা ছিঁড়ে দিয়ে যেতে হবে।

এবার সাধুদের গুরুমহারাজ বললেন—আমীর সাহেব, আপনার

কোন জরুরী প্রশ্ন আছে বলে মালুম হচ্ছে আমার। তা ফরমায়েশ করুন। আমার সাধ্য হয় তো জবাব দেব। তবে মানুষ তো মানুষ আমীর সাহেব। বলে হেসে বললেন—

নয়ন চলে ভাই গগন কিনারে—উসকে পারে লাখ ভুবন—

উসকে পারে নসীবকে ঘর—উসকে পতা লাগাওয়ে কোন জন?

মহম্মদ সৈয়দ বললেন—না মহারাজ, নসীবকে নিয়ে মাথা আমি ঘামাই নে। নসীবে যা হবার তা হবে। সে সব জিজ্ঞাসা করতে আমি আসি নি। আমি গোড়াতেই বলেছি মহারাজ আমি জানপহছানের তিয়াষা হয়ে এসেছি। অনেক সময় রাহীর তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে না গেলেও টলমলে দরিয়া দেখলেও জেগে ওঠে। তখন সে ছুটে যায় কি এমন পানি পেয়েছি পিয়ে নি। আমারও তাই হয়েছে মহারাজ। আমি এই যে বাচ্চা—এই বাচ্চাকে দেখে ছুটে এসেছি ওর পরিচয় জানতে।

সাধুর কপালে কুঞ্চনরেখা জেগে উঠল। এই কালের সমাজের এক অতি কুৎসিত প্রথার কথা তাঁর মনে পড়ে গেল। তিনি মহম্মদ সৈয়দের মুখের দিকে রূঢ় দৃষ্টিতে তাকালেন। দেখলেন মহম্মদ সৈয়দ মুগ্ধ হয়ে বালককে দেখছেন। তিনি তাঁর দৃষ্টি ফেরাবার জন্যেই তাঁকে ডাকলেন—আমীর সাহেব!

—সাধুমহারাজ!

—আমীর সাহেব, ও বাচ্চা আমাদের বিচারে যে কি তা তোমাকে বলবার আমার অধিকার নেই। তবে ওর দিকে দয়া করে তুমি তাকিয়ো না। দুনিয়াতে সুরতের অভাব নেই। সুরত খুঁজলে অনেক মেলে, ওর চেয়েও অনেক বেশী সুরত মেলে। মেহেরবানি করে তুমি ভুলে যাও ওর কথা। তা ছাড়া ও একরকমের পাগল। আপন মনে হাসে—আপন মনে কাঁদে। ভুখ লাগলে বুঝতে পারে না। ডেকে অনেক সাধ্য-সাধনা করে খাওয়াতে হয়। আরও একটা কথা বলি আমীর সাহেব যে ওর অনিষ্ট করলে তোমাকে ধ্বংস হয়ে যেতে হবে।

মহম্মদ সৈয়দ হেসে বললেন—সাধুমহারাজ, আপনি মিথ্যে রাগ করছেন আমার উপর। এ বাচ্চা যে দেওয়ানা—এর চোখের নজর যে আসমানও পার হয়ে যায় সে আমি দেখেই বুঝেছি। তবু আমি ছুটে এসেছি ওর পরিচয় জানতে তার কারণ আছে। আমি অকপটে সব কথাই আপনার কাছে খুলে বলছি। তারপর যদি মনে করেন ওর পরিচয় জানতে চাওয়া কসুর হয়েছে আমার তাহলে আপনি বলবেন আমাকে, আমি তখুনি চলে যাব। মহারাজ, আমি জন্মেছিলাম ইহুদীর ঘরে। ছেলেবেলা থেকে তুনিয়া আর তুনিয়ার মালিককে জানবার জন্যে ইহুদীদের শাস্ত্র সব পড়েছি, পড়তে গিয়ে জানতে গিয়ে হয়ে গিয়েছিলাম ফকীর—দেউলিয়া। কিন্তু মন ভরে নি। তখন মন পড়ল ইলাহী ধর্মের দিকে। ইরানের সব সেরা উলেমার কাছে ফার্সী আরবী আর কোর্আন পড়ে মনে হল এতেই জানব পাব তুনিয়ার মালিকের সন্ধান। জেনেছি অনেক সাধুমহারাজ, কিন্তু পাই নি কিছুই। মক্কাশরীফ থেকে ফিরছিলাম—একদিন পথে এক সরাইখানায় দেখলাম একজনকে—এক ঔরৎকে। দেখে মনে হল একে পেলেই বুঝি যাকে খুঁজি তাকে পাব আমি। এই সেই সাকী যে আমাকে তুনিয়াব মালিক যিনি তাঁর করুণার সিরাজী আকণ্ঠ পান করাতে পারে সারা জিন্দিগী!

ওদিকে সাধুদের দলটি তখন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তারা বুঝতে পেরেছে এই মুসলমান আমীর ওই ছেলেটিকে দেখে মুগ্ধ হয়ে নির্লজ্জের মত তাকে পাবার জন্য দাবি করছে, লোভ দেখাচ্ছে গুরুমহারাজকে। একটা চাপা অসন্তোষের উত্তাপ বিকীর্ণ হতে আরম্ভ হয়েছে—সেটা চাপা ফিসফিস শব্দের মধ্যে ভেসে আসছে; যেন আশেপাশে কোথাও একদল ক্রুদ্ধ সাপ কোন গহ্বরের মধ্য থেকে একসঙ্গে ক্রুদ্ধ নিঃশ্বাস ফেলছে।

মহম্মদ সৈয়দ তু'একবার কথা বলতে বলতে থামলেন। কিন্তু বৃদ্ধ সাধু তাঁকে বললেন—বলুন, আমীর সাহেব বলুন।

বক্তার কণ্ঠস্বরে এবং বাকভঙ্গির মধ্যে এক আশ্চর্য সরল আকূতি ছিল যা বৃদ্ধ সাধুকে স্পর্শ না করে পারে নি।

সৈয়দ বলেছিলেন—এই বাচ্চার মুখ অবিকল সেই সলিমার মত। দেহের গড়ন মুখের হাসি—সেই—সেই অবিকল তার। অবিকল। আর শুনেছিলাম তার গান; সরাইখানায় সে তার মনিবাইনের দিল শরীফ করতে তাকে গান শোনাচ্ছিল—আমি শুনেছিলাম—মনে হয়েছিল বেহেস্ত থেকে ভেসে আসছে বেহেস্তের গান। এ বাচ্চার গান আমি শুনি নি।

থেমে গিয়ে বললেন—ওর গলার আওয়াজই শুনি নি আমি—এখনও পর্যন্ত একটা কথাও ও বলে নি। সুতরাং কণ্ঠস্বরে মিল আছে কি না বলতে পারব না। সে সলিমা আমাকে একটা কথা বলেছিল—মহারাজ তার মত সত্য কথা আর হয় না। বলেছিল—"হায় সাহেব, শুনেছি খোদাতায়লাকে খুশী করতে তুমি সর্বস্বান্ত দেউলিয়া হয়ে গেছ। আজ মানুষকে চাইলে কি করে পাবে? এ দুনিয়া এমনিই বটে সাহেব, এখানে খোদাকে চাইলে মানুষকে হারায়—আবার মানুষকে চাইলে খোদাকে হারায়।" আর বলেছিল সে এই হিন্দুস্তানের লেড়কী—যখন তার উমর পাঁচ বছর তখন এদেশের গোলাম বাঁদীর কারবারীরা তাকে মায়ের বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বিক্রি করেছিল ইরানী কারবারীর কাছে। তাই—

আবার একটু থামলেন মহম্মদ সৈয়দ, তারপর বললেন—তাই আমি খোদার সন্ধানের পথ ছেড়ে তাকে কিনব, তাকে নিয়ে আমীরী দৌলতে সুখে রাখব বলে এসেছিলাম হিন্দোস্তানে। যেখানে এসে ইরানী ইরাকী তুর্কী বাদাকশানী খোরাশানীরা পথের ভিক্ষুক থেকে নবাব হয় আমীর হয়—রাজার দৌলত রোজগার করে সেই হিন্দোস্তান থেকে দৌলত রোজগার করব বলে। কিন্তু—। কিন্তু সে আশা বিলকুল বরবাদ হয়ে গেছে। তাকে তার মনিব খুব চড়া দামে বিক্রী করে দিয়েছে কোন্ মুলুকের সুলতানের কাছে। কি করব? কিছু

করবার নেই বলে সওদাগরির কাম করি। দৌলতের নেশায় ভুলতে চেষ্টা করি তাকে। আজও সেই দৌলতের ধান্দায় চলেছিলাম। হঠাৎ পথের ধারে দেখলাম এই বাচ্চাকে—মহারাজ, মালুম হল কি সলিমা বুঝি কোন যাদুতে বাচ্চা বনে গিয়ে এই গাছতলায় বসে আছে। তাই সামলাতে পারলাম না। ওই বাচ্চাকে জানবার জন্যে না এসে পারলাম না। সে যে কি আকর্ষণ তা বলতে পারব না মহারাজ—মনে হল ও বাচ্চা সমুন্দর আর আমি দরিয়া—আমাকে টানছে ও আমার জনম থেকে, যেমন সমুন্দর হাজারো কোশ দূরে থেকেও টানে পাহাড়ের বুকে ঝরা ঝরনাকে তেমনি ভাবে। তাই ছুটে এসেছি—আপনার কাছে জানতে চেয়েছি ওর পরিচয়। এতে যদি আমার কসুর হয়ে থাকে সাধুজীউ তবে মাফ করবেন আমাকে।

সাধু মহারাজ হেসে বললেন—

লালী মেরে লালকী, জিত দেখোঁ তিত লাল
লালী দেখন মৈ গঈ, মৈঁ ভী হোগই লাল।

বুঝতে পেরেছি মীর সাহেব। প্রভু কবীরদাসজী বলেছিলেন—আমার যে লাল যে পিয়ার তার লালিমা তোমার চোখে লাগে, তামাম লাল হয়ে যায়। লালকে দেখতে গিয়ে তার লাল ছটায় আমিও লাল হয়ে গেলাম। তোমারও তাই হয়েছে। দোষ তোমার নেই। বস মীর সাহেব—আমি বলব তোমাকে ওর পরিচয়। তুমিও ভুল দেখ নি। ঠিক দেখেছ। ইগারা বারা বরিষ আগে দুনীচান্দ বানিয়ার বেটী অমৃতকুমারীকে চুরি করে নিয়েছিল তার মায়ের কাছ থেকে। এই বাচ্চা অভয়চান্দ তখন দু' মাহিনার বাচ্চা—মা তাকে বুকে আঁকড়ে ছুটে পালিয়েছিল। হয়তো সেই অমৃতকুমারীকে তুমি দেখেছ ইরানে, সেই হয়তো সেই সলিমা।

সৈয়দ মহম্মদ একটু ইতস্ততঃ করে বললেন—আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করব মহারাজ? না, একটা নয়, দুটো—

—হাঁ হাঁ, কর। নিশ্চয় জবাব দেব। বল।

—একে আপনারা পেলেন কি করে? আর এ বাচ্চা এমনই বা কেন? মগজ খারাব?

মহারাজ বললেন—মীর সাহেব, হিন্দোস্তানে তুমি এসেছ অল্প দিন। বার চৌদ্দ বছর আগেও এ মুলুকে হিন্দু আর মুসলমানের মধ্যে মেহমানি ছিল। তোমাদের সঙ্গে লড়াই বহুৎ হয়েছে, নবাব সুলতান তারা এদেশে এসে হিন্দুদের সঙ্গে লড়াই করেছে, মন্দির ভেঙেছে. লুটতরাজ করেছে; হিন্দুরা হেরেছে—হাঁ মীর সাহেব, লড়ায়ে হেরেছে। হিন্দুর চেয়ে ইরানী ইরাকী তুর্কী জঙ্গী জঙ্গবাহাদুরদের তাগদ বেশী। হাঁ বেশী। আবার হিন্দুরাও বেইমানি করে মুসলমানকে পথ বাতলে দিয়েছে। লড়াই ফতে করবার ফন্দিফিকির বলে দিয়েছে। অনেক হিন্দুকে জবরদস্তি মুসলমানও করেছে। এ তো এই সিন্ধুমুলুকে হাজারো বরষ চলে আসছে। তবুও এরই মধ্যে হিন্দু মুসলমানে সওদাগরে সওদাগরে চাষীতে চাষীতে মজুরে মজুরে সিপাহিতে সিপাহিতেও মীর সাহেব, দোস্তি হয়েছে তা। দেখতে পাচ্ছ। কিন্তু বারা চৌদা বরষ পিছে মেহমানিও হত। হিন্দু লেড়কী জবরদস্তি নিয়ে যাওয়ার কথা শুনেছ। কিন্তু তা ছাড়াও বাপে বাপে দোস্তি—সেই দোস্তির টানে এর ছেলের সঙ্গে ওর মেয়ের বিয়ে হয়েছে, এর মেয়ের সঙ্গে ওর ছেলের সাদী হয়েছে। আবার মহব্বতি হয়েছে—হিন্দুর ছেলে মুসলমানের মেয়ে সাদী হয়েছে। মুসলমানের ছেলের সঙ্গে হিন্দুর মেয়ের সাদী এখনও চলছে। তা তো দেখছ। কিন্তু মুসলমানের মেয়ের সঙ্গে হিন্দুর ছেলের আর বিয়ে হয় না। হলে হিন্দুর ছেলের জাত চলে যায়।

—আগে তা যেত না? সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন মহম্মদ সৈয়দ।

—না। যেত না। আমার প্রভু কবীরদাস বলেছেন—

"তুই জগদীশ কঁহাতে আয়া কহ করনে ভরমায়া।
আল্লাহ রাম করীম কৃষণ হজরত নাম ধরায়া।"

কবীরদাসজী জোলহার ঘরের ছেলে, মুসলমান জোলহা, তিনি

রামকেও ভজলেন রহিমকেও ভজলেন। তুনিয়াকে বললেন—মানুষ তো—সে হিন্দুস্তানী হো আর তুর্কমানী ইরানী হো মানুষ তো মানুষ। তারা শুনেছিল বুঝেছিল। কারবার চলেছিল। মগর মোল্লা বললে আর বাদশা বললে—এ হবে না। এ চলবে না। হিন্দু লেড়কী মুসলমানের ঘরে আসে সে ঠিক আছে। লেকিন মুসলমান লেড়কী হিন্দুর ঘরে যাবে হিন্দু হয়ে যাবে তাতে ইসলামে গুনা হয়। এই বাদশাহী ফরমান জারী হয়ে গেল, জারী করলে সাহজাঁহা বাদশা কি হিন্দুর ছেলে মুসলমানী বিয়ে করলে তাকে কলমা পড়তে হবে মুসলমান হতে হবে। নারাজ হলে সাজাই হবে তার—আর উ মুসলমানী লেড়কীর ফের সাদী হবে মুসলমানের সঙ্গে কাজীর দরবারে। এ মীর সাহেব সিন্ধু থেকে জম্মু কাশ্মীর পর্যন্ত চল ছিল। বাদশাহী ফরমান জারী হল—কোতোয়াল কাজী তলাশী করলে—জোর তলাশী—তাতে কত যে হিন্দু মুসলমান হয়ে গেল তার ঠিকানা নেই।

একটু থামলেন সাধুজী।

এতক্ষণে মহম্মদ সৈয়দের খেয়াল হল যে সাধুর দলের জন কয়েক এসে তাঁর পিছনে অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে আছে। চকিতের মত তাঁর শঙ্কা হল একটা, কিন্তু সামনের সাধুর প্রসন্ন প্রশান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁর সে শঙ্কাকে তিনি দূর করে দিলেন।

সেই প্রবীণ সাধুটি বললে—গুরুজী, বেলা তিন পহরে ঢলছে। চৌকার কাজ হয়ে গিয়েছে। আপনার মরজি হলে—

গুরুমহারাজ মীর সাহেবের মুখের দিকে তাকালেন, বললেন—দেহ ধারণ করতে হলে ভুখাকে মানতে হয় মীর সাহেব। তুনিয়ার মাটিতে বাতাসে আকাশে আঠ পহরই চলছে হয় জাড়া নয় ধুপ নয় ঝড় নয় তুফান। আত্মা পরমাত্মাকে নিয়ে বিহার করেন—তার তো আচ্ছাদন চাই মন্দির চাই। সে মন্দিরের পরিচর্যা না করলে তো চলে না। আপনিও তো ক্ষুধার্ত নিশ্চয়। আপনি কি—

—না না, আমি ক্ষুধার্ত নই মহারাজ। তবে আপনার ভোজন সেরে নিন। আমি ততক্ষণ অপেক্ষা করি।

মহম্মদ সৈয়দ গোঁড়া নন কিন্তু নিষ্ঠাবান মুসলমান। এই সব কাফের সাধুদের সমস্ত কিছু সে খানাপিনা পর্যন্ত তাদের দেবতাকে ভোগ না দিয়ে খায় না সে তিনি জানেন, খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে এদের ছোঁয়াছুঁয়ির কড়াকড়িও তাঁর অজানা নয়। এতক্ষণ ধরে কথাবার্তার মধ্যে কয়েকবার কবীরদাসের নাম শুনে তাঁর দোঁহা শুনে বুঝেছেন এরা কবীরপন্থী। কবীরপন্থীদের সঙ্গে পরিচয় তাঁর কম। তবে শুনেছেন কবীরদাস মুসলমান জোলহার ছেলে হয়ে হিন্দু বৈষ্ণব সাধুর কাছে দীক্ষা নিয়ে নিজে সাধনা করে এক ধর্মমত তৈরি করেছে। তাতে হিন্দুও আছে মুসলমানও আছে। অনুমানে বুঝতে পারেন, জোলহার ছেলে সাধারণ বুদ্ধিতে এর খানিকটা ওর খানিকটা নিয়ে এক খিচুড়ির মত বানিয়েছে। তা হয়তো উদার—তার মধ্যে হয়তো এ দেশের বিচিত্র বৈরাগী ভাব আছে—সুফী মতের মত খানিকটা গন্ধও আছে, তবুও নিষ্ঠাবান মুসলমান হিসেবে ওদের ধর্মমতে ভোগ দেওয়া খানা তিনি কখনই খাবেন না। মহম্মদ সৈয়দ এসে তাঁর ঘোড়াটার কাছে দাঁড়ালেন। ঘোড়াটি তাঁর বড় প্রিয়। মনিবকে কাছে পেয়ে সে তার মুখ তুলে একটু ডেকে উঠল, পা ঠুকলে মাটিতে। তিনি তার ঘাড়ের উপর হাতের মৃদু চাপড় দিয়ে আদর করে বললেন—ক্যা, ভুখ লাগা হ্যায় বেটা ?

ঘোড়াটার কান দুটো খাড়া হয়ে উঠল। সহিসটা একটু দূরে গাছতলায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। রোদ এখন প্রখর। বোধকরি এই সময়টাতেই সব থেকে বেশী উত্তাপ। তাও বাঁচোয়া যে সময়টা ফাল্গুনের প্রথম। দিনের বেলা এখনও ছোট। সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়েছে। কতক্ষণ যে কাটবে তা বুঝতে পারছেন না। তবে যা বুঝবার তা অনেকটাই বুঝেছেন। এ বাচ্চা সলিমারই ভাই। এতে

আর কোন সন্দেহ নেই। সেই মুখ। সেই দেহের গড়ন। সেই সুষমা। না—। মনে হচ্ছে তার থেকেও বেশী।

সে নারী। পুরুষের মনোহরণের উপাদানে তার দেহ এবং সুষমা তৃষ্ণার্তের কাছে ভরা-দরিয়ার মত সমৃদ্ধ। এ বালক—তবু যেন এর মধ্যে আশ্চর্য সুষমা। মুখের ওই বিষণ্ণতা, চোখের দৃষ্টির ওই উদাসীনতা, ঠোঁটের ওই প্রসন্ন হাসির মধ্যে যে মাধুরীর বিকাশ দেখেছেন তা তিনি কখনও দেখেন নি।

সামনের সড়কটার উপর ভিড় বাড়ছে ক্রমশঃ। যাত্রীর দল চলেছে থাট্টার দিকে। বেলা পড়ে আসছে—সন্ধ্যের বাজারের পূর্বে পৌঁছুতে হবে। থাট্টা থেকে ফিরতি যাত্রীর ভিড় কম। তু'পহর পর্যন্ত যারা বাজার-হাটের কাজ সেরেছে তারা সব চলে গেছে। যারা থেকে গেছে তারা রাতটা থেকে ভোর ভোর রওনা হবে। রাত্রে পথ হাঁটা নিরাপদ নয়। এসব অঞ্চলে তুর্ধর্ষ বেলুচ গুজর ডাকাতদের উপদ্রব লেগেই আছে। রাত্রে থাট্টা থেকে কলাচী পর্যন্ত নৌকায় যেতে হবে, যত রাত্রি গভীর হবে তত সমুদ্রের উপকূলও বিপদসংকুল হয়ে উঠবে। দৃষ্টি তাঁর মনের দোলায় একবার সড়ক ধরে থাট্টার দিকে প্রসারিত হচ্ছে আবার একবার ঘুরছে গাছতলার দিকে, দেখছেন ওই ছেলেটিকে।

ছেলেটিকে দেখলেই সমস্ত মনটা যেন ঝ'ড়ো আবহাওয়ায় দরিয়ার মত তুফান তুলছে। ছুটে গিয়ে ওকে বুকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করছে। মনে হচ্ছে ওর মধ্যেই পাবেন সলিমাকে। সলিমা অমৃতকুমারী। এ বাচ্চা অমৃতকুমারীর ভাই অভয়চান্দ।

থাট্টার দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে তিনি তাকালেন গাছতলার দিকে। অভয়চান্দকে দেখতে পেলেন না। কোথায় গেল? ঠিক সেই মুহূর্তেই গাছতলার ওদিক থেকে যেন বাঁশী বেজে উঠল। বাঁশী নয়, বাঁশীর মত কণ্ঠস্বর। সেই কণ্ঠস্বর। সেই ইরানের সরাইখানায় রাত্রে শুনেছিলেন। সলিমার গান তারপরও শুনেছেন কিন্তু সেদিনের রাত্রের সে মোহ

আজও তাঁর মনে আছে। রাত্রি তখন প্রথম প্রহর পার হয়ে গিয়েছিল, সরাইখানার কোলাহল স্তব্ধ। তিনি সলিমার মনিবাইনের কর্মচারীর সঙ্গে কথা বলছিলেন নিচের ঘরে। উপরতলা থেকে গান ভেসে এসেছিল—মনে হয়েছিল এ বেহেস্তের সংগীত—বেহেস্তে বীন বাজিয়ে কোন হুরী খোদাতায়লার বন্দনাগান গাইছে—

'এয় মেহেরবান খুদা—।'

আজ এ কণ্ঠস্বর আরও উচ্চ আরও তেজী—যেন ছুটে যাচ্ছে আকাশ থেকে আকাশেরও ওপারে—।

'ময় গুলাম, ময় গুলাম, ময় গুলাম, ময় গুলাম তেরা,

ময় গুলাম !'—

মহম্মদ সৈয়দের স্নায়ুতন্ত্রী যেন অবশ হয়ে গেল। তিনি অভিভূতের মত দাঁড়িয়ে রইলেন।

—'তু দেওয়ান মে'হরবান—নাম তেরা সেরা

ময় গুলাম তেরা—।'

মহম্মদ সৈয়দের দৃষ্টি আপনি ওই দিগন্তের দিকে নিবদ্ধ হল। কেন তা বলতে পারেন না।

—এক রোটী এক লেঙ্গৌটী—

ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন সৈয়দ মহম্মদ।

ঠিক এই মুহূর্তে কে তাঁকে ডাকলে—জনাব। খুদাবন্দ।

সামনের একটা ছুটন্ত ঘোড়া এসে থামল। তার খুরের ধুলোয় আচ্ছন্ন হয়ে গেলেন মহম্মদ সৈয়দ। নিশ্বাসের সঙ্গে ধুলো ঢুকে কষ্ট হচ্ছিল তাঁর। সেই কষ্টে তাঁর চেতনা ফিরে এল বা মোহের আচ্ছন্নতা কেটে গেল। তিনি দেখলেন সামনে দাঁড়িয়ে ইব্রাহিম। তার পিছনে দাঁড়িয়ে সহিস রহমৎ।

ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠল সৈয়দ সাহেবের। প্রশ্ন করলেন—কি ইব্রাহিম ? তুমি ফিরে এলে কেন ? আমি তো—

ইব্রাহিম অভিবাদন করে বললেন—বহুত গোলমাল জনাব।

আমাদের ডেরাতে আমরা মাল সবে নামিয়েছি আর কোতোয়ালীর সিপাহী এসে আমাদের ডেরা ঘেরাও করে মাল আটক করেছে। খুদ কোতোয়াল হাজির রয়েছেন। বলছেন ফৌজদার সাবের পরওয়ানা আছে। বিলকুল মাল 'সওদা-ই-খাস' হো যায়েগা।

সওদা-ই-খাস! এ কি জুলুমের কথা! সরকার আপন খুশিমত দাম দিয়ে মাল খাস করে নেবে আর চড়া বাজার দরে বেচে নাফা করবে? কেন? এ তো জুলুম। রাস্তায় ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে 'রাহাদারি' দিয়ে বিলকুল আবওয়াব পেশকশ মিটিয়ে দিয়ে হুকুমনামা নিয়ে বেরিয়েছেন তিনি। তবে কেন এ জুলুম?

ইব্রাহিম বললে—হুজুর, খুদ গিয়ে হাজির না হলে বোধহয় বিলকুল মাল সওদা-ই-খাস হয়ে সন্ধ্যার বাজারেই বিক্রী হয়ে যাবে। এ হুজুর বোরা বানিয়াদের কাম। তারাই ফৌজদারকে ঘুষ দিয়ে করিয়েছে। জলদি করুন হুজুর। নইলে বিলকুল নোকসানি হয়ে যাবে। খরিদা রূপেয়ার আধা দাম মিলবে না।

ওদিকে এখনও সাধুদের ভজন চলছে। তু দেওয়ান মেহেরবান। হয়তো ভোজনের অনেক দেরি। তিনি একটু ভেবে সহিস রহমৎকে বললেন—রহমৎ!

—হুজুর আলি!

—ইয়ে লে বকশিস। বলে থলে বের করে তা থেকে একটা মোহর তার হাতে দিয়ে বললেন—এক কাম তোকে করতে হবে রহমৎ—এইখানে তোকে থাকতে হবে। দেখতে হবে সাধু লোক এখান থেকে কোথায় যায়। আমি থাট্টায় গিয়ে গফুরকেও পাঠিয়ে দেব, খানা দেব তার হাতে। তিনজনে রইলি; একজন এরা এখান থেকে উঠলেই থাট্টা গিয়ে খবর দিবি। একজন ওদের সঙ্গে যাবি। এই নে কিছু খুচরা রূপাইয়া। হাঁ? সমঝা?

—হাঁ হুজুর। বিলকুল সমঝমে আ গিয়া।

মহম্মদ সৈয়দ ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে বসলেন। পথের ধুলো উড়িয়ে ঘোড়া ছুটল। তখনও গান হচ্ছে—

ময় গুলাম—ময় গুলাম—ময় গুলাম—ময় গুলাম
তেরা—ময় গুলাম!

সেই কণ্ঠস্বর—!

মনে হচ্ছে ইরান বা তুরানে বা তুর্কমানিয়াতে সলিমা গাইছে—ময় বাঁদী, ময় বাঁদী, ময় বাঁদী, ময় বাঁদী।

তিন

থাট্টা শহরের বাজার এবং বন্দর সে কালে সব থেকে পুরানো বাজার ও বন্দর। বন্দর হিসেবে থাট্টা এখন ক্রমশঃ অযোগ্য হয়ে আসছে। নদীর মুখে বালি জমেছে। তবে বাজার এখনও জমজমাট। যে কালের কথা হচ্ছে অর্থাৎ ১০৫১।৫২ হিজরীতে হিন্দোস্তানের পশ্চিম উপকূলে আরও অনেক বন্দর গড়ে উঠেছে, জমে উঠেছে। দক্ষিণে কালিকট কোচিন জমাট বন্দর ছিল। এখন ফিরিঙ্গী মুলুকের ফিরিঙ্গীরা—পর্টুগীজ ওলন্দাজ ইংরেজ ফরাসী এরা আজ দুশো বছরের মধ্যে, সিরিয়া মিশর ইরাক ইরানের সওদাগরদের হাত থেকে দরিয়ার মালেকানি কেড়ে নিয়ে গুজরাটের ডিউ থেকে কালিকট কোচিন পর্যন্ত অনেকগুলো বন্দর গড়ে নিয়েছে। কুঠি তৈয়ার করেছে। ডিউ, দমন, গোয়া, বোম্বাই—এ ছাড়া ছোটখাটো অনেক কুঠি তাদের। মুঘল বাদশাহী তদারকে এ সমস্ত সওদাগরির উপর একতিয়ার কায়েম হয় সুরাট থেকে। সুরাটই এখন সব থেকে জমজমাট।

দক্ষিণের তামাম কারবার চলে এই সব বন্দরের বাজার থেকে। গোলকুণ্ডার কুতুবশাহী, বিজাপুরে আদিলশাহী সুলতানদের দরবার, আহমদনগরে নিজামশাহী গিয়ে এখন মুঘল বাদশাহের শাহজাদার

দরবারে কারবার চলে। তাছাড়া তুলার কারবার বড় কারবার। কিন্তু সিন্ধুদেশে সিন্ধু বেলুচিস্তান থেকে মুলতান পাঞ্জাব কাশ্মীর পর্যন্ত কারবারের ছুটো পথ—একটা ইরাক ইরান অঞ্চল থেকে পাহাড় মুল্লুকের ভিতর হয়ে আফগানিস্তানের বোলান আর খাইবারের পাহাড়িয়া পথে পেশবর মুলতান লাহোর এসে পৌঁছয়। আর একটা জলের পথ—সেটা দামাস্কাস থেকে বেইরুট হয়ে ইরাক ইরানের কিনারা ঘেঁষে আসে থাট্টায়—বাগদাদ থেকে জমিনে জমিনে বসরা এসে সেখান থেকে জাহাজ নৌকায় ওই ইরানের কিনারা পাশে পাশে রেখে এসে পৌঁছয় থাট্টায়। থাট্টার সামনে সমুদ্রের মুখে নদী অগভীর—তবুও এরই মধ্যে কোনরকমে কাজ চলে। থাট্টা থেকে এদেশী মাল ওই পথেই যায় ইরান ইরাক, এমন কি মিশর পর্যন্ত। বিদেশী মাল থাট্টা থেকে ছড়ায় পাঞ্জাব দিল্লী পর্যন্ত, আবার এদিকে দক্ষিণে চলে যায় বিজাপুর গোলকুণ্ডা তক। সুতরাং এতগুলো বন্দর হওয়া সত্ত্বেও থাট্টার বাজারের জমজমাটি খুব। তবে খুব পুরানো বাজার বলে খুব সংকীর্ণ. বসতি খুব ঘিঞ্জি। অল্প উঁচু পাথরের বাড়ি সব। দোতলাগুলোও একটা মানুষের কাঁধে আর একটা মানুষ চাপলে অনায়াসে দেখা যায়। নিচে চৌকের বাজার যেটা সেটার মাঝখানে কয়েক কাঠা জমিন ঘিরে একটা গোলাই—তার থেকে চারটে বড় রাস্তা এবং অসংখ্য অপ্রশস্ত রাস্তা বেরিয়ে চলে গেছে। আঁকাবাঁকা গলিপথগুলির আবার অসংখ্য শাখাপ্রশাখা।

চৌকের গোলাই জায়গাটায় ছু'বেলা বাজার বসে—অস্থায়ী বাজার, চারিপাশে পাকা বাড়ির সামনের অংশে ছোট বড় দোকান, নানান ধরনের পণ্যে বোঝাই। তার মধ্যে গোলাইটার চারিপাশে গোলদারী অর্থাৎ খাদ্যদ্রব্যের দোকানই বেশী। আটা গম জোয়ার দাল হরেক মসলা ঘি সৈন্ধব নুন—যার গন্ধ মিশিয়ে একটা উগ্র বিচিত্র গন্ধ পাওয়া যায়। তার মধ্যে হিংয়ের গন্ধটা বেশী উগ্র। গোলাইটা গোটাই পাথর দিয়ে বাঁধানো। সামনে কতকগুলো শুকনো ফলের

দোকান। পেস্তা বাদাম আখরোট খেজুর কিসমিস মনাক্কা, তার সঙ্গে স্থানীয় কাঁচা ফল।

অন্য অন্য পণ্যের দোকানের আলাদা আলাদা পটি আছে— সেগুলো ওই চারিদিকের চারটে প্রশস্ত রাস্তার তু'পাশে চলে গেছে। জহরত পটি, সোনা রূপা পটি, গালিচা জাজিম পটি, কাপড় পটি, রেশম পটি, পশম পটি, হাতিয়ার পটি, বর্তন পটি অর্থাৎ বাসন পটি। এ ছাড়া জানোয়ারের বাজার আলাদা, সেখানে বয়েল, গাই, ঘোড়া, উট, গাধা, খচ্চর বিক্রী হয়। তার সঙ্গে ছাগল, ভেড়া থেকে মুর্গী, কবুতর পর্যন্ত।

থাট্টার প্রাচীন বন্দর পূর্বদিকে সিন্ধুনদের ঘাটের উপর। সিন্ধুনদ দক্ষিণমুখে আরও চলে গিয়ে সমুদ্রের সঙ্গে মিশেছে। একটা শাখা চলে গেছে উত্তর দিকে। একটা আরও পূবে। মূল নদীর মুখে বালি জমে জমে অগভীর হয়ে ওঠাতেই থাট্টার বন্দর মন্দা পড়ে আসছে। তা হলেও এখনও নৌকা ডিঙ্গি মারফত কারবার চলে। আগে এই নদীতে বড় বড় জাহাজ এসে থাট্টার ঘাটে ভিড় করত। এখান থেকে নদীতে লাহোর পৌঁছতে লাগত তু' মাস। ফিরতে মাত্র এক মাস। শহরের এই বন্দরমুখী রাস্তার উপর মস্ত ফটক। ফটক পার হলেই বালির চড়া। চড়ার উপর দেড়শো তুশো বয়েল এবং উটের গাড়ি মোতায়েন থাকে। আর পাঁচ সাতশো বয়েল উট আর খচ্চর। কতক গাড়ি টানে, কতক পিঠে ছালায় মাল বয়ে থাকে। ঘোড়াও থাকে। তাঞ্জাম পালকিও মেলে। তাদের সঙ্গে মানুষ। অসংখ্য মানুষ। মজতুর, কামিন, ভিক্ষুক, কানা-খোঁড়া, বুড়ো আর বালবাচ্চার দল। এই বালির চড়াতে দিনে তো গিজগিজ করেই, রাত্রেও এখানে পড়ে থাকে অনেকে। আর থাকে অসংখ্য নৌকায় মাল্লা মাঝির দল। খাঁড়ির কিনারাতেই এদের ঝোপড়ি। এখানেই বালবাচ্চা ঔরৎ নিয়ে বাস করে।

বড় বড় সওদাগরী নৌকা জাহাজ কিস্তি খাঁড়িটা মজে আসার

দরুন দূরে নোঙর করে দাঁড়িয়ে থাকে। মাল খালাসী আর মাল লাদাইয়ের কামকারবার চলে এই সব নৌকা মারফত। কিনারা থেকে খালাস হয়ে চলে শহরের ভিতর।

রাত্রি তখন প্রহর পার হয়েছে। বালুচড়ার উপর বন্দরঘাটের শোরগোল ঠাণ্ডা হয়ে আসছে, মানুষের ভিড় পাতলা পড়ছে; ওদিকে শহরে বাজার তখন গসগস করছে, একেবারে বলতে গেলে চরমে উঠেছে। এরপর ঘাড়িখানেকের মধ্যেই ঝপ করে একসময় দেখা যাবে সব ঠাণ্ডা পড়ে আছে।

মালের সওদা চলছে। গুদামবন্দী হচ্ছে। গাড়িতে লাদাই হচ্ছে। জানবারের পিঠে ছালাবন্দী হচ্ছে। তবে সোনা রূপা হীরা জহরতের কারবার আগেই বন্ধ হয়েছে। এ মুল্লুক বেপরোয়া বাগীর মুল্লুক; এখানে আশেপাশে হামলা ডাকাইতি বারো মাস লেগেই আছে। ডেরা ইসমাইল খানের দল আছে, 'মানকেরা'তে খামেরা আছে, 'নোহানিরা' আছে: থাট্টার সব থেকে কাছে পশ্চিমে কির্থার আর লাথি পাহাড়ের নাহমার্দি এবং পুকিয়া আফগানরা আছে। নাহমার্দিদের হারুন খাঁ, পুকিয়াদের মুরীদ খাঁয়ের দল দুর্ধর্ষ দল। বাদশাহী শাসন তারা মানে না। পূর্বে রাজপুতানার ভীল রাজপুত আছে, জাঠ গুজরেরা আছে। কখন যে কারা এসে শহরে ঢুকে হল্লা তুলে মারকাট করে লুঠতরাজ করে যাবে তার ঠিকানা নেই। জাঠ এবং গুজরেরা সিন্ধুর মত তুফানী দরিয়ার বাধায় চট করে এপারে আসে না কিন্তু নাহমার্দি আর পুকিয়া খানেদের ভয়ে সর্বদাই সশঙ্কিত থাকতে হয়। এই সব কারণের জন্যে এক প্রহরের ঘড়ি বাজলেই শহরের চারিদিকের ফটক বন্ধ হয়ে যায়। বাদাকশানি সিপাহীর পাহারা পড়ে।

চৌকের গোলাইটা থেকে যে সব গলি বেরিয়েছে সেই গলির উপর মহম্মদ সৈয়দের একটা আস্তানা আছে। দোতলা পাথরের বাড়ি।

ভিতরে প্রশস্ত উঠান, সেখানে উট বয়েলগুলো থাকে, গাড়িগুলো থাকে একপাশে।

বাড়ির ভিতর থেকে ব্যস্তসমস্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন এক ফকীর। পরনে কালো আলখাল্লা, মাথায় কালো কাপড়ের পাগড়ি। গলায় কতকগুলো মালা। কাঁধে একটা ঝোলা। হাতে লাঠি। বেরিয়ে এসে পথে নেমে ফকীর বললেন—আল্লাতয়লা মঙ্গল করবেন। ডর করো না। সব ঠিক আছে। দরওয়াজা বন্ধ করো। দরিয়ার কিনারে সব তৈয়ার আছে তো?

—হাঁ জনাবআলি।

—বস। বন্ধ করো দরওয়াজা। আর কোন ঝামেলা হবে না। সব ঠিক করে দিয়েছি আমি।

বলে গলি থেকে বেরিয়ে এসে গোলাইয়ের মধ্যে বাজারের জনারণ্যের মধ্যে মিশে গেলেন। লোকের ভিড়ের মধ্য দিয়ে গোলাই পার হয়ে ধরলে সিন্ধু দরিয়ার বন্দরঘাটের পথ। হনহন করে চলতে লাগলেন। কখন প্রহর রাতের ঘড়ি বাজবে আর সঙ্গে সঙ্গে ফটক বন্ধ হবে।

এই পথটার মাঝামাঝি এসে ফকীর থমকে দাঁড়ালেন। পথটার এইখান থেকে ফটকের মুখ পর্যন্ত মূল রাস্তাটার তু' পাশের গলির মধ্যে বাঈপাড়া। কসবী মহল্লা। জাহাজী লস্করেরা থাট্টায় নেমে ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত শহরে ঢুকে নারী সন্ধানে গোলমাল হৈচৈ করে। সেই কারণে কসবীরা নিজেদের ব্যবসার তাগিদেই শহরে ঢুকবার মুখেই ভিড় করেছে। নানান জাতের মেয়েকে ধরে আনে একদল মানুষ, তারা ঠিক গোলাম বাঁদীর কারবারী নয়, গোপনে বিক্রী করে দিয়ে যায় এই অঞ্চলের বাড়ির মালিক যারা তাদের কাছে। বাড়ির মালিকেরা অনেকেই গৃহস্থ এবং বিশিষ্ট লোক। ধনী ব্যবসায়ী আছে, হিন্দু মুসলমান। হিন্দুদের মধ্যে অনেকে ফোঁটা তিলককাটা ব্রাহ্মণ পর্যন্ত আছে। তাদের লোকেরা বাড়ির

দরজায় মৌজুদ থাকে। খদ্দের ধরবার জন্য দালাল আছে। তারা রাস্তায় হাত ধরে টানাটানি করে।

তাতারী, ইরানী কসবী, ইরাকী লেড়কী, বেলুচ, কাশ্মীরী, রাজপুত, ব্রাহ্মণ, এমন কি হাবসী কাফ্রি—কি চাই—ফরমায়েশ করুন। আসুন। এই তাদের বুলি। তার সঙ্গে দারুর নাম বলে যায়। হরেক রকমের দারু। এমন কি ফিরিঙ্গীস্তানের কড়া দারু তাও পাওয়া যায়।

কোতোয়ালীর সিপাহী মধ্যে মধ্যে ঘোরে। কিছু কিছু আদায় করে নিয়ে যায়। কোতোয়ালের তো মাহিনাদারী বন্দোবস্ত। তার ভাগ ফৌজদার পর্যন্ত নিয়ে থাকেন।

প্রায় রাত্রেই দুটো একটা খুনখারাবি হয়। সে সব বিলকুল চাপা পড়ে যায় ফৌজদার কোতোয়ালের মেহেরবানিতে।

রাত্রে এ মহল্লা সাক্ষাৎ নরক। ফকীর আপন মনেই মৃদুস্বরে বললেন—ইয়ে দোজখ্ হ্যায়!

থমকে দাঁড়ালেন ফকীর। এতটা রাত্রি করে ভারী অন্যায় করেছেন তিনি। দিন থাকতে তাঁর বেরিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। দিনের আলো থাকতে মহল্লাটার চেহারা এমন বীভৎস হয় না।

গিসগিস করছে লোক। অধিকাংই বিদেশী লস্কর, এবং দারু পান করে কাণ্ডজ্ঞানহীন। মদের গন্ধে যেন বমি আসে। এর মধ্য দিয়ে যেতে হবে। কিন্তু না গিয়েও উপায় নেই—যেতেই হবে।

কম সে কম পঞ্চাশ হাজার তঙ্কার কারবার—নিজের বিশ হাজার তঙ্কা খরচা হয়ে গেছে।

হঠাৎ একটা হাসির হুল্লোড় উঠল। ফকীর দেখলেন সামনেই একটা কসবী বাড়ির তলায় জন চারেক লস্কর মুখে লাল রঙ মেখে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে উপরের দিকে তাকাচ্ছে। রাস্তার লোকে হাততালি দিয়ে হাসছে। উপরে দোতলার ঝরোকায় ক'জন কসবী খিলখিল করে হেসে ভেঙে পড়ছে। তাদের ঝরোকার মাথা থেকে লোহার

শিকলে ঝোলানো বড় বড় দুটো কুপিতে চারটে মুখে চারটে পলতের আলো জ্বলছে। ওদের বেশ দেখা যাচ্ছে। লস্করগুলির ক্রুদ্ধ ভঙ্গির উত্তরে মেয়েগুলো মুখভঙ্গি করে ইশারায় জানাচ্ছে তারা থুথু ফেলবে। ফকীর বুঝলেন মেয়েগুলো পানের পিচ ফেলে দিয়েছে লস্করগুলোর মাথায় মুখে।

ফকীর সাবধান হয়ে পথের মাঝখান ধরলেন। মনে মনে আল্লার নাম করতে করতে এসে দাঁড়ালেন ফটকের সামনে।

সিপাহীরা ফটক বন্ধের আয়োজন করছে—শহরের কোতোয়ালীর ঘণ্টা পড়বার অপেক্ষা। এ সময়ে বাইরে যাবার লোক নেই, ভিড় করে লোকেরা ভিতরেই ঢুকছে। সিপাহী ফকীরকে বাইরে যেতে দেখে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলে—আপনি বাইরে যাবেন হজরত, এই রাত্রে?

ফকীর হেসে বললেন—হাঁ জী। সমুন্দরে জোয়ার এলে খড়কুটো কাঠ এসব সেই ঠেলায় ভিতরের দিকে চলে—কিন্তু যে সাঁতার জানে সিপাহীজী সে সেই তুফান ঠেলেই সমুন্দরের দিকে যায়। আমি ফকীর—দুনিয়াদারির তুফান ঠেলে চলাই আমার কাম।

বলে তিনি বেরিয়ে গেলেন। সিপাহীটা কথাগুলি শুনে সম্ভ্রম করে সালামত জানালে।

সামনে বিস্তীর্ণ বালুচর। আকাশে চাঁদ রয়েছে। চাঁদনী আলোয় বালুচরের উপর মানুষ জন উট বয়েল ঘোড়া খচ্চর যেগুলো রাত্রেও এখানে পড়ে থাকবে সেগুলোকে মোটামুটি দেখা যাচ্ছে। দূরে সমুদ্রের মুখ বরাবর জাহাজের মাস্তুলগুলো সমুদ্র এবং আকাশের গায়ে লম্বা কালো দাগের মত দেখাচ্ছে। বালুচরের উপর ঝোপড়িগুলোর মধ্যে কুপি জ্বলছে—চুলার আগুন দেখা যাচ্ছে। তক্তা দিয়ে তৈরী করা কয়েকটা কাফিখানায় ভিড় জমেছে।

ফকীর চারিদিক দেখে এগিয়ে গেলেন দরিয়ার নিচের দিকে, কিনারা বরাবর যে দিকে জেলে ডিঙ্গি ছোট নৌকাগুলো কাছি দিয়ে

খোঁটার সঙ্গে বাঁধা অবস্থায় ভাসছে। একটা জায়গায় এসে তিনি থমকে দাঁড়ালেন! এদিকটা নির্জন হয়ে পড়েছে। ভিড় যা কিছু তা সবই ফটকটা থেকে বেরিয়ে একটা নির্দিষ্ট এলাকায়।

কিছুক্ষণ পরই একটা নৌকা থেকে একটা লোক নেমে জল ভেঙে পাড়ে উঠে দাঁড়াল। ফকীর তাঁর একখানা হাত আকাশের দিকে তুলে সম্ভবতঃ ইশারা দিলেন। এবার লোকটা হনহন করে এসে তাঁর কাছে দাঁড়াল। এবং তসলীম জানালে। ফকীর বললেন—গাউস খাঁ! পেয়েছ?

—হাঁ হুজুর আলি—সব তৈয়ার।

—বহুৎ আচ্ছা—চল।

ফকীর নয়, ফকীরের বেশ ধরেছেন মহম্মদ সৈয়দ। যাবেন খাঁড়ি থেকে বেরিয়ে সমুদ্রে পড়ে কিনারার কাছ ধরে কলাচীর দিকে। কলাচীর কাছাকাছি একটা জায়গায় একখানা বড় কিস্তি এসে ভিড়েছে। সেই কিস্তিতে অন্য খালের সঙ্গে একজন চেনা ইরানী এসেছেন তাঁর বরাতি পঁচিশটা দুর্লভ মুক্তা নিয়ে। সেখানে আজ রাত্রে তারা তাঁর জন্য অপেক্ষা করবে. এখান থেকে রওনা হওয়ার কথা ছিল বিকেলে। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। অকস্মাৎ পথে ওই বিচিত্র ছেলেটিকে দেখে মনে পড়েছিল সলিমাকে। তিনি তার পরিচয় নিতে সেখানে থেকে গিয়েছিলেন। পরিচয় মোটামুটি পেয়েছেন কিন্তু পুরো পান নি, তার আগেই ইব্রাহিম গিয়ে খবর দিয়েছিল ফৌজদারের হুকুমে তাঁর মাল কোতোয়াল আটক করেছে—বলেছে সওদা-ই-খাস হবে। তিনি রহমতকে সাধুদের কাছে রেখে থাট্টায় এসে সওদা-ই-খাসের ঝঞ্ঝাট মেটাতে গিয়েছিলেন ফৌজদারের কাছে। এসব ঝঞ্ঝাট মেটানোর পথ একটি—সে ঘুষের পথ, এ সকলে জানে। এর পথে দাঁড়ায় যে ঘুষ দেবে তার সংগতির অভাব। এমন দাবি করে বসে যে তা মিটিয়ে দিয়ে ফিরতে হয় লোকসানের বোঝা মাথায় নিয়ে। ফৌজদারকে দিয়ে

তাঁর দরবার থেকে দরজার পর দরজা পার হয়ে হয়ে রাস্তায় এসে দেউলিয়া হয়ে যেতে হয়। তখন সে মাল তখুনি তখুনি কাউকে বেচে না দিলে এমন অবস্থা দাঁড়ায় যে থাট্টা থেকে ফেরার মত রাহা খরচা জোটে না।

মাস তিনেক আগে একটা গালিচার চালান এনেছিলেন মহম্মদ সৈয়দ; দুর্লভ ইরানী গালিচা; গুলাবের পাপড়ির মত নরম আর তেমনি চিকনাই; তার উপর নাঙ্গা গায়ে শুলেও একটি সুঁড় ফোটে না। পা দিলে পায়ের পাতাখানা অর্ধেক তার মধ্যে ডুবে যায়। এনেছিলেন তিনি উমরকোঠের আমীর, যোধপুরের মহারানা এবং মুলতানের নবাবের জন্য। সব থেকে সেরা গালিচাখানা নিয়ে যাবার ইচ্ছা ছিল গুজরাটের সুবাদার নবাব আজম খানের দরবারে। আজম খান দুর্ধর্ষ নবাব, এমন গুজরাট যে গুজরাট—যেখানে রাহাজানি ডাকাইতি লুটতরাজ এই সিন্ধু অঞ্চলকেও হার মানাতে চলেছিল সেখানে তিনি এসে বদমাশ লুঠেরা ডাকাইত বদমাশদের শায়েস্তা করে এনেছেন। গুজরাটে আমেদাবাদে এখন ব্যবসা ক্রমশঃ জমে উঠছে। মনে ইচ্ছা ছিল সৈয়দ সাহেবের যে হায়দ্রাবাদ মুলতান অঞ্চল ছেড়ে তিনি আমেদাবাদে আসবেন এবং ব্যবসা ফাঁদবেন। দক্ষিণে যেতে তাঁর সুবিধে হবে। সেবার ফৌজদার সাহেব মাসুল আদায়ের সময় মালপত্র দেখে মাসুলের উপর দাবি করেছিলেন ওই সেরা গালিচাখানা। এ নিয়ে ঝগড়াঝাঁটি হয়েছিল অনেক। শেষ পর্যন্ত সৈয়দ সাহেবেরই হয়েছিল জিত। থাট্টায় এই সময়েই এসে হাজির হয়েছিলেন বাদশাহী দরবারের আমীর ইয়াদগর বেগ। কান্দাহার নিয়ে ইরান এবং হিন্দোস্তানের দরবারের মধ্যে যে কাড়াকাড়ি চলে আসছে আজ চার পাঁচ পুরুষ ধরে সেই কাড়াকাড়ির পালায় এবার হিন্দুস্তানের জিত হয়েছে; কান্দাহারের মনসবদার আলিমর্দান খাঁ ইরানের শাহকে ছেড়ে সাজাহান বাদশাহের আনুগত্য স্বীকার করেছে। বাদশাহ সাজাহান তখন দিল্লী থেকে নানান পথে ফৌজ

পাঠাচ্ছেন—বড় বড় সেনাপতিদের পাঠাচ্ছেন। যাত্রার পথে এসেছিলেন ইয়াদগর বেগ সাহেব।

ইয়াদগর বেগের সঙ্গে সৈয়দ মহম্মদের পরিচয় ছিল। সেই জোরে সৈয়দ সাহেব তাঁর মাল খালাস করে নিয়ে চলে গিয়েছিলেন। এবার তারই শোধ তুলতে ফৌজদার কোতোয়ালকে হুকুম দিয়েছিলেন—সৈয়দ মহম্মদ ইরানী সওদাগরের মাল আসুক বা বাইরে যাক আটক কর। সওদা-ই-খাস করে নাও।

সেই নিয়ে এই হাঙ্গামা। সৈয়দ মহম্মদ পথে পথেই এসে গিয়েছিলেন ফৌজদারের দফতরে, সেখানে না পেয়ে একেবারে ফৌজদারের হাবেলীতে এসে এত্তালা পাঠিয়ে কোমরের পেটি খুলে দু হাজার রূপাইয়া দামের একটা নীলা সামনে ধরে বলেছিলেন—এ নীলা সেই সময় থেকে আপনার জন্যে মৌজুদ করে রেখেছি। এ নীলা আংটিতে বসিয়ে পরবেন। দেখবেন ছ মাহিনার মধ্যে আপনি বাদশাহের নজরে পড়ে যাবেন।

ফৌজদার প্যাঁচানো লোক, বলেছিলেন—এ আংটি পরে বসব কিসে সৈয়দ সাহেব? কিন্তু নীলাটি হাতে তুলে নিয়ে লুব্ধ সপ্রশংস দৃষ্টিতে না দেখে থাকতে পারেন নি।

সৈয়দ মহম্মদ বাক্যে সুনিপুণ। তিনি ফারসী ভাষায় পণ্ডিতই শুধু নন—কবি। তিনি বলেছিলেন—জনাব, দুনিয়াতে তাজ যিনি পরান তিনি মসনদের ব্যবস্থা করেই পরান। খানা যিনি দেন বর্তন তিনি আগেই ঠিক করে তবে খানা সাজান। আপনাকে আংটি যে পরাচ্ছে সেই বসবার গালিচা মায় তাকিয়া ব্যবস্থা করবে।

—ইয়াদ থাকবে তো?

—জনাবআলি, সৈয়দ মহম্মদ বচপন থেকে হতে চেয়েছিল খোদার বান্দা ফকীর নয়তো উলীমা। নসীবের ফের সে হয়েছে সওদাগর—বানিয়া। ঝুট বাত তাকে বলতে হয়; কিন্তু দুখ তার তাতে অনেক। এতটা পথ চলে এসেছি যে আর ফিরতেও সাহস হয় না,

যেন তাগদ বিলকুল হারিয়ে গেছে। কিন্তু বাত দিয়ে সে বাতের খেলাপ যে করবে এমন 'কমিনা' সে নয়। সে চীজ নেই। তবে খারাব চীজ সৈয়দ দেয় না। তার দোষই হল নজর তার মাটিতে থাকে না, সে আসমানের রংয়েই মশগুল। ওই দোষেই ছনিয়াদারিতে তার কিছু হল না।

ফৌজদার কথাগুলি শুনে খুশী হয়ে কেরামৎ করে উঠেছিলেন, ওয়া-ওয়া-ওয়া। ঠিক আছে সৈয়দ সাহেব ঠিক আছে, আমি এখুনই হুকুম দিয়ে দিচ্ছি। বিলকুল খালাস করে দেবে আপনার মাল।

সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়েছিলেন সৈয়দ মহম্মদ। থাকবার ইচ্ছেও তাঁর ছিল না। সময়ও না। যেতে হবে সেই কলাচীর ধারে। ওদিকে তখন আকাশ লাল হয়ে উঠেছে পশ্চিম দিকে। সূর্য পশ্চিম দিকে সমুদ্রের বুকে ডুবে যাচ্ছে। নামাজের ওয়াক্ত হয়ে গেছে।

লা ইলাহি ইলাল্লা! করুণাময় ঈশ্বর—হে মহিমময় খোদা! তোমাকে ডাকবার, তোমার মহিমা কীর্তনের সময় চলে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি ফৌজদারের হাবেলী থেকে ফিরে মোকামে এসে 'ওজু' করে নিয়ে জাজিম বিছিয়ে নিয়ে নামাজে বসেছিলেন। মনে আপসোস হয়েছিল এখানকার বড় মসজিদে যাবার সময় হল না। 'ওয়াক্ত' অর্থাৎ সময় চলে যাবে। নামাজ সেরে উঠে এখানকার কর্মচারী গাউস খাঁকে এবং দালাল বিঠ্‌ঠলদাসকে ডেকে বললেন—খুব বিশ্বাসী মাল্লা আর খুব পোক্ত নৌকো এখুনি গিয়ে ঠিক করে এস। ঘোড়ায় বা উটে এই রাত্রে কলাচী যাওয়া ঠিক হবে না। আর আমার সঙ্গে যাবার জন্যে আদমী চাই। জবরদস্ত জঙ্গী জোয়ান। মোকামের পাহারাদার মামুদকে আমার কাছে ডাক।

তারা চলে গেল। মামুদ তারপরই এসে সেলাম করে তসলীম জানিয়ে সসম্ভ্রমে দাঁড়াল।

সৈয়দ বললেন—মামুদ, আজ একটা শক্ত কাজে আমাকে যেতে হবে। রাত্রে নৌকা করে যাব কলাচীর কাছে। কাজ সেরে আবার

সঙ্গে সঙ্গেই ফিরব। হাতিয়ারবন্ধ হয়ে তো যাবেই। তার উপর দো পিস্তৌল নাও। আমার সঙ্গেও পিস্তৌল আছে। ফিরিঙ্গীদের পিস্তৌল। বুঝেছ ?

সেলাম করে মামুদ বললে—হাঁ জনাবআলি।

—তোমার জান লুকসান হলে তোমার বালবাচ্চার তামাম ভার আমার। তোমার সঙ্গে যদি আমার জানও যায় তবে আমার গদি থেকে তোমার বালবাচ্চাকে এক হাজার আশরফি দেবে—তার বন্দোবস্ত আমি করে যাব।

—হুজুরআলি মেহেরবান। আমি তৈয়ার হয়ে নিচ্ছি। তবে আমার জান থাকতে আপনার কিছু হবে না, এ আমার কসম রইল।

সে চলে গেল।

এরপর সৈয়দ অনুভব করলেন তিনি ক্লান্ত। সারাটা দিনই আজ ঘোড়ার উপর আর পথে ধুপের মধ্যে কেটেছে। শরীর থকে গেছে। তাঁর পোশাকের ভিতর দেহটা যেন কেমন অস্বস্তি বোধ করছে। চাকরকে ডেকে তিনি গোসলখানায় জল দিতে বললেন, বললেন—কুঁইয়া থেকে উঠিয়ে তাজা টাটকা পানি দেনা। আর বললেন—বাবুর্চিকে কহনা কি খানা তৈয়ার রাখনা। হাঁ! আমি গোসল করেই খেয়ে নেব।

সে চলে গেলে তিনি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছিলেন। তাঁর আজকের এই যাত্রায় মন কিছুতেই যেন স্ফূর্তি পাচ্ছে না। না। মন তাঁর টানছে পিছনের দিকে। এখান থেকে কোশভর পিছনে সেই গাছতলাটায়।

সেই আশ্চর্য নজর-পিয়ারা সেই বাচ্চাকে মনে পড়ছে। সেই সুন্দর মুখ—সেই উদাসী দৃষ্টি!

অবিকল সলিমা। সলিমার ভাই তাতে কোন সন্দেহ নেই। মনে পড়ছে তার গান

'ময় গুলাম, ময় গুলাম, ময় গুলাম ময় গুলাম তেরা
তু দেওয়ান মেহেরবান—নাম তেরা সেরা—'

চোখে জল এসে গিয়েছিল তাঁর। মনে মনে গুঞ্জন উঠেছিল—লা ইলাহি ইলাল্লা মহম্মদে রসুলাল্লা।

চাকর এসে সামনে দাঁড়িয়েছিল তাঁর। তাঁর এই ভাবান্তর দেখে সে কথা বলতে সাহস করে নি। কিন্তু তাঁর হুঁশ হয়েছিল। হুঁশ না হয়ে উপায় কি? বিশ হাজার রূপাইয়া তিনি লগ্নী করেছেন আজ পুরা এক বছর ধরে। দফায় দফায়। রূপাইয়া দৌলত নিয়ে কারবার—বিচিত্র কারবার। এ নিয়ে কারবার যারা করে তারা তুনিয়ায় জমিন কেনে হীরা জহরত কেনে বান্দা কেনে বাঁদী কেনে আরাম কেনে—কিন্তু নিজে সে বিকিয়ে যায় দৌলতের কাছে—হয়তো বা শয়তানের কাছে।

হজরৎ রসুলাল্লা মহম্মদ সারা মুসলমানের পয়গম্বর মালিক হয়েছিলেন—মক্কা মদিনা সারা ইরাকের মালিক হয়েও নিজের জামা সেলাই করেছেন টুপি সেলাই করেছেন।

তাঁর অনুসরণ করেই জীবন কাটাবার একসময় তাঁর অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু—এ কি করতে কি হয়ে গেল!

তাঁকে টানছে পঁচিশটা তুর্লভ পারস্য সাগরের মুক্তা। সৈয়দ মহম্মদ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উঠলেন—চলো।

গোসল সেরে খানা খেয়ে নিয়ে তিনি উঠে দেখলেন বিঠ্ঠলদাস ফিরেছে। গাউস ফেরে নি।

বিঠ্ঠলদাস বললে—নৌকা সে ঠিক করে এসেছে। গাউস খাঁ সেখানে আছে। হুজুরআলি ফকীরের পোশাক পরে গিয়ে যেখানে ডিঙ্গিগুলো খাঁড়ির কিনারায় বাঁধা আছে সেখানের কাছাকাছি দাঁড়ালেই গাউস খাঁ এসে তাঁকে নৌকায় নিয়ে যাবে। ঠিক প্রহরের ঘড়ির পরই তারা তৈয়ার থাকবে। মামুদ যদি হুজুরের সঙ্গে যায় তবে এখুনি সে রওনা হয়ে যাক। কেন না মামুদকে নিয়ে ফটক বন্ধ হবার সময় শহরের বাইরে গেলে পাহারাদাররা সন্দেহ করবে। থাট্টায় মামুদকে তলোয়ারবাজ বলে সকলেই প্রায়

চেনে। আরও একজন জঙ্গী লোক সেখানে ঠিক করা হয়েছে, সেও যাবে।

মামুদ তখনই চলে এসেছে। এখন সৈয়দ সাহেব ফকীর সেজে ঠিক প্রহরের ঘড়ি বাজবার মুখেই ফটক পার হয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন খাঁড়ির কিনারায় ডিঙ্গির সারির সামনে। গাউস খাঁ এসে তাঁকে সালামত জানিয়ে বললে—সব তৈয়ার হুজুর।

* * *

নৌকার মাঝি তিনজন। সৈয়দ সাহেব তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে তাদের দেখে নিতে চাইলেন। মুখ মানুষের মনের আরশি। ওইখানে তার প্রতিবিম্ব অহরহ ভাসছে। কখন কার কি মনে হচ্ছে তার মুখের দিকে নজর রেখো—ঠিক বুঝতে পারবে। আবার মানুষটার মন যে কেমন তাও বুঝে নিতে পারবে তার মুখ দেখে।

অভয়চান্দকে মনে পড়ল। তার মুখ দেখে যে কেউ এক লহমায় বুঝতে পারবে এ দেওয়ানা। এর মন পিয়ারের ভাবনায় মশগুল, কখনও হাসে কখনও কাঁদে। সে পিয়ারাকে সে দেখতে পাচ্ছে। তার সঙ্গেই কথা হচ্ছে তার।

মামুদের মুখের দিকে চাইলেই বুঝতে পারবে তার শক্ত চোয়াল দুটোয় একটা দুর্দান্ত শক্তিকে চেপে রেখে দিয়েছে। চোখের দিকে দেখলে মনে হবে লম্বা সরু চোখ দুটোয় আশ্চর্য সাহস ঝিকমিক করছে—যেমন শানানো ছুরিতে একটা ঝিকিমিকি খেলে যায়।

মাল্লা তিনজনের মুখের দিকে তাকিয়ে সৈয়দ সাহেব বিস্মিত হলেন। প্রথমেই মনে হল তারা এ মুলুকের আদমী নয়। এরা সিন্ধী বা বেলুচ বা ইরানী তুরানীর কেউ নয়। মনে হল তবে কি গুজরাটী? না—তাও ঠিক মনে হচ্ছে না। কোচিন অঞ্চলের লোক? মধ্যে মধ্যে কোচিন অঞ্চল থেকে সওদাগরেরা নৌকায় সওদা নিয়ে আসে, তাদের চেহারার সঙ্গে মিল আছে। অথবা

পূব তরফে তেলেঙ্গানার তেলেঙ্গী হতে পারে। বিঃ

না—বিহারীদের কাঠামো আরও ভারী।

মাঝিদের মধ্যে যে হাল ধরে বসেছিল তা দিকে তাকালেন, হ্যাঁ, এদেশের লোকদের মত লম্বা নয়, মাথায় খাটো; কিন্তু বুকের পাটাখানা আর হাত দুখানায় অনেক তাগদ ধরে এ দেখলেই বোঝা যায়। রং কালচে, মুখখানায় একটা মাধুর্য আছে কিন্তু চোয়াল দুটো শক্ত। চোখ দুটো এদেশের মত টানা লম্বা নয়—বড় চমৎকার ঢলঢলে।

লোকটিই বললে—জনাবআলি, তাঁবেদার বান্দার কসুর মাফ হয়—একটু তকলিফ্ করতে হবে। তাহলে আর ঝঞ্ঝাট ঝামেলা কি কিছু ডর্ থাকবে না।

লোকটির মুখের উর্দু চমৎকার শুদ্ধ কিন্তু উচ্চারণে কেমন একটা টান রয়েছে।

লোকটি বললে—ফকীরের পোশাক খুলে যদি মছুয়ার মত এই আমার মত মাথায় একটা সাদা কাপড়ের পাগড়ি পরে নেন আর গায়ে একটা চাদর জড়িয়ে নেন তবে সবাই ভাববে মছুয়ার নৌকা মাছ ধরতে চলেছে। স্রিফ এই খাঁড়িটা। খাঁড়ির মধ্যে অনেক নৌকায় বাদশাহী সিপাহী লুকিয়ে থাকে। দু চারখানা বোম্বেটে ডাকুরও ডিঙ্গি থাকে। মছুয়াদের ডিঙ্গির ওপর খুব নজর রাখে। মছুয়া ডিঙ্গিতে অনেকে এই ছিপাছিপির কারবার করে তো।

ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন মহম্মদ সৈয়দ—এই বেওকুফ বেতরিবৎ বেতমিজ মাল্লাটা বলে কি? লোকটার কথাবার্তা বাতচিজের ঢঙ খারাপ নয়, বরং মাল্লাদের কথাবার্তা থেকে ভাল—আলাদা। কিন্তু সে কি জানে না যে—

লোকটা বললে—জলদি করতে মরজি হোক জনাবআলির। কেন না কোথায় যে কার নজর দূরবীনের মত আমাদের দিকেই চেয়ে আছে তার ঠিকানা নেই।

সৈয়দ সাহেব এবার ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে উঠলেন—কি রকম বেতরিবৎ আদমী এটা মামুদ? এই উল্লু তুই কি জানিস নে যে শির নাঙ্গা করলে গুনা হয়—শরীর নাঙ্গা করায় মানা আছে? নেহি। আমি এই পোশাকেই যাব। তাতে যা আপদ মুসিবৎ হয় হবে। তোর জানের ডর থাকে তো বল আমি যাব না। উতার যাউঙ্গা।

মামুদ বললে—কুছ ডর নেহি না সুলেমান। আমাদের সঙ্গে পিস্তৌল আছে তিনটে। তোকে সড়কি তীর ধনুক নিতে বলেছিলাম, নিয়েছিস তো?

লোকটা সত্যিই বে-তমিজ আদমী—শুধু বেতমিজ বেতরিবৎ নয়, বেয়াদব বে-পরওয়াও তার সঙ্গে। সে সৈয়দ সাহেবের কথায় ভয় খেলে বলে মনে হল না। বললে—মামুদ বেরাদর, তুমি জঙ্গী আদমী. সাহেব হয়তো নন—তুমি তো জান, দরিয়ার বুকে ওদের বড় নৌকো যখন হুড়মুড় করে এসে পড়বে তখন পিস্তৌল তীর ধনুক কোন কামে আসবে না। নৌকো উলটে যাবে। দরিয়ার তুফানে হাবুডুবু খেতে হবে।

সৈয়দ সাহেবের আর সহ্য হল না, তিনি বলে উঠলেন—চুপ রহো বান্দর কাঁহাকা! আর এক বাত বলবি তো তোর জান নিয়ে নেব আমি পিস্তৌলের গুলিতে।

উদ্ধত লোকটা মুহূর্তে যা করলে তা ভাবতে পারেন নি সৈয়দ সাহেব। সে ঝপ করে নৌকো থেকে লাফিয়ে পড়ল খাঁড়ির জলে। লাফিয়ে পড়বার সময় বললে—তোমরা যাও মামুদ বেরাদর—আমি যাব না। নৌকো ওরা তুজনেই নিয়ে যেতে পারবে।

সৈয়দ বললেন—কি—তোরা তু আদমীতে নিয়ে যেতে পারবি?

ততক্ষণে লোকটা প্রায় কিনারায় উঠে গেছে। সেখানে দাঁড়িয়ে হেঁকে বললে—সুলেমান কারু গালিগালাজ খায় না মামুদ। সে আপনার মায়ের পেটের ভাইদের জান নিয়েছে।

সৈয়দ বললেন—পাকড়ো উসকো। মামুদ!

মামুদ সবিনয়ে অভিবাদন করে বললে—এখন হল্লা হয়ে যাবে । এই যাওয়ার মুখে— ।

কুণ্ঠিতভাবে সে তাকালে মনিবের দিকে।

সৈয়দ বুঝলেন এবং একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। মনে মনেই আপসোস করলেন এই ভাবে মাসুল ফাঁকি দেবার জন্যে তিনি আজ চোরের মত চলেছেন। অথচ—। অথচ জীবন যখন আরম্ভ করেন তখন কি প্রতিজ্ঞা তিনি করেছিলেন। বানিয়ার কাম করতে নেমে তিনি শেষ চোর হয়ে গেলেন। চোরের মতই আজ ছোটা আদমীর কথা তাঁকে সহ্য করতে হল। নসীব!

ওদিক থেকে আর একজন মাঝি এসে হালে বসল। নৌকাটা দুলছিল এতক্ষণ, লোকটা হালে বসতেই সেটা স্থির হয়ে চলতে আরম্ভ করলে।

সৈয়দ জিজ্ঞাসা করলেন—ও চলে গেল, দু আদমীতে চলবে ডিঙ্গি ?

একজন মাল্লা বললে—হাঁ হুজুর—ও তো আমাদের মাল্লা নয়। ও এই সব কামে যখন যাই আমরা তখন পাহারাদারীও করে আবার হালও ধরে।

মামুদ বললে—ও গুণ্ডা আদমী জনাব। হিম্মৎ ওর জবর। আর তীর ধনুক সড়কিতে বহুৎ মজবুদ আদমী। থাট্টাতে সুলেমানের নাম খুব।

নৌকা চলছিল, সৈয়দ ভাবছিলেন ওই বেয়াদব বদমাশ লোকটার কথা। একদম বে-পরোয়া, ডাকু বোম্বেটের জাত। বললে মায়ের পেটের ভাইদের খুন করেছে।

হঠাৎ প্রশ্ন করলেন—ও বললে ভাইদের খুন করেছে। কেন? নবাব বাদশাহদের মধ্যে লড়াই হয় বাদশাহী নবাবীর জন্যে, সে বুঝি। হাঁ, আর হয় ঔরতের জন্যে। ঔরতের জন্যে খুন করেছে?

মামুদ বললে—আমি ঠিক জানি না জনাবআলি। ওর সঙ্গে

আমার জানপহচান হয়েছে গেল বারের মহরমের খেলার সময়। ওর খেলার জৌস দেখে ওর সঙ্গে আমি তলোয়ারের পেঁচ খেলেছিলাম। কিন্তু হারাতে পারি নি, ও-ও আমাকে হারাতে পারে নি। তখন থেকে দোস্তি। এরা বলতে পারে। এরা ওর দেশোয়ালী।

—কোন্ দেশ ওর বাড়ি? এ দেশের লোক তো নয়! গায়ের রঙ চোখ দেখে মনে হল দক্ষিণের লোক হবে।

হালের মাল্লাটা বললে—না হুজুর, আমরা পুরব মুলুকের আদমী। বাড়ি আমাদের বাংগাল মুলুক।

—বাংগাল? সে তো বহুৎ দূর! সেখানে তো শুনি সাপ আর শের আছে অনেক।

—হাঁ হুজুর। তা আছে। বাঘ বনে থাকে। সাপ থাকে গর্তে।

—বাঘ তোমরা মার? কি দিয়ে মার?

—সড়কি দিয়ে গেঁথে। লাঠি দিয়ে পিটে। দাও দিয়ে কোপ মেরে। সুলেমান তিনটে বাঘ মেরেছে। দুটো সড়কিতে গেঁথে—আর একটার সঙ্গে লড়াই করেছিল দাও নিয়ে, সেবার জখম হয়েছিল নিজে।

—ও ভাইদের কাটলে কেন?

—ভাইদের কাটলে হুজুর—সে—। চুপ করে গেল লোকটা।

—কিছু শরম কি বাত?

—না। হুজুর! ওরা আগে ছিল কায়স্থ। এ মুলুকের লালা। বাংগাল মুলুকের দক্ষিণে যশোর এলাকায় রাজা প্রতাপআদিত্য ছিলেন বহুত হিম্মৎ আর কিস্মতের মালেক। শাহানশাহ আকবর শাহ বাদশাহের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন, ফৌজ তৈরি করেছিলেন, ফিরিঙ্গী বড়া সাহেবকে নিয়ে জঙ্গীজাহাজের বহর বানিয়েছিলেন। দু তিনটে লড়াইয়ে বাদশাহী ফৌজকে হারিয়ে শেষ হেরেছিলেন রাজা মানসিংহের হাতে। রাজার পরে তাঁর

খুড়তুতো ভাইরা রাজা হয়েছে—তবে তাদের কোন তেজ নেই হিম্মৎ নেই। সুলেমানের দাদা রাজার ফৌজে মনসবদার ছিল। অনেক জমিন ছিল। রাজা জমিদারি জায়গীর দিয়েছিলেন। রাজা হেরে গেলেন, ওর দাদা লড়াইয়ে মরেছিল, বাপের কাছ থেকে জমিনদারি কেড়ে নিয়েছিল সরকার, ওরা তবুও জমিন নিয়ে চাষ করে খুব ভারী গৃহস্থী ছিল, বহুৎ জমজমা। সুলেমানরা তিন ভাই। সুলেমান ছিল ছোট। তখন নাম ছিল চন্দর, ডাকতো চাঁদ বলে। বড় ভাই ইন্দর, মেজ সূর্যি। আর বহিন ছিল নাম লক্ষ্মী। বড়ভাই মেজভাই রইস লোক ছিল। লেখাপড়া করেছিল—সংস্কৃত জানত, ফার্সী লিখাপড়া করেছিল। চাঁদ ওসবের ধার ধারত না। সে তলোয়ার লাঠি সড়কি কুস্তি নিয়ে মেতে থাকত। লক্ষ্মীর সাদী হয়েছিল এক বড় জোতদার কায়স্থের বাড়িতে। একবার লক্ষ্মী আসছিল বাপের বাড়ি। তাকে আনতে গিয়েছিল চাঁদ নৌকা নিয়ে লাঠিয়াল সড়কিওলা নিয়ে। পথে হুজুর হারমাদী ছিপ এসে ওদের উপর হামলা করে। হারমাদী ফিরিঙ্গী লোকের জুলুম আর হামলা—সে বড় ভয়ানক হুজুর। লেড়কী লুঠে নেয়, জোয়ান ধরে নিয়ে যায়, গিয়ে দুনিয়ার গোলামীর হাটে বিক্রি করে দেয়—তা জানেন। হারমাদরা নৌকা ডুবিয়ে দিয়ে চাঁদ আর লক্ষ্মীকে বেঁধে তুলে নেয় নিজেদের ছিপে। কিন্তু চাঁদ বহুৎ জবরদস্ত জাঁহাবাজ। সে শেষ রাত্রে লক্ষ্মীকে নিয়ে ছিপ থেকে লাফিয়ে পড়ে সাঁতরে কিনারায় উঠে বনে বনে ছুটে পালায়। ওই বনের কাছাকাছি আমাদের বাড়ি। আমরা হুজুর মছুয়া। একসময় আমরাও হিন্দু ছিলাম। লেকিন—ওই রাজা প্রতাপআদিত্যের যখন হার হল তখন থেকে আমরা মুসলমান হয়েছি। চাঁদ এসে উঠেছিল আমাদের গাঁওয়ে। আমাদের গাঁও খুব জেলিয়ার গাঁও। আমরা জেলিয়া হলেও রাজা যখন জঙ্গীজাহাজ করেছিলেন তখন আমরা ওই জঙ্গীজাহাজে লস্করের কাম করেছি। লড়াইও করেছি। আমাদের গাঁওয়ে শও দেড়শো মরদ—তারা হুজুর হাতিয়ার

ধরতে জানে। চাঁদকে আমরা জানতাম চিনতাম। বড় ঘরের ছেলে। দিলদরিয়া আদমী। চাঁদবাবুদের এলাকায় নদীতে মাছ ধরতাম। চাঁদ লক্ষ্মীকে নিয়ে আমাদের গাঁওয়ে এসে পড়তেই সেই রাতেই শোরগোল উঠে গেল। সব জোয়ানেরা বেরিয়ে পড়ল বহুৎ আওয়াজ তুলে। নদীর কিনারা তক আমরা ছুটে গেলাম। হারমাদরা আর হাঙ্গামা না করে চলে গেল।

চাঁদ জখম হয়েছিল হুজুর। লক্ষ্মী আর চাঁদকে আমরা একজনের নতুন তৈরী বাড়িতে থাকতে দিলাম। সিধা দিলাম। তারা থাকল। আর খবর দিলাম বড়ভাই মেজভাই ইন্দরবাবু আর সূর্যিবাবুর কাছে। তোমরা তোমাদের বজরাটজরা নিয়ে এসে চাঁদ আর লক্ষ্মীকে নিয়ে যাও।

তা হুজুর, কেউ এল না। একদিন দু'দিন গেল—কেউ এল না। চাঁদ আমাদের বললে—তবে তোমরাই আমাদের পৌঁছে দাও।

তাই গেলাম আমরা। আমি ছিলাম হুজুর সে দলে। অনেক লোক সঙ্গে করে গেলাম কি পাছে আবার বিপদ ঘটে। হারমাদ বেটাদের বিশ্বাস নাই, সাপের মত ওদের আক্রোশ রাগ। ওরা যাকে ছোবল দিতে গিয়ে ছোবলাতে পারে না তার পাশে পাশে ওরা সাপের মত লুকিয়ে লুকিয়ে ফেরে, সুবিস্তা পেলেই ছুবলে তবে স্বস্তি পায়। তাই অনেক লোক সঙ্গে করে গেলাম।

হুজুর, কিন্তু হিন্দু উঁচু জাতের নিয়ম আলাদা। খাবারের গন্ধ নাকে ঢুকলে ওদের অর্ধেক খাওয়া হয়। জবরদস্তি স্রিফ মেয়ের হাতখানা ধরতে পারলেই মেয়েটার জাত চলে যায়—তাকে তারা ফেলে দেয় এঁটো মাটির বাসনের মত। সে বহিন হোক জরু হোক—এমন কি মা হলেও ছেলেরও উপায় থাকে না মাকে ঘরে নিতে।

তাই হল হুজুর। গুহবাবুর বাড়ির দরজা ফটক সব বন্ধ হয়ে গেল। চাঁদ ডাকলে—গলা ফাটিয়ে ডাকলে—লক্ষ্মী ডাকলে কাঁদলে।

কেউ সাড়া দিলে না—শুধু চাঁদের মায়ের কান্নার আওয়াজ মিলল অন্দরমহলের ভিতর থেকে।

চাঁদ বললে—আমি ফটক ভাঙব। ভাঙ ফটক।

তখন ওর বড়দাদা বাড়ির উপরতলার ঝরোকায় দাঁড়িয়ে বললে—উপায় নেই। গোটা বংশের জাত হারাতে দিতে পারব না। তোদের দুজনের জাত গিয়েছে।

চাঁদ অবাক হয়ে বললে—জাত গিয়েছে? কি করে?

ওর দাদা বললে—প্রথমে হারমাদে ধরে নিয়ে গিয়েছিল—

—আমরা তো সেখানে কিছু খাই নি। সেই রাতেই জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে পালিয়েছি।

—তা পালিয়েছ হয়তো কিন্তু তারপর মুসলমান জেলেদের গ্রামে তাদের বাড়িতে গিয়েছ। থেকেছ খেয়েছ। একবেলা এক দিন নয় আজ চার দিন। আমরা পণ্ডিতদের মত নিয়েছি, তাঁরা বলেছেন জাত গিয়েছে। লক্ষ্মীর স্বামী খবর পেয়ে জানিয়েছে ওই স্ত্রী সে ঘরে নেবে না। লক্ষ্মীকে নিয়ে এ বাড়ি ঢোকা হবে না। বাড়িতে গোবিন্দ রয়েছেন। তবে লক্ষ্মীকে ছেড়ে দিয়ে তুমি যদি এস তবে আসতে পার। পণ্ডিতেরা বলেছেন পুরুষ মানুষ বিপদ-আপদে পড়ে এমন হলে তাদের প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে, কিন্তু মেয়েদের নেওয়া যায় না।

চাঁদ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সেদিন বলেছিল—চল সদ্দার তোমাদের গ্রামেই যাব আমরা। আমরা মুসলমানই হব। তোমাদের সঙ্গেই থাকব।

চাঁদ লক্ষ্মীকে নিয়ে ফিরে এসেছিল আমাদের গাঁওয়ে। কিন্তু লক্ষ্মী সেইদিন রাত্রেই গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিল। চাঁদ কাঁদে নি হুজুর। নদীতে বোনকে ভাসিয়ে দিয়েছিল—কবর দেয় নি, বলেছিল—নাঃ, ওর যখন এত্না আপত্তি তখন কবর দেব না। তবে পোড়াব না। দাও, ওকে নদীর জলে ভাসিয়ে দাও। গুহবাড়ির লক্ষ্মী

জলেই ভেসে যাক। আর ফিরে এসে আমার—হুজুর, আমি ভাত খাচ্ছিলাম—আমার সেই পাত থেকে এক গরাস ভাত তুলে নিয়ে মুখে পুরে বলেছিল আমি মোসলমান হয়ে গেলাম।

অবাক হয়ে শুনছিলেন সৈয়দ সাহেব। কোন দিকে কোন খেয়াল ছিল না।

মামুদ হঠাৎ বললে—হুজুরআলি!

অ্যাঁ।

—আলো। আলো দেখা যাচ্ছে কলাচীর! ওই! আমরা সমুদ্দরে পড়েছি। এদিকে একখানা সওদাগরী বড় কিস্তি নৌকো নোঙর করে রয়েছে। ওই নৌকোখানা কি না দেখুন।

সৈয়দ মহম্মদ উৎকণ্ঠিত হয়ে তাকালেন সেদিকে।

চার

আগ্রাতে শাহানশাহ সাজাহানের দেওয়ানী খাসের দরবার সন্ধ্যার মুখে জমজম গমগম করছিল। আমীর ওমরাহদের মধ্যে যারা বিশেষ অনুগৃহীত এবং বিশ্বাসভাজন এসে হাজির হয়েছে। উজীর আমীর-উল-উমরা আসফ খান খানখানান তাঁর আসনে বসে আছেন —তাঁর পাশেই বসে আছেন খানখানান মহবৎ খান, দুজনে বসে মৃদুস্বরে কথা বলছেন। আসফ খাঁ বৃদ্ধ হয়েছেন, মহবৎ খাঁও প্রৌঢ়। আসফ খান শুধু উজীরই নন—তিনি শাহানশাহের শ্বশুর—সম্রাজ্ঞী মমতাজমহলের বাপ। জাহাঙ্গীর শাহের মৃত্যুর পর শাহজাদা খসরুর পুত্র শাহজাদা দেওয়ার বক্স, সম্রাট জাহাঙ্গীরের জীবিত পুত্রদের অন্যতম শাহজাদা শাহরিয়ার, শাহজাদা দানিয়েলের দুই ছেলে—শাহজাদা তহমুর শাহজাদা হোশন প্রভৃতির বিরোধিতা এবং বিরুদ্ধতাকে এই বৃদ্ধ আসফ খানই অতি সুচতুর কৌশলে ব্যর্থ করে দিয়ে প্রায় বিনা বাধায় শাহজাদা খুরমকে তক্তেতাউসে বসিয়েছেন। তাঁর ভগ্নী এতবড় শক্তিশালিনী, অসাধারণ বুদ্ধির

অধিকারিণী, শাহানশাহ জাহাঙ্গীরের ছায়ার মত জীবনসঙ্গিনী বেগম হজরৎ নূরজাহানের প্রতাপ প্রভাব পর্যন্ত তিনি অত্যন্ত ধীরতা বিচক্ষণতার সঙ্গে ব্যর্থ করে দিয়েছেন। বলতে গেলে শাহজাদা খুরম শাহানশাহ সাজাহান হয়েছেন আসফ খাঁর প্রতিভায়, আর খানখানান মহবৎ খাঁর শক্তিতে। অবশ্য শাহজাদা খুরমের চেয়ে বুদ্ধিতে, রণনৈপুণ্যে, সাহসে যোগ্যতর আর কেউ ছিলেন না তাঁর ভাই বা ভাইপোদের মধ্যে। জয়ী তিনি হতেনই। কিন্তু আসফ খাঁর বুদ্ধি এবং শক্তির জন্যই কোন বেগ তাঁকে পেতে হয় নি। তাঁর হুকুমেই সাজাহানের চার ভাইপো এবং ভাই শাহরিয়ারের প্রাণদণ্ড হয়েছে। সাজাহান এখন নিষ্কণ্টক। আসফ খান এবং মহবৎ খান মৃদুস্বরে কথা বলছিলেন দক্ষিণ সম্বন্ধে। মুঘল সাম্রাজ্যের দক্ষিণ প্রান্তে কুতুবশাহী আর আদিলশাহী সুলতানদের রাজ্য গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর। ওইখানে লেগে রয়েছে অশান্তি। নিজে শাহজাদা খুরম শাহানশাহ জাহাঙ্গীর শাহের আমলে এদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন এদের জয় করবার জন্য। কিন্তু জাহাঙ্গীর শাহের ইন্‌তেকাল হওয়ার খবর পেয়েই একটা সন্ধি করে তিনি চলে এসেছেন আগ্রায় মসনদের জন্য। তারপর থেকেই দক্ষিণে কুতুবশাহী সুলতান আর আদিলশাহী সুলতানেরা দিল্লীর বাদশাহকে একরকম অস্বীকারই করে আসছেন। গোপনে গোপনে তাঁরা তৈয়ারও হচ্ছেন। আলোচনা সেই নিয়ে। আর এক অশান্তি উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে কাবুলের ও পশ্চিমে ইরানের সীমানা নিয়ে। না হলে বাকী হিন্দোস্তানে শান্তি বিরাজ করছে। বাঙলায় পর্তুগীজ হারমাদরা সাতগাঁ সোনারগাঁওয়ে এক রকম ঠাণ্ডাই আছে। রাজপুতানায় যোধপুর, জয়পুর, এমন কি চিতোর পর্যন্ত শান্ত। কোন বিরোধ নেই। মেবারের রানা জগৎসিং যে সন্ধি করেছেন তা মেনে চলছেন। চিতোর গড়ের ভাঙা পাঁচিল ভাঙাই থাকবে, মেরামত করবেন না বলে যে কথা দিয়েছেন তার অন্যথা হয় নি।

মধ্যে মধ্যে ফিরিঙ্গীস্তানের ফিরিঙ্গী লোকেরা থাট্টা থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত সমুদ্রের ধারে ধারে কিছু কিছু জুলুমবাজি আর 'সমুন্দরে ডাকাজানি' করলেও মোটামুটি ঠাণ্ডাই আছে বলা যায়। মধ্য ভারতে বাদশাহ জাহাঙ্গীর শাহের আমলের দুর্ধর্ষ আফগান আমীর খাঁজাহানের বিদ্রোহের পালা শেষ হয়েছে। মালব থেকে সুদূর দক্ষিণ পর্যন্ত তার পিছনে ধাওয়া করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। খাঁজাহান শেষ যুদ্ধে সব হারিয়ে পড়েছিল। তার মুণ্ডু এসেছিল।

খাঁজাহানের প্রিয়পাত্র 'ঝুঝর সিং' সেও শেষ পর্যন্ত প্রাণ দিয়েছে। মোটামুটি দক্ষিণ আর উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত ছাড়া সমস্ত বাদশাহী ইলাকায় কোন ঝঞ্ঝাট ঝামেলা নেই।

'বিলকুল আগ্ বুত গিয়া'—সব আগুন নিভিয়ে গেছে—নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে হিন্দুস্তানের খাস ইলাকার মধ্যে। 'বহুৎ মৌজী ঠাণ্ডি'র মধ্যে এখন আগ্রার আসর সরগরম। বড় বড় ইমারত গড়ে উঠছে। দিল্লীতে নতুন শা-জাহানাবাদের পত্তন হয়েছে। সারা হিন্দুস্তানের এলেমদার কারিগর তার সঙ্গে বুখারা সমরকন্দে যারা তৈমুরশাহী ইমারত গড়েছে তাদের বংশধরেরা এসে বাদশাহের হুকুম শুনে নকশা বানিয়ে সেই মত কিল্লা তৈয়ার করবে। একেবারে আকবরশাহী এই আগ্রা কিল্লার মত। তাতে দেওয়ানী-আম দেওয়ানী-খাস সব থাকবে। কিন্তু সে হবে এমন যে যাকে বলা যাবে—দুনিয়ায় যদি বেহেস্ত থাকে তবে তা এই এই এইখানে। আগ্রার তোশাখানায় সোনা রূপা হীরা জহরত মণি মুক্তা নাকি অঢেল। গুণে শেষ করা যায় না। ওজন করে পরিমাণ নির্ণয় করাও দুঃসাধ্য।

সন্ধ্যায় দেওয়ানী খাসে বাদশাহের দরবারের জলুসের তুলনা নেই। রূপোর রেলিংয়ে ঘেরা শ্বেতপাথরের সারিবন্দী থাম এবং নকশাদার খিলানের মাথায় নকশাদার ছাদ, সামনে প্রশস্ত একতলার ছাদ বিস্তীর্ণ অঙ্গনের মত বিস্তৃত। খাস দরবারে গাঢ় রক্তবর্ণ মখমলের

পর্দা ঝালরে মণি মুক্তার বাহার। তার উপর বড় বড় শামাদানের এবং ছাদে ঝুলানো ঝাড়লণ্ঠনের বাতির আলোর ছটায় ঝলমল করছে। ভিতরে ঠিক মাঝখানে উঁচু পাথরের বেদির উপর বাদশাহী মসনদ। সোনা রূপা হীরা মতি খচিত মসনদ ময়ূর সিংহাসন তক্তেতাউস, মখমলের কোমল আসন—তিন দিকে তিনটি মখমলের মসলন্দ অর্থাৎ তাকিয়া। সামনে রূপার তেকাটার উপর সোনার থালায় সোনালী তবকে মোড়া পানের খিলি—সোনার আতরদানে আতর এবং একমাপের কাটা সরু কাঠিতে জড়ানো তুলোর তুলি গোঁজা রয়েছে। পাশে আরও দু'তিনটে তেকাটার উপর সোনার থালায় কোনটাতে মোহর, কোনটাতে আংটি মুক্তার মালা রাখা রয়েছে। একটাতে রয়েছে বাদশাহী পাঞ্জা সীলমোহর কালি কাগজ কলম। এ সব এই সন্ধ্যার আসরে বাদশাহ খুশি মত কাউকে মোহর কাউকে আংটি কাউকে মুক্তোর মালা বকশিশ দেবেন। কারু নসীব ভাল হলে সে হয়তো কোন একটা মৌজা কি কোন একটা পরগনাও জায়গীর পেয়ে যাবে।

দেওয়ানী খাসের মধ্যে প্রথমেই বসে আছেন আসফ খান—উজীরে হিন্দোস্তান আর মহবৎ খান—গোটা বাদশাহী ফৌজের মালেকে মুল্ক। তা ছাড়া আছে মীর বক্সী, সে কাগজপত্র নিয়ে বসে আছে। তার সঙ্গে 'দেওয়ান বিয়োয়াৎ'। তোপখানার মালিক মীর আতীশ আছে। আজ আরও আছেন রাজপুতানার দুজন ছোটখাটো রাজা। আর এসেছেন বাদশাহের মেহমান কাশ্মীরের রাজৌরী রাজ্যের রাজা মহারাজা রাজু সিং। মহারাজা রাজু সিংয়ের বেটীর সঙ্গে শাহজাদা ঔরংজীবের সাদী হয়েছে। নবাববাঈ রহমৎউন্নেসার বাপ। অনেকদিন পর বাদশাহ তাঁর সঙ্গে আজ দেখা করবেন। এ ছাড়া আগ্রার মুঘল আমীররা আছেন। আর আছেন বাদশাহের হাকিম। আগ্রার শায়র আর্থাৎ কবিদেরই আজ ভিড় বেশি। কারণ সন্ধ্যেতে বাদশাহের খাস আসরে আজ 'মুশায়ারা'

অর্থাৎ কবি সম্মেলন হবে। তাঁরা বসেছেন সামনে প্রশস্ত ছাদের চত্বরে—তার উপরে বহুমূল্য পারস্যদেশের তৈয়ার নকশাদার শামিয়ানা খাটানো হয়েছে। সে আসরও আলোয় আলোময়। দামী কাশ্মীরী ইরানী গালিচা জাজিমের প্রশস্ত ফরাস। নানান সুবা থেকে শায়র অর্থাৎ কবিরা এসে সেই আসরে বসেছেন জাঁকিয়ে। সকলের পিছনে এক এক মসলন্দ বা তাকিয়া। মাঝখানে বড় রূপোর পরাতে পান জরদা সুরতি মসলার পাত্র। আতরদানে আতর। কতকগুলি গুলাবজল ভরা গুলাবপাশ রাখা রয়েছে। ধূপদানে গোছা গোছা আগর বাতি অর্থাৎ ধূপকাঠি পুড়ছে। কবিদের সব শৌখিন পোশাক, রঙীন মুরেঠা জরিদার আংরাখা, শৌখিন কামদার পাঞ্জাবি পিরহান টিলা চুস্ত হরেক রকম পায়জামা। সব বসে আছেন। কবি কুদ্‌শী, কবি কাশী, কবি সায়ব, কবি সেলিম, কবি মাশি, কবি রফি, কবি ফারুক, মুনীর, শায়দা, এমন কি কবি ব্রাহমন যাঁর আসল নাম চন্দ্রভান তিনিও এসেছেন লাহোর থেকে। একপাশে বসে আছে একটি তরুণ—পোশাক পরিচ্ছদ সাধারণ, তাতে দারিদ্র্যের পরিচয় রয়েছে—তার নাম শায়র অর্থাৎ কবি সুভগ। এইসব নামগুলি কবিদের ছদ্মনাম। আসল নাম আছে। কিন্তু কবি হিসেবে এঁরা ছদ্মনামেই বিখ্যাত।

এই সময় এসে ঢুকলেন বৃদ্ধ কবি সৈয়দ জিলানী; বাদশাহ জাহাঙ্গীর শাহের আমলের কবি। মাথার চুল দাড়ি গোঁফ সব 'সফেদ' হয়ে গিয়েছে। একটু কুঁজোও হয়েছেন। তিনি শুধু কবিই নন বাদশাহী দরবারের তিনি দারোগা-ই-জওহরখানা অর্থাৎ বাদশাহী জওহরতখানার সর্বেসর্বা—হিন্দুস্তানের শ্রেষ্ঠ জহুরী।

তাঁর সঙ্গে শাহানশাহ সাজাহানের দরবারের শায়রে শের সভাকবি আবুল তালিব কালিম। কাশানে জন্ম—হামদানে মানুষ হয়েছেন, সেখান থেকে হিন্দোস্তানের বাদশাহী দরবারে রুবাই গজল মসনভী কাসিদা কাব্য কবিতার গানবাজনার কদরের কথা

শুনে চলে এসেছেন। এখানে এসে নতুন বাদশাহের নজরে পড়েছেন। তিনি 'পাদশাহীনামা' রচনা করেছেন। তাঁর 'দিওয়ান' কেতাবে বাদশাহের গুণগান করে 'কাসিদা' তৈয়ার করে একবার নয় বার কয়েক তাঁর ওজনের সমান সোনা রূপা পেয়েছেন।

সাজাহান বাদশাহ শুধু গান নাচ ইমারত দরবার ফৌজ তোপ এই সবই ভালবাসেন না। তিনি গজল রুবাই কাসিদা মসনভীর ভক্ত। যাঁর কবিতা তাঁর ভাল লাগে তাঁকে তিনি তুলাদণ্ডে চড়িয়ে তাঁর সমান ওজনের সোনা রূপা পুরস্কার দেন।

শায়রে শের কালিম সাহেব এবং বৃদ্ধ কবি জিলানীকে দেখে সভার সকলেই সালামত জানালে। তাঁরাও প্রত্যভিবাদন জানিয়ে কবিসভার ঠিক মাঝখানে বসে মাঝখানের থালা থেকে পানের খিলি তুলে নিয়ে মুখে পুরে কবিদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করতে আরম্ভ করলেন। এঁরাই আজকের আসরে বিচারে শাহানশাহকে সাহায্য করবেন।

শায়রে শের কালিম সাহেব এবং বৃদ্ধ কবি সৈয়দ জিলানীকে দেখে উজীর আসফ খাঁ দক্ষিণ সম্বন্ধে মহবৎ খাঁর সঙ্গে আলোচনা স্থগিত রেখে বললেন—শাহবুরুজে এ কথা শাহানশাহের সামনে হবে খানখানান। এখন থাক। এখানকার আসরটা যাতে তাড়াতাড়ি শেষ হয় তার বন্দোবস্ত করতে হবে। নইলে মুশায়ারা শেষ না হলে তো বাদশা উঠবেন না। আমি বরং বলে দিয়ে আসি শায়র লোগোঁদের বাদশা আজ কি চাইবেন। ওঁরা ভেবে রাখুন।

মহবৎ খাঁ বললেন—ও সেই তুরানের সুলতানের চিঠি?

—হাঁ। তার জবাব তো দিতেই হবে। জবাব না দিতে পারলে হিন্দুস্থানের বাদশাই শুধু নন তামাম দরবার তামাম মুল্কের শরম কি বাত্।

—জরুর! তবে কি জানেন—এর জবাব কি আছে? জহান আর হিন্দুস্থান এ দুয়ের ইলাকার ফারাকই তো এর সাক্ষী দিচ্ছে।

হেসে আসফ খাঁ বললেন—আমীর উমরাহ উজীর আমরা না পারি এই কথার কারবারী শায়র তার কথার মারপেঁচ দিয়ে মাটিকে বেহেস্ত বানিয়ে দেয়! দেখি!

উজীর আসফ খাঁ কবিমণ্ডপে প্রবেশ করে অভিবাদন করে বললেন—আপনাদের মেজাজ শরীফ? তবিয়ৎ বিলকুল ঠিক?

সকলে প্রত্যভিবাদন জানিয়ে ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন—মেহেরবানি খোদার। দরবার হিন্দোস্তানের বাদশাদের—এখানে কি কারুর মেজাজ বে-শরীফ থাকতে পারে না তবিয়ৎ বেঠিক হতে পারে!

আসফ খাঁ বললেন—আজ এ মজলিসে বাদশাহ কি ফরমায়েশ করবেন তা আগে থেকে একটু বলে রাখি। আপনারা ভেবে রাখুন। তুরানের সুলতান এক খত পাঠিয়েছেন বাদশাহের কাছে—তার মধ্যে তিনি এক সওয়াল রেখেছেন কি হিন্দুস্তান আর দুনিয়া এক নয়। দুনিয়ার একটা ছোট টুকরা হল হিন্দুস্তান। সেই একটুকরার মালিক হয়ে বাদশা কি বলে 'শা-জাঁহান' যার মানে দাঁড়ায় তামাম দুনিয়ার বাদশা সেই নাম নিয়েছেন? বাদশা এর এক আচ্ছা জবাব ভেজতে চান। আমীর ওমরাহ আমরা যে জবাব দিয়েছি শাহানশাহের তা পসন্দ হয় নি। তাই আপনাদের ডেকেছেন। একটু ভেবে রাখুন আপনারা। বাদশাহের আসবার ওয়াক্ত হয়ে এসেছে।

এমন সময় শরবতের গ্লাস বসানো বড় বড় পরাত নিয়ে এসে ঢুকল দেওয়ানী খাসের নোকরেরা। দারোগা দেওয়ানী খাস চারিপাশ ঘুরে দেখতে লাগলেন প্রত্যেকের হাতে গ্লাস পৌঁছুচ্ছে কি না।

শরবত খাওয়া শেষ হয়েছে এমন সময় বাদশাহী নাকাড়া বেজে উঠল; সঙ্গে সঙ্গে অন্দরমহল থেকে দেওয়ানী খাসে ঢুকবার দরজায় এসে দাঁড়াল চোপদারের সারি—তার মাঝখানে নকীব এসে দাঁড়িয়ে হাঁকলে বাদশাহের আগমনবার্তা। সকলে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল।

নকীব সরে দাঁড়াল, সঙ্গে সঙ্গে বাদশাহ প্রবেশ করলেন দরবারে। তাঁর ডান পাশে শাহজাদা দারা সিকো—বাদশাহ সাজাহানের প্রিয়তম পুত্র।

*　　　　*　　　　*

প্রাথমিক পর্ব পান আতর বিলি করার পর সমাগত রাজা এবং নবাবদের সঙ্গে কথাবার্তা বললেন—তাঁদের উপঢৌকন নিয়ে তার তারিফ করে তাঁদের খেলাত দিলেন। কাউকে পোশাক ছোরা কোমরবন্দ। এ ছাড়া হাতী ঘোড়া দেবার হুকুম হল। সব শেষে এসে দাঁড়ালেন কাশ্মীরের রাজৌরীর মহারাজা রাজু। সম্পর্কে বৈবাহিক। কোন কারণে বৈবাহিকের সঙ্গে সম্রাট আজ কয়েক বছর দেখা করেন নি। তাঁর দিকে তাকিয়ে সম্রাটের কপাল কুঁচকে উঠল প্রথমটা। তারপরই সহাস্যে সম্ভাষণ করে বললেন—রাজা-সাহেবের কন্যা শাহজাদা ঔরংজীবের বেগম নবাববাঈ আশ্চর্য গুণবতী। তৈমুরশাহী হারেমে সে কাশ্মীরের মূল্যবান এবং মঙ্গল-দায়ক দুর্লভ 'নীলা' জহরতের মত।

কুর্নিশ করে রাজা রাজু বললেন—সে আমার পরম সৌভাগ্য।

—হ্যাঁ। রাজা আজ শাহবুরুজে আমার সঙ্গে দেখা করবেন। উজীর খানিখানান আর ওমরাহদের সঙ্গে আমার কথাবার্তা শেষ হওয়ার পর, আপনি মেহমান আমার, আপনার সঙ্গে কথা বলব। শাহজাদা দারা আপনাকে নিয়ে যাবেন। বাদশাহ দারা সিকোর দিকে তাকালেন।

রাজা আবার কুর্নিশ করে পিছিয়ে এসে নিজের নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়ালেন।

বাদশাহ এবার কবিদের আহ্বান করে পান আতর দিয়ে হেসে বললেন—আজ শায়র লোঁগের কাছে আমি এক সওয়াল পেশ করছি। দেখুন হঠাৎ কি জানি আমার দিলের মধ্যে কে যেন বলে উঠল—"জাঘ্ অজ্ দহান পরীদ্।" একটা কাক মুখের উপর থেকে উড়ে

গেল। কিন্তু না আমার সমঝে এল এর কি মানে, না দিল বললে আর কোন কথা! এ নিয়ে আপনারা শায়র লোঁগ আমাকে গজল কি কাসিদী কি রুবাই কিছু তৈরি করে শোনান।

মৃদু মৃদু হাসছিলেন শাহানশাহ।

উজীর আসফ খাঁ কাছে এসে মৃদুস্বরে শাহানশাহকে কিছু বললেন। সম্ভবতঃ তুরানের সুলতানের চিঠির কথা। শাহানশাহ ঘাড় নাড়লেন—অর্থাৎ সেটা মনে আছে বা পড়েছে। এবং সঙ্গে সঙ্গেই বললেন—হাঁ। আর এক সওয়াল আছে। খানখানান উজীর-ই-হিন্দোস্তান আসফ খান বলছেন সে সওয়াল তিনি আগেই আপনাদের কাছে পেশ করেছেন। আপনাদের জবাব তৈয়ারও হয়ে থাকতে পারে। তুরানের সুলতান মুস্করা করে হিন্দোস্তানের বাদশাকে ছোট করতে চেয়েছেন। হিন্দুস্তানের ইজ্জত আর হিন্দুস্তানের বাদশাহের ইজ্জত দুই-ই এক—এতে ফরক নেই।

কবি ব্রাহমন—লাহোরের চন্দ্রভান এগিয়ে এসে কুর্নিশ করে বললেন—জাঁহাপনার হুকুম হলে আমি জবাব পেশ করি—

—নিশ্চয়।

সমস্ত গুঞ্জন স্তব্ধ হয়ে গেল। কবি ব্রাহমনের কণ্ঠস্বর সংগীতের ছন্দে ধ্বনিত হল। তখনকার কালে কবিরা তাঁদের কাব্য ছন্দে গেঁথে আবৃত্তি করতেন না, সুরে গান করে গেয়ে শোনাতেন। কবিরা কথার মালা গাঁথতেন সুরের সুতোয়।

ব্রাহমন গাইলেন—"সমশের অর্থাৎ তলোয়ার যার খাপে পোরা থাকে, লোভের জন্য ক্ষোভের জন্য রক্তে রাঙা হয় না, সেই সব থেকে খোদাতয়লার প্রিয় আশীর্বাদধন্য। হিন্দুস্তানের বাদশাহের সমশের দুনিয়া জয় করতে পারে। কিন্তু লোভ এবং ক্ষোভ সংবরণ করে সমশের তার খাপে পুরে রেখেছে। দুনিয়া জয় করতে সে পারে বলেই সে সা-জাহান। খোদা তার এই নাম তাঁর ফরমান দিয়ে কায়েম করেছেন।"

খাঁটি পারসী ভাষায় চমৎকার কবিতা রচনা করেছেন হিন্দুস্তানী চন্দ্রভান। তারিফ সকলেই করলে। কিন্তু জবাব বড় বড় হয়ে গেছে।

আর একজন উঠে বললেন—খোদার ফরমান যার পড়বার চোখ আছে সে রাত্রে আকাশের দিকে তাকালেই দেখতে পাবে হিন্দুস্তানের আকাশে নক্ষত্র দিয়ে লেখা আছে এখানকার বাদশাহ যে তার নাম খোদা দিয়েছেন সা-জাহান।

বাদশা বললেন—এর জবাবে তুরানের সুলতান তুরানের আকাশের নক্ষত্রে লেখা ফরমান দাখিল করে বলবে, তুরানের সুলতানেরও ঠিক এমনি ফরমান আছে। তারপর বাদশা শায়রে শের আবুল কালিমের দিকে তাকিয়ে বললেন—শায়রে শের এবার আপনি বলুন। আমি এ জবাবের জন্যে যেমন ব্যস্ত তার থেকেও ব্যস্ত আমার ওই দিনের সওয়ালের জবাবের জন্যে। এর ফয়সালা আপনি করুন।

কবি কালিম উঠে বললেন—জাঁহাপনা, দুনিয়াদারিতে সুলতানী বাদশাহীর কিস্মৎ তার ইলাকার দামে। সেই দাম বিচার করলে গোটা দুনিয়ার যা দাম তাই এক হিন্দুস্তানের দামের থোড়া কুছের বেশী নয়। আফগানেস্তান থেকে বাঙ্গাল মুল্ক পর্যন্ত আর উজবেগ-স্তানের বাল্‌খ থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত ইলাকার মাটিতে দুনিয়ার রোটী যোগাতে পারে, এর দরিয়ার পানি জড়ো করে সমুন্দর বনে যায়। এর এক পাহাড়ের সঙ্গে দুনিয়ার তামাম পাহাড় ওপর ওপর সাজালে সমান হয় না। এর সোনা চাঁদী হীরা জহরত যা মিট্টির তলায় আছে তার সমান সোনা চাঁদি হীরা জহরত বাকী দুনিয়ায় নাই। সুতরাং হিন্দুস্তানের বাদশা শাহানশা না হলে আর শাহানশা কে? বলে তিনি গাইলেন দুটি ছত্র।—

"হিন্দ র জহান জ রূয় অদদ্ হর দূ চূঁয়কীস্ত।
শহরা খিত্বাব-ই-শাহজাহানী মুকরর অস্ত॥"

"অর্থাৎ গুনে হিসেব করে হিন্দ আর জাহানের দাম এক বলেই বাদশাহের উপাধি শা-হ-জাহান নির্দিষ্ট হয়েছে।"

সঙ্গে সঙ্গে তারিফ আর কেরামতের উচ্ছ্বাস উঠে গেল সারা সভায়। বাদশাহ উজ্জ্বল মুখে বললেন—বহুৎ আচ্ছা—বহুৎ খুব! ওয়া ওয়া ওয়া! উজীর সাহেব, এই জবাব ভেজে দিন তুরানের সুলতানের কাছে। আর শায়রে শেরকে দেওয়া হোক মুক্তার মালা, শিরপেঁচ, আর এক পোশাক। তার সঙ্গে এক হাজার আশরফি। আর এক তাঞ্জাম। তাঞ্জাম বইবার কাহারের খরচ দরবার থেকে দেওয়া হবে।

তার পরই বললেন—এইবার "জাঘ্ অজ্ দহান পরীদ্"। আমার দিলের সওয়ালের জবাব আমার চাই!

বলতে বলতে বাদশাহ যেন একটু অতি সরস মৌজের মধ্যে ডুবে গেলেন। আবার প্রথমেই উঠলেন কবি ব্রাহমন লাহোরের চন্দ্রভান। তিনি গাইলেন—একটি সুন্দরী ছাদের উপর শুয়ে ঘুমিয়েছিল নিথর হয়ে। একটা কাক তাকে মুর্দা ভেবে তার মুখের উপর এসে বসল। সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরী ঘুম ভেঙে তাকালে। জীবনের কাছ থেকে মৃত্যু যেমন পালায় তেমনি করেই কাক মুখের উপর থেকে উড়ে গেল।

বাদশাহ বললেন—শেষটা বেশ বলেছ কবি ব্রাহমন—জীবনের কাছ থেকে মৃত্যু যেমন পালায় তেমনিভাবে জেগে ওঠা সুন্দরীর মুখ থেকে কাকটা উড়ে গেল। কিন্তু আমার দিল বলছে এ জবাব ঠিক হল না। তবু এই নাও। বলে একমুঠো আশরফি তুলে ধরলেন।

*　　*　　*

একে একে প্রায় সব কবিই এক একটা জবাব দিলেন কিন্তু কারুর জবাবেই বাদশার দিল সায় দিলে না। দিল বললে না যে এই ঠিক জবাব আমি পেয়েছি।

বাদশাহ বললেন—কি আপসোসের বাত, এমন ভাল ভাল গজল রুবাইএর মধ্যেও আমার দিল খুঁজে পাচ্ছে না তার জবাব। ভাবছি, আমার দিলই কি ভোঁতা হয়ে গেল? না এই সব শায়র যারা দিনের আসমানে তারা দেখে—যারা নাকি দেওয়ানা হয়ে বোখারা সমরকন্দ দিয়ে দিতে পারে পিয়ারীর মুখের তিলের জন্যে তারাই অন্ধা হয়ে গেল।

এবার উঠে দাঁড়াল সেই তরুণ কবিটি—'কবি সুভগ'—এক কাশ্মীরী রাজপুত কবি। যার পোশাকে দৈন্যের চিহ্ন পরিস্ফুট। সে উঠে দাঁড়ায়ে কুর্নিশ করে বললে—জাঁহাপনার হুকুম হলে এই গরীব বান্দা একটা জবাব দেবার কোশিস করবে।

—বল। বল।

তরুণ কবির কণ্ঠস্বর তরুণ। শুধু তরুণই নয় মিঠাও বটে। সে গজলের সুরে গাইলে—

"খালী কি বুদ্ বর্ লব্জ আন্ শহদ মী চকীদ।
হানগাম-ই-বুসহ্ দাদণ্ আন্ খাল্ রা গুজীদ।
দর অয়্হর্ বদীদ বলব্ খাল্ রা নদীদ।
হয়রণ্ অজ্ আন্ বামান্দ্ কি জাঘ্ অজ্ দহান
পরীদ্।"

অর্থাৎ পিয়ারীকে চুম্বন করবার সময় তার ঠোঁটের উপর যে কালো তিলটি ছিল তারই উপর চুম্বন করলাম। তারপর আমি দেখলাম আর পিয়ারীও আয়নার দিকে তাকিয়ে দেখলে যে সে তিলটি আর নেই; কি আশ্চর্য, মুখের উপর থেকে কাকটি উড়ে পালিয়েছে!

বাদশাহ সরস কৌতুকে উচ্ছ্বসিত হয়ে হেসে উঠলেন। সকলেই বুঝতে পারলে, শাহানশাহের দিল এবার ঠিক জবাব পেয়ে উল্লসিত হয়ে উঠেছে।

সঙ্গে সঙ্গে ওমরাহ থেকে কবিরা পর্যন্ত সকলেই খুব তারিফ করে উঠল কবির।

—কি নাম তোমার ? দেশ কোথায় ?

কুর্নিশ করে কবি বললে—এ গোলামের নাম মোহন ভায়—গজল রুবাইয়ের কারবারে আমি 'সুভগ'। দেশ আমার কাশ্মীর। এখন দুনিয়া ভর আমার দেশ। কিছুদিন দিল্লী এসেছি।

—আচ্ছা তোমাকে ওজন করে আমি সোনা আওর চাঁদি দেব। কিন্তু বল তো নওজোয়ান—এই মুখ থেকে কাক উড়ে গেল, এর জবাবে যা বললে তা কি তোমার জীবনে ঘটেছে ? তুমি দেখেছ কাক উড়ে যাওয়া ?

তরুণ কবি মাথা হেঁট করে রইল।

শাহানশাহ হেসে উঠে বললেন—এ না দেখলে তো বলতে কেউ পারবে না। আজ এক নতুন বাঁদী আমদানী হয়েছে। তার গালের উপর তিল দেখে আমি তাকে চুম্বনের জন্য ওই তিলটিকেই বেছে নিলাম—ওই তিলের জন্যই তার সুরত যেমন বেড়েছিল তেমনি খুঁত মনে হচ্ছিল। আমি যেই—।

হাসতে লাগলেন শাহানশাহ।

শাহানশাহ সাজাহান তখন প্রৌঢ়—১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে বয়স আটচল্লিশ। তার উপর ৯।১০ বছর আগে প্রিয়তমা বেগম আরজমন্দ বানু মমতাজমহলের মৃত্যুর পর গভীর অন্তর্দাহে তাঁর চুলে দাড়িতে পাক ধরেছে। বড়ছেলে শাহজাদা দারা সিকোর বয়স তখন পঁচিশ। তিনি, শুধু তিনি কেন তাঁর কনিষ্ঠদের—সুজা ঔরঙ্গজেব মুরাদের পর্যন্ত বিবাহ হয়ে গেছে। ওদিকে যমুনার কিনারায় মমতাজমহলের সমাধির উপর ইমারত গড়ে উঠছে। কিন্তু সে কালে এই ধারায় কোন নিন্দা বা অশোভনতা ছিল না।

শাহজাদারা বাল্যকাল উত্তীর্ণ হতে হতে ১৫।১৬ বৎসর বয়স থেকেই তাঁদের পৃথক মহলের ব্যবস্থা হত, তাঁর পরিচর্যার জন্য গোলাম বান্দার সঙ্গে তরুণী সুন্দরী বাঁদী তাঁকে উপঢৌকন দেওয়া

হত। এর জন্য পিতার কাছে পুত্র বা পুত্রের কাছে পিতা কেউ লজ্জিত হতেন না। শুধু মুসলমান সমাজেই নয় হিন্দু রাজারাজড়ার মধ্যেও এর রেওয়াজ ছিল।

হঠাৎ দারা সিকো শাহানশাহের একটু কাছে এসে সসম্ভ্রমে মৃদুস্বরে কিছু বললেন। শাহানশাহ হাসি বন্ধ করে তাকালেন কবি সুভগের দিকে। এবং বললেন—তুমি কাঁদছ কবি সুভগ ?

সকলের দৃষ্টিই এবার আকৃষ্ট হল ওই তরুণ কবির দিকে। সত্যই তরুণ কবি মুখ নিচু করে আছে, তার চোখ থেকে ঝরা জল তার আংরাখার গায়ে পড়ছে। উজ্জ্বল আলোর ছটায় বেশ বোঝা যাচ্ছে।

মুখ তুললে তরুণ কবি। চোখের পাতায় তার চোখের জল লেগে রয়েছে। সে অভিনন্দন করলে কিন্তু কথা বলতে পারলে না।

রাজৌরীর রাজা, রাজা রাজু এবার কুর্নিশ জানিয়ে শাহানশার কাছে কিছু বলবার অনুমতি চাইলেন ; শাহানশাহ বললেন—সবুর করুন রাজা, কবির দিলে বহুৎ দুখ্‌ আছে। আমি সেই দুখটা কি তা জেনে নিতে চাই।

রাজা রাজু বললেন—কবি সুভগ আমারই দেশের লোক। ওর দুখ দর্দের কথা আমি জানি। কিন্তু সে আমি জাঁহাপনার কাছে একান্তে নিবেদন করতে চাই।

শাহানশাহ তাঁর মুখের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন—তাই হবে রাজাসাহেব। আমি এখনই শাহবুরুজে যাব। সেখানে উজীরসাহেব আর খানখানান মহবৎ খানের সঙ্গে কথাবার্তা সেরে নিয়ে আপনার কথার সঙ্গে ওর কথা শুনব। শাহজাদা দারা আপনাকে সেখানে নিয়ে যাবে।

বলেই শাহানশাহ উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে নাকাড়া বাজল, শাহানশাহী নাকাড়া। ঘোষণা হল দেওয়ানী খাস দরবার শেষ হল।

হিন্দোস্তানের বাদশাহীতে শুধু বিলাস নাই শুধু ভোগ নাই রাজ্যের দূরতম প্রান্তের কঠিন চিন্তা আছে। সে চিন্তা নিত্য নিয়মিত—হয়তো অহরহ। হিন্দোস্তানের বাদশা সূর্যোদয়ের দু 'ঘড়ি' আগে বাদশাহী শয্যা ছেড়ে উঠে প্রাতঃকৃত্য এবং ওজু শেষ করেন। যেদিন স্নান করবেন সেদিন স্নানও সেরে নেন বাদশাহী হামামে। তারপর যান বাদশাহের নিজের মসজেদে; সেখানে গালিচার উপর বসে সূর্যোদয় পর্যন্ত তসবি জপ করেন। আগ্রা বা দিল্লীর মসজেদে মসজেদে আজানের ধ্বনি উঠে শেষ হলেই প্রথম নামাজ শেষ করেন।

সেখান থেকে যান 'দর্শন ঝরোকায়'। কেল্লার বাইরে দর্শন ঝরোকার সামনে হাজারে হাজারে দর্শনার্থীরা দাঁড়িয়ে থাকে। হিন্দু মুসলমান সব শ্রেণীর। সেখানে তিনি প্রজাদের নালিশের আরজি গ্রহণ করেন। বাদশাহী আমলারা প্রজার উপর জুলুমবাজি করে, সে বাদশাহদের অজানা নয়। আমলাদের হাত দিয়ে এসব নালিশের আরজি বা দরখাস্ত সহজে আসতে পারে না বলে তিনি নিজে গ্রহণ করেন।

তারপর যমুনার বালির উপর শুরু হয় জানোয়ারের লড়াই। হাতীর লড়াই। সেখান থেকে আম দরবার দেওয়ানী আমে। প্রথম প্রহর শেষ হওয়ার অনেক আগে আম দরবারে আসেন বাদশাহ। আম দরবারের আকার বিশাল। আয়োজনও বিপুল। মীর বক্সী এখানে কাগজপত্র নিয়ে বাদশাহের কাছে পেশ করেন। বাদশাহ নিজে দেখেন। মনসবদার জায়গীরদারদের দরখাস্ত। তারপর বাদশাহ খেলাতের হুকুম দেন। যোগ্য ব্যক্তির পদোন্নতি মঞ্জুর করেন। তারপর অন্যান্য দফ্‌তরের কাগজ দাখিল হয়। কোথায় খাজনা বাকী পড়েছে। কোথায় খাজনা থেকে কত টাকা কি বাবদে খরচ করেছে সুবাদার সেই সব হিসাব। তারপর মীর আতীশ তোপখানার নতুন তোপ নতুন গোলন্দাজ আম দরবারের সামনে দিয়ে বাদশাহকে

দেখিয়ে নিয়ে যায়। আহদী-ই-বক্সীর ইঙ্গিতে নতুন আহদীর দল সেলামত দিয়ে চলে যায়।

এই সব সেরে বাদশাহ যান দেওয়ানী খাসে।

এখানে বাদশাহের শ্রেষ্ঠ ওমরাহ উজীর খানখানানদের সঙ্গে রাজ্যের জটিল প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেন। গোপন ইস্তাহার, বড় বড় নালিশ, দেশের রাজা ওমরাহ নবাবদের পেশ করা এবং তাদের বিরুদ্ধে বাদশাহী দফ্তরের জবাবের শুনানি হয়। বাদশাহ ফয়সালা করেন। কারও দণ্ড বিধান হয়, কারুর দণ্ড মকুব হয়। দারোগা-ই-ইমারত এইখানে বড় বড় ইমারতের নকশা দাখিল করে, বাদশাহ দেখেন; পছন্দমত বদল করে ইমারত গড়বার হুকুম দেন।

তারপর যান শাহবুরুজে। সেখানে প্রথম দফা বসে পরামর্শ সভা। এরপর বাদশাহ যান হারেমে। সেখানে খাওয়াদাওয়ার পর বিশ্রাম করে উঠেই বসেন হারেমের খবর নিতে। মমতাজমহল থাকতে মমতাজমহল আসতেন—এখন আসেন কন্যা জাহানারা বেগম। হারেমের কথা শোনান—গরীব হয়ে যাওয়া রইসের ঘরের মেয়েদের দরখাস্ত পেশ করেন। বাদশাহী হারেমের আত্মীয়াদের বৃত্তি, কুমারী মেয়ের বিয়ের যৌতুক মঞ্জুর করেন। এমন কি দিল্লী আগ্রার মুসলমান অনাথ ছেলেমেয়েদের খবর নিয়ে হাজির করেন সামনে। বাদশাহ সাহায্য দেন।

আবার সন্ধ্যায় দেওয়ানী খাসে দরবার হয়। বিশেষ শখে মুশায়ারা হয়। কখনও বড় বড় মোল্লা মৌলভীরা আসেন। ধর্মতত্ত্বের আলোচনা হয়, সমস্যার সমাধান হয়। হিন্দুস্তানে সব থেকে বড় সমস্যা এই কাফেরদের নিয়ে। তারা রসুলাল্লা হজরৎ মহম্মদের পবিত্র ইসলামের সারমর্ম এবং সত্য বুঝবে না। নানান জায়গায় নানান ঝঞ্ঝাট আর ঝামেলা বেধে যায়। এদের মন্দিরের পাথরের গড়া পুতুলকে ঈশ্বর বলে পূজো করে। কিছুতেই বুঝবে না—বুঝতে পারে না বলে বুঝবে না নয়, ইচ্ছে করে বুঝবে না যে আল্লা বেগর মাবুদ

নেই। যিনি আল্লা তাঁর কোন আকার নেই। তিনি নিরাকার। তিনি এক। তিনি সর্বব্যাপী। তবু মানুষের মত হাত পা মুখ চোখ দিয়ে তাঁকে কল্পনা করবে। পাথরের পুতুল তৈরি করে কাঁসর ঘণ্টা বাজনা বাজিয়ে ফুল জল দিয়ে পূজো করবে। ছোট মেয়েতে পুতুল নিয়ে খেলা করে যেমন তেমনি করে খেলা করবে। গাছ পূজো করবে, জন্তু পূজো করবে। ইসলাম—পবিত্র ইসলাম যার শেষ নবী পয়গম্বর হজরৎ মহম্মদ—তিনি ছাড়া আল্লার আদেশ আর কেউ শোনে নি তারপর, তবু এই কাফেররা তাঁর কথা তাঁর এই ইসলামকে মানতে চায় না, বরং মনে মনে বিরোধিতা করবে। এদের গুনাহ সহ্য করে বাদশাহী করতে হয়। তার জন্যে মোল্লাদের মৌলভীদের সঙ্গে পরামর্শ করতে হয়। ফরমান জারি করতে হয়।

লা এলাহা ইল্লাল্লা মহম্মদে রসুলাল্লা—

আল্লা ভিন্ন মাবুদ নাই; মহম্মদ আল্লার রসুল, আল্লার রহমত দুনিয়ায় যারা উত্তম শ্রেষ্ঠ তাদের ওপর; তারা ছাড়া বিলকুল আল্লার দরবারে গুনাহের জন্য শাস্তি পাবে। এ তারা বুঝবে না। শুধু বুঝবে নাই নয় তার দুশমনি করবে। এই কাফের মুলুকে এসে ইসলামের ইজ্জত রাখা সোজা কথা নয়। কত মুসলমান যে ইসলামের নিয়মের কত খেলাপ করছে তার হিসাব নেই। তার খবর রাখা তার প্রতিবিধান তাঁকে করতে হয়।

সন্ধ্যার দেওয়ানী খাসে এক প্রহর পর্যন্ত এই সব কাজ কাম সেরে আবার শাহবুরুজে বৈঠক। তারপর সারাদিনের কাজ শেষ, এখন তিনি হারেমে গিয়ে পোশাক বদল করে রঙমহলে বসে নাচ দেখেন গান শোনেন। তারপর খাওয়া তারপর বিশ্রাম। এই বাদশাহী!

আজ শাহবুরুজে দক্ষিণের কথা তুলেছিলেন উজীর আসফ খান। শাহজাদা ঔরংজীব দক্ষিণের সুবাদার এখন। শাহজাদা দক্ষিণে

বাদশাহী শক্তি পূর্ণ প্রতিষ্ঠার জন্য বিজাপুরে আদিলশাহী আর গোলকুণ্ডায় কুতুবশাহী সুলতানদের একেবারে খতম করতে চান। কাজ সেই রকম ভাবেই করে চলেছেন।

শাহজাদা ঔরংজীব যেমন বুদ্ধিমান তেমনি সাহসী। বুদ্ধি বরং কিছু বেশী। অত্যন্ত কঠিন লোক। কঠোর শাসক।

শাহজাদা খবর পাঠিয়েছেন মারাঠা ডাকু খেলোজী ভোঁসলের সঙ্গে লড়াই ফতে করে তাকে খতম করেছেন। একটা উপদ্রব দূর হয়েছে। লোকটা আগে বিজাপুরের সুলতানের মনসবদার ছিল। তারপর বিজাপুরের সুলতানের নোকরী ছেড়ে বনেজঙ্গলে থেকে ডাকাইতি আর লুঠ এই পেশা করে তুলেছিল। লোকটা খতম হয়েছে। আর মঞ্জুরী চেয়েছেন গণ্ডোয়ানা জায়গীরের রাজার ছেলেকে দেবগড়ের রাজা বলে স্বীকার করা হোক। চার লাখ টাকা সে সুবাদার বরাবর আমানত করেছে। আর শাহজাদা চেয়েছেন বিজাপুর না হোক গোলকুণ্ডার সঙ্গে এখনই লড়াই করে বোঝাপড়া শেষ করা হোক। গোলকুণ্ডার সুলতান কুতুবশাহ শাহানশাহ সাজাহানের দুঃসময়ে সাহায্য করেছিলেন। বাদশাহের সেইখানেই অমত হচ্ছে।

তিনি চুপ করে ভাবছিলেন। তাঁর মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন উজীর আসফ খান আর প্রধান সেনাপতি খানখানান মহবৎ খান।

অবশেষে বাদশাহ বললেন—গোলকুণ্ডা জহরতের খনি। মীরজুমলা কুতুবশাহের মনসবদার—তার কাছে নাকি এমন জহরত আছে যাতে একটা মুল্ক কেনা যায়। কিন্তু তবু সে দিনের কথা আমি কি করে ভুলব? যেদিন বাদশাহ জাহাঙ্গীর আর বেগম নূরজাহান সাহেবার সঙ্গে ঝগড়া করে পালাচ্ছি, মহবৎ খান আর পারভিজ আমার পিছনে ছুটছে। তখন কুতুবশা তাঁর ইলাকার মধ্য দিয়ে আমাকে যেতে দিয়েছিলেন। যেখানে যেখানে ছাউনি করেছি

সুলতানের মনসবদার এসে সালামত দিয়েছে। খানাপিনার যোগাড় করে দিয়েছে। এমন কি সুলতান আমাকে তিন লাখ টাকাও দিয়েছিলেন নজরানা। যতক্ষণ তাঁর কোন দোষ না হয় ততক্ষণ বিনা দোষে তাঁর সুলতানি আমি শেষ করব এ কি করে হয় উজীর-সাহেব? তা হয় না। খোদার দরবারে কৈফিয়ত কি দেব? রসুলাল্লা মহম্মদের নাম নেব কি করে? সে হয় না। শাহজাদাকে লিখে দিন বিনা বাদশাহী হুকুমতে শাহজাদা গোলকুণ্ডার সুলতানের মুঠঠিভর মাটিও যেন কেড়ে না নেন। কাল দেওয়ানী খাসের দু'পহরের দরবারে আমি খত সহি করব।

বাদশাহ শাহবুরুজের দারোগার দিকে চেয়ে বললেন—শাহজাদা দারা সিকো বোধহয় অপেক্ষা করছেন রাজৌরীর রাজাকে নিয়ে। দেখ—আসতে বল।

ইঙ্গিত বুঝে খানখানান আসফ খান আর মহবৎ খান অভিবাদন জানিয়ে শাহবুরুজ থেকে বেরিয়ে গেলেন। তাঁরা যেতেই দারোগাও বেরিয়ে গেল। শাহানশাহের কপালে আবার কুঞ্চনরেখা ফুটে উঠল। তিনি উঠে বারকয়েক পায়চারি করে নিজেকে শান্ত করে আবার এসে আসনে বসলেন।

রাজৌরীর রাজা মহারাজা রাজু তাঁর সঙ্গে প্রতারণা করেছেন। তিন বছর আগে তিনি রাজাকে লিখেছিলেন—বাদশাহ দেখেছেন যে কাশ্মীরে গুলেকমল ফোটে। তার মত ফুল তামাম হিন্দোস্তানে নাই। বসরাই গুলাব যে গুলাব তাও তার কাছে শরম পায়। বাদশাহ শুনেছেন কি রাজাসাহেবের অন্দরের বাগিচায় যে ঝিল আছে তাতে যে গুলেকমল ফোটে তার নাকি তুলনা কাশ্মীরেও মেলে না। বাদশাহ ইচ্ছা করেছেন কি এই এক গুলেকমল তিনি বাদশাহী হারেমে এনে শাহজাদা ঔরংজীবের গলায় মালার সঙ্গে গেঁথে দেবেন। রাজাকে তাঁর মেহমান হবার ইজ্জত আর কদর দিয়ে বাদশাহ খুশী হতে চান। তাই তাঁর অন্দরের সব থেকে সুন্দরী

কুমারী কন্যাকে উপযুক্ত মর্যাদার সঙ্গে নিয়ে আসবার বন্দোবস্ত করে তাঞ্জাম, সওয়ার, মনসবদার পাঠাবেন।

রাজৌরীর রাজা সানন্দেই সম্মতি জানিয়েছিলেন। তাঁর কন্যাকে উপযুক্ত উপঢৌকন হীরা জহরত সোনাদানা কাশ্মীরী শাল গালিচা কামদার আসবাব এবং তার সঙ্গে কাশ্মীরী হিন্দু বাঁদী সঙ্গে দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। শাহানশাহ কন্যা দেখে বহুত খুশী হয়েছিলেন, শুধু রূপবতী নয় গুণবতী কন্যা। খাঁটি রাজপুত কন্যা। ইসলামের কলমা পরেও কাঁদত। তারপর ক্রমে সে ইসলামের তত্ত্ব বুঝেছে। আর তা ছাড়া বাদশাহী হারেমের কানুন কায়দা সুন্দর আয়ত্ত করেছে। এই সব হিন্দু মেয়েদের একটা গুণ আছে। সেটা স্বামী ভক্তি। তাঁর বাবার মা শাহানশাহ আকবর শাহের পত্নী যোধাবাঈকে মনে পড়ছে। তাঁর নিজের মা ছিলেন মোটারাজা উদয় সিংহের বেটী মানমতী। তাঁকে মনে পড়ছে। তাঁদের গুণ আছে এই বেটীর মধ্যে।

নবাববাঈ রহমৎউন্নেসা বেগম বড় ভাল মেয়ে। তার কোলে ইতিমধ্যেই এক বেটী এসেছে; জেবউন্নিসা বেগম নাম দিয়েছেন তিনি। সেও গুণবতী মেয়ে হবে। জাহানআরার মত।

সবই ঠিক। এতে তাঁর আক্ষেপের কিছু নেই। কিন্তু রাজা তাঁকে প্রতারণা করেছেন, ঝুটা বাত বলেছেন, ফেরবাজি করেছেন। পরে তিনি সেটা জেনেছেন।

নবাববাঈ রাজার আপন বেটী নয়। আর হিন্দুও নয়। তার মা হিন্দু কিন্তু তার বাপ মুসলমান ফকীর। তিনি নাকি সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। তার এই বেটীকে তার বাচপন থেকে রাজা আপন অন্দরে নিয়ে হিন্দু বলে প্রচার করেছেন আর তাকে সেই ভাবে মানুষ করেছেন।

লা এলাহা ইলাল্লা মহম্মদে রসুলাল্লা। ইসলামের উপর এর চেয়ে যে বড় অন্যায় দাগাবাজি হতে পারে না। কি হত যদি নবাববাঈ

রহমৎউন্নেসা বাদশাহী হারেমে না আসত! তা হলে তো এত বড় এক সিদ্ধ পুরুষ ফকীর সাহেবের বেটী আজ কোন এক কাফেরের ঘরে কাফেরী মতে মাথায় কপালে সিঁদুর লেপে পাথরের পুতলীকে ভাবত ঈশ্বর!

খবরটা তিনি পেয়েছিলেন বিয়ের কিছুদিন পরেই। দুরন্ত গোস্বা হয়েছিল তাঁর। ইচ্ছা হয়েছিল চষে দেন রাজৌরী। কিন্তু ওই বধূটির মুখের দিকে তাকিয়ে তা তিনি করেন নি। আরও কারণ ছিল। দুশমনেরা হাসবে। হিন্দুরা কানাকানি করবে হিন্দুস্তানে। আর ইরান তুরান আফগানিস্তান পর্যন্ত খবরটা যাবে, সেখানকার দরবারে এই নিয়ে মুস্করা চলবে।

হিন্দোস্তানের বাদশাহ যে নিজে খেতাব নিয়েছে সাহজাহান তাকে হিন্দোস্তানের এক কাফের জমিদার স্রিব বেওকুফ বানিয়ে দিয়েছে। আর প্রকাশ হয়ে পড়বে হিন্দুস্তানেব বাদশাহী ইলাকায় ইসলাম বেতব্বিরে বরবাদ হতে চলেছে।

দারোগা এসে অভিবাদন করে এত্তেলা জানালে—শাহজাদা আর রাজাসাহেব।

বাদশাহ তাকিয়ে ছিলেন বাইরের দিকে। তিনি ফিরে তাকালেন। রাজাকে তিনি ক্ষমা করেছেন। ভ্রূকুটি কপালে মিলিয়ে গেল না, কিন্তু একটু হাসি তাঁর ঠোঁটে ফুটে উঠল।

পাঁচ

শাহানশাহ কপালে ভ্রূকুটি এবং মুখে হাসি নিয়ে তাকিয়ে ছিলেন দরজার দিকে। শাহজাদা দারা সিকো এবং রাজৌরী অধিপতি রাজা রাজু এসে ঢুকলেন—অভিবাদন করে শাহজাদা সরে দাঁড়ালেন—রাজা রাজু এবার কুর্নিশ করে শাহজাদার পাশে দাঁড়ালেন।

শাহানশাহ বললেন—বসুন রাজাসাহেব। শাহজাদা দারা সিকো, তুমিও বস। মধ্যে মধ্যে তুমি শাহানশাহের নামে সেকায়েত করো কি হিন্দোস্তানের বাদশাহ অনুদার!

দারা সিকো অভিবাদন করে বললেন—শাহানশাহ অনুদার এ কথা কখনও বলতে পারি না আমি। কখনও বলি না। শাহানশাহ শুধু হিন্দোস্তানের বাদশাহই নন, তিনি আমার আব্বাজান। তাঁর থেকেই আমি দুনিয়ায় পয়দা হয়েছি, তাঁর অফুরন্ত স্নেহে আমি ধন্য—দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান। তবু আমি বলি শাহানশাহ আরও উদার —মাথার উপরের ওই আসমানের মত উদার হোন, যেখানে লাখো লাখো ক্রোড় ক্রোড় 'সিতারা' আর গজ্‌ম্‌ ছোট বড় সবই যেমন সমান আদরে ঠাঁই পায় তেমনি ভাবেই শাহানশাহ উদার স্নেহে তাঁর মুসলমান হিন্দু আমীর রাজা গরীবান ফকীর সাধু সকলকে দেখবেন। আসমানের তারাগুলোর কেউ নীলা, কেউ কিছুটা লালচে, কেউ সফেদ—তার জন্য আসমান যেমন কোন ফরক্ করে না তেমনি তিনিও ফরক্ করবেন না।

—ওয়া ওয়া! শাহজাদা দারা সিকো এক সঙ্গে কবি বটেন আবার দার্শনিকও বটেন। ঠিক বাত—ঠিক বাত বলেছ তুমি দারা সিকো। কিন্তু আমার প্রিয়পুত্র, তুমি কি কখনও দিনের আসমানের দিকে তাকিয়ে দেখেছ? রাত্রের আকাশে জরুর লাখো লাখো ক্রোড় ক্রোড় তারা—কেউ নীলা, কেউ পীলা, কেউ লালী, কেউ সফেদ ফুটে থাকে ঝকমক করে; কিন্তু সুবা যেই হয়—যেই আফতাব সূরয যে

মুহূর্তে ওঠেন তখন তারা কেউ থাকে না। থাকে কিন্তু থেকেও থাকে না। কি রাজাসাহেব, আপনি বলবেন আসমানকে কি তার জন্যে অনুদার বলা যায়?

রাজা রাজু আড়ষ্ট হয়েই বসে ছিলেন। তার বুকের মধ্যে হৃদ্‌পিণ্ডের স্পন্দন তিনি নিজেই অনুভব করছিলেন। গলা শুকিয়ে আসছিল। পিতাপুত্রের এই আলোচনার মধ্যে তিনি জড়িয়ে রয়েছেন তা তিনি বুঝতে পারছিলেন কিন্তু তাঁকে যে অতর্কিতে প্রশ্ন করবেন শাহানশাহ তা তিনি ভাবেন নি। তিনি একটু চমকে উঠলেন, কোন রকমে সামলে নিয়ে বললেন—বেশক্! বেশক্! এর চেয়ে আর বড় সত্য কি হতে পারে এই দুনিয়ার মধ্যে? এবং এই সত্য হিন্দোস্তানের শাহানশাহের চেয়ে আর কে বেশী বুঝতে পারে?

—শাহজাদা, তুমি কি বল?

—রাজাসাহেব ঠিক বলেছেন জাঁহাপনা!

—হাঁ। এ খোদার মরজি। তার যে রোশনি তা সুরয আফতাবের মধ্যেই সব তিনি ঢেলে দিয়েছেন। বাকী ক্রোড় ক্রোড় নক্ষত্র তার ছিটেফোঁটা পেয়েছে। ক্রোড় ক্রোড় তারা রাত্রের আসমানে জ্বলে কিন্তু তাতেও দুনিয়ায় আলো হয় না। শুধু তাই নয় তারা তাপও দিতে পারে না যাতে এই দুনিয়ার জান বাঁচে। নয় কি?

—নিশ্চয় পিতা নিশ্চয়। এ কথা কে অস্বীকার করবে?

—হেসে বাদশাহ বললেন—অস্বীকার করবার উপায় কি শাহজাদা! খোদা দুনিয়ার কল্যাণের জন্য রোশনির হদিস পয়গম্বর রসুল হজরত মহম্মদকে জানিয়েছিলেন ফেরিস্তা মারফত। দুনিয়ায় বাবা আদমের কাল থেকে হাজারো হাজারো বরষ ধরে এই সব তারা-নক্ষত্র দুনিয়ার আঁধিয়ারা দূর করতে পারে নি; গুনাহে ভরে গিয়েছিল দুনিয়া। যেদিন পয়গম্বর রসুল হজরত ফেরিস্তা মারফত ইসলামের হদিস পেলেন সেই দিন থেকে দুনিয়ায় রাত্রির আঁধিয়ারা দূর হল আর 'জাড়া' দূর হল। দুনিয়াতে আলো হল তাপ হল

ফুল ফুটল পাখী ডাকল। তার আগে রাতের আঁধিয়ারায় জানবার যেমন জানবারী করে বেড়ায় তেমনি ছিল দুনিয়ার হাল। তাই থেকে যেত!

শাহানশাহ এবার রাজা রাজুর দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে তাঁকেই বললেন—রাজাসাহেব যদি একবার শাহজাদা ঔরংজেবের বেগম নবাববাঈ রহমৎউন্নিসাকে দেখতে পেতেন তাহলে এ কথা যে কত সত্য তা বুঝতে পারতেন। কাশ্মীরের 'গুলেকমল'—সে এই ইসলামের রোশনিতে যে বাহার যে খসবু নিয়ে ফুটছে আজ, তেমন করে সে কখনই ফুটতে পারত না যদি হিন্দুদের কাফেরি ধর্মের নক্ষত্রের নীচেই থাকত আজও।

শাহানশাহের কণ্ঠস্বরে ঈষৎ উত্তাপের স্পর্শ লাগল যেন। শঙ্কিত হয়ে উঠলেন শাহজাদা দারা সিকো—রাজৌরীর রাজা ঘর্মাক্ত হতে শুরু করলেন, কপালে স্বেদ বিন্দু ফুটে উঠল।

রাজা রাজু আসন থেকে উঠে নতজানু হয়ে বসে বললেন—আমার অপরাধ আমি স্বীকার করেছি জাঁহাপনা। আবার আজও করছি!

—আমি আপনাকে মাফ করেছি রাজাসাহেব। যেদিন নবাববাঈ মথুরায় শাহজাদা ঔরংজীবকে তার প্রথম পুত্রসন্তান উপহার দিয়েছে সেই দিন মাফ করেছি। আর মাফ করেছি আমার পুত্রবধূ নবাববাঈয়ের গুণ দেখে। হাঁ। সে গুণবতী মেয়ে। চাঁদের মত সে ঠাণ্ডা! তেমনি তার রোশনি! ইরানের শাহজাদী দিলরাস বানু একটু বেশী তেজী! শাহজাদা ঔরংজীবের নিজেরও উত্তাপ বেশী! তার জিন্দিগীতে নবাববাঈ তাকে ঠাণ্ডি হাওয়ার মত আরাম দেবে!

আশ্বস্ত হলেন দারা সিকো।

শাহানশাহ রাজাকে বললেন—উঠুন রাজাসাহেব, আপনি আমার মেহমান, উঠুন। বসুন, বসুন। শাহজাদা, আমাদের মেহমানকে শরবত পান তুমি নিজের হাতে এগিয়ে দাও।

শাহজাদার ইঙ্গিতে বহুমূল্য কাশ্মীরী গোলাই ত্রিপয়ের উপর

থেকে শরবতের পরাত তুলে ধরলে একটি সুবেশা সুন্দরী বাঁদী। সে অন্তরালেই ছিল, শাহজাদার ইঙ্গিতে বেরিয়ে এল।

শাহানশাহ বললেন—একে চিনতে পারেন রাজাসাহেব?

রাজাসাহেব মেয়েটির মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

—চিনতে পারছেন না? হাসলেন বাদশাহ। তারপর বললেন —আমার গোস্তার খবর জেনে আপনি আমাকে পঁচিশজন হিন্দু লেড়কী বাঁদী পাঠিয়েছিলেন, এ তাদেরই একজন। দেখুন তো পাহাড়ীয়া কাফেরের বেটী বলে চেনা যায়? তারপর মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—বল্ রে শিরিন তখন তোর নাম কি ছিল রাজাসাহেবকে বল্। ওর নাম দিয়েছি আমি শিরিন। আজ যখন দেওয়ানী খাসে যাই তখনই দরোগাকে বলেছিলাম কাশ্মীরের রাজার পাঠানো এক বাঁদীকে যেন আমার কাছে পাঠায়; আপনাকে দেখাব বলেই ডেকেছিলাম। বাঁদী এসে দাঁড়াল। মেয়েটা বড় খুবসুরত, আর সদ্য ফোটা তাজা ফুলের মত ওর একটা খুসবয় যেন নাকে এল। একবার নাকের কাছে তুলে ধরে খুসবয় পরখ করবার ইচ্ছেও হল। দেখলাম ওর নাকের পাশে ঠোঁটের উপর একটা তিল। সে একটা অপূর্ব বাহার। যেন গুলাবের বনে থোকা থোকা ফোটা গুলাবের মধ্যে একটা কালো পাখী এসে বসেছে। ছোট একটি কালো পাখী। আমি ওকে ডেকে সেইখানেই একটি চুম্বন করে ওর খুসবয়ের স্বাদ নিতে গেলাম। কিন্তু তারপরই দেখলাম গুলাবের গুচ্ছের মত মুখের মধ্যে বসে ছিল যে কালো পাখীটা সে আর নেই, উড়ে গেছে! ঠিক সেই সময় একটা কৌয়া উড়ে গেল জানলার আলসে থেকে। মনের মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে ওই আজকের কথাটা গুনগুন করে উঠল —"জাঘ্ অজ্ দহান পরীদ্।" মুচকে মুচকে হাসতে লাগলেন বাদশাহ।

রাজা বললেন—শাহানশাহ সুন্দরের কদরদান—তিনি ছাড়া এমন উপমা কার মনে আসবে।

—কিন্তু তোমার ওই শায়র সুভগটি কে রাজাসাহেব? ঠিক আমার যা ঘটেছে তা না ঘটলে তো এই গজল্ কেউ বানাতে পারে না! ও কিছু দেওয়ানা বলে মনে হচ্ছে!

—হাঁ জাঁহাপনা ও দেওয়ানাই বটে!

—মহব্বতি?

রাজাসাহেব চুপ করে রইলেন। শাহানশাহ হাসতে লাগলেন। শাহজাদা দারা সিকোর দিকে তাকিয়ে বাদশাহ বললেন—শাহজাদা কি কিছু জানতে পেরেছেন ওই দেওয়ানা কবির দিলের কথা? সে যেন কাঁদছিল মনে হয়েছিল আমার।

শাহজাদা দারা সিকো চুপ করে রইলেন। রাজাসাহেব বললেন—শাহানশাহ, কবি সুভগ একে কবি তার উপর বয়সে নবীন। দিল বড় নরম। সামান্য কাঁটা বিঁধলেই মনে হয় বুঝিবা তাঁর কলিজাই এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে গেল।

—কিন্তু সে কাঁটাটি কিসের কাঁটা রাজাসাহেব?

শাহজাদা দারা সিকো এবার বললেন—জ`াহাপনা হিন্দোস্তানের বাদশাহ, হিন্দোস্তানের বাদশাহীর কিস্মত আর কদর সারা জাহানের বাদশাহীর কিস্মত আর কদরের চেয়ে বেশী। তবুও হিন্দোস্তানের বাদশাহ যখন কিল্লার ঝরোকার পাশে বসে যমুনার ওপারে আমার মায়ের কবরের দিকে তাকিয়ে থাকেন—তার উপর তাজমহলের যে ইমারত গড়ে উঠছে তাই দেখেন তখন হিন্দোস্তানের বাদশাহীও তাঁকে আনন্দ দেয় না! এ কাঁটা জ`াহাপনা সেই কাঁটা।

চুপ করে রইলেন বাদশাহ। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। তারপর বললেন—মৌলানা রুমী বলে গিয়েছেন—

"জুম্লহ্ ম-অশূক্ অস্ত্ র আশিক পরদয়ি।
জিন্দহ্ ম-অশূক্ অস্ত্ র আশিক মরদয়ি।"

হাঁ বেটা, মানুষের কলেজায় যখন সত্যিকারের মহব্বতি জাগে

তখন এমনই হয়। তখন "যাকে ভালবাসি যে প্রেমাস্পদ সেই সত্য—সেই হয়ে ওঠে প্রাণ আর যে ভালবাসে সে হয় তার আবরণ দেহের মত। প্রেমাস্পদ বেঁচে থাকে—প্রেমিক যে সে ভালবাসার সঙ্গে সঙ্গেই মুর্দা হয়ে যায়।" প্রাণের অভাবে দেহের কি কিস্মত, দুনিয়ারই বা কি কিস্মত বল ?

তাঁর বেদনার্ত কণ্ঠস্বরে শাহবুরুজের বাতাস যেন ভারী হয়ে উঠল। শাহজাদা এবং রাজা রাজুও দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চুপ করে রইলেন।

শাহানশা একটু পরে আবার বললেন—শাহজাদা, আমি এই শায়রকে যে পুরস্কার দেব বলেছি সে তো দেবই। তার উপরেও যদি কিছু প্রার্থনা থাকে তবে বলো—তা আমি নিশ্চয় পূরণ করব।

শাহজাদা বললেন—শাহানশাহের হুকুমৎ পেলে আমি জাঁহাপনার কাছে দুঃখের কথা পেশ করতে পারি।

—নিশ্চয়। নিশ্চয়। এমন যে কবি তার দুঃখ দূর করা আমার কর্তব্য। বল—বল শুনি! কবি সুভগের 'ম-অশূক্' যদি হারিয়ে গিয়ে থাকে তবে আমি জরুর তার খোঁজ করে বের করে দিতে হুকুম দেব। আর যদি বেঁচে না থাকে তবে আমি তার কবরের উপর এক ছত্রি বানিয়ে দেব। বল।

—জাঁহাপনা ইচ্ছে করলে কি না হতে পারে। তবে কবি সুভগের ম-অশূক্ মরে যায় নি। সে বেঁচে আছে। রাজাসাহেব যখন জাঁহাপনাকে পঁচিশ জন রূপসী কাশ্মীরী বাঁদী পাঠান তখন কবি সুভগের ম-অশূক্‌কেও তাদের সঙ্গে এখানে পাঠিয়েছিলেন। কবি সুভগ তখন গরীব এবং বয়সও অনেক কাঁচা ছিল। তিনি কি করবেন? গরীব এক কাশ্মীরী চাষার বেটা; তার বাপ রাজাসাহেবের কাছে টাকা পেয়ে খুশী হয়ে তাকে দিয়ে দিয়েছিল। বেটী বাদশাহ হারেমে যাবে সুখে থাকবে। আপসোসও ছিল না। কবি সুভগ তখন থেকেই দেওয়ানা। রাজাসাহেব পরে শায়র

সুভগকে জানতে পারেন। উনি শায়রকে তাঁর দরবারে ডেকে রাখতে চেয়েছেন কিন্তু শায়র আসে নি। এবার তিনি মুশায়ারার জন্যে সুভগকে ডেকে তাঁর সঙ্গে আসবার জন্যে অনুরোধ করেন। শায়র সুভগ এবার না বলে নি। সে এসেছে। দরবারে মুশায়ারার সময় যখন শাহানশাহ প্রথমেই 'জাঘ্ অজ্ দহান পরীদ্' শায়রদের সামনে রাখেন তখন উজীর-সাহেব বলেছিলেন প্রথমে তুরানের সুলতানের চিঠ্ঠির জবাব বহুৎ জরুরী সুতরাং তার ফয়সালা আগে দরকার।

—হাঁ হাঁ পহেলেই তার জবাবই দিয়েছিল শায়রে শের কালিম।

—হাঁ শাহানশাহ। এরই মধ্যে শায়র সুভগের কাছে এসে পৌঁছে গিয়েছিল 'জাঘ্ অজ্ দহান পরীদের' ভিতরের কিস্সা। শাহজাদা মহিউদ্দীন মহম্মদ ঔরংজীবের বেগম-সাহেবা নবাববাঈয়ের কাছে যে সব উপঢৌকন পাঠিয়েছেন তাঁর বাপ রাজাসাহেব, তার সঙ্গে আগ্রা এসেছেন এ খবর যেমন পৌঁছেছিল তেমনি এ খবরও পৌঁছেছিল যে কবি সুভগ এসেছে তাঁর সঙ্গে মুশায়ারায় বাদশাহকে কুর্নিশ জানাতে।

চুপ করে গেলেন শাহজাদা দারা।

সাজাহান বললেন—হাঁ। তারপর?

শাহজাদা বললেন—জাঁহাপনা, কে যে একসময় এসে তার হাতে এক খত দিয়ে যায় তা শায়র সুভগ জানে না তবে এক খত সে পায়—তাতেই ছিল জাঘ্ অজ্ দহান পরীদের মত মজবুদ তালাবন্দী ডিব্বার তালার কুঞ্জী! এ কুঞ্জী ম-অশূকের পাঠানো—তাতে শায়র সুভগের সন্দেহ থাকে নি। তাই তার দোনো আঁখো ভরে গিয়েছিল পানিতে। যা ছাপিয়ে ছাপিয়ে টপটপ করে ঝরে পড়েছে বাদশাহের সামনে।

শাহানশাহ সাজাহান তামাম হিন্দোস্তানে মহব্বতির সেরা জহুরী। যমুনার ওপারে যে তাজমহল গড়ে উঠছে তাই তার প্রমাণ। আরও প্রমাণ নাচা-গানার প্রতি, মসনভী গজলের প্রতি প্রবল আকর্ষণে। লোকে অপবাদ দেয় তিনি মদ্যপ্রিয় বলে। কিন্তু শাহানশাহ

সাজাহান মদ খুবই কম খান। শাহজাদা খুরম যখন তিনি তখন চব্বিশ বছর বয়স পর্যন্ত মদ ছোঁন নি। তাঁর আব্বাজান শাহানশাহ বাদশাহ শাহ জাহাঙ্গীর শাহজাদার চব্বিশ বৎসরের জন্মদিনে নিজে হাতে তাঁর হাতে সিরাজীর পিয়ালা তুলে ধরে বলেছিলেন—খাও, এ খেতে হয়। এ না খেলে বাদশাহগিরি করবে কি করে। তারপর কিছুদিন তিনি শিরাজী অল্প অল্প মাত্রায় পান করেছেন বটে কিন্তু তারপর আবার ছেড়েও দিয়েছেন। তবে মহব্বতির ইলাকায় তার মর্ম বুঝবার মত রসিক খুব কম।

শাহানশাহ হেসে বললেন—তা হলে যে গুলাবের গুচ্ছের উপর থেকে ছোট কালো পাখীটি উড়ে গেছে সেই গুলাবের গুচ্ছের খুসবয় থেকেই দেওয়ানা হয়েছে শায়র সুভগ! শিরিন কি চলে গেছে? তাকে কি তুমি যেতে হুকুম দিয়েছ?

—আমি হুকুম দিই নি জাঁহাপনা, দরোগা বললে এই হুকুমই জাঁহাপনার দেওয়া ছিল।

—হাঁ হাঁ! সেই হুকুমই দেওয়া ছিল আমার। শিরিন থাকলে তার মহব্বতি আর তার বুদ্ধির জন্যে কিছু ইনাম দিতাম।

তারপর হেসে বললেন—বেশ তো শায়র সুভগ আর শিরিনের মহব্বতি যখন এখনও পর্যন্ত চেরাগের মত জ্বলছে, তখন তাদের সাদীর ব্যবস্থা কর! শায়র সুভগকে কোন নোকরী দাও! কি রাজাসাহেব—বাদশাহ কি অনুদার?

শাহজাদা দারা সিকো বললেন—জাঁহাপনা আসমানের মতই উদার, কিন্তু জাঁহাপনা, আসমান যখন মেঘের ঘনঘটার ভাণ্ডার থেকে জল ঢেলে দেয় মুষলধারে তখন সে জল মিট্টির দুনিয়া ধরতে পারে না—সে জল নেমে দরিয়ায় নামে—দরিয়ার দুই কূল তাকে ধরতে পারে না, ছাপিয়ে তুফান বইয়ে দেয়। জাঁহাপনার এই অনুগ্রহ ধরবার ক্ষমতা সুভগের নেই। সে কথা সে আমাকে বলেছে। আমি এ কথা বলেছিলাম তাকে। বলেছিলাম চোখের পানি তুমি মুছে ফেল

শায়র সুভগ—শাহানশাহ সাজাহানের মত মহব্বতির সমঝদার কেউ নেই। তিনি নিশ্চয়ই তোমার ম-অশ্রুকে তোমাকে ফিরিয়ে দেবেন। মেঘের ঘনঘটার যে কথা বললাম আমি সে কথা আমার নয়—সে কথা শায়র সুভগের। সে বললে আমি দুনিয়াও নই—সামান্য একটা মাটির ঢিপি—তারই মধ্যে ছোট্ট একটা নালার মত আমার পানি ধরবার পাত্র। এ অনুগ্রহের বর্ষণ ধরবার ক্ষমতা আমার নেই শাহজাদা। আমি হিন্দু—আমি গরীবান ঘরের ছেলে—বাপ চাষবাস করে। সে এখন বাদশাহী হারেমে এসে মুসলমান হয়ে গেছে। আমি তো মুসলমান হতে পারব না!

বাদশাহের কিছুক্ষণ পূর্বের প্রফুল্ল মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। একটু চুপ করে থেকে বললেন—রাজাসাহেব, আপনি তাকে বলুন হিন্দোস্তানের বাদশা এতে খুশী হবেন। পয়গম্বর রসুলাল্লার আশীর্বাদ পাবে। দীন আর দুনিয়ার একমাত্র মালিক খোদা তার প্রতি প্রসন্ন হবেন।

শাহজাদা দারা সিকো শাহানশাহ বাদশাহ সাজাহানের প্রিয়তম পুত্র—একমাত্র জ্যেষ্ঠা ভগ্নী জাহানআরা পিতৃস্নেহে তাঁর মত ভাগ্যবতী। বাদশাহের আমীর ওমরাহ সকলেই গোপনে কানাকানি করে যে, শাহজাদা দারা সিকো বাদশাহকে একরকম পুতলী বানিয়ে ফেলেছে। শাহজাদা অন্যায় আবদার করলেও বাদশাহ তা না রেখে পারেন না। এর জন্য আর তিন শাহজাদা—শাহ শুজা শাহজাদা ঔরংজীব শাহজাদা মুরাদবক্স তার সঙ্গে শাহজাদী বেগম রৌশনআরা মনে মনে ক্ষুব্ধ; শাহজাদা ঔরংজীব এবং রৌশন-আরা অবশ্য বেশী। কিন্তু শাহানশাহ সেদিকে ভ্রুক্ষেপহীন—অন্ধ। শাহজাদা দারা সিকোও তাঁর এই সৌভাগ্য ও অধিকার সম্বন্ধে পূর্ণমাত্রায় সচেতন। দারা সিকো প্রকৃতিতে দার্শনিক, ইসলামী শাস্ত্রের সঙ্গে তিনি কাফেরদের শাস্ত্র পড়েন, কেরেস্তানী শাস্ত্র পড়েন, ইহুদীদের শাস্ত্র পড়েন, মৌলবী পণ্ডিত পাদরী রাব্বিদের সঙ্গে

আলোচনা করেন। সকলে বলে শাহানশাহ জালালুদ্দিন আকবর শাহের পথের ভক্ত তিনি। গোঁড়া মুসলমান মৌলানা এবং মৌলবীরা আকবর শাহকে 'দজ্জাল' বলে থাকে তা জেনেও দারা সিকো তাঁর জীবনে শাহানশাহ জালালুদ্দিন আকবর শাহকেই তাঁর আদর্শ করেছেন। তিনি জানেন তিনিই হিন্দোস্তানের ভাবী বাদশাহ। সে প্রশ্রয় স্বয়ং বাদশাহই দিয়েছেন। বাদশাহের কথায় তিনি মধ্যে মধ্যে তাঁর নিজের স্বাধীন মত প্রকাশ করবার সাহসও রাখেন। তবে পুত্রোচিত বিনয়ের সঙ্গে ও হিন্দোস্তানের বাদশাহের প্রতি উপযুক্ত সম্ভ্রমের সঙ্গেই সে কথা বলে থাকেন। এবার শাহজাদা বিশেষ সম্ভ্রম জানাবার জন্যই অভিবাদন করে বললেন—শাহানশাহ তাঁর পুত্র এবং বান্দা দারা সিকোর গোস্তাকী মাফ্ করবেন যদি আমি একটা আরজি তাঁর সামনে পেশ করি।

শাহানশাহ মুখ তুললেন—কপালে তাঁর ভ্রূকুটী জেগেছে ক্ষীণ রেখায়। তিনি বললেন—শাহজাদা দারা সিকো নিশ্চয় জানেন যে, শাহানশাহ সকল প্রজারই আরজি শুনে থাকেন। পেশ কর, তোমার আরজি পেশ কর।

আবারও অভিবাদন করে শাহজাদা বললেন—বান্দা শুনেছে সিন্ধ মুলুক থেকে জম্মু কাশ্মীর পর্যন্ত ইলাকায় মুসলমান আর হিন্দু পাশাপাশি হাজার বরষ ধরে বাস করে আসার ফলে তারা কে হিন্দু কে মুসলমান এ নিয়ে ঝগড়া প্রায় ভুলে গিয়ে বাবা আদম আর ইভের সন্তান হিসেবে বাস করে এসেছে। তাদের মধ্যে মুসলমানের বেটা যেমন সাদী করেছে হিন্দুর বেটীকে তেমনি হিন্দুর বেটাও সাদী করেছে মুসলমান লেড়কীকে। তাতে মুসলমান লেড়কার জাত কখনও যায় না—ইসলাম উদার। হিন্দু কেরেস্তান ইহুদী যে আসুক তার মধ্যে আশ্রয় পায়। হিন্দুরা এ বিষয়ে গোঁড়া। ওই ইলাকা ছাড়া অন্য ইলাকায় এখনও সে গোঁড়ামি আছে তাদের। এখানেই শুধু মানুষে মানুষে পাশাপাশি বাস করে তারা হিন্দু

না, মুসলমান না, মানুষ হয়ে গিয়েছে। সেই নজীরে কি শায়র সুভগের সঙ্গে এই শিরিনের সাদী হয় না? হতে পারে না? শাহান-শাহই রেওয়াজ ফরমান জারি করে বন্ধ করেছেন!

বাদশাহ সাজাহান বললেন—খোদাতয়লার অসীম করুণা হিন্দোস্তানের বাদশার উপর যে তিনি সময়ে জানতে পেরেছেন এই রেওয়াজের কথা। এবং ফরমান জারি করে তা বন্ধ করেছেন। রাজৌরীর রাজা এদিক দিয়ে যেমন অপরাধী তেমনি এ রেওয়াজের কি ফল তা আমাকে দেখিয়ে দিয়ে আমার ধন্যবাদভাজন! আমি রাজাসাহেবকে তাঁর কন্যা চেয়েছিলাম শাহজাদা ঔরংজীবের জন্যে। তিনি পাঠালেন কন্যা। দেখলাম সে কন্যা রূপবতী গুণবতী কিন্তু কাফের বলে তার আর খোদার দরবারে গুনাহের শেষ নেই। সে পুতুল পূজো করতে না পেয়ে কাঁদত। আরও বহুৎ গুনাহ। হাঁ কাফেরদের ঘরের বেটীর এ হয়ে থাকে। আমার মা ছিলেন রাজপুতের মেয়ে—আমার দাদীও ছিলেন তাই। যোধাবাঈ। আকবর শাহকে দজ্জাল বলে মৌলানারা। তারা অকারণ বলে না। যোধাবাঈ কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়ে এই আগ্রা কেল্লার মধ্যে পুতুল পূজো করেছেন, পট পূজো করেছেন। তুলসী গাছ পুঁতে তাও পূজো করেছেন। আমার আম্মাজান—তিনিও পুরা ইসলামী হতে পারেন নি! তবু তাঁরা মসজেদে গিয়ে খোদার কাছে গুনাহের জন্য মাফ্ চেয়েছেন। কিন্তু রাজা সাহেব যাকে পাঠালেন সে—। তুমি জান সে কথা শাহজাদা?

—জানি জাঁহাপনা। রাজৌরীতে এসেছিলেন এক পীর—

—সে পীর কে তুমি জান? মক্কা শরীফের পীর সৈয়দ আবদুল কাদির জিলানীর বংশধর পীরসাহেব সৈয়দ শাহ মীর। পয়গম্বর রসুলের পবিত্র বংশের সঙ্গে নিকট সম্পর্ক। পুত্র, দুনিয়া ভোর চেয়ে দেখ মাটির সঙ্গে মিশে আছে পাথর। সে পাথরের কত রঙ কত বাহার কত ঢঙ। খোদাতয়লারই সব সৃষ্টি কিন্তু তবু

তার মধ্যে আছে কোহিনূরের মত জহরত হীরা পোখরাজ নীলা। তারাও পাথর তবু তার কদর আলাদা! কেন আলাদা জান। রোশনি তাতে পড়বামাত্র তারা ঝলমল করে ওঠে। এই সৈয়দবংশ তাই। সেই হজরত পীর সৈয়দ মীর সাহেবের প্রতি শ্রদ্ধায় চুম্বকের প্রতি লোহার মত আকৃষ্ট হয়ে রাজাসাহেব পীরসাহেবের সঙ্গে তাঁর বেটীর সাদী দিয়ে ধন্য হয়েছিলেন। কি রাজাসাহেব আমি ঠিক বলছি?

কুর্নিশ করে রাজা রাজু বললেন—শাহানশাহ কখনও বেঠিক কথা বলেন না জাঁহাপনা।

বাদশাহ বললেন—হাঁ। ধন্য হয়েছিলেন রাজাসাহেব। সেই বেটীর এই বেটী—পীরসাহেব সৈয়দ শাহ মীরের বেটী—সৈয়দ-বংশের পবিত্রতা তার রক্তে। পীরসাহেব পত্নীর মৃত্যুর পর হজ করতে গেলেন আর ফিরলেন না। রাজাসাহেব হিন্দু। তিনি এই বেটীর বেটীকে ঘরে এনে কাফের ধর্মে তাকে বিশ্বাস করালেন। নিজের বেটী বলে জানালেন সকলকে। আগ্রার হারেমে তাকেই পাঠালেন নিজের বেটী বলে। দেখলাম কি জান—দেখলাম এই শাহানশাহের তাজের কোহিনূরের মত জহরত যা তার উপর পাথরের ছিল্‌কের মত ছিল্‌কে পড়ে গেছে। পুত্র, এই বেটী যদি আগ্রার হারেমে এসে ইসলামকে আবার ফিরে না পেত তবে কোন কাফেরের ঘরে যেত এবং তার সারা জিন্দগী সে কাফের লেড়কীর মত পুতুল পট গাছ পূজো করত—শেষ পর্যন্ত সহবতের দোষে বিলকুল পাথরই বনে যেত। সারা ছুনিয়ার আসমানে যেমন আফতাব সূরয, সারা ছুনিয়ায় ইসলামও ঠিক তাই। সেই আলো সেই তাপ যারা পেয়েছে, রাত্রের আঁধিয়ারায় তারা ফিরে গেলে জানবার হয়ে যাবে। খোদাতয়লার কাছে সে গুনাহের শেষ নেই। এতবড় গুনাহ এতবড় ইসলামের বেইজ্জতি হিন্দুস্তানে যদি ঘটে তবে তার সব গিয়ে পড়বে বাদশাহের উপর। জবাব-

দিহি করতে হবে তাকে খোদার দরবারে! ভেবে দেখ শাহজাদা—এই যে রেওয়াজ দাঁড়িয়েছিল সিন্ধু থেকে জম্মু কাশ্মীর পর্যন্ত ইলাকায় তাতে কত কত ইসলাম লেড়কী কাফের জোয়ানকে সাদী করে কাফের হয়েছে—তাদের বালবাচ্চা কাফের হয়েছে। কত গুনাহ হয়ে গেছে সেই পাঠান থেকে মুঘল আমলে জাহাঙ্গীরশাহী পর্যন্ত! এর পর এই ফরমান জারি করেছি আমি! অন্যায় করেছি আমি রাজাসাহেব?

রাজা রাজু ক্ষত্রিয় রাজা। তাঁর মুখ এক একবার রাঙা হয়ে উঠছিল আবার পরমুহূর্তে বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছিল। শিরায় শিরায় রক্ত কখনও ফুটে উঠছিল—কখন আগ্রার এই বিশাল কিল্লার মধ্যে তিনি রয়েছেন অনুভব করে হিম হয়ে জমাট বাঁধবার উপক্রম করছিল। তিনি মাথা নীচু করে কম্পিত কণ্ঠস্বরে বললেন—আমার কসুর আমি স্বীকার করেছি জাঁহাপনা!

বাদশাহ হেসে বললেন—আমি আপনাকে মাফও করেছি রাজাসাহেব। আমি চাই নি জবরদস্তি করে মুসলমান করতে। কি আপনার রাজ্য ধ্বংস করতে। শাহজাদাকে আমি জানি—তাঁর দিল বড় নরম। তিনি জানেন কি না জানি না হিন্দু উলেমা পণ্ডিতরা বাদশাহ আকবর শাহকে বলে যোগী। আর শাহজাদা দারা সিকোকে বলে ভক্ত! নরম না হলে ভক্ত হয় না! দিলের নরমাই খুব আচ্ছা নয় শাহজাদা দারা সিকো। মৌলানারা শাহ আকবরকে বলে দজ্জাল। বাদশাহ সাজাহানকে তারা বলে 'মেহেদী'। দারা সিকোকে তারা যা বলে তা খুব শুনতে ভাল নিশ্চয় লাগবে না!

শাহজাদা দারা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁর মুখও লাল হয়ে উঠেছে। বাদশাহ পিতার উপর তাঁর দাবি তাঁর অভিমান দরিয়ার তুফানের মত। কিন্তু তা তিনি প্রাণপণে সংযত করে

রেখেছেন। বাদশাহ যে এতখানি উত্তেজিত হয়ে উঠবেন তা শাহজাদা ভাবতেও পারেন নি।

বাদশাহ তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন—পুত্র দারা সিকো। তা বলে শাহানশাহ সাজাহান আমুদার নন! তুমি জান সারা হিন্দোস্তানের লোক জানে পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ শাহানশাহ সম্বন্ধে কি বলে? কি রাজা আপনি জানেন না?

কুর্নিশ করে রাজা রাজু বললেন—জানি জাঁহাপনা—"দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা মনোরথান্ পূরয়িতুং সমর্থ। অন্যৈর্নৃপালৈঃ পরিদীয়মানঃ শাকায় বা স্থাল্লবণায় বা স্যাৎ।"

দারা সিকো বললেন—শাহানশাহের দানের খ্যাতি যেমন তেমনি খ্যাতি তাঁর দৌলতের। অন্য রাজাদের সুলতানদের দৌলত কোথায়? তারা শাক আর নিমক আর মাটির পাত্রের অতিরিক্ত দেবার দিলই বা পাবে কোথায়!

—শাহজাদা দারা সিকো কি ভুলে গেছেন দেওয়ানী আমে শাহজাদার প্রিয়পাত্র কবীন্দ্রাচার্য সরস্বতী যেদিন কাফেরদের তীরথের উপর থেকে তীর্থযাত্রীদের আবওয়াব উঠিয়ে দেবার জন্যে আরজ জানান সে দিন তাঁর আরজির দরদ আর আবেগের স্পর্শে আমার দুই আঁখে শাহজাদা দারা সিকোর মত আঁশু এসেছিল!

শাহজাদা নতমস্তকে বললেন—মনে আছে শাহানশাহ!

—শাহজাদার কি মনে আছে বৃন্দাবন গোকুলের ঠাকুরদোয়ারার জন্য সাজাহান বাদশা গোবর্ধননাথের টিকায়েত রায় বিঠলকে তামাম জাতিপুরা মৌজা লাখেরাজ দিয়েছেন?

—মনে জরুর আছে জাঁহাপনা। আমার বিশ্বাস গোকুলের রায় টিকায়েতরা নিত্যই শাহানশাহের মঙ্গল কামনা করে।

বাদশাহ বলেই গেলেন—শাহজাদা নিশ্চয় ভুলে যান নি 'চিন্তামন মন্দিরে'র কথা। শাহজাদা ঔরঙ্গজীব মুসলমান হিসেবে সুন্নীর পথকেই শ্রেষ্ঠ মনে করেন। আর তিনি কিছু বেশী তেজী গোঁড়া।

তিনি যখন 'চিন্তামন মন্দির' ভেঙে দেন তখন হিন্দুদের মনে খুব আঘাত লেগেছিল—শাহজাদা দারা সিকো বড় কোমল-চিত্ত—তিনি তাদের হয়ে আরজ পেশ করেছিলেন আমার কাছে। আমি হুকুমৎ জারি করে সেই চিন্তামন মন্দির নতুন করে তৈরি করিয়ে দিয়েছি!

শাহজাদা দারা সিকো চঞ্চল হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বার বার অভিবাদন করে বললেন—আমার কসুর হয়েছে, গোস্তাকী হয়েছে শাহানশাহ—কিন্তু আমি জাঁহাপনার মনে এত আঘাত লাগবে তা বুঝতে পারি নি! আমাকে মাফ্ করুন!

—পুত্র, তোমার উপর ক্রোধ করবার শক্তিই নেই আমার। শুধু হিন্দুর কথাই বললাম কিন্তু মুসলমানদের বিচারের ক্ষেত্রেও আমি তাদের গুনাহ মাফ্ করি না। কবি শায়দাকে আমি নির্বাসিত করেছি—সে গানা তৈয়ার করেছিল—কি তোমার তা মনে আছে?

শাহজাদা দারা বললেন—হাঁ জাঁহাপনা—"চিস্ত দানী বাদাই গুলান মুসাঙ্কবা-ই জওহরী; হুস্ন্ আরা পরোয়ার দিগার উ ইশ্‌ক্‌রা পয়গম্বরী।"

—হাঁ। যে শায়র বলে মদই তুনিয়ার শ্রেষ্ঠ বস্তু, যে মদ্য পানে লোককে নাচায় তাকে খোদা মাফ্ যখন করেন না তখন বাদশাহই বা মাফ্ করবেন কোন্ একতিয়ারে। আমি আমার জ্ঞান ও বুদ্ধি মত বাদশাহী চালাই শাহজাদা; সে বাদশাহী ইসলাম আর পয়গম্বর রসুলের একান্ত ভক্ত এবং বিশ্বাসী তৈমুর শাহের বংশের। ইসলামকে ক্ষুন্ন করবার তার একতিয়ার নাই। মুসলমান হিন্দু হবে—মুসলমানের বেটী হিন্দুর ঘরে গিয়ে হিন্দু হয়ে যাবে এর চেয়ে গুনাহ হয় না। হিন্দু মুসলমান হোক। ইসলামের দরওজা খোলা। এস—মেহমান হয়ে যাও, বেরাদর হয়ে যাও—বিলকুল মুসলমান আদমীতে আদমীতে ফরক্ নাই। একসঙ্গে নামাজ। একসঙ্গে খানাপিনা। এর চেয়ে বড় ধর্ম নেই। আফতাব সূরয; শাহজাদা, মানুষের জীবনের আসমানে ইসলাম সূর্যের মত উঠেছে।

সেই সূর্যের আলো থেকে পালিয়ে যদি কেউ গর্তে ঢোকে অন্ধকার খোঁজে আর তাই হতে দেওয়া যদি উদারতা হয় তবে তাতে ঘোর অমঙ্গল হবে। এ হয় না—পুত্র, তা হতে দিতে আমি পারি না।

ঢং ঢং শব্দে আগ্রা কিল্লার ফটকে নও ঘড়ির শব্দ আরম্ভ হল। বাদশাহের আজ উঠবার সময় পার হয়ে গেছে। শাহানশাহের মেজাজ দেখে কেউ সে কথা বলে দিতে এগিয়ে আসতে সাহস করে নি। ঘণ্টার আওয়াজে বাদশাহ সচেতন হয়ে উঠলেন। নিজেই বললেন—রসুলাল্লা—ন ঘড়ি বেজে গেল! দেরি হয়ে গেল—শাহজাদী জাহানআরা তার আব্বাজানের খানা খাবার বক্ত চলে গেল বলে নিশ্চয় খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন।

শাহজাদা দারা সরে দাঁড়ালেন। রাজা রাজু শুধু বললেন—জাঁহাপনা, আমার এই নজরানা আমি একান্তে আপনাকে দিতে চেয়েছিলাম।

শাহানশাহ দাঁড়ালেন।

রাজা বললেন—বেগম নবাববাঈয়ের পুত্র হয়েছে। তাকে মুক্তার মালা দেব বলে কিছু ভাল মুক্তা সংগ্রহ করেছিলাম। সেও আমি এনেছি। পাঠিয়ে দিয়েছি সওগাতের সঙ্গে। তারপর হঠাৎ এই মুক্তা পেলাম। যেন বাদশাহকে দেবার জন্যেই আমার হাতে তুলে দিলেন খোদাতয়লা। তাই এ মালা আমি শাহানশাহকেই নজরানা দিতে চাই।

একছড়া পায়রার ডিমের মত আকারের নীলাভ মুক্তার মালা! মশালচীর মশালের আলোয় ঝলমল করে উঠল। শাহানশাহের পাকা জহুরীর দৃষ্টিতে গিয়ে তার ছটা লাগল যেন—দৃষ্টি হয়ে উঠল উজ্জ্বল। হাতে নিয়ে তারিফ করে বললেন—ওয়া ওয়া ওয়া! এ তো ইরানী দরিয়া ছাড়া মেলে না রাজাসাহেব। এ আপনি কি করে সংগ্রহ করলেন?

রাজাসাহেব বললেন—বলেছি জনাব, যেন খোদার অনুগ্রহে

আপনাআপনি আমার হাতে এল। এক আশ্চর্য সুন্দর বাচ্চার গলায় ছিল এই মালা। কবীরপন্থী ফকীর সে বাচ্চা। সে আমাকে বললে—আমি অবশ্য অবাক হয়ে এই মালার মতিগুলির দিকে তাকিয়ে ছিলাম, সে বললে—কেয়া তুম মাংতা ইয়ে মতিকে হার? লেও লেও।

বাদশাহ সবিস্ময়ে বললেন—বাচ্চা তাহলে পাগল?

—একরকম পাগল বই কি। তার মালিক বললেন—দেওয়ানা। খোদাতয়লা ঈশ্বরের অনুরাগে সে দেওয়ানা।

—তার মালিক? তার মালিক আবার কে? বললেন না কবীর-পন্থী ফকীর!

—হাঁ জনাব! সে কবীরপন্থী ফকীরই ছিল। কিন্তু তখন এক ইরানী সওদাগর তার মালিক হয়েছেন। তিনিই তার গলায় এই দুর্লভ মতির হার পরিয়ে দিয়েছিলেন!

—ইরানী সওদাগর?

—হাঁ শাহানশাহ মালেকে-ই-মুল্ক—সেও আশ্চর্য মানুষ। গায়ের রঙ তার একদম ফিরিঙ্গীস্তানের মানুষের মত। শুনলাম সে হল এক আর্মানী ইহুদীর ছেলে। ইরানে কাশানে এসে তারা বাস করেছিল। প্রথমে সে রাব্বি হবার জন্যে পড়াশুনা করে পণ্ডিত হয়ে উঠেছিল। তারপর তার তিয়াস জাগল—সে কোরান পড়লে। কোরান পড়ে সে ইহুদী থেকে হল মুসলমান। মক্কা শরীফ গিয়ে সেখানকার শ্রেষ্ঠ মৌলানাদের কাছে পড়ে সে ফকীর হতে চেয়েছিল! হঠাৎ আবার তার দিলের মধ্যে খেয়াল হল—না ফকিরী নয় দৌলত রোজগার করে সে হবে আমীর। সেই ধান্ধায় সওদাগর হয়ে সে আসে থাট্টায়। সে-ই ইরানী দরিয়া থেকে এইসব মুক্তা আনিয়েছিল। তার ইচ্ছা ছিল সে এই দুর্লভ মুক্তার মালা নিয়ে আসবে খোদ বাদশাহের দরবারে। বাদশাহকে বেচবে এই মতির মালা। কিন্তু আশ্চর্য লোক এই সওদাগর! হঠাৎ কবীরপন্থী দলের মধ্যে এই

অপূর্ব সুন্দর দেওয়ানা বাচ্চাকে দেখে পাগল হয়ে গেল। ব্যবসা ছেড়ে সে এই দলের পিছনে ছুটল!

বাদশাহ বললেন—ইরানী কিনা! এদের এই এক খেয়াল। এই গুনাহে ইরানের আদমী বরবাদ যাবে। কি নাম সে সওদাগরের?

—মহম্মদ সৈয়দ।

—মতি জহরতের কারবারী?

—তার সঙ্গে গালিচার কারবারও করে।

—কোথায় থাকে? গদি কোথায় তার?

—আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল দ্বারকার কাছে। সমুদ্রের কূলে। শুনলাম লাহোর হায়দ্রাবাদ থাট্টা তিন জায়গাতেই তার গদি আছে।

—মহম্মদ সৈয়দ?

—হাঁ জাঁহাপনা মহম্মদ সৈয়দ। বড়া ভারী উমদা আদমী। অভয়চান্দ আমাকে তার গলা থেকে খুলে দিলে এই মতির মালা —মহম্মদ সৈয়দ বললেন—লে যাইয়ে রাজাসাহেব। যে মালিক সে আপনাকে দিয়েছে যখন তখন আমি কিছু বলবার কে।

শাহানশাহ আবার বললেন—মহম্মদ সৈয়দ? অভয়চান্দ? ওই লৌণ্ডা?—হুঁ। ঘাড় নাড়লেন বাদশাহ। তারপর অগ্রসর হলেন।

ওদিকে নহবতখানায় তখন ন ঘড়ির নহবত বাজছে। সানাইয়ে বাজছে দরবারী কানাড়া। ওয়া ওয়া ওয়া।

শাহবুরুজের সম্মুখের পথটা চঞ্চল হয়ে উঠল। শাহানশাহ আসছেন।

কয়েকদিন পর হিন্দুস্তানের বাদশাহের বাদশাহী মিছিল চলেছিল আগ্রা থেকে কাশ্মীর। বাদশাহ কাশ্মীর চলেছেন, সেখানে গর্মীর কালটা কাটিয়ে দিল্লী হয়ে আগ্রা ফিরবেন। যাবার পথেও দিল্লীতে অল্প কয়েকদিন মাত্র থাকবেন। এই গরমের সময়টায় দিল্লী আগ্রায় বড় কষ্ট হয়। দরিয়ার পানি সেও গরম হয়ে যায়। দিন দু'পহর কাটাতে হয় মাটির তলায় আরামখানায়। উপরে পাংখা পর্যন্ত সহ্য হয় না। দুপুরে লু বয়। বাদশাহ বাবর—তিনি এই গরমকালের জন্য হিন্দুস্তানের তক্ত পেয়েও ঠাণ্ডা মুল্ক কাবুল কান্দাহার বোখারা সমরখন্দ্ ভুলতে পারেন নি। মরবার সময় বলেছিলেন কাবুলে যেন তাঁর কবর দেওয়া হয়। সেখানে ঠাণ্ডা মুল্কের আরামে তিনি নিশ্চিন্তে ঘুমোবেন।

বাদশাহের সঙ্গে হারেম চলেছে। শাহজাদীরা চলেছেন—পুত্রবধূদের মধ্যে নবাববাঈও চলেছেন। আগে আগে চলেছে লোকলস্কর ফৌজ; হাতী, ঘোড়া, গাড়ি—তার উপর বিলকুল বাদশাহী সরঞ্জাম। বাদশাহী তাঁবু, কানাত, রসদ, সুখস্বাচ্ছন্দ্যের তামাম জিনিস। তার সঙ্গে চলেছে দপ্তরখানা। উজীর, মনসবদার, নাজির, পেশকার আর দারোগার দল; খোজা বান্দা বাঁদী বাঈজীরাও চলেছে।

শাহজাদারা সকলেই আপনাপন সুবায়। এক শাহজাদা শাহ আলিজা দারা সিকো সঙ্গে রয়েছেন। তিনি অধিকাংশ সময়ই শাহানশাহের কাছেই থাকেন। দুনিয়ার লোক জানে শাহজাদা দারা সিকোই শাহানশাহ সাজাহানের সর্বাপেক্ষা প্রিয় পুত্র। তাঁকে ছেড়ে তিনি থাকতে পারেন না। তিনি কিন্তু এই সময়টায় আগ্রায় থাকতেন না, বছরখানেক আগে থেকে তিনি লাহোরে গিয়েছেন। কান্দাহার কাবুল এলাকার ওধার থেকে ইরানের শাহ সাফী

কান্দাহারের উপর একটা হামলা করবার মতলবে আছেন। কান্দাহার হিন্দুস্তানের এলাকা। চাঘতাই বংশের প্রতিষ্ঠাতা শাহানশাহ বাবর শাহ এ এলাকা হিন্দুস্তান ভুক্তান করে গিয়েছিলেন। তার আগেও ছিল ইরাকে—পয়গম্বর রসুল তুনিয়াতে ইসলাম প্রচারের পর থেকে ও এলাকা ইরানের শাহেরা নিয়ে সব ইসলাম এলাকা করেছেন। শাহ বাবরের পর বাদশাহ হুমায়ুন শাহের আমল গেছে। তখনও কান্দাহার হিন্দুস্তানের এলাকা। হুমায়ুন বাদশাহের মৃত্যুর পর শাহানশাহ হলেন জালালউদ্দীন আকবর শাহ। তখন তাঁর বয়স মাত্র চৌদ্দ। সেই সময় ইরানের শাহ, শাহ থামাস্প সুযোগ পেয়ে কান্দাহার ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু খুদা মেহেরবান —তাঁর ইচ্ছায় আপনাআপনি কান্দাহার এসেছিল হিন্দুস্তানের বাদশাহী একতিয়ারে।

ইরানের শাহের মনসবদার মুজঃফর হুসেন মির্জা ইরানের শাহের জালিমি আর জুল্‌মের প্রতিবাদে নিজে থেকে এসে আকবর শাহের দরবারে কান্দাহার কিল্লা আর তার সঙ্গে সুবা আকবর শাহের হাতে তুলে দিয়ে দরবারে আশ্রয় নিয়েছিল—নোক্‌রী পেয়েছিল।

তারপর সাতাশ বছর পর বাদশাহ জাহাঙ্গীরের সময় আবার কান্দাহার কেড়ে নিয়েছিলেন ইরানের শাহ, শাহ আব্বাস। বাদশাহ জাহাঙ্গীর তখন শাহীবেগম নূরজাহানের কাবেজে এসে একরকম এলিয়েই পড়েছিলেন। শুধু শরাব আর নাচে গানের মধ্যে দিনরাত প্রায় ঘুমিয়েই থাকতেন, স্বপ্ন দেখতেন। যা করতেন নূরজাহান বেগম। বেগমসাহেবার চক্রান্তে বাদশাহী শক্তি হয়ে গেল টুকরো টুকরো। তাঁর চক্রান্তে শাহজাদা খুরম বিদ্রোহ করেছেন, মহবৎ খাঁ বিদ্রোহ করেছেন। এই সুযোগে শাহ আব্বাস ছিনিয়ে নিলেন কান্দাহার, ডেরা গাজী খাঁ, ডেরা ইসমাইল খাঁ। তা আর উদ্ধার হল না। ঘরের ঝগড়াই কোনদিন মেটে নি তা বাইরে একটুকরো কান্দাহার উদ্ধার করবেই বা কে, আর ফুরসৎই বা কোথায়।

খোদা মেহেরবান। আর তৈমুর শাহের চাঘতাই বংশের হিন্দুস্থানী বাদশাহীর উপর তাঁর মেহেরবানি অপরিসীম। আর ইরানের শাহের জুলুমবাজিও অসহনীয়। সেই অসহনীয় জুলুমবাজির জন্য আবার এই দু'বছর আগে কান্দাহারের সুবাদার অত্যাচারপীড়িত আলি মর্দান খাঁ দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ বাদশা, শ্রেষ্ঠ বিচারক, হিন্দুস্তানের মুসলমানদের 'মেহেদী' সাজাহানের দরবারে এসে কান্দাহার তাঁর হাতে দিয়ে বলেছে—কান্দাহারের উপর হক্ ও একতিয়ার আপনার। আপনার হকের এলাকা আপনি নিন। আমি আপনার গোলামী করতে এসেছি। আমাকে আশ্রয় দিন।

বাদশাহ সাজাহান খুব খুশী হয়ে তা নিয়েছেন, আলি মর্দান খাঁকে আমীরী দিয়েছেন। কান্দাহার পেয়ে খুশী হয়েই তিনি নিশ্চিন্ত হন নি। কান্দাহারে জবরদস্ত জঙ্গী ফৌজ পাঠিয়েছেন। এবং ডেরা গাজী খাঁ ডেরা ইসমাইল খাঁ এলাকা জুড়ে সুবা তৈরি করে সে এলাকা রক্ষার জঙ্গী ব্যবস্থা করেছেন। কান্দাহার কিল্লা এবং ওই বিস্তীর্ণ দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলের যত ঘাঁটি আর ছোট ছোট কিল্লা তার সবগুলিকে নতুন মেরামতি আর গড়নে বহুত বহুত মজবুদ ও জবরদস্ত করে তুলেছেন। টাকা কম খরচ হয় নি। লাখে লাখে আট লাখ টাকা খরচ হয়েছে এতে। ভ্রূক্ষেপ করেন নি তাতে।

ওদিকে ইরানের শাহ, শাহ সাফীর এর জন্য মাথা হেঁট হয়েছে। আবদুল হামিদ বলে—ইরানের শাহের এখন "রোজ বে-তার উ শা-ব বে-খওয়াব"—মানে 'দিনে জেগে থেকে স্বস্তি নাই রাত্রে ঘুমুতে গিয়ে ঘুম নেই'।

এক বছর আগে খবর এসেছিল ইরানের শাহ কান্দাহার কেড়ে নেবার মতলব করে জঙ্গী ব্যবস্থা করেছেন।

এই খবর পেয়ে হিন্দুস্তানের বাদশাহ ব্যবস্থা করতে বিলম্ব করেন নি। তিনি জবরদস্ত মনসবদারদের অধীনে ফৌজ পাঠাবার ব্যবস্থা করে শাহজাদা দারা সিকোকে বলেছিলেন—শাহজাদা, তুমি এই

ইরানীদের হটিয়ে ইরানের দাম্ভিক শাহ সাফীর গুমোর আর মতলববাজি ভেঙে দিয়ে এস।

আনন্দের সঙ্গে এবং উৎসাহের সঙ্গে শাহজাদা দারা এই অভিযানে রওনা হয়েছিলেন। লাহোর পর্যন্ত এসে সেখানেই তাঁর এই অভিযানের মূল আস্তানা করে তিনি রওনা হয়েছিলেন কাবুল। কাবুল থেকে তিনি নিজে রওনা হয়েছিলেন গজনী আর কিল্‌চ্‌ খাঁকে রওনা করে দিয়েছিলেন কান্দাহার।

হিন্দুস্তানী বাদশাহী ফৌজের কুচকাওয়াজ আর ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শুনেই ইরানীরা হটে গেছে। ওদিকে তখন কনস্তান্তি-নোপলের সুলতানের সঙ্গে শাহের লড়াই বেধেছে। শাহের পিছিয়ে না গিয়ে উপায় ছিল না।

দারা সিকো কাবুল হয়ে ফিরেছেন লাহোর। লাহোরে খবর এসেছিল বাদশাহ এবার অনেকদিন পর কাশ্মীর যাবেন ঠিক করেছেন। তিনি শাহজাদাকে আগ্রা আসতে বলেছেন—বলেছিলেন—কাশ্মীরের রাজৌরীর রাজাকে নিয়ে তুমি আসবে। তোমাকে সঙ্গে নিয়ে আমি লাহোর হয়ে কাশ্মীর যাব। তোমাকে দীর্ঘদিন দেখি নি। প্রিয় পুত্র, তোমাকে কয়েক মাস না দেখেই মনে হচ্ছে বুঝি সারা জিন্দগীই আমার ফুরিয়ে গেল—তোমাকে দেখলাম না।

তাই রাজা রাজুকে নিয়ে দারা সিকো এসেছিলেন আগ্রা; এবং আবার ফিরে চলেছেন পিতার সঙ্গে। লাহোরে তিনি থাকবেন—শাহানশাহ যাবেন কাশ্মীর।

রাজা রাজুর তাঁবু পড়েছে লালকিল্লার দক্ষিণদিকে যমুনার ধারে রাজঘাটের কাছে। তাঁর সঙ্গে সেই তরুণ কবি সুভগও ফিরে চলেছে কাশ্মীর। শাহানশাহ তার "জাঘ্‌ অজ্‌ দহান পরীদ"এর পাদপূরণে গজল শুনে খুশী হয়ে প্রতিশ্রুতি এবং রেওয়াজ মত তাকে তার ওজনের পরিমাণ সোনা রূপা ইত্যাদি দিয়েছেন। তার পরনে এখন নতুন দামী পোশাক—সেও শাহানশাহের দান। একা সে

সেদিন অপরাহ্নবেলায় চুপ করে মাথা হেঁট করে বসে আছে তাঁবুর মধ্যে। শাহানশাহের হুকুমে তাকেও যেতে হচ্ছে কাশ্মীর। বাদশাহের বাঁদীর দলে শিরিনও যাচ্ছিল। শিরিন সেদিন থেকে বাদশাহী বাঁদীদের মধ্যে ভুক্তান হয়েছে।

বাদশাহ শিরিনের সুরতের তারিফ করেছেন শুনে ঔরংজীবের বেগম রহমতউন্নিসা নবাববাঈ তাকে বাদশাহের কাছে নজরানাস্বরূপ পাঠিয়ে দিয়েছেন। বাদশাহ এক শিরিনের বদলে চারজন বাঁদী পাঠিয়ে দিয়েছেন পুত্রবধূকে। তার একজন হিন্দুস্তানী, একজন ইরানী, একজন তুর্কী আর একজন হাবসী। কিন্তু মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে গেছে।

আজ সেই শিরিন নাকি জওহর খেয়েছে। বিষ খেয়ে মরেছে শিরিন। কিছুক্ষণ আগে খবর পেয়ে রাজাসাহেব গেছেন লাল-কিল্লায়।

কবি সুভগের মনে হচ্ছে শিরিনের মৃত্যুর জন্য সেই দায়ী। মুশায়ারার দিন থেকে এ পর্যন্ত যা ঘটেছে তা বিচার করে তাই তার মনে হচ্ছে। শাহানশাহ তাকে ইনাম বকশিশ দিয়েই দেওয়ার পালা শেষ করেন নি। আরও দিতে চেয়েছিলেন। শিরিনকে দিতে চেয়েছিলেন। বলেছিলেন—শায়র সুভগ, তুমি দেওয়ানা হয়েছ মহব্বতির জন্যে। বাদশা সাজাহান মহব্বতির বড়া ভারী সমঝদার। বাদশাহ দেওয়ানা। তাঁর কলিজা ছিঁড়ে মমতাজমহল চলে গেছে যেদিন সেই দিন থেকে তিনি দেওয়ানা। তিনি তার জন্যে এক মসনভী বানাচ্ছেন। কাগজের উপর কালির হরফে নয়; শ্বেতপাথর গেঁথে গেঁথে ইমারতের এমন মসনভী তৈরি করছেন তিনি যে দুনিয়া যতকাল থাকবে ততকাল এ পত্থলের মসনভীর জোড়া মসনভী কেউ তৈরি করতে পারবে না। যমুনার কিনারায় সে গড়ে উঠছে। তুমি দেখেছ?

ঘাড় নেড়ে জানিয়েছিল সুভগ—হ্যাঁ, সে দেখেছে সেই ইমারত।

বাদশাহ বলেছিলেন—হাঁ। বাদশাহ সাজাহানও দেওয়ানা।

যার মহব্বতি নাই সে দেওয়ানা হয় না। বাদশাহ মহব্বতির সব থেকে বড় সমঝদার। তার জন্যে আমি ঠিক করেছি শিরিনকে আমি তোমাকে দেব। তুমি মোল্লার কাছে গিয়ে কলমা পড়ে পয়গম্বর রসুলের গোলাম হয়ে যাও, তারপর আমি মোল্লা ডেকে শিরিনের সঙ্গে তোমার সাদী দিয়ে দেব। বাদশাহী দরবারে একটা নোকরীও মিলবে। তোমরা কবুতর কবুতরীর মত জিন্দগী কাটাবে মিঠি আবাজের লহরা তুলে।

ভয়ে শুকিয়ে গিয়েছিল কবি সুভগ। বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল তার মুখ।

সে তো তার ধর্ম ছাড়তে পারবে না! না—কিছুতেই সে তা পারবে না। ব্রাহ্মণের ছেলে সে। সে নিত্য গীতা পড়ে। স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম ভয়াবহঃ। সেই বাণী তার কানের পাশে যেন এই মুহূর্তটিতে বেজে উঠেছিল।

শাহানশাহ, হিন্দুস্তানের মালিক। তাঁর দৃষ্টি অতি তীক্ষ্ণ। সুভগের মুখ দেখে তিনি তার মনের কথা লহমায় মালুম করে নিয়েছিলেন।

তিনি বলেছিলেন—তুমি কোরান পড়েছ? আরবী ফার্সী তুমি এমন জান, পড় নি কোরানশরীফ?

—পড়েছি জাঁহাপনা।

—তবে? দিন দুনিয়ার রাত দিনের মালিক যিনি খুদাতয়লা—তাঁর কথা পয়গম্বর রসুলের মুখ থেকে বেরিয়েছে—তার থেকে সত্য আর কিছু আছে?

—না জাঁহাপনা! এমন সত্য দুনিয়ায় সত্যই দুর্লভ। সে মুখ তুলেছিল। কথা বলতে বলতে তার সাহস এসেছে—সে-সাহসের মধ্যে সে যেন তার ভগবানের আশ্রয় অনুভব করছে। মনে হচ্ছে তার পিঠের কাছে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। অভয় অনুভব করে নির্ভয় হয়ে সে অভিবাদন করে বলেছিল—জাঁহাপনা, গোলামের গোস্তাকি

যদি হয় তা হলে গোলামকে মাফ করবেন এ ভরসা আমার আছে। তামাম হিন্দুস্তানের বাদশাহ শাহানশাহ সাজাহানকে আমাদের পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ বন্দনা করেছেন—বলেছেন দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা। গোটা হিন্দুস্তানের হিন্দুরা জাঁহাপনার বাদশাহীতে স্ত্রী পুত্র ধর্ম জমিন জেরাত নিয়ে ঈশ্বরের রাজত্বের মত নিরাপদ আশ্রয়ে বাস করে। নিত্য প্রভাতে উঠে সকলেই তাঁর জয় কামনা করে।

—হাঁ, হাঁ। দিল্লীর বাদশাহ জানেন খোদাতয়লা মুসলমানকে তাঁর শ্রেষ্ঠ উপাসক বলে বেহেস্তে তাদেরই একচেটিয়া অধিকার দিয়েছেন, কিন্তু এই মিট্টির তুনিয়ায় বাঁচবার অধিকার দিয়েছেন সকলকে। কাফেরদের তিনি বাঁচবার অধিকার নিশ্চয় দিয়েছেন। এক রকম ভাবেই তিনি আলো হাওয়া পানি বর্ষান মুসলমান আর হিন্দুর উপর। সমান বাঁচবার একতিয়ারও দিয়েছেন। বাদশাহ হিসেবে সে একতিয়ার আমি জরুর মানি।

কবি সুভগ বার বার অভিবাদন করে বলেছিল—জাঁহাপনা, যদি এই গোলাম বলে যে, খুদাতয়লার মরজিতে মচ্ছি জন্মায় পানির অন্দরে। তারই মধ্যে সে বাঁচে ; তাকে মাটির উপরে তুনিয়ার এই রোশনি আর হাওয়ার আরামের মধ্যে তুলে বাঁচাতে গেলে সে বাঁচে না, সে মরে যায়। তাহলে কি শাহানশাহ এই গোলামের উপর নারাজ হবেন ?

একটু হেসে শাহানশাহ বলেছিলেন—না। নারাজ হব না তবে খুশী হব না। মাটির উপর রোশনি আর হাওয়ার মধ্যে পানির অন্দরের জীব মরে সে তার তুর্ভাগ্য—বাঁচলে সে মচ্ছি থাকত না, ইনসানি পেত মানুষ হত। কবি সুভগের সওয়ালে এই চুক আছে সে যেন ভেবে দেখে। তবে আমি তোমার মন বুঝেছি। তুমি যাও এখন। এখনই তোমার জবাব আমি নেব না। তুমি ভেবে দেখ। এক কাজ কর, চল—আমার সঙ্গে কাশ্মীর চল। তোমার পিয়ারীও

আমার সঙ্গে যাবে। ভাব তুমি। কাশ্মীরে গুলবাগিচায় বসে তোমার জবাব আমি শুনব। শিরিন সেখানে থাকবে।

রাজাসাহেব নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন—শাহানশাহের পাশে শাহজাদা দারা সিকোও দাঁড়িয়ে ছিলেন—তিনিও নির্বাক হয়ে শুনেছিলেন সব। সেখানে আর কেউ ছিল না। শাহানশাহ শাহজাদা দারা সিকোর বাড়িতে এসে তাঁকে ডেকে এসব কথাগুলি বলেছিলেন। গোপন রাখতে চেয়েছিলেন সকলের কাছে। শাহজাদা দারা সিকোর নিজের হাবেলীর মাটির তলার ঠাণ্ডি ঘরে বসে এসব কথা হয়েছিল।

তারপর এর মধ্যে কবি সুভগ শিরিনের গোপন চিঠিও পেয়েছিল। সে আকৃতি করে লিখেছিল—তোমাকে ছেড়ে এখানে এসে ভুলি নি তোমাকে কোনদিন। তবু নসীবকে মেনে দিলকে বুঝিয়ে ঘেরাটোপ ঢাকা পিঁজরার পাখীর মতই দানাপানি খেয়েছি; বুলি বলেছি, গানাও শুনিয়েছি মনিবাইন নবাববাঈকে। কিন্তু তুমি এখানে এলে কেন? সেদিন মুশায়ারা হবে শুনে এক ফাঁকে এসে ঝরোকায় চোখ রেখে মুশায়ারার আসর দেখতে সাধ হল। হঠাৎ দেখলাম তুমি! পিঁজরার ঘেরাটোপের ছেঁড়া ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ে গেল চাঁদকে। আমার দিল উতলা পাখীর মত পিঁজরায় মাথা ঠুকতে লাগল। মনে পড়ল বাদশার মুখে বার বার শুনেছিলাম—'জাঘ্ অজ্ দহান পরীদ'। বুঝেছিলাম শাহানশাহ মুশায়ারার আসরে এ কথাটা বলবেন। একটা খোজাকে অনেক মিনতি করে আশরফি কবুলে তোমাকে লিখে পাঠিয়েছিলাম বৃত্তান্তটা। তুমি মাত করেছ মুশায়ারার আসর। আমার দিল খুসবুতে ভরে উঠেছে তোমার ইজ্জতে। কিন্তু সে খুসবু চন্দনের ধূপ, জ্বলে জ্বলে তবে উঠছে। আমি পুড়ছি। হায়, দুনিয়ার বাইরে এমন কোন জায়গা নেই যেখানে ধরম নিয়ে লড়াই নেই?

আর একখানা পত্র পেয়েছিল সে দিল্লীতে এসে। এই দু'দিন আগে। "মা-শুক—হয়তো আমি মরব। দোহাই তুমি যেন

কিছু করে বসো না। দোহাই! হাসতে হাসতে মরব। তুমি আমার দেহটা কবর থেকে তুলে শিবের সতীদেহ কাঁধে করে বেড়ানোর মত কাঁধে নিয়ে যেন চলে যেয়ো। আমি মরেও তোমার কাছে ফিরে আসব।"

আজ খবর এসেছে শিরিন বিষ খেয়ে মরেছে এই কিছুক্ষণ আগে।

রাজা রাজুকে শাহজাদা দারা সিকো খবর দিয়ে ডেকে পাঠিয়েছেন। তিনি সেখানে গেছেন। মাথা হেঁট করে বসে আছে কবি সুভগ। চোখ থেকে টপটপ করে জলের ফোঁটা ঝরছে—ধিক্কার দিচ্ছে কখনও নিজেকে কখনও নসীবকে। মধ্যে মধ্যে মনে হচ্ছে—এ কি অত্যাচার। এ কি জুলুম। হে ভগবান! সঙ্গে সঙ্গেই মনে হচ্ছে—মিথ্যে মিথ্যে—ভগবানও মিথ্যে। সব ঝুট হায়।

* * *

সন্ধ্যার পর, আজ লালকিল্লার দেওয়ানী খাসে বাদশাহের দরবার বসে অল্পক্ষণের মধ্যেই শেষ হয়ে গেল। বাদশাহের মেজাজ আজ শরীফ ছিল না। দিল্লীর বাসিন্দা আমীর এবং আশপাশ এলাকার নবাব রাজাদের সঙ্গে সৌজন্যমূলক কথাবার্তা শেষ করে নজরানা নেওয়া এবং খেলাত দেওয়ার কাজ সেরেই উঠে চলে গেলেন। বললেন—মেজাজ আজ শরীফ নয়। সারা দিল আমার দুখ আর আফশোষে ভরে গেছে।

নকীব ঘোষণা করলে। সম্রাট দেওয়ানী খাস থেকে বেরিয়ে চলে গেলেন সোজাসুজি একেবারে মমতাজমহল বেগমের জন্য তৈরি করা মহলের দিকে। সেখানে আজ শুধু বিশ্রাম করবেন। শিরিনের এমন বিষ খেয়ে মরার জন্য সত্যই তিনি মর্মান্তিক দুঃখ পেয়েছেন। মমতাজ বেগমের প্রতি তাঁর প্রেম অকপট। অগাধ। তাতে একবিন্দু খাদ নেই। তবু তাঁর নারীর রূপের প্রতি মোহ আছে।

আজও আগ্রায় দু'একজন আমীর বেগমের প্রতি তাঁর স্নেহের কথা শোনা যায়; তাঁরা নিত্য বাদশাহের রঙমহলে আসেন, বাদশাহকে তাঁদের সালামৎ দিয়ে যান। আগ্রার লোকে পরিহাসও করে। তা করুক, তবুও বাদশাহ সাজাহানের প্রেম সত্য একথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। তিনি প্রেমিক—তিনি রূপের সমঝদার। একাধারে দুই। শিরিনের রূপ ছিল। তিনি তার তারিফ করেছিলেন। আবার কবি সুভগের প্রতি তার গাঢ় প্রেমের কথা জেনে খুশী হয়ে তার সঙ্গে সুভগের সাদীর কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু কবি সুভগ ধর্মান্তর গ্রহণ করতে রাজী হয় নি। তবু তাকে তিনি সময় দিয়েছিলেন—সঙ্গে নিয়ে চলেছিলেন কাশ্মীর। কিন্তু উতলা নারীহৃদয়ে এটুকু বিলম্বও সহ্য হয় নি। সে দেওয়ানা হয়ে উঠেছিল। অধীর হয়ে বিষ খেয়ে নিজের জীবনের শেষ করে দিয়েছে। এতে তিনি যত দুঃখ পেয়েছেন তত এই মৃত্যু তাঁর কাছে অপরূপ মনে হয়েছে। তাকে আজই সন্ধ্যায় কবর দেওয়া হয়েছে। হুমায়ুন বাদশার কবরের এলাকার মধ্যে একটু দূরে যমুনার ধারে নির্জনে। শিরিন বলে গিয়েছিল তাকে যেন নির্জন স্থানে কবর দেওয়া হয়। আর যমুনার পানির পরশ যেন সে পায়। তার তরঙ্গের গান যেন তার কানে আসে। বাদশাহ সেই হুকুমই দিয়ে ফিরে এসে মমতাজ বেগমের মহলে ঢুকে কয়েকটা খাঁচার বুলবুলকে ছেড়ে দিয়েছেন। তারা পাখা মেলে উড়ে চলে গেল—তিনি দাঁড়িয়ে দেখে একটু বিষণ্ণ হেসে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছেন।

কথাটা গোপন ছিল না। দেওয়ানী খাসে বাদশাহ আসবার আগেই খবরটা এসে পৌঁছে গিয়েছিল আমীরদের কানে। তাতে বিস্মিত কেউই হন নি।

'জাঘ্ অজ্ দহান পরীদ' থেকে বাদশাহের মেজাজের খবর তাঁরা জানতেন। উজীর আসফ খাঁ যে আসফ খাঁ তিনিও বলেছিলেন—"মমতাজ নেই—খেলুক—রঙীন পুতুল নিয়ে খেলা করে যদি ভাল থাকে

তবে খেলুক।" সেই খেলনাটা ভেঙে গেল। বাদশাহের দিল খারাপ হবে বইকি। তিনি অল্পক্ষণ পরেই চলে গেলেন।

বাদশাহ সকাল সকাল চলে যেতেই দরবারে উপস্থিত আমীর উমরাহরাও সকলে একে একে চলে গেলেন। তাড়া সকলেরই আছে। দেওয়ানী খাস শেষ হলেই অধিকাংশেরা বাড়ি ছোটেন—বাড়িতে বা ইয়ার দোস্তের বাড়িতে মজলিস মহফিল বসবে। নাচগান শিরাজী হাসি মস্করা আতর গুলাব পানের সঙ্গে উল্লাস চলবে। কেউ কেউ যাবেন বাঈপাড়া।

দেওয়ানী খাস পার হয়ে আম দরবারের সামনে আছে তাঁদের আপন আপন যান। সেই যানবাহনে চেপে চলে গেলেন তাঁরা।

শাহ আলিজা, শাহজাদা দারা সিকো সম্রাটকে এগিয়ে দিয়ে আবার ফিরে এলেন। শুধু রাজা রাজু তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। শাহজাদা তাঁকে সঙ্গে নিয়ে দেওয়ানী আমের পিছনে যে একটি কক্ষ আছে সেই কক্ষে প্রবেশ করে বসলেন। সঙ্গের দেহরক্ষীকে বললেন—হুঁশিয়ারীর সঙ্গে নজর রাখবে। কেউ যেন না আসে।

*　　　　*　　　　*

শাহজাদা বললেন—শায়র সুভগকে বলেছেন সব কথা?

রাজাসাহেব বললেন—বলেছি। কিন্তু সে বিশ্বাস করতে পারছে না।

—আপনি সাহস দেবেন। বলবেন, ভয়ের কিছু নেই, অবিশ্বাসেরও কিছু নেই। হকিম আমার বিশ্বাসী হকিম। তার এলেম আমি দেখেছি। দিল্লীর সকলেই তাকে জানে। সে আমাকে বলেছে, এ কাজ সে আগেও করেছে। তবে যার-তার কথায় করে না। বললে—খুদ শাহজাদার হুকুম বলেই এ আমি করছি। কোন ভয় নেই। এ দাওয়াইয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই ঠিক মরে গিয়েছে বলে মনে হয়। কিন্তু সে মরে না। আবার বাঁচালে বাঁচে। ঠিক সাড়ে তিন

ঘড়ির সময় তার হাত পা ঠাণ্ডা হয়েছে। দেখে সবারই মনে হচ্ছে মরে গিয়েছে। কিন্তু না। সে বেঁচে আছে। শরীরে তাপও আছে। কিন্তু সাধারণে বুঝতে পারবে না। কলিজাও খুব আস্তে চলছে। পাঁচ ঘড়ি পর্যন্ত এই অবস্থা চলবে। তার মধ্যেই যে পুরিয়া আপনাকে দিয়েছি সেই পুরিয়া মধুর সঙ্গে মেড়ে মুখের মধ্যে চারিপাশে আঙুল দিয়ে লাগিয়ে দেবেন। তারপর ডুলিতে চাপিয়ে নিয়ে যাবেন; এক মোকাম ঠিক করা আছে; ডুলির কাহারেরা জানে। সঙ্গে আমার নিজের খুব একজন বিশ্বস্ত লোক থাকবে। কোন ভয় নেই। কাহার এবং সিপাহী সব আমি খুব বাছাই করে দিয়েছি। তারা নিয়ে যাবে। সেখানে হকিমের লোক থাকবে। সে তারপর বাঁচাবার ব্যবস্থা করবে। পায়ে হাতে মালিশ লাগিয়ে ঘষবে। ক্রমে ক্রমে হাত পা গরম হবে। চোখ মেলবে। তারপর সেখান থেকে আর এক মোকামে নিয়ে যাবে। সেখানে সব বন্দোবস্ত্ করা আছে। তিন চার দিন—দরকার হলে পাঁচ সাত দিন থাকবে। কবি সুভগকে বলবেন, সাহস চাই। ভয়ের কিছু নেই। তারপর ভার তার। তবে দিল্লী আগ্রার অঞ্চলে যেন না থাকে। কবরখানায় লোক রেখেছি—তারা মাটির মধ্যেও ফাঁক রেখে দেবে বাতাসের জন্যে। লোকজন চলে এলেই তারা বের করে নেবে শিরিনের লাশ। চাপিয়ে দেবে ডুলিতে।

রাজা রাজু নির্বাক হয়ে শুনছিলেন। শাহজাদার কথা শেষ হলে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—কিন্তু—।

—কি রাজাসাহেব? এর মধ্যে কিন্তুর কিছু নেই। নিশ্চিন্ত থাকুন আপনি।

—সে কথা আমি বলি নি শাহজাদা। বলছি এত ঝুঁকি নিয়ে এ আপনি কেন করলেন!

দারা সিকো বললেন—কবি সুভগের জন্য রাজাসাহেব। এ ক'দিনে আমি তাকে খুব ভাল করে বুঝেছি। বড় উমদা আদমী।

দিল তার আলোর মত সাচ্চা। কিন্তু সে তার হিন্দুধর্মকে এত বেশী ভালবাসে যে সে ওই ধর্ম ছেড়ে বাঁচবে না। সে যে পানি আর মচ্ছির কথা বলেছিল তার চেয়ে তার নিজের সম্পর্কে আর বড় সত্য নেই। অথচ আমি বুঝেছি রাজাসাহেব যে, বাদশাহ তাকে মুসলমান করে ওই শিরিনের সঙ্গে না সাদী দিয়ে ছাড়বেন না। শাহানশাহ জেদী নন, কিন্তু এতে তাঁর যে নেশা তা তাঁর ছোট্ট একটা পাহাড়ী কেল্লা দখল করে তার উপর বাদশাহী ঝাণ্ডা গাড়ার নেশার চেয়ে কম নয়। শেষ পর্যন্ত ভাল হত না রাজাসাহেব! ছোট্ট কেল্লা যখন জবরদস্ত জঙ্গী দখল করতে ঘা খায় তখন বলে—দাগো তোপ! গুঁড়ো করে দাও ওটা!

—কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাদশাহের কানে উঠবে না তো?

—না। এ আমরা জানি শুধু চারজন। এমন চারজন যে যাদের গর্দান গেলেও এ কথা বের হবে না। প্রথম থেকে জানে নাদিরা বেগম, আপনার বেটী রহমতউন্নিসা, আর আমি। আর এ কথা আজ মাত্র জেনেছেন আমার বড়কী বহেন, হজরত জাহানারা বেগম। কাফন বেরিয়ে যাবার পর তাঁকে বলেছি। আর কেউ জানে না। এরপর জানছেন আপনারা।

—গোস্তাকি মাফ্ করবেন শাহ আলিজা—তবু আমি বলব এর জন্য এত বড় ঝুক্কির কাজ না করাই বোধ হয় উচিত ছিল।

শাহজাদা দারা বললেন—করেছি নবাববাঈয়ের অনুরোধে। আমি যেমন দুখ্ পেয়েছিলাম কবি সুভগের দুঃখে, তেমনি দুখ্ পেয়েছিল নবাববাঈ শিরিনের দুঃখে। শিরিন বাদশাহী বাঁদী মহল থেকে রহমতউন্নিসার কাছে এসে কাঁদত।

রাজা রাজু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—শিরিন যে তার বচপনের সহেলী। শিরিনের নাম ছিল হরিপীতম। মা ছিল না, বাপ ছিল, সে এক ভিখমাঙোয়া ব্রাহমন। শিরিন বাপের হাত ধরে আসত আমার দরওয়াজায় ভিখ মাগ্তে। রহমতের শখ ছিল সে

নিজে হাতে ভিখ দেবে ভিখমাঙোয়াদের। বহুৎ খুবসুরতি ছিল হরিপীতম আর গীত গাইত বড় ভাল। তাকে রহমতউন্নিসার ভাল লাগল; সে একদিন শিরিনের হাত ধরে বললে, তুমি আমার সহেলী। তারপর আবদার ধরলে, তুমি আমার কাছে থাক। খবর শুনে বাপটাকে কিছু টাকা দিলাম আমি, সে খুশী হয়ে বেটীকে দিয়ে গেল। তারপর দুজনে এক সঙ্গে খেলত, এক সঙ্গে গীত গাইত। মন্দিরে গিয়ে ভজন গাইত হাতে তালি দিয়ে। কবি সুভগ ছিল মন্দিরের পূজারীর বেটা। ওদের মহব্বতি সেই তখন থেকে। তারপর বাদশা যখন চাইলেন—তোমার ঘরের এক বেটীকে আমার ঘরে বেটার বেগম করতে পাঠিয়ে দাও, তখন অমৃত্ কুমারীকেই আমি পাঠিয়ে দিলাম। শাহজাদা, আপনি বিশ্বাস করুন—আমার নিজের বেটী পাঠালে জাত যাবে এ কথা ভেবে আমার দামাদ পীর-সাহেব সৈয়দ শাহের বেটীকে পাঠিয়ে জাত বাঁচানোর মতলব আমার ছিল না। তাই যদি থাকবে শাহজাদা, তবে পীরসাহেবের সঙ্গেই বা আমার বড় বেটীর সাদী দেব কেন? শও শও বরিষ ধরে আমরা হিন্দু মুসলমান পাশাপাশি বাস করি। কারুর সঙ্গে কারুর দুশমনি নেই। পড়োশীর মত, এর ঘরে আমি পানি খাই, আমার ঘরে সে খায়। সাদী সাগাই যে কত হয়েছে তার ঠিকানা নেই। পাঠিয়ে-ছিলাম, অমৃতের চেয়ে রূপসী খুবসুরতি বেটী আর আমার ঘরে কেউ ছিল না বলে। কাশ্মীর আর ইরান দুই রক্তের সুরত। তেমনি তরিবৎ। তাই পাঠিয়েছিলাম। তার সঙ্গে হরিপীতমকে পাঠিয়ে দিলাম—কেঁও কি অমৃতকুমারী বাদশাহী হারেমে এসে প্রথম বড়ই একলা হয়ে যাবে; তার সঙ্গে তার দিলের সহেলী থাকলে খানিকটা আরাম পাবে, দোসর পাবে; দুঃখের মধ্যেও সুখ মিলবে। আমি অবশ্য তখন জানতাম না সুভগের সঙ্গে তার মহব্বতির কথা।

—হাঁ, তাই রাজাসাহেব। সেই কারণেই সহেলী শিরিনের জন্যে নবাববাঈয়ের এত দরদ্। সে কাকে বলবে ভেবে না পেয়ে এসে

নাদিরা বেগমকে বলেছিল। ঔরংজীবের সঙ্গে আমার সম্পর্ক তো জানেন। তবু একদিন লুকিয়ে এসে বলেছিল নাদিরাকে। কারণ নবাববাঈকে শিরিন বলেছিল যে, সুভগ কখনও ধরম ছাড়বে না। রৌশনআরা বেগম ঔরংজীবের দিকে। ঔরংজীব গোঁড়া মুসলমান। রৌশনআরাও তাই। জাহানারা বেগমকে বলতে সাহস পায় নি। অগত্যা বলেছিল নাদিরা বেগমকে আমাকে বলবার জন্যে। আমার মতের কথা তো ছাপি নেই। হিন্দু মুসলমান আমার কাছে সমান; আমার কাছে আল্লা ঈশ্বর এক; এ সব তো বলে থাকি আমি। তাই আমার কাছে আরজ্ জানিয়েছিল। আমি নিজে শিরিনের চিঠ্‌ঠির মুসাবিদা করে দিয়েছিলাম। আমার বিশ্বস্ত লোক দিয়ে পাঠিয়ে দেবার বন্দোবস্ত আমি করেছি। কবি সুভগের সঙ্গে আলাপ করেছি। কিন্তু দেখলাম কবি সুভগ নিজের ধর্ম দিয়ে শিরিনকে পেতে চায় না। বলে—তুসরা জনম আছে শাহজাদা। সেই জনমে আমরা মিলব। আমি বললাম—আচ্ছা শায়র সুভগ, তোমাকে যদি ধরম না দিতে হয় আর শিরিনকে যদি বাদশাহ তোমাকে দেন, তবে কি বলবে? শিরিন মুসলমানী হয়েছে বলে নেবে না? তবুও বলবে তুসরা জনমে মিলবে? সে বললে—না শাহজাদা তা কেন বলব? কখনও তা বলব না। আমি কিষণজীর নাম করব—সে আল্লাতয়লার নাম করবে। তাতে আমি আপত্তি করব না। আমার দাদো সাদী করেছিল এক মৌলানার বেটীকে। আমার দাদিয়া সে। আমার দাদিয়া তুটো মালা জপত। একটাতে আল্লার নাম অন্যটাতে হরির নাম; আমি তার পেটের বেটার বেটা। আমি কেন তা বলব? এরপর এ না করে কি করতে পারতাম বলুন? এ তুখ তো শুধু শিরিন আর সুভগের নয় রাজাসাহেব, এ তুখ যে সারা হিন্দোস্তানের। হিন্দু আর মুসলমান এক খোদার এক ঈশ্বরের পয়দা—তবু এ ওকে অচ্ছুত ভাবে ও একে অচ্ছুত ভাবে। ভাই ভাবে না।

রাজা রাজু বললেন—শাহ আলিজা হিন্দুস্তানের বুকে দেবদূত এসে জন্মেছেন। খোদা আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন। ওই যে কাল বাদশাহকে ইরানী সওদাগর মহম্মদ সৈয়দের কথা বলছিলাম, ওই যে অভয়চান্দ বলে এক মোহনিয়া বাচ্চাকে নিয়ে মেতেছে, তার মুখেও শুনলাম এমনি কথা। ওই অভয়াচান্দ লেড়কাটির বাপ সেও এক মুসলমান মেয়ে বিয়ে করেছিল তুসরা দফে। তুই জেনানা নিয়ে খুব সুখী মানুষ ছিল। হঠাৎ ওই বাদশাহী ফরমান জারি হল তখন তার হল ফেসাদ্‌। মুসলমানী জরু, সে বললে—তোমাকে ছেড়ে অন্য কাউকে নিকা করতে হলে আমি জরুর মরব। নওজোয়ানী জেনানী, তার উপর খুবসুরতি। তাকেও ছাড়তে পারলে না অভয়চান্দের বাপ। সে মুসলমানই হল কিন্তু হিন্দু জেনানী, সে বললে—আমি আমার ধরম ছাড়ব না। সে তার বেটা আর বেটীকে নিয়ে একদিন রাতে পালাল। ভিখ মেগে খেতো। সো ভি আচ্ছা। তারপর একদিন ডাকু লোকে তার বেটীকে নিয়ে পালাল, বেটা তখন নেহাতই বাচ্চা—তাকে বুকে করে কাঁদতে কাঁদতে চলল সে জেনানী। শেষ একজায়গায় গাছের তলায় মরল। তখন একদল কবীরপন্থী যাচ্ছিল সেই পথে—তারাই সেই বাচ্চাকে—তখন তার উমর ছ' সাত বরিষ, তাকে নিয়ে মানুষও করলে, চ্যালাও বানালে। তাদের কাছ থেকে সৈয়দ মহম্মদ—

ওদিকে লালকিল্লার ফটকের উপর থেকে ঘড়ি বাজতে শুরু হল। শাহজাদা চকিত হয়ে বললেন—রাজাসাহেব, ঘড়ি বাজছে। আজ আর নয়। ওদিকে আপনার দেরি হয়ে যাবে। আপনি গিয়ে দেখুন কবি সুভগকে নিয়ে ওখানে আপনার লোকেরা গিয়েছে কি না?

রাজাসাহেব অভিবাদন করে বললেন—সব বন্দোবস্ত্ আমি করে এসেছি শাহজাদা।

—তবু আপনি যান। দেখুন।

—শাহজাদা দীর্ঘজীবী হোন। হিন্দুস্তানের এই হিন্দু আর

মুসলমানের আক্রোশ আর খুনোখুনির শেষ হবে আপনার বাদশাহীতে।

শাহজাদা উপরের দিকে দৃষ্টি তুললেন। ছাদের দিকে তাকিয়ে বললেন—রাজাসাহেব, খোদা সেই জন্যেই আমাকে হিন্দুস্তানে পাঠিয়েছেন। আমার বচপন থেকে কেউ যেন আমার ভিতর থেকে বলে—চোখ বুজলে একলা থাকলে আমি শুনতে পাই, খোদাতয়লা আর ঈশ্বর একসঙ্গে মিলে গিয়ে আমাকে বলেন—এই জন্যে তোকে আমি দুনিয়ায় পাঠিয়েছি। আমি মনে মনে বলি—এ আমি কি করে করব? কি বলে এই হিন্দু মুসলমানকে বোঝাব এ কথা যে হিন্দুতে মুসলমানে ফরক নেই? আল্লা ঈশ্বর এক? তারপর আমি তখন নওজোয়ান—আমার প্রথম লেড়কী পয়দা হয়ে মারা গেল আগ্রা থেকে লাহোরের পথে। সেদিন ছিল পবিত্র ইদলফিতরের দিন। আমি শোকে ভেঙে পড়লাম। শাহানশাহের মত স্নেহময় আব্বাজান আমাকে সান্ত্বনা দিতে পারলেন না। হজরত জাহানারা বেগমের মত বহেনের স্নেহেও মন বোঝে নি। মন বুঝল লাহোরে পীরসাহেব মিয়া মীরের কাছে এসে তাঁর পায়ের তলায় বসে। খুদ বাদশা শাহ-জাহাঁন এসেছিলেন পীরসাহেবকে দেখতে কাশ্মীর থেকে ফেরার পথে। পীরসাহেব তাঁর হীরা জহরত এমন কি তাজের কোহিনূরের দিকেও একদণ্ডের জন্যেও নজর নামান নি। তাঁর নজর হরঘড়ি থাকত দূর আসমানে কিছুর খোঁজে। তিনি আমাকে বোঝালেন—এই যে দর্‌দ্—এই দর্‌দ্ দিয়ে আদমীকে ভালবাসো। তামাম আদমীকে—কোই হিন্দু না কোই মুসলমান না, সব আদমী। যাঁহা আদমী তাঁহা খুদা তাঁহা ভগবান। সেই দিন রাতে রাজাসাহেব, ভিতর থেকে শুনলাম সেই আওয়াজ—বললে—কুছ ফরক নেহি হিন্দু আউর মুসলমানসে। কেয়া ফরক! 'আন্‌-অ-ল্ হক্' বলে মুসলমান—হিন্দু বলে 'ব্রহ্মোঽস্মি'। কি ফরক! রাজাসাহেব, হিন্দুস্তানের শাহজাদা করে যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তিনি এই জন্যেই আমাকে পাঠিয়েছেন।

রাজাসাহেব অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলেন—নির্বাক বিস্ময়ে আবিষ্ট হয়ে শুনছিলেন কথাগুলি।—আন্‌-অ-ল্ হক্, ব্রহ্মোঽস্মি!

শেষ ঘণ্টাটা বেজে তার রেশটা তখনও বাতাসে ভাসছে। শাহজাদা তাঁকে বললেন—আসুন তাহলে রাজাসাহেব। আপনি সমস্ত খবর নিয়ে কাল সুবা বহুৎ সবেরে আমাকে খবর দেবেন। আমার আদমীরা ওই মোকামে পৌঁছে দিয়েই চলে আসবে। রৌশনআরা খুব চতুর। আমি ডর তাকে করি নে। কিন্তু ডর আমার নাববাঈয়ের জন্যে। ঔরংজীব গোঁড়া মুসলমানিয়ানার ফকীরী আলখেল্লার তলায় হিংসা আর আক্রোশের ছোরা বাঘনখ পরে চব্বিশ ঘণ্টা শানায়।

* * *

শা-জাহানাবাদের চারিপাশে বাদশাহী পাঁচিলের বাইরে ছোট বড় অনেক মহল্লা। সে সব মহল্লায় রাজা আমীর নবাব উমরাহদের বড় বড় হাবেলীও আছে। বাগবাগিচা আছে। তোগলকাবাদ দক্ষিণ দিকে; এদিকে খুব বড় একটা আমীর ওমরাহের বসত নেই। তবে অনেক মধ্যবিত্ত, গৃহস্থের বাস আছে। তেমনি একটি গৃহস্থ বাড়ি ক'দিন আগে একজন ভদ্র প্রবীণ হিন্দু এসে কেরায়া নিয়েছিলেন। নাম বলেছেন জীওনলাল সিং। লোকজন বেশী নেই সঙ্গে। একজন নোকর আর একজন বর্কআন্দাজ এই মাত্র। মিষ্টভাষী মধুর চরিত্রের অমায়িক লোক। বাড়ি যমুনার ওপারে, গাজিয়াবাদের তরফে। গাজিয়াবাদ দিল্লীর মাঝখানে।

তাঁর বেটার বহুমাঈর নাকি খুব বেমার, তাকে দিল্লীর হকিম সাহেব দিয়ে চিকিৎসা করাবেন; তাই তিনি ক'দিন আগে এসে বাড়িটা কেরায়া নিয়ে সব কিছুর ব্যবস্থা বন্দোবস্ত সব কিছুর ইন্তেজাম করে রাখছেন। সেদিন রাত প্রহরখানেক হবার আগে থেকেই জীওনলালজী ঘরবার করছেন—বর্কআন্দাজকে একটু আগিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন। মহল্লার বাইরে পথের উপর আলো নিয়ে সে অপেক্ষা

করছে। আজ রাত্রে তাঁর রুগ্ণা পুত্রবধূকে নিয়ে পুত্র এখানে এসে পৌঁছবে। দিল্লী মুলুকের এই গরমের কালে সকাল এক প্রহর হতে না হতে রোদ ঝাঁ ঝাঁ করে ওঠে। আগুনের হলকা ছোটে বাতাসের উপর ভর দিয়ে। এখনও সে গ্রীষ্ম হয় নি—সে গ্রীষ্ম আসবে আর মাসখানেক পর যখন দু'পহরে বাইরে যারা কাম-কাজ করে কি বাধ্য হয়ে বের হয় তাদের অনেক জন সর্দ্গরম্ হয়ে মরে। মাঠের মধ্যে মরে পড়েও থাকে দু' চার কেন দশ বিশজন। তাই এঁরা ব্যবস্থা করেছেন সন্ধ্যের ঠিক মুখে রওনা হয়ে রাত একপ্রহর নাগাদ তারা এসে এখানে পৌঁছে যাবে। আজ বিকেলে জীওনলাল ঘর ঘর মিঠাই বিলি করেছেন ; দু'পহরে পূজার্চনা করিয়েছেন আর ঘর ঘর প্রায় হাত জোড় করে বলে এসেছেন—দেখবেন যেন ঐ সময়টায় লোকজনেরা ভিড় না করে, আর গোলমাল না হয়। কেন না সামান্য গোলমাল হলেই আমার বহুমাঈ ডর পেয়ে ভড়কে ওঠে, তার ডর হয়ে যায় কি যমদূতেরা তাকে নিতে এসেছে। আর, বেমার আরাম না হওয়া পর্যন্ত কেউ যেন দেখতেও না আসে।

জীওনলালজী বলেছেন, দেবতার দয়ায় আর খুদার মেহেরবানিতে বহুমাঈ আরাম হয়ে যান—তারপর আমি মিঠাইয়ের ভার নিয়ে ঘর ঘর সক্কলকে প্রণাম করাব। আমার বহুমাঈ যদি মারা যায় তবে একমাত্র বেটা আমার, উ বাউরা হয়ে যাবে। কি হয়তো নিজেই খুন হবে। এরই জন্যে আমার এত আকুতি। বৃদ্ধ জীওনলাল প্রায় কেঁদে ফেলেছিলেন।

রাত্রি তখন একপ্রহর পার হয়েছে। লালকিল্লায় নহবত সবে বেজে শেষ হয়ে গেছে। শিয়ালেরা ডেকে চুপ হয়েছে ; এই সময় ডুলি কাঁধে বেহারারা এসে মহল্লায় ঢুকল। বারণ সত্ত্বেও কিছু কিছু লোক দরজায় উঁকি মেরে দেখার আকর্ষণ সামলাতে পারে নি।

জীওনলাল হাত জোড় করে ইশারায় তাদের ঘরে যেতে বলে তাদের দরজা বন্ধ করালে।

ডুলি ঢুকে গেল বাড়ির মধ্যে।

কবি সুভগ ডুলির আবরণ সরিয়ে দিয়ে একটি নিঃসাড় নারীদেহ সন্তর্পণে পাঁজাকোলা করে তুলে ঘরে নিয়ে গেল। নিচের তলাতেই ভিতরের দিকের একটি ঘরের মধ্যে প্রস্তুত করা বিছানার উপর শুইয়ে দিলে তাকে বয়ে এনে।

একজন প্রৌঢ় মুসলমান এসে বসলেন বিছানায়। তারপর তাঁর ঝোলা থেকে শিশি বের করে সুভগের হাতের তালুতে ঢেলে শিরিনের দুই হাতের এবং পায়ের তালুতে মাখিয়ে দিতে বললেন—ভাল করে মালিশ করো।

সুভগ হাতে মালিশ নিয়েই যেন চমকে উঠল। মালিশটা যেন তার হাতের তালুতে দাহের সৃষ্টি করছে। সে মৃদু স্বরে বললে—এত গরম?

হেসে প্রৌঢ় মুসলমানটি বললেন—মরণের হিম কাটিয়ে জীবনের উত্তাপ আনতে হবে ববুয়া। গরম না হলে চলে! সূরজ মহারাজের বৈশাখী তাপ না হলে বরফ গলে! লেকেন হুঁশিয়ার—এ হাত যেন জিভে ঠেকিয়ো না। স্রিফ মালিশ করে যাও। আর একজন মালিশ নাও—হাতে লাগাও। আর একজন আংরার সেক লাগাও।

উদ্গ্রীব হয়ে জীওনলালজী দাঁড়িয়ে ছিলেন শিয়রে। হাতে তাঁর একটা বাতি। হঠাৎ একসময় বললেন—যেন নিঃশ্বাস পড়ছে হকিমসাহেব।

হকিমসাহেব তখন হাত ধুয়ে ওষুধ মাড়ছিলেন। তিনি নিঃশব্দে উঠে এসে বাঁ হাতখানি ধরলেন।

ঘাড় নাড়লেন—হাঁ চলছে—নাড়ী আসছে আবার যাচ্ছে। আবার আসছে। আসছে।···হাঁ। আসছে! চোখের পাতা কাঁপছে।

সাত

এত সাবধানতা সত্ত্বেও শিরিন বাঁদীর ব্যাপারটা ঠিক গোপন থাকে নি। বাদশাহ কাশ্মীরে গ্রীষ্ম কাটিয়ে দিল্লী হয়ে আগ্রায় ফিরে এসেছেন। এরই মধ্যে শাহজাদী বেগম রৌশনআরা সাহেবা ব্যাপারটার গন্ধ পেয়েছিলেন। বেগম রৌশনআরা শাহানশাহ সাজাহানের দ্বিতীয়া কন্যা। অসামান্যা রূপবতী কিন্তু তার চেয়েও বুদ্ধি তাঁর প্রখর। বড় বোন জাহানআরা বেগম সম্রাটের সর্বাধিক প্রিয়পাত্রী। মমতাজমহলের মৃত্যুর পর থেকে এই কন্যাই তাঁর সব হয়ে উঠেছে। একাধারে কন্যা এবং জননীর মত সারাক্ষণ তাঁকে ঘিরে রাখেন। আর ছেলেদের মধ্যে প্রাণাধিক প্রিয় জ্যেষ্ঠপুত্র শাহজাদা দারা সিকো। অজস্র দানে দাক্ষিণ্যে এই পুত্র এবং এই কন্যাটিকে শাহানশাহ ত্বনিয়ার সামনে তুলে ধরেছেন।

বাদশাহের পুত্র কন্যাদের মধ্যে বাল্যকাল থেকেই এ নিয়ে ঈর্ষার আর শেষ নেই। তুচ্ছ খুঁটিনাটি ঘটনায় এই বিরোধ বিশাল মুঘল সাম্রাজ্যের ত্বর্ভেদ্য এবং অপরাজেয় পাথরের কিল্লার মাটির তলায় বারুদঘরের চারিপাশে আগুনের টুকরোর মত একের পর এক জমা হয়ে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছিল।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে পিতার স্নেহ সমাদর নিয়ে যে ঈর্ষা সে ঈর্ষা সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারকে কেন্দ্র করে পরিপুষ্ট হয়ে উঠল। দল গড়ে উঠেছে। আমীর উমরাহ বড় বড় দায়িত্বশীল শক্তিশালী কর্মচারীরা ভিতরে ভিতরে এক এক শাহজাদাকে কেন্দ্র করে দল বেঁধেছে। বিশাল সাম্রাজ্যের সামন্ত রাজারা নবাব এবং সুলতানেরাও তাই। বাদশাহী কিল্লার মধ্যে বাদশাহী অন্দরেও তাই।

জাহানআরা বেগম শাহজাদা দারা সিকোকে ভালবাসেন, তাঁর স্বার্থ দেখেন, শুধু ভালবাসাই নয়, শাহজাদা দারা সিকো এবং শাহজাদী জাহানআরা ত্বজনেই ধর্মমতে প্রায় এক পথের পথিক।

রৌশনআরা বেগম এবং শাহজাদা ঔরংজেবও ঠিক তাই—তাঁরা ধর্মমতে এক, এবং জাহানআরা ও দারা সিকোর মত ও পথের ঘোরতর বিরোধী।

দারা সিকো জন্ম থেকে সিদ্ধ ফকীর সাধক খাজা মৈনুদ্দিন চিস্তির খাদিম, বেগম জাহানআরা নিজে মৈনুদ্দিন চিস্তির মুরিদা। পরে দারা সিকো কাদির জিলানীর কাদেরিয়া পন্থের ভক্ত হয়েছেন, কাদেরিয়া পীর মিয়া মীরের কাছে এসে মুগ্ধ হয়ে তাঁর পন্থাকেই শ্রেষ্ঠ পন্থা বলে মনে করেন। জাহানআরা বেগম কাদেরিয়া না হলেও তার সঙ্গে বিরোধ নেই। কিন্তু ঔরংজীব এবং রৌশনআরা মনে করেন এ পন্থা কুরান এবং হাদিসের বিরোধী। ইসলামের পক্ষে এর চেয়ে ক্ষতিকর আর কিছু হতে পারে না।

দারা সিকো কাফির। ইসলামে সে অবিশ্বাসী। ইসলামের বিরোধী। সে সম্রাট হবে কল্পনা করলে শাহজাদা ঔরংজীব ক্ষুব্ধ রোষে চীৎকার করে উঠতে চান; কিন্তু তিনি বিচক্ষণ—অতি ধীর—বুদ্ধিমান। সে রোষ এবং ক্ষোভকে চেপে জমা করে রাখেন। কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে আত্মসংবরণ করে হেসে কথা বলেন। যারা তাঁর দলের—তাঁর অতি অন্তরঙ্গ তাঁরা তার অর্থ বুঝতে পারেন।

বেগম রৌশনআরাও তাই। ঠিক যেন ঔরংজীবের অর্ধাংশ। অসামান্যা রূপসী—চোখে উজবেগীস্তানের পিঙ্গলাভা, চকিতে সেখানে আগুন দপ করে জ্বলে উঠে নিভে যায়। যার চোখে পড়ে তার মনে হয় বেগমসাহেবার বৈদুর্যমণির মত চোখের তারা আলোর ঝিলিক লেগে বুঝি ঠিকরে পড়ছে।

বেগম রৌশনআরার উপর এখানকার ভার দিয়ে ঔরংজীব অনেকখানি নিশ্চিন্ত হয়ে দক্ষিণের সুবাদার হয়ে সুকৌশলে ভবিষ্যতের আয়োজন করে চলেছেন। রৌশনআরা আগ্রা কেল্লার মধ্যে খোজা এবং বাঁদীদের মধ্যে বাছাই করে গুপ্ত সংবাদ সংগ্রাহকের দল ছড়িয়ে রেখেছেন। কিল্লার বাইরে শহরে তাঁর সংবাদ সংগ্রাহক সংগ্রাহিকা

আছে। তারা সব নানান ধরনের পেশার লোক। কেউ কোন পীর বা ফকিরের খাদিম, কেউ ব্যবসা করে, শ্বেত-পাথরের জিনিস বেচে, কেউ চুড়ি বিক্রি করে; জর্দা কিমাম আতর নিয়ে আসে। এসে খবর বিক্রি করে যায়। আর কিল্লার মধ্যে খোজা গোলাম এবং বাঁদী যারা তারা বকশিশ পায়। এ কাজ শুধু তার বাঁদী এবং গোলামেরাই করে না, শাহ-ই-আলিজা দারা সিকো, জাহানআরা বেগম, এমন কি খুদ বাদশাহের বান্দা বান্দীর মধ্যেও তাঁর গুপ্তচর আছে। আগ্রায় আছে দিল্লীতে আছে। লাহোরে আছে।

এই দল বলতে গেলে তুটি। শাহ-ই-আলিজা দারা সিকো এবং শাহজাদী জাহানআরার এক দল—দ্বিতীয় দল ঔরংজীবের। অপর তুই ভাই শাহজাদা সুজা এবং শাহজাদা মুরাদেরও আপন আপন দল আছে কিন্তু সে দল আগ্রা দিল্লীতে খুব শক্তিশালী নয়।

সম্রাট সাজাহানের আর এক কন্যা আছেন—কনিষ্ঠা কন্যা শাহজাদী গৌহরআরা বেগম; কিন্তু শাহজাদী জাহানআরা বা শাহজাদী রৌশনআরার মত ব্যক্তিত্ব সাহস বা বুদ্ধি তাঁর নেই। তিনি শাহজাদা দারার সপক্ষে নন। তাঁর বিপক্ষেই। বাবা সম্রাট—তিনি দিন তুনিয়া গর্দানের মালিক তবু তিনি বাপ—তাঁর স্নেহে সকলের সমান অধিকার। সেই অধিকার তিনি শাহজাদী জাহানআরার সঙ্গে সমানভাবে পান না এই অভিমান থেকেই তিনি দারা সিকো এবং জাহানআরার বিরোধী।

সম্রাট সাজাহানের আর তুই বেগম এখনও জীবিত, কিন্তু তাঁদের কোন ক্ষমতাই নেই। তবে তাঁরাও কন্যা জাহানআরার প্রাধান্যে ক্ষুব্ধ।

চারিদিকে ছড়ানো এই গুপ্তচরের দল থেকেই এ সংবাদ রৌশনআরা পেয়েছেন। প্রথম পেয়েছিলেন লাহোরে।

কাশ্মীর যাবার পথে দিল্লী থেকে রওনা হয়ে লাহোরে এসে বাদশাহ দিন দশেক ছিলেন। লাহোর তখন জমজমাট।

কান্দাহার নিয়ে আবার যুদ্ধের সম্ভাবনা প্রবল হয়ে উঠেছে। প্রথমবার শাহজাদা দারা সিকো অভিযানের নেতৃত্ব নিয়ে কাবুল পর্যন্ত না পৌঁছুতে পৌঁছুতে ইরানের শাহ আব্বাস তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে পিছন ফিরে চলে গিয়েছিলেন। ওদিকে তখন তুর্কীস্তানের অধীশ্বর সুলতান মুরাদ সসৈন্যে এসে ইরানের পশ্চিম সীমান্ত আক্রমণ করেছেন। পূর্ব দিকে হিন্দুস্তান পশ্চিম দিকে তুর্কীস্তান—এই দুই বিপরীত দিকে যুদ্ধ করবার সাহস তাঁর হয় নি। দারা সিকোকে যুদ্ধ না করেই ফিরে আসতে হয়েছিল। দু বছর পর তুর্কীস্তানের বাদশাহ সুলতান মুরাদের মৃত্যুতে ইরানের শাহ আব্বাস আবার সুযোগ পেয়েছেন। পশ্চিম দিক থেকে তুর্কীদের বিতাড়িত করে আবার মুখ ফিরিয়েছেন পূর্ব দিকে—হিন্দুস্তানের বাদশাহের এলাকাভুক্ত কান্দাহার তাঁর লক্ষ্য।

বিশ্বস্ত চর খবর এনেছে ইরানের শাহ আব্বাস তাঁর মীরবক্সী অর্থাৎ প্রধান সেনাপতি রুস্তম খাঁ গুর্জীকে সসৈন্যে খুরাসানের রাজধানী নিশাপুরে ছাউনি ফেলে তাঁর জন্য প্রতীক্ষা করতে বলেছেন। তিনি নিজে এক বিরাট ইরানী বাহিনী তৈরি করে সেই বাহিনী নিয়ে এসে যোগ দেবেন রুস্তম খাঁর বাহিনীর সঙ্গে। তারপর মিলিত বাহিনী এগিয়ে চলবে হিন্দুস্তানের এলাকার দিকে। শুধু কান্দাহারই তাঁর লক্ষ্য নয়, কান্দাহার, ডেরা ইসমাইল খাঁ, ডেরা গাজী খাঁ, এমন কি কাবুল গজনী পর্যন্ত তাঁর লক্ষ্য।

হিন্দুস্তান তার জন্য তৈরী হচ্ছে। পিছিয়ে নেই। মির্জারাজা জয়সিংহ, কাছোয়া রাজপুত রাজা মহারাজ যশোবন্ত সিংহের কাছে পরোয়ানা গেছে তাঁরা যেন অবিলম্বে লাহোরে এসে শাহজাদার সঙ্গে মিলিত হন। সৈয়দ খাঁ জাহান, রুস্তম খাঁ লাহোরেই রয়েছেন। মুলতানের সুবেদার সৈয়দ খাঁকে তৈরী থাকতে আদেশ দেওয়া হয়েছে। পথে শাহজাদার বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হবেন।

বাদশাহ সাজাহান লাহোরের গ্রীষ্মের মধ্যেও এই কারণেই

দিন দশেক থাকবার মনস্থ করেছিলেন। নিজে সমস্ত দেখেশুনে যাবেন।

এরই মধ্যে সেদিন রৌশনআরা বেগমের খোজা খাদিম এসে তাঁর কামরার সামনে দাঁড়াল। বেগম-সাহেব কেতাব পাঠ করছিলেন, একজন বাঁদী তাঁকে তালপাতার পাংখা জলে ভিজিয়ে তাই দিয়ে বাতাস দিচ্ছিল।

রৌশনআরা মুখ তুলে তাকে দেখে প্রশ্ন করেছিলেন—কি ইব্রাহিম? কিছু আর্জ আছে তোমার?

তসলিম জানিয়ে ইব্রাহিম বললে—দিল্লী থেকে আজ একজন হরকরা এসেছে। শাহানশাহের দরবারে চিঠি আর কাগজপত্র পেশ করে আমার খোঁজ করছিল। খবর পেয়ে আমি তার কাছে গিয়েছিলাম। সে এই অজুপতরী আমাকে দেখালে।

আংটিটি সে সসম্ভ্রমে বাড়িয়ে ধরলে।

আংটিটি ভাল করে দেখলেন রৌশনআরা। তাঁর গুপ্তচর যারা তাদের কাছে চিহ্নস্বরূপ এমনি আংটি দেওয়া আছে। সে আংটি মধ্যে মধ্যে বদল হয়। এক ধরনের আংটি কিছুদিনের পর বাতিল করে নতুন আংটি দেওয়া হয়। এ সেই আংটির আধুনিকতম আংটি। এই এইবারই দিল্লী ছাড়বার মুখে এই আংটি তিনি চলতি করে এসেছেন।

রৌশনআরা বললেন—কি বললে সে?

—সে আপনার কাছে বলতে চায়।

—আমার কাছে? কেন? এত জরুরী?

—সে তাই বলে।

রৌশনআরা একটু ভেবে নিয়ে বললেন—সন্ধ্যার পর। আমার মাথা ধরবে। আমি শাহানশাহের হারেমের মজলিস থেকে চলে আসব। তুমি তাকে নিয়ে আসবে ডুলিতে চাপিয়ে, সে জেনানা সেজে আসবে। আমার এই আংটি নাও। বলবে—। কি বলবে?

বলবে—শাহজাদা ঔরংজীবের ফৌজে কাজ করত তার বেটা। সে বেটা তার মারা গেছে দক্ষিণের লড়াইয়ে। তার জন্যে সে রৌশনআরা বেগমের মারফতে আর্জি জানাবে শাহজাদার কাছে। কিল্লার ফটকে কে আছে খবর নাও। বিলকুল ভার তোমার উপর।

খোজা ইসমাইল অভিবাদন করে বললে—তার জন্যে শাহজাদী এতটুকু চিন্তা করবেন না। খোজা ইসমাইল তার মালিকানএর জন্যে জান দিতে পারে।

* * * *

মোগল দরবারে, কিল্লায়, হারেমে যত কড়াকড়ি বিচিত্র পথে তত তার ছিদ্রপথ। সেই পথে ষড়যন্ত্র চলে। প্রণয় চলে। গুপ্তচরেরা আনাগোনা করে। নিশান অর্থাৎ চিঠি আসে চিঠি যায়। বাইরের পুরুষ এসে অন্দরে ঢোকে। ধরা পড়লে কিল্লার অন্দরে বিচার হয়। কিল্লার ভিতরেই সাজা হয়। হয়তো মানুষটা হারিয়ে যায়। সুতরাং লোকটির বৃদ্ধা মুসলমানীর মত বোরকা পরে ডুলির ভিতরে আত্মগোপন করে আসতে বাধা হয় নি।

শাহজাদা ঔরংজীবের সঙ্গে ভগ্নী শাহজাদী রৌশনআরা বেগমের প্রীতির কথা সকলে জানত। সুতরাং শাহজাদা ঔরংজীবের মৃত একজন বিশ্বস্ত অনুচরের মা অনুগ্রহপ্রার্থী হয়ে রৌশনআরার কাছে আসবে এতে প্রশ্নের কিছু ছিল না।

শাহজাদী ঘরের মধ্যে কালো বোরকায় মুখ আবৃত করে বসে ছিলেন। বোরকা পরে বৃদ্ধার ছদ্মবেশে লোকটি এসে কুর্নিশ করে দাঁড়াল।

শাহজাদী কিছু বলবার আগেই খোজা ইব্রাহিম বললে—কথা বলবে খুব আস্তে। মনে রেখো তুমি ঔরৎ।

সে ঘাড় নাড়লে।—হ্যাঁ।

শাহজাদী বললেন—কি বলতে এসেছ তুমি? কি এমন খবর যে তুমি তা ইব্রাহিমকে বলে বিশ্বাস করতে পার নি?

সে একখানি চিঠি বাড়িয়ে ধরলে।

—কার চিঠি ?

—তা আমি জানি না।

—কে দিয়েছেন ?

—আমীর-উল-উমরা জাফর খান।

চিঠিখানি নিয়ে বেগম রৌশনআরা পাঁচখানি মোহর তার হাতে দিয়ে বললেন—তোমার ইনাম! ইব্রাহিম, তুমি একে বাইরে রেখে এস।

অত্যন্ত মৃদুস্বরে লোকটি এবার বললে—হুজুরাইন, আরও কয়েকটা কথা বলবার জন্যে বলে দিয়েছেন। সে কথা চিঠিতে নেই।

—কি কথা ?

—তোগলকাবাদের কাছে এক মহল্লা আছে—সে মহল্লায় থাকে এক কিমাম জর্দাওয়ালী হামিদন বিবি। সে বেগমসাহেবার কাছে অনেকবার এসেছে।

—হাঁ। জানি।

—সে একটা খবর আমীর-উল-উমরাকে জানিয়ে গেছে।

—কি খবর ?

—শিরিন বলে শাহানশাহের এক বাঁদী জওহর খেয়ে মরেছে সেদিন।

—হাঁ।

—সেইদিন রাত্রে তাদের মহল্লায় এক ডুলি আসে। তার ক'দিন আগে থেকে এক হিন্দু বানিয়া এসে এক মোকাম কেরায়া নিয়েছিল। বলেছিল তার বেটার বহুর বহুৎ বেমারী।

লোকটি সমস্ত বিবরণ বলে গেল। বলে বললে—হামিদন বিবির কিছু সন্দেহ হয়েছিল—তার কারণ সে শাহ-ই-আলিজা দারা সিকোর একজন অতি বিশ্বস্ত মুন্সীকে দেখেছিল ওই ডুলির সঙ্গে।

—আচ্ছা।

—হুজুরাইন, তারা চলে গেলে হামিদন তামাম রাত জেগে বসে ছিল। জানতে কিছু তখন পারে নি। তবে সন্দেহ হয়েছিল শাহ-ই-আলিজার নোকরকে দেখে। তারপর সে ওই মোকানের মালিক জীওনলালের কাছে আসা যাওয়া করেছে। খুব দর্দ দেখিয়েছে। এবং ওই বেমারী হয়েছিল যে বহুর তার সঙ্গেও জানপহছান করেছে। সে বলেছে—এই বহু কখনও জীওনলালের বেটার বহু নয়। তার চুলের দিকে তাকিয়ে মুখের দিকে তাকিয়ে সে নিশ্চয় বলতে পারে এই লেড়কীর নাম শিরিন। এ শিরিন নাকি জওহর খেয়ে মরার ভান করেছিল। কিন্তু মরে নি। তাকে কবর দেবার সময় মাটিতে ফাঁক রেখে দেয়া হয়েছিল। এবং ঠিক বখ্‌তে তুলে এনে হকিমের দাওয়াইয়ে আবার বেঁচেছে। এ শিরিন বাদশাহের বাঁদী শিরিন। এ এক হিন্দুকে ভালবাসত—কিন্তু সে হিন্দু মুসলমান হতে চায় নি বলে শাহ-ই-আলিজা এই ভাবে তাকে ওই হিন্দুর হাতে তুলে দিয়েছেন। তারা এখন সে মহল্লা থেকে চলে গেছে। আরও একটা খবর সে দিয়েছে—সে বলেছে এই শিরিন কাশ্মীরী মেয়ে, প্রথম সে ছিল শাহজাদা ঔরংজীবের বেগম নবাববাঈ সাহেবার বাঁদী।

রৌশনআরা চঞ্চল হয়ে উঠলেন।

এত দরদ দারা সিকোর? এক কাফের জোয়ানের জন্য? কিন্তু—।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—কিন্তু কবরের মধ্যে যদি শিরিনের দেহ পাওয়া যায়?

লোকটি কম্পিতকণ্ঠে বললে—কবরে মানুষের কঙ্কাল আছে। জাফর খান সাহেব খবর শুনে খুঁড়ে দেখেছিলেন।

—তবে?

—শাহ-ই-আলিজার লোকেরা জাফর খানের সন্দেহ সম্ভবতঃ বুঝতে পেরেছিল। তারাই কোথা থেকে এক মুর্দার হাড়গোড় এনে পুঁতে দিয়েছে।

—হুঁ! তুমি যাও।

*　　*　　*

স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন রৌশনআরা বেগম। এ কি পাপ! এ কি ধর্মের অবমাননা! চিঠিখানা যেটায় মূল সংবাদ আছে সেটা খুলতে তিনি ভুলে গেছেন। ইসলাম! পবিত্রতম ধর্ম। খুদ্ খুদা লা ইলাহি ইল্লাল্লা—তাঁর নিজের বাণী হজরত মহম্মদ শুনেছেন। তিনি বলেছেন—একমাত্র মুসলমানের জন্য খোলা থাকবে স্বর্গের দ্বার। একমাত্র ইসলামের মধ্য দিয়েই আদমের লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি পুত্র-কন্যাদের মুক্তি নির্ভর করছে। সেই পবিত্র ইসলাম নিয়ে এসেছিলেন এ কাফেরের মুল্‌কে এই পুতুল পুজোর দেশে চাঘতাইয়া বাবুর শাহ।

শাহ বাবুর, তুমি আল্লাহতয়লার প্রিয় সন্তান। এই কাফেরদের মুল্‌কে ইসলামের বাদশাহী এখ্‌তিয়ার তুমি কায়েম করেছ। তুমি চেয়েছ এই কাফেরদের মুল্‌ক—এই খুদাতয়লার এমন সুন্দর জমীন, এই জমীনের মুল্‌ককে কাফেরদের কাবিজ থেকে মুক্ত করতে।

হায় বাবুর শাহ! হায় হায়! তোমার বংশে যদি আকবর শাহ শুধু কাফেরদের খুশী করবার জন্যে এই এক পথ না দেখাতেন! তার দৃষ্টান্তেই শাহানশাহের এই আদুরে ছেলেটি আজ এক নতুন পথ ধরেছে। দারা সিকো কাফির। হিন্দুদের শাস্ত্র পড়ে তার অনুবাদ করে। বলে কি—

অতি তিক্ত হাস্য ফুটে উঠল রৌশনআরার মুখে।

হঠাৎ খোজা ইব্রাহিম এসে দরজার সামনে দাঁড়াল। মৃদুস্বরে ডাকলেন—হুজুরাইন!

ফিরে তাকালেন রৌশনআরা তার দিকে।

—বড়ী বেগমসাহেবা হজরত জাহানআরা আর শাহ-ই-আলিজা—

চমকে উঠলেন রৌশনআরা। কি ব্যাপার? হঠাৎ তাঁর এত সৌভাগ্য? শাহ-ই-আলিজা শাহজাদা—ভবিষ্যতে হিন্দুস্তানের

বাদশাহ দারা সিকো—তাঁর সঙ্গে হিন্দুস্তানের বাদশাহী হারেমের মালিকান হজরত জাহানআরা বেগম !

তিনি উঠে দাঁড়ালেন। হাতে চিঠিখানা ধরাই আছে। ওপাশে পদশব্দ শোনা যাচ্ছে। কোথায় রাখবেন চিঠিখানা !

খোজা ইব্রাহিম হাত পাতলে। দ্বিধা না করেই রৌশনআরা তার হাতে চিঠিখানা দিয়ে এগিয়ে গেলেন দ্বারপ্রান্তে ভাই আর বোনকে প্রত্যুদ্গমন করে আনবার অছিলায়—খোজা ইব্রাহিমকে অবসর দিলেন চিঠিখানা সামলাতে। ইব্রাহিম চিঠিখানা দলা পাকিয়ে নিজের মুখের মধ্যে পুরে শক্ত করে দাঁতে টিপে দাঁড়িয়ে রইল।

রৌশনআরাকে দেখেই জাহানআরা বললেন—এই যে তুমি উঠে দাঁড়িয়েছ—তোমার শিরঃপীড়ার কথা শুনে আলাহজরত চিন্তিত হয়ে পড়লেন। বললেন—তুমি একবার দেখে এসো জাহানআরা—রৌশনআরার মধ্যে মধ্যে শিরঃপীড়া হয়। উঠতে পারে না। এ তো ভাল নয় !

রৌশনআরা বললেন—কমে এসেছে। মগজে দর্দ হতেই ভেবেছিলাম সেই রকমই হবে, হয়তো সারারাত্রি কষ্ট পেতে হবে। কিন্তু—। একটু হেসে বাকীটা আর বললেন না।

দারা সিকো বললেন—রৌশনআরা বড় বেশী চিন্তা করে।

মুখ লাল হয়ে উঠল রৌশনআরার। তিনি ও কথাটা এড়িয়ে গিয়ে বললেন—যখন এতবড় সৌভাগ্য আমার হয়েছে—বড় ভাই বড় বহেন—শাহ-ই-আলিজা হিন্দুস্তানের ভাবী সম্রাট আর হজরত বেগম শাহজাদী জাহানআরা তসরীফ নিয়ে আমার এই গরীবখানায় এসেছেন তখন ভিতরে এসে বসুন। কিছু শরবত পানের হুকুম হোক।

ভিতরে এসে সকলে বসলেন।

রৌশনআরা ইব্রাহিমকে ডেকে বললেন—বাঁদীদের বল শরবত পান আনবার জন্যে।

দারা সিকো বসে ঘরের চারিদিক দেখে বললেন—তোমার এখানে কোন অসুবিধা হচ্ছে না তো বহেন? লাহোরে এখন তো আমার ভার সমস্ত কিছুর। বলতে গেলে শাহানশাহের এই তাঁবেদারেরই তোমরা অতিথি।

রৌশনআরা বললেন—না, কোন অসুবিধা নেই। তবে আগ্রা দিল্লীর সুবিধা কোথায় মিলবে এখানে।

—তবু পিতামহ জাহাঙ্গীর শাহ এখানে বাস করতেন—এ তাঁর অত্যন্ত প্রিয় স্থান ছিল বলে অনেক ইন্তিজাম অনেক শাহী বন্দোবস্ত তিনি করে গেছেন। বলেই হঠাৎ বলে বসলেন—শুনলাম আজ নাকি এক বুড়ী এসে দিক করে গেছে তোমাকে? কে না কি ভাই শাহজাদা ঔরংজীবের এক বিশ্বস্ত অনুচরের আম্মা তোমার কাছে এসেছিল? তার ছেলে নাকি ঔরংজীবের হুকুমৎ হাসিল করতে গিয়ে দুশমনের হাতে খুন হয়েছে; তার আম্মার নাকি বড়ই অভাব —তার জন্যে আরজ করতে তোমার কাছে এসেছিল?

রৌশনআরা শক্ত হয়ে গেলেন ভিতরে ভিতরে। লোকটা ধরা পড়ে নি তো? না পড়লে এ কথা দারা সিকো জানলে কি করে? তিনি ভাবছিলেন কি বলবেন।

জাহানআরা বললেন—রৌশনআরার দিল বড় উদার। সে এই অসুস্থ শরীরেও সে বৃদ্ধার সঙ্গে দেখা করেছে। কি তার আরজ? বল না তার নাম পতা। দারা সিকো এখন এখানকার সর্বময় কর্তা। তিনি তার খোঁজ করে তার যা অভাব আছে পূরণ করবেন। কি নাম তার রৌশনআরা?

অসাধারণ বুদ্ধিমতী এবং ধীর রৌশনআরা।—তাই তো! কি নামটা বললে আমি তো ভুলে গেলাম! আঃ—কি নাম?

এই সব বাঁদী সোনার পরাতে করে শরবতের গেলাস এনে সামনে ধরলে, তার পিছনে আর একজন বাঁদী, তার হাতের পরাতে পান।

রৌশনআরা একটা কাজ পেয়ে যেন বেঁচে গেলেন। তিনি নিজে হাতে গেলাস উঠিয়ে এগিয়ে দিতে দিতে বেশ সহজ হয়ে বললেন— শিরঃপীড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওই একটা উপসর্গ হয়েছে, এই মাথার দর্দের সময় যা বলি, যা শুনি সব কেমন ভুল হয়ে যায়। দর্দের সময় এল—বললে—আমি তাকে পঁচিশখানা আশরফি যা সামনে ছিল তাই দিয়ে বললাম—তুমি এই নিয়ে যাও। তারপর এখানে শাহ-ই-আলিজা আছেন—তাঁর দফ্‌তরে শাহজাদা ঔরংজীবের নামে দরখাস্ত লিখে পেশ করো। শাহ-ই-আলিজা তা পাঠিয়ে দেবেন শাহী হরকরা মারফত। তিনি ব্যবস্থা করবেন।

দারা সিকো বললেন—এ উপসর্গ ভাল নয় রৌশনআরা, তুমি চিকিৎসা করাও। উপেক্ষা কর না।

জাহানআরা বললেন—আজই আমি বলব আলাহজরতকে। আজকের এই ঘটনাই বলব। বলব—এ তো ভাল নয়!

রৌশনআরা বললেন—আমি নিজেই বলব ভাবছিলাম। মেয়েটা চলে গেল—একটু চোখ বুজেছিলাম। একটু ঘুম এসেছিল। হঠাৎ ঘুম ভাঙল—তারপর মনে হল এ কি স্বপ্ন দেখলাম আমি? ভাবনা আমারও হচ্ছে। শুনেছি শাহ-ই-আলিজা ভাইসাহেবের এক নাকি বিচক্ষণ হকিম আছেন দিল্লীতে। তিনি নাকি কবর থেকে মুর্দা তুলে তাকেও বাঁচাতে পারেন! ভাবছিলাম আলাহজরতকে বলব—শাহ ই-আলিজার সেই হকিমের নাম পতা জেনে তাকে দিয়েই চিকিৎসা করাব।

দারা সিকো যেন সোজা শক্ত হয়ে গেলেন।

জাহানআরা তাঁর মুখের দিকে তাকালেন।

রৌশনআরা হেসে পানের পরাত এগিয়ে দিলেন।

পানের খিলি প্রথমে নিলেন বড়ী বেগমসাহেবা হজরত জাহানআরা। কিমামের কৌটাটি খুলে সামনে ধরলেন রৌশনআরা। অপূর্ব মিষ্ট গন্ধে ঘরখানা মুহূর্তে ভরে উঠল। জাহানআরা কিমাম

তুলে নিয়ে বললেন—এ তো বড় অপূর্ব রৌশনআরা। এ কিমাম তুমি কোথা থেকে পেলে ? কই, আগে তো কখনও এ কিমামের খুসবু পাই নি !

শাহজাদা দারা সিকো কথার মধ্যে কথা পেড়ে দিয়ে প্রশ্ন করলেন—তোমাকে এমন তাজ্জব হকিমের খবর কে দিলে রৌশনআরা ?

দারা সিকোর কণ্ঠস্বর গম্ভীর। খানিকটা কঠোরও বটে। শাহজাদী জাহানআরা চকিত হলেন মুহূর্তের জন্য। তারপর বললেন—কেন ? দিল্লীর আধা-হকিম আধা-কবিরাজ হিন্দু ফকিরের মুরীদ আব্বাসউদ্দীন খাঁয়ের উপর তোমার তারিফের কথা কে না জানে ? হিন্দু ফকীর তাকে যে সব গাছগাছড়া চিনিয়ে দিয়ে গিয়েছেন, দাওয়াই বলে দিয়েছেন তাতে তো আশ্চর্য ফল পায় বলে শুনেছি। শুনেছি সাপে কেটে কি জওহর পিয়ে যারা মরে তাদের এতটুকু জান থাকলে সে বাঁচাতে পারে। রৌশনআরাকে কেউ তারই কথা বলে থাকবে। কিন্তু বহেন রৌশনআরা গোঁড়া সুন্নী মতে বিশ্বাসী—তার দাওয়াই খেলে কি তাতে গুনাহ হবে না তোমার ? সে তো শুনেছি খেতে হলে পহেলেই সেই হিন্দু ফকীরকে হিন্দুর মতন কপালে হাত ঠেকিয়ে সেলামত জানাতে হয়।

রৌশনআরার মুখ আবার লাল হয়ে উঠল। তিনি বললেন—নিশ্চয়ই না। তাহলে সে দাওয়াই আমি কখনও খাব না। শাহ-ই-আলিজার মত আমি কুরান হাদিশের নির্দেশ অমান্য করে কাফিরের শাস্ত্র পড়ি না দিন দুনিয়ার মালিকের পতা করবার জন্য। কি তোমার মতও বিশ্বাস করি না যে কাফিরও যেতে পারে বেহেস্তে, কাফিরের ধর্মের মধ্যেও সত্য আছে, ধর্ম আছে ! না, বিশ্বাস করতে পারি না। আর আমি জানি যারা এই রকম ভাবে কুরান হাদিশের ইজ্জতকে ছোট করে তাদের উপর খুদা নারাজ হন। পয়গম্বর রসুল গোসা করেন। এবং তারা শেষ পর্যন্ত—

হঠাৎ থেমে গেলেন রৌশনআরা। তাঁর চোখে পড়েছে শাহজাদা দারার ললাটে ভ্রূকুটি জেগেছে। মুখ লাল হয়ে উঠেছে। রৌশনআরা অতি চতুর। তিনি থেমে গেলেন এবং একটু চুপ করে থেকে কণ্ঠস্বর ভঙ্গি সব বদলে ফেলে সসম্ভ্রমে বললেন—অবশ্য শুনেছি শাহ-ই-আলিজা আল্লা প্রেরিত পুরুষ। এই লাহোরেই না কি একরোজ রাত্রে এক 'হাতিফ' (দেবদূত) তাঁকে দেখা দিয়ে কি কি সব বলেছিলেন—

শাহজাদা দারা তার কথায় বাধা দিলেন। আবেগ-প্রবণ তিনি। বাল্যকাল থেকেই আবেগ তাঁর প্রবল। এত প্রবল যে তিনি জেগে স্বপ্ন দেখেন—কল্পনায় রচনা করেন অনেক কিছু। তিনি কথায় বাধা দিয়ে বললেন—রৌশনআরা! হ্যাঁ আমি তাই বটে! আমি আল্লাকে শুধু নামাজ পড়ে আর গোঁড়া মোল্লার মত আচার আচরণ মেনে সন্তুষ্ট থাকতে পারি না, ভাবতে পারি না এতেই আমার সব হয়ে গেল। আমি জানতে চাই—তাঁকে বুঝতে চাই—তাঁর বাণী শুনতে চাই—তাঁর জ্যোতি চোখে দেখতে চাই। কলিজায় শামাদানের বাতির মত জ্বালিয়ে রাখতে চাই। দুনিয়ার কতটুকু বোঝ রৌশনআরা—কতটুকু জান? দিন দুনিয়ার যিনি মালেক—লা ইলাহা ইল্লাল্লা—যে আল্লা ছাড়া মাবুদ নেই—তিনি ছাড়া যেখানে স্রষ্টা নেই—তিনি ছাড়া যেখানে দেনেওলা আর দুসরা কেউ নেই সেখানে কাফেরের কথা ছাড় রৌশনআরা—এই কীট-পতঙ্গ মক্ষি গাছপালা—ফুল ফল কার ইচ্ছায় পয়দা হয়েছে—কে তাদের খেতে দেয়? কে তাদের বাঁচিয়ে রাখে?

আমিও ভাবতাম—আর শিউরে উঠতাম—মনে হত আমার গুনা হচ্ছে—কিন্তু একদিন রাত্রে এই লাহোরে যে কামরায় আমি থাকি ওই কামরায় বসে বসে ভাবছিলাম—তখন আমি শোকে কাতর—আমার প্রথম মেয়ে মারা গেছে ইতুলফিতরের দিন। ফকীর মিঞা মীরের উপদেশ শুনেও সান্ত্বনা পাই নি। ভাবছি—এই গুনাহের জন্যেই কি

খুদা আমাকে এই সাজা দিলেন? ঠিক এই সময় আমি শুনলাম—সেই শোকাচ্ছন্নতার মধ্যে শুনলাম—"দারা সিকো, তুমি মুষড়ে পড়ো না—তুমি ওঠো। তুমি এসেছ খোদাতয়লার কাজ করতে। তোমাকে যা বুঝবার শক্তি দিয়ে পাঠিয়েছেন খুদা তা আজও পর্যন্ত কোন বাদশাহ্, কোন সুলতান, কোন রাজাকে তিনি দেন নি। তুমি ওঠো!" একবার নয় রৌশনআরা, এক রাত্রে হাতিফ চার চার বার এসেছেন। চার বার তিনি এক কথা বলে গেছেন।

আমি মোল্লা নই রৌশনআরা। আমি ধর্মের গোঁড়ামি করে মানুষদের তাক্ লাগিয়ে তাদের বশ করতে আসি নি। আমি তাদের পথ দেখাতে এসেছি।

রৌশনআরা—

> "হিন্দু কহে শুন হুম্ বড়ে, মুসলমান কহে হম্
> এক মুংগ কা দু ফন্দ হ্যায় কৌন জিয়াদা, কৌন কম্?
> কৌন জিয়াদা কৌন কম্, করনা নেহি কাজিয়া—
> এক রামকা ভকৃত্ হ্যায় দুজে রহমান কা রাজিয়া।
> কহে দীন দরবেশ দুইয়ো সারিতান, মিল এক সিন্ধু—
> সাহিব সাবদা এক হ্যায়, এক মুসলমান হিন্দু।"

রৌশনআরা দৃঢ়ভাবে ঘাড় নাড়লেন—কথা বললেন না। না না না।

এর পর সব স্তব্ধ হয়ে গেল। দু পক্ষই। কয়েক মুহূর্ত পর জাহানআরা বেগম উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে দারা সিকোও উঠলেন।

জাহানআরা বললেন—উঠলাম রৌশনআরা।

রৌশনআরাও উঠে দাঁড়িয়ে অভিবাদন করে বিদায় সম্ভাষণ জানালেন। চলে গেলেন দারা এবং জাহানআরা। দারা সিকোর ভাবাবেগ তখনও নিঃশেষিত হয় নি। তিনি আবৃত্তি করতে করতেই অগ্রসর হলেন—

"বে নাম-ই-আন্‌কে উ নাম-এ না-দরদ—
বা-হার নাম-এ কি খওয়ানী সার বার আরদ্।"

যিনি স্রষ্টা যিনি দিন দুনিয়ার অধীশ্বর তাঁর কোন নামই নেই কিন্তু তুমি তোমার পছন্দমত যে নামেই ডাকবে তাতেই তিনি সাড়া দেবেন।

রৌশনআরার কপিশ চক্ষুতারকাদুটি ঝিকমিক করছিল। তিনি মৃদুকণ্ঠে বললেন—লা ইলাহা ইল্লাল্লা পয়গম্বর রসুল-এ আল্লা—কাফিরকে তুমি কখনও ক্ষমা করো না!

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আবার বললেন—হায় বাবুর, হায় হিন্দুস্তানের মুসলমান! এই তোমাদের বাদশাহ হবে।

—ইব্রাহিম!

—হুজুরাইন!

—হুঁশিয়ার হরকরা চাই—দক্ষিণ যাবে। শাহাজদা ঔরংজীবের কাছে।

নিজে কাগজ কলম নিয়ে চিঠি লিখতে বসলেন। "বাঁদী শিরিনের খবর জানাই। কথাটা আজ প্রমাণের উপায় নেই। কবরে মুর্দার কঙ্কাল ওরা পুরে দিয়েছে—কিন্তু—।

"এদের সন্ধান আমি করছি। এবং পরে জানাচ্ছি। আরও একটা খবর জানাই। ইরানের সেই ইহুদী মুসলমান, সৈদ মহম্মদ, অভয়চান্দ নামে এক কাফির লড়কাকে নিয়ে যে ইসলামকে বরবাদ করেছে সে গেছে দক্ষিণ—বোধ হয় গোলকুণ্ডা।"

আট

—সৈদ সাহেব—মালিক—

—অভয়চান্দ !

—এ আমরা কোথায় যাচ্ছি ? কোন্ মুলুকে ?

—যাচ্ছি অভয়চান্দ, দক্ষিণ। দক্ষিণে গোলকুণ্ডার নাম শুনেছ ? কুতুবশাহী সুলতানের এলাকা।

—কেন ? বেশ তো ছিলাম এই মুলুকে।

—তোমার কষ্ট হচ্ছে অভয়চান্দ ?

—কষ্ট ? না। কষ্ট নয়। এখানেও সেই জমিন আর দরিয়ার মুলুক, মাথার উপর আসমান, সেখানেও তাই। আর এখানেও মানুষ সেখানেও মানুষ। কষ্ট কেন হবে ?

মহম্মদ সৈয়দ থাট্টার সেই ইরানী সওদাগর বড় একখানা নৌকায় হিন্দুস্তানের পশ্চিম কিনারায় আরব সাগরে পাড়ি দিয়ে চলেছিলেন দক্ষিণে। থাট্টা এবং পাঞ্জাবের ব্যবসার পাট উঠিয়ে দিয়ে চলেছেন। এখানকার সব কিছু বিক্রি করে দিয়েছেন মহম্মদ সৈয়দ। মানুষটা যেন কেমন হয়ে গেছেন। অবশ্য গোড়া থেকেই মানুষ হিসেবে তিনি দশটা সাধারণ মানুষের মত নয়। অন্য রকম মানুষ। ইহুদী ধর্মশাস্ত্র কোরান প্রভৃতিতে অসাধারণ তাঁর পাণ্ডিত্য। তাঁকে লোকে বিশেষ করে মুসলমানেরা সম্মান ও শ্রদ্ধা করত। কিন্তু হঠাৎ এই অভয়চান্দ এল তাঁব জীবনে। তা থেকেই সব গোলমাল হয়ে গেল।

অভয়চান্দকে দেখেছিলেন প্রথম কবীরপন্থী সাধুদের সঙ্গে। আশ্চর্য তার মুখের মিল সেই সিরাজ শহরে দেখা সলিমার মুখের সঙ্গে। উদাস-দৃষ্টি বালক কোন্ দিগন্তের দিকে দৃষ্টি রেখে বসে ছিল। মহম্মদ সৈয়দ সে মুখের আকর্ষণে পথেই নেমে পড়ে সন্ধান নিতে গিয়েছিলেন—কে এ বালক।

সাধুদের সঙ্গে তিনি বিনীত শ্রদ্ধার সঙ্গেই আলাপ করেছিলেন। হঠাৎ বালক গান গেয়ে উঠেছিল—

ময় গুলাম ময় গুলাম ময় গুলাম তেরা—
ময় গুলাম।
তু দেওয়ান মেহেরবান—নাম তেরা সেরা—
ময় গুলাম তেরা।

অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন মহম্মদ সৈয়দ। মনে হয়েছিল দুনিয়ার দেওয়ানকে তিনি ওই আকাশের ওপারে যেন দেখতে পাচ্ছেন। তিনি তার নামটুকুই জেনেছিলেন—তার নাম অভয়চান্দ। তার বেশী সেদিন আর কিছু জানতে পারেন নি। তাঁকে ছুটে যেতে হয়েছিল থাট্টা বন্দরে। সেখানে ফৌজদার মনের রাগে তাঁর গদির উপর হামলা শুরু করেছে, মাল আটক করেছে সংবাদ নিয়ে লোক এসেছিল ঘোড়া ছুটিয়ে। চলে যেতে হয়েছিল তাঁকে কিন্তু লোক রেখে গিয়েছিলেন তিনি ওইখানেই; দুজন লোক। একজন তাঁকে এসে সংবাদ দেবে আর একজন সাধুদের সঙ্গেই থাকবে। মহম্মদ সৈয়দ থাট্টার কাজ সেরে এই সাধুদের কাছে এসে অভয়চান্দের পরিচয় নেবেন। তাঁর দৃঢ় ধারণা এ বাচ্চা সেই সলিমারই সহোদর। কারণ সলিমা হিন্দুস্তানের লেড়কী আর হিন্দুর মেয়ে, গোলাম বাঁদীর কারবারীরা তাকে এখান থেকে লুঠে নিয়ে গিয়ে ইরানে বিক্রী করেছিল। সে কথা তিনি সলিমার কাছে শুনেছেন। সলিমাকে কিনবার জন্য—তাকে নিয়ে দৌলতখানা বানিয়ে ঘর বাঁধবেন বলে তিনি মুক্তা জহরতের ব্যবসায়ী হয়ে এসেছিলেন থাট্টায়। ফিরে যাবার কথা দু বছরের মধ্যে। কিন্তু এর মধ্যে ইরান থেকে খবর পেয়েছেন যে সলিমার মালিকানের বেটীর বিয়ে হয়ে গেছে এবং সলিমাকে বিক্রী করে দিয়েছে তুরানের এক সুলতান গোছের আমীরের কাছে। যার ছেলে সলিমাকে শুধু বাঁদীই রাখে নি তাকে তার পরশতার অর্থাৎ উপপত্নী হিসেবে গ্রহণ করেছে।

মহম্মদ সৈয়দ আর ফিরে যান নি। তিনি ব্যবসা করে ধনী হতে চেয়েছিলেন। তারপর ইচ্ছে হয়েছিল হিন্দোস্তানের বাদশাহ—ছুনিয়ার সব থেকে ঐশ্বর্যশালী এবং সম্পদশালী বাদশাহ শাহানশাহ সাজাহানের দিল্লী দরবারে গিয়ে ছুর্লভ রত্ন সেলামী দিয়ে কুনিশ করে দাঁড়াবেন এবং ওমরাহী পাবেন। তারপর তিনি খেল খেলবেন। অসাধারণ পণ্ডিত তিনি। নিজে তিনি কবি। নিজের যোগ্যতায় তাঁর আস্থা আছে। তিনি জানতেন একবার দরবারে ঢুকতে পারলে তিনি উজীর-উল-মুল্ক হয়ে যাবেন, কারুর সাধ্য নাই তাঁর পথ রুখতে। বাদশাহী দরবারে রত্নবিলাসী সাজাহান বাদশা তাজের উপর কোহিনূর লাগিয়ে বসে থাকেন। তাঁকে চমৎকৃত করবার মত এক-ধরনের মুক্তা তিনি সংগ্রহ করাচ্ছিলেন। ইরানের দরিয়ায় এই মোতি হাজারে একটা মেলে। রঙ নীলাভ; আকারে নিটোল একটি পায়রার ডিমের মত। বহুদিন ধরে চেষ্টা করে সেই মুক্তা, সেইদিন রাত্রে থাট্টার কিছু উপরে একটা নতুন গড়ে ওঠা বন্দরে তিনি গোপনে খালাস করতে গিয়েছিলেন। খালাস করে ফিরে থাট্টায় এসে পৌঁছেই সামনেই দেখেছিলেন রহমতকে।

রহমত মহম্মদ সৈয়দের ঘোড়ার সহিস। তাকেই তিনি রেখে এসেছিলেন সাধুদের দলের কাছে। খবর আনবে সাধুদের। কোন্ দিকে গেল তারা। রহমতকে দেখেই জিজ্ঞাসা করেছিলেন মহম্মদ সৈয়দ—রহমত! কি খবর?

সালামত জানিয়ে রহমত বললে—সাধুর দল রওনা হয়েছে হুজুর পহরভর রাত থাকতে। গফুর তাদের সঙ্গে গিয়েছে।

—কোন্ দিকে গেল তারা?

—বোধ হয় গুজরাতের দিকে গেল।

—গুজরাতের দিকে? চিন্তিত হয়ে উঠেছিলেন মহম্মদ সৈয়দ। গুজরাত হিন্দুস্তানের মরুভূমি আর বদমাশ চোর ডাকাইতের এলাকা। সে দিকে গেল সাধুর দল? সারা হিন্দুস্তানে গুজরদের মত ছুর্ধর্ষ

ডাকাত নেই। খানাপিনার কষ্ট—ফসল হয় না। উপায়ও নেই তাদের। কিন্তু এই সাধুরা বিচিত্র! তারা ভয়ডর করে না। চলে—এই পথেই চলে। তীরথ দর্শন!

কত লোক যে হিংলাজ যায় এই থাট্টা হয়ে, পথে মরে, ডাকাতেরা মারে, জল অভাবে মরে, তবু এরা যায়!

সারারাত্রির ক্লান্তির পর কি করবেন সৈয়দ তা ঠিক করতে পারেন নি। তিনি চিন্তিত মনেই মুখ হাত ধুয়ে নাস্তা করে বিশ্রামের জন্য একটু শুয়েছিলেন। শোবার সঙ্গে সঙ্গেই আচ্ছন্ন হয়েছিলেন গভীর নিদ্রায়।

সে গভীর ঘুম তাঁর ভেঙে গিয়েছিল আশ্চর্য স্বপ্ন দেখে। স্বপ্নে তিনি দেখেছিলেন অভয়চান্দকে এবং সলিমাকে। বিচিত্রভাবে সলিমা অভয়চান্দ হয়ে যাচ্ছিল আবার অভয়চান্দ সলিমা হয়ে যাচ্ছিল। তারপর সব যেন এলোমেলো হয়ে গেল। সে যেন ঝড় এলো, আকাশ অন্ধকার হয়ে গেল, তারই মধ্যে উঠল আর্ত চীৎকার। সলিমার কণ্ঠস্বর! না—ওই অভয়চান্দের কণ্ঠস্বর! সে কণ্ঠস্বর যেন ঝড়ের সঙ্গে ধুলোবালির মধ্যে পাক খেতে খেতে চলে যাচ্ছে। তাঁর ঘুম ভেঙে গেল।

মহম্মদ সৈয়দ উঠে বসলেন। সর্বাঙ্গ তাঁর ঘামে ভিজে গেছে। বুকের মধ্যে নিদারুণ উৎকণ্ঠা জেগে উঠেছে। অভয়চান্দ সলিমা, সলিমা অভয়চান্দ দুজনেই কোন তুফানি হাওয়ায় হারিয়ে গেল।

বসে বসে অনেক চিন্তা করে শাস্ত্রসম্মত বুদ্ধিসম্মত স্বপ্নের ব্যাখ্যা করে তিনি সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছলেন। সে সিদ্ধান্ত হল এই যে সলিমা এবং অভয়চান্দ একটা দুই-বাতি শামাদানের দুই রোশনি। ওরা অভিন্ন। ভাই আর বহেন। একই রূপ, একই কণ্ঠস্বর, একই মন,—এর মধ্যে সে আছে তার মধ্যেও এ আছে। একই গুলাবের ডালে জোড়া গুলাবের মত। এবং এই যে ঝড়, এ ঝড় আর কিছু নয়—সে ঝড় ওই গোলামের কারবারীদের পোষা ডাকাতের দল। তারা

মরুভূমিতে উটের পায়ে ঝড় উঠিয়ে ছুটে এসে লুটে নিয়ে গেল। দুনিয়াতে গোলামীর ঝড় বইছে—তারা মানুষ বেচে বেচে দুনিয়াময় ছড়িয়ে দিচ্ছে। সলিমা গেছে এই ঝড়ে হারিয়ে, অভয়চান্দও গেল।

ভাবতে ভাবতে তিনি অধীর অস্থির হয়ে গিয়েছিলেন। সলিমা হারিয়েছে—অভয়চান্দও হারাল। না। তিনি হারাতে পারবেন না। তা তিনি পারবেন না। হয়তো এখনও সময় আছে। এখনও যদি জমিনের ইলাকায় খুব ভাল উটের দল নিয়ে গুজরাতের দিকে ছোটান আর হিন্দুস্তানের কিনারা বরাবর খুব দ্রুতগামী নৌকাতে কতকগুলো জবরদস্ত লোক পাঠান তবে জরুর দেখতে পাবেন।

অনেক ভেবে তিনি বিকেলবেলা পর্যন্ত তাই ঠিক করেছিলেন। দশটা খুব ভাল জোয়ান উট আর এক এক উটের পিঠে চার চারজন ভাড়া করা জবরদস্ত ইরানী সিপাহী নিয়ে বেরিয়েছিলেন নিজে। আর রহমতকে সঙ্গে নিয়ে দায়িত্বশীল কর্মচারী গাউস খাঁ বেরিয়েছিল জলপথে। সেখানেও লোক মিলেছিল ভাল। মামুদ থাট্টার সমুদ্রতটে গিয়ে আগের রাত্রের সেই নৌকাওয়ালাকেই নিয়ে এসেছিল। যে নৌকায় গত রাত্রে গিয়েছিল ইরানী মুক্তা আনতে। এবং সঙ্গে এনেছিল সেই সুলেমানকে, যে কাল মহম্মদ সৈয়দের সঙ্গে বদজবান করে জবাব দিয়ে জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে চলে গিয়েছিল। বলে গিয়েছিল—সুলেমান কারুর গোলাম নয়, সে কারুর মেজাজ সয় না। এর জন্য সে বাপ ভাইদের ছেড়েছে, তার ধর্ম ছেড়েছে, দেশ মুলুক ছেড়ে দরিয়ায় ভেসেছে সারা জীবনের মত। এ সেই লোক।

এর তাঁবে নাকি পঁচিশজন জাঁহাবাজ লোক আছে। যারা জমিনের উপর শেরের সঙ্গে লড়তে ভয় পায় না—দরিয়ায় হাঙ্গরের পেট চিরে দিয়ে ঘায়েল করে দেয়—বাদশাহী ফৌজের সঙ্গেও বনে জঙ্গলে লড়াই দেয়, আবার দরিয়ায় সওদাগরী নৌকাতে তারা পাহারা দিয়ে চলে এ বন্দর থেকে ও বন্দর, পথে হারমাদদের সঙ্গে

লড়াইয়ে পিছপাও হয় না। এবং এদের নজর আকাশের বুকে উড়ন্ত বাজপাখির মত—ওরা ঠিক বুঝতে পারে কোন্ নৌকা কাদের, কি তাদের মতলব এবং কতখানি তাদের হিম্মৎ। নৌকা এদের নিজের। নৌকায় লড়াই দেবার জন্যে চারিপাশে মোটা কাঠের আড়াল তৈরি করিয়েছে—তার ঘুলঘুলির মধ্যে থেকে তারা তীর ছোঁড়ে, বন্দুকও দাগতে পারে। এবং অব্যর্থ তাদের নিশানা। বিশেষ করে সড়কিতে। এইভাবে রওনা হয়েছিল দুই দল। মিলবার কথা ছিল সুরাট বন্দরে। জমিনের পথে প্রথম ভোরবেলা মহম্মদ সৈয়দ প্রথম খবর পেয়েছিলেন। রহমত ছিল গাউস খাঁর সঙ্গে নৌকায়। কারণ সেই চিনিয়ে দিতে পারবে অভয়চান্দকে বা সাধুর দলকে। আর জমিনের পথে তিনি নিজেই চলেছিলেন রহমতের নিশানা দেওয়া পথে। এ পথে সারারাত চলে ভোরবেলা একটা গাছতলায় দেখা পেয়েছিলেন গফুরের। গফুর গাছতলায় কাপড় মুড়ি দিয়ে শুয়ে ছিল। সকালের আলোয় সে উঠে বসেছে সবে, এমন সময় সামনের উটের একজন বলেছিল—ওই একটা আদমী। গাছের তলায়। ওই উঠে পালাচ্ছে আমাদের দেখে।

সত্যিই গফুর ছুটে পালাচ্ছিল পথ ছেড়ে রুক্ষ প্রান্তরের মধ্য দিয়ে। মহম্মদ সৈয়দ বলেছিলেন—হাঁকাও উট। ওকে ধর। ও পালাচ্ছে কেন?

মানুষের পায়ের চলন আর দীর্ঘপদ উটের দৌড়। অল্পক্ষণেই ধরা পড়েছিল। ধরা পড়ার পর সৈয়দ সাহেবের একজন লোক বলেছিল—আরে এ তো গফুর মিয়া!

গফুর বিহ্বলভাবে চীৎকার করেছিল—মেরো না—আমাকে মেরো না—আমি গরীব। আমার কাছে কিছু নেই।

সৈয়দ সাহেবের লোককে সে চিনতেও পারে নি। সে লোক আবার তাকে বলেছিল—গফুর মিয়া, কি হল তোমার? আমাকে পহচানতেও পারছ না! গফুর মিয়া!

এতক্ষণে সে একটু সাব্যস্ত হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে তাকে চিনে বলেছিল—তুমি—এরফান খাঁ?

—হাঁ। হাঁ! কি হল তোমার?

—ডাকু! এরফান মিয়া ডাকু! ও, খুব বেঁচে গিয়েছি।

—চলো, হুজুরআলি নিজে এসেছেন, এসেছেন কোন সাধুর দলের খোঁজে। যাদের সঙ্গে তুমি ছিলে—

—উ লোক সব মর গিয়া। ডাকুরা এসে সব কোইকো মার ডালা। চার পাঁচ জোয়ানকে আর ওই লৌণ্ডাকে নিয়ে গিয়েছে বেঁধে।

ততক্ষণ মহম্মদ সৈয়দ সাহেবের উট এসে সেখানে পৌঁছে গিয়েছে। তিনি চীৎকার করে উঠলেন—গফুর!

* * *

গফুর বলেছিল—সাধুর দল পরশু শেষ রাতে রওয়ানা হয়ে প্রথম প্রহর বেলা পর্যন্ত চলে আবার আশ্রয় নিয়েছিল একটা গাছতলায়। সেও তাদের সঙ্গে সঙ্গে এসে একটু দূরে বসেছিল। রহমত চলে গেলে সে সাধুর দলের কাছে পরিচয় দিয়েছিল গুজরাট যাত্রী বলে। বলেছিল—চলেছে সে মনের দুঃখে। এদেশে সে আর থাকবে না। এখানে তার কেউ নেই কিছু নেই। গুজরাটে তার মেহমান আছে, তার কাছে যাচ্ছে। সেখানেই কাটিয়ে দেবে অবশিষ্ট জীবন। সে ভাবছিল একলা যেতে হবে, কিন্তু সাধু মহারাজদের দেখা পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছে—সে তাদের সঙ্গে যেতে পারবে। সাধুরা তাকে অবিশ্বাস করে নি। তাদের উট চালাবার লোকেরও খামতি ছিল, তাই তাকে তারা সঙ্গে নিয়েছিল। কাল দুপহরে খানাপিনার পর আবার সন্ধ্যার মুখে তারা রওনা হয়েছিল, কারণ এই অঞ্চলটায় কোন বসত নেই। পথঘাটও নিরাপদ নয়। ক্রোশ কতক দূরে আছে একখানা গ্রাম আর গ্রামের মুখে সরাই, সেখান পর্যন্ত পৌঁছে রাত্রের মত বিশ্রাম করবে এবং আবার ভোর রাত্রে রওনা হবে।

ক্রোশ তিন তারা গেছে, ওদিকে সূর্য অস্ত যাচ্ছে, লাল হয়ে গেছে আসমান, এমন সময় ডাহিনা তরফ বাঁয়া তরফ দু তরফ থেকে বালিয়াড়ির মাঝবরাবর দেখা গেল দুই আঁধি। ধুলোর দুটো গম্বুজ যেন ঘুরপাক খেতে খেতে এগিয়ে আসছে।

—আঁধি? চীৎকার করে উঠেছিলেন মহম্মদ সৈয়দ।—ডাকু?

গফুর সবিস্ময়ে বলেছিল—জী হাঁ! আঁধি নয় ডাকু!

—উটের উপর সওয়ার হয়ে ছুটে এল। আমি দেখেছি আমি দেখেছি!

অবাক হয়ে গেল গফুর। শুধু গফুরই বা কেন সকলেই অবাক হয়ে গেল। মহম্মদ সৈয়দ সাহেব থাট্টায় কাল ছটফট করেছেন। তারা নিজেরা নানারকম কথা বলেছে আর হেসেছে। "লৌণ্ডার সুরত দেখে ইরানী সওদাগর দেওয়ানা হয়ে গেছে।" একজন বলেছিল—"দেখ না সুতোকাটা হাওয়ায় ভেসে যাওয়া ঘুড্ডীর পিছে পিছে বাউরার মত ছুটছে।" কিন্তু এই মুহূর্তে মহম্মদ সৈয়দের কথা শুনে তারাও বিস্মিত না হয়ে পারলে না। মহম্মদ সৈয়দ থাট্টায় থেকে দেখলে কি করে!

মহম্মদ সৈয়দ বললেন—তারপর, গফুর, তারপর? বাতাও! তারপর?

সাধুর দল থেমে গিয়েছিল। দলের বৃদ্ধ মহারাজ হাত তুলে তাদের মহান্তের ধ্বজা তুলে ধরে ভগবানকে ডাকতে শুরু করেছিল। দলের জোয়ানরা চীৎকার করতে শুরু করেছিল—ভাইয়া লোক আমরা সাধু আমরা ফকীর। এক লঙ্গোটী এক রোটী ছাড়া দৌলত আমাদের নেই। মৎ মারো। মৎ মারো ভাই। মুসলমান হও তো দোহাই আল্লার—হিন্দু হও যদি দোহাই কিষণজী হরির! মৎ মারো!

গফুর বললে—কিন্তু কে সে কথা শোনে। ডাকু ধরমের কথা

শোনে না। আল্লার দোহাই মানে না। ভগবানের দিব্যি শোনে না। তারাও তা শোনে নি। প্রথমেই এক ঝাঁক তীর এসে পড়েছিল! আর সেই তীরের ঝাঁকের এক তীর এসে বিঁধেছিল মহান্ত মহারাজের বুকে। পড়ে গেলেন মহান্ত মহারাজ। তখন সাধুদের মধ্যে যারা শক্তসমর্থ জোয়ান তারা তাদের চিমটা নিয়ে দাঁড়িয়ে লড়াই দিলে। দেখতে দেখতে অন্ধকার হয়ে আসছিল।

গফুর সেই অন্ধকারের সুযোগে একটু পাশে মুর্দার মত অসাড় হয়ে পড়ে রইল। কিছুক্ষণের মধ্যেই লড়াই শেষ। কতক্ষণ লড়বে এই বৈরাগী সাধুরা!

ডাকুরা লোকগুলোকে জখম করে উট আর যা কিছু ছিল খুঁজে পেতে দেখে যা পেল নিয়ে চলে গেল। তার সঙ্গে পাঁচ ছ জন ষোল থেকে বিশ বছরের তাগড়া নওজোয়ানকে বেঁধে নিয়ে গেছে। আর নিয়ে গেছে ওই বহুৎ খুবসুরত ছোকরাকে।

তারা চলে গেলে গফুর উঠে ছুটতে আরম্ভ করেছিল। অন্ধকারে এই রুক্ষ প্রান্তর আর বালির উপর ছুটতে ছুটতে পড়েছে উঠেছে। আবার ছুটেছে আবার পড়েছে। শেষ এই গাছতলায় এসে আর পারে নি, এখানেই শুয়ে পড়েছিল। সকালে ঘুম ভেঙে উঠেই দূরে উটের সারি দেখে ঠিক ঠাওর করতে পারে নি তারা কারা। সওদাগরী দল না আবারও কোন লুঠেরার দল। তাই সে ছুটে পালাতে চেয়েছিল।

মহম্মদ সৈয়দ বলেছিলেন—জলদি ওকে উটে তুলে নাও। হাঁকাও উট। জলদি হাঁকাও।

আরও কিছু দূর এসে পেয়েছিলেন সে লুটের জায়গা, সাধুরা যেখানে জখম হয়ে বা মরে পড়ে আছে বালির উপর। বেশীরভাগ সাধুই মরে গেছে। তিনজন বেঁচে আছে। তার মধ্যে একজন সেই বৃদ্ধ মহান্ত মহারাজ। যিনি মহম্মদ সৈয়দকে সন্দেহ করে বাক্যালাপ

শুরু করেছিলেন। তিনি আহত হয়েছেন পাঁজরায়, কিন্তু তীরটা বিঁধেছে একপাশে। মর্মস্থল বিদ্ধ করতে পারে নি।

মানুষের জীবন কখনও যায় অতি সহজে একমুহূর্তে, কখনও মর্মান্তিক আঘাত সত্ত্বেও যেতে চায় না। নিদারুণ কষ্টের মধ্যেও কঠিন যুদ্ধ করে আহত দেহটাকে আঁকড়ে ধরে থাকে। সাধুর তখন জ্ঞান হয়েছে। জলের জন্য বার বার হাঁ করেছেন। কার কাছে করেছেন তিনি জানেন না। খাঁ-খাঁ-করা প্রান্তর—চারিপাশে বালি বালি আর বালি—উপরে নির্মেঘ ধূলাচ্ছন্ন ধূসর আকাশ, তবু তিনি হাঁ করছেন। মধ্যে মধ্যে চেতনা হচ্ছে—তখন চোখে সচেতন দৃষ্টি আসছে। তিনি চোখ বুজে বিড়বিড় করে ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করছেন।

মহম্মদ সৈয়দের চোখে জল এল। এয় মেহেরবান খোদা, তোমার দুনিয়ায় মানুষ এমন নৃশংস কেন? একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তিনি তাঁর পাশে বসে বললেন—পানি। পানি লাও!

জলের বর্তন ধরে তিনি সাধুর মুখে একটু একটু করে জল ঢেলে দিলেন। অনুচরদের বললেন—দেখ—আর যাদের জান আছে তাদের মুখে পানি দাও!

গফুর বললে—হুজুরআলি!

মহম্মদ সৈয়দ তার মুখের দিকে তাকালেন।

গফুর বললে—হুজুরআলি, এখানে দেরি হলে আর তাদের ধরা যাবে না। সামনে বড় শহর 'বাদিন'—সেখানে বান্দা বিক্রীর হাট আছে।

সৈয়দ বললেন—জানি গফুর। কিন্তু কি করে এদের ফেলে যাব! আমি মুসলমান—কি করে এই মরণাপন্ন মানুষদের মুখে পানি না দিয়ে চলে যাব বল? বলে আবার সাধুর মুখে জল ঢেলে দিলেন।

তারপর বললেন—এক কাম করো গফুর। তুমি চার উট নিয়ে

চলে যাও বাদিনের দিকে। আর আট উট চলে যাক পশ্চিম মুখে দরিয়ার কিনারার দিকে। উটের পায়ের দাগ দেখতে দেখতে যাও। বাদিনে তারা বোধ হয় যাবে না গফুর। আমার বিশ্বাস তারা যাবে সমুদ্রের দিকে। সমুদ্রের ধারে সব ছোটখাটো গোপন ঘাঁটি আছে। সেখানে গোলামের কারবারীদের নৌকা থাকে। সেখানেই তারা এই ধরনের কেনাবেচা করে। এখানের ডাকাইতির ধরা মানুষকে এখানে বিক্রী করায় বিপদ আছে। চেনা লোক বেরিয়ে যায়। গোলমাল হয়। বাজারের বাদশাহী নোকরেরা ফ্যাসাদ বাধায়। আমি এদের একটা ব্যবস্থা করেই উঠব। চলব আমি দরিয়ার দিকে। তুমি বাদিনে সন্ধান না পেলে ওখান থেকে চলে যেয়ো দরিয়াকিনারায় আরও দক্ষিণে। আমাদের সঙ্গে দেখা হবেই।

একটি কাতর শব্দ শুনে মহম্মদ সৈয়দ তাকালেন আহত সাধুর দিকে। দেখলেন বৃদ্ধ মহান্ত চোখ মেলে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন।

সৈয়দ একটু ঝুঁকে পড়ে ডাকলেন—মহারাজ।

অত্যন্ত কষ্টের মধ্যেও বৃদ্ধ সাধু একটু হেসে বললেন—আমীর!

—কষ্ট হচ্ছে খুব?

সাধু আবারও হাসলেন। অত্যন্ত ধীরে ধীরে বললেন—"দেহ ধরণেকা দণ্ড হৈ, সব কোইকো হোয়।" দেহ ধরতে গেলেই দুঃখ আমীর! এ দণ্ড সবার। সাধুরও বটে অসাধুরও বটে। আসবার সময় দুখ—পথ চলতে দুখ—আবার যাবার সময়েও দুখ। কি করব?

সৈয়দ বললেন—আপনার জন্যে কি করতে পারি মহারাজ?

—কি করবে? অনেক করেছ আমীর! পানির জন্যে ছাতি ফাটছিল। তুমি পানি দিয়েছ। আর কি করবে? আমি বেশীক্ষণ বাঁচব না। কিন্তু তুমি কি আমার জন্যে আটক পড়লে আমীর?

সৈয়দ বললেন—মহারাজ, আমি আপনাদের খোঁজেই

এসেছিলাম। মিথ্যে আপনাকে বলব না। এসেছিলাম সেই অভয়চান্দের খোঁজে। তাকে দেখে অবধি আমার কলেজা খাক্‌ হয়ে গেছে মহারাজ! মনে হচ্ছে তুনিয়ায় সেই আমার সব! আমি আমার সব দৌলত ঢেলে দিয়ে তাকে পাবার জন্যে এসেছিলাম আপনাদের খোঁজে! কিন্তু—

মহান্ত বললেন—সে কালই বুঝেছিলাম আমীর। অভয়চান্দও আমাকে বলেছিল।

চমকে উঠলেন মহম্মদ সৈয়দ।—কি বলেছিল?

—তুমি চলে গেলে ও কাঁদতে লেগেছিল। ও বাচ্চা একটু অদ্ভুত আমীরসাহেব। লোকে বলে ওর মগজ খারাব কিন্তু আমি জানি জন্ম থেকেই ও বিচিত্র। ওর আত্মা পরমাত্মার সঙ্গে কথা বলে মিতালি করে। ও বললে—আমীর যে চলে গেল। আমীরের সঙ্গে যে আমার জানপহচান বহুত রোজের। ওকেই তো আমি খুঁজি! আমাকে যে ওর কাছে যেতে হবে!

অবাক হয়ে গেলেন মহম্মদ সৈয়দ।

মহারাজ বললেন—যখন ডাকুবা এল চারিদিক থেকে ধুলোর আঁধি তুলে তখনও সে চীৎকার করে ডেকেছে—আমীর আমীর আমীর!

—ও কে মহারাজ?

*　　　*　　　*

মহারাজ বললেন—একটু পানি দাও আমীর।

জল খেয়ে মহারাজ বললেন—কাল তো তোমাকে বলেছি আমীরসাহেব ও হল তুনিয়াতে তুনীচান্দ বানিয়ার বেটা। তুনীচান্দ প্রথম জোয়ানিতে সাদী করেছিল এক বানিয়ার বেটীকে—তার এক বেটী হল অমৃত্‌কুমারী। তারপর এই বাচ্চা অভয়চান্দ। তারপর মহব্বতী হয়ে গেল এক মুসলমান কারবারী—ছোট কারবারীর বেটির সঙ্গে। তাকেও সে সাদী করলে। তখন হিন্দুস্তানের এ মুলুকে এমন সাদী হত। মুসলমান হিন্দুর বেটী বিয়ে করত; তাতে জোরজবরদস্তি

ছিল না। তবে মধ্যে মধ্যে হত বইকি। কারুর বিয়ে-করা বউ কি তু চার ঘর বহুৎ উচা ব্রাহমন ছত্রি লালাদের মেয়ে হলে হত। কিন্তু সাধারণ ঘরে হত না। আবার হিন্দুর লেড়কা মুসলমান পড়োশীর মেয়ের সঙ্গে মহব্বতি হলে তাকে বিয়ে করে নিয়ে যেত—তাতেও হিন্দু লেড়কার জাত যেত না। মুসলমান লেড়কীও খুশী হয়ে রহিমের সঙ্গে রামের নাম নিয়ে ঘরকন্না করত। এ মুলুকের হিন্দু মুসলমান মেহমান হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু হিন্দু মুসলমানের নসীব—বাদশাহ সাজাহান ফরমান জারি করলেন। এ কখনও হবে না। কোরান আর হদিশের হুকুমতে এ হয় না। মুসলমানের বেটী হিন্দুর ঘরে গিয়ে হিন্দু হয় না। আজ থেকে এমন সব সাদী নাকচ। হিন্দু স্বামী যদি মুসলমানী কবিলাকে রাখতে চায় তবে তাকে মুসলমান হতে হবে।

তুনীচান্দ মুসলমান হয়ে গেল। মুসলমানী কবিলা বললে—তোমাকে ছেড়ে বাঁচব না আমি। কিন্তু তুনীচান্দের হিন্দু স্ত্রী ধরম ছাড়লে না। সে তার বেটা বেটী নিয়ে চলে গেল। চলে গেল থাট্টা ছেড়ে। মুলুক ছেড়ে। পথে এমনি ডাকুরা এসে লুটে নিলে বেটীকে। অমৃত্‌কুমারীকে। তার তখন উমর দশ বারো বরিষ। আর অভয়চান্দ চার পাঁচ বরিষের বাচ্চা। অভয়চান্দের মা ডাকুদের সঙ্গে লড়েছিল। তার কাছে ছিল ছোরা। এক আদমীকে জখম করে শেষ ইজ্জতের জন্যে নিজেও মরেছিল নিজের ছুরিতে। বাচ্চা অভয়চান্দ বেহুঁশ হয়ে একটা খন্দের মধ্যে পড়েছিল। ডাকুরা অমৃত্‌কুমারীকে নিয়ে গেল। পরের দিন সকালে আমি আমার চেলাদের সঙ্গে যাচ্ছিলাম ওই পথে—কুড়িয়ে পেয়েছিলাম অভয়চান্দকে। তার সুরত আর তার ললাট দেখে আমি বুঝতে পেরেছিলাম এ বাচ্চা পরমাত্মার সঙ্গে জন্ম থেকে জানপহচান নিয়ে জন্মেছে। তুমি তো দেখেছ আমীর কেমন করে গগনকিনারের ওপারে সে চোখ তুলে তাকিয়ে থাকত! কতবার জিজ্ঞাসা করেছি—অভয়চাঁদ কি দেখ ওখানে? ওই নীলা আসমানে কি আছে?

কখনও বলতো—ওখানে তো মহারাজা শাহানশাহ রয়েছে। দেখতে পাচ্ছ না মহারাজ? কখনও বলতো—আমীর। এক আমীর ওই দরবারের ফরমান নিয়ে আসছে মহারাজ!

একটু চুপ করে থেকে মহারাজ বললেন—সে আমীর বোধ হয় তুমিই হবে আমীরসাহেব!

সৈয়দ আবেগে অধীর হয়ে বলে উঠলেন—কিন্তু কোথায় পাব তাকে মহারাজ? কোথায়? তাকে যে ডাকুরা লুটে নিয়ে গেল!

—কি করে বলব আমীর, এত দূর তো নজর আমার চলে না। তবে আমার বিশ্বাস তাকে পাবে তুমি। কি দাম দেবে আমীর?

—আমার বিলকুল দৌলত। সব কুছ! আমার জান আমার কলেজা আমার গর্দান।

—নিশ্চয় পাবে তা হলে। জরুর মিলবে! আমার এই ডাণ্ডাটা তুমি উপর দিকে ছুঁড়ে দাও, ডাণ্ডা মাটিতে পড়বে—তার মাথার দিকটা যে দিকে পড়বে সেই দিকে চলে যাও। তবে এক বাত আমীর—তার জাত তুমি মেরো না। জাত যদি তার যায় তবে সে বাঁচবে না। মরে যাবে। এ আমি তোমাকে বলতে পারি। আমার কথা আলগ। আহি হিন্দু না মুসলমান না। আমি সাধু।

* * *

সেই ডাণ্ডার নিশানা ধরেই যাত্রা করেছিলেন মহম্মদ সৈয়দ। যাবার সময় ওইখানে বালির মধ্যেই ইসলামী মতে তাঁদের কবর দিয়েছিলেন। সাধু বলেছিলেন—যে মতে তোমার খুশি দিয়ো। গুরু কবীরের মৃত্যুর পর তাঁর সৎকার নিয়ে তাঁর হিন্দু মুসলমান শিষ্য বীর সিং আর বিজলী খাঁর মধ্যে ঝগড়া বেধেছিল। লড়াই করবার জন্যে তৈয়ার হয়েছিল। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর শিষ্যেরা দেখেছিল তাঁর দেহটা নেই—একরাশ পদ্মফুল হয়ে গেছে। তারা ভাগ করে নিয়ে আধা পুড়িয়েছিল আধা কবর দিয়েছিল।

মহম্মদ সৈয়দ তাঁকে কবরই দিয়েছিলেন।

তারপর যাত্রা করেছিলেন ওই ডাণ্ডার নির্দেশিত পথে। সে পথ মহম্মদ সৈয়দেরই অনুমান করা পথ। সমুদ্রকিনারার দিকে।

এসে মিলেছিলেন গাউস খাঁর সঙ্গে। গাউস খাঁ সেই মুসলমান বাঙালীকে নিয়ে নৌকায় এসে পৌঁছেছিল একটা ছোট বন্দরে। কিন্তু সেখানে সন্ধান মেলে নি। তবু মহম্মদ সৈয়দ হাল ছাড়েন নি। এক মাস পর গুজরাতের নিচের দিকে হিন্দুদের দ্বারকা তীর্থের কাছাকাছি একটা এমনি গুপ্ত বন্দর থেকে ছাড়ছিল একখানা বড় নৌকা।

নৌকা দেখেই সুলেমান বলেছিল—হুজুরআলি, এ নৌকো গোলাম কারবারীদের। চলল বোধ হয় সুরাট! দেখুন খোঁজ করুন। বলেন তো এখানে আরও লোক যোগাড় করে নি—নৌকো যোগাড় করি। বারদরিয়ায় বের হলেই মেরে দেব।

মদম্মদ সৈয়দ বলেছিলেন—যোগাড় তুমি কর। এদিকে আমি দেখি খোঁজ করে, যদি দেখতে দেয়।

মহম্মদ সৈয়দ নৌকার মালিকের সঙ্গে দেখা করেই তার সামনে ধরেছিলেন মোহরের তোড়া।

বলেছিলেন—আমার প্রিয়তম জন হারিয়েছে। সাহেব, সে যদি কোন রকমে তোমার নৌকোয় থাকে তো এ তোড়া তোমার। যদি না থাকে তবে তোমাকে একশো মোহর আমি দেব। আমাকে দেখতে দাও একবার!

সন্দিগ্ধ হয়েছিল মালিক।

আংরাখার জেব থেকে ছোট কোরান শরিফ বের করে হাতে নিয়ে সৈয়দ বলেছিলেন—কোরান হাতে নিয়ে খুদার নাম নিয়ে হলফ নিয়ে বলছি বদমতলবী আমার নেই। বাদশাহী কি সুলতানী কি কোন রাজগীর তাঁবেদার আমি নই।

কারবারী দুশো' মোহর দাবি করেছিল।

সৈয়দ বলেছিলেন—তাই। দুশো মোহর দেখতে দেওয়ার জন্যে।

আর ছুটো তোড়া—পাঁচশো পাঁচশো মোহর ভরা তোড়া দেব যদি তাকে মেলে!

দেখতে দিয়েছিল কারবারী। এবং সৈয়দও তাকে পেয়েছিলেন। শীর্ণ ক্লান্ত মলিন হয়ে গেছে অভয়চান্দ। নৌকার খোলের মধ্যে এক পাশে পড়ে আছে। তার অতি ক্ষীণ কণ্ঠের গান শুনতে পেয়েছিলেন মহম্মদ সৈয়দ।

সেই গান—

ময় গুলাম ময় গুলাম ময় গুলাম তেরা—
ময় গুলাম—।

সঙ্গে সঙ্গেই ছুটো তোড়া কারবারীর হাতে দিয়ে বলেছিলেন সৈয়দ—এই নাও। এই নাও। 'এবং চীৎকার করে ডেকেছিলেন অভয়চান্দ!

বিশাল ছুটি চোখ মেলে অভয়চান্দ তাঁর দিকে তাকিয়েছিল। তারপর বলেছিল—আমীর!

তাকে বুকে করে তুলে নিয়ে এসেছিলেন মহম্মদ সৈয়দ। তার সারা অঙ্গ পরিষ্কার করে পরিয়ে দিয়েছিলেন মনোরম পরিচ্ছদ।

এতে সঙ্গের সকল অর্থ নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল মহম্মদ সৈয়দের। বিপদে পড়েছিলেন। শেষ বের করেছিলেন সেই মুক্তা। যে মুক্তা তিনি সেদিন রাত্রে কলাচীতে ইরানী নৌকা থেকে চালান নিয়ে ফিরেছিলেন। সেগুলো তিনি সামলে সিন্দুকবন্দী করে রেখে আসবার কথা ভুলেই গিয়েছিলেন। লম্বা একটা চামড়া ও শক্ত কাপড়ে তৈরি থলিয়ার মধ্যে পুরে কোমরে বেঁধেছিলেন—সে বাঁধাই ছিল। বিক্রি করবার জন্যে এগিয়ে যেতে হয়েছিল দ্বারকা পর্যন্ত। এই তীর্থে হিন্দুদের বড় বড় শেঠ রাজা মহারাজা এসে থাকেন। দ্বারকায় একটা জহরতের বাজারও আছে। অনেক তীর্থযাত্রী দেবতাকে দেবার জন্যে জহরতের গহনা কিনে থাকে। পূজাতে উৎসর্গ করবার জন্যেও সোনা রূপা হীরা মণি মুক্তাও দরকার হয়।

কিন্তু দ্বারকার বাজারে এই মুক্তার খরিদ্দার ছিল না বা থাকবার কথা নয়।

ভাবতে ভাবতেই গিয়েছিলেন মহম্মদ সৈয়দ। একটি মুক্তা হাতে নিয়েই গিয়েছিলেন। এর দাম কমসে কম পাঁচ হাজারের কম নয়। বাজার থাকলে আর জহরত-চেনা খরিদ্দার থাকলে দশ হাজার হয়ে যাবে। তা এখানে মিলবে না। কিন্তু মহম্মদ সৈয়দের নসীব ভাল—হঠাৎ মিলে গেল এক খরিদ্দার। শুনলেন কাশ্মীরের রাজৌরীর মহারাজা মহারানা রাজু এসেছেন তীর্থদর্শনে। দেখা হল বাজারেই। তিনি তাঁর কাছে গিয়ে বললেন মুক্তার কথা।

মুক্তাও দেখালেন। রাজা রাজু বললেন—আমার বাসায় চলুন সওদাগর সাহেব। আমি কিনব।

মহম্মদ সৈয়দ দর করেন নি। মহারাজা নিজে থেকেই দিয়েছিলেন আট হাজার টাকা। সবই সোনার মোহরে। তিনি নিবেদন করবেন দেবতার মন্দিরে। বাসুদেবের চরণে। মোহর গুনে নিয়ে চলে আসছিলেন মহম্মদ সৈয়দ। হঠাৎ মহারাজা বললেন—একটা কথা সওদাগরজী! বৈঠিয়ে, তসরীফ রাখিয়ে।

বসেছিলেন মহম্মদ সৈয়দ।

—এমন মুক্তা আমাকে আরও দিতে পারেন?

সৈয়দ সাহেব ভেবেচিন্তেই বলেছিলেন—পারি। তবে এখানে নয়। থাট্টায়। আমার নাম মহম্মদ সৈদ। হায়দ্রাবাদেও আমার গদি আছে। সেখানে পারব দিতে।

—এখানে পারেন না?

আবার একটু ভেবে সৈয়দ বলেছিলেন—না। তিনি তাঁকে বলতে সাহস করেন নি যে এমন মূল্যবান মুক্তা তাঁর সঙ্গে রয়েছে একটি দুটি নয়—ষোলটি।

নৌকায় ফিরে এসে সৈয়দ সাহেব সকলকে টাকাকড়ি দিয়ে খুশী করে থাট্টা ফিরবার আয়োজন করেছিলেন। রাত্রে কামরার মধ্যে

বাতি জ্বেলে অভয়চান্দকে শুশ্রূষা করে সাজিয়ে তাকে খুশী করবার জন্যে পাগলামির আর অন্ত ছিল না। হঠাৎ কি খেয়াল হল তিনি ওই মুক্তা বের করে তার হাতে দিয়ে বললেন, এরই হার গেঁথে তোমার গলায় পরিয়ে দেব।

অভয়চান্দ মুক্তাটা হাতে নিয়ে ভারী খুশী হয়েছিল। সে সেটাকে হাতের মুঠোয় ধরে বুকের কাছে রেখে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। মহম্মদ সৈয়দ তার পাশে মাথায় হাত রেখে ঘুমিয়েছিলেন নিশ্চিন্ত হয়ে। এতদিনে পেয়েছেন অভয়চান্দকে। অনেকক্ষণ দেখেছিলেন তাকে। আশ্চর্য মুখ। সলিমার মতই অবিকল। কিন্তু তাছাড়াও কিছু আছে। ওর গায়ে হাত দিতে ভয় করে। ওর চোখে চোখ মিললে চোখ জুড়িয়ে যায়। ওর চোখের রোশনি তাঁর চোখে জ্বলে ওঠে। মনে হয় গগনকিনারের পর্দা উঠে যাচ্ছে।

হঠাৎ রাত্রে চমকে উঠে তাঁর ঘুম ভেঙেছিল। অন্ধকারের মধ্যেও তিনি বুঝতে পারছিলেন একটা লোক নৌকার কামরার মধ্যে ঢুকে সামনেই বসে আছে। তার নিশ্বাসের শব্দ পড়ছে। অভয়চান্দ যেন ছটফট করছে যন্ত্রণায়। সৈয়দ বুঝতে পারলেন চোর ঢুকেছে এবং অভয়চান্দের মুখ চেপে ধরে সে চেষ্টা করছে অভয়চান্দের শরীর থেকে গহনা ছিনিয়ে নিতে।

সৈয়দ সাহেব সন্তর্পণে তাঁর পাশে রাখা ছোরাখানা নিয়ে অন্ধকারের মধ্যেই আন্দাজ করে সতর্কতার সঙ্গে ছোরাটা তার গায়ে বিঁধিয়ে দিলেন। লোকটা বাপ বলে চীৎকার করে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে সৈয়দও উঠে দাঁড়ালেন। এবং চীৎকার করে উঠলেন—গাউস খাঁ! চোর! চোর!

লোকটা ছুটে পালিয়ে গেল। কিন্তু দরজার কাছে গিয়েই পড়ে গেল। সৈয়দ সাহেব তখনও চীৎকার করছেন—গাউস খাঁ গাউস খাঁ।

গাউস খাঁ বাতি নিয়ে এল। লোকটা আহত হয়ে পড়ে

গোঙাচ্ছিল। চোর সে নয়! সে সেই সুলেমান বাংগালী। তার ডান কাঁধের নীচেই বসে গেছে সৈয়দ সাহেবের ছোরাটা। এবং আহত ডান হাতের মুঠোর মধ্যে রয়েছে সেই মুক্তাটা। অভয়চান্দের হাত থেকে সে সেটা ছিনিয়ে নিয়েছিল। অভয়চান্দ তখন অজ্ঞান। সৈয়দ সাহেব সব ফেলে দিয়ে পড়েছিলেন অভয়চান্দকে নিয়ে। সারারাত্রি অভয়চান্দের মাথা কোলে নিয়ে বসে ছিলেন বিনিদ্র হয়ে।

সকালে গাউস খাঁ বলেছিল—হুজুরআলি, নৌকো ছেড়ে দিতে হবে। নৌকোয় সুলেমানের অনেক লোক। ওরা ক্ষেপে উঠবে। পথে যে কে কি করবে তার কিছু ঠিক নেই।

—তা হলে?

—জমিনে জমিনে চলুন।

—তাতে অভয়চান্দের তকলিফ হবে গাউস খাঁ!

হঠাৎ মহম্মদ সৈয়দের মনে পড়েছিল রাজৌরীর মহারাজা সাহেবের কথা। তিনি কাশ্মীর ফিরবেন। হয়তো থাট্টা হয়েই ফিরবেন। তাঁর সঙ্গে গেলে নিরাপদ হবে যাত্রা। জলপথ স্থলপথ যে পথে তিনি যান সেই পথেই তিনি ফিরবেন। তিনি ঠিক করেছিলেন এখুনি যাবেন রাজা সাহেবের কাছে। যাবার জন্যে তিনি আর একটা মুক্তা হাতে নিয়েছিলেন, রাজা সাহেবকে দেবেন। মুক্তা তিনি চেয়েছেন।

রাজা সাহেবের সঙ্গেই তিনি ফিরছিলেন। রাজা সাহেব পেয়ে খুব খুশী হয়ে বলেছিলেন—খুব খুশী করেছেন আমাকে। কাল থেকে ভাবছি কি জানেন? এ মুক্তা দেবতাকে দেব, না নিয়ে যাব, শাহানশাহকে নজরানা দেব! কাল দিতে পারি নি দেবতাকে। তা বেশ, চলুন, আমার সঙ্গেই চলুন। আমি যাব জমিনে জমিনে কারণ আমি তো এক হাজার ফৌজ নিয়ে এসেছি।

নিরাপদেই ফিরেছিলেন মহম্মদ সৈয়দ। কিন্তু থাট্টায় এসে অস্বস্তি বোধ করলেন। গোটা থাট্টা তখন যেন তাঁর কথা নিয়ে গুলজার হয়ে উঠেছে।

হিন্দু বানিয়ারা সব ক্ষেপেছে, এককাট্টা হয়েছে—তাঁর সঙ্গে কামকারবার করবে না। সে হিন্দু বানিয়া লড়কা—সাধু হয়েছিল যে তাকে মহম্মদ সৈয়দ সাধুদের মেরে কেটে ছিনিয়ে নিয়ে লৌণ্ডা বানিয়েছে!

ফৌজদার চুলবুল করছে—খোঁজ করছে কোথায় সাধুদের খুন করে গেড়ে রেখেছে মহম্মদ সৈয়দ। খুনের রাহাজানির দায়ে পড়বে।

একদল মুসলমান ক্ষেপেছে—মহম্মদ সৈয়দ হিন্দু লড়কাকে কলমা পড়ায় নি, হিন্দুই রেখেছে। আর তাকেই সে ঔরতের মত তার পিয়ারা করেছে।

এ সবই সুলেমানের কীর্তি। সেও হলফ নিয়েছে—মহম্মদ সৈয়দের আর ওই লৌণ্ডার জান সে নেবে!

তাই মহম্মদ সৈয়দ অনেক ভেবে গোপনে গোপনে সব বিক্রি করে নিয়ে চলেছেন দক্ষিণ। গোলকুণ্ডা! নিজে যথেষ্ট সাজসরঞ্জাম করে অভয়চান্দকে নিয়ে নৌকায় চলেছেন।

নয়

বিচিত্র বালক অভয়চান্দ। সে যেন দুনিয়ার সুখ দুঃখ ভোগ-বিলাস কোন কিছুতে বাঁধা পড়ে না। উদাসীন, সব কিছুতেই উদাসীন। আকাশের দিকে চেয়ে আছে তো পলকহীন দৃষ্টিতে আকাশের দিকে চেয়েই আছে। আবার ধূ-ধূ করা প্রান্তরের দিকে চেয়ে আছে তো তাই আছে; দু এক ডাকে সাড়া দেয় না। খেতেও তার মনে থাকে না; শুতেও সে ভুলে যায় অনেক সময়; বাড়িব সমস্ত লোক যখন গাঢ় ঘুমে অচেতনের মত পড়ে থাকে তখন সে ছাদের উপর উঠে নক্ষত্রখচিত আকাশের দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে নিস্পন্দের মত। আবার কখনও ধুলোর উপর পড়েই গভীর ঘুমে ঘুমোয় প্রহরের পর প্রহর। মহম্মদ সৈয়দ তার পরিচর্যার জন্য নোকর বাঁদী রেখে দিয়েছিলেন কিন্তু বিচিত্র অভয়চান্দ তাদের পরিচর্যা নেয় না, খেতে দিলে খায় না, পোশাক পরালে খুলে ফেলে দেয়, বেশী পীড়াপীড়ি করলে কাঁদে। মহম্মদ সৈয়দকে এসে সামলাতে হয়। কখনও কখনও অভয়চান্দ ছুটে গিয়ে মহম্মদ সৈয়দ যেখানে থাকুন তাকে আঁকড়ে ধরে কাঁদে। মহম্মদ সৈয়দও সব ফেলে উঠে আসেন তাকে নিয়ে। নির্জন ঘরে এনে বসিয়ে তাকে শান্ত করেন। নিজের হাতে খাওয়ান, সে হাসিমুখে খায়; সৈয়দ তাকে সাজ-পোশাক পরিয়ে দেন, সে খুশী হয়ে সাজপোশাক পরে আয়নায় নিজেকে দেখে হাসে, আর সৈয়দকে বলে—ভাল লাগছে আমাকে?

সৈয়দ বলেন—দেখো—সীসা রয়েছে সামনামে—তুমি দেখো!

অভয়চান্দ বলে—নহি। তুমি বাতাও।

সৈয়দ মহম্মদ কতদিন তাকে মেয়ের পোশাকে সাজিয়ে হীরা জহরত পরিয়ে অপলকদৃষ্টিতে দেখে মনে করেছেন সলিমাকে। যুবতী সলিমা। তার নয়নে কটাক্ষ। সারা অঙ্গে যৌবনের আবেদন।

রক্ত তোলপাড় করে ওঠে। অভয়চান্দ বালক। মেয়ের পোশাকে তাকে যুবতী বলে মনে হয় না, মনে হয় একটি কিশোরী। চোখে তার কটাক্ষ নেই কিন্তু নিস্পলক এক আশ্চর্য সারল্যময় দৃষ্টিতে সে সৈয়দ সাহেবের দিকে তাকিয়ে থাকে। তার মধ্যে যৌবনের আবেদন নেই কিন্তু আশ্চর্য এক আকর্ষণ আছে। তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে দেহ মন যেন প্রশান্ত হয়ে আসে। শিরায় শোণিতপ্রবাহ যেন স্তব্ধ হয়ে চোখে নেমে আসে গাঢ় নিদ্রার মত একটা কিছুর প্রভাব।

এ সৈয়দ মহম্মদ অনুভব করেছেন। এই সময়টিতে তাঁর সুপ্তপ্রায় চেতনার মধ্যে একটি গানের সুর বাজে—

ময় গুলাম ময় গুলাম ময় গুলাম তেরা।
তু দেওয়ান মেহেরবান—নাম তেরা সেরা।
ময় গুলাম তেরা।

মনে হয় এই অভয়চান্দই তাঁর সেই দেওয়ান।

এদিকে কথাটা থাট্টার বাজারে গোপন ছিল না। এবং যেমন হয় এর উপরে মানুষের মনের কুৎসিত সন্দেহের গ্লানি ঘটনাটাকে অতিকুৎসিত করে তুলেছিল। মহম্মদ সৈয়দের কারবারে নিযুক্ত মুসলমান কর্মচারীরাই প্রথম ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। গাউস সৈয়দ সাহেবকে বলেছিল—মালিক, একটা কথা আপনাকে বলব, আপনি গোঁসা করবেন না।

সৈয়দ বলেছিলেন—কি কথা বল?

—জনাবআলি এই হিন্দু লৌণ্ডাকে এনেছেন কিন্তু লৌণ্ডা যে বিলকুল ইসলামী কানুন বরবাদ করে দিলে!

—অভয়চান্দ? কি করলে সে?

—জনাবআলি, লৌণ্ডা দিনরাত কাফেরী ধরনের গীত গাইছে। কাফেরী কানুনে পূজা করছে। জনাবআলি শুনেছি বড় ভারী উলেমা। মক্কাশরীফে জনাব কোরান হদিস মক্স করেছেন—আপনার

মোকামে এ হলে গুনাহ হয়। আমরা বহুৎ দুখ পাই। শরম লাগে। লোকে বলে—

—কি বলে গাউস ?

—বলছে—মহম্মদ সৈয়দ ইসলামকে বরবাদ করে দিচ্ছে। এ তার গুনাহগারি। সে দজ্জাল বনে গিয়েছে। বলছে—সৈয়দ সাহেবের নোকরী যারা করে তারাও এ গুনাহগারির ভাগীদার।

সৈয়দ তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলেছিলেন—কিন্তু তা তো বিলকুল ঝুট গাউস। হিন্দু আর মুসলমান এদেশে পাশাপাশি রয়েছে। এক দরিয়ার পানি পান করি এক ক্ষেতির ফসল খাই। তা ছাড়া আল্লাহতয়লার এই তাজ্জবের সৃষ্টির দিকে তাকাও—একই আসমানে সূরয আর চাঁদ আর লাখো লাখো তারা ঝলমল করে। কারুর সঙ্গে কারুর দুশমনি নাই। তারা রোশনি দেয়—হিন্দু আর মুসলমান বিচার করে না—সবার উপর সমান রোশনি দেয়। আমার বাড়িতে এক হিন্দু লেড়কা যদি তার ধরমমতে তার আল্লাকে ডাকে তাতে গুনাহ কিসের বল ? শুনেছি আকবর শাহ বাদশাহ যোধাবাঈ রাজপুতানীকে সাদী করেছিলেন—যোধাবাঈএর মহলে হিন্দুমতে তিনি থাকতেন, তুলসী মন্দির ছিল, তিনি হিন্দু মতে ব্রত ধরম করতেন। তাতে কি আকবর শাহ মুসলমান থেকে খারিজ হয়ে গিয়েছিলেন ? শাহজাদা দারা সিকো কাফেরের শাস্ত্র পড়েন—পার্সীতে তার তর্জমা করেন—তাতে কি তিনি গুনাহগারির ভাগীদার হয়েছেন ?

গাউস চুপ করে রইল কিছুক্ষণ তারপর বললে—মালিকসাহেব, যদি গোস্তাকি মাফ করেন তবে এর জবাব আমি দিতে পারি।

মহম্মদ সৈয়দ বললেন—জরুর, জবাব দিতে পার গাউস। গোস্তাকি কেন হবে ? বল।

গাউস বললে—হুজুরআলি, আকবর শাহকে মুসলমানেরা অমুসলমান না বলুক তাকে দজ্জাল বলে থাকে। শাহজাদা দারা

সিকো বাদশাহের বড় ছেলে—বাদশাহ তাকেই বাদশাহী দেবেন একথা সবাই শুনেছে ; কিন্তু শাহজাদা দারা সিকোর ইয়ে চাল-ঢঙ মুসলমানরা কেউ বরদাস্ত করে না মনে মনে। তাকে তারা বলে কাফির।

কথাটা মহম্মদ সৈয়দের অজানা নয়, তিনি জানেন—তবুও তিনি এমন সাফা জবাব মুখের উপর গাউসের কাছ থেকে প্রত্যাশা করেন নি।

মুখের উপর এমন সাফ জবাব দিতে গাউসেরও কম উত্তেজনা হয় নি, এবং জবাব দিয়ে তার সাহসও বেড়ে গিয়েছিল, সে বলেছিল—জনাবআলি ইরান থেকে এসেছেন—হিন্দুস্থানী কাফির লোকের কলেজার বিলকুল কথা ঠিক জানেন না। তাই বলছেন কাফির তার ধরম নিয়ে থাকলে ক্ষতি কি ? জনাবআলি, এই কাফির মুসলমানদের কি দুশমনি করে কি নফ্‌রাতি (ঘৃণা) করে তা জানেন না। হুজুরআলি বললেন তারাও বাবা আদমের পয়দা আদমী, মুসলমানও তাই। লেকেন পুতুল পূজো করা কাফিররা মুসলমানের এখতিয়ারে মুঘল বাদশাহীর মধ্যে বাস করেও মুসলমানদের অচ্ছুত ভাবে। ছোট জাত ভাবে। তা ছাড়া হুজুরআলি এত বড় উলেমা হয়ে কি করে ভুলে যাচ্ছেন যে খুদাতয়লার হুকুমত্‌ রয়েছে ইসলামের খাদিমদের উপর কি কাফেরী থেকে তাদের ইসলামে নিয়ে এলে খুদাতয়লা পয়গম্বর রসুল খুশ্‌ হন। তাঁর মোবারকবাদী দোয়া মিলে যায়। হিসাব-নিকাশের দপ্তরে জমা হয়ে যায়। কি হরজা ওকে কলমা পড়ালে ?

—না। মহম্মদ সৈয়দ বলেছিলেন—না গাউস। আমি সেই সাধুর কাছে তাঁর মরণকালে বাত দিয়েছি। তা ছাড়া তিনি বলেছেন আমাকে যে ওর ধরম যদি পালটে দি জবরদস্তিতে তবে বাচ্চা আর বাঁচবে না। মরে যাবে।

একটু চুপ করে থেকে বললেন—গাউস, একরকম সিদ্ধাই নিয়েই ও পয়দা হয়েছে। ও ঠিক দুনিয়ায় তোমার আমার মত নয়, ও আলাদা

জাতের মানুষ। জন্মক্ষণ থেকেই ওর আসমানের ওপারের কোন দুসরা দুনিয়ার সঙ্গে জানপহচান আছে। বাতচিতও হয়। তুমি তো দেখেছ গাউস ওর খানার সঙ্গে কোনরকমে গোস্ত কি মুঘলাই খানাপিনার মিশাল হয়ে গেলে বেমারি হয়ে যায় ওর—যতক্ষণ না বিলকুল চিজ উগরে বেরিয়ে যায় ততক্ষণ বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকে মুর্দার মত।

গাউস ক্রমশঃ আরও উত্তেজিত হয়ে উঠছিল—সে বললে—মর যানে দিজিয়ে উসকো।

—গাউস! চমকে উঠলেন মহম্মদ সৈয়দ।

গাউস গ্রাহ্য করলে না—সে বলেই গেল—খুবসুরত্ ঔরতের অভাব নেই, হাটেবাজারে মেলে। কাফির জনানা বড় ঘরানা চান তাই মিলবে; গোলামের কারবারীদের বলুন। কাশ্মীরের ঔরতের জলুস ইরানী গুলাবের চেয়ে বেশী। আর লৌণ্ডাই যদি ভাল লাগে তবে তারই বা অভাব কি? তা বলে যে লৌণ্ডা ইসলামী খানা খেলে বমি করে, যে দিনরাত কাফিরের ধরম মেনে ভজন করে মুসলমানের ঘরে তাকে বরদাস্ত করতে হবে?

একটু চুপ করে থেকে সৈয়দ বলেছিলেন—বরদাস্ত যদি না করতে পার গাউস সাহেব, তবে আমি বলব নোকরী তুমি ছেড়ে দাও।

—নোকরী ছেড়ে দেব?

—জরুর। দুটো পথ। তিসরা পথ তো নেই।

গাউস স্তম্ভিত হয়ে মহম্মদ সৈয়দের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেছিল। তার চোখ থেকে যেন আগুন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাচ্ছিল।

মহম্মদ সৈয়দ সবিস্ময়ে এই উদ্ধত কর্মচারীটির দিকে তাকিয়ে প্রায় স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। এতক্ষণে তাঁর মধ্য থেকে পুরানো ব্যবসায়ী মহম্মদ সৈয়দ বেরিয়ে এল। কিছুদিন থেকেই যেন তাঁর এই মালিক সত্তাকে তিনি খুঁজে পান না। মধ্যে মধ্যে সবিস্ময়ে

ভাবেন এ তাঁর কি হল? কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই সে প্রশ্নকেও তাঁর মনের মধ্যে খুঁজে পান না। সে প্রশ্নও হারিয়ে যায়—জেগে ওঠে তাঁর মধ্যেকার নতুন মানুষ যে অভয়চান্দের মতই ওই আকাশের নীলের দিকে তাকিয়ে থাকে। দেখতে কিছু পান না। কি দেখতে চান তাও স্পষ্ট নয়, তাও জানেন না; তবে বড় ভাল লাগে। মনে হয় মধ্যে মধ্যে যেন ওই নীলা আসমানের বুকে কোন একখণ্ড মেঘের মধ্যে বা রাত্রিকালে অসংখ্য তারার মধ্যে কতকগুলি তারার সারির ঘেরের মধ্যে ফুটে উঠেছে ওই অভয়চান্দের মুখ। কখনও মেয়ের সাজে সাজানো অভয়চান্দের মুখ। কখনও ওই বাচ্চা ফকীর অভয়চান্দের মুখ। মনে মনে গজলের সুর গুঞ্জন করে ওঠে। কথাগুলিও এসে পড়ে। গুনগুন করে ওঠেন—"নীলা আসমান তুমি আয়না—না তুমি কাচ। তোমার পানে তাকিয়ে যাকে দেখতে পাচ্ছি সে কি জমীনের মানুষ—তোমার বুকে তার প্রতিবিম্ব ফুটে উঠেছে? না সে আছে তোমার ওপারে, কাচের মধ্য দিয়ে তাকে দেখতে পাচ্ছি? বল আসমান কে কায়া আর কে ছায়া!"

এই কয়েক মাসের মধ্যে এমনি হয়ে গেছেন মহম্মদ সৈয়দ। আজ হঠাৎ তাঁর নোকর গাউস খাঁয়ের লাল চোখ দেখে পুরানো জিন্দগীর আমীর জহরতবালা সওদাগর মহম্মদ সৈয়দ জেগে উঠল।

তিনি মুহূর্তে উঠে দাঁড়ালেন। সেই পুরানো মনিবের কণ্ঠস্বরে বললেন—আভি বাহার যাও!

রক্তচক্ষু গাউস চমকে উঠল।

—বাহার যাও!

গাউস খাঁ কিছু বলবার চেষ্টা করলে সৈয়দ বললেন—গাউস খাঁ! এবার কণ্ঠস্বর শুধু গম্ভীর নয়, সে কণ্ঠস্বর উচ্চ এবং তার মধ্যে উত্তাপ অনেকখানি। গাউস খাঁ হাজার হলেও তনখায় বাঁধা নোকর। তনখা তৈরি হয় চাঁদিতে, মোহর হয় সোনাতে, কিন্তু তার মধ্যে খুব সম্ভব নিমক আছে। যে নিমক মানুষকে যার নিমক খায় তার কাছে

দুর্বল করে দেয়। গাউস খাঁ নীরবে এবার ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল

মগজ তাঁর গরম হয়ে উঠেছিল; তিনি কামরার পায়চারি করছিলেন আর ভাবছিলেন গাউসকে আজই বরখাস্ত করবেন। তার আগে জানতে হবে আর কারা ওই গাউসের দলে আছে। তিনি না হয় তাঁর কারবারে সমস্ত মুসলমান নোকর বরখাস্ত করে হিন্দু নোকর রাখবেন। হিন্দু দালাল বিঠ্‌ঠলদাসকে বললেই সে হিন্দু নোকর এনে বহাল করে দেবে। বানিয়া বিঠ্‌ঠলদাস প্যাঁচালো আদমী; কিন্তু পয়সা পেলেই খুশী, আর কিছু চায় না; গাউসদের মত "এঁও লাল আঁখ" দেখায় না। কিন্তু তাজ্জবের কথা, পরের দিনই শুনলেন অভয়চান্দের পরিচর্যার জন্য নিযুক্ত হিন্দু নোকর আর হিন্দু বাঁদী দুজনেই পালিয়েছে। তারা আর কাম করবে না। কারণ থাট্টার বাজারে হিন্দু বানিয়ারা শোরগোল তুলেছে যে, ওই বাচ্চার 'ঝুটা' নাড়াচাড়া করলে হিন্দুর জাত যাবে কারণ ওই বানিয়া লৌণ্ডার জাত মহম্মদ সৈয়দ বারো আনা শেষ করে দিয়েছে, বাকী শুধু 'কলমা পড়ানো', সেটুকু হলেই পুরা মুসলমান হয়ে যাবে অভয়চান্দ!

বানিয়া দালাল বিঠ্‌ঠলদাস বললে—জনাব, খবর আরও খারাপ। কারণ হিন্দু বানিয়ারা জোট পাকাচ্ছে কি ওই যে অভয়চান্দ সে সিদ্ধাই নিয়ে পয়দা হয়েছে; যাকে ভগবান পাঠিয়েছে সন্ন্যাসী করে তাকে এইভাবে মহম্মদ সৈয়দ বাড়িতে লৌণ্ডা করে রেখে হিন্দুদের সর্বনাশ করেছে। এ তারা বরদাস্ত করবে না। তারা এককাট্টা হয়ে মহম্মদ সৈয়দের সঙ্গে বিল্‌কুল লেনদেন কাজকারবার সব বন্ধ করে দেবে। তারা মহম্মদ সৈয়দের নাম দিয়েছে 'লুচ্চা ইরানী'।

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন মহম্মদ সৈয়দ।

হঠাৎ একটা ঘটনা ঘটল—তা থেকেই সব ওলোট-পালোট হয়ে গেল। সেদিন তিনি ভোরবেলা মসজিদ থেকে আজানের আওয়াজ

শুনেই বিছানা ছেড়ে উঠে ঘুমন্ত অভয়চান্দের উপর একখানা পাতলা চাদর ঢাকা দিয়ে ঘরের দরওয়াজা বন্ধ করে গোসলখানায় ঢুকলেন। সেখান থেকে মুখ হাত ধুয়ে পরিচ্ছন্ন হয়ে নিয়ে তাঁর নামাজ করবার ঘরে এসে নামাজে বসলেন।—লা ইলাহা ইল্লাল্লা পয়গম্বরে রসুল আল্লা। মেহেরবান খোদা—তুমি ভিন্ন মাবুদ নাই। তুমি ভিন্ন সত্য নাই। বলে প্রার্থনা এবং স্তব মনে মনে উচ্চারণ করে চলেছেন, ঠিক এই সময় ভেসে এল অভয়চান্দের আর্ত কণ্ঠস্বর। আর্তনাদ করে উঠেছে অভয়চান্দ!

চমকে উঠলেন মহম্মদ সৈয়দ।

আবার অভয়চান্দের আর্ত কণ্ঠস্বর ভেসে এল—মেরে মালিক!

আর স্থির থাকতে পারলেন না মহম্মদ সৈয়দ, তিনি ছুটে বেরিয়ে গেলেন—যাবার সময় দেওয়ালে ঝুলানো খাপ-বন্দী তলোয়ারখানা খাপ থেকে টেনে বের করে নিলেন।

ঘরের মধ্যে অভয়চান্দ রক্তাক্ত দেহে পড়ে ছিল। কেউ খোলা জানলা দিয়ে তাকে তীর দিয়ে বিঁধেছে। তীরটা তার কাঁধের নীচে কলেজার কিছু উপরে বিঁধেছে, এফোঁড় ওফোঁড় হয় নি কিন্তু ক্ষতটা বেশ গভীর। ছাদের আলসের উপর থেকে তীর ছুঁড়তে হয়েছে তাই লক্ষ্যটাও ঠিক হয় নি এবং তীরের গতিতে জোরও খুব বেশী পৌঁছয় নি। দুশমনের খোঁজ করবার তার অবসর ছিল না, তিনি বেহুঁশ অভয়চান্দকে কোলে তুলে নিয়ে আর্তকণ্ঠে ডেকেছিলেন—অভয়চান্দ! মেরা অভয়চান্দ! অভয়চান্দ!

অভয়চান্দ একবার চোখ মেলে মৃদুস্বরে বলেছিল—মেরা মালিক!

মহম্মদ সৈয়দ চীৎকার করে ডেকেছিলেন নোকরদের—পানি পানি! জলদি পানি লাও! আওর কোই যাও হকিম সাহেবকে ডেকে নিয়ে এস। জলদি!

অভয়চান্দ মরে নি; জখম তার বেশই হয়েছিল কিন্তু মহম্মদ সৈয়দ থাট্টার শ্রেষ্ঠ হকিমদের ডেকে প্রচুর পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তাঁদের। অভয়চান্দ ভাল হয়ে উঠলে সে পুরস্কার তাঁরা পাবেন। সুতরাং হকিমেরা প্রাণপণ করেছিলেন এবং অভয়চান্দের সেবা করেছিলেন তিনি নিজে। বিশ্বাস করে কোন নোকরের হাতে দেন নি। কাজকর্ম কাম-কারবার সমস্ত ছেড়ে তিনি অভয়চান্দের মুখের দিকে তাকিয়ে বসে থাকতেন; প্রচুর রক্তক্ষরণে দুর্বল ক্লান্ত অভয়চান্দ দীর্ঘক্ষণ নিথর হয়ে ঘুমিয়ে থাকলে মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে তাকে ডাকতেন—অভয়চান্দ! মেরা অভয়চান্দ!

অভয়চান্দ চোখ মেলে চাইত, সমুদ্রশঙ্খের মত শুভ্র বিশাল চোখ দুটি পুরো মিলতেও তার কষ্ট হত; তবু সৈয়দ সাহেবকে দেখলেই তার পাতলা দুটি ঠোঁটে ক্ষীণ একটি হাস্যরেখা ফুটত এবং অতি ক্ষীণ কণ্ঠে সে বলত—মেরা মালেক! মেরা দেওয়ান!

তার কপালের উপর হাত বুলিয়ে দিয়ে সৈয়দ বলতেন—নেহি অভয়চান্দ। তুমিই আমার দেওয়ান—তুমিই আমার মালেক!

অভয়চান্দ দুটি হাত চেপে ধরত।

এরই মধ্যে তামাম থাট্টা শহরে রটে গেল মহম্মদ সৈয়দ ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে গেছে; সে 'মরদুদ্'। সে নামাজ ছেড়ে ছুটে গিয়েছে লৌণ্ডা অভয়চান্দের টানে। সে গাউস খাঁকে বলেছে—হ্যাঁ আমি গিয়েছি। গাউস খাঁ, আমি জানি না আমার জিন্দগীতে আমার দুনিয়ায় কে আমার ঈশ্বর! অভয়চান্দ না আর কেউ!

"খুদা-ই-ইমান অভয়চান্দস্ত ইয়া দিগর।"

থাট্টার মুসলমানেরা স্তম্ভিত হয়ে গেছে শুনে।

কথাটা মিথ্যা নয়, গাউস কথাটা মিথ্যা রটনা করে নি। মহম্মদ সৈয়দ সত্যই তাকে এ কথা বলেছেন। মহম্মদ সৈয়দ এই ঘটনার জন্য সন্দেহ করেছিলেন গাউস খাঁকে এবং তাকে ডেকে বলেছিলেন—এ কাম তুমি করেছ গাউস?

গাউস বলেছিল—না, আমি করি নি—তবে কে করেছে আমি জানি। করেছে সুলেমান—সেই বাঙ্গালী মুসলমান। তবে আমি করলে খুশী হতাম! আপনি মহম্মদ সৈয়দ, আপনি এক কাফির লৌণ্ডার জাদুতে পড়েছেন। এত বড় উলেমা আপনি, আপনি ওই কাফির লৌণ্ডার চীৎকার শুনে নামাজ সারা না করে উঠে এসেছেন। বলুন আমি ঝুট বলছি?

তার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে মহম্মদ সৈয়দ বলেছিলেন—না, তুমি সত্য কথাই বলেছ। হাঁ, উঠে আমি এসেছি!

—খুদার কাছে নামাজের চেয়ে ওই লৌণ্ডার চীৎকার বড় হল সৈদ সাহেব?

অকম্পিতকণ্ঠে সৈয়দ বলেছিলেন—গাউস খাঁ, তবে শোন "খুদা-ই-ইমান অভয়চান্দস্ত ইয়া দিগর।"

চীৎকার করে উঠেছিল গাউস খাঁ। বে-ইমান—লুচ্চা ইরানী।

হাতে তালি দিয়েছিলেন মহম্মদ সৈয়দ। সঙ্গে সঙ্গে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিল চারজন অস্ত্রধারী লোক। এবং যে কামরায় কথা বলছিলেন তাঁরা সেই ঘরের এক কোণের একটা পর্দাঢাকা খিলানের মধ্য থেকে বেরিয়ে এসেছিল আর একজন। মহম্মদ সৈয়দ বলেছিলেন, বাঁধো ওকে। পহেলে মুখ বন্ধ করো।

গাউস এদের নাম না জানলেও এদের চেনে। এরা থাট্টার বন্দর এলাকার জাঁহাবাজ গুণ্ডা লোক, এরা ভাড়া খাটার কাজ করে থাকে ওই সমুদ্রের বালুকিনারে। এদের অসাধ্য কিছু নেই। এরা স্বচ্ছন্দে একটা মানুষকে দুহাতে চেপে ধরে ক্ষুর দিয়ে নলিটা কেটে দেয়। লাশ পাচার করে বিচিত্র পন্থায়। গাউস এদের হাতে মুহূর্তে বন্দীই শুধু হল না, একখানা গামছার শক্ত বাঁধনের মধ্যে বোবা হয়ে গেল।

—মালেক!

ক্ষীণ কণ্ঠের 'মালেক' শব্দটি মহম্মদ সৈয়দকে একমুহূর্তে

মানুষ করে দিলে। বিগলিত হয়ে গেলেন যেন। ফিরে তাকিয়ে দেখলেন অভয়চান্দ চোখ মেলেছে এবং তার পায়ের দিকে দরজার সামনে বন্দী গাউস খাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। চোখ তার ছলছল করছে। সৈয়দ বললেন—অভয়চান্দ!

—মালেক! মেরা দেওয়ান—গরীবকো ছোড় দেনা। গরীব—ছেড়ে দাও মালিক।

—ছেড়ে দেব?

—আমার বহুৎ দুখ লাগছে মালেক। ছেড়ে দাও। তার ছলছল চোখ থেকে বলতে বলতে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ল।

মহম্মদ সৈয়দ গাউসকে ছেড়েই দিয়েছিলেন। এবং গাউসই এ সমস্ত বিবরণ নানান জায়গায় এমন কি থাট্টার ফৌজদারের কাছ পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিল; কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি বুঝতে পারলেন তাঁর ভাগ্যাকাশের এই উজ্জ্বল আলোকময় গ্রহটিকে নিঃশেষে মুছে দেবার জন্য চারিপাশ থেকে মেঘ ঘনিয়ে আসছে।

বানিয়া বিঠ্‌ঠলদাস এসে তাঁকে বলেছিল—অভয়চান্দকে আপনি ছেড়ে দিন সৈয়দ সাহেব। না হলে আপনার বিপদ অনিবার্য। কাম-কারবার তো বিলকুল যাবে; আপনাকে আর অভয়চান্দকে কাজীর দরবারে হাজির করবে ফৌজদার। হয়তো বহুৎ কড়া সাজাই হয়ে যাবে। আর এই অভয়চান্দকেও ছাড়বে না!

থাট্টা শহরের খবর সে বিস্তৃতভাবে বলেছিল।

মহম্মদ সৈয়দ ভাবছিলেন।

অভয়চান্দ চুপ করে বসে ছিল একপাশে। সে এসে সৈয়দ সাহেবের গলা জড়িয়ে ধরে বলেছিল—মুঝে ছোড় দো মালিক!

—তোমাকে ছেড়ে দেব? না। ঘাড় নেড়েছিলেন মহম্মদ সৈয়দ। তারপর বিঠ্‌ঠলদাসকে বলেছিলেন—বিঠ্‌ঠলদাস!

—ফরমাইয়ে মালিক!

—তুমি দালাল। দালালি কর। আমার কারবারের একজন খরিদ্দার দেখে দিতে পার?

—কারবারের খরিদ্দার? বেচে দেবেন কারবার?

—হাঁ সমস্ত।

বিঠ্‌ঠলদাস অবাক হয়ে চেয়ে থেকেছিল তাঁর মুখের দিকে। সৈয়দ সাহেব বলেছিলেন—কারবারের মাল কি মওজুদ আছে তা তোমার বিলকুল মালুম আছে। আমি সব বেচে দেব।

—সব!

—সব।

—তারপর!

—তারপর অভয়চান্দকে নিয়ে আমি চলে যাব।

—কোথায় যাবেন মালিক?

—পথে পথে বিঠ্‌ঠলদাস। বিঠ্‌ঠলদাস, অভয়চান্দ আমার বান্দা নয়, আমার লৌণ্ডা নয়—অভয়চান্দ আমার তুসরা কিছু। তুমি শুনেছ বিঠ্‌ঠলদাস, আমি গাউসকে বলেছিলাম "খুদা-ই-ইমান অভয়চান্দস্ত ইয়া দিগর"। আমার জিন্দগী তামাম তুনিয়া সব কিছু ওর জন্যে ছাড়তে তৈয়ার আমি বিঠ্‌ঠলদাস। খুদ খুদার দরবারে পৌঁছবার পথের রোশনি অভয়চান্দ। আমি সেই পথে চলব।

অবাক হয়ে গিয়েছিল বিঠ্‌ঠলদাস। কিছুক্ষণ পর বলেছিল—আমি সব বুঝতে না পারলেও কিছু যেন বুঝছি সৈয়দ সাহেব। তা বেশ আমি খোঁজ করি, দেখি খরিদ্দার।

—তুমি তো দালালি করে অনেক রোজগার কর বিঠ্‌ঠলদাস। তুমি নাও না।

—আমি! হুজুরআলি, এই কারবার কেনবার টাকা আমি কোথা পাব! দো চার লাখ রূপেয়া তো কম-সে-কম, সে আমার কোথায়?

—কত আছে তোমার?

—বড়জোর ত্রিশ চালিশ হাজার।

—তাই দিয়ো আমাকে।

—তাই ?

—হ্যাঁ—তাই।

*   *   *

সব কাজকারবার গুটিয়ে দিয়ে সামান্য টাকায় সমস্ত বিক্রি করে দিয়ে তিনি অভয়চান্দকে নিয়ে চলেছেন দক্ষিণে সুদূর গোলকুণ্ডায়। গোলকুণ্ডায় কুতুবশাহী সুলতান আবদুল্লা কুতুবশাহ ধার্মিক উদার শিয়া মুসলমান। শুধু উদার শিয়াই নন রসিক মানুষ—সুফী তত্ত্বের রসগ্রাহী। গোলকুণ্ডা সমৃদ্ধ রাজ্য। রাজধানী হায়দ্রাবাদের জলুসের আর সমৃদ্ধির খ্যাতি দেশদেশান্তরে। দুর্লভ মণিরত্নের আকর রয়েছে গোলকুণ্ডায় ; সারা এসিয়ার জহুরীরা এখানে ভীড় জমিয়েছে ; শাহানশাহ সাজাহানের শিরপেঁচে যে কোহিনূর বসানো আছে তা এসেছে এই গোলকুণ্ডা থেকে। তা ছাড়া আরও একটা বড় কারবার রয়েছে গোলকুণ্ডায় ; ইস্পাতের কারখানা আর কারবার। রাজধানী হায়দ্রাবাদের উত্তরে নির্মল আর ইন্দোর থেকেই ইস্পাত চালান যায় সারা দুনিয়ার সেরা অস্ত্র তৈরীর কারখানা দামাস্কাসে। দামাস্কাসের যে-সব তলোয়ার দিয়ে হাতীর মাথা কাটা যায় সে-সব তলোয়ার এই গোলকুণ্ডার ইস্পাত থেকে তৈরী। এলোরে গালিচার মস্ত কারবার। তা ছাড়া বনে যে সব হাতী পাওয়া যায় তা আফ্রিকার হাতীর সমতুল্য। সারা হিন্দুস্তানের কোন বনে এমন হাতী মেলে না। চন্দনের বন। তামাকের ক্ষেত। কারবার এখানে অনেক। মসলিপত্তনম পূরব দরিয়ার সব থেকে বড় বন্দর। পেগু, শ্যাম, মেক্কা, মাদাগাস্কার, কোচিন, চীন, মানীলা পর্যন্ত জাহাজী কারবার চলে মসলিপত্তনম থেকে।

হাবসী ইরানী ইরাকীরা এখানে দলে দলে এসে ভিড় জমিয়েছে। এদের সঙ্গে আছে নানান জায়গায় নানান দরবেশ ফকির দেওয়ানা, শায়ের, যারা আপন আপন মতে ভজন-সাধন করে। আবদুল্লা

কুতুবশাহ বহুৎ দরদ্‌দার লোক, তিনি এই সব বিচিত্র সাধনপদ্ধতিকে বুঝতে চেষ্টা করেন। তার সমাদর করেন। এ ছাড়াও এখানে আর একজন আছেন যাঁর ভরসা করেন মহম্মদ সৈয়দ। তিনি মীরজুমলা খাঁ, কুতুবশাহী রাজ্যের সিপাহসালার। মীরজুমলা তাঁর ইরানের দোস্ত। ইরান থেকে মীরজুমলা জওহরতের কারবার করতে এসে উঠেছিলেন গোলকুণ্ডায়; মহম্মদ সৈয়দ গিয়েছিলেন থাট্টায়। মীরজুমলা সাহেব জওহরতের ব্যবসায় মন-মন জওহরত সংগ্রহ করেছেন। তারপর কুতুবশাহের জঙ্গী ব্যবস্থার সর্বময় কর্তা হয়ে কুতুবশাহীর হাল ঘুরিয়ে দিয়েছেন। বহুৎ নাম মীরজুমলার। তিনি 'বানাঘাট' পরগনা জয় করেছেন প্রচণ্ড যুদ্ধ করে। সারা হিন্দুস্তানে তাঁর নাম। সৈয়দ সাহেবের বিশ্বাস মীরজুমলা তাঁকে নিশ্চয় চিনতে পারবেন। এবং তাঁকে তিনি রক্ষাও করবেন।

গোলকুণ্ডায় তিনি সামান্য কোন কারবার করে দিনাতিপাত করবেন। শহরের প্রান্তে ছোট একটি বাড়ি নিয়ে সেখানে অভয়চান্দকে নিয়ে দিন কাটাবেন। বিচিত্র অভয়চান্দ! তার ছবি তিনি আসমানে মেঘ উঠলে মেঘের মধ্যে দেখেন, রাত্রে সারি সারি তারার ঘেরের মধ্যে তাকে দেখেন। শুধু তাই নয় মধ্যে মধ্যে অভয়চান্দকে দেখে তাঁর মনে হয়, অভয়চান্দ রক্তমাংসের মানুষ নয়; তার শরীর রোশনি দিয়ে গড়া। তিনি কতবার লক্ষ্য করেছেন দুপহরের ধুপের সময় অভয়চান্দের শরীরে কোন ছায়া পড়ে না। কতবার এই বিচিত্র বালক তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে দেয় তাঁর মনের কথা। কতবার তাঁর মনের প্রশ্নের উত্তর সে গান গেয়ে সেই গানের মধ্যে বলে দেয়। এই তো সেদিন—তিনি থাট্টার মোকামে যখন তাঁর কারবার নিয়ে বিব্রত—কি করবেন ভেবে পাচ্ছেন না—এক-একবার অভয়চান্দের মুখের দিকে তাকাচ্ছেন আর মনে মনে তাঁর কারবারের দামের হিসাব কষছেন তখন অভয়চান্দ হঠাৎ তার একতারাটা তুলে নিয়ে বলেছিল—মালিক, গীত শুনাই?

—গীত? একটু হেসেছিলেন সৈয়দ সাহেব, বুঝেছিলেন অভয়চান্দ চিন্তিত দেখে গান গেয়ে তাঁকে খুশী করতে চাচ্ছে। এটুকু তাঁর খুব ভাল লেগেছিল।

অভয়চান্দ বলেছিল—হাঁ গীত। আচ্ছা গীত।

—আচ্ছা শুনাও।

অভয়চান্দ গান ধরেছিল—সে গান শুনে তিনি চমকে উঠেছিলেন। সে গেয়েছিল—

"লারৌ বাবা আগি জ্বলারো ঘরা রে।
তা করো নি মন ধন্ধে পরা রে!"

ওরে বাবা আগুন লাগিয়ে ঘরটা তো জ্বালিয়ে দে। ছাই করে দে! এই ঘরের জন্যেই মন কাম-কারবার নিয়ে ব্যস্ত। তাই নিয়েই ধন্ধা।"

এমন অনেকবার হয়েছে।

অভয়চান্দকে মোহের বশে তিনি বলেন নি—"খুদা-ই-ইমান অভয়চান্দস্ত ইয়া দিগর।"

তিনি বুঝতে পেরেছেন—অনুভব করতে পারছেন অভয়চান্দ তাঁর জিন্দগীতে চাঁদের মত উঠেছে; সারা জিন্দগী আলো আর ঠাণ্ডাইতে ঝলমল করে তুলবে এবং জুড়িয়ে দেবে। খুদ খুদার মেহেরবানি আপনা-আপনি তাঁর কাছে এসে ধরা দিয়েছে।

আশ্চর্য রূপ, মুখের দিকে তাকালে চোখ ফিরতে চায় না।

আশ্চর্য স্পর্শ বালকের, সে গলা জড়িয়ে ধরে, তিনি তাকে বুকে য়ে ধরেন—সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দেহ মন অবশ হয়ে যায়।

আশ্চর্য কণ্ঠস্বর, তার গান শুনলে দিন দুনিয়ার সব চিন্তা যেন সমুন্দরের বাতাসের মধ্যে গুমোট গরমের মত মিলিয়ে যায়।

আশ্চর্য দৃষ্টি অভয়চান্দের, সে তাঁর দিকে তাকায়—মনে হয় তার দৃষ্টি তাঁর বুকের মধ্যে তাঁর মনকে দেখতে পাচ্ছে।

আশ্চর্য ওর সহবতের গুণ, তামাম দুনিয়ায় মানুষ থেকে সামান্য পর্যন্ত এক হয়ে যাচ্ছে।

থাট্টার মোকামে খানাপিনার পর চাল দাল গঁহু চিনির টুকরা নিয়ে পিঁপড়েরা ঝগড়া করত, লড়াই করত। অভয়চান্দ তাদের বলত—নহি নহি নহি। মৎ করো। লড়াই মৎ করো। নহি নহি নহি।

কখনও সৈয়দের মনে হয়েছে অভয়চান্দ একদম পাগল—বাউরা, বিগড়ে-যাওয়া মগজ নিয়েই ও পয়দা হয়েছে। কখনও মনে হয়েছে —না না না। এ আওয়াজে খুদার হুকুমৎ জারি হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি দেখেছেন অভয়চান্দের এই রূপলাবণ্যময় দেহে রক্ত নেই মাংস নেই—ওর ভিতরে কঙ্কালও নেই। ও স্রিফ এক পুঞ্জ রোশনি, আলো —সে মানুষের আকার নিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়েছে চোখের সামনে থেকে পর্দা উঠে যাচ্ছে, দুনিয়ার রঙ বদলাচ্ছে; তিনি যেন দেখতে পাচ্ছেন এই খুনোখুনি কাটাকাটি জঙ্গীবাজি কাড়াকাড়ি, ঔরৎ আর মর্দানার লালসভরা মাশুকবাজির এই দুনিয়ার পিছনে এক আশ্চর্য দুনিয়া। সে দুনিয়ায় আছে শুধু প্রেম শুধু করুণা—প্রশান্ত, স্নিগ্ধ, আনন্দের সংগীতের একটি অবিশ্রান্ত অবিরাম লহরী বেয়ে চলেছে। মনে হয়েছে সেই দুনিয়ার পর্দার সামনে এই অশান্তি, দুনিয়ার মানুষের দুর্ভোগ। সেই পর্দা তুলবার এখতিয়ার নিয়ে এসেছে এই অভয়চান্দ। সৈয়দের নসীব ভাল—সৈয়দের উপর খুদার অসীম মেহেরবানি যে অভয়চান্দ তাঁকে ডেকে নিয়েছে—তাঁকেই তুলে দিতে হবে এই পর্দা। সঙ্গে সঙ্গে তামাম দুনিয়া ওই অপরূপ দুনিয়ার সঙ্গে মিশে যাবে,—মিলিয়ে যাবে। নুনের পাহাড়ের উপর যদি সমুন্দরের তুফান আসে কিংবা নুনের পাহাড় যদি সমুন্দরে গিয়ে ডুব দেয় তা হলে যেমন বিলকুল নুনের পাহাড় গলে সমুন্দরই হয়ে যায়, ঠিক তেমনি ভাবে মিলে যাবে।

সেই সাধনা করবেন তিনি—আর পেটের জন্যে সামান্য কারবার। তার সঙ্গে তিনি এই অনুভবের কথা নিয়ে গজল রুবাই তৈরি করবেন —সে গাইবে তাঁর এই অভয়চান্দ। দুনিয়ার মানুষকে শুনিয়ে

বেড়াবেন। তাই চলেছেন গোলকুণ্ডা, হায়দ্রাবাদ। সুফী তত্ত্বের রসিক উদার শিয়া মুসলমান আবছুল্লা কুতুবশাহ নিশ্চয় এ বুঝবেন। থাট্টার এদিকে সুন্নীর দল গোঁড়া, তাদের মন সংকীর্ণ, তারা তাঁকে সহ্যই করতে পারলে না। হিন্দুরাও এখানে তাই। তারাই বা সহ্য করলে কোথায়? কুতুবশাহের আশ্রয়ে চলেছেন তিনি। নৌকায় করে চলেছেন। তাঁর ক'জন অতিবিশ্বস্ত নোকর আর মাঝিদের নিয়ে নৌকা ছেড়েছেন থাট্টা থেকে—সমুন্দরের কিনারা বরাবর দক্ষিণে যাবেন সুরাট পর্যন্ত। সেখান থেকে তাপ্তী নদীর মোহনায় ঢুকবেন পূর্বমুখে। তারপর সেখানে নৌকা ছেড়ে দিয়ে চলবেন জমীনের পথে। জমীনের পথে বরাবর দক্ষিণে হায়দ্রাবাদ। নোকর যারা তারা সকলেই তাঁর কেনা গোলাম। তাঁর প্রতি তারা অনুরক্তও বটে।

* * *

আরব দরিয়ার নীল জলের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে সমুদ্রের পাখী উড়ছে। মধ্যে মধ্যে দূরে দেখা যাচ্ছে সমুদ্রের বুকে হাঙ্গরেরা লাফালাফি করছে। পূব তরফে অনেকটা দূরে দেখা যাচ্ছে কিনারার জমীন।

ভাবতে ভাবতেই চলেছিলেন মহম্মদ সৈয়দ। হঠাৎ একসময় অভয়চান্দের মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হল অভয়চান্দ যেন বিষণ্ণ।

অভয়চান্দ সমুন্দর আর আকাশ যেখানে মিলেছে সেইখানটার দিকে তাকিয়ে ছিল, হঠাৎ সে বললে—সৈদসাহেব মালেক!

—অভয়চান্দ!

—এ আমরা কোথায় যাব?

—যাচ্ছি অভয়চান্দ দক্ষিণ। দক্ষিণে গোলকুণ্ডার নাম শুনেছ? কুতুবশাহী সুলতানের ইলাকা।

—কেন? এই দেশে তো বেশ ছিলাম।

—তোমার কষ্ট হচ্ছে অভয়চান্দ?

—কষ্ট ? বিচিত্র অভয়চান্দ হেসে বললে—না। কষ্ট নয়। এখানেও সেই জমীন দরিয়া মাথার উপর আসমান, সেখানেও তাই। এখানেও আদমী মানুষ, সেখানেও তাই। কষ্ট কেন হবে ?

সৈয়দ বললেন—এখানকার মানুষেরা শয়তানের মত বজ্জাত অভয়চান্দ। দু-দুবার তোমাকে খুন করতে চেষ্টা করেছে। আমার উপরেও তারা খাপ্পা হয়ে গেছে। এখানে থাকলে তারা আরও হামলা আরও ঝামেলা করবে। তাই যাচ্ছি গোলকুণ্ডায়।

—সেখানে লোকে হামলা করবে না ?

—মনে হয় করবে না। সুলতান আবদুল্লা কুতুবশাহ শিয়া। উদার 'আজাদমেজাজী' লোক। সমঝদার আদমী।

—কি করবে সেখানে ?

—কি করব। কাম-কারবার কিছু করব। আর তোমাকে পিয়ার করব। গজল রুবাই বয়েৎ বানাব। তুমি গাইবে, আমি সকলকে ডেকে শোনাব।

চুপ করে রইল অভয়চান্দ। তার দৃষ্টি আবার ফিরে গিয়ে নিবদ্ধ হল সমুন্দর আর আসমান যেখানে মিশে গেছে সেইখানে। সৈয়দ ডাকলেন—অভয়চান্দ !

—মালেক !

—চুপ করে গেলে যে ? কি ভাবছ ?

হাসলে অভয়চান্দ। সে হাসি বিষণ্ণ।

হঠাৎ সে বললে—কারবার করে কি করবে মালেক ?

—অভয়চান্দ !

অভয়চান্দ বললে—কারবারেই তো যত ঝামেলা মালেক। ওই নিয়েই তো দুশমনি।

—না অভয়চান্দ ! তা ছাড়াও দুশমনি রয়েছে—বড় দুশমনি। হিন্দু মুসলমানের দুশমন, মুসলমান হিন্দুর দুশমন।

—আমরা যদি হিন্দুও না হই মুসলমানও না হই ?

—তা কি করে হবে অভয়চান্দ।

বড় বড় চোখ মেলে অভয়চান্দ বললে—তা হয় না বুঝি ?

—না। তাও হয় না। হতে দেয় না!

—তার থেকে চল না মালেক চলে যাই কোন জায়গায় যেখানে আদমী নেই। সেখানে তুমি থাকবে আর আমি থাকব!

স্থিরদৃষ্টিতে মহম্মদ সৈয়দ অভয়চান্দের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

কি বলছে অভয়চান্দ! ফকীরী!

অনেকক্ষণ—অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন। চোখের পলক পড়ল না। মনের মধ্যে যেন ঝড় উঠেছে। ফকীরী কল্পনার ঝড় এসে কারবার জীবনের বাগবাগিচা হাভেলী যেন ভেঙে দিতে চাইছে।

হঠাৎ একসময় কোমরবন্ধটা খুলে তা থেকে বের করলেন একমুঠো জহরত। তাঁর কারবারের মাল বিক্রী করে দিয়েছেন তিনি কিন্তু এই মূল্যবান জহরতগুলি সঙ্গে নিয়েছেন। এর দাম বিঠ্ঠলদাসের দেবার ক্ষমতা ছিল না। এগুলি কম দামে বিক্রী করতেও তার মন চায় নি। হায়দ্রাবাদে গিয়ে এর থেকে উৎকৃষ্ট কিছু জহরত নিয়ে সুলতানের সঙ্গে দেখা করবেন। হায়দ্রাবাদে সারা পৃথিবীর জহরত কারবারীরা জহরত খুঁজতে আসে। বিক্রী করে নতুন জিন্দগী শুরু করবেন।

সূর্যের ছটা পড়ে জহরতগুলো ঝিলিক মারছিল। নানান রঙের আলোর ঝিলিক ছড়িয়ে পড়েছে।

—বাঃ কি সুন্দর! কখন অভয়চান্দ দিগন্ত থেকে চোখ ফিরিয়ে তাঁর হাতের অঞ্জলির জহরতের দিকে তাকিয়েছে এবং রঙের বাহার দেখে বলছে—বাঃ কি সুন্দর!

—তুমি নেবে অভয়চান্দ ?

—দাও। হাত পাতলে অভয়চান্দ।

কয়েকটি উৎকৃষ্ট হীরা পোখরাজ নীলা তার হাতে তুলে দিলেন মহম্মদ সৈয়দ। অভয়চান্দ বিমুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সেগুলির দিকে।

নৌকা চলছিল। সূর্য পশ্চিমে ঢলছে। সুরাট বন্দরের নিশানা মিলছে। কিল্লার গম্বুজ দেখা যাচ্ছে। আজই সন্ধ্যা তক পেঁাছনো যাবে। অপরাহ্ণের সঙ্গে সঙ্গেই সমুদ্রের হাওয়া প্রবল হয়ে উঠেছে। নৌকা দুলছে। এক ঝাঁক বাচ্চা হাঙ্গর নৌকার পাশে পাশে লাফাতে লাফাতে চলছে। মহম্মদ সৈয়দ ভাবতে ভাবতেই চলেছেন। ফকীরী!

হঠাৎ অভয়চান্দ খিলখিল করে হেসে বললে—দেখ দেখ মালেক, মচ্ছিরা কেমন খেয়ে ফেলছে!

—কি?

—জহরত। এই দেখ। বলে সে একটা বড় হীরা তুলে জলে ছুঁড়ে দিলে এবং সেটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মাছগুলো সেইখানে লাফ দিয়ে পড়ে ডুব মারছে ওই জলে ডুবে যাওয়া পাথরটিকে ধরবার জন্য।

দশ

দক্ষিণ ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের স্থবাদারের রাজধানী তখন দৌলতাবাদ। বছর কয়েক আগে বাদশাহ সাজাহান দাক্ষিণাত্য বিজয় পর্ব শেষ করে মাণ্ডু জয় করে আগ্রা ফিরেছেন। গোটা নিজামশাহী এলাকা বাদশাহের খাস সাম্রাজ্যভুক্ত হয়েছে। মালিক অম্বরের সঙ্গে সঙ্গেই নিজামশাহী স্থলতানের সৌভাগ্য অস্তমিত হয়েছিল। তাঁর ছেলে ফতে খাঁ গেছে। নিজামশাহী বংশের স্থলতানদের শেষক্রমে যাঁরাই স্থলতান হয়েছিলেন তাঁদেরই মস্তিষ্ক স্থির থাকে নি। থাকতে পায় নি। হাবসী সর্দার আর পাঠান সর্দারদের কলহের মধ্যে পড়ে অসহায় ভাবে মদ্যপান আর বিলাস-বিভ্রমে প্রমত্ত হয়ে থাকা ছাড়া তাঁরা আর পথ খুঁজে পান নি। স্বয়ং বাদশাহ সাজাহান মসনদে বসেই অল্পকালের মধ্যেই দাক্ষিণাত্যের মামলার ফরসালা করেছেন। তামাম নিজামশাহী মুলুকই আজ মুঘল স্থবাদারের খাস ইলাকা। ওদিকে বিজাপুরের আদিলশাহী স্থলতান এবং গোলকুণ্ডার কুতুবশাহী স্থলতানদের কাছে যুদ্ধের খেসারত এবং নজরানা আদায় করে বশ্যতাসূচক সন্ধিপত্রে তাঁদের স্বাক্ষর করতে বাধ্য করে ফিরে গেছেন আগ্রায়। সে আজ প্রায় ছ সাত বছরের কথা। দাক্ষিণাত্যের স্থবাদার করে বসিয়ে গেছেন তৃতীয় পুত্র শাহজাদা ঔরংজীবকে। শাহজাদা মহীউদ্দীন মহম্মদ

কঠিন কঠোর পরিশ্রমী। বিলাসবিভ্রমে তাঁর ঘৃণা; দুর্বার দুরন্ত সাহস; অসাধারণ বিচক্ষণতা এবং দূরদৃষ্টি। উচ্ছ্বাসহীন আবেগহীন স্বল্পভাষী মানুষ। মাত্র আঠারো বছরের যুবা। আর যে কাজ রেখে গেলেন তাঁর জন্য তা তাঁর পক্ষে অত্যন্ত স্বল্প। নিজামশাহী স্থলতানের একজন ধূর্ত শঠ হিন্দু মারাঠী সর্দার সাহজী ভোঁসলের হাত থেকে নিজামশাহী রাজ্যের কয়েকটা দুর্গ জয় এবং তার হাতের খেলার

পুতুল এক নিজামশাহী সুলতানকে উদ্ধার আর পাহাড়িয়া রাজ্য গোন্দ এবং বাগলানার রাজাদের বশ্যতা অর্জন। সে কাজ এই অসাধারণ তরুণ শাহজাদার পক্ষে অনায়াসসাধ্য ছাড়া আর কিছু ছিল না। তাঁর সুযোগ্য মনসবদার খান-ই-জমানকে পাঠিয়ে ছিলেন উত্তর দিক থেকে—এবং বিজাপুরের সুলতানের সঙ্গে চুক্তি করে তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন তাঁর মনসবদারকে দক্ষিণ থেকে এই ধূর্ত মারাঠাকে পিষে মারবার জন্য।

চতুর সাহজী তখন পুনায়। সে এর মধ্যে থেকেও পালিয়েছিল। পার্বত্য পথে পথে 'দেশ' হয়ে মালোহী দুর্গে শেষ আশ্রয় নিয়ে নিজেকে নিরাপদ ভেবেছিল। কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারে নি। আদিলশাহী এবং বাদশাহী ফৌজ এসে মাহোলী অবরোধ করে তার পালাবার পথ বন্ধ করে বসতেই সে নিজামশাহী সুলতানকে বাদশাহী মনসবদার খান-ই-জমানের হাতে সমর্পণ করে নিজে আশ্রয় নিয়েছিল বিজাপুরের সুলতানের কাছে। নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন তরুণ শাহজাদা নিজামশাহী সুলতানদের পুনরভ্যুদয়ের আশঙ্কা থেকে। নিজামশাহী সুলতানকে গোয়ালিয়র দুর্গে পাঠাবার হুকুম দিয়েছিলেন বাদশাহ।

তারপর করেছিলেন 'উদ্গীর' আর 'আউসা' দুর্গ জয়। দুর্ভেদ্য দুর্গের তলায় সুড়ঙ্গ কেটে বারুদ ঠেসে আগুন দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছিলেন তার প্রাচীরবেষ্টনী। উদ্গীর আউসার রাজা আত্মসমর্পণ করেছে।

গোলকুণ্ডার সুলতানের কাছে দুর্লভ হাতী গজমতী—যার দাম টাকায় হয় না—সেই হাতী এবং তার সঙ্গে প্রচুর অর্থ আদায় করে পাঠিয়েছিলেন বাদশাহের কাছে। এবং নিজে পত্তন করেছিলেন নতুন শহর ঔরঙ্গাবাদের।

এরপরই তিনি বাদশাহের ডাক পেয়ে এলেন আগ্রা। তাঁর বিবাহ হল। প্রথম বিবাহ। ইরানী রাজবংশের সন্তান শাহ

নাওয়াজ খাঁ এসেছিলেন হিন্দোস্তানে ভাগ্যান্বেষণে; তাঁর কন্যা দিলরাস বানুর সঙ্গে বিবাহ হল। তারপর বিবাহ হল রহমৎউন্নিসার সঙ্গে।

শাহজাদা তাঁর দুই বেগম এবং দিলরাস বানুর সন্তান জেবউন্নিসা আর রহমৎউন্নিসার পুত্র মহম্মদ সুলতানকে নিয়ে বাস করছেন ঔরঙ্গাবাদের নবনির্মিত ভবনে। নিজের নামে পত্তন করা শহর ঔরঙ্গাবাদের প্রতি তাঁর গভীর মমতা।

যে সময়ের কথা সে সময় বাদশাহ সাজাহান গেছেন কাশ্মীর। আলিজা শাহজাদা দারা সিকো লাহোরে। ঔরংজীব ঔরঙ্গাবাদের প্রাসাদ-অলিন্দে আকাশের দিকে চেয়ে বসে আছেন। ভাবছেন। তাঁর হাতের মুঠোয় একখানি পত্র। ক্ষণে ক্ষণে তাঁর ললাটে সারি সারি রেখা জেগে উঠছে। তাঁর কপিশ চক্ষুতারকা যেন জ্বলে জ্বলে উঠছে।

মধ্যে মধ্যে তাঁর ঠোঁট দুটি নড়ছে—মনে মনে তিনি যেন কিছু বলছেন। বলছেন—কাফের! কাফের! সর্বাঙ্গে পেশীগুলি শক্ত হয়ে উঠছে সঙ্গে সঙ্গে।

হঠাৎ তাঁর কানের পাশে সুমিষ্ট নারীকণ্ঠে উচ্চারিত হল—আলিজা!

গাঢ় চিন্তামগ্নতার মধ্যে এমন ভাবে কেউ ডাকলে সাধারণতঃ চকিত হয়ে ওঠে বা বিরক্ত হয় মানুষ। কিন্তু শাহজাদা ঔরংজীব অন্য ধাতুতে গড়া। তিনি ধীরে মুখ ফেরালেন—এবং বুঝেওছেন কে এসেছে।

নবাববাঈ রহমৎউন্নিসা এসে দাঁড়িয়েছেন।

তিনি বললেন—নবাববাঈ?

—আলিজার বাঁদী!

—তোমার কথাই মনে মনে ভাবছিলাম নবাববাঈ। তাই তোমাকে ডেকেছিলাম। তুমি এসেছ। ভালই হয়েছে।

—খুস্‌নসীব বাঁদীর!

—খুস্‌নসীব তোমার নিশ্চয়। তুমি কাফেরের বেটী নও—তুমি বিখ্যাত সৈয়দ কাদির জিলানীর বংশধর সৈয়দ শাহ মীর সাহেব সিদ্ধপীরের বেটী। কিন্তু এ তুমি আমাকে এতদিন বল নি কেন?

কণ্ঠতালু শুকিয়ে গেল নবাববাঈয়ের।

—নবাববাঈ?

—আলিজা!

—বল নি কেন বল?

—আলিজা, আল্লাহ্‌তয়লা জানেন—পয়গম্বর রসুলের নাম নিয়ে বলছি এ তো আমি জানতাম না আলিজা! এই বেটা আমার বুকে—আলিজা, আমি এর কিছুই জানতাম না!

চুপ করে রইলেন ঔরংজীব। নবাববাঈও চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ঔরংজীব তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন—বস, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

পাশের আসনে নবাববাঈ বসলেন।

ঔরংজীব বললেন—বাদশাহও এ খবর আমাকে এখনও জানান নি। জানিয়েছেন রৌশনআরা। আরও কি জানিয়েছেন জান?

—সেও আমি জানি না আলিজা।

—পড়। দাঁড়াও, তার আগে তোমাকে বলে রাখি, এ কথা তুমি গোপন রাখবে। অত্যন্ত গোপন। কারও কাছে প্রকাশ করবে না।

নবাববাঈ কিছু বললেন না কিন্তু সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন। শাহজাদা বললেন—বুঝিয়ে বলছি। দেখ—দিল্লীর বাদশাহ কাফের রাজা রাজুর বংশের মেয়ে দাবি করেছিলেন। কাফেরের মেয়ে এনে তাকে ইসলামে দীক্ষিত করে পবিত্র করে নিয়ে একদিকে খুদার কাছে দোয়া পেয়েছেন—অন্যদিকে বাদশাহী ইজ্জত

বাড়িয়েছেন—যে কাফেররা মুসলমানদের পানি পর্যন্ত খায় না, মনে মনে ছোট মনে করে তাদের মাথা পায়ের কাছে দাবিয়ে দিয়েছেন। দেখ—জঙ্গীর জোরে আজ তামাম হিন্দুস্তানের কাফের রাজা মহারাজা তৈমুরশাহী বাদশাহের দরবারে মাথা হেঁট করে কুর্নিশ জানিয়ে ঢোকে—নজরানা দেয়, বাদশাহের কাছে অভয় চায় আশ্রয় চায় নোকরি চায়—সে আলাদা কথা। সে হল জঙ্গীর জোর। কিন্তু তাদের জাতের ইজ্জত নিয়ে তারা সহজে হার মানে না। তুমি জরুর শুনেছ যে রাজপুতানায় রাজপুতরা লড়াইয়ে বার বার হেরেছে কিন্তু জাত নিয়ে হার মানে নি। রাজপুত মেয়েরা জ্যান্ত আগুনে পুড়ে মরেছে। এখনও সারা হিন্দুস্তানে চিতোরের রানী পদ্মিনীর নাম নিয়ে তারা বড়াই করে। হাজারে হাজারে রাজপুত লেড়কী জেনানা জবরদস্তি আমরা কেড়ে নিয়েছি—ইসলামে দীক্ষিত করেছি—তারা আমাদের ঘরে এসেছে। আমাদের সন্তান গর্ভে ধারণ করেছে। হয়তো তারা গুনতিতে যারা পুড়ে মরেছে তাদের থেকে বেশী। লেকেন—

একটু চুপ করলেন ঔরংজীব। বিচিত্র হেসে বললেন—তবু যারা পুড়ে মরেছে তারাই থেকে গেছে হিন্দুস্তানের গল্পে গানায়; শুধু হিন্দু নয় আমরা মুসলমানরাও তাদের কথাই বেশী করে মনে করি। যারা জাত দিয়ে আমাদের ঘরে এল তারা যেন পোখ্‌রা কি দরিয়ার বুকে বাবুলার মাফিক উঠে ফেটে গেল মিলিয়ে গেল। বাদশাহ আকবর শাহকে খাঁটি মুসলমানরা বলে 'দজ্জাল'। আকবর শাহ বাদশাহীর জন্যে ইসলামের ইজ্জতকে পুরা না দেখে, কাফেরদের কাছে টানতে চেয়েছিলেন। ইসলামের পুরা দাবি তিনি মানেন নি। চতুর ছিলেন আকবর শাহ। চটাতে চাইতেন না কাফেরদের, বিশেষ করে রাজপুতদের। লেকেন একটা রেওয়াজ তিনি করে গিয়েছেন যে রেওয়াজ ইসলামের ইজ্জত বাড়িয়েছে। তিনি রাজপুত রাজাদের কাছে বেটী চেয়ে চিঠি লিখেছেন—তারা ভয়ে ভয়ে কিংবা বাদশাহী মুরাব্বীয়ানার জন্যে

বেটী পাঠিয়েছে। কিন্তু মনে মনে খুশী হয় নি। আমাদের দাদা বাদশাহ জাহাঙ্গীর শাহ যোধপুরী বেগমের পেটের ছেলে ; আব্বাজান শাহানশাহ সাজাহান—তিনিও রাজপুতানী বেগম, মোটারাজা উদয় সিংহের বেটী মানমতীর ছেলে। আমরা, এতদিনে তৈমুরশাহীতে, ভাই বোন সব পয়দা হয়েছি খাঁটি মুসলমান রক্তে—আমাদের আম্মাজান হজরত বেগম মমতাজমহল আর্জুম বানু খানখানান আসফ খাঁর বেটী। ইরানী রক্ত তাঁদের। আমি খুশী হয়েছি নবাববাঈ, যে তুমিও পীরসাহেব সৈয়দ শাহ মীর হজরতের বেটী। তাঁর রক্ত তোমার দেহে। তোমার কোলেও ওই মহম্মদ সুলতান আমার প্রথম বেটা। কিন্তু আজ সামনে কি দাঁড়িয়েছে জান ? দাঁড়িয়েছে বাদশাহী ইজ্জত। এতটুকু একমুঠা জমীনের মত একটা রাজ্য রাজৌরীর রাজা সে আমাদের ঠকিয়ে দিলে! এর জন্যে করতে হয় কি জান ইজ্জত রাখতে হলে ? করতে হয়—পাহাড় মুল্কের রাজৌরীকে চাড় দিয়ে তুলে দরিয়ায় ফেলে দিতে হয়। কিন্তু বাদশাহ মহম্মদ সুলতানের মুখ চেয়ে, তোমার মুখ চেয়ে রাজা রাজুকে মাফ করেছেন। সুতরাং এ প্রকাশ তুমি কখনও করো না।

নবাববাঈ ঘেমে উঠেছিলেন শুনতে শুনতে। শাহজাদার দীর্ঘ বক্তব্য শেষ হলেও তিনি অপেক্ষা করে রইলেন যদি তিনি আরও কিছু বলেন।

এই শাহজাদাটি এই তরুণ বয়সেই আশ্চর্য ভারী মানুষ। আমীর মনসবদার এমন কি উজীব পর্যন্ত নাকি তাঁর চোখে চোখ রেখে কথা বলতে পারেন না। দিলরাস বানু তিনি—তাঁরা তাঁর বেগম—কিন্তু এই ক' বছরের মধ্যে তাঁদের এই নবীন স্বামীটি কোন দিন সমাদর করতে গিয়ে কখনও আবেগে আত্মহারা হন না। ধীর পদক্ষেপ ধীর কথাবার্তা ; কখনও সিরাজী কি সরাব মুখে তোলেন না। গান শোনেন না, কোন কিছুকে ভয় করেন না। অথচ—

দেখতে বিশালকায় পুরুষ নন—মাথায় সাধারণ, বড় বড় আফগান

ইরানী আমীর মনসবদারের কাছে খাটো মানুষ বলে মনে হয়, অথচ খুদা ছাড়া দুনিয়াতে কাউকে ভয় করেন না। নবাববাঈ শুনেছেন শাহজাদার তখন বলতে গেলে 'বচপন', চৌদ্দ বরিষের লড়কা ; তখন তিনি পাগলা হাতীর সঙ্গে লড়েছিলেন। আগ্রা কিল্লার ঝরোকায় বসে শাহানশাহ হাতীর লড়াই দেখছিলেন—সামনে যমুনার ধারে বালুকিনারে দুই ভারী জবর হাতী লড়াই করছিল। সুধাকর আর সুরতসুন্দর। চারিপাশে সেখানে লোকজনের মধ্যে ঘোড়ার উপর সওয়ার হয়ে বসে ছিলেন বাদশাহের চার ছেলে চার শাহজাদা। সুধাকর হাতীটার ছিল বড় বড় দাঁত, সুরতসুন্দরের দাঁত ছিল না। সুধাকরের দাঁতের ঘা খেয়ে সুরতসুন্দর পালিয়েছিল কিন্তু সুধাকর রাগে অন্ধা হয়ে সুরতসুন্দরকে সামনে না পেয়ে তাড়া করে এসেছিল শাহজাদাদের। ভয়ে সকলে পালিয়েছিলেন—শাহজাদা দারা সিকো, শাহজাদা সুজা, শাহজাদা মুরাদ সব ঘোড়া ছুটিয়ে পালিয়েছিলেন। পালান নি এই শাহজাদা মহম্মদ মহীউদ্দীন ঔরংজীব বাহাদুর। ঘোড়ার রাশ টেনে ধরে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁর নিজের বল্লম ধরে। সিপাহীরা হাউইয়ে আগুন দিয়ে ছুঁড়েছিল সুধাকরের দিকে, তবু সে মানে নি। সে তার মাহুতকে মানে নি। ছুটে এসেছিল শাহজাদার দিকে। হৈ হৈ হায় হায় উঠেছিল চারিপাশে। শাহানশাহ ঝরোকায় ঘেমে উঠেছিলেন। কিন্তু শাহজাদা অনড়। সুধাকর আসতেই তাকে তার মাথায় তাঁর বল্লম দিয়ে মেরেছিলেন। বল্লমটা বসে গিয়েছিল। সুধাকর যন্ত্রণায় পাগল হয়ে শাহজাদার ঘোড়াটাকে মেরেছিল দাঁতের ঘায়ে। শাহজাদা ঘোড়া থেকে লাফ দিয়ে পড়ে তাঁর তলোয়ার খুলে দাঁড়িয়েছিলেন। হাতীটা থমকে গিয়েছিল। ওদিকে সুরতসুন্দরকে ফিরিয়েছিল তার মাহুত। সুতরাং হাতীটাকেই ফিরে যেতে হয়েছিল। শাহজাদা যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন সেইখানেই ছিলেন—এক পাও পিছু হটেন নি। তামাম লোক অবাক হয়ে গিয়েছিল। কে এ রুস্তম? শাহানশাহ তাঁকে বলেছিলেন—

বাহাদুর। আর খুশী হয়ে খেলাত দিয়েছিলেন এই সুধাকর হাতীটাকে, বলেছিলেন—বেটা, এ হাতী আজ থেকে তোমার। আর দিয়েছিলেন পাঁচ হাজার মোহর, তার সঙ্গে দু দু লাখ রূপেয়ার নানান জিনিস। এ শাহজাদা আলাদা জাতের মানুষ। একবার চোখের দিকে তাকালেই তা মালুম হয়ে যায়।

খাঁটি মুসলমান! গোঁড়া, অত্যন্ত গোঁড়া। ইসলামের জন্য জান দিতে পারেন। জান নিতেও কোন দ্বিধা নেই।

তাই দীর্ঘ বক্তব্য শেষ করে তিনি চুপ করলেও নবাববাঈ কিছু বলতে ভরসা করলেন না। চুপ করে প্রতীক্ষা করেই রইলেন।

ঔরংজীব এবার রৌশনআরার চিঠিখানা তাঁর হাতে দিতে গিয়েও না দিয়ে, নিজে খুলে পড়ে তাঁকে শোনালেন। শোনালেন শিরিনের বিবরণটুকু।

কাশ্মীরী শায়ের সুভগের সঙ্গে শিরিনের প্রেমের কথা। তারপর বাদশাহের ইচ্ছার কথা। কবি সুভগকে মুসলমান করে শিরিনের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশের কথা। এবং তার পরের সব বিবরণ। শিরিনকে কবর থেকে তুলে সুভগের হাতে দেওয়া হয়েছে। শর্ত আছে শিরিন মুসলমানই যখন হয়েছে তখন সে তাই থাকবে আর কবি সুভগ হিন্দুই থাকবে। তারা মহব্বতির উপর বনিয়াদ কেটে ঘর গড়ে তুলবে।

এইটুকু পড়েই তিনি চুপ করলেন।

নবাববাঈ বললেন—হাঁ আলিজা, শিরিন দিল্লীতে এসে শায়ের সুভগের জন্য কাঁদত। তার মহব্বতি সে ভুলতে পারে নি। সে আমি জানি। শাহানশাহের ভাল লেগেছিল বলে তাকে যখন শাহানশাহের বাঁদী মহলে পাঠানো হল তখন আমি দিদিজী নাদিরা বানু বেগম সাহেবাকে সব বলেছিলাম—দিদিজী, শিরিন আমার বচপনের সহেলী। আমার জন্যে ও এসেছে আগ্রায় মা-বাপ ছেড়ে আপন মুল্লুক ছেড়ে আপনার—।

থেমে গেলেন নবাববাঈ। কিন্তু শাহজাদা তাঁর দিকে তাকিয়ে একটুকরো বিচিত্র হাসি হেসে বললেন—বল নবাববাঈ, আপনা ধরম ছেড়ে ব্রাহমনের লেড়কী মুসলমান হল, বল!

নবাববাঈ চুপ করে রইলেন। মাথা তাঁর হেঁট হয়ে গেল। বুকের ভেতরটা গুড়গুড় করে উঠল অনির্দিষ্ট আশঙ্কায়। হ্যাঁ, তাই তিনি বলতে যাচ্ছিলেন।

ঔরংজীব বললেন—নবাববাঈ, কসুর তোমার আমি ধরব না। রাজা রাজু তোমাকে তোমার বচপনে কাফের করে মানুষ করেছিল। বচপনে যা করে, যা মানে, তা সহজে ভোলা যায় না। হিন্দুস্তানের বাদশাহ জেলালউদ্দীন আকবর শাহের হারেমে হাজার দৌলতের মধ্যে এসেও যোধপুরী বেগম তুলসী গাছ আর গঙ্গাপানি ভুলতে পারেন নি। আকবর শাহ তাই দিয়েছিলেন আগ্রা কেল্লার মধ্যে। খাঁটি মুসলমানেরা অকারণে আকবর শাহকে দজ্জাল বলে না।

বলতে বলতে মুখখানা তাঁর রোষরক্তিম হয়ে উঠল। দেখে ভয় পেলেন নবাববাঈ।

শাহজাদা উঠে দাঁড়ালেন। উত্তেজনায় তিনি সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন। হাত দুখানি মুষ্টিবদ্ধ হয়ে উঠেছে। সামনের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন—তারপর এই দারা সিকো। আকবর শাহ ছিলেন দজ্জাল। দারা সিকো কাফের। ইসলামকে সে বরবাদ দেবে। আফসোস, আফসোসের বাত কি শাহানশাহ সাজাহান—যাঁকে মুসলমানেরা বলে মেহেদী—তিনিও অন্ধা হয়ে গেছেন। দারা সিকোর এই সব গুনাহ তিনি দেখতে পান না। হায় রে তৈমুরশাহীর নসীব, তাঁর এই বংশধর থেকে ইসলাম বরবাদ হবে এই হিন্দুস্তান মুল্‌কে! এই কাফের হবে বাদশাহ!

চুপ করে গেলেন। স্থির দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলেন। যেন সুদূর ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে দেখছেন ভবিষ্যতের ছবি। বরবাদ হচ্ছে ইসলাম—সারা মুল্ক কাফেরীপনায় ভরে উঠছে।

তারপর হঠাৎ বলে উঠলেন—নেহি নেহি মেহি !

আবার কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে কিছু ভাবলেন। কারণ এবার তিনি তাকিয়ে ছিলেন মাটির দিকে। তারপর বললেন—আপনার মহলে যাও নবাববাঈ। তোমার কসুর নেই সে আমি বুঝেছি। যাও। আমি বাইরে যাচ্ছি।

চলে গেলেন ঔরংজীব। তিনি চলেছেন এখুনি এর একটা ব্যবস্থা করবেন বলে। শিরিন আর শায়র সুভগ যেখানে থাক তাদের খোঁজ তিনি করবেন। আরও কাজ আছে—কে এক সৈয়দ মহম্মদ জহরতবালা—সে এক কাফের লৌণ্ডাকে নিয়ে মেতেছে। সে বলছে—খুদা-ই-ইমান অভয়চান্দস্ত দিগর। সে আসছে থাট্টা থেকে—দক্ষিণে যাবে সে গোলকুণ্ডা। সুলতান কুতুবশাহ সুফী। তাঁর আশ্রয়ে যাচ্ছে। তাকে পথে আটকাতে হবে। এই সুফীরা—এরাই ইসলামের অধঃপতনের আর একটা কারণ। এদের নিশ্চিহ্ন করে দেবেন তিনি যদি সুযোগ পান—আল্লাহ্‌তয়লা তাঁকে যদি কোন দিন সে অধিকার দেন !

এগারো

দাক্ষিণাত্যের উত্তর ভাগ পাঠান সুলতানদের আমল থেকে মোটামুটি মুসলমান সুলতানদের অধীনে এসেছিল। বাহমনী রাজত্ব পাঁচ ভাগে বিভক্ত হয়েছিল—বাহমনী বংশকে উচ্ছেদ করে আহম্মদনগর বিজাপুর গোলকুণ্ডা বেরার এবং বিদর। আহম্মদনগরে নিজামশাহী, বিজাপুরে আদিলশাহী এবং গোলকুণ্ডায় ছিল কুতুবশাহী সুলতান। তার মধ্যে বাদশাহ জেলালউদ্দীন আকবর শাহের আমলে আহম্মদনগর মুঘল বাদশাহের করতলগত হয়েছে। এই পাঁচ রাজ্যের মধ্যে বিবাদের আর অন্ত ছিল না। .স . সময় বিরোধ লেগে ছিল বিজাপুরের আদিলশাহী সুলতান এবং আহম্মদনগরের নিজামশাহী সুলতানের মধ্যে। নিজামশাহী সুলতানের কন্যার সাদী হয়েছিল বিজাপুরের সুলতানের সঙ্গে। আজও সারা দক্ষিণের লোকেরা এই নিজামশাহী কন্যা এবং বিজাপুর সুলতানার নাম উচ্চারণ করে সগৌরবে। সে নাম চাঁদ সুলতানা। মহিমময়ী অসমসাহসিনী চাঁদ সুলতানা প্রাণ দিয়েও পিতৃবংশ এবং শ্বশুরবংশের সঙ্গে গৃহবিবাদ মেটাতে পারেন নি। গুপ্তঘাতকের হাতে তিনি নিহত হয়েছিলেন। সেই সুযোগে মুঘল বাদশাহী ফৌজ ঝাঁপিয়ে পড়েছিল আহম্মদনগরের উপর। আকবর শাহের কনিষ্ঠ পুত্র মুরাদ আহম্মদনগর দখল করেছিলেন। এর পর কিছুদিন প্রায় দু'পুরুষ, এক নিজামশাহী সুলতান নামেমাত্র মসনদে থাকলেও সাজাহানের আমল পর্যন্ত তাঁরা বিলুপ্ত হয়েছেন। আহম্মদনগর কিল্লা এখন মুঘল বাদশাহীর এলাকা। তারপর অবশিষ্ট এখন বিজাপুর এবং গোলকুণ্ডা। আদিলশাহী সুলতান এবং কুতুবশাহী সুলতান। গৃহবিবাদও লেগেই আছে। তা থাকলেও তাদের অস্তিত্ব সবল এবং সমৃদ্ধ। দক্ষিণের সুলতানদের রাজত্বের বিশেষত্ব এই যে এখানে হাবসী সর্দারদের প্রাধান্য। বহুকাল ধরেই জাহাজে চেপে বহু ভাগ্যান্বেষী হাবসী মুসলমান সর্দার তার সঙ্গে তুর্কী ও

দু'দশজন ইরানী যুদ্ধজীবী দক্ষিণে এসে এই সুলতানদের অধীনে সামান্য কর্ম থেকে আপন-আপন দক্ষতায় জায়গীর পেয়ে আমীর হয়েছেন। মোটামুটি বলতে গেলে গোলাপীবর্ণ তুর্ক ওমরাহী ও কৃষ্ণবর্ণ হাবসী ওমরাহীতে দ্বিধা-বিভক্ত দক্ষিণ। তা ছাড়াও আছে এই দেশী অর্থাৎ দক্ষিণের অধিবাসী দক্ষিণী কঙ্কণী ব্রাহ্মণ এবং হিন্দু সমরনায়কদেরও একটি গোষ্ঠী। দাক্ষিণাত্যের পাহাড় এবং ঘন অরণ্য অঞ্চলে এই মারাঠীরা তাদের যে বিচিত্র যুদ্ধপদ্ধতি আবিষ্কার করেছে তার সঙ্গে সমগ্র উত্তর ভারতের ক্ষাত্রপ্রধান অঞ্চলের যুদ্ধপদ্ধতির পার্থক্য প্রায় বিপরীত।

উত্তর ভারতে পঞ্জাব থেকে রাজপুতানা এবং উত্তর প্রদেশ কোশল বিহার পর্যন্ত ক্ষত্রিয় সমরনায়কেরা এবং তাদের অধীনে সেনাবাহিনী সেই রামায়ণ মহাভারতের যুদ্ধপদ্ধতির যুদ্ধধর্মকে প্রাণপণে অক্ষুণ্ণ রেখেছে—সম্মুখ সমর এবং যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন এইটেই তাদের কাছে আশ্চর্য রকমের আকর্ষণীয় ধর্ম। পিঠে অস্ত্রাঘাত চিহ্ন লজ্জার কথা, পালিয়ে যাওয়া বা পিছু হটা তাদের কাছে অগৌরবের কথা। এবং নিরস্ত্র শত্রুকে বধ করাও তাদের কাছে ধর্মসম্মত নয়। শরণাগত, সে যেই হোক, একজন গুপ্তচর হলেও তাকে আশ্রয় না দিলে পূর্বপুরুষেরা লজ্জায় মাথা হেঁট করেন। নরকস্থ হন। ভারতবর্ষের বহু যুদ্ধে উভয় পক্ষের সম্মতিতে যুদ্ধবিরতি হয়েছে: হিন্দু ক্ষত্রিয় সৈন্যেরা শিবিরে এসে অস্ত্রশস্ত্র রেখে প্রচুর ভাঙ খেয়ে যখন রামচন্দ্র ও কিষণজীর ভজনা করেছে ঢোল এবং করতাল বাজিয়ে, তখন ও পক্ষের শিবিরের সৈন্যেরা অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে রাত্রির অন্ধকারে হিন্দুদের অসতর্ক অবস্থায় এসে 'আল্লা হো আকবর' ধ্বনি তুলে লাফিয়ে পড়ে সে এক বীভৎস হত্যাকাণ্ড করেছে। তবু দু' দশজন ছাড়া এদের কেউ পালায় নি। হর হর মহাদেও ধ্বনি দিয়ে মরেছে, বুকে কাঁধে আহত হয়েছে। যারা পালিয়ে বাড়ি ফিরেছে তারা বাপ মা এমন কি স্ত্রীর দ্বারাও তিরস্কৃত হয়েছে। সে তিরৌরীর যুদ্ধ থেকে খানুয়ার যুদ্ধ পর্যন্ত। তবুও তারা আজও যা ছিল তাই আছে।

কিন্তু দক্ষিণের এই পাহাড় ও জঙ্গলের খর্বকায় অধিবাসীরা তা নয়। এরা পিছু হটতে জানে প্রয়োজনের সময়, পালাতে জানে, লুকুতে জানে এবং ছত্রভঙ্গ হয়ে দূরান্তরে গিয়েও মিলতে জানে, এবং সময় বুঝে এরা আবার এই সুলতানী বা বাদশাহী সৈন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে জানে দলবদ্ধ নেকড়ের মত। এবং কঙ্কণী ব্রাহ্মণেরা তীক্ষ্ণবুদ্ধি পরামর্শদাতা—যোদ্ধাসর্দারেরাও কৌশলী চতুর। এদের মধ্যে ভোঁসলে বংশের সর্দারেরা প্রধান। হাবসী বা তুর্কী ওমরাহদের বিবাদের সুযোগে এরা বেড়ে উঠেছে এবং উঠছে। তাদের তারা নির্মূল বা ধ্বংস করতে পারে নি। তবে হিন্দুধর্মের সহজ এবং সাধারণ জীবনে এরা উত্তর ভারতের সঙ্গে পৃথক নয়। বলতে গেলে কড়াকড়ি একটু বেশী।

* * *

শাহজাদা ঔরংজীব, পূর্বেই বলেছি, দাক্ষিণাত্যের সুবাদার হয়ে এসেছেন। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন বিজাপুর এবং গোলকুণ্ডার দিকে। এদের গৃহবিবাদ সুকৌশলে বাড়িয়ে যাচ্ছেন। এই ছুটি মুসলমান রাজ্য কুক্ষিগত করতে পারলেই গোটা দক্ষিণকে মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত করতে পারবেন।

এই সুলতানদের তিনি প্রীতির চক্ষে দেখেন না। তার প্রধান কারণ এঁরা সুফী। তা ছাড়া বার্ষিক কর দিয়ে তাঁরা স্বরাজ্যে প্রায় স্বাধীন। এঁরা বিলাসী মদ্যপ—রাজকার্যে অকর্মণ্যের সামিল। যা করে এই সর্দারেরা তাই মেনে নিতে বাধ্য হন। তুর্ক পাঠান সর্দারদের সঙ্গে হাবসী সর্দারদের কলহের মধ্যে কতকগুলো দক্ষিণী হিন্দু সর্দার শক্তিশালী হয়ে স্বেচ্ছাচার করছে তাও নিবারণ করবার এঁদের শক্তি নেই। নিজামশাহীর কার্যতঃ বিলুপ্তি ঘটেছে কিন্তু আজও ঠিক নিঃশেষ হয়েছে এ কথা বলা যায় না।

নিজামশাহী সুলতানের ছুর্ধর্ষ সেনাপতি এবং সর্বেসর্বা হাবসী আমীর মালিক অম্বর মরেছে। তার ছেলে ফতে খাঁ মরেছে। কিন্তু

তাদের অধীনস্থ এক হিন্দু সর্দার সাহজী ভোঁসলে উদ্‌গীর কেল্লায় নিজামশাহী সুলতান বংশের এক বাচ্চাকে সুলতান করে বসিয়ে উদ্‌গীর আউসা প্রভৃতি কতকগুলো পার্বত্য দুর্গ নিয়ে এখনও চেপে বসে আছে। খান-ই-জমান এবং খান-ই-দৌরানকে তাকে দমনের জন্য পাঠিয়েছেন—কিন্তু আজও তারা সাহজী ভোঁসলকে সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত করতে পারে নি। মধ্যে মধ্যে তিনি অসহিষ্ণু অধীর হয়ে ওঠেন। ইচ্ছে হয় ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে নিজের তরবারি কোষ-মুক্ত করে আল্লাহ্ তয়লার নাম উচ্চারণ করে বেরিয়ে পড়েন আরব-সাগরের সামুদ্রিক ঝঞ্ঝার মত অথবা আরবের মরুভূমির মরুঝঞ্ঝার মত। ইসলাম ধর্মাবলম্বী সুলতানের পুত্রের অভিভাবক এক কাফের হিন্দু। এর চেয়ে বড় গুনাহ আর কি হতে পারে এই দুনিয়ায়! কিন্তু শাহজাদা শুধু গোঁড়া সুন্নী মুসলমানই নন তিনি চাঘতাই বংশের বাদশাহের পুত্র শাহজাদা। রাজনীতিতে এই অল্পবয়সেই তিনি সুদক্ষ সুপারঙ্গম। তিনি ধৈর্য ধরতে জানেন। বাইরে থেকে কাউকে কিছু বুঝতে দেন না।

যে দিনের ঘটনা বলছি সে দিন কিন্তু তিনি দাক্ষিণাত্যের মুঘল রাজধানী ঔরঙ্গাবাদের পরামর্শ করবার কক্ষের মধ্যে উত্তেজিত হয়েই পদচারণা করছিলেন। গোলকুণ্ডা থেকে একজন হরকরা গুপ্তচর সংবাদ এনেছে যে গোলকুণ্ডা শহরের বাইরে সে একজন ফকীরকে দেখে এসেছে, তার নাম লোকে বলছে সারমাদ। তার সঙ্গে আছে একটি অপরূপ সুন্দর হিন্দু লৌণ্ডা যার নাম চান্দ। ফকীর সারমাদ আশ্চর্য আশ্চর্য কথা বলে—তেমনি তার পারসী গান—সে গান গায় ওই লৌণ্ডা অভয়চান্দ। লৌণ্ডার গানের গলা মধুর লায়েক মধুরাই—আর কি এক জাদু আছে লৌণ্ডার আওয়াজে—যে মানুষ শোনে তার আর হুঁশ থাকে না!

শাহজাদা চোখ বন্ধ করে কয়েক মুহূর্ত ভেবেছিলেন। কপালে

কটি রেখা জেগে উঠেছিল। তিনি চিন্তা করছিলেন। সারমাদ আর চান্দ? মহম্মদ সৈয়দ আর অভয়চান্দ নয়?

কিছুদিন আগে তাঁর প্রিয় ভগ্নী রৌশনআরা লাহোর থেকে নিশান পাঠিয়েছিলেন—তাতে রহমৎউন্নিসার জন্ম-বৃত্তান্তের খবর ছিল—শিরীন বাঁদীর খবর ছিল আর খবর ছিল এই এদের। মহম্মদ সৈয়দ ইহুদী থেকে হয়েছিল মুসলমান। তারপর থাট্টায় এসেছিল জওহরতবালা হয়ে। জওহরতের সঙ্গে আর পাঁচরকম ব্যবসা করতে করতে এই এক হিন্দু লৌণ্ডার সুরত দেখে বাউরা হয়ে গিয়ে ইসলামকে বরবাদ দিয়েছে। সে এখন আল্লাহ্‌তয়লাকে ভুলেছে—তাঁর জায়গায় বসিয়েছে এই হিন্দু লৌণ্ডা অভয়চান্দকে। সে বলে—সকলের সামনে প্রকাশ্যে বলে—"খুদা-ই-ইমান অভয়চান্দস্ত দিগর।" এর চেয়ে গুনাহ আর হতে পারে না। কাফের পুতুলকে বলে ঈশ্বর। তার পূজো করে; তাকে খেতে দেয়; তাকে কাপড় পরায়,গহনা পরায়, সোনার সিংহাসন গড়িয়ে তার উপর বসায়। তাকে বাতাস করে। এ হল লেড়কীদের পুত্‌লী নিয়ে খেলাঘরে খেলা করার মত খেলা। কোন মানুষ কোন মুসলমান এ বরদাস্ত করতে পারে না।

পয়গম্বর বলে গেছেন—মুসলমান ধর্মের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য হল এই কাফেরী তুনিয়া থেকে মুছে দাও। তার জায়গায় ইসলামের সত্য পথে খুদাতায়লার উপাসনা করতে শেখাও মানুষকে। যে কাফের থেকে মুসলমান হবে তাকে সাহায্য কর, তাকে আলিঙ্গন দাও, তাকে রক্ষা কর, অনুগ্রহ কর। মুসলমান—তুমি বাদশাহ হলে জানবে তোমাকে খুদাতায়লা বাদশাহী দিয়েছেন এই জন্যে। এই হল তোমার শ্রেষ্ঠ এবং প্রথম বাদশাহী কর্তব্য। তুমি আমীর হলে বুঝবে খুদা তোমাকে আমীরশাহী দিয়েছেন ঠিক এই জন্যে। মুসলমান—তুনিয়ায় তুমি পয়দা হয়েছ তাও এই জন্যে।

মদিনা আর মক্কায় পয়গম্বরের জারি-করা ফরমান আজ মুসলমানের

শক্তির বলে জারি হতে চলেছে তামাম দুনিয়াভর। এই হিন্দুস্তানের কাফেররা দুনিয়ার কাফেরদের মধ্যে সব থেকে বদমাশ আর নিকৃষ্টতম কাফের। এই হিন্দুস্তানে সেই মহম্মদ বিন কাসেমের আমল থেকে আজ হাজার বরিষ গুজরে গেল তবু এই সত্য ইসলামধর্মের পবিত্রতা বুঝলে না, মহত্ত্ব বুঝলে না। এই সারা দিনদুনিয়া—ওই চাঁদ সূরয আর ওই আসমানে কোটি কোটি নক্ষত্রের স্রষ্টার বিরাটত্ব বুঝতে চাইলে না, চায় না। লড়াই দিয়ে নিজের খুন ঢেলে জান দিয়েও ইসলাম গ্রহণ করলে না। গ্রহণ করা দূরে থাক তারা ইসলামকে তাদের কাফেরী ধর্মের চেয়ে ছোট মনে করে। তাদের অচ্ছুত ভাবে। তাদের বলে—যবন।

তার চেয়েও গুনাহগারীর ধর্ম এটা। "খুদা-ই-ইমান অভয়চান্দস্ত দিগর।" আমার খোদা অভয়চান্দ ছাড়া আর নেই!

একটা কাফের লৌণ্ডা! সে হল তার খুদা!

মুসলমানের মুখে এমন কথা!

বহেন রৌশনআরা লিখেছিলেন—"সে যাচ্ছে থাট্টা থেকে গোলকুণ্ডায় সুলতান আবদুল্লা কুতুবশাহের দরবারে। আবদুল্লা কুতুবশাহ সুফী। তাঁর উপর তার এই রকম উদ্ভট ধরনের ধর্মসাধন পন্থার উপর একটা আকর্ষণ আছে। গোলকুণ্ডায় ফকীরেরা অনেকে কাফেরদের তান্ত্রিক এবং বৈষ্ণবদের মত বিচিত্র পন্থায় সাধন-ভজন করেন। মহম্মদ সৈয়দ গোলকুণ্ডায় যাচ্ছে তাঁর রাজ্যে আশ্রয় পাবে বলে।"

এ সব কথা সত্য। শাহজাদা ঔরংজীব খবর নিয়ে জেনেছেন যে এ সবই সত্য—গুজব নয়; এমন কি অতিরঞ্জিতও নয়। দু' চার জন ফকীর কাফেরদের বৈষ্ণবদের মত ঔরৎ নিয়ে সাধনভজনের কাম-কারবার করে। সুতরাং লৌণ্ডাকে নিয়ে একটা নতুনতর সাধনভজন দেখিয়ে আবদুল্লা কুতুবশাহের আশ্রয় প্রত্যাশা বেশী কিছু নয়।

শাহজাদা খবরটা পেয়ে তাঁর গুপ্তচরদের হুকুম দিয়েছিলেন যে বিজাপুর গোলকুণ্ডার উত্তর অঞ্চল এই বাদশাহী এলাকার সমস্ত পথের উপর খুব কড়া নজর রাখ। মহম্মদ সৈয়দ নাম, ইরানী চেহারা কিন্তু রং আরও কটা হলেও হতে পারে। অনেকে বলে লোকটার পয়দা হয়েছিল ইরানের কাশান এলাকায় কিন্তু লোকটার বাপ পিতামহ কাশানের লোক নয়, তারা হল আর্মানী। পেশায় সে জওহরতবালা। তার সঙ্গে থাকবে বহুৎ খুবসুরত এক লৌণ্ডা—তার নাম অভয়চান্দ। যাচ্ছে তারা গোলকুণ্ডা। পেলেই তাদের আটক কর। এবং হাজির কর আমার সামনে; মোকাবিলা করবেন তার সঙ্গে।

এ হুকুম দিয়েছেন তিনি তিন মাস আগে। প্রত্যেক সড়কের রাহাদারী ছাউনিতে হুকুম দিয়ে রেখেছেন। আট দশ জন গুপ্তচর রেখেছেন। প্রথম মাসখানেক শত রাজকার্যের মধ্যেও ইয়াদ রেখেছেন মহম্মদ সৈয়দের নাম। প্রত্যাশা করেছেন জওহরতবালা মহম্মদ সৈয়দকে 'গিরফ্‌তার' করে হাজির করবে তাঁর সামনে।

ক্রমে কথাটা পুরনো হয়ে এলেও একেবারে ভুলে তিনি যান নি। দুনিয়াতে আদমী গুনাহ করলে গুনাহ তার। এ কথা সত্য। কিন্তু তার সঙ্গে এ কথাও সত্য যে দুনিয়ায় যে খাঁটি মুসলমান তার দায়দায়িত্ব হল খুদাতায়লার দুনিয়ায় গুনাহগারির প্রতিকার করা। এবং সেই খাঁটি মুসলমান যদি বাদশাহ কি সুলতান হন—কি শাহজাদা হন তবে তাঁর দায়দায়িত্ব আরও অনেক বেশী। শাহজাদা ঔরংজীব! তামাম হিন্দুস্তানের মালেক শাহানশাহ বাদশাহ সাজাহানের পুত্র, শাহজাদা তিনি। সমস্ত দক্ষিণ মুলুকে তিনিই বাদশাহের প্রতিভূ। হয়তো বা ভবিষ্যতে বাদশাহ সাজাহানের পর—তিনিই—।

সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চিন্তার মোড় ঘুরে যেত। চিন্তার সঙ্গে মন চলে যেত আগ্রায় দিল্লীতে।

প্রথমেই মনে পড়ত শাহবুলন্দ্‌ ইকবাল শাহজাদা দারা সিকোর

মুখ। কাফির! কাফির! কাফির! দারা সিকো কাফির! সেই ইসলামের মধ্যেও পূর্ণ সত্যকে দেখতে পায় না। সে কাফির পণ্ডিতদের নিয়ে শাস্ত্র আলোচনা করে, আজকাল নাকি উপনিষদ নামে কি একখানা কিতাব নিয়ে মশগুল হয়ে আছে। পার্সীতে তার তরজমা করছে। কেরেস্তানদের বাইবেল নিয়ে আলোচনা করে পাদরীদের সঙ্গে।

কাফির, সে কাফির! সে কাফির! শাহবুলন্দ্ ইকবাল তার খেতাব! পিতার প্রিয়তম পুত্র। তা হোক। তা হও তুমি শাহবুলন্দ্ ইকবাল। তা তুমি হও! 'লা-ইলাহি-ইল্লাল্লা! আল্লা বেগর মাবুদ নাই। ইসলাম ছাড়া ধর্ম নাই।'—এ যদি সত্য হয় তবে—তুমি—নও—তুমি নও। তুমি কথনও বসবে না হিন্দুস্তানের বাদশাহী তখ্‌ত্‌তাউসে। কখনও না।

খুদার গোলামের গোলাম—পয়গম্বর রসুল হজরত মহম্মদের নোকর গোলাম এই মহম্মদ মহীউদ্দীন ঔরংজীব বেঁচে থাকতে অন্ততঃ তা হবে না। না। কখনও হবে না।

মনশ্চক্ষে তিনি ভাবী কালের রণাঙ্গনে মনে মনে সৈন্য সমাবেশ করতেন।

* * *

দাক্ষিণাত্যের রাজনীতিতে তিনি গভীর থেকে গভীরতর প্রদেশে প্রবেশ করতেন। সম্পদ সংগ্রহে মনোযোগী হতেন। বিজাপুর আর গোলকুণ্ডা এই দুই সুলতানশাহী উচ্ছেদ করে ভাবী সাম্রাজ্যের ভিত গড়তেন।

বিজাপুরের সঙ্গে সন্ধি হয়ে গেছে। তিনি সন্তুষ্ট হন নি।

গোলকুণ্ডার সঙ্গে সন্ধি তার আগেই হয়েছে। সে সন্ধি আরও দৃঢ় আরও স্থায়ী। বাদশাহ যখন শাহজাদা, সাজাহান নন তখন—তখন তিনি তাঁরই মত শাহজাদা। শাহজাদা খুরম। ঔরংজীব সেজ অর্থাৎ তৃতীয় শাহজাদা—খুরম ছিলেন মেজ। দ্বিতীয়। অবশ্য

জ্যেষ্ঠ শ্বশ্রু তখন অন্ধ বন্দী। কিন্তু সম্রাট জাহাঙ্গীরের পাশে তখন সম্রাজ্ঞী নূরজাহান জীবিত। সেই সময় শাহজাদা খুরম পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। সে বিদ্রোহ দমন করতে সম্রাজ্ঞী নূরজাহান মুঘল দরবারের শ্রেষ্ঠ মনসবদার খান-ই-খানান মহব্বৎ খাঁকে পাঠিয়েছিলেন। মহব্বৎ খাঁর তাড়ায় শাহজাদা খুরম প্রথম পালিয়ে এসেছিলেন দক্ষিণে। কিন্তু মহব্বৎ খাঁ তাঁকে বিশ্রাম দেন নি। এবং দক্ষিণে কেউ তাঁকে সাহায্য করে নি। একমাত্র গোলকুণ্ডার এই সুলতান আবদুল্লা কুতবশাহ তাঁকে কয়েক দিনের জন্য তাঁর রাজ্যে অভ্যর্থনা করে আশ্রয় দিয়েছিলেন—কিছু সাহায্যও করেছিলেন। তার পর শাহজাদা খুরম দক্ষিণ দেশের পূর্ব উপকূল ধরে উড়িষ্যা হয়ে বাঙ্গাল হয়ে পালিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত ক্ষমাপ্রার্থনা করে বাদশাহ বাপের পায়ে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। বাদশাহ তাঁকে ক্ষমাও করেছিলেন। পরে শাহজাদা খুরম পিতার মৃত্যুর পর বাদশাহ হয়েছেন। কিন্তু বাদশাহ হয়েও সেদিনের শাহজাদা খুরম কুতুবশাহী সুলতান আবদুল্লার উপকার বিস্মৃত হতে পারেন নি। তাঁর সঙ্গে সন্ধি করেছেন। সে সন্ধি অনেক বেশী মজবুদ। এই সন্ধি না হলে শাহজাদা ঔরংজীব নিজামশাহীর মতই গোলকুণ্ডার কুতুবশাহী সুলতানী খতম করতেন।

গোলকুণ্ডা সারা হিন্দুস্তানের হীরা জওহরতের আকর। এক গোলকুণ্ডার হীরা জওহরতের দামে তামাম দুনিয়া কেনা যায়।

* * *

তিন মাস পর আজ গোলকুণ্ডার এক গুপ্তচর হরকরার কাছে এই খবর পেয়ে শাহজাদা ঔরংজীব চঞ্চল এবং উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। ফকীর সারমাদ আর লোণ্ডা চান্দ?

কিন্তু তাঁর মনে হচ্ছে—না—। এরাই তারা—জওহরতবালা মহম্মদ সৈয়দ আর হিন্দু বানিয়া জাতের লোণ্ডা অভয়চান্দ!

চোখ বুজে ভাবলেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে কপালে চিন্তার সারি সারি রেখা দেখা দিল।

কয়েক মুহূর্ত পর তিনি হরকরাকে জিজ্ঞাসা করলেন—লোকটা বলছ তুমি ফকীর? সওদাগর নয়?

—না আলিজা, সে সওদাগর নয়। একটা ছোট ঝোপড়ির মত মাটি আর পাথরের মোকাম বানিয়ে তার মধ্যে থাকে। ভজন করে। বয়েৎ আওড়ায়। হিন্দু মুসলমান লোকের ভিড় হয়। লোকটির পরনে একটা লংগৌটি ছাড়া কিছু নাই। আর লৌণ্ডার পরনেও তাই। তবে কখনও কখনও ফকীর তাকে সাজায়, বাদশা শাহজাদার মত সাজায়। আবার কখনও লৌণ্ডা কাঁচলি ঘাঘরা পরে গহনা পরে মাথায় ওড়না চড়িয়ে পায়ে ঘুংঘট পরে গানা গাইতে গাইতে নাচে।

—লৌণ্ডার নাম শ্রিফ চান্দ? অভয়চান্দ নয়?

—লোকে তাই বলে জনাবআলি। দুসরা নাম আমি শুনি নি।

—হুঁ।

শাহজাদা ঔরংজীব বললেন—হুঁ। তারপর কয়েকবার পায়চারি করে ভেবে নিয়ে একটা জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়ালেন।

আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন—সুলতান কুতুবশাহের দরবারে লোকটা যায় আসে কিনা বলতে পার?

—না জনাবআলি এ কথা শুনি নি। তবে শুনেছি—

—কি শুনেছ?

—সুলতানের উজীর মীরজুমলা সাহেবের সঙ্গে তাঁর জানপহচান আছে।

—মীরজুমলা আসেন যান?

—না। শুনেছি ফকীর গিয়েছিলেন তাঁর কাছে।

—আর কিছু জান?

—না।

—ফকীর হামেশা যায় ?

—না। প্রথমে ওখানে গিয়ে তিন চার রোজ গিয়েছিলেন। তারপর আর যান না।

—হুঁ। তুমি যাও।

লোকটা চলে যেতেই শাহজাদা হাতে তালি দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে দ্বাররক্ষী সান্ত্রী একজন বাদশাহী সিপাহী এসে সালামত জানিয়ে দাঁড়াল।

—আমার খাস মুন্সীকে পাঠিয়ে দাও।

তিনি ভাবছিলেন একখানা খত্ লিখিয়ে পাঠাবেন গোলকুণ্ডা। "মাননীয় কুতুবসাহী সুলতানের কাছে তামাম হিন্দুস্তানের মহামান্য বাদশাহ শাহানশাহ সাজাহানের সুবাদার শাহজাদা ঔরংজীবের নিবেদন এই যে শহর থাট্টা থেকে একজন জওহরতবালা মহম্মদ সৈয়দ কিছুদিন হল সুলতানের গোলকুণ্ডা রাজ্যে এসেছে। তার সঙ্গে এক হিন্দু লৌণ্ডা আছে—তার নাম অভয়চান্দ। তার খবর সুলতানের উজীর মহম্মদ মীরজুমলা সম্ভবতঃ অবগত আছেন—"।

মনে মনে মুসাবিদায় বাধা পড়ল। আবার দ্বাররক্ষী সিপাহী ভিতরে ঢুকে অভিবাদন করে দাঁড়াল।

শাহজাদা বললেন—কি ?

চিন্তায় বাধা পেয়ে শাহজাদার ললাটে আবার ভ্রূকুটি দেখা দিয়েছে।

সিপাহী বললে—মীর আতাউল্লা খান সাহেব—

—মীর আতাউল্লা ?

মীর আতাউল্লা শাহজাদা ঔরংজীবের সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত কর্মচারী। রাজকর্মে পরামর্শদাতা। বিচক্ষণ লোক।

শাহজাদা একমুহূর্তে চিঠির মুসাবিদাটা মনে মনে ছিঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। বললেন—নিয়ে এসো।

মীর আতাউল্লা যে সংবাদ এনেছে সে-সংবাদের গুরুত্ব সর্বাধিক এবং দাবি সর্বাগ্রগণ্য।

মীর আতাউল্লা ঘরে ঢুকেই অভিবাদন করে প্রসন্ন হেসে বললে—বড় সুসংবাদ এনেছি আলিজা।

—সুসংবাদ!

—হাঁ আলিজা! খান-ই-জমানের হরকরা এসেছে। উদ্‌গীর কেল্লা আউসা কেল্লা ছেড়ে দিয়ে নিজামশাহী সুলতান বলে যে বাচ্চাকে সাহজী ভোঁসলে এতদিন নিজামশাহী ইলাকার মালিক বলে চালাচ্ছিল তাকেও আমাদের হাতে দিতে রাজী হয়েছে। তবে তাকে ছেড়ে দিতে হবে।

—শেভানআল্লা! এ নিশ্চয়ই সুসংবাদ আতাউল্লা খাঁ! কিন্তু—

চুপ করে অপেক্ষা করে রইল আতাউল্লা খাঁ।

ঔরংজীব বললেন—সাহজী ভোঁসেলকে ছেড়ে দেবে কেন?

—না হলে—

—হাঁ হাঁ আতাউল্লা, এদেশের এই কাফেরগুলো পাহাড়ী চুহার মত চালাক। আমি জানি। ছেড়ে দেব বলে তাকে বের হতে দিয়ে ফাঁদ পেতে ধরা যায় না। আতাউল্লা খাঁ, দক্ষিণে এসে অবধি এই সাহজী ভোঁসলের যা নাম শুনেছি, যা কাজে পরিচয় পেয়েছি তাতে ওকে আমার কি মনে হয় জান! লোকটা চুহা নয়—লোকটা সাপ। ওর থেকে ভবিষ্যতে আমাদের বিপদ হবে।

—আলিজার দৃষ্টিতে আলিজা কখনও ভুল দেখেন না। সাহজী অতি চতুর, অতি বদমাশ। কিন্তু আলিজা, চতুর সাহজী এরই মধ্যে বিজাপুর সুলতানের কাছে আশ্রয় চেয়েছে এবং পেয়েছে। বিজাপুর সুলতান খান-ই-জমানকে লিখেছেন—সাহসী ভোঁসলে আমার নোকরী নিয়েছে। নিজামশাহীর সব সংস্রব ও ছেড়ে দিচ্ছে। ওকে আমার দরবারে আসতে দিলে আমি কৃতজ্ঞ হব।

ভাবছিলেন শাহজাদা।

আবার সিপাহী এসে আতাউল্লা সাহেবকে মৃতুস্বরে কি বললে

মীর আতাউল্লা শাহজাদাকে বললে—মুন্সী এসেছে।

জরুরৎ নেই। যেতে বলে দাও

সারমাদ নয় মহম্মদ সৈয়দ নয়। এখন সাহজী ভোঁসলে!

সারমাদ বা মহম্মদ সৈয়দ যাবে কোথায়? তামাম হিন্দুস্তান মুঘল বাদশাহীর ইলাকা। এবং ঔরংজীব আজও তরুণ। এখনও অনেক দিন বাঁচবেন তিনি। হবে। পরে হবে। কিন্তু হবেই একদিন। হতেই হবে।

ঔরংজীব একদিন হিন্দুস্তানের বাদশাহ হবেন। হবেনই তিনি বাদশাহ।

বাদশাহী নয়—নোকরী। খুদাতাল্লার নোকরী।

পয়গম্বর রসুলের গোলামি।

খুদা আল্লা ছাড়া পৃথিবীর স্রষ্টা কেউ নন।

ওই নাম ছাড়া অন্য কোন নাম নেই।

মহম্মদ ছাড়া পয়গম্বর নেই।

ইসলাম ছাড়া ধর্ম নেই। সত্য নেই।

বাদবাকী যা কিছু সব মুছে দেবে ঔরংজীব। সব মুছে দেবে।

মসজেদ ছাড়া উপাসনালয় থাকবে না। ইসলাম ছাড়া ধর্ম থাকবে না।

তারই সঙ্গে দারা সিকো মহম্মদ সৈয়দ আর সারা কাফের জাতকে মুছে দেবে ঔরংজীব। মু—ছে দে—বে।

আতাউল্লা ভীত হয়ে উঠল শাহজাদার মুখ দেখে।

বারো

তরুণ শাহজাদা ঔরংজীবের আকস্মিক এই ভাবান্তরে ভীত হলেন আতাউল্লা খাঁ। কিন্তু কোন প্রশ্ন করতে সাহস করলেন না। আতাউল্লা শাহজাদার প্রিয়পাত্র অন্তরঙ্গ পরামর্শদাতা : তিনি ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে রইলেন। শাহজাদাকে তিনি চেনেন জানেন, খানিকটা বুঝতেও পারেন। কিন্তু এই অতিতরুণ শাহজাদা, যার বয়স মাত্র একুশ পার হয়ে বাইশে পড়তে চলেছে, তাঁর অন্তরতম তলদেশে পৌঁছতে পারেন না। তিনি কেন, কেউই পারে না। কিন্তু প্রবীণ কর্মচারী তিনি, শাহজাদার প্রধান পরামর্শদাতা, সুতরাং ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করবার সাহস তাঁর আছে।

শাহজাদা ঔরংজীব বিচিত্র রহস্যময় মানুষ। আগ্রায় যমুনার তটভূমিতে বালক শাহজাদা একক, লড়াইয়ে মেতে ওঠা সুধাকর হাতীর সামনে দাঁড়িয়ে যে লড়াই করেছেন সে কথা শুনেছেন। তিনি জানেন এই শাহজাদা ধর্মপ্রাণ সুন্নী। নিজের জীবনের চেয়েও ধর্মের অনেক বেশী দাম তাঁর কাছে। সূর্যোদয়ের অনেক আগে উঠে প্রাতঃকৃত্য ও স্নান শেষ করে জপের মালা নিয়ে বসেন। সূর্যোদয় পর্যন্ত তিন হাজার দুশো বার আল্লাহ্‌তয়লার নাম জপ করে তবে ওঠেন। এমন মানুষ তিনি জীবনে দেখেন নি।

শাহজাদার মুখ দেখে কেউ কখনও অনুমানও করতে পারে না যে কি চিন্তা তাঁর মনের মধ্যে আলোড়িত হচ্ছে। অতি ক্রোধেও তাঁর মুখের একটি পেশীর পরিবর্তন হয় না ; ললাটে একটি রেখাও দেখা যায় না। বসে থাকেন আসনে, তাঁর মুখ বুকের উপর ঝুঁকে থাকে ; চোখ হয় অর্ধনিমীলিতের মত ; মনে হয় যেন তন্দ্রামগ্ন কিংবা ধ্যানমগ্ন। কথা শুনেই যান শুনেই যান—কিন্তু হঠাৎ এক সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত ঝাঁকি দিয়ে মাথা তুলে মেরুদণ্ড সোজা করে কথার উত্তর দেন। এবং এমন উত্তর দেন যে, তার উত্তরে আর বক্তার

দ্বিতীয় কথা বলবার অবকাশ থাকে না। সেই শাহজাদা আজ এমন সোজা হয়ে ঝাঁকি দিয়ে ঘাড় সোজা করে তুলে কাকে কি বললেন? ঠোঁট দুটি যেন নড়ল, কিন্তু কোন কথা আতাউল্লা শুনতে পেলেন না, অতি নিকটে থেকেও না। শাহজাদার মুষ্টিবদ্ধ হাত অতি কঠোর ভঙ্গিতে সামনে প্রসারিত হয়ে এদিক থেকে ওদিক এবং ওদিক থেকে এদিক পর্যন্ত ঘুরে এল। কিসের জন্য? ঔরংজীব যখন মনে মনে বলছিলেন—মুছে দেব—কাফেরী বে-ইসলামী মুছে দেব। কাফেরদের ওই মন্দিরগুলো ওই পুতুলগুলো ভেঙেচুরে সমভূমি করে দিয়ে মু—ছে দে—ব। শুধু তাই নয়, ইসলামের নামে যারা বে-ইসলামী করে, ঔরৎ আর সিরাজী নিয়ে সারা দিনরাত মহফিল আর মজলিস করে, গানা আর নাচায় যারা দোজখ তৈয়ার করে তাকেই ভাবে দুনিয়ার বেহেস্ত, তাদের কঠোর সাজা দিয়ে শায়েস্তা করব। তাঁর আপসোস তাঁর জন্মদাতা পিতা—সারা হিন্দুস্তানের যিনি বাদশাহ—সারা হিন্দুস্তানের মুসলমানেরা যাকে বলে 'মেহেদী' তাঁরও এই বয়স পর্যন্ত নাচ গানের আসক্তি গেল না! এই বয়সেও বাঁদীর ঠোঁটের উপর আঁকা তিলকে কালো বুলবুল ভেবে তাকে চুম্বন করে নিজের ঠোঁটে সে দাগ উঠিয়ে নিয়ে মনে মনে 'জাঘ্ অজ্ দহান্ পরীদ' বলে কৌতুকে বিভোর তিনি হন। এবং প্রকাশ্য দরবারে সারা রাজ্যের কবিদের সেই কথাটি বসে গজল বানাতে বলতেও লজ্জা বোধ করেন না। আরে! ঔরৎ তো দুনিয়ায় ভোগের জন্যই তৈরী হয়েছে। কিন্তু তাই বলে দুনিয়া-ভর—দিনরাত, ইসলাম এই ভোগ যথেচ্ছ করতে বলে নি! জরুর! হিন্দুস্তান তোমার, তার দৌলত তোমার, তার সর্বোৎকৃষ্ট ভোগ্য বস্তুতে তোমারই অধিকার, কিন্তু তারও তো একটা কানুন আছে।

হিন্দুস্তানের মালিক—তামাম হিন্দু-মুসলমানের গর্দানের সর্বেসর্বা তিনি; এ কথা তাঁকে বলা যায় না! কিন্তু অবিচার, অধর্ম, অন্যায়, এ মানবে কেন সে-মানুষ, যে ধার্মিক, যে খোদাতয়লার কানুন মানে অক্ষরে অক্ষরে, পয়গম্বর রসুলের হুকুমৎ মানে?

হিন্দুস্তানের বাদশাহ শাহানশাহ, তোমার চোখের সামনে তোমার জ্যেষ্ঠপুত্র ইসলামের কানুনে যাকে লোকে দজ্জাল বলে সেই বাদশাহ জালালউদ্দীন আকবর শাহের অনুকরণ করে নতুন এক ধর্ম বানাতে চাচ্ছে, ইসলামকে বরবাদ করে! তুমি দেখতে পাও না?

হায়! হায়! হায়! একসঙ্গে হিন্দুস্তানের বাদশা আর নয়া ধর্মের পয়গম্বর হবে দারা সিকো! মোহান্ধ বাদশাহ, তুমি দেখতে পাচ্ছ না, খুদার হুকুমতে পয়গম্বর রসুলের নির্দেশে এর সাজা একদিন জরুর নেমে আসবে। আসবে নয়, আসছে। আমি দেখতে পাচ্ছি, আমি পাচ্ছি দেখতে।

হয়তো খোদার এই নোকর, পয়গম্বর রসুলের এই সিপাহী পিয়াদাকেই সে-সাজার ইস্তাহার জারি করতে হবে! হবে তোমাদের উপর।

খোদার নোকর পয়গম্বরের সিপাহী পিয়াদা তা অকম্পিত হাতে জারি করবে। সে মুছে দেবে। বিল—কু—ল সে মুছে দেবে!

আবার একবার হাত আগের মত ঘুরে এল—একবার এদিক থেকে ওদিক আবার ওদিক থেকে এদিক। এবং এবার এসে সে-হাত ঠেকল তাঁর কোমরবন্ধে গোঁজা ছোরাটায়।

ছু'পা পিছিয়ে গেলেন আতাউল্লা খাঁ।

তাঁর পায়ের গোড়ালিতে লাগল একটা বাতিদান। তিনহাত লম্বা সোনার বাতিদানে কাচের ফানুসের মধ্যে মোমবাতি জ্বলছিল ঘরে; অপরাহ্নেই আলো জ্বেলেছে। ঘরটা কিছু অনুজ্জ্বল। একটা ছুটো নয় আটটা বাতিদান ছিল ঘরে। তার মধ্যে ছুটো বাতিদানই জ্বলছিল শাহজাদার মসনদের ছু'পাশে। আতাউল্লা খাঁ কথা বলছিলেন শাহজাদার বাঁ পাশে দাঁড়িয়ে। শাহজাদার হাতখানা কোমরবন্ধে গোঁজা ছোরাতে গিয়ে ঠেকল দেখেই তিনি সভয়ে ছু'পা পিছিয়ে গেলেন। ফলে গোড়ালির ধাক্কায় বাতিদানটা উলটে পড়ে গেল মেঝে জুড়ে বিছানো বহুমূল্য ইরানী গালিচার উপর। ফানুসটা

ভেঙে গেল। এবং বাতিটার শিখা পশমের মত সুন্দর দাহ্যবস্তুর সংস্পর্শ পাবামাত্র লোলুপগ্রাসে তাকে লেহন করতে আরম্ভ করতে উদ্যত হল হিংস্র জানোয়ারের মত।

ঔরংজীব এবার মুহূর্তে সংবিৎ ফিরে পেলেন। আতাউল্লা খাঁ চীৎকার করে উঠলেন—পানি! পানি! জলদি পানি লাও!

তারপরই মনে হল শাহজাদার নিরাপত্তার কথা; তিনি ব্যস্ত ব্যাকুল কণ্ঠে বললেন—আলিজাঁহা!

শাহজাদা বললেন—ভয় পাবেন না আতাউল্লা খাঁ। ও কতটুকু আগুন! জলদি কিছু একটা চাপা দিয়ে পা দিয়ে দাবিয়ে দিন। দাবিয়ে দিন।

পশমপোড়া দুর্গন্ধে তখন ভরে গেছে ঘরটা। দ্বাররক্ষীরা ছুটে এসেছে তখন। শাহজাদা তাদের বললেন—গালিচাকে উলটে দিয়ে পা দিয়ে দাবিয়ে দাও। তারপর পানি ঢাল। আর আসরবরদারকে বলে দাও সমস্ত গালিচাটা বদলে দিতে। আগরবাত্তি জ্বেলে দিতে বল। না হলে বদ্‌বয় যাবে না।

তারপর সেই ভাবলেশহীন মুখে আতাউল্লা খাঁকে বললেন—আসুন খাঁসাহেব, বাইরে আসুন। আগুনের সঙ্গে লড়াই খুব বড় কথা নয়। কিন্তু বদ্‌বয় সহ্য করা যায় না। কি বলছিলেন আপনি? সাহজী বিজাপুর চলে গেছে—চাকরিও সে পেয়ে গেছে সেখানে?

—হাঁ জনাবআলি। সাহজী ভোঁসলে বড়া ভারী চালাক, পাহাড়িয়া চুহার (ইন্দুরের) মত। দাঁতে ভারী ধার। খাঁচা পেতেও ধরা যায় না। খাঁচার শিক কাটতে বড় মজবুদ। জাঁতে পড়েও পড়ে না; জাঁতে পড়তে পড়তে কুদি মেরে পালায়। খান-ই-জমানকে নিশান পাঠালে কিল্লার ভিতর থেকে যে, সে নিজামশাহী বাচ্চা সুলতানকে পাঠিয়ে দিচ্ছে। কুড়িটা কেল্লার দখলও ছেড়ে দিচ্ছে—কিন্তু তাকে তার ফৌজ নিয়ে বেরিয়ে যেতে দিতে হবে। খান-ই-জমান বন্দোবস্ত করেছিলেন সদর দরওয়াজা দিয়ে সকলকে বের হতে

হবে, এবং বাচ্চা সুলতানের তাঞ্জাম আর নোকরেরা প্রথমে বের হবে। তাঁর সম্মানে তোপ পড়বে। তাঞ্জাম এসে খান-ই-জমানের তাঁবুতে ঢুকলে পর শাহজী তাঁর ফৌজ নিয়ে বেরিয়ে যেতে পারেন। এই ইন্তেজাম করে খান-ই-জমান চারিদিকের ফৌজ কমিয়ে সামনা বরাব্বর জমায়েত করে রেখেছিলেন; সাহজী বের হবার মুখেই সুলতানের সম্মানের তোপ পড়লেই আক্রমণ করবেন। কিন্তু—

থেমে গেলেন আতাউল্লা খাঁ।

শাহজাদা তাঁকে নিয়ে বারান্দা অতিক্রম করে ছাদের সিঁড়ি ধরলেন—ছাদে যাবেন। এখনও দিনের আলো রয়েছে। পশ্চিম আকাশ উজ্জ্বল। শাহজাদা তাঁর দিকে না তাকিয়েই বললেন—খান-ই-জমান শের; শেরের সঙ্গে লড়াইয়ে তিনি মজবুদ! তার কায়দা তাঁর জানা আছে, কিন্তু ইঁদুরের সঙ্গে লড়াইয়ের কায়দা তাঁর জানা নেই। শের আক্রমণ করলে সামনে বেরিয়ে আসে কিন্তু ইন্দুরের গর্তের মুখ একটা নয়, বড় মুখটা আগলালে সে পিছন দিকের ছোট মুখ দিয়ে বেরিয়ে পালায়। সাহজী সে তার স্বভাব মত সামনের দিকে না এসে পিছনের দরওয়াজা ভেঙে পালিয়েছে! এই তো!

—আলিজার থেকে বুদ্ধিমান এ গোলাম আর জীবনে কাউকে দেখে নি! ঠিক তাই, জনাবআলি! তবে আর এক কায়দা সে করেছিল। সারিবন্দী বয়েল গাড়ির উপর বস্তাবন্দী মাল চাপিয়ে সামনের দিকে সাজিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিল যাতে খান-ই-জমান প্রতারিত হয়েছেন!

—হাঁ। খান-ই-জমান ভেবেছিলেন মাল যখন আসছে তখন পিছে পিছে মালিকও জরুর আসছে। কিন্তু সে তখন পিছনের দরওয়াজা খুলে পাহাড়ের পথে বেরিয়ে গেছে। সাহজী চতুর—সে জানে মালের থেকে জানের দাম বেশী। যাক্ মাল তো পেয়েছেন।

চুপ করে রইলেন আতাউল্লা খাঁ।

উত্তর না পেয়ে শাহজাদা একটা সিঁড়িতে মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়ালেন। সেই ভাবলেশহীন মুখেই বললেন—কি? বিলকুল বস্তা বস্তা মাটি আর পাথর?

—হাঁ আলিজা। স্রেফ মাটি আর পাথর।

এরপর শাহজাদা আর কথা বললেন না, ছাদের উপর এসে দাঁড়ালেন। কিছুক্ষণ পর দক্ষিণ-পশ্চিমে বিজাপুরের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন—এদিকে বিজাপুর আর এই দক্ষিণ-পূর্বে গোলকুণ্ডা। এর পর যা তা সামান্য। অতি সামান্য—নয় কি আতাউল্লা? এদিকে আরবের দরিয়া ওদিকে কালাপানি।

—হাঁ আলিজা।

—এর সঙ্গে সঙ্গেই গোলকুণ্ডা জয় করা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত সহজ হত। কিন্তু শাহানশাহ ভুল করলেন। সন্ধি করে বসলেন।

আতাউল্লা খাঁ বললেন—কুতুবশাহী সুলতান তাঁকে তাঁর দুঃসময়ে অনেক খাতির আর অনেক সাহায্য করেছিল আলিজা। তাই এ সন্ধির জন্য বাদশাহের সুনামে এ মুলুক ভরে গেছে।

—হাঁ। সুনাম সুযশ এসব বড়ই লোভনীয় বস্তু খানসাহেব; সিরাজী আর খুবসুরত ঔরতের সঙ্গে ফরক নেই। বরং বেশী লোভনীয়। লোকে সাধু সাজে, জটা রাখে, ভিখ মেঙে খায় ওই সাধু নামের সুযশের জন্যে। লোকের প্রণামের জন্যে।

চুপ করে রইলেন আতাউল্লা। এর জবাব কি দিতে হবে বুঝতে পারলেন না।

শাহজাদা বললেন—সব থেকে বড় হল ধর্ম খানসাহেব। খুদার হুকুমৎ—দারু সিরাজী মুসলমানের পক্ষে পাপ। জেনানা তুমি কুরানের নিয়মমত রাখতে পার। কিন্তু তার বেশী নয়। কিন্তু বাদশাহী হারেমে পরসতার মহলের রেওয়াজ হয়েছে। বাঁদী অগুন্তি। এই কাফির রাজারা পাঁচ সাত শও সাদী করে। এর মাফ নেই। বাদশাহী হল খুদার নোকরী। যশ এখানে ঠিক তাই আতাউল্লা খাঁ।

বেশী সুযশ,—হিন্দু মুসলমান বিলকুল লোক যে রাজার সুযশ গায় সে রাজা জানবেন জরুর খুদার হুকুমৎ অমান্য করে। আশ্চর্য হচ্ছেন কথা শুনে? কিন্তু ভেবে দেখুন আতাউল্লা খাঁ। দুনিয়ায় একশোর মধ্যে একজনের চেয়েও কম লোক সৎ ধার্মিক। নিরেনব্বুই জন ভণ্ড, চোর, লম্পট, মাতাল, মিথ্যাবাদী—নয় কি? বলুন?

—হাঁ আলিজা, একথা নিশ্চিত সত্য।

—নিমকহালালের চেয়ে নিমকহারাম বেশী—এও সত্য?

—বেশক জনাবআলি!

ঔরংজীবের মুখে এতক্ষণে একটি ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটে উঠল। বললেন—তাহলে বলুন তো খানসাহেব, বেশ বিবেচনা করে বলুন এই সব অসৎ অধার্মিক লম্পট বদমাশ দজ্জাল লোকদের মনোরঞ্জন করে যে রাজা কি বাদশা তাদের কাছে হরবক্ত শুধু প্রশংসাই পায় সে বাদশা যশকে মানে? না ধর্মকে মানে? বলুন তো তারা লোককে মানে? না খুদাকে মানে? বলুন—জবাব দিন!

আতাউল্লাকে বলতে হল—আলিজা যা বলেছেন তা দিনের আলোর মত সত্য। কিন্তু তাঁর ভয় হল শাহজাদা কি শাহানশাহ বাদশাহ সাজাহান সম্পর্কে—! বাকীটা ভাবতেও তিনি পারলেন না।

শাহজাদার মুখখানি বুকের উপর অভ্যাসমত ঝুঁকে পড়েছিল। অর্ধনিমীলিত চোখে তিনি বললেন—গোলকুণ্ডার কুতুবশাহী সুলতান আমার কাছে কাফির। সব মুসলমান—আমি বলছি যারা খাঁটি মুসলমান তাদের কাছে সে কাফির। সুফীদের প্রশ্রয় দিয়ে দিয়ে সে গোটা গোলকুণ্ডার মধ্যে যত ভণ্ড ফকীর দরবেশ আর সুফী আমীরদের ওমরাহী নিয়ে ভাবে, খুদার উপরে খুদগারী করে সে। এ গোনাহের অংশ হিন্দুস্তানের বাদশাকে স্পর্শ করবে না। জানেন কোথাও যার আশ্রয় হয় না তেমন ভণ্ড এসেও এখানে আশ্রয় পায়। সৈদ মহম্মদ বলে এক ভণ্ডের খোঁজ করতে পাঠিয়েছিলাম আমি, জানেন আপনি?

—না আলিজা। সে কে?

—সে এক—। হঠাৎ থেমে গিয়ে এক লহমায় সোজা খাড়া হলেন ঔরংজীব। তারপর একটু দীর্ঘ উত্তপ্ত নিশ্বাস ফেলে মুখ নামালেন, ধীরে ধীরে সৈয়দ মহম্মদের বিবরণ বললেন এবং বলতে বলতে আবার হঠাৎ ঝাঁকি দিয়ে ঘাড় সোজা করে বললেন—সে বলে আমি জানি না খুদা কে। অভয়চান্দের মধ্যেই দেখতে পাই আমি খুদাকে।

স্তব্ধ হয়ে গেলেন, কিছুক্ষণ পর বললেন—আমার দৃঢ় বিশ্বাস সারমাদ ফকীর আর চান্দ নামে লৌণ্ডা এরা আর কেউ নয়—এরাই সেই সৈদ মহম্মদ আর বানিয়া লৌণ্ডা অভয়চান্দ!

আতাউল্লা বললেন—শাহজাদা হুকুম করলে এখনি জবরদস্ত লোক পাঠিয়ে তাদের খতম করতে পারি। বলেন তো দুজনের শির আনতে পারি!

শাহজাদা চুপ করে রইলেন। কোন উত্তর দিলেন না।

আতাউল্লা বললেন—এক হুকুমৎ জারি করে নিশান পাঠাতে পারি সুলতান আবদুল কুতুবশাহের কাছে। অথবা সুলতানের দরবারে ওকীলকে আমরা লিখতে পারি—সুলতানকে শাহজাদার অভিপ্রায় জানাবার জন্য বলতে পারি।

শাহজাদা ঔরংজীব চলবার সময় প্রায় হাত দুখানা পিছনের দিকে নিয়ে মুঠো বেঁধে নিয়ে পা ফেলতেন। তিনি সবল সুদক্ষ দুঃসাহসী নির্ভীক যোদ্ধা—রীতিমত ব্যায়াম এবং যুদ্ধচর্চা রাখেন—সে যেন তাঁর অতি সযত্নে গোপনে করে রাখা রূপ। চলবার সময় দু হাত পিছনে মুঠো বেঁধে একটু সামনে ঝুঁকে চলেন। বসে থাকেন যখন তখনও তাই। অথবা তাঁর পায়ের চেয়ে মস্তিষ্ক অনেক আগে এগিয়ে থাকে। মনের চিন্তার সঙ্গে পা চলতে পারে না।

আলসে থেকে সরে এসে কয়েক কদম হেঁটে চললেন শাহজাদা, এটা তাঁর ক্ষোভ বা চিন্তার উগ্রতাকে সংহত করবার একটা ঢঙ।

আতাউল্লা খাঁ তাঁর পিছনে পিছনে চললেন। পাক দুই ঘুরে হঠাৎ আতাউল্লা খানের সঙ্গে সামনাসামনি দাঁড়িয়ে তিনি বললেন— খানসাহেব কি ভুলে গেছেন যে, বিজাপুর গোলকুণ্ডার দরবারে যে বাদশাহী ওকীল আছে তারা খুদ বাদশাহী দপ্তরের লোক? তাদের বিলকুল খবর দেওয়া নেওয়া চলে বাদশাহী খাস দপ্তরের সঙ্গে। ইস্তাহার হুকুমনামার কিছু কিছু নকল মেহেরবানি করে দক্ষিণের শাহজাদা সুবাদারের কাছে আসে. কিন্তু যা গোপন খবর তা একদম সরাসরি আগ্রায় যায়। দরকার হলে ওকীলের দপ্তর সুবাদারী দপ্তরকে জানাতে পারে যে—

একটু থেমে হেসে মোলায়েম করে বললেন—শাহজাদা সুবাদারের গোলাম আমি—তবুও শাহী দপ্তরের হুকুমৎ এই যে বাদশাহী হুকুমনামা সঙ্গে না থাকলে এ দপ্তরের খবর কাউকে জানাবার একতিয়ার এ গোলামের নেই! এ কানুন কি ভুলে গেলেন আপনি?

মীর আতাউল্লা খাঁ বয়সে প্রবীণ, এ খবর তাঁর না-জানা নয়। এও তিনি জানেন যে দক্ষিণে স্বয়ং বাদশাহ এসে যে যুদ্ধ করে গেছেন এবং সন্ধি করে গেছেন তারপর যে রাজ্যবিস্তার তিনি চান না তা নয়, রাজ্যবিস্তার তিনি চান। কিন্তু এই সব সুবাদার এমন কি শাহজাদা সুবাদারদের শক্তি যাতে বৃদ্ধি না পায় তার জন্যই এ ব্যবস্থা করেছেন। যাতে তারা ছুতোনাতায় ছোট ছোট রাজা জমিদারের এলাকাগুলো রাজ্যবিস্তারের নামে জয় করে লুঠ করা সোনা রূপা হীরা জহরত সঞ্চয় করে এমন শক্তিমান হয়ে না ওঠে যে কোনদিন বিদ্রোহ করে বসে।

বিশেষ করে এই তৃতীয় পুত্র শাহজাদা মহীউদ্দীন মহম্মদ ঔরংজীবের উপর তাঁর তীক্ষ্ণতম দৃষ্টি রেখেছেন তিনি।

গোলকুণ্ডায় হীরার খনি আছে। সোনার খনিও আছে দক্ষিণে। তা থেকে তিনি মধ্যে মধ্যে খাস দরবার থেকে প্রয়োজনমত আদায়

করে নেন। কিছু কিছু শাহজাদা সুবাদারও পান কিন্তু লুণ্ঠতরাজ কি তার মালিক হবার কোন সুযোগ তিনি দেন নি। শাহজাদা ঔরংজীব এর জন্য ক্ষোভ আগ্নেয়গিরির মত বুকে চেপে রাখেন। অন্য শাহজাদারা সুজা মুরাদ বিলাসব্যসনে প্রমত্ত। সেখানে তাঁদের খরচের উপর কোন লাগাম নেই। কিন্তু শাহজাদা ঔরংজীব দক্ষিণের সুবাদারী নিয়ে এসে অবধি একদিকে রাজ্য গড়ে তুলছেন অন্যদিকে তিল তিল করে সঞ্চয় করছেন। বিলাসিতার ধার ধারেন না তিনি।

শাহানশাহ সাজাহানের শ্রেষ্ঠ স্নেহ বড় ছেলে আর বড় মেয়ের উপর। শাহ-ই-আলিজা মহম্মদ দারা সিকোর উপর। জন্মক্ষণ থেকেই তিনি সৌভাগ্যবান। শাহানশাহ জাহাঙ্গীর তখন বাদশাহ। বাদশাহ সাজাহান তখন শাহজাদা খুরম। শাহজাদা খুরম সুদীর্ঘ-কালের অপরাজেয় মেবার যুদ্ধে জয়ী হয়ে ফিরেছেন—সঙ্গে নিয়ে এসেছেন রানা প্রতাপের পৌত্রকে জামিনস্বরূপ—পথে আজমীঢ়ে জন্মালেন শাহজাদা খুরমের প্রথম পুত্র; বাদশাহ জাহাঙ্গীর জন্মক্ষণেই তাকে নাম দিয়েই ক্ষান্ত হন নি তাকে খেতাবও দিয়েছিলেন। মহম্মদ দ্বারা সিকো নামের সঙ্গে যোগ করে দিয়েছিলেন—হিন্দুস্তান বাদশাহীর গুলাব।

শাহজাদা খুরম যেদিন বাদশাহ সাজাহান হয়ে হিন্দুস্তানের মসনদে বসলেন সেদিন থেকেই তাঁর দৈনিক হাতখরচের বরাদ্দ হাজার তঙ্কা। এখন থেকে প্রায় দশ বছর আগে ১০৪৩ হিজরীতে বাদশাহের জন্মদিনে উনিশ বছর বয়সে তাঁকে বারো হাজার জাঠ আর ছ হাজার সওয়ারের মনসব দিয়ে মনসবদার করেছেন। শুধু তাই নয়, তাঁকেই প্রকারান্তরে তাঁর উত্তরাধিকারী, হিন্দুস্তানের ভাবী বাদশাহ বলেও ঘোষণা করেছেন। পঞ্জাবের সরকার 'হিসার' জায়গীর দিয়েছেন। বাদশাহ বাবরের কাল থেকে এই সরকার 'হিসার' জায়গীর ভোগ যাঁরা করে এসেছেন তাঁরাই হিন্দুস্তানের বাদশাহ হয়েছেন।

বাদশাহী খাস দপ্তরে এই শাহ-ই-আলিজা সর্বেসর্বা। সবই একরকম তাঁর হাতে। আতাউল্লা খাঁ শুনেছেন, জানেন, শাহজাদা ঔরংজীবের প্রতি এই কড়া নজর এবং বিজাপুর গোলকুণ্ডার সঙ্গে হিন্দুস্তানের বাদশাহী সম্পর্ক সম্পর্কে এই বিশেষ ব্যবস্থা অর্থাৎ দক্ষিণের শাহজাদা সুবাদারের কোন অধিকার না রাখার ব্যবস্থা হয়েছে তাঁরই প্রভাবে। একে শাহানশাহ তাঁকে প্রাণের তুল্য ভালবাসেন তার উপর বাদশাহের পরিবারের সর্বময়ী কর্ত্রী বাদশাহের প্রিয়তমা কন্যা হজরত জাহানআরা বেগম সাহেবা এই শাহ-ই-আলিজা দারা সিকোর পৃষ্ঠপোষক।

এটা শাহজাদা ঔরংজীবের অত্যন্ত ক্ষোভের কারণ। তার উপর মহম্মদ দারা সিকো চরিত্রে ঠিক শাহজাদা ঔরংজীবের বিপরীত।

ঔরংজীব বড় ভাইকে বলেন কাফের। মুসলমান সমাজে দজ্জাল বলে পরিচিত জালালউদ্দীন আকবর শাহের অনুগামী তিনি। সারাক্ষণ যত বিচিত্রচরিত্র ফকীর সাধু সন্ন্যাসী এই নিয়ে মেতে আছেন। তিনি হিন্দুস্তানের বাদশা হবেন, হিন্দু মুসলমানের ধর্মের বিরোধ মিটিয়ে এক করবেন হিন্দুস্তানের মানুষকে।

ইসলামধর্মপ্রাণ কঠোর সুন্নী ঔরংজীব তা সহ্য করতে পারেন না।

না পারারই কথা। মীর আতাউল্লা খাঁ ঔরংজীবের কর্মচারী—তাঁর থেকে বয়সে অনেক বড়, তবু তিনি তাঁর ভক্ত।

শাহজাদার কথার উত্তর দিতে গিয়ে সমস্ত কথাগুলি মনে পড়ে গেল তাঁর।

তাঁর উত্তরের প্রতীক্ষা না করেই শাহজাদা বললেন—এসবে প্রয়োজন নেই এখন খানসাহেব। ঠিক এই ভাবে একটা লোকের আর একটা বাচ্চার মাথা নেওয়া কঠিন কাজ নয়। অত্যন্ত সহজ। এবং—। এবং এভাবে দুটো মাথা নিয়ে এই সব অধার্মিক ভণ্ড যারা মেকী বুজরুকি করে, সাধারণ মানুষের মগজ বেগড়ায় তাদের শেষ করা যাবে না। দুটো মাথা গুপ্তঘাতকে নিয়ে আসবে, সঙ্গে সঙ্গে

দেখবেন দুটোর জায়গায় চার আট দশ মাথা উঠেছে। ঠিক এই বুজরুকি ভণ্ডামি করছে। অপেক্ষা করতে হবে খানসাহেব। খুদার দরবারে যেদিন সময় হবে—পয়গম্বর রসুলের ফরমান ইস্তাহার জারি হবে সেদিন দেখবেন। দেখবেন হাজারো হাজারো আদমীর সামনে সেই ইস্তাহারের হুকুমতে তাদের মাথা কাটা যাবে। যখন যাবে তখন যে সব মাথা উঠে আছে বা উঠতে চাচ্ছে তারা মাথা নামিয়েছে মুখ লুকিয়েছে। এমন করে গুপ্তঘাতক দিয়ে শির নিয়ে কোন ফায়দা নেই। তার উপর এই খবর যদি কোন রকমে আগ্রায় বা লাহোরে গিয়ে হিন্দুস্তানের বাদশাহীর গুলাব মহম্মদ দারা সিকোর কানে পৌঁছয় তা হলে হজরত জাহানআরা বেগমকে দিয়ে বাদশাহের কান ভারী করে কৈফিয়ত তলব হবে আমার উপর।

আতাউল্লা খান বার বার ঘাড় নেড়ে বললেন—আলিজা ঠিক বলেছেন। হাঁ, এ কথা অতি সত্য।

—তবু আপনাকে বলব এই খবরটা নিতে। এই সারমাদ কে? আর এই চান্দই বা কে? সৈদ মহম্মদ আর বানিয়া লৌণ্ডা অভয়চান্দ কিনা।

অভিবাদন করে আতাউল্লা বললেন—অবিলম্বে ব্যবস্থা করছি আমি। অত্যন্ত সুদক্ষ লোক পাঠাব আমি। বলছেন—লোকটা ছিল জহরতের সওদাগর। ভাল জহরত দিয়ে তাকে পাঠাব আমি। সে সেই জহরত দিয়ে এই সারমাদকে প্রণাম করবে। যে জহরত চেনে ভাল জহরত দেখলে জরুর সে তারিফ করবে। খুশী হবে। তখন পরিচয় পাওয়া খুব সহজ হয়ে যাবে।

ঔরংজীব খুশী হয়ে উঠলেন, বললেন—খানসাহেব, এই তীক্ষ্ণ-বুদ্ধির জন্যেই আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি।

—না আলিজা। আমি আপনার নোকর।

—না না না। মহম্মদ ঔরংজীব শ্রদ্ধার পাত্রকে শ্রদ্ধা করতে কখনও ভোলে না। আপনি জানেন, আমি সমস্ত বাদশাহী আমীর

এবং উজীর থেকে ছোট কর্মচারী পর্যন্ত যার মধ্যেই মুসলমানকে দেখেছি তাকে শ্রদ্ধা করেছি। কাফির রাজা যারা তাদের আমি শ্রদ্ধা করতেই পারি না মুসলমান হয়ে; কিন্তু ভদ্রতা দেখাতে সম্মান দেখাতে কখনও কসুর করি নে। সেটাও উদ্ধত দারা সিকোর মনে সন্দেহের উদ্রেক করেছে। হায় নয়া ধর্মের পয়গম্বর! তুমি কথায় কথায় হিন্দুস্তানের উজীর থেকে শুরু করে প্রত্যেকের সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার কর ঝগড়া কর; তুমি এর উলটো মানে করে বাদশাহের কান ভারী করলে কি, এ মহম্মদ ঔরংজীবের মতলববাজি। এই সব গোলামদের সে নিজের দলে টানবার চেষ্টা করছে, কিন্তু তাতে তৈমুরশাহী বংশের শ্রেষ্ঠ বংশধর শাহানশাহ বাদশাহ সাজাহানের ইজ্জত খাটো হচ্ছে, ধুলোয় লুটুচ্ছে। বাদশাহ এ নিয়েও আমাকে অনেক উপদেশ দিয়েছেন। আমি জবাব দিয়েছি—আমি সামান্য মানুষ—শাহজাদা হলেও খুদার কাছে সকলের সঙ্গেই সমান। তাই বেখাতির কারুর করি নে আমি, উজীর মনসবদারদের কথায় কথায় অপমান করি নে। তবে বাদশাহী বংশের ইজ্জতে ধুলো আমি লাগতে দিই নে—দেব না। তবুও আলাহজরত হিন্দুস্তানের বাদশার যখন এমন হুকুম তখন আরও সাবধান হব আমি।

হঠাৎ থেমে গেলেন শাহজাদা।

দূরে একটা ধুলোর পুঞ্জের দিকে দৃষ্টি পড়ল তাঁর। দূরে গোদাবরীর তটপ্রান্তের যে বনরেখা সেখান থেকে উড়ছে ধুলো। আঙুল দেখিয়ে বললেন—খান-ই-জমান কি আজ পৌঁছবেন লিখেছেন?

—হাঁ আলিজা, আজ রাত পহর ভর পর্যন্ত পৌঁছবার কথা।

—ও বোধ হয় তারই ধুলো? না?

—হাঁ। তাই হবে।

—শহরে কি আজ ঢুকবেন তিনি?

—না আলিজা, গোদাবরীর ওপারেই তাঁবু গেড়ে থাকতে বলেছি আমি। কাল শহরে ঢুকবেন। তার জন্যে ইন্তেজাম করছি আমি।

সারা ঔরংগাবাদ সাজানো হবে। সকাল থেকে তোপ পড়বে। নিজামশাহী ইলাকা বাদশাহী ইলাকা ভুক্তান হল—ওই বাচ্চা নিজামশাহী সুলতানকে সোনার শিকলে বেঁধে হাতীতে চড়িয়ে শহর ঘুরিয়ে আলিজার দরবারে হাজির করা হবে। আমাদের কিল্লার ইলাকায় দরবারী তাম্বু কানাত আজই রাতে বানানো হবে।

—ঠিক করেছেন। খান-ই-জমানকে খিলাত দিতে হবে। আরও কাজ আছে, আরও কথা আছে আমার আপনার সঙ্গে। বলব আমি আপনাকে এবং আরও একটা শক্ত কাজের ভার দেব।

—বাচ্চা সুলতানকে নিয়ে কি করবেন?

—প্রকাশ্যে হত্যা করা ঠিক হবে না। মুঘলের ইজ্জতে ধুলো লাগবে—রক্তের ছিটে লাগবে। মানুষেরা দুঃখ পাবে। জোয়ান হলে এটা হত না। সসম্মানে রাখা হবে। তারপর পুস্তদানার শরবত খেয়ে সুলতান একদিন বন্দীদশা থেকে মুক্তি পাবেন। বাচ্চা সুলতানের জন্যে পোশাক আর একটা আরবী ঘোড়া বেছে রাখবেন।

—এ তো কোন শক্ত কাজ নয় আলিজা। কি শক্ত কাজের হুকুম দেবেন বলছিলেন?

—ও হাঁ। হাঁ। বলছি। তার আগের কথা বলে নি। খান-ই-জমান যে দৌলত আনছেন এই দৌলত থেকে বাছাই করে বহুৎ জলুসদার একটা ভেট পাঠাতে হবে আগ্রায়। বাদশাহ শুনছি কাশ্মীর থেকে শিগ্‌গির ফিরবেন। আমি নিজেও যাব।

—প্রয়োজন হলে কিছু জহরত কিনব?

—তা কিনতে পারেন। সোনা মোহর আশরফি হাতী ঘোড়া যা পেয়েছেন খান-ই-জমান তার হিসাব যেন কোনক্রমে কেউ জানতে না পারে! আর—

আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন—নামাজের সময় হল আতাউল্লা খাঁ—নামাজ পড়তে হবে।

বলে নামতে লাগলেন সিঁড়ি ধরে। আতাউল্লা খাঁ তাঁকে অনুসরণ

করলেন। শাহজাদা যে ঘরে নামাজ পড়েন সে ঘর অতি পরিচ্ছন্ন আভরণ আসবাবহীন। শুধু মেঝেটা ধবধবে সাদা মার্বেলে মোড়া—ঘরের মাছখানে ইরান থেকে আনানো একটি ভেড়ার চামড়া মাত্র বিছানো থাকে। শাহজাদা ঔরংজীব তার উপরে নামাজ পড়েন। পশ্চিম দিকে খোলা সুবৃহৎ দরজা। এ ঘরে কারুর প্রবেশাধিকার নেই।

সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে বললেন—আর একজন খুব সুদক্ষ লোক চাই আমার। সে কবি শায়র হওয়া চাই।

—কবি? শায়র?

—হাঁ, গুপ্তচর হয়ে তাকে যেতে হবে কাশ্মীরের দিকে। ঢুঁড়তে হবে দিল্লীর পুব দিক থেকে বরাবর কাশী পর্যন্ত। সে উর্দু তো জানবেই, সংস্কৃত জানলে আরও ভাল হয়। কাশ্মীরী দেশোয়ালী বুলিও জানতে হবে। এক কাফির কবি—কবি হিসেবে নাম তার 'সুভগ', তাকে ঢুঁড়ে বের করতে হবে। করতেই হবে।

তাঁরা এসে পড়েছিলেন নামাজের ঘরের দরজায়; ঔরংজীব তৎক্ষণাৎ কথা বন্ধ করে ঘরে ঢুকলেন—ওজু করে নামাজ পড়বেন। খোলা দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছে পশ্চিম আকাশ লাল হয়ে উঠেছে।

—লা এলাহী ইল্লাল্লা—।

তেরো

কুতুবশাহী সুলতানের প্রাচীন বাসস্থান এবং রাজধানী গোলকুণ্ডা। গোলকুণ্ডা দুর্গ পাহাড়ের উপর; কিন্তু যে সময়ের ঘটনা সে সময়ের প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে সুলতান ইব্রাহিম কুতুবশাহ নতুন হায়দ্রাবাদ শহরের পত্তন করেছেন গোলকুণ্ডা থেকে ক্রোশ তিন চার দূরে। নতুন শহরের জলজলা এবং জমজমা স্বাভাবিকভাবেই পুরানো শহর ও কিল্লা থেকে অনেক বেশী।

প্রকাণ্ড একটা হ্রদের পাড়ের উপর নতুন শহর গড়ে উঠেছে। সুলতান অধিকাংশ সময় নতুন শহরে বাস করলেও তাঁর আসল আস্তানা হল গোলকুণ্ডার পুরানো কিলা। এই কিলার গড়ন এমনই বিচিত্র যে কিলার নীচের ফটক থেকে যে শব্দই হোক তা উপর থেকে ঠিক শুনতে পাওয়া যাবে। একটি ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ প্রাসাদ-শিখরের প্রহরী শুনতে পেয়ে সারা কিলাকে জাগিয়ে তুলবে এমনই ব্যবস্থা।

মুঘল বাদশাহীর গ্রাস থেকে বাঁচতে হলে যে প্রবল এবং প্রচণ্ড শক্তির প্রয়োজন তা এই জীর্ণ সুলতানশাহীর নেই। আগের আমলের বাহমনী সুলতানশাহী ভেঙে পাঁচ সুলতানশাহী—তার মধ্যে বেরার আর বিদর ইতিমধ্যেই মুঘলের পেটের মধ্যে চলে গেছে, বাকী ছিল তিন সুলতানশাহী—আমেদনগরে নিজামশাহী, বিজাপুরে আদিলশাহী গোলকুণ্ডায় কুতুবশাহী। পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের আত্মীয়তা কুটুম্বিতা, এক রক্ত; তবু দুশমনির অন্ত নেই। সেই দুশমনির ঝগড়ায় পড়ে গৃহযুদ্ধে দুর্বল হয়ে সব থেকে উত্তরের ইলাকার সুলতানশাহী নিজাম রাজ্য আমেদনগর শেষ হয়েছে কিছুদিন আগে। সুতরাং নূতনের মোহে পুরানো নিরাপদ সুরক্ষিত আশ্রয়কে বিস্মৃত হতে পারেন নি মহম্মদ কুতুবশাহ।

মহম্মদ কুতুবশাহ গোলকুণ্ডার পুরানো কিলার মধ্যে বসে দক্ষিণ

দিকের দুর্ভেদ্য বন ও জঙ্গলে ভরা পার্বত্য অঞ্চলের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। ভাবছিলেন।

সুলতানের পাশে দাঁড়িয়ে আছে দুজন বাঁদী। মহম্মদ কুতুবশাহ নিজেও বটেন এবং তাঁর সিংহাসনে বসবার আগে থেকেও বটে এখানে এক বিচিত্র মনোভাব গড়ে উঠেছে। তাকে কেউ ব্যাখ্যা করে বিকৃত ভোগ ও লালসাবাদ বলে, কেউ ব্যাখ্যা করে ধর্মের উদারতা বলে, কেউ বলে নিতান্ত নিষ্ক্রিয়তা বা শক্তিহীনতা। কোন রকমে বেঁচে আছেন—ধর্ম, চরিত্র এসব নিয়ে মাথা ঘামাবার অবসরও নেই, সাহসও নেই। সুতরাং প্রজারা যে যা করছে করুক, ওমরাহীর আমীররা যা করছে করুক, তাঁর সুলতানী থাকলেই হল।

ইরান অঞ্চল থেকে এসেছিল এক ইরানী মুসলমান—নাম মীরজুমলা; সে এসে আশ্রয়প্রার্থী হয়েছিল কুতুবশাহের; কুতুবশাহ তাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। সে ছিল জহরতের ব্যবসায়ী। জহরত সে খুব ভাল চেনে। কিন্তু ব্যবসা করবার মত মূলধন তার ছিল না; স্বদেশ থেকে ভাগ্যতাড়িত হয়ে কোনক্রমে স্ত্রী পুত্র নিয়ে গোলকুণ্ডায় এসে কাজ আরম্ভ করেছিল।

কুতুবশাহী গোলকুণ্ডা ইলাকা রত্নপ্রসূ ইলাকা। এখানে হীরা জহরতের খনি আছে। পায়ের তলায় গড়াগড়ি যায় দুর্লভ মণি রত্ন। রাজভাণ্ডারে রাশিরাশি জহরত জমা হয়ে রয়েছে। সারা দুনিয়ার বানিয়ারা ব্যবসায়ীরা, যারা হীরা জহরতের ব্যবসায় করে তারা গোলকুণ্ডায় আসবেই। মীরজুমলাও প্রথম এখানে এসে সামান্য কর্ম নিয়ে জীবন শুরু করেছিল। তারপর কর্ম ছেড়ে শুরু করেছিল ব্যবসায়। ব্যবসায়ে চতুর এবং কর্মক্ষম এই লোকটি অসাধারণ সাফল্য লাভ করে কুতুবশাহকে পারস্যের দুর্লভ মুক্তা এবং এই গোলকুণ্ডারই অতি উৎকৃষ্ট জহরত উপঢৌকন দিয়ে তাঁর দরবারে মনসবদারের কাজ নিয়েছিল। সামান্য তিনহাজারী মনসব।

আজ সেই মীরজুমলা তার নসীবের জোরে এবং তার সঙ্গে

শৌর্যবীর্য ও সাহসের জোরেও বটে ধীরে ধীরে মনসবের পর মনসব অতিক্রম করে একাধারে সারা গোলকুণ্ডার সব থেকে বড় মনসবদার এবং রাজ্যের সিপাহসালার ; এবং এ সুলতানশাহীর উজীরীই দখল করে বসেছে। পিঙ্গলচক্ষু দীর্ঘকায় মীরজুমলাকে দেখে সুলতান মহম্মদ কুতুবশাহ একটা অস্বস্তি বোধ করেন। তিনি দেখতে পাচ্ছেন একটা অজগর যেমন একটা হরিণকে পিছনে কামড়ে ধরে গোটা শরীরের পাকেপাকে তাকে জড়িয়ে পিষে পিষে শীর্ণ করে নিয়ে ধীরে ধীরে গিলতে থাকে এবং গোটা হরিণটাকে তিন চার পাঁচ দিনে গিলে শেষ করে ঠিক তেমনি করেই মীরজুমলা কুতুবশাহীকে গ্রাস করছে।

এখানে তাঁর ভরসা শাহজাদা ঔরংজীব এবং তাঁর জ্ঞাতি শত্রু মহম্মদ আদিলশাহ।

মীরজুমলার এ উদ্দেশ্য তারা থাকতে কথনও সিদ্ধ হবে না। সঙ্গে সঙ্গে দুই বিরোধী শক্তি ন্যায়দণ্ড উঁচু করে, আকাশে তুলে ধরে রণদামামা বাজিয়ে মীরজুমলাকে শাস্তি দিতে এগিয়ে আসবে।

তাঁর জীবনের দুর্ভাগ্য তাঁর পুত্রসন্তান হয় নি আজও। সন্তানের মধ্যে কন্যা। তাও এই বৃদ্ধবয়সে খোদাতায়লার কৃপায় হয়েছে। কিন্তু না হলেই ভাল ছিল। তাঁর পর উত্তরাধিকারীহীন এই সুলতানশাহী যে নিত সে নিত—তার জন্য তাঁর কোন দুশ্চিন্তা থাকত না। আজ এই কন্যাদের জন্যই তাঁকে চিন্তা করতে হয় যেন তাদের সন্তান-সন্ততিদের হাতেই থাকে এই সুলতানশাহী।

তাঁর নোকর তাঁর গোলাম এই মীরজুমলার হাতের মুঠোয় যেন তাদের না পড়তে হয়। অবশ্য কন্যাদের বয়স এখন নিতান্তই অল্প—তবু তিনি এসব কথা না ভেবে পারেন না।

আমীর মীরজুমলাকে তিনি এ রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সম্মান দিয়েছেন। একসঙ্গে উজীরী এবং সিপাহসালারী দিয়েছেন, জায়গীর দিয়েছেন। সে এখান থেকে শ্রেষ্ঠ রত্ন সংগ্রহ করেছে। তার রত্নসম্ভারের সংগ্রহের দাম কত তার পরখ কেউ করে নি, কারণ চোখে দেখে কারু

যাচাই করবার সৌভাগ্য হয় নি। সে জানে এক সে নিজে। তবে শোনা যায় তার ওজনের পরিমাণ কয়েক মন—পাঁচ দশ মন।

বিড়ালের মত চোখ, লোকটার দৃষ্টিতে যেন কিছু আছে, দেখলে মনে হয় শয়তানও তাকে দেখে শঙ্কিত হয়। তার পায়ে পায়ে সে ফেরে, তার ছায়ার সঙ্গে সে মিশে থাকে।

লোকটা নিঃশব্দ পদক্ষেপে এক পা এক পা করে এগিয়ে আসছে কুতুবশাহী মসনদের দিকে তাতে তিনি নিঃসন্দেহ। অথচ তাকে নইলে তাঁর চলা অসম্ভব। এই মুহূর্তেও তিনি উদ্‌গ্রীব হয়ে তারই অপেক্ষা করছেন। তাকে তলব পাঠিয়েছেন; এবং বসে আছেন তারই প্রতীক্ষা করে।

শাহজাদা ঔরংজীবের এক দূত এসেছে। শাহজাদার দূত ঠিক নয়—শাহজাদার অন্তরঙ্গ পরামর্শদাতা আতাউল্লা খাঁ সাহেবের একজন লোক এসেছে একখানা চিঠি নিয়ে।

তার মধ্যে দুটি প্রশ্ন আছে। "মহামান্য সুলতানের রাজ্যে কে একজন ফকীর এসেছে এই খবর পেয়েছেন শাহজাদা। এবং সুলতানের রাজ্যে নাকি সে হিন্দু মুসলমান সমস্ত সাধারণ লোকের কাছে জিন্দা পীরের মত খাতির পাচ্ছে। অথচ এই ফকীর বাস করে এক লৌণ্ডাকে নিয়ে। ফকীরের নাম সারমাদ—আর এই লৌণ্ডার নাম চান্দ। লোকে বলে এই ফকীর এই লৌণ্ডাকে নিয়ে নানান সাজে সাজায়, কখনও সাজায় ঔরতের মত, কখনও সাজায় বাদশাজাদার মত, কখনও সাজায় হিন্দু যোগীর মত। এবং কাফেরদের মত সে এই লৌণ্ডার পূজা করে। এই লৌণ্ডা নাকি এমন গান গায় যে লোকে গান শুনে মুগ্ধ হয়ে যায়।

পয়গম্বর রসুলের গোলামীর নাম ইসলাম। তিনি যা বলে গেছেন তাই মেনে না চললে যে গুনাহ তার আর মার্জনা নেই। এই ফকীর সারমাদ সেই গুনাহ করছে নিত্য প্রতিক্ষণে সুলতানের ইলাকায় বসে। এবং এই কাফেরের মুলুক এই হিন্দুস্তানের কাছে মক্কাশরীফের

মাথা হেঁট করছে। তার একটা গান আমার কানে এসে পৌঁছেছে। সে গান কলমে লেখাও পাপ। তবু আপনার অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে এই ধর্মভ্রষ্ট বদমাশ নাস্তিক ফকীর বলে—হায় হায় হায়—মক্কাশরীফের কাবা মসজেদে আর এই কাফের হিন্দুদের এই সব ইট কাঠ আর পাথরে গড়া মন্দিরে কি তফাত। এ দুয়ের কোথায় আছেন খুদাতায়লা অথবা ঈশ্বর? দুই জায়গাতেই যা আছে তা পাথর না হয় কাঠ। গিয়ে দেখে এস মক্কাশরীফের মসজেদ —সেখানে দেখতে পাবে খুদাতায়লার পাদপীঠ হিসেবে একখানা কালো পাথর, এবং হিন্দুস্তানে কাফেরের মন্দিরে গিয়ে দেখ সেই পাথর যে পাহাড় থেকে কেটে এনেছে সেই পাহাড়ের কষ্টিপাথর কুঁদে খোদাই করে গড়া একটা পুতুল। যার নাম দিয়েছে সে একটা, ঈশ্বর কিংবা ভগবান। কিন্তু শুনো মুসলমান শুনো হিন্দু শুনো এই দুনিয়ার মানুষ, দুয়ের কোথাও নেই তিনি। কোথাও নেই।

শাহজাদা ঔরংজীব বয়সে নবীন। কিন্তু তিনি বহু প্রবীণ জন অপেক্ষাও বুদ্ধিমান এবং ঈশ্বরানুরাগী। একজন খাঁটি মুসলমান। তিনি এই খবর ঔরংগাবাদে বসে পেয়েছেন এবং আপসোস করছেন কি কুতুবশাহী সুলতানের ইলাকা মুসলমানের ইলাকা, পয়গম্বর রসুলের গোলামের সুলতানশাহী, সেই ইলাকায় বসে একজন ভণ্ড মুসলমান এমন গুনাহের বাত উচ্চারণ করে! কাবার কালো পাথর আর এই কাফেরদের পুতুলে কোন ফারক নেই! শাহজাদার মুখে এই আফসোস শুনে আমি একজন বিশ্বস্ত লোক সুলতানের রাজ্যে এই ফকীরের খোঁজে পাঠিয়েছিলাম। আশা করি সুলতান এতে আমার অপরাধ নেবেন না; কারণ রাজ্যসংক্রান্ত কোন গোপন সংবাদ সংগ্রহের জন্য আমি গুপ্তচর পাঠাই নি। আমি দেখতে পাঠিয়েছিলাম এই ফকীরকে। এবং তার গান নিজের কানে শুনে যাচাই করতে পাঠিয়েছিলাম।

আমার লোক নিজের কানে শুনে এসেছে এই গান। এই গান

শুনে আমার লোক এই ফকীর সারমাদকে প্রশ্ন করেছিল—হজরত, তাই যদি হয়, কাবা মসজেদেও যদি খুদাতায়লার আভাস না থাকে, অস্তিত্ব অনুভব করতে না পারে মানুষ, সেখানকার সেই পাথরখানা যদি কাফেরের মন্দিরের পুতুলের মত পাথরই হয় তবে তাঁকে পাব কোথায়? তিনি আছেন হয়তো সর্বত্র কিন্তু তাঁকে অনুভব করব কি করে কোথায় গিয়ে?

এ প্রশ্নের উত্তরে সেই ভণ্ড ফকীর বলেছে—পাবে তাঁকে তুনিয়ার জিন্দিগীর মধ্যে। যাকে তুমি ভালবাসো, যাকে তুমি পিয়ার করো, যার জন্যে তুমি কলেজাটা ছিঁড়ে দিতে পার তার মুখের দিকে তাকালেই তুমি তাঁকে দেখতে পাবে। তাকে বুকে জড়িয়ে ধরো, ধরলেই তুমি তাঁর স্পর্শ পাবে। তার পায়ে কেঁদে তোমার জিন্দিগীর তুখ ঢেলে দাও, দেখবে তার হাত দিয়ে খুদা সে তুখ তুলে নিচ্ছেন—এবং দেখতে পাবে সে তুখ তোমার, পরশপাথরের ছোঁয়ায় যেমন লোহা সোনা হয়ে যায়, তেমনি সোনা হয়ে যাচ্ছে। সুখে ভবে উঠছে তোমার দিল, তোমার জিন্দিগী!

মহামান্য সুলতান, আপনি একজন খাঁটি মুসলমান। আপনাকে উপদেশ দেওয়া বা দিতে যাওয়া আমার পক্ষে ধৃষ্টতা। তবে সামান্য একজন মুসলমান হিসেবে কি প্রশ্ন করতে পারি না সুলতানের দরবারে যে এই কি মুসলমানশাহীর ইজ্জত—এই কি ইসলামের জিন্দাবাদী? এ কি ইসলামের মুর্দাবাদী নয়?

এই যে সংবাদ, অর্থাৎ যে সংবাদ আমার লোক আপনার রাজ্য থেকে সংগ্রহ করে এনেছে তা আমি শাহজাদাকে বলি নি। শাহজাদা এ শুনলে অত্যন্ত মর্মাহত হবেন। শুধু মর্মাহতই হবেন না, এই কারণে তিনি আগ্রায় বাদশাহের দরবারে এসব খবর পেশ করে ইসলামের এই অগৌরব এবং কলঙ্ক বেইজ্জতি দূর করবার জন্য যা করণীয় তা করবার অনুমতি চাইতে পারেন। এবং আপনাকে

গোপনে জানাই যে শাহজাদা শীঘ্রই আগ্রায় বাদশাহকে তসলীম এবং নজরানা পেশ করতে যাচ্ছেন।"

পত্রখানা কোলের উপর রেখে মধ্যে মধ্যে চোখ বুলাচ্ছিলেন মহম্মদ কুতুবশাহ। বাঁদী দুজন দুপাশে দাঁড়িয়ে আছে—একজনের হাতে ময়ূরপালকের পাখা, অন্যজন সামনে চন্দনকাঠের উপর হাতীর দাঁতের সুদৃশ্য কারুকার্যখচিত তেপায়ার উপর সিরাজীর পাত্র, মসল্লার রেকাবি, মেওয়ার এবং মোরব্বার থালা রেখে দাঁড়িয়ে আছে। সুলতান যখনই মুখ তুলে তাকাবেন, ইশারা দেবেন তৎক্ষণাৎ সে তাঁর ঠিক অভিপ্রায়টি বুঝে সেই পাত্রটি তুলে ধরবে। পাশে একখানা প্রশস্ত ঘরে বসে আছে বীন নিয়ে দুজন বাঈ। তারাও সুলতানের বাঁদীমহলভুক্ত। গানবাজনা শোনাবার জন্য তাদের কেনা হয়েছে। দূরে দুই কোণে দাঁড়িয়ে আছে দুজন হাবসী বাঁদী। কালো কষ্টিপাথরের মত রঙ। দীর্ঘাঙ্গী। সমগ্র দক্ষিণেই হাবসীদের এবং আফ্রিকার কাফ্রী মুসলমানদের ভিড় একটু বেশী।

* * *

পত্রে আতাউল্লা খাঁ লিখেছে—"শাহজাদা আগ্রা যাচ্ছেন বাদশাহকে নজরানা দিতে এবং তসলীম জানাতে।" এবং তার আগেই আতাউল্লা খাঁ লিখেছে—"শাহজাদা ইসলামের এই বেইজ্জতির কলঙ্ক দূর করবার জন্য যা করণীয় তা করবার অনুমতি চাইতে পারেন বাদশাহের কাছে।"

কপালে সারি সারি কুঞ্চনরেখা দেখা দিল সুলতানের। সুলতানের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। জীবনের উত্তাপ এখনও বিশ বছর বয়সের শাহজাদা ঔরংজীবের মত গরম না হলেও একদম ঠাণ্ডা হয়ে জমে বরফ হয়ে যায় নি। ক্রোধ খানিকটা হল বইকি। এতো সোজা কথায় আতাউল্লা খাঁ লিখেছে—এই অজুহাতে শাহজাদা গোলকুণ্ডা আক্রমণের অনুমতি চাইতে পারেন বাদশাহ সাজাহানের কাছে।

ঠিক এই সময় শব্দ থেকে তিনি জানতে পারলেন উজীর মীরজুমলা আসছেন। তাঁর ঘোড়া মহলের ফটকের মধ্যে ঢুকেছে। সঙ্গে ক'জন সওয়ার আছে। চারজন। তাঁর মনে হচ্ছে। তবে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ একসঙ্গে মিলে গিয়ে ঠিক বুঝতে দিচ্ছে না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই একজন হাবসী খোজা এসে খবর দিলে—উজীর মীরজুমলা খান-ই-খানান তাঁর তসরিফ নিয়ে অপেক্ষা করছেন—সুলতান তাঁকে আসবার জন্য হুকুমৎ পাঠিয়েছিলেন—

—হাঁ। তাঁকে নিয়ে এস। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সুলতান তাকালেন বাঁদীর দিকে—বাঁদী ঠিক তাঁর অভিপ্রায় বুঝেছে। সে সিরাজীর পাত্র থেকে সোনার পানপাত্র পরিপূর্ণ করে বাড়িয়ে ধরল। সুলতান একনিশ্বাসে পান করে যেন একটু চাঙ্গা সোজা হয়ে বসলেন। বাঁদী বাড়িয়ে ধরলে মসলার পাত্র। কয়েকটা লবঙ্গ এলাইচি তুলে নিয়ে মুখে দিলেন সুলতান।

ঠিক এই সময়ই বিড়ালচক্ষু দীর্ঘাকৃতি মীরজুমলা এসে সামনে দাঁড়িয়ে যথাবিধি অভিবাদন জানিয়ে বললেন—সুলতান আমাকে তলব করেছেন?

—হাঁ মীরজুমলা। আজ সকাল থেকেই বড় একটা অস্বস্তিতে রয়েছি।

—ঔরংগাবাদের এক সওয়ার এক নিশান নিয়ে এসেছে। কার নিশান ঠিক জানি না। শাহজাদা ঔরংজীবেরও হতে পারে। তবে আমার বিশ্বাস তাই বটে—কিন্তু মীর আতাউল্লা খাঁন এক পত্র দিয়েছেন। সে পত্র বাদশাহের ওকীল সাহেব সুলতানের সঙ্গে সাক্ষাৎকার করে একটি সুদৃশ্য চন্দনকাঠের বাক্সের মধ্যে উপঢৌকনে ঢেকে পৌঁছে দিয়েছেন।

একটু হাসলেন মহম্মদ কুতুবশাহ। বললেন—মীরজুমলা খান, তোমার থেকে বুদ্ধিমান এবং যোগ্যতর ব্যক্তি আমি খুব কমই দেখেছি।

হাঁ, তার মধ্যে এক পত্র ছিল, সেইখানাই আমার অস্বস্তির কারণ।

বলে পত্রখানা কোল থেকে তুলে মীরজুমলার হাতে দিলেন, বললেন—পড়ে দেখ।

বলে আবার বাঁদীর দিকে তাকালেন। বাঁদী এবার মোরব্বার রেকাবি তুলে ধরলে।

—না। ফল।

লজ্জিত হল বাঁদী। সে তাকিয়ে ছিল এই দীর্ঘদেহ সবলপেশী মোটা মোটা হাড়সর্বস্ব-গড়ন পীতচক্ষু মীরজুমলা সাহেবের দিকে। মীরজুমলা এখনও তরুণ। বয়স চল্লিশ পার হয় নি। বাঁদী তাড়াতাড়ি ফলের রেকাবি তুলে ধরলে। সুলতান গোটা কয়েক আঙুর তুলে মুখে দিতে লাগলেন একটার পর একটা।

মীরজুমলা সাহেব চিঠিখানি শেষ করে অভিবাদন জানিয়ে বললেন—এর জন্যে সুলতান এমন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত কেন হয়েছেন আমি বুঝতে পারছি না। হাঁ, এই সারমাদই মহম্মদ সৈদ। মহম্মদ সৈদকে আমি গোড়া থেকেই আশ্রয় দিতে চাই নি। লোকটি তো আমার সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রেই গোলকুণ্ডায় এসেছিল। ইরান থেকে যখন এদেশে আসি তখন এক জাহাজে এসেছিলাম, সেই সময় পরিচয় হয়েছিল। ওই আমাকে মুক্তা দিয়েছিল মূলধন হিসেবে। লোকটা আসলে ইহুদী। পরে ইসলামে দীক্ষা নিয়েছে। ও গেল থাট্টায় আমি এলাম গোলকুণ্ডায়। দীর্ঘদিন পর এখানে এল একটা কাফির লৌণ্ডা নিয়ে। দেখলাম বাউরা হয়ে গেছে। বলেন তো ওর গর্দান নিয়ে সোনার থালায় করে পাঠিয়ে দিতে পারি ঔরংগাবাদ।

সুলতান বললেন—এ অঞ্চলের লোকে তার কত অনুগত তা তুমি জান?

—জানি।

—লোকে উন্মাদ হয়ে যায় তার সাক্ষাৎ পাবার জন্যে তার গান শুনবার জন্যে। এবং তাকে আমি দেখেছি মীরজুমলা খান। একে হত্যা যে করবে সারা জীবন তাকে দুঃখ পেতে হবে। তুমি কি তার গান শুনেছ?

—শুনেছি।

—শুনেছ? চোখ দিয়ে তোমার জল পড়ে নি? দিল গলে যায় নি?

—না, সুলতান। আমি আপনার রাজ্যের উজীর সিপাহসালার—একসঙ্গে দুই। এত সহজে চোখ থেকে আঁসু বের হলে কি একদিকে মুঘল অন্যদিকে বিজাপুর, এই দুই দুশমনকে রুখে রাখতে পারতাম, না পারা যায়?

—তাহলে মহম্মদ সৈদ বা সারমাদকে যদি এ রাজ্য থেকে আমি চলে যেতে অনুরোধ করি তুমি ক্ষুব্ধ হবে না তো?

—আমি তো তার জন্য সুলতানের কাছে কখনও কোন অনুরোধ করি নি!

—কর নি কিন্তু আমি ভেবেছিলাম তুমি তার দ্বারা উপকৃত—তুমি আমাকে বলেছিলে এ কথা একসময়। বলেছিলে দুঃসময়ে এর মত এত বড় দোস্ত আর হয় না।

—হাঁ। বলেছিলাম সুলতান মালিক। কিন্তু মালিক-ই-জাঁহা, তা নিয়ে আজ এতটুকু আমার মাথাব্যথা নেই। কারণ সে ইসলাম-দ্রোহী!

—তাহলে আমি লোক পাঠিয়ে দিই ফকীরের কাছে। সে চলে যাক এ মুলুক থেকে। তাকে হত্যা করতে আমার মন সায় দেয় না মীরজুমলা, করলেও ফল ভাল হবে না। দেশে দারুণ অশান্তি হবে। অশান্তি হয়তো তুমি দমন করতে পারবে, তুমি শক্তিমান, কিন্তু তাতে অনেক রক্তপাত হবে। আমার রাজ্যে তা হয়, এ আমি চাই নে। সে গুনাহ আমার সইবে না! তাহলে

মহম্মদ সৈদই সারমাদ এ কথা আমি জানাতে পারি। এটা সত্য কথা ?

—হাঁ মালিক-ই-মুল্ক। সত্য। সারমাদই মহম্মদ সৈদ। থাট্টার জহরতবালা।

—আর একটা খবর শুনেছ ? বিজাপুরের ?

—হাঁ সুলতান-ই-দুনিয়া, তাঁর বৃদ্ধবয়সে পুত্রসন্তান হয়েছে।

চোদ্দ

গভীর রাত্রি তখন। ফকীর সারমাদের আশ্রমে সারমাদ বসে ছিলেন। আকাশের দিকে তাকিয়ে কি ভাবনায় যে মগ্ন ছিলেন সে তিনি নিজেই যেন বুঝতে পারছিলেন না। তাঁর কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে আছে বালক অভয়চান্দ। বালকের উষ্ণ প্রশ্বাস তাঁর একটা হাতে পড়ছিল। এবং তার মাথা ও মুখের স্পর্শ লাগছিল সারমাদের জানুর উপর। মনে হচ্ছিল তারই মধ্য দিয়ে তিনি এমন একটা কিছু অনুভব করছেন যার ব্যাখ্যা চলে না।

বিরাট পৃথিবী—তার মধ্যে নদনদী পাহাড় অরণ্যশোভা—অনন্ত কোটি জীবন—কীট থেকে শুরু করে মানুষ পর্যন্ত, এ সব যেন তাঁর কাছে মুছে গেছে। আছেন তিনি আর আছে এই বানিয়া বালক অভয়চান্দ। মনে হচ্ছে সারা তুনিয়াটাই যেন অভয়চান্দের মধ্যেই বিলুপ্ত বা মিশিয়ে গিয়েছে।

সারমাদ একটা তন্ময়তার মধ্যে মগ্ন ছিলেন। তিনি আকশের দিকে তাকিয়েও যেন দেখছিলেন এই বালককে। গোটা আকাশ জুড়ে সে যেন শুয়ে আছে তবু তাকে অতিকায় বলে মনে হচ্ছে না। বা আকাশটাকে তাঁর আশ্রমের আঙিনার মত ছোট বলেও মনে হচ্ছে না।

টুপটাপ শব্দ করে পাতা ঝরছে; তাঁর আশ্রমের প্রায় পিছন থেকেই অরণ্যলোক আরম্ভ হয়েছে। অঞ্চলটাই পাহাড়ে। শহরের প্রান্তে খানিকটা দূরে একটা পাহাড়ের কোলে তাঁর আশ্রম। পাহাড়টা জঙ্গলে ভরতি।

অভয়চান্দকে নিয়ে যে তাঁর নূতন জীবন—সেই জীবনে যে নিত্যনূতন অভিজ্ঞতা অনুভূতি অর্জন করছেন তাই আস্বাদন এবং তাই নিয়ে মাটির পথ ছাড়া মনের যে একটি অদৃশ্য পথ আছে সেই পথে যাত্রা নিরন্তর এবং অব্যাহত রাখবার জন্য এই একান্ত নির্জনে

অরণ্যালোকের পটভূমিতে এই কুটিরখানি তৈরি করেছিলেন। গোড়ায় যখন থাট্টা থেকে অভয়চান্দকে নিয়ে এই দক্ষিণে চলে আসেন তখন মনের মধ্যে দুটি মানুষের ভরসা তাঁর ছিল। একজন গোলকুণ্ডার সুলতান মহম্মদ কুতুবশাহ, অন্যজন মীরজুমলা। মীরজুমলার কাছে প্রত্যাশা করেছিলেন কৃতজ্ঞতা আর সুলতান কুতুবশাহের কাছে প্রত্যাশা করেছিলেন আধ্যাত্মিক রসগ্রাহিতা। মহম্মদ কুতুবশাহ স্বর্ণ এবং হীরকখনি প্রসবিনী গোলকুণ্ডার সুলতান, তিনি যোদ্ধা ছিলেন একদা, আজও যুদ্ধ করতে পারেন না তা নয়, পারেন তবে করেন না। মীরজুমলার উপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত আছেন। সংগীতের তিনি সমঝদার। সুরারও তিনি রসগ্রাহী। তাঁর চোখ নারীর রূপ কষটে কষ্টি-পাথর: পরসতারমহল বাঁদী বেগমে ভরতি। হারেমে হাবসী কাফ্রী ইরানী তুরানী আর্মেনিয়ান কাশ্মীরী রাজপুত দক্ষিণী হিন্দু মুসলমান ক্রীশ্চান সব জাতের বাঁদী তিনি রাখেন। কিন্তু এরই মধ্যে কোথায় আছে একটি নিরাসক্ত পুরুষ, আধ্যাত্মিক জীবনের সাধক। এই সাধনার ধারাটাই কুতুবশাহী বংশে দীর্ঘকাল থেকে রয়ে গেছে।

সংগীত সাধনায় যেমন 'ঘরোয়ানা' বলে একটা কথা আছে, এই হিন্দুস্তানে হিন্দুদের ঘরে ধর্মসাধনায় কুলধর্ম বলে কথা আছে। এ সব কথা গুপ্ত কথা গুহ্য কথা। তার আসল মর্ম কেউ জানে না বোঝে না—কিন্তু এই সব ঘরের মানুষদের একটি বিচিত্র আচরণে মানুষ বিস্মিত না হয়ে পারে না। বিস্ময় লাগবারই কথা। এ দেশটাই বড় বিচিত্র।

কত দেশের কত মানুষ যে এ দেশে এসেছে এবং এ দেশেরই মানুষ হয়ে বেমালুম মিশে গেছে তার আর হদিস নেই। মহম্মদ সৈয়দ যখন প্রথম থাট্টায় আসেন সলিমার জন্য, তখন তিনি আবেস্তা এবং কোরানে সুপণ্ডিত, এবং জীবনের তৃষ্ণা শুধু সলিমার জন্যই ছিল না, জ্ঞানের জন্যও ছিল। জীবনে জানতে চাওয়ার তৃষ্ণাটা গোড়া থেকেই তাঁর প্রবল। অবশ্য সে সময় নূতন যৌবনে তিনি সলিমার

জন্যই প্রায় পাগল হয়ে উঠেছিলেন। তা হলেও ব্যবসা-বাণিজ্য করতে করতেই তিনি এই বিচিত্র দেশ সম্পর্কে অনেক অনুসন্ধান করেছেন। অনেক জেনেছেন। প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করে এদের নারীজাতিকে সম্বোধন। মা বহেন—এ দুটো শব্দ যে কোন বয়সের পুরুষ যে কোন বয়সের নারীকে কি অনায়াসেই না সম্বোধন করে ডাকে! মেয়েরাও ডাকে বাবা বলে এবং ভাই বলে ঠিক তেমনি অনায়াসে। আরও কত আশ্চর্য কথা শুনেছেন। অতি আশ্চর্য! পৃথিবীর কোন দেশের কোন শাস্ত্রের মধ্যে তার সমর্থন মেলে না। এদের একদল বিচিত্র সাধক আছে যারা নাকি নিজের স্ত্রীকেও মা বলে পূজো করে।

সন্ধান করতে করতেই এই অভয়চান্দের সঙ্গে দেখা। তখনও পর্যন্ত যে সন্ধান তিনি করেছেন তাতে এই কাফের মুলুকের এইসব আচার-আচরণ সম্পর্কে তিনি একটা বিদ্বেষ, না, বিদ্বেষ নয়, ঘৃণাই অনুভব করতেন। হঠাৎ দেখা হল এই অভয়চান্দের সঙ্গে—তার সঙ্গে দেখা হল সেই সাধুর দলের সঙ্গে। কবীরপন্থী সাধু।

কবীর নিজে ছিলেন মুসলমানের ছেলে। বাপ পেশায় ছিলেন জোলা। কিন্তু আশ্চর্য, এই মুসলমান বালক হয়ে গেলেন হরিনামের ভক্ত। এবং এ দেশের লোকেরাও আশ্চর্য লোক—সে হিন্দুও বটে মুসলমানও বটে—তারা দল বেঁধে এসে সন্ত কবীরের শিষ্য হয়ে গেল। হিন্দু হিন্দু থেকেও কবীরপন্থী, মুসলমান মুসলমান হয়েও কবীরপন্থী। এমন সন্ত এ দেশে অনেক। এ দেশের বিচিত্র গল্প শুনেছেন,—রাজার ছেলে রাজ্য ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে গেছেন। তার সঙ্গে সঙ্গে গোটা রাজবংশটাই তাঁর শিষ্য হয়ে গেল। রাজ্যসম্পদ ভোগ এসব কোন বাঁধনে বাঁধতে পারল না।

এমনি একটি বিচিত্র সাধন-পন্থা কুতুবশাহী সুলতান বংশে গুপ্ত ধারার মত সুদীর্ঘকাল ধরে প্রবাহিত হয়ে আসছে। হিন্দু এবং মুসলমানের সাধনের ধারা মিলে এই ধারার উৎপত্তি।

সুলতান মহম্মদ বিন তোগলকের আমলে দিল্লীর এক ব্রাহমনের বাড়িতে ছিল এক কেনা গোলাম। বাচ্চা বয়সে কিনে তাকে তিনি মানুষ করেছিলেন। তিনি মানুষের ললাট গণনা করতে পারতেন। গোলামের হাটে একটি প্রিয়দর্শন বালককে দেখেই তিনি ভবিষ্যৎ দেখতে পেয়েছিলেন, দেখতে পেয়েছিলেন এই বালক মহাভাগ্যবান। ভবিষ্যতে সে রাজ্যেশ্বর হয়ে নিজের বংশের প্রতিষ্ঠা করবে। ক্রমে ছেলেটি বড় হল। ব্রাহ্মণের বাড়ির চাষবাস করত। একদিন ক্ষেত্র কর্ষণ করতে গিয়ে সে হলের মুখে পেয়েছিল একটি মোহরপরিপূর্ণ পাত্র। আশ্চর্য বালক, সে পাত্রটি আত্মসাতের প্রলোভন সংবরণ করে তার প্রভুর সামনে নামিয়ে দিয়ে বলেছিল—মালিক, আপনার ক্ষেতের মধ্যে মাটির নীচে এই পাত্রটি ছিল। এতে সোনার মোহর রয়েছে—এ আপনার—এ আপনি নিন।

ব্রাহ্মণ তাকে আশীর্বাদ করে নিয়ে গিয়েছিলেন সুলতান মহম্মদ বিন তোগলকের দরবারে। ছেলেটির সততার কথা সুলতানকে বলে ছেলেটিকে মুক্তি দিয়েছিলেন গোলামী থেকে। সুলতানকে বলেছিলেন—সুলতান মেহেরবান কদরদান, এমন সততার কদর যদি আপনি না করেন তবে করবে কে? একে আপনার নোকরীতে নিন।

সুলতান তাকে একশো সওয়ারের অধিনায়ক নিযুক্ত করেছিলেন। তারপর তার ভাগ্য আর তার পৌরুষ। সে এই দক্ষিণে এসে ধ্বংসোন্মুখ হিন্দু রাজ্যের উপর রাজ্যস্থাপন করে সত্যই রাজ্যেশ্বর হয়েছিল। সে আজকার কথা নয়, পাঠান আমলের কথা। রাজ্য-স্থাপন করেও হাসান তার প্রভুকে ভোলে নি। সে নিজের নাম নিয়েছিল হোসেন বাহমন গঙ্গু। গঙ্গু বাহমনের নাম নিজের সঙ্গে যুক্ত করে নিজেকে ধন্য মনে করেছিল। এবং সেই সঙ্গে সে তার পিতৃতুল্য গঙ্গু ব্রাহমনের কাছে শেখা অনেক কিছু রীতিনীতি এবং তাঁর প্রদত্ত শিক্ষাকে নিজের বংশে প্রতিষ্ঠা করেছিল। নিজে মুসলমান হয়েও অনেক হিন্দু শিক্ষাকে জীবনে ফলবতী করেছিলেন হোসেন

গঙ্গু বাহমন। অনেকে বলেন তিনি নিরামিষ খেতেন। কখনও হিন্দুদের উপর অত্যাচার করতেন না। সমান চোখে দেখতেন হিন্দু এবং মুসলমানকে।

গোপনে হিন্দুদের মন্দিরে দেবদর্শন করে বেড়াতেন।

রাধাকিষণ জীউর কাহিনীয়া বড় ভালবাসতেন।

আর একটা শিক্ষা তিনি জীবনে রূপায়িত করেছিলেন। ঐশ্বর্য এবং বিলাসের মধ্যে সুলতানী মসনদে বসেও তিনি ছিলেন ফকীর মেজাজের লোক—অনাসক্ত। গঙ্গু ব্রাহমন হোসেনকে বলেছিলেন—"হোসেন, রাজা হবে, হবেই তুমি। কিন্তু কখনও ভুলো না তুমি এক-দিন গোলাম হিসেবে ক্ষেতির কাম করেছ। দেখ, আমাদের হিন্দুদের একজন রাজা ছিলেন যিনি আল্লা বল আল্লা ঈশা বল ঈশা ব্রহ্ম বল ব্রহ্ম তাঁকে তিনি জানতেন। তিনি রাজত্বও করতেন আবার জমীন চাষও করতেন। আমাদের দেশের ব্রাহ্মণেরা আগের কালে ব্রহ্মকেই মানত। অন্য অন্য দেবতাকে ঠিক মানত না। এই সব ব্রাহ্মণেরা এসে তাঁর সভায় বড় বড় সমস্যার মীমাংসা করে নিয়ে যেত। রাজত্ব করবে তেমনি ভাবে। ভুলবে না তুমি মানুষ। ভুলবে না মানুষে মানুষে ফারাক নেই। ওই ভিখমাঙোয়া যে সেও মানুষ আবার দিল্লীর সুলতান এতবড় পণ্ডিত এমন খেয়ালী মহম্মদ বিন তোগলক সেও মানুষ। মানুষের জমীনের উপর বড় লোভ। বড় লালস। কিন্তু যেটুকু তার দরকার সে হল সাড়ে তিন হাত জমীন। তার বেশী নয়।"

এইটেই আশ্চর্যভাবে বাহমনী বংশের মধ্যে একটা চেহারা নিয়েছিল। বাহমনী বংশের ধ্বংস হল—তার উপর নিজামশাহী আদিলশাহী কুতুবশাহী রাজ্য গড়ে উঠেছে কিন্তু এই গুপ্ত সাধনার ধারাটি আশ্চর্যভাবে আজ সামান্য সামান্য অদলবদল করে বেঁচে আছে। তার সঙ্গে ইরানের সুফী সাধনা এসে মিশেছে। তাই এখানকার

ধারাধরন বিচিত্র, দরবার বিচিত্র, সুলতানেরাও বিচিত্র। সব থেকে বিচিত্রতম মানুষ এই গোলকুণ্ডার মহম্মদ কুতুবশাহ।

সাকী সিরাজী গানবাজনা নিয়ে মশগুল। দূরদূরান্তর দেশ-দেশান্তর থেকে কেউ গুণী এলে কুতুবশাহের সমাদর সে পাবেই। বিপন্ন হয়ে কেউ এলে তাকেও কখনও ফেরান না। এই তো আজকের দিল্লীর বাদশাহ শাহানশাহ সাজাহান তখন শাহজাদা, তাঁর বাপ শাহানশাহ জাহাঙ্গীর শাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বাদশাহের সেনাপতি মহাব্বত খাঁর কাছে হেরে দিল্লী থেকে পালিয়ে এসেছিলেন দক্ষিণে; পিছনে পিছনে ফৌজ নিয়ে আসছিলেন মহাব্বত খাঁ। শাহজাদাকে যে আশ্রয় দেবে সাহায্য দেবে সে দুশমন বলে গণ্য হবে। বিপন্ন শাহজাদার অর্থ ছিল না, খাদ্য ছিল না, বিশ্রামের অবকাশ ছিল না; বাদশাহের ভয়ে কোন রাজা কোন সুলতান কোন নবাব শাহজাদাকে আশ্রয় দেয় নি, এক দামড়ি সাহায্য করে নি, কিন্তু মহম্মদ কুতুবশাহ তাঁকে গোলকুণ্ডা সীমান্তে আহ্বান জানিয়ে কয়েকদিনের আশ্রয় দিয়ে, খাদ্যে পানীয়ে অতিথি সংকারে পরিতৃপ্ত করে বিদায়ের সময় আহার্য এবং অর্থ উপঢৌকন দিয়ে তাঁকে বিদায় দিয়েছিলেন।

মহম্মদ সৈয়দ এই মানুষটির কাছেই আশ্রয় নিতে এসেছিলেন গোলকুণ্ডা। কিন্তু পথে সব গোলমাল হয়ে গেল। গোলমাল হয়ে গেল এই বালক অভয়চান্দের মধ্যে। তামাম দুনিয়া যেন হারিয়ে গেল এই ছেলেটির মধ্যে। আবার মধ্যে মধ্যে এমন হয় যে আকাশের দিকে তাকালে সেখানে দেখতে পান এই অভয়চান্দকে; সমুন্দরের বুকে আসতে আসতে প্রথম ব্যাপারটা ঘটেছিল, অভয়চান্দ ঘুমুচ্ছিল নৌকার ঘরের মধ্যে, মহম্মদ সৈয়দ তাকিয়ে ছিলেন তার মুখের দিকে। হঠাৎ একসময় ঘর থেকে বাইরে এসে দরিয়ার বুকের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলেন, মনে হল অভয়চান্দ যেন সমুন্দরের বুকে ভাসছে। ভয়ে মহম্মদ সৈয়দ চীৎকার করে উঠেছিলেন। কি

করে ভেসে গেল অভয়চান্দ? কখন ভেসে গেল? ছুটে ছইয়ের ভিতরে গিয়েছিলেন দেখতে, কোন্ দিক দিয়ে কেমন করে ঘুমন্ত অভয়চান্দ ভেসে গেল? ভিতরে এসে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন মহম্মদ সৈয়দ কারণ প্রসন্ন প্রশান্ত মুখে অভয়চান্দ নৌকার ভিতরে আরামের বিছানার মধ্যে তখনও ঘুমন্ত। শুধু মুখে একটু হাসি ফুটে ছিল।

অবাক হয়ে গিয়েছিলেন সারমাদ। এ কেমন করে হল? কেন তিনি এমন ভুল দেখলেন? কেন?

প্রথম দিন মনকে বুঝিয়েছিলেন—ভুল ভুল। এর মধ্যে কেন নেই। ভুল হয়। কিন্তু পরের দিন আবার দেখলেন তিনি ঠিক এমনি ভুল। সেদিন শুধু সমুদ্রের জলে অভয়চান্দকে ভাসতেই দেখলেন না আকাশের বুকেও অভয়চান্দকে দেখলেন—সে যেন সেখানেও শুয়ে রয়েছে। কেমন করে রয়েছে—এ সম্ভবপর কি না এসব বিবেচনা করেও তিনি বার বার নিজের চোখ কচলেও অন্য কোন রকম দেখেন নি। সেই একই ছবি দেখেছিলেন।

বার বার প্রশ্ন করেছিলেন নিজেকে—এমনও হয়? কেমন করে এমন হয়? উত্তর মেলে নি। তবে এটা তিনি বুঝেছিলেন যে এমন হয়। কেমন করে হয় কেউ জানে না—তবে এমন হয়!

এ মুল্‌ক তাজ্জবের মুল্‌ক। এ মুল্‌কে নাকি ঈশ্বর মানুষ হয়ে জন্মান ঔরৎকে ভালবাসার জন্যে। মহব্বতির জন্যে। শুধু ঔরতের মহব্বতির জন্যেই বা কেন, মায়ের কোলে ছেলে হয়ে খেলা করবার জন্যেও আসেন। যখন এমনি ভাবে কেউ কাউকে ভালবাসে তখন বুঝতে হবে খুদ খুদা তাঁর ওই ভালবাসার জনের মধ্যে নিজের আসন পেতে বসেছেন। ভাল যে বাসে সে ওই মানুষটাকে বাসে না, বাসে খুদাকে। তখনই সমুন্দরেও সে ভাসে, ঘরেও সে ঘুমোয়, আকাশেও সে বিছানা পেতে শুয়ে থাকে একই সঙ্গে।

কথাটা বলেছিল তাঁকে এই বালক অভয়চান্দ।

মহম্মদ সৈয়দ প্রশ্ন করেছিলেন—কে বললে তোমাকে ঐ সব কথা? কার কাছে শিখেছ?

অভয়চান্দ হেসে বলেছিল—আমি জানি।

—কি করে জানলে?

—তা তো জানি না।

—কার কাছে শিখলে?

—কারও কাছে তো শিখি নি।

—তবে?

—তবে কি?

—জানলে কি করে?

অনেকক্ষণ ভেবে অভয়চান্দ বলেছিল—তোমার কাছে।

সবিস্ময়ে মহম্মদ সৈয়দ বলেছিলেন—আমার কাছে?

—হ্যাঁ, তোমার কাছে। তুমিই তো বলছ। আমি সমুন্দরে ভাসছি আকাশেও ভাসছি নৌকোর মধ্যেও একসঙ্গে রয়েছি। তুমি তো ঝুটা আদমী নও। ঝুট বাত তো বল না। তুমি যখন বলছ তখন সচ্‌ বাত। তুমি আমাকে কত ভালবাস কত পিয়ার কর, তাই জন্যে জরুর এমনি দেখছ। আর বচপনে শুনেছি বৃজধামে রাধা বলে এক আহীরদের বহু ছিল—সে ভালবেসেছিল কানাইয়া-লালজীকে। কিষণজীকে। বাঁশুরিয়াকে। সে এমনি দেখত। যমুনা নাম করে দরিয়া আছে তার পানি বড়ি গহীন আর কালী। তার মধ্যে সে দেখত সে কিষণজীকে। নীলা আকাশে দেখত। আবার ঘরে বসে থাকত, কাঁদত আর বাঁশী বাজাত তার নাম ধরে। সেই শুনত—আর কেউ শুনতে পেত না। রাধা এমন করে ভালবেসেছিল—সেই ভালবাসাতেই কিষণজীর মধ্যে জাগলেন সাঁই।

অবাক হয়ে শুনেছিলেন মহম্মদ সৈয়দ। তারপর এই বিচিত্র সত্য যা তাঁর কাছেই সত্য—বাকী দুনিয়ার কাছে ঝুট তাই দেখতে

দেখতে তাঁর সব যেন বদল হয়ে গেল। গোটা আদমীটাই ছুসরা আদমী হয়ে গেল। গোলকুণ্ডায় এসে হীরা জহরত মাটিতে গেড়ে রেখে শহরের এই প্রান্তে ছোট আশ্রমটি বেঁধে নির্জনে জীবনের এই বিচিত্র তপস্যাই করে চলেছেন। মহম্মদ সৈয়দ নামটাও ফেলে দিয়েছেন। এখন নাম সারমাদ। ফকীর। কোমরে একখণ্ড বস্ত্র ছাড়া কোন আবরণ রাখেন নি। মীরজুমলাকে একবার একটা খবর দিয়েছিলেন কিন্তু মীরজুমলা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান নি। তাতে এতটুকু ক্ষুব্ধ হন নি। এবং সেই সঙ্গেই গোলকুণ্ডার সুলতান মহম্মদ কুতুবশাহের দরবারে গিয়ে দেখা করার সংকল্পও ধূলায় ফেলে দিয়ে হারিয়ে ফেলেছিলেন।

শুধু অভয়চান্দকে নিয়ে খেলা। এই খেলাই তাঁর সব। জীবনে যা শিখেছিলেন ইহুদী শাস্ত্র থেকে, যা শিখেছিলেন কোরান থেকে, যা শিখেছিলেন জ্ঞানীগুণীজনের কাছ থেকে, সব ভুলে গিয়ে ছেলেদের ধূলোখেলার মত খেলছিলেন অভয়চান্দকে নিয়ে। এর সঙ্গে একটি খেয়াল ছিল—গান। তিনি পারসীতে গান তৈরি করতেন, অভয়চান্দ সেই গান গাইত। কখনও কখনও অভয়চান্দ মেয়ে সাজত। মনোহর রূপ অভয়চান্দের, মহার্ঘ্য মেয়েদের সাজসজ্জায় সে মনোহারিণী রূপসীর মত পায়ে ঘুঙুর পরে নাচত তার সঙ্গে। এই মেয়ে সেজে অভয়চান্দ যখন নাচত তখন সে গাইত কবীরজীর গান।—

আয়ৌ দিন গৌনেকে হো, মন হোত হুলাস।
ডোলিয়া উঠারে বীজা বনরা হো জহুঁ কোঈ না হমার॥
পঁইয়া তেরী লাগৌ কহররা হো ডোলি ধর ছিনবার।
মিল লেবৈঁ সখিয়া সহেলর হো মিনৌঁ কুল পরিবার॥
দাস কবীর গায়েঁ নিরগুণ হো সাধো করি লে বিচার।
নরম গরম সৌদা করি লে হো, আগে হাট না বাজার॥

যুবতী মেয়ে বলছে—আমার স্বামীর বাড়ি যাবার দিন হয়েছে—মনে আমার আর আনন্দ ধরছে না। নির্জন বনের মধ্যে দিয়ে চলছে

আমার ভুলি। ওরে কাহারেরা, তোদের পায়ে পড়ি রে—একটু দাঁড়া—আমার আপন জন যারা এতদিনের তাদের আর একবার দেখে নি। কবীরদাস বলছে—ওরে সাধু, বিচার করে দেখ যে তোর স্বামী সে হল নির্গুণ। তার নেই কিছু রে, নেই কিছু। যা কিছু কেনাকাটা করবার করে নে—সামনে আর হাট বাজার পাবি নে।

এই গানের আকর্ষণেই এ দেশের লোকেরা ভিড় করে আসত শুনতে। সারমাদ চোখ বন্ধ করে শুনতেন আর চোখ দিয়ে জল গড়াত। প্রথমে এসেছিল নিছক কৌতুক এবং কৌতূহলবশতঃ। একটা অপূর্ব সুন্দরী কিশোরী মেয়ে নেচে ভজন গাইছে। আর প্রগল্‌ভা যুবতীর মত বলছে—আমার গৌনার দিন হয়ে গেছে—মনে আর খুশি উল্লাস ধরছে না গো ধরছে না। মানুষের চিত্ত উতলা হয়ে উঠত। আর তার সামনে মুগ্ধদৃষ্টি এক গোলাপের মত দেহবর্ণ সুন্দর পুরুষ পলকহীন হয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে, এর মধ্যে যে দেহ লেনদেনের কারবারের নির্লজ্জ আভাস পেতো তার কৌতুকে তারা হেসে ভেঙে পড়ত। ক্রমে গান যত এগিয়ে যেত তত ভাবের বদল হত। দাস কবীরের ভণিতায় যখন নর্তকী বলত স্বামী তো নির্গুণ তখন তারা মুহূর্তে হয়ে যেত স্তব্ধ। গান শেষ করে নাচ থামিয়ে অভয়চান্দ লুটিয়ে পড়ত আশ্রমের অঙ্গনতলে। খুলে যেত তার পরচুলের বেণী—খুলে যেত তার ওড়নার ঘোমটা—খুলে যেত তার কাঁচুলি—প্রকাশ হয়ে পড়ত সে মেয়ে নয়, এক অপূর্বদর্শন বালক, আর ওই গোলাপের মত দেহবর্ণ ফকীর তাকে বুকে তুলে নিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতেন, তখন তাদের মনে হত এর থেকে পবিত্র এবং অধিকতর আশ্চর্য কিছু তারা দেখে নি। এর মধ্যে দেহবাদের ছদ্মবেশই আছে কিন্তু আসলে তার এতটুকু স্পর্শ বা এতটুকু অস্তিত্ব নেই—তখন তাদের চোখের সুমুখ থেকে যেন একটা কালো পর্দা

খুলে যেত। এবং বেরিয়ে পড়ত একটি জ্যোতির্বিন্দু এবং তার চারিপাশে একটি পরম শুভ্র আলোর মণ্ডল।

তারাও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদত।

আবার এক একদিন ফকীর তাঁর বীন বাজিয়ে পারসী গজল গাইতেন। ছেলেটি তাঁর সামনে বসে থাকত, শুনত সেই গান। অবাক হয়ে শুনত। পারসী ভাষার গান—তার অর্থ ছেলেটি সঠিক বুঝত না, যারা পাশে দাঁড়িয়ে ভিড় জমিয়ে শুনত তাদেরও অধিকাংশ লোক বুঝত না তবে গজলের অন্তর্নিহিত আকূতি বুঝত। অনেক সম্ভ্রান্ত মুসলমান খবর পেয়ে এসে শুনে গেছেন এই ফকীরের গান। মধ্যে মধ্যে দু'চারজন আমীর এসে আলাপ করেও গেছেন। কিন্তু সে আলাপ তেমন জমে নি। তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই বলেছেন—ফকীর সাহেব, সুলতানের দরবারে যান না কেন?

ফকীর প্রত্যেককে নতুন নতুন বা পৃথক পৃথক জবাব দিয়েছেন।

একদিন এক কালো আলখাল্লা এবং স্ফটিকের মালা পরে মাথায় মোটা পাগড়ি বেঁধে এসেছিলেন এক ফকীর। তিনি বলেছিলেন—আপনি সুলতানের দরবারে যান না কেন ফকীর সাহেব?

এই বিচিত্র ফকীর সারমাদ বলেছিলেন—তাঁর দরবারে তাঁর সামনেই তো বসে আছি হজরত!

প্রশ্নকারী ফকীর চমকে উঠেছিলেন। এবং তাঁর পাশে যে সঙ্গীটি ছিল তার দিকে ভ্রূকুঞ্চিত করে তাকিয়েছিলেন। সে লোকটিও যেন ইশারায় কিছু বলেছিল। সারমাদ বলেই চলেছিলেন—এই তামাম দুনিয়াই তো তাঁর দরবার হজরত। ওই নীলা আসমান থেকে পাহাড়ের ভিতরে অন্ধকার গুহা সবই তো তাঁর বিচিত্র দরবারের শোভা—তার মধ্যে তিনি তাঁর মসনদে বসে আছেন। কখনও দেখি রাজার পোশাকে বসে আছেন, কখনও দেখি কাঙালের পোশাকে বসে আছেন। কখনও দেখি আপনি যে কালো আলখাল্লা পরে বসে আছেন তাই পরে বসে আছেন। কিন্তু হজরত কোন পোশাকেই

কোন বেশেই আমার তাঁকে পছন্দ হয় না। পছন্দ কেবল এই বালক। দুনিয়ার মালিক সুলতান এখন আমার সামনে এই লৌণ্ডার মুরত ধরে বসে আছেন। আমাকে পিয়ার করছেন!

ফকীর বলেছিলেন—এ সব তো ইসলামবিরোধী কথা হচ্ছে হজরত!

সারমাদ বলেছিলেন—আমিও বছরখানেক তাই ভেবেছি হজরত। কোরানের বাইরে ধর্ম নেই—খুদার সন্ধান নেই—সত্যের হদিস নেই। লেকিন হজরত, এক রোজ তামাম দুনিয়া আমার এই দুই চোখের সামনে বদলে গেল। হজরত, কোরানের বাইরে ধর্ম আর ইসলামের বাইরে যদি খুদা না থাকেন তবে ইসলামের ইলাকার বাইরের ইলাকা আছে কি করে হজরত? মাছ কি পানির বাইরে থাকতে পারে, না, মানুষ থেকে তামাম জানবার যারা বাতাসে নিশ্বাস নেয় তারা কি বাতাস যেখানে নেই সেখানে বাঁচতে পারে? মচ্ছির কাছে পানি বা জানবার মানুষের কাছে হাওয়া বাতাস যা বিলকুল এই দিন দুনিয়া সুরয চাঁদ তারা এ সবের কাছে খুদা তাই। খুদা যদি শুধু মক্কার কাবা মসজেদে থাকেন আর মসজেদে মসজেদে থাকেন তবে তিনি কি আকারে আয়তনে এতই ছোট যে এর বাইরে নিজেকে বিস্তার করবার মত তাঁর আর আয়তন নেই?

কালো পোশাক-পরা ফকীর স্থিরদৃষ্টিতে সারমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর সঙ্গের লোকটি—সম্ভবতঃ তিনি তাঁর অনুগত কোন সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ ব্যক্তি—তিনি সারমাদের কথা শুনে চঞ্চল হয়ে উঠলেন। তাঁর কোষের তলোয়ারে যেন কিছুটা নাড়াচাড়ার শব্দ উঠল। সে শব্দ শুনে কালো আলখাল্লা-পরা ফকীর চকিত হয়ে মুখ তুলে সঙ্গীর দিকে তাকালেন। শব্দটা স্তব্ধ হয়ে গেল। লোকটি স্থির হলেন।

সেদিন কথাবার্তা যখন হচ্ছিল তখন রাত্রিকাল, রাত্রিও অনেকটা হয়েছে। কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমী কি অষ্টমী, দশ দণ্ড অর্থাৎ প্রহরের ঘণ্টা

শহরের ঘড়ি ঘরে বেজে গেছে কিছুক্ষণ আগে। পূর্ব দিগন্তে চন্দ্রোদয় হচ্ছিল। সেই দিকে তাকিয়ে সারমাদ হঠাৎ বলে উঠলেন—হজরত, বলুন তো এই যে চাঁদ উঠছে আকাশে এ কি মুসলমান হো আর না হো সমস্ত দুনিয়ার মানুষের কাছে ঠিক একই রকম দেখাচ্ছে না? হজরত, এ কথা ঠিক যে কিছু মানুষ দেখতে পায় না; যারা অন্ধা তারা পায় না আর যারা বে-মুসলমানও ঠিক এই রকম দেখে বলে দরওয়াজা জানালা বন্ধ করে দেয় তারা পায় না। হিন্দুদের মধ্যেও এমন লাখো লাখো আদমী আছে। আপসোস কি বাত্, যে মুলুকেই যাই দেখি কোথাও আছে ইহুদী কোথাও আছে কেরেস্তান কোথাও আছে মুসলমান কোথাও আছে হিন্দু—হিন্দুদের মধ্যে আছে আবার হাজারো জাত। হজরত, নেই কেবল মানুষ। যা আল্লা খুদাতায়লা পয়দা করেছিলেন।

কালো আলখাল্লা পরা ফকীর বললেন—হজরত, একটা কথা বলব আপনাকে?

—ফরমাইয়ে হজরত!

—আপনি আরও দূরে গভীর বনে নির্জনে চলে যান। যেখানে হিন্দু মুসলমান নেই—মানুষ নেই!

—আমি কি অন্যায় বলেছি হজরত? আমার এই ভাওনা এই চিন্তা এসব ঝুট্? আমি মিথ্যা বলছি?

—না হজরত। তা আমি কখনও বলব না।

—তবে?

কালো আলখাল্লা পরা ফকীর বললেন—আপনি যা বলেছেন হজরত তার থেকে সত্য কথা আর হয় না। লেকিন হজরত, আফতাপ সূরয যেমন ওই দূরে আকাশে আছেন বলেই সহ্য হয়—আমরা বেঁচে থাকি—কাছে এলে যেমন পুড়ে ঝলসে যাব তেমনি ভাবেই এ সত্যকে মানতে গেলে কলেজা ঝলসে যাবে; তা ছাড়া হজরত হয়তো এ দেশেব কড়োর কড়োর মানুষের মধ্যে আমরা হারিয়ে যাব।

আপনি এ মুল্‌ক থেকে নির্জনে চলে যান। যে কথা আপনি সমঝেছেন তা আপনার কলেজাতেই রাখুন। না হলে হয়তো বিপদ ঘটবে হজরত। আমাদের এখানকার সুলতান আপনার কথা জানেন। তু তিন দিন গোপনে ছদ্মবেশে এসে আপনার কথা শুনে গেছেন। অভয়চান্দের গান শুনে গেছেন। আপনার আগের নামও তিনি জানেন। আবেস্তায় আপনি রুবানি—কুরানে আপনি বড় ভারী মৌলবী তাও জানেন। আপনার ধরম আপনার বাতের তারিফ তিনি করেন—সমঝদারও বটেন। তিনি যদি মসনদ ছাড়তে পারতেন তবে তিনি আপনার পিছনে পিছনে শিষ্যের মত ঘুরতেন। কিন্তু সুলতান তা পারবেন না। দিল্লীর মসনদে আকবরশাহীর আমল আর নেই। বাদশা শাহ সাহজাহান ইসলামের মেহদী; কড়া মেজাজের লোক। তাঁর তৃতীয় ছেলে শাহজাদা ঔরংজীব খুব গোঁড়া। সুলতান এঁদের হাত থেকে আপনাকে তো রক্ষা করতে পারবেন না। আপনি নির্জনে চলে যান। কোন হিন্দু রাজ্যেও যাবেন না। তারাও আপনাকে সহ্য করবে না। সুলতানই আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। এ অনুরোধ তাঁর—আমি শুধু বয়ে নিয়ে এসেছি মাত্র। তবে বলেও দিয়েছেন বরং দিল্লীর দিকে গেলে আপনি নিরাপদ হতে পারেন কারণ বাদশাহ সাহজাহান গোঁড়া হলেও বাদশাহের জ্যেষ্ঠপুত্র শাহবুলন্দ একবাল দারা সিকো উদারতম মুসলমান। খাঁটি মানুষ। তিনি হিন্দু পণ্ডিত মুসলমান মোল্লা মৌলবী কেরেস্তান পাদরী এদের নিয়ে এক নতুন ধর্ম যার মধ্যে তামাম তুনিয়ার মানুষ একসঙ্গে বিনা ঝগড়ায় বাস করতে পারে তার সন্ধান করছেন। আপনি চলে যান দিল্লীর দিকে। আপনার মত সত্য-দ্রষ্টাকে পেলে তিনি খুব খুশী হবেন।

সারমাদ বক্তার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলেন। সদ্য-ওঠা চাঁদের লালচে আলো বক্তার মুখের উপর পড়েছে। বক্তার কথা

শেষ হতেই সারমাদ বললেন—হজরত, আপনি হজরতও বটেন, সুলতানও বটেন। যা শুনেছিলাম তা মিথ্যে শুনি নি।

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বক্তা বললেন—হজরত, না—দুটোর কিছুই নই আমি। সত্যি করে একটাও হতে পারি নি। গোলকুণ্ডার মসনদ পেয়েছি—তাতে পিতার পুত্র হিসেবে বসেছি কিন্তু তাকে রক্ষা করবারও শক্তি নেই আমার। আবার বৈরাগ্য অন্তরে সত্যই আছে; এ সেই হোসেন গঙ্গুর আমল থেকেই আছে। কিন্তু নামেই আছে। কিন্তু পুরনো শালের মত জীর্ণ হয়ে গেছে। তাকে ব্যবহার করবার উপায় নেই। তুলে ধরলেই থস্ থস্ করে খসে খসে পড়ে যাবে।

আবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—দেখুন শাহজাদা ঔরংজীব আপনার খবর পেয়েছেন। তিনি একরকম শাসিয়েই পত্র লিখেছেন। আমি শক্তিহীন। আমার সিপাহসালার এবং উজীর মীরজুমলা আপনার দ্বারা উপকৃত। তা তিনি স্বীকাব করেন। কিন্তু আপনার এই বেমুসলমানীর উপর তাঁর গোস্সা অনেক। তাই—। লোক পাঠিয়ে আপনাকে এসব কথা বলতে আমার ভাল লাগে নি। ছদ্মবেশে রাত্রির পর নিজেই এসেছি।

হঠাৎ উঠে তিনি দাঁড়ালেন।

বললেন—হজরত, আমি আপনার কাছে বিদায় প্রার্থনা করছি। সালাম!

—সালাম আলায়কুম সুলতান! সুলতানের এই হুকুম—

বাধা দিয়ে ছদ্মবেশী সুলতান বললেন—হুকুম নয়, অনুরোধ। এ এক শক্তিহীন অপদার্থ সুলতানের আরজি হজরতের কাছে।

—এ আরজি আমার কাছে খুদ খুদার ফরমান। সারমাদ তা অবশ্য মান্য করবে।

কয়েক মুহূর্ত পর পথের উপর ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ বেজে

উঠল। সারমাদ দাঁড়িয়ে রইলেন পথের দিকে তাকিয়ে। চন্দ্রালোকের আবছায়ার মধ্যে ছুটি সওয়ার শহরের দিকে ফিরে চলেছে।

একটু চুপ করে থেকে সারমাদ যেন নিজে নিজেই বললেন—সুলতানকে সারমাদ বিপন্ন করবে না। কিন্তু সুলতান, সারমাদ তো মৃত্যুকে ভয় করে না। মৃত্যুকে যখন যেচে মানুষ বরণ করে তখনই তো সে দেখতে পায় তাঁকে, যাঁকে দেখা যায় না যাঁকে বোঝা যায় না যাঁকে জানা যায় না, সেই খুদাকে। হিন্দুর ভগবানকে।

পনেরো

আগ্রা থেকে দক্ষিণাবর্তের যে পথটি গোয়ালিয়র হয়ে বাঁদিকে অরণ্যসংকুল অঞ্চলকে রেখে চলে গেছে, এই ভূখণ্ডই বুন্দেলখণ্ড—বুন্দেলা রাজপুতদের বসতি ছিল। অতি প্রাচীন বংশ। রামায়ণের সূর্যবংশের থেকেও প্রাচীন বলে এদের দাবি। এরা শক্তিউপাসক, অপরাজিতা দেবী বিন্ধ্যবাসিনীর আশীর্বাদধন্য বংশ।

মির্জাপুরে গঙ্গাতীরে দেবী বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দির, তিনি চণ্ডীপুরাণের ভ্রামরীরূপে অরণ্যসংকুল পাহাড়ে অবস্থান করেন। এরা তাঁর উপাসক। সেই দৈত্যদের বংশধরেরা এখনও এই অঞ্চলে বন্য বর্বরের মত বাস করে।

শাহজাদা ঔরংজীবের আগ্রাগামী বাহিনী এই পথ ধরেই চলেছিল; বাদশাহী বাহিনী যে শৃঙ্খলায় এবং যে ধারায় চলে তার এতটুকু এদিক-ওদিক ছিল না। সুবিশাল না হলেও বাহিনীটি ছোট নয়।

প্রথমে চলেছে একদল সওয়ার। দ্রুতগামী অশ্বারোহী সেনা; পিঠে কোমরবন্ধে হালকা অস্ত্রশস্ত্র। তার পিছনে হাতী, তার পিছনে উট, উটের উপর তীরধনুক এবং বন্দুকধারী সিপাহী। তার পিছনে বড় বড় শক্তিশালী বলদে টেনে নিয়ে চলেছে কতকগুলো কামান। তারপর চারিদিকে অশ্বারোহী বাহিনীর ঘেরের মধ্যে বাদশাহী হারেম এবং খোদ মালিক চলেছেন হাতীর উপর। বেগমমহল চলেছে তাঞ্জামে। তার পিছনে আবার থাকে-থাকে সৈন্যদল এবং হাতী উট ও বয়েল গাড়িতে চলেছে শাহজাদার জিনিসপত্র। তাঁবু ইত্যাদি নিয়ে খান-ই-সামান এবং তার অধীনস্থ দারোগার দল চলে গেছে বাহিনীর আগে আগে। হুকুমমত তারা নির্দিষ্ট স্থানে তাঁবু গেড়ে ছাউনি প্রস্তুত করে শাহজাদার জন্য অপেক্ষা করবে।

শাহজাদা যে হাতীর উপর চেপে যাচ্ছেন সে হাতীটি একটি দুর্লভ

হাতী, সে হাতী তিনি গোলকুণ্ডার সুলতানের কাছে পেয়েছেন। হাতীটির নাম গজমতী। ভারতবিখ্যাত হাতী এটি। আগ্রায় তিনি যে উপঢৌকন নিয়ে যাচ্ছেন তার মধ্যে এই হাতীটি একটি দুর্লভ হাতী। উচ্চতায় সাধারণ হাতীর প্রায় দেড়গুণ। এবং তার দাঁত দুটি প্রায় আড়াই হাতের কাছাকাছি লম্বা—তেমনি সুডৌল ও সুগঠিত। এই গজমতীর মত হাতী এক লক্ষ টাকা দাম দিয়েও মেলে না। এবং সোনার হাওদা এবং ঝালর আছে, সোনার সিঁথি আছে—তার দামও এক লাখ। এর উপর নিজে সওয়ার হয়ে আসছেন দক্ষিণ থেকে, ঔরঙ্গাবাদ থেকে। পথে গোন্দরাজ্য অতিক্রম করে চলেছেন বুন্দেলাদের রাজধানী 'উর্চা'র দিকে। এই পথটিই তিনি নিজে পছন্দ করে নির্দেশ দিয়েছেন—"এই পথে যাব আমি আগ্রা!"

'দেওঘর', 'ছন্দা'র রাজাদের কাছে সংবাদ গেছে—তাঁরা তাঁর অভ্যর্থনা করেছেন যথোচিত—তাঁকে উপঢৌকনে তুষ্ট করেছেন। গোন্দরাজ্যের রাজধানী চৌরাগড়ে তিনি দরবার করেছিলেন। এখানে বিশ্রাম করে চলেছেন 'উর্চা'র দিকে। সেখানে রাজা দেবী সিং তাঁর অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করেছেন। সেখানে কয়েকদিন বিশ্রাম করে তারপর রওনা হবেন। শাহজাদা ঔরংজীব গম্ভীর স্বভাবের লোক। সেই লোক যেন আরও খানিকটা গম্ভীর হয়ে উঠেছেন। তাঁর তরুণ ললাটের মসৃণ গোলাপী আভার চামড়ায় সারি সারি কুঞ্চন রেখা ফুটে উঠেছে। এ রেখাগুলি তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এর আবির্ভাব হয় চকিতে আবার মিলিয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু এবারের আগ্রা যাত্রার প্রায় শুরু থেকেই তাঁর কপালের উপর দাগগুলি যেন বর্ষার আকাশের মেঘের ফালির মত জমেই রয়েছে।

এ লক্ষণ বড় শুভ নয়, অন্তত বেগমসাহেবারা থেকে সামান্যতম গোলাম পর্যন্ত শঙ্কিত এবং ত্রস্ত হয়ে আছে। শুধু খান-ই-খানান আতাউল্লা খাঁ খান-ই-দৌরান এবং খান-ই-জমান প্রমুখ কয়েকজন

প্রবীণ সেনাপতি যাঁরা আজ প্রায় আট ন বছর শাহজাদার সঙ্গে রয়েছেন এবং তাঁর সঙ্গে দক্ষিণ ভারতকে ধীরে ধীরে গ্রাস করে বা মুঠোর মধ্যে কবজা করে নিয়ে চলেছেন তাঁরা বুঝতে পারছেন কি চলছে শাহজাদার মনের মধ্যে। এই দক্ষিণেই বাদশাহ সাজাহানের সঙ্গে শাহজাদা ঔরংজীব তাঁর যোদ্ধা-জীবন আরম্ভ করেছেন; এখানেই প্রথম মনসব পেয়েছেন ষোল বছর বয়সে। তাঁরা বুঝতে পারছেন শাহজাদা কি ভাবছেন। এইসব মনসবদারেরা সেই তখন থেকেই আজ এই আট ন বছর ধরে ধীরে ধীরে দক্ষিণে এগিয়ে এগিয়ে চলেছেন। পিছন হটেন নি এক পা। সেই পাঠান স্থলতানশাহী থেকে এ পর্যন্ত এই হিন্দোস্তানে উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত এতটা এগিয়ে যেতে কেউ পারে নি। কেউ না।

আতাউল্লা খাঁ তাঁর ঘোড়ার উপর থেকে লক্ষ্য করছিলেন শাহজাদাকে। হাওদার উপর সেই এক ভঙ্গিতে বসে আছেন শাহজাদা। চোখের দৃষ্টি স্থির। বাঁ হাতখানির উপর থুতনিটি রেখে সামনে তাকিয়ে রয়েছেন। চোখের যেন পলক পর্যন্ত পড়ছে না।

নর্মদা এবং বিন্ধ্যপর্বতমালা অতিক্রম করেই বুন্দেলখণ্ড প্রবেশ করবেন। করবেন কেন, করেছেন। এই বুন্দেলখণ্ডের বুন্দেলা রাজপুত রাজা বীর সিং দেবের উপর বাদশাহের গোসা ফেটে পড়ল, যেমন করে আগুনের ফুলকি পড়লে বারুদের স্তূপ ফেটে যায় এক মুহূর্তে। বীর সিং দেব বাদশাহ জাহাঙ্গীর শাহের পিয়ারের আদমী ছিলেন। তার কারণও ছিল—বাদশাহ জাহাঙ্গীর যখন শাহজাদা —যখন বাদশাহ আকবর শাহ মসনদে বসে আছেন, তাঁর জিন্দিগীর মধ্যে শাহজাদা সেলিম আকবর শাহের পরম প্রিয়পাত্র খান-ই-খানান আবুল ফজলকে গোপনে হত্যা করিয়েছিলেন; তার কারণ তাঁর সন্দেহ ছিল খান-ই-খানান আবুল ফজল শাহজাদা সেলিমের উপর বিরূপ ছিলেন। এবং আরও সন্দেহ ছিল যে যাঁরা শাহজাদার বড় ছেলে

বাদশাহের পিতামহের পোতা শাহজাদা খসরুকে সিংহাসনে বসাবার পক্ষপাতী তাঁদের মধ্যে এই আবুল ফজল অগ্রগণ্যদের একজন। এই কারণে তিনি আবুল ফজল খান-ই-খানানকে গুপ্তহত্যা করিয়েছিলেন। বাদশাহ জালালউদ্দীন আকবর শাহ অচতুর ছিলেন না। তের চৌদ্দ বছর বয়সে বাইরাম খাঁর হাত থেকে হিন্দুস্তানের বাদশাহী কেড়ে নিয়েছিলেন সুকৌশলে। তিনি আবুল ফজলের জন্য যত মর্মাহত হয়েছিলেন তার অধিক দুঃখ পেয়েছিলেন—এই কাজ তাঁর পরম প্রিয় প্রথম পুত্রের। পীর সেলিম চিস্তির অনুগ্রহে আশীর্বাদে পেয়েছিলেন তিনি সেলিমকে। সেলিম তাঁর জীবনের 'চেয়ে প্রিয় ছিলেন। কিন্তু এ সন্দেহকে প্রমাণিত করবার মত নমুদ কিছু পান নি। নমুদ যা কিছু সব ছিল এই বুন্দেলা মনসবদার বীর সিং দেবের কাছে। বীর সিং দেব রাজপুত, তিনি কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করেন নি। আকবর শাহ যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন শাহজাদার সঙ্গে তাঁর কোন যোগাযোগ আছে এ পর্যন্ত দেখান নি।

শাহজাদা সেলিম বাদশাহ জাহাঙ্গীর হয়ে বীর সিং দেবকে অজস্র অনুগ্রহে ভূষিত করে এই বুন্দেলখণ্ডের একচ্ছত্র অধীশ্বর করে সিংহাসনে বসিয়েছিলেন। বীর সিং দেব চিরজীবন বাদশাহ জাহাঙ্গীরের অনুগত ছিলেন। এবং শাহজাদা খসরু বা খুরম এঁদের খুব গ্রাহ্য করেন নি। বাদশাহ জাহাঙ্গীরের জীবনকালে নিরুপদ্রবে এই বুন্দেলখণ্ডে রাজত্ব করে আলাদীনের ধনভাণ্ডার সঞ্চয় করে গিয়েছিলেন। উর্চাকে মনের মত করে সাজিয়ে গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর ধনভাণ্ডার তাঁর কেল্লার মধ্যে রাজকোষে লোহার সিন্দুকে জমা রাখতেন না তিনি। বুন্দেলাদের চিরাচরিত প্রথা—দৌলত সোনা চাঁদি হীরা জহরত সব মাটির নীচে বড় বড় কুঁইয়া বানিয়ে সেই কুঁইয়ার মধ্যে গেড়ে রাখতেন। তারপর সে কুঁইয়া মাটি দিয়ে আবার বন্ধ করে দিতেন। শুধু একটা সাংকেতিক চিহ্ন থাকত। রাজধানী

ভেঙেচুরে ধূলিসাৎ করে দিয়েও তার সন্ধান মিলত না। এবং দেশের তামাম লোকের বুকে বাঁশ দিয়ে ডলে তলোয়ার উঁচিয়ে কাটবার ভয় দেখিয়েও এই সব বন্ধকরা কুঁইয়ার সন্ধান মিলত না। কারণ এদের নিয়ম ছিল এই যে এ সন্ধান জানবে শুধু একজন। যিনি খোদ রাজা তিনি। এ কুঁইয়া যারা তৈরি করে তারা কেউ বেঁচে থাকে না, যারা দৌলত বয়ে নিয়ে গিয়ে বোঝাই করে তারাও দৌলতের বোঝার সঙ্গে মাটির নীচে গাড়ি থাকে; শুধু তাই নয় এর সন্ধান নিয়ে বেঁচে থাকেন শুধু একজন। তিনি নিজে রাজা। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর নির্বাচিত উত্তরাধিকারীকে এর সন্ধান দিয়ে যান। এর ফলে অনেক সময়ের অনেক গুপ্তধনের গুহা আজও অনাবিষ্কৃত।

বীর সিং দেব সামান্য সম্পদ নিয়ে রাজা হয়ে বাদশাহ জাহাঙ্গীরের অনুগ্রহে কোটি কোটি টাকা সঞ্চয় করে যান। কোন অনুগ্রহ প্রার্থনা করেই বীর সিং দেব কখনও বাদশাহ জাহাঙ্গীরের দরবার থেকে শূন্যহাতে ফেরেন নি। এমন কি সোনার কলস দিয়ে শ্বেতপাথরের আকাশছোঁয়া মন্দির তাও তৈরি করবার হুকুমত বীর সিং দেব বাদশাহ জাহাঙ্গীরের কাছে মঞ্জুর করিয়েছিলেন। শুধু বুন্দেলখণ্ডে উর্চাতেই নয় মথুরাতে পর্যন্ত মন্দির তৈরি করিয়েছিলেন বীর সিং দেব।

এইটে অসহ্য হয়েছিল মুসলমান মৌলভী মুল্লা এবং আমীরদের। ইসলামী বাদশাহীর এলাকার মধ্যে এ কি অনাচার!

খুদা কি এই অনাচার সহ্য করবেন? করেন?

ইসলামের বিধানেরই যদি এমন বেইজ্জতি হয়, কোরানের নির্দেশ যদি এমনিভাবে বরবাদ হয় তবে কি দরকার ইসলামী বাদশাহী নামের?

মনসবদারেরা এবং মৌলভীরা মনে মনে খুদার দরবারে আরজ জানাত—এয় খুদা, এর তুমি বিচার করো!

সেই বিচার হল! সেই বিচার থেকেই শাহজাদা ঔরংজীবের মনসবদারীর একরকম শুরু।

বীর সিং দেব মারা গেলেন, উত্তরাধিকারী নির্বাচিত করে গেলেন ছেলে ঝুঝর সিংকে। তখনও বাদশাহ জাহাঙ্গীর বেঁচে।

বাদশাহের মৃত্যুর পর শাহজাদা খুরম বাদশাহ সাজাহান হয়ে মসনদে বসেই পেলেন ঝুঝর সিংএর বিচারের সুযোগ। বাদশাহ এ-সবের বিচার করবেন বলেই ঝুঝর সিংএর উপর পরওয়ানা জারি করলেন—"হিন্দোস্তানের বাদশাহ দিন দুনিয়ার মালিক শাহ-ইন-শাহ আবুল মুজাফর সিহাবউদ্দীন মহম্মদ শাহজাহান পাদশাহ গাজীর হুকুমত এই যে বুন্দেলখণ্ডের রাজা ঝুঝর সিং বুন্দেলা যেন বাদশাহের বিনা হুকুমতে রাজধানী আগ্রা থেকে বাইরে কোথাও না যান। ঝুঝর সিং বুন্দেলার কাছ থেকে বাদশাহ গাজীর অনেক কিছু জানবার আছে; কৈফিয়ত নেবার আছে।"

ঝুঝর সিং বুন্দেলা বীর সিং দেবের ছেলে। তাঁর বাপ বুন্দেলখণ্ডের গভীর বনের ভিতরে ভিতরে কুঁইয়া খুঁড়ে ক্রোড় ক্রোড় টাকা রেখে গিয়েছেন। তাঁর রাজধানী উর্চাতে মজবুদ কিল্লা তৈয়ার করেছেন। ফৌজ পল্টন গড়েছেন, তোপখানা তৈয়ার করেছেন। তার উপর সারা জাহাঙ্গীরশাহীর আমলে আপন ইচ্ছেমত যা খুশি করেছেন। জাহাঙ্গীর পাদশাহের কাছে সাত সাত খুন করলেও ঝুঝর সিংয়ের মাফ ছিল। তিনি নতুন বাদশাহের হুকুমত পেয়েই বুঝেছিলেন বাদশাহ তাঁকে আগ্রাতে বন্দী করবেন। তারপর একে একে তাঁর কাছে আদায় করবেন পহেলে দৌলত, তার বাদ চাইবেন হয়তো বুন্দেলা রাজপুতের বেটী! বলবেন—"ভেজো বাদশাহী হারেমে তোমার ঘরের সব থেকে ভাল বেটীকে।" ঝুঝর সিং তা মানতে রাজী হতে পারেন নি মনে মনে। তিনি একদিন রাত্রে আগ্রা থেকে বেরিয়ে পালান, গিয়ে হাজির হন উর্চায়। এবং সঙ্গে সঙ্গে তৈয়ার হতে শুরু করলেন।

বাদশাহ সাজাহানের বাদশাহীতে বুন্দেলখণ্ড জয় করতে বের হওয়াই প্রথম বাদশাহী অভিযান। আগ্রা থেকে দক্ষিণমুখে। বুন্দেলখণ্ডের প্রথম কিল্লা ইরিচ কিল্লা জয় করলেন পঁয়ত্রিশ হাজার ফৌজ নিয়ে। বুন্দেলা ঝুঝারের ফৌজ পনের হাজার। তবু লড়েছিল। এক ইরিচ কিল্লা লড়াইয়েই দু দু হাজার বুন্দেলা লড়ে জান দিয়েছিল। আতাউল্লা খাঁ সে লড়াইয়েও ফৌজের সঙ্গে ছিলেন, যারা প্রথম ইরিচ কিল্লায় ঢুকেছিল তিনি তার মধ্যে একজন। তিনি আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন যে বারো বরিষএর লেড়কা থেকে কম্-সে-কম্ আশী বরিষ-এর বুড়া পর্যন্ত খোলা তলোয়ার হাতে মরে পড়ে আছে। আর সব মুর্দার জখম সামনের দিকে— বুকে নয়, কপালে নয়, পেটে। পিঠের দিকে জখম চোখে ঠেকে নি।

ঝুঝার সিং সেবার লাখো লাখো রূপেয়া জরিমানা দিয়ে মাফ নিয়েছিলেন। কিন্তু কিছু দিন পর আবার বাধল লড়াই। সেই লড়াইয়ে বুন্দেলখণ্ড অভিযানে শাহজাদা হয়েছিলেন দশহাজারী মনসবদার। শুধু তাই নয়, ঝুঝর সিংয়ের রাজধানী উর্চা দখল করে শাহজাদা উর্চায় রইলেন। ওদিকে ঝুঝর সিং তাঁর বাছাইকরা পল্টন আর তাঁর পরিবারবর্গ নিয়ে দক্ষিণ দিকে বনের মধ্য দিয়ে প্রথম এলেন ধামুনি কিল্লায়।

মুঘল বাহিনী তাঁর পিছনে ছুটেছিল। ছুটেছিল আক্রোশে এবং দৌলতের লোভ দুইয়ের জন্য!

হঠাৎ বাহিনীর সম্মুখভাগের গতি মন্থর হয়ে এল। সম্মুখে অরণ্যভূমি পাতলা হয়ে এসেছে। তার কারণ, সামনেই ঘন জঙ্গলের মধ্যে আশ্চর্য মনোরম একটি উপত্যকা। আয়তনে বেশ বিস্তীর্ণ, কোমল ঘাসে ঢাকা বৃক্ষহীন একটি স্থান—ঊর্ধ্বলোক এবং তিন দিক বেশ ঘেরা এবং ঢাকা; এক পাশে একটি পাহাড় থেকে নেমে

আসা ঝরনা। উত্তর দিকে ছোট একটি পাহাড়। এই উপত্যকা-ভূমিতে সারি সারি তাঁবু পড়েছে।

অগ্রগামী দল এসে সমস্ত ব্যবস্থা করে শাহজাদাকে অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। এইখানেই বিশ্রাম হবে। এক দিন দু'দিন নয়, চার দিন। অন্য মনসবদারেরা বলেছিলেন—এর থেকে বুন্দেলখণ্ডের রাজধানী উর্চায় গিয়ে কয়েক দিন বিশ্রাম করলে ভাল হত না?

সত্যই ভাল হত। যে শুনবে সেই বলবে ভাল হত। কারণ এই অরণ্যভূমের মধ্যে কি আছে? এখানে ওখানে কিছু বুনো জাত আছে এই মাত্র। তা ছাড়া কোন বসতি নেই। এই স্থানটিকে লোকে ভয়ও করে থাকে। বলে নাকি এখানে ঝুঝর সিংয়ের এবং তাঁর পরিবারবর্গের প্রেতেরা ঘুরে বেড়ায়।

ঠিক এইখানেই ঝুঝর সিং তাঁর রানী শিশুপুত্র এবং কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচরদের সঙ্গে নিয়ে মুঘলদের তাড়নায় ক্রমাগত পালাতে পালাতে উর্চা থেকে ধামুনি—সেখান থেকে এ-কেল্লা ও-কেল্লা করতে করতে দক্ষিণে পালাচ্ছিলেন। শেষ এই মনোরম স্থানটিতে একদিন এসে পৌঁছে নিজেকে নিরাপদ মনে করে এইখানটিতেই আশ্রয় নিয়েছিলেন। শুধু ঘোড়ার উপর সওয়ার হয়ে এসেছেন—সঙ্গে রাজার মত সাজসরঞ্জাম কিছু নেই। শুধু সঙ্গে এনেছিলেন কিছু সোনা আর হীরা জহরত—তাও ঘোড়ার পিঠের জিনের মধ্যে লুকানো ছিল। সেই জহরতের মধ্যে ছিল এক দুর্লভ রত্ন। যে রত্নটি ছিল তাঁর গৃহবিগ্রহ গোপালবিগ্রহের বুকের মণিহারের মধ্যরত্ন।

আহার্যের মধ্যে সঙ্গে ছিল কিছু তৈরী রুটি, কিছু জনার আর ভুট্টা। এখানে কয়েকটা উনোন তৈরি করে বনের কাঠ ভেঙে জ্বেলে তাকে সেঁকে গরম করে নিয়ে, ঘোড়াগুলোকে জনহীন বনের

গাছের ডালে বেঁধে ক্লান্ত দেহে এই উপত্যকাভূমের কয়েকটা বিভিন্ন পাথরের চত্বরে শুয়ে নিশ্চিন্ত নিদ্রায় ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। মুঘলের আক্রমণ সম্পর্কে ঝুঝর সিং সত্যই ভুল করেন নি। প্রধান সৈন্য-দলকে অন্য দিকে অন্য পথে অন্য সেনাপতির নেতৃত্বে রওনা করে দিয়ে মাঝখান থেকে তিনি বেরিয়ে এসেছিলেন এই দিকের ঘুরপথে। এ পথ দুর্গম—কারণ এ পথে চলে শুধু বনের মানুষ। আর চলে জানোয়াররা—তাদের তিনি ভয় করেন নি বা করবার প্রয়োজন মনে করেন নি।

ভুল করেছিলেন।

সন্ধ্যার দিকে সূর্য যখন পশ্চিমে হেলে পড়েছে সেই সময় গোন্দজাতীয় কতকগুলি একেবারে আরণ্য মানুষ ঘোড়ার ডাক শুনে সবিস্ময়ে সন্ধানে সন্ধানে এই দিকে এগিয়ে আসে গাছের আড়াল থেকে এবং গাছের উপর থেকে; বীরসজ্জায় সজ্জিত এই যোদ্ধাদের এবং রত্নালংকারভূষিতা রানীকে দেখে তাদের আর বিস্ময়ের শেষ ছিল না। তার উপর এই দামী ঘোড়াগুলি!

তাদের বিস্ময়ের শেষ ছিল না।—এরা কারা? কে?

ভয়ের শেষ ছিল না। এরা তাদের এই অরণ্যরাজ্য কেড়ে নিতে এসেছে!

তাদের লোভের শেষ ছিল না। পশ্চিম দিকের সূর্যের লাল আলো বৃক্ষকাণ্ডের মধ্য দিয়ে এসে ঘুমন্ত মানুষগুলির বর্ম অস্ত্র এবং অলংকারের উপর পড়ে ঝলমল করছিল। এবং মানুষগুলির দেহ বর্ণ গঠন সবই তাদের একদিক থেকে ভীত করছিল—অন্যদিক থেকে প্রলুব্ধ করছিল। কিছুক্ষণ দেখে নিজেদের সঙ্গীসাথীদের ডেকে এনে তারা ঘুমন্ত এই নরনারীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রতিজনকেই হত্যা করে তাদের ঘোড়া থেকে সব ধনরত্ন অলংকার লুঠ করে নিয়ে উল্লাসে নৃত্য করেছিল। শেষ এখানেই হয় নি, ইতিমধ্যে মুঘলের অগ্রগামী

ফৌজী গুপ্তচরেরা ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে এই হত্যাকাণ্ডের সন্ধান পেয়ে এখানে এসে ঝুঝর সিংয়ের মাথা কেটে নিয়ে গিয়ে হাজির করেছিল মনসবদারের কাছে। মনসবদার পাঠিয়েছিলেন বাদশাহের কাছে।

শাহজাদা ঔরংজীব তখন উর্চায়। তিনি সেখানে খবরটাই পেয়েছিলেন। ঝুঝর সিংয়ের মুণ্ডটা চোখে দেখেন নি। কিন্তু পরে তিনি বার বার এই স্থানটায় লোক পাঠিয়েছেন। অতিবিশ্বস্ত অনুচর। যে অনুচর খান-ই-খানান আতাউল্লা খাঁ সাহেবেরও পরিচিত নয়।

আতাউল্লা খাঁ সাহেবকে তিনি কতবার বলেছেন এই বনের যারা গোন্দ বাসিন্দা—যারা সভ্যতার মুখ দেখে নি তাদের প্রধানদের সন্ধান করে তাঁর কাছে হাজির করতে। হাজিরও তিনি করেছেন, বন্ধ ঘরের মধ্যে একলা তিনি তাদের সঙ্গে কথা বলে বিদায় করে দিয়েছেন। কিছু বকশিসও দিয়েছেন—কিন্তু তিনি কি চান—কিসের খোঁজ করেন তা তিনি আতাউল্লা খাঁর কাছেও প্রকাশ করেন নি।

এবার আগ্রা যাত্রার সময় সেইখানে চার দিন বিশ্রাম করবেন এ খুবই অর্থপূর্ণ তাতে সন্দেহ নেই। এ সন্দেহ অবশ্য মনসবদারদের ঠিক জাগে নি তাও নয় আবার ঠিকই যে জেগেছে তাও নয়। তাঁরা অনেকেই ভাবছেন শাহজাদা ঔরংজীব ঝুঝর সিংয়ের মৃত্যুর স্থানটিতে একটা কিছু করবেন।

অন্ততঃ একটা ছোটখাটো মসজেদ !

* * *

ঠিক সন্ধ্যার মুখে শাহজাদা ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। একলা—যেন কিছু খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

ছাউনিটা এমনভাবে পড়েছে যে ঠিক মধ্যস্থলটি যেখানে বুন্দেলা

রাজপুত বীরেরা হত হয়েছিলেন সেখানটায় পড়েছিল শাহজাদার ছাউনি। ছই বেগমসাহেবার তাঁবু আর শাহজাদার তাঁবু। তার থেকে খানিকটা ছাড়িয়ে বাঁদীদের তাঁবু—বাবুর্চীখানা এইসব। তার থেকে সরে অনেক দূরে দূরে ঘন জঙ্গল যেখানে সেখানটা যথাসাধ্য পরিষ্কার করে ফৌজের ছাউনি পড়েছে।

শাহজাদা ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন উপত্যকার মধ্যে একটা পাথরের চত্বরের উপর। পিছনে খানিকটা দূরে দূরে ছজন বাদাকশানি দেহরক্ষী খোলা তলোয়ার নিয়ে শাহজাদার পদক্ষেপের সঙ্গে তাল রেখে নিঃশব্দে অনুসরণ করছিল। কোন রকমে যেন শাহজাদার বিরক্তি উৎপাদন না হয়।

হঠাৎ পিছন দিক থেকে এসে দাঁড়ালেন আতাউল্লা খান। দাঁড়ালেন নাশাকচীদের কাছে—সামনে শাহজাদার কাছে এগিয়ে গেলেন না। একজন নাশাকচী বেশ উচ্চকণ্ঠে খান-ই-খানানের নাম ঘোষণা করলে। শাহজাদা ঘুরে দাঁড়ালেন। আতাউল্লা খান এবার সসম্ভ্রমে অভিবাদন জানিয়ে এগিয়ে কাছে এসে আবার অভিবাদন করে বললেন—শাহজাদার নোকর এ সময়ে এসে কি শাহজাদার মেজাজ খারাব করে দিলে ?

—খান-ই-খানান আমার অন্তরঙ্গ ব্যক্তি। আমার এই অল্প বয়সে খান-ই-খানানের কাছে আমি অনেক শিক্ষা লাভ করেছি। বিরক্ত কি—ঠিক এই সময়টিতে যেন আপনাকেই মনে মনে কামনা করছিলাম।

অভিবাদন করে আতাউল্লা খান বললেন—এই নোকরের গোস্তাকী মাফি কিয়া যায় শাহজাদা, দীর্ঘক্ষণ ধরে একটা জিনিস লক্ষ্য করছি আমি। যখন আপনি আগ্রা যাবার জন্য এই পথ ধরে যাব বলে হুকুমত জারি করেছিলেন তখন এইটেই মনে হয়েছিল কি শাহজাদা যে পথে পথে উত্তর থেকে দক্ষিণ জয় করতে করতে রওনা হয়েছিলেন,

ঠিক সেই পথ ধরেই হুজুরআলি দক্ষিণ থেকে উত্তর জয় করবার দাগ এঁকে রেখে যাচ্ছেন।

একটু চমকে উঠলেন শাহজাদা। কিন্তু সে পলকের জন্য এবং সে আতাউল্লা খানও ঠিক ঠাওর করতে পারলেন না। শাহজাদা নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন—শাহবুলন্দ একবাল শাহজাদা দারা সিকো আমার বড় ভাই; আমাদের পিতা ভারতের শাহ-ইন-শাহের পিয়ারের পুত্র; হজরত বেগম আমাদের বড়ী বহেন জাহানআরার পরম প্রিয়পাত্র। তিনি অবশ্য আমার উপর অকারণে কিছু নারাজ। কিন্তু তা হলেও আমার মনে এ চিন্তা নেই আতাউল্লা খাঁ। তার জন্য এ চিন্তা আমার নয়। তার জন্যও এই পথ আমি আগ্রা ফেরবার জন্য বেছে নিই নি। তার একটা অন্য কারণ আছে।

আতাউল্লা খান চুপ করে রইলেন। কোন প্রশ্ন করতে নিজে থেকে আগ্রহ দেখালেন না। সেটা বেয়াদবি হবে নোকরের পক্ষে। হলেনই বা তিনি শাহজাদার শলাহকার—হলেন বা তিনি বয়সে নবীন। তবু শাহজাদা মনিব—তিনি তাঁর অধীনস্থ মনসবদার। তিনি তাঁর অধীন।

শাহজাদা ঔরংজীব তাঁর দিকে তাকিয়ে নিজেই বললেন—আপনার জরুর ইয়াদ আছে যে উর্চাতে বুন্দেলা রাজা বীর সিং দেব যে কাফেরী মন্দেল তৈরি করেছিল—যে মন্দেল ছিল বহুত উচা আর জলুস ছিল খুব, যার মাথায় বসানো ছিল সোনার কলস—যে কলস বহুত দূর থেকে ঝকমক করত রোদের ছটায়—। একটু থামলেন শাহজাদা।

আতাউল্লা খান সুযোগ পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে বললেন—জরুর ইয়াদ আছে। মুসলমান মাত্রেই সে মন্দেল দেখে কলেজায় দর্দ অনুভব করত। আপসোস করত, জাহাঙ্গীর শাহীকে গালি দিত। শাহজাদা আপনি মুসলমানের বুক থেকে সে দুঃখ দূর করেছেন। আপনি তাকে ভেঙে মসজেদ তৈরি করেছেন।

—হাঁ। ইসলামের খিদমতগারী করতেই মুসলমান দুনিয়ায় পয়দা হয় আতাউল্লা খাঁ। আমার সেই প্রথম খিদমতগারী। মুসলমান হিসেবে সেই আমার প্রথম কীর্তি। ঝুঝর সিংকে জয়—বুন্দেলখণ্ড থেকে দক্ষিণের রাজ্যগুলো জয়ের চেয়েও বড় কীর্তি এটা। আমার আব্বাজান হিন্দোস্তানের বাদশাহকে আমি আহ্বান করেছিলাম এই মসজেদে নামাজ পড়তে। তিনি খুশী হয়েছিলেন। ঝুঝর সিং নিজের সকল থেকে পিয়ায়ের রানী আর বাচ্চা ছেলেকে নিয়ে পালিয়ে এসে এখানে খতম্‌ হয়েছিল। কিন্তু তার অন্দরমহলে অনেক রাজপুত ঔরৎ ছিল যারা মরতে পারে নি। তাদের আমি ইসলামে দীক্ষা দিয়ে কাফেরী থেকে উদ্ধার করেছি। কিছু এই রাজপুত লেড়কীও পাঠিয়েছিলাম আগ্রার জন্যে। কিন্তু—।

চুপ করলেন শাহজাদা।

আতাউল্লা খাঁও নীরবে প্রতীক্ষা করে রইলেন।

কিছুক্ষণ পর শাহজাদা বললেন—কিন্তু তখন থেকে মধ্যে মধ্যে আমি একটা স্বপ্ন দেখি। কি স্বপ্ন জানেন? দেখি একটা বাচ্চা ছেলে—তার বুকে একটা জহরতের হীরের সঙ্গে আশ্চর্য বড় হীরে! সেই ছেলেটা আমাকে যেন ব্যঙ্গ করছে। মসকরা করে হাসছে।

আবারও একটু চুপ করে থেকে শাহজাদা বললেন—সে বলে কি জানেন? বলে তোমার মতলব হাসিল হবে না।

—মতলব হাসিল হবে না? এবার আতাউল্লা খাঁ আর আত্ম-সংবরণ করতে পারলেন না।

—হাঁ। আমার মনে একটা মতলব আছে আতাউল্লা খান। আছে এক মতলব। সে মতলব হল কোরান হদিসের হুকুমত আমি হিন্দোস্তানে জারি করব। হিন্দোস্তানের নাম বদলে ইসলাম-ই-স্তান করব আমি। মনে মনে আমি এর জন্যে অনেক কল্পনা করি। কিন্তু রাত্রে স্বপ্নে এই বাচ্চা মসকরা করে এই কথা আমাকে বলে। আমি শুনেছি ঝুঝর সিংয়ের পাটরানী তার ছেলের আগে ওই মন্দিরের এক

গোপালমূর্তি ছিল সেই মূর্তিটা বুকে বেঁধে নিয়ে রওনা হয়েছিল। তার বুকে ছিল এই জহরতের মালা আর এই দুর্লভ হীরা। স্বপ্নে আমি তাকেই দেখি। ওই মূর্তি ওই বাচ্চাকে যদি কোন মসজেদের সিঁড়িতে গাড়তে পারি তবে মতলব জরুর আমার হাসিল হবে। বর্তমানকে মেরে বদলে শেষ করা যায় আতাউল্লা খান—ভবিষ্যৎকে বদল করা বড় কঠিন কাজ। পয়গম্বর মদিনায় আর মক্কায় কত তকলিফ পেয়েছিলেন সে তো জানেন!

দু'বছর পর—১০৬০-৬১ হিজরীর বসন্তকাল। দক্ষিণাপথ থেকে আগ্রার পথে ঠিক আবার ওই বনের মধ্যে ওইখানটিতেই শাহজাদা ঔরংজীবের ছাউনি পড়েছিল। এবার বনের মধ্যে সেই জায়গাটিতে যেখানে গতবার শাহজাদা ঔরংজীব অপরাহ্নে দাঁড়িয়েছিলেন—পশ্চিমের সূর্যের আলোর লম্বা লম্বা ফালিতে আলোকিত বনভূমির যতটুকু দেখা যায় ততটুকু তন্নতন্ন করে খুঁজেছিলেন কিন্তু কিছু পান নি। সেইখানটি তিনি বাঁধিয়ে একটি চত্বর তৈরি করে রেখে গিয়েছিলেন; শাহজাদা নামাজ পড়েছিলেন সেইখানে বসে।

ঝুঝর সিংকে এইখানে বন্য আদিবাসীরা হত্যা করেছিল। তাঁর পাটরানী খুন হয়েছিলেন। কেউ কেউ বলে—না, খুন হন নি তিনি, নিজের শিশুপুত্রকে স্বহস্তে খুন করে নিজের বুকে নিজে ছুরি বসিয়ে খুন হয়েছিলেন নিজের হাতে। এইখানে শাহজাদা যেমন খুঁজেছিলেন একটি কষ্টিপাথরের তৈরী বালক দেবতার মূর্তি—যার বুকে বহুমূল্য রত্নহারের মধ্যমণি হিসাবে একটি দুর্লভ হীরার ধুকধুকি আছে—এবারও ঠিক তেমনিভাবে তিনি খুঁজে বেড়াচ্ছেন। গতবার খুঁজে কিছু পান নি; এখানকার আদিবাসী সর্দারদের ডেকে খোঁজ করেছিলেন কিন্তু তারা কোন খোঁজ দিতে পারে নি। অবিশ্বাস করুন বা না করুন বিশ্বাস শাহজাদা ঔরংজীব কাউকে করেন না। এক্ষেত্রেও করেন নি। তবে এই বন্য জাতির মানুষেরা যে যুক্তি দেখিয়েছে তার খণ্ডন তিনি করতে পারেন নি।

তারা বলেছিল—শাহজাদা তো জানেন আমাদের লোকেরা বনের ভিতর ঝুঝর সিং তার রানী তার লেড়কা আর তার সঙ্গের লোকদের ঘুমুতে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল। তাদের মত চেহারা—তাদের মত পোশাক—তাদের গায়ের গহনার মত গহনা—গাছে ঝোলানো

তাদের হাতিয়ারের মত হাতিয়ার—গাছের ডালে বাঁধা তাদের ঘোড়ার মত ঘোড়া তো কখনও দেখে নি। সন্ধ্যাবেলা পচ্ছিম আসমানের সূরয ঠাকুরের লাল আলো এখানটায় এসে পড়ে। বনের ভিতরে অন্য জায়গায় পড়ে না কিন্তু এ জায়গাটায় পড়ে। সেই আলো পড়ে ঝলমল করছিল। তারা দেখে লোভ সামলাতে পারে নি, দল বেঁধে এসে এক একজন এক একজনের বুকে চেপে ছুরি বসিয়ে খুন করে খতম করেছিল। পাপ বাছে নি। ধরম মানে নি। কিন্তু তুনিয়ার মালিক একজন তো আছেন। তিনি তো সব দেখেন। দেখেছিলেন তিনি সব। এবং সঙ্গে সঙ্গেই তার বিহিত করেছিলেন। ইশারা দিয়ে এনে হাজির করে দিয়েছিলেন বাদশাহী ফৌজ আর মনসবদারকে। তারা সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক ঘিরে আক্রমণ করেছিল এই সব পাপী লুণ্ঠনকারীদের। তাদের সকলকে কেটে মনসবদার নাসিরৎ খাঁ যা কিছু পেয়েছিল নিয়ে চলে গেছে। ঘোড়া থেকে শুরু করে তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ পর্যন্ত খুলে নিতে ভোলে নি। এমন কি রানীজীর মৃতদেহটাকেও আবরণহীন উলঙ্গ অবস্থায় ফেলে গিয়েছিল। তারা তো এর পর ভয়ে কেউ কয়েক দিন আসে নি এদিকে। শুধু কয়েক দিন কেন আজও পর্যন্ত সাধ্যসত্ত্বেও কেউ এদিক মাড়ায় না।

কথাগুলির একটিও মিথ্যা নয়। একথা শাহজাদা খুব ভাল করে জানেন। তার কারণ আছে। 'উর্চা' বুন্দেলা ঝুঝর সিংয়ের রাজধানীতে সোনার কলসওয়ালা গোবিন্দজীর মন্দির তিনি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তোপ দাগিয়ে উড়িয়েছিলেন। অনেক হিসাব করে কাজ করেছিলেন। লড়াইয়ের প্রথম দিকে রেখেছিলেন তিনি হিন্দু কাফির সিপাহীদের। বুন্দেলাদের তুশমন হিন্দু রাজপুত রাজাদের ডেকে বলেছিলেন—"নাও, আজ তোমরা বদ্‌লা নাও। তোমাদের দিন আজ এসেছে। আপলোগোঁ কি দিন আ গেয়া। বদ্‌লা লে লিজিয়ে। উর্চা তোপ দেগে উড়িয়ে দিন, গুঁড়িয়ে দিন।"

তরুণ শাহজাদার বয়স তখন পনের পার হয়ে ষোলোতে পড়েছে, কিন্তু মগজ তাঁর সাফা ছিল—পঞ্চাশ বছর বয়সের পাক্কা আদমীর মত, উজীর বাদশাহের মত। সেই বয়সেই তিনি উর্চার ইতিহাস মনে রেখে বিচার করে বুঝেছিলেন বাদশাহ জাহাঙ্গীরের অবাধ অপার অনুগ্রহের প্রশ্রয় পেয়ে বীর সিং দেব তাঁর দীর্ঘ রাজত্বকালে নিজের স্বজাতি জ্ঞাতিদের পীড়িত করে তাদের ধনরত্ন লুঠ করে তাদের মেরে কেটে তাদের ঔরৎ লুঠে এনে উর্চাকে সাজিয়েছেন নিজের প্রতাপ বাড়িয়েছেন—ঠিক ততখানি পরিমাণ আক্রোশ হিংসা সুদে আসলে দ্বিগুণ হয়ে জমা হয়ে আছে এই সব প্রতিবেশীদের মধ্যে। এরাই সব থেকে কঠিন আক্রোশে লড়বে। তিনি জানতেন যে, সে আক্রোশ এমন কঠিন এমন ভীষণ হিংস্র যে তার কাছে কোন বাধাই বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। না ধর্ম, না জ্ঞাতিত্ব ; না কোন বিধি, না কোন বিধান—কিছু না, কিছু না। এবং তার সঙ্গে এইটেও জানতেন যে এরা মন্দির পর্যন্ত ভাঙবে কিন্তু দেবতা ভাঙবে না। তবে হ্যাঁ, চুরি করে বাঁচাতে পারে দেবতার পবিত্রতা।

সেই কারণে তাদের সামনে রেখে উর্চার উপর তোপ দাগিয়ে কেল্লার বুরুজের সঙ্গে বড় বড় বাড়ি এবং তার সঙ্গে মন্দিরের চূড়া ভাঙিয়ে শহরে ঢুকেছিলেন। মন্দির ভাঙার পর পাথরের পুতুলগুলো ভাঙার কাজ তিনি এর পর অতি বিশ্বস্ত মনসবদার দিয়ে করিয়েছেন। তিনি শুনেছিলেন এই রত্নহারের কথা, এই ধুকধুকির কথা—তার সঙ্গে এই বাচ্চা ভগবান বিগ্রহের কথা। ঐ বাচ্চা নাকি হাতে পত্থলের লাড্ডু নিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে আছে। আর এই বাচ্চা ভগবানই নাকি বুন্দেলাদের সব থেকে প্রিয় দেবতা। সব থেকে বেশী খাতির তার। রানীরা নাকি এই বাচ্চা ভগবান পুতুলটাকে নিয়ে আপন ছেলেকে যেমন আদর করে সাজায় গোজায় খাওয়ায় পরায় তাই করে। এ নাকি তাদের সঙ্গে কথা কয়। কিন্তু আশ্চর্য, শাহজাদা সব পুতুলগুলো পেয়েছিলেন, পান নি কেবল এই পুতুলটাকে। এই

এই পুতুলটাই নাকি বীর সিং দেবের সব সৌভাগ্যের মূল। এরই সমাদর নাকি সব থেকে বেশী। ওই বড় মন্দিরে আরও সব বড় পুতুলের মাঝখানে ছিল তার সোনার সিংহাসন। কালো কুচকুচে কষ্টিপাথরের একটা বাচ্চা ভগবান।

ছেলেটাকে তিনি স্বপ্নে দেখেন—সে একটু দূরে দাঁড়িয়ে দুষ্ট ছেলের মত হাসে আর বলে—মতলব হাসিল হবে না। বুকে তার এখনও দেখতে পান সেই দুর্লভ হীরার ধুকধুকি। তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন কিন্তু বেশ বুঝতে পারেন যা দেখছেন তা সত্য নয় তা স্বপ্ন—নিছক স্বপ্ন—সম্ভবতঃ ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়তে পড়তে আধো নিদ্রা আধো জাগরণের মধ্যে ভেসে ওঠে ছবি, তিনি অস্ত্র খোঁজেন, সে হেসে মিলিয়ে যায় ঘুমও ভেঙে যায়। কোন কোন দিন চীৎকারও করে ওঠেন—বেতমিজ! বদমাশ! শয়তান! বলতে বলতে জেগে উঠে লজ্জিত হয়ে পাশের বিছানায় নিদ্রাতুরা বেগমকে চেয়ে দেখেন।

আজ প্রায় আট বছর দক্ষিণে দাক্ষিণাত্যের সুবাদার হয়ে তাঁর কাটল। এর ঠিক প্রারম্ভেই ঘটেছে এই ঘটনা। বুন্দেলখণ্ডে উর্চা জয় তাঁর প্রথম যুদ্ধজয়। এই আট বছরের মধ্যে আরও অনেক যুদ্ধ তিনি করেছেন। তাঁর পিতা স্বয়ং বাদশাহ সাজাহান এসে দক্ষিণ দিকে মুঘল অধিকার আরও খানিকটা এগিয়ে দিয়ে তাঁকে ভার দিয়ে আগ্রা ফিরেছিলেন। এই আট বছরের মধ্যে শাহজাদা ঔরংজীব নিজামশাহী সুলতানের রাজ্যের অধিকাংশই খাস করেছেন। হায়দ্রাবাদের কাছে ঔরঙ্গাবাদ শহর পত্তন করেছেন; এবং সেই শহরই হয়েছে সুবা দাক্ষিণের মুঘল রাজধানী। এখান থেকে যতবার আগ্রা গিয়েছেন বাদশাহের কাছে নজর নিয়ে সালামত জানাতে ততবার তিনি এই পথে এই জায়গাটি হয়ে গিয়েছেন। দু'বছর আগে সেবার রাত্রে একটা ঘটনা ঘটেছিল। তাঁর তাঁবু এবারও যেখানে আছে সেবারও ঠিক সেইখানে গাড়া হয়েছিল।

সামনে ছিল ওই বাঁধানো চত্বরটি। হঠাৎ মধ্যরাত্রে সেবার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল তাঁর। চমকে উঠে তিনি জেগে উঠেছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল কে যেন খিলখিল করে হেসে উঠল। তিনি চমকে জেগে উঠে বসে স্থির হয়ে কান পেতে শুনেছিলেন।

শুনতে পেয়েছিলেন সেই হাসি আবার যেন কেউ হেসে উঠেছিল। শাহজাদা ঔরংজীব দুর্ধর্ষ দুঃসাহসী। বারো বছর বয়সে পাগলা লড়াইয়ে-হাতী সুধাকরের সঙ্গে একলা লড়াই করেছিলেন। বাদশাহ ভেবে পান নি কি করবেন—তাঁর ভাই শাহ বুলন্দ শাহজাদা দারা সিকো পালিয়ে বেঁচেছিলেন। সুজা মুরাদ তাঁরাও পালিয়েছিলেন কিন্তু শাহজাদা ঔরংজীব পালান নি। ঘোড়াটা পালাতে চাচ্ছিল—কিন্তু বাঁ হাতে শক্ত মুঠোয় লাগাম ধরে তাকে খাড়া রেখে ডান হাতে তাঁর বর্শা উদ্যত করে আক্রমণোদ্যত সুধাকরের কপালে ছুঁড়ে বিদ্ধ করেছিলেন। সুধাকর তাঁর ঘোড়াটাকে জখম করেছিল—শাহজাদা লাফিয়ে মাটিতে দাঁড়িয়ে তাঁর তলোয়ার খুলে সেই বিশালকায় মেতে যাওয়া আহত ক্রুদ্ধ হাতীটার সঙ্গে দ্বিতীয় দফায় বোঝাপড়ার জন্যে তৈয়ার হচ্ছিলেন। এবার সুজা এসেছিলেন ছুটে কিন্তু ঘোড়াটা শিরপা করে দাঁড়িয়ে সুজাকে ফেলে দিয়েছিল—মুরাদও আসতে চেষ্টা করেছিলেন। রাজপুতরাজা মহারানা জয় সিংও এসেছিলেন এগিয়ে, ওদিক থেকে হাউইবাজিতে আগুন দিয়ে সুধাকরের দিকে ছোঁড়া হয়েছিল এবং সুধাকরও পালিয়েছিল কিন্তু শাহজাদা ঔরংজীব ঠিক সেই নিজের জায়গায় তলোয়ার ধরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ভয় তিনি কাউকে বা কিছুকে করেন না। তিনি শাহ বুলন্দ ইকবাল দারা সিকো, বাদশাহ সাজাহানের পিয়ারের জ্যেষ্ঠপুত্র নয়নের মণি নন। জীবনের জন্য তিনি ছুটে পালান না। তিনি লা-ইলাহি-ইলাল্লা খুদাতায়লার খিদমতগার গোলাম, তিনি পয়গম্বর রসুল মহম্মদের নোকর, তার বেশী কিচ্ছু না। তিনি দারা সিকোর মত মহান নন—তাঁর মত তিনি অনুভব করেন না যে খুদার কৃপা তাঁর মধ্যে স্ফুরিত হচ্ছে। দিব্যদৃষ্টিতে

তিনি সব দেখতে পাচ্ছেন—ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান। তিনি তাঁর মত হিন্দু মুসলমান ইহুদী খ্রীষ্টান সব ধর্মের পয়গম্বর হয়ে জন্মান নি। তিনি শুধু খুদার নোকর—পয়গম্বরের গোলাম; তবে তিনি ভীরু নন—ভয় কাউকে করেন না। যা করেন যা পারেন তা শুধু নিজের কলিজার সাহসে আর দুখানা হাতের কিম্মতে করেন—আপন মগজের বুদ্ধি বিবেচনার সাহায্যে করেন। শাহজাদা দারার মত ওঝা নিয়ে সাধু নিয়ে মন্ত্রতন্ত্র ঝাড়ফুঁক করে কিছু করেন না।

শাহজাদা ঔরংজীব সন্তর্পিত পদক্ষেপে উঠে এসে তাঁবুর দরজার পর্দা খুলে একটু পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে দেখলেন। মনে হল একটা ছায়ার মত একটা কিছু যেন গাছের কাণ্ডের সঙ্গে মিশে বা ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হাসিটা উঠছে যেন ওখান থেকেই। যেন ওই ছায়াময় কায়াটাই হাসছে। স্থিরদৃষ্টিতে দেখতে দেখতে ভ্রম ভাঙল—ওটা কায়া নয়, ছায়াই বটে। আর হাসি—ঠিক হাসি নয়, পাখীর ডাক।

বাইরে এসে দেখেছিলেন তাঁবুর দরজার খোজা প্রহরীরা স্থির মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে। প্রতি তাঁবুর দরজায় দুজন হিসেবে। তারা এত গভীর রাত্রে শাহজাদাকে দেখে বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল। অভিবাদন করেছিল কিন্তু প্রশ্ন করতে সাহস করে নি। তিনিই প্রশ্ন করেছিলেন ওই ছায়া তারা দেখেছে কি না এবং ওই হাসি তারা শুনেছে কি না! তারা অভিবাদন করে বলেছিল—কই আলিজা—কই এমন কিছু তো দেখি নি। কই, কোথায়? আর পাখীর ডাকই তারা শুনেছে—মানুষের হাসি বলে তো তাদের মনে ভ্রম হয় নি!

শাহজাদা ভ্রূ কুঞ্চিত করে ফিরে এসেছিলেন তাঁবুর মধ্যে। বিছানায় শুয়ে পড়েও কিন্তু আর ঘুম আসে নি; সারা রাত জেগে শুধু ওই কথাই ভেবেছিলেন। পরের দিন ওই গাছের কাণ্ডটাকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তিনি পরীক্ষা করে দেখেছিলেন। দেখেছিলেন—ভ্রম হবার

কথা বটে। গাছটার কাণ্ডটার গঠনভঙ্গি বিচিত্র। মনে হচ্ছে যেন এই কাণ্ডটার মধ্যে একটা বাচ্চা ছেলে লুকিয়ে আছে। গাছটা আপনার ত্বক দিয়ে তাকে অতি সাবধানে লুকিয়ে রেখেছে। তবুও মানুষের অবয়বের মত একটা কিছু বুঝা যায়। স্থূলদৃষ্টি মানুষেরা অনেক কিছু দেখতে পায় না। এটাও পায় নি। তিনি গাছটা কেটে ফেলতে হুকুম দিয়েছিলেন। গাছটা কেটে তাকে চেলা করে দেখেও তৃপ্তি হয় নি। গাছটার মূল পর্যন্ত উপড়ে ফেলবার হুকুম দিয়েছিলেন। এবং সেই জায়গায় ওই নামাজ পড়বার চত্বরটা বানিয়ে গিয়েছেন।

সেবার আগ্রায় বাদশাহের দরবারে তাঁর উপঢৌকন দিয়ে বাদশাহের খুশী মুখ দেখে কয়েক মাস পর আবার ফিরেছিলেন ঔরঙ্গাবাদ। ফেরার পথে আবার এই পথে এইখানটিতে ছাউনি ফেলেছিলেন। এবারও তিনি অনেক ঘুরেছেন আশেপাশে। এবং বিস্ময়ের কথা—নামাজ পড়বার সময় বার বার তাঁর ভ্রম হয়েছে। আরও কয়েকটা গাছের কাণ্ডের মধ্যে তেমনি ধরনের একটি মানুষের আকার আভাসে দেখা দিতে শুরু করেছে। একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা—না আরও বেশী, গুনে পেয়েছিলেন দশটা।

এবার আগ্রা চলেছেন চতুর্থবার। অনেক উপঢৌকন নিয়ে চলেছেন তিনি। এই আট বছরের মধ্যে তিনি সাতহাজারী মনসব থেকে পনেরহাজারী মনসবদারীতে উন্নীত হয়েছেন। দাক্ষিণাত্যে তিনি তাঁর যোগ্যতা প্রমাণিত করে এসেছেন। বিজাপুর গোলকুণ্ডার সুলতানদের এলাকা তাঁদের রাজ্য শুধু নামেই আছে। শাহজাদা ঔরংজীব তাঁর কূটনীতির চালে চালে এবং তাঁর শক্তির ওজনে গতিতে যোগ্যতায় দক্ষিণের ঘন বনের বাসিন্দা বিরাটকায় শেরের থাবার তলায় ধরা জানোয়ারের মত করে রেখেছেন। ইচ্ছা করলে এক মুহূর্তে তাকে তিনি শেষ করে দিতে পারেন। এই হিসাব নিয়ে দাখিল করতে যাচ্ছেন তিনি আগ্রার শাহানশাহী দরবারে। তিনি দেখতে চান বুঝতে চান বাদশাহের বিচারকে।

কিছুদিন আগে তাঁদের জ্যেষ্ঠ শাহজাদা দারা সিকো কান্দাহারে ইরানী আক্রমণ রোধ করবার জন্য ফৌজ নিয়ে যাচ্ছিলেন। এই প্রথম নয়, এই দ্বিতীয়বার। ভাগ্যবান শাহজাদা দারা সিকো। প্রথমবার ইরানী ফৌজ নিয়ে ইরানের শাহ হিন্দুস্তানের বাদশার সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হবার উদ্যোগ করছেন—যাত্রা শুরু করেছেন এমন সময় ইরানের পশ্চিম দিক থেকে তুর্কী আক্রমণের সংবাদ আসায় তিনি উলটোমুখে ফিরেছিলেন। শাহজাদা দারা সিকো যুদ্ধ না করেই বিজয়ী হয়ে ফিরে বিজয়ীর সম্মান লাভ করেছিলেন বাদশাহের কাছে। দ্বিতীয়বার অর্থাৎ এবারও সেই সদয় ভাগ্য শাহজাদা দারা সিকোকে বিনাযুদ্ধে বিজয়ীর সম্মান দিয়েছে। সৈয়দ খানজাহান, রুস্তম খান বাহাদুর, মির্জারাজা জয় সিং, রাজা যশোবন্ত সিংকে নিয়ে শাহজাদা যাত্রা করেছিলেন লাহোর থেকে। মূলতানের সুবাদার সৈয়দ খান বাহাদুর এবং কাবুলের মনসবদারদের কাছে ফরমান গিয়েছিল —তোমরা ফৌজ নিয়ে এগিয়ে চল কান্দাহার। শাহজাদা তাঁর ফৌজ নিয়ে চলেছিলেন খুরাসানের রাজধানী নিশাপুরের দিকে। নিশাপুরের দিকে এগিয়ে আসছে ইরানী ফৌজ নিয়ে ইরানের শাহের সিপাহসালার রুস্তম খাঁ গুরজি। শাহজাদা বহু ফকীর বহু কাফির গণক আর ওঝাদের কবচ তাবিজ নিয়ে অনেক তুকতাক করিয়ে অগ্রসর হচ্ছেন রুস্তম খাঁকে বাধা দেবেন বলে, এমন সময় খবর এল খুদ ইরানের শাহের ইন্তেকাল হয়েছে। শাহ আর নেই। রুস্তম খাঁ শাহের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে তাঁর ফৌজের মুখ ফিরিয়ে চলে গেছেন রাজধানীর দিকে।

শাহজাদা দারা সিকো নাকি আস্ফালন করে ইরান আক্রমণ করতে চেয়েছিলেন। সিস্তান ফারা হিরাট দখলের আয়োজন করে বাদশাহের কাছে অনুমতি চেয়ে পাঠিয়েছিলেন। বাদশাহ সাজাহান তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র দারা সিকোকে যতই পেয়ার করুন তিনি এ অনুমতি তাঁকে দেন নি। এই হিন্দুস্তান মুলুকের আদমী তিনি—তিনি

জানেন কাবুল কান্দাহার সিস্তান ফারা কাশান খোরাসান অঞ্চল কি রকম অঞ্চল! এই সমতল আর সরস মুল্‌কের লোকেরা সেই বরফঢাকা পাহাড়ে অঞ্চলে একদম অকেজো হয়ে যাবে। বাদশাহ তৎক্ষণাৎ সওয়ার পাঠিয়েছিলেন এ আরজি নাকচ করে দিয়ে, তার বদলে হুকুম দিয়েছিলেন—"তুমি সৈন্যবাহিনী নিয়ে ফিরে এসো। খুদা মেহেরবান। তিনি যা দেবার তা দিয়েছেন। তুমি বিজয়ী হয়েছ। ফিরে এসো, আমরা উদ্‌গ্রীব হয়ে তোমার অপেক্ষা করছি। রুস্তম খান বাহাদুর ফিরোজজঙ্গ এবং সৈয়দ খান বাহাদুর জাফরজঙ্গকে তিরিশ হাজার সওয়ার ফৌজ নিয়ে গজনীতে মোতায়েন রেখে ব্যবস্থা করে মাসখানেকের মধ্যেই তুমি ফিরে আসবে।"

শাহজাদা দারা তাই করেছিলেন। শাহানশাহ লাহোর পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে বিনাযুদ্ধে বিজয়ী তাঁর প্রিয়তম পুত্রকে বিজয়ীর সম্মানে সম্মানিত করেছেন। মনসব দিয়েছেন—খেলাত দিয়েছেন—জায়গীর দিয়েছেন।

শাহজাদা ঔরংজীবের দুর্ভাগ্য—তিনি ঠিক তার কিছু দিন আগেই আগ্রা থেকে দাক্ষিণাত্যে চলে এসেছিলেন। তিনি এ দৃশ্য দেখতে পান নি। তিনি দেখতে পান নি শাহজাদা দারা সিকো যুদ্ধজয় করে কি লুঠে এনেছেন। কটা গজমতী হাতী কত সোনা কত দীনার কত রূপেয়া! কত সোনা রূপার বর্তন! কত জহরত! ইরানে গজমতী হাতী মেলে না, হাতীর দেশ সেটা নয়,—কিন্তু ঘোড়া? ইরানের পশ্চিম গায়ে ইরাক, আরব। আরবী ঘোড়ার তুল্য ঘোড়া পৃথিবীতে হয় না। শাহজাদা ঔরংজীব পড়েছেন মাসিডোনিয়ায় সেকেন্দারশাহ ছিলেন বিশ্ববিজয়ী বীর। তাঁর এক ঘোড়া ছিল—সে ঘোড়ার নাম ছিল 'বিউকেফেলাস্'; সে ঘোড়া ছিল আরবী ঘোড়া। খোরাসানের ঘোড়াও বিখ্যাত ঘোড়া। তাই বা কটা এনেছেন লুঠে দারা সিকো!

ইরানের দরিয়ার মুক্তা বিখ্যাত। সে মুক্তা কত এনেছেন দারা সিকো! তবে দারা সিকোর অভ্যর্থনা এবং অভিনন্দনের দৃশ্য ঔরঙ্গাবাদের প্রাসাদে বসে কল্পনায় যেন চোখে দেখেছিলেন।

শাহজাদা জানেন এ অভিযানে প্রিয়পুত্র দারা সিকোর জন্য কত অর্থ ব্যয় করেছেন। সবই শাহজাদা ঔরংজীবের নখদর্পণে। আগ্রা দিল্লীর দপ্তর থেকে এসব হিসাব তাঁর কাছে আসে। শুধু হিসাবই বা কেন, আগ্রা কিল্লার অন্দরমহল থেকে দরবার পর্যন্ত যেখানে যে কথা হয়, যে গোপন পরামর্শ হয়, সব—সব তাঁর কাছে গোপনীয় নিশান মারফত আসে।

আগ্রায় বহেন রৌশনআরা আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে তাঁর পক্ষের চক্র গড়ে বসে আছেন চক্রের কেন্দ্রে। তিনিই পাঠিয়েছিলেন লাহোরে শাহজাদা দারা সিকোর অভ্যর্থনা এবং অভিনন্দনের বিস্তৃত বিবরণ।

এবার তাই তিনি আবার একবার আগ্রা চলেছেন বাদশাহের দরবারে তাঁর দাক্ষিণাত্যে সুবাদারীর কৃতিত্ব এবং অনেক দৌলত নিয়ে; গিয়ে পেশ করবেন হিন্দুস্তানের মালেক-ই-মুল্‌ক বাদশাহ গাজী সাজাহানের দরবারে সর্বসমক্ষে, এবং দেখবেন বাদশাহ গাজী যিনি সূক্ষ্ম বিচারক তিনি কি বলেন—তাঁকে কি মনসব দেন! দেখবেন তিনি।

*　　　*　　　*

পথের মধ্যে ঝুঝর সিংয়ের জীবনের শেষ রক্তঝরা স্থানটিতে এবারও তাঁবু গেড়ে দু'দিন বিশ্রাম করবেন স্থির করেছেন। এবারও সঙ্গে আছেন আতাউল্লা খাঁ। ঔরঙ্গাবাদে মাতুল সায়েস্তা খাঁকে তাঁর প্রতিনিধি রেখে নিশ্চিন্ত হয়েই তিনি চলেছেন। মাতুল সায়েস্তা খাঁ তাঁর প্রতি সত্যই অনুরক্ত।

গভীর রাত্রে শাহজাদা জেগে বসে আছেন। বসে আছেন—যদি কোন ইশারা পান। এই তো আগ্রা রওনা হবার মতলব করার

দিন থেকে আজ পর্যন্ত সেই বাচ্চাকে যে কতবার তিনি মনে করেছেন এবং ঘুমের মধ্যে কতবার যে তাকে স্বপ্নে দেখেছেন তার হিসাব তাঁর মত হিসাবনবীশও রাখতে পারেন নি।

দু'দিন রাত্রের মধ্যে কোন কিছু শুনতে পান নি—কোন কিছু দেখতে পান নি। তবে এবার বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন গাছের কাণ্ডগুলির মধ্যে ঠিক তেমনি এক একটি ছোট ছেলের মূর্তির আভাস ফুটে উঠেছে। কাছে গেলে দেখা যায় না, ধরা যায় না, কিন্তু একটা দূরত্বের এপারে এলেই ঠিক মনে হয় গাছগুলোর বাকলের ভিতরে একটা কাঠের বা পাথরের মূর্তি যেন ঢাকা দেওয়া আছে। প্রায় প্রতিটি গাছের মধ্যেই যেন দেখা যায়।

মনের এই কথাটা তিনি অত্যন্ত গোপনে রেখেছেন। অত্যন্ত গোপনে। প্রকাশ করায় বিপদ না হোক অনিষ্টের সম্ভাবনা আছে; তাঁর হিন্দু মনসবদারেরা জানে যে শাহজাদা গোঁড়া মুসলমান। কাফেরী সমস্ত কিছুর উপর তাঁর অপরিসীম বিরাগ—ঘৃণা। কিন্তু তবু তিনি এই ব্যাপারটা জানতে দিতে চান না। ঔরংজীব কাফের হিন্দুদের ধর্মের কথা ভালই জানেন। এই পুতুল পূজোর ব্যাপারে তারা উন্মাদ। বিশেষ করে এই পুতুলটির ব্যাপারে। এই এক পুতুল, নানা চেহারায় একে গড়ে এরা একে ভগবান বলে পূজো করে, একে নিয়ে খেলাও করে। এই পুতুলটাকে একেবারে বাচ্চার চেহারা দিয়ে তৈরি করে হাতে পাথরের নাড়ু দিয়ে বলে গোপাল। এর মুখের দিকে তাকিয়ে পুরুষেরা কাঁদে—মেয়েরা হাতে তালি দিয়ে নাচাতে চেষ্টা করে। আবার একে নওজওয়ান করে তৈয়ারি করে। বাঁকা ঠামে বাঁশীহাতে পায়ের উপর পা দিয়ে দাঁড় করিয়ে দেয়—বাঁয়ে এক ঔরতের মূর্তি তৈরি করে দাঁড় করিয়ে দেয়। তাকে এরা দিনদুনিয়ার মালিক বলে মানে, বাঁশুরিয়া বলে আদর করে, পুরুষেরা এর জন্যে ঔরতের মন নিয়ে একে ভালবাসে, কেঁদে বেড়ায় ঘর ছেড়ে। মেয়েরা মহব্বতি করে এই পাথরের পুতুলের সঙ্গে।

আকবর শাহ বাদশাহের সময় চিতোরগড়ে রানা কুম্ভের রানী মীরাবাঈ এই পুতুল নিয়ে পাগল হয়ে সারা জিন্দগী নেচে গান করে কাটিয়ে দিয়ে গেছে। এর খাস আস্তানা হল বৃন্দাবন। আগ্রা থেকে বৃন্দাবন সামান্য পথ। মথুরা শহরের কোলে যম্‌নার ঠিক ওপারে। মথুরাও এই পুতুল পূজোর আর একটা জায়গা। বৃন্দাবনে এই পুতুলের মন্দির এত উঁচু যে আগ্রার কেল্লা থেকে দিনে দেখা যায় সোনার কলসের ছটা, রাত্রে দেখা যায় ওই চূড়ায় ঝুলানো সীসার ফানুসে ঘেরা বাতির আলো। বাল্যকাল থেকে দেখে এসেছেন তিনি। এবং প্রশ্ন করেছেন—"কাফেরের পুতুলের মন্দির এমনই মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকবে ইসলাম বাদশাহীর আমলে? গুনাহ হবে না খুদাতয়লার দরবারে? পয়গম্বর রসুল গোস্যা করবেন না!"

প্রশ্ন করে যে জবাব তিনি বাদশাহের কাছে পেয়েছেন তাতে তিনি খুশী হতে পারেন নি।

বাদশাহ বলেছেন—বাদশাহ জেলালউদ্দিন্ আকবর শাহের সময়েরও আগে থেকে এই মন্দির আছে। পাঠান আমল থেকে দিল্লীর সুলতানেরা একে সয়ে এসেছেন, বাবর শাহ হুমায়ুন বাদশাহ আকবর শাহ জাহাঙ্গীর শাহ এঁরাও সহ্য করেছেন; আজ আমার ইচ্ছে না থাকলেও সহ্য করতে হবে। জান সারা হিন্দুস্তান—সে কাশ্মীর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত আর গুজরাত থেকে আসাম পর্যন্ত এ মন্দিলের কিছু হলে বুক চাপড়ে কাঁদবে কড়োর কড়োর মানুষ। তাছাড়া আরও কথা আছে ঔরংজীব—তাহলে এই কড়োর কড়োর কাফের ঔরৎ আর মরদের চোখের পানির তুফানে চাঘ্‌তাই বংশের ইসলামী বাদশাহীর কিল্লা হয়তো ডুবেও যেতে পারে!

ডুবে যদি যায় তবে তাই যাক। খুদার হুকুমৎ পয়গম্বরের নির্দেশ যদি তামিল হাসিল করতে ডুবেই মরতে হয়, ভেসেই যেতে

হয় তো যাক, তাই যাক। নিস্তব্ধ রাত্রে সেই বনের মধ্যে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে শাহজাদা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনের আবেগে বলে উঠলেন—যাক—তাই যাক। ডুবেই যদি যায় তো যাক।

বনের মধ্যে ধ্বনি ও প্রতিধ্বনির একটা বিচিত্র রূপ আছে। সেখানে ধ্বনির গাম্ভীর্য আয়তন যেন প্রতিধ্বনিতে বেড়ে যায় এবং এ-দিকে ও-দিকে চারিদিকে বেজে বেজে ফেরে। তাই হল। তাঁর শেষ কথাটিই স্পষ্ট হয়ে কানে বার বার ফিরে এল।

যাক—যাক—যাক—যাক।

সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনিহীন একটা হাসিতে যেন সারা বনভূমি ভরে গেল। ধ্বনিহীন শি—শি—শি—শি শব্দে হাসি।

চমকে উঠলেন শাহজাদা। পরক্ষণেই বুঝতে পারলেন বাহুড়ের পাখার শব্দ। এই গভীর রাত্রির স্তব্ধতার মধ্যে তাঁর কথার ধ্বনি ও প্রতিধ্বনির আঘাতে বাহুড়গুলো চকিত হয়ে উড়তে আরম্ভ করে। তাদের বড় বড় পাখাগুলোর বায়ুতাড়নার শব্দ একটা শব্দতরঙ্গের সৃষ্টি করেছে।

কে যেন তাঁর কথায় ব্যঙ্গ করে হেসেই চলেছে।

অসহ্য মনে হল তাঁর। উত্তপ্ত মস্তিষ্কে আবার মনে হল ওই গাছের কাণ্ডের মধ্যে আত্মগোপন করে রয়েছে যে বাচ্চাটা বা যে বাচ্চাগুলো এ হাসি তাদেরই হাসি। তিনি আবার বিরক্তিভরে বললেন—আঃ!

—শাহজাদা! নারীকণ্ঠের ডাক। কেউ ডাকলে তাঁকে।

—কে? ও—দিলরাস বানু! শাহজাদার খেয়াল হল আজ তিনি দিলরাস বানুর তাঁবুতে শুয়ে আছেন।

—হ্যাঁ শাহজাদা, আমি দিলরাস।

শাহজাদা দুই হাত বাড়িয়ে দিলরাসকে বুকে টেনে নিলেন।

দিলরাস বানু প্রশ্ন করলেন—আপনি ঘুমোন নি কেন শাহজাদা? কি হয়েছে আপনার? কালও আপনি আমার এখানে ছিলেন—

কালও ঘুমোন নি, পরশু ছিলেন নবাববাঙ্গীয়ের তাঁবুতে—সেও আমাকে বলছিল আপনি ঘুমোন নি। কেন শাহজাদা?

শাহজাদা বললেন—জান, এইখানে বুন্দেলা রাজা ঝুঝর সিং খুন হয়েছিল। বুন্দেলা রাজ্য জয় আমার জিন্দগীর প্রথম অভিযান। উর্চার মন্দির ভেঙে আমি প্রথম মসজেদ তৈয়ার করেছি। এই জায়গাটায় এলে আমি ঘুমোতে পারি না, স্থির থাকতে পারি না। আমার যেন কেমন হয়। হাঁ দিলরাস, কেমন যেন হয়ে যাই আমি। তামাম হিন্দুস্তানের মন্দিলগুলো—হাঁ মন্দিলগুলো আমাকে ব্যঙ্গ করে।

—আপনি ঘুমুবার চেষ্টা করুন শাহজাদা—আমি আপনার কপালে হাত বুলিয়ে আরাম দেবার চেষ্টা করি। রাত্রি বোধ হয় বেশী নেই। আবার তো শেষ প্রহর হতে হতে আপনি উঠবেন।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে শাহজাদা বললেন—হাঁ। বলে বিছানায় শুয়ে চোখ বুজলেন তিনি। পরক্ষণেই উঠে বসলেন। বললেন—না।

দিলরাস সবিস্ময়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন—কি হল? কিছু বে-আরাম বোধ হল শাহজাদার?

—না দিলরাস—না।

—তবে?

—কাল ভোরেই এখান থেকে তাঁবু উঠবে। তার হুকুম দিয়ে রাখব। উঠতেই হবে। বলে তিনি বেরিয়ে গেলেন তাঁবুর ভিতর থেকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই শাহজাদার নাকাড়া বেজে উঠল। তার সঙ্গে নকীব হুকুম জারী করে ফিরতে লাগল—উঠে যাও সিপাহী লোক। জেগে যাও। তৈয়ার হয়ে যাও। কাল ভোরবেলা এখানকার ছাউনি উঠবে। কাল ভোরে। তৈয়ার হয়ে যাও।

শাহজাদা ঔরংজীবের হুকুমের কখনও এক চুল এদিক ওদিক হত না। ভোরবেলাতেই ঠিক উদয়লগ্নেই প্রস্তুত মুঘল বাহিনীকে নিয়ে তাঁর যাত্রা শুরু করলেন। শাহজাদার জীবনের নিয়ম, রাত্রি এক-প্রহর থাকতে ঘুম থেকে উঠে প্রাতঃকৃত্য শেষ করে নামাজ সেরে জপের মালা নিয়ে বত্রিশশো বার আল্লাতয়লার নাম জপ করে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে দিনের কাজ আরম্ভ করা ; সেই নিয়মানুসারেই তিনি জপ শেষ করে প্রাতরাশ সেরে বনের মধ্যে পথটুকু তাঁর ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে পথ অতিক্রম করে বেরিয়ে এসে সওয়ার হলেন হাতীর পিঠে। দৃষ্টি তাঁর সম্মুখের দিকে প্রসারিত করে দিলেন—আগ্রার দিকে। সেখানে কি অপেক্ষা করে আছে তাঁর জন্যে ? অবজ্ঞা ? শাহানশাহের প্রিয় পুত্র দারা সিকোর ব্যঙ্গভরা এক দৃষ্টি ?

সতেরো

বুন্দেলখণ্ডের অরণ্যভূমের সেই বিশেষ স্থানটি থেকে শাহজাদা ঔরংজীবের বাহিনী উত্তরমুখে আগ্রা অভিমুখে চলেছিল। মধ্যপ্রদেশ পাহাড় আর অরণ্যের রাজ্য। বিন্ধ্যপর্বতমালা এবং দণ্ডকারণ্যের দেশ। বসন্তের মধ্যকালও অতিক্রান্ত—শালগাছে এখনও মঞ্জরী ঠিক উদ্গত না হলেও উঁকি দিতে শুরু করেছে। পাতা ঝরছে; শীতের মধ্যে যে সব গাছের পাতা ঝরে গেছে তার স্তূপ পড়ে আছে সমগ্র অরণ্যভূমে। তার উপর জন্তু-জানোয়ারের ভারী পা ফেলার শব্দ একটা বিচিত্র ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তোলে। একগুণ যেন দশগুণ উঁচু হয়ে ধ্বনিত হয় এবং গাছের পল্লবের তলায় তলায় অরণ্য ব্যাপ্ত করে ছড়িয়ে পড়ে। অনেক গাছে নতুন পাতার এবং ফুলের সমারোহ ভরে দিয়েছে অরণ্যভূমিকে। মধ্যে মধ্যে বড় বড় গাছ থেকে মোটা কাছির মত লতা ঝুলে পড়েছে, বাতাসে দুলছে। স্তবক স্তবক ফুলে ভরা; তা থেকে মদির গন্ধ বাতাসকে ভারী করে রেখেছে।

পথে উর্চায় কয়েক দিন বিশ্রাম করে, উর্চার নূতন রাজার আতিথ্য গ্রহণ করবেন। অভিপ্রায় আছে গোপনে সন্ধান নেবেন এমন কোন দেববিগ্রহ রাজা ফিরে পেয়েছেন কি না? বা এ রাজ্যে কোথাও এমন দেবতার পূজা হয় কি না? এটা অবশ্য কাল রাত্রে চিন্তার মধ্যে এসেছে। প্রথমে উর্চায় বিশ্রামের উদ্দেশ্য ছিল অন্য। নজরানা। এবং খবর নেওয়া, রাজা আরও কয়টা গুপ্তধন-ভাণ্ডারের সন্ধান পেয়েছেন। হঠাৎ সামনের দিক থেকে কানে কানে একটা সংবাদ ভেসে এল। শাহজাদাকে ঠিক মাঝখানে রেখে যে সওয়ারের দুই সারি এগিয়ে চলেছিল, যাদের ঘোড়ার রং একরকম, পোশাক-পরিচ্ছদ একরকম, এমন কি দেখতেও তারা অনেকটা একরকম—তাদের সামনে যে মনসবদার চলেছিল তার কানে এসে পৌঁছুল

খবরটা। মনসবদার ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে সওয়ারদের সারির মধ্যে ঢুকে এগিয়ে এসে শাহজাদার সামনে ঘোড়া থেকে নেমে কুর্নিশ করে বললে—আগ্রা থেকে এক সওয়ার এসেছে—বলছে বহুৎ জরুরী খবর এনেছে সে। তাকে পাঠিয়েছেন মাননীয়া শাহজাদী রৌশনআরা বেগমসাহেবা। বলেছেন এ খবর সঙ্গে সঙ্গে আলিজাঁহার কানে ওঠা প্রয়োজন।

শাহজাদা ঔরংজীব গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে চলেছিলেন। ঘোড়ার লাগাম তাঁর হাতে মাত্র ধরাই ছিল, তিনি নিজে ঘোড়াটাকে চালাচ্ছিলেন না। সুশিক্ষিত ঘোড়াটা তাঁর দেহরক্ষীদলের পাশাপাশি দুই সারির পিছনে মনিবকে নিজেই বহন করে নিয়ে চলেছিল। মনিবকে সে জানে, মনিবকে সে ভালবাসে; মনিব তার পিঠে সওয়ার হলে সারা দেহে তার শিহরন বয়ে যায়। সে পা ঠুকতে শুরু করে, আনন্দে হ্রেষাধ্বনি করে সকলকে জানিয়ে দেয় শুনিয়ে দেয়। মনিবকে নিয়ে সে আপনিই চলে। চলতে চলতে যেখানে তার মনে হয় মনিবের সজাগ হওয়া প্রয়োজন সেইখানেই সে নিজের ঘাড়টা নিয়ে এমনভাবে একটা ঝাঁকি দেয় যে মনিবের হাতে-ধরা রাশের মারফত একটা আকর্ষণের ইঙ্গিত শাহজাদা পেয়ে যান এবং সঙ্গে সঙ্গে শাহজাদা সজাগ হয়ে সামনে তাকিয়ে পথটা দেখে যতটুকু সতর্ক হবার প্রয়োজন হয়ে যান। শাহজাদা ঔরংজীব দুর্ধর্ষ সাহসী, নিপুণ যোদ্ধা এবং তেমনি সুদক্ষ অশ্বারোহী।

নিজের ঘোড়া থেকে নেমে কুনিশ করতেই শাহজাদার ঘোড়া আপনি দাঁড়িয়ে গেল। শাহজাদা মনসবদারের দিকে তাকিয়ে কপালে কুঞ্চনরেখা তুলে প্রশ্ন জানালেন—কি?

আগ্রার সওয়ারের খবর শুনেই বললেন—ডাক তাকে।

* * *

আগ্রার সংবাদ সত্যই গুরুতর সংবাদ। শাহজাদী রৌশনআরা বেগমসাহেবা খবর পাঠিয়েছেন—"অবিলম্বে তুমি দক্ষিণ থেকে যত

দ্রুত পার এসে আগ্রায় পৌঁছে যাও। আমাদের বড়ী বহেন হজরত বেগম শাহজাদী জাহানআরা মারাত্মকভাবে আগুনে পুড়ে জখম হয়েছেন। আমাদের মহামান্য পিতা বাদশাহ সাজাহান তাঁর প্রিয়তমা কন্যার এই জীবনসংশয়পূর্ণ দুর্ঘটনায় যেন ভেঙে পড়েছেন। শাহজাদীর কি হবে কেউ বলতে পারে না। বেহোঁশ হয়ে আছেন তিনি। অনবরত যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন। আলাহজরত তাঁর বিছানার পাশে বসে আছেন, চোখে তাঁর ঘুম নেই, হিন্দোস্তানের জন্যও গ্রাহ্য নেই ; দিনে ওই অল্প কিছুক্ষণের জন্য দরবারে একবার যান মাত্র। খুব জরুরী নিশান কি ইস্তাহারে ছাড়া দস্তখত করাও ছেড়ে দিয়েছেন। নিজে হাতে তিনি দাওয়াই লাগাচ্ছেন পোড়া ঘায়ে, নিজে হাতে তাঁর মুখে তুলে দিচ্ছেন দুধ কি শুরুয়া। শাহাজাদীকে দেখবার জন্য তোমার আসা কর্তব্য তো নিশ্চয়ই। এক্ষেত্রে তার উপরেও কিছু। আমাদের প্রিয় বড় ভাই শাহজাদা দারা সিকো এখানে রয়েছেন—অনবরত খোঁজ-খবর করছেন। তিনি বড়ী বহেনের চিরদিনের প্রিয়পাত্র। ওদিক থেকে ভাই সুজা মুরাদ এসে পড়ছেন। দক্ষিণের পথ দুর্গম। সংবাদ পৌঁছুতে বিলম্ব হবে বলে আমি সওয়ার পাঠালাম। আমি জানি শাহজাদা আগ্রা ফেরার পথে অবশ্যই রাজাদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতে করতে আসছেন, কিন্তু এই ক্ষেত্রে তা না করে যত শীঘ্র পারেন আগ্রা এসে পৌঁছুবার চেষ্টা করুন। এবং আসবার পথে অবশ্যই সন্ধান করে আসবেন বিচক্ষণ চিকিৎসকের বা সিদ্ধ ফকীরের। অন্ততঃ তাঁদের দোয়া এবং তাবিজ আনতেই বা ক্ষতি কি ?”

*　　　*　　　*

শাহজাদা ঔরংজীব সন্ধ্যার মুখে তাঁবু ফেলে পত্রবাহকের কাছে বিবরণ শুনলেন।

চৈত্র মাসের প্রথম সপ্তাহ পার হয়েছে—আগ্রা শহরে দিনের বেলা রোদ চড়ছে ; সন্ধ্যাবেলা মিঠি মিঠি হাওয়া বইতে শুরু করে,

প্রহরভর রাত্রি হতে হতে জাড়া পড়ে যায়—তখন গরম কাপড় দরকার হয়। কিন্তু 'সামকে ওয়াক্ত' অর্থাৎ সন্ধ্যার সময় একটা আমেজ লাগে। পথের ভিখমাঙোয়ারও লাগে, তা হিন্দোস্তানের বাদশাহের কিল্লার ভিতর রঙমহলে। শাহজাদী জাহানআরা বেগম আলাহজরতের জীবনের প্রধান নির্ভর। মমতাজ বেগমের মৃত্যুর পর বাদশাহের আরও বেগম আছেন দুজন—আকবরাবাদী আর ফতেপুরীমহল কিন্তু বাদশাহের প্রিয়পাত্রী বা প্রেয়সী কেউ হয়ে ওঠেন নি, তাঁরা আছেন আছেন; যেমন বাদশাহ রাজা মহারাজার হারেমে অন্তঃপুরে বহু মহিষী থাকেন, আপনাপন মহলে থাকেন, খুশিমত দিনযাপন করেন, হঠাৎ কোনদিন বাদশাহের স্মৃতিপথে তাঁর নাম বা তাঁর কথা ভেসে উঠলে সেদিন এত্তেলা পাঠান—বাদশাহ আজ আসবেন তাঁর মহলে। অথবা তাঁকেই ডাক পড়ে বাদশাহের শয়নকক্ষে। এঁরাও তেমনিভাবেই ছিলেন, সে মমতাজ বেগমসাহেবার জীবিতকালেও বটে, তাঁর মৃত্যুর পরও বটে। মমতাজ বেগমের কর্তব্যভার—সমস্ত রঙমহলের কর্তৃত্ব অধিকার এ আকবরাবাদী বা ফতেপুরীমহল কেউ পান নি, এ অর্পিত হয়েছিল জ্যেষ্ঠা কন্যা জাহানআরা বেগমের উপর। বাদশাহের কাছে নির্দিষ্ট সময়ে এসে রঙমহলের সমস্ত খবর বাদশাহকে শোনাতে হত; এমন কি আগ্রা শহরের কি সারা হিন্দুস্তানের কোন বিশেষ খবর তাঁর কানে এলে তাও তিনি বাদশাহের কানে তুলে দিতেন। পারিবারিক ভাই বোনদের কথা যা তাঁর জানা উচিত তা জানাতেন। এবং এই প্রিয়তমা কন্যাটির মুখ থেকে যে কথা, অন্তরের যে অভিপ্রায় ব্যক্ত হত বাদশাহ ঠিক তাই করতেন। কন্যা জাহানআরার কথার কখনও অন্যথা হত না।

সেদিন বাদশাহ সন্ধ্যার পর দেওয়ানী খাসের দরবার সেরে শাহবুরুজে উজীর এবং মনসবদারদের সঙ্গে পরামর্শ সেরে মহলে এসে মুসম্মন বুরুজে তাঁর প্রসিদ্ধ সুখশয্যায় বসেন। তাঁর অপেক্ষায়

হজরত বেগম জাহানআরা আগে থেকেই সেখানে উপস্থিত হয়েছেন। শাহজাদা দারা সিকো লাহোর থেকে যুদ্ধ না করেই যুদ্ধজয়ী বীর হিসেবে সম্মান অভিনন্দন পেয়ে লাহোরের বাস তুলে আগ্রায় এসেছেন। তিনিও উপস্থিত ছিলেন। বাদশাহের অন্য কন্যাদের মধ্যে রৌশনআরা উপস্থিত ছিলেন। তিনি জানতে উৎসুক ছিলেন—দক্ষিণ থেকে শাহজাদা ঔরংজীব যে এলাকা এবং যে দৌলত জয় করেছেন এবং বহু উপঢৌকন নিয়ে বাদশাহের দরবারে তাঁর আনুগত্য নিবেদন করতে আসছেন তার জন্য বাদশাহ পুত্রকে কি সম্মান বা কি সমাদর দেবেন এবং দেখাবেন। নতুন মনসব দেওয়া হবে কি না! বা জাহানআরা বেগমের কথার সুর কতখানি সরস বা কতখানি শুষ্ক তা কান পেতে ঠাওর করা ছিল তাঁর বিশেষ অভিপ্রায়। বড় ভাই শাহবুলন্দ ইকবাল শাহজাদা দারা সিকোর মুখখানি কতখানি গম্ভীর হয়ে ওঠে বা গোলকুণ্ডার সুলতান মহম্মদ কুতবশাহের সেই এক কালের উপকারের কথা বাদশাহকে মনে করিয়ে দিয়ে ধর্মবাক্য উচ্চারণ করে কতখানি দোষারোপ করেন এই ভাইটির উপর—তার প্রতিটি কথা মনে মনে গেঁথে নেবার জন্য তিনি এই আসরটিতে সেদিন গিয়েছিলেন। তিনি খবর পেয়ে গিয়েছিলেন যে, ভাই শাহজাদা ঔরংজীব ঔরঙ্গাবাদ থেকে রওনা হয়েছেন। বাদশাহের কাছেও খবরটা এসেছে। সেটা এখনও শাহজাদা দারা সিকো বা জাহানআরা বেগম জেনেছেন কি না তা সঠিক জানতেন না রৌশনআরা। তিনি এসে চুপ করে বসে ছিলেন একটু আগে থেকেই। আরও ছিলেন দুই বেগমসাহেবা আকবরাবাদী এবং ফতেপুরীমহল। বাদশাহের অন্য কন্যা গৌহরআরাও ছিলেন।

বড় বোন জাহানআরা প্রশ্ন করেছিলেন—রৌশনআরা, তোমার কিতাবখানায় নাকি দক্ষিণ থেকে আদিলশাহী সুলতানের কিতাবখানার দুর্লভ মসনভী নকল করিয়ে পাঠিয়েছেন আমাদের ভাই শাহজাদা ঔরংজীব? তার সঙ্গে শায়ের নূরউদ্দিন

পারসী রচনা "খান-ই-খলীল", "গুলজার-ই-ইব্রাহিম" কিতাব দুখানার নকলও আছে ?

রৌশনআরা হেসে বললেন—বড়ী বেগমসাহেবা শুনেছেন ঠিকই। আমিই লিখেছিলাম ভাই ঔরংজীবকে যে, দক্ষিণের সুলতানশাহী তোমার এলাকার মধ্যে। তুমি অনেক বহুমূল্য জিনিসই সেখান থেকে বাদশাহী তোষাগারে পাঠিয়ে সমৃদ্ধ করছ। কিন্তু তুমি আজও পর্যন্ত সুলতানশাহীর দরবারে বড় বড় শায়েরের যে সব কাব্য রচিত হয়েছে তার কিছু তো এখানে পাঠাতে পার। বাদশাহী কিতাবখানায় থাকতে পারে। আমাদের মহামান্য বড়ী বহেনসাহেবা নিজে বিখ্যাত কবি—তিনি পেলে খুশী হবেন। ঔরংজীব তা পাঠিয়েছে। নকল আমার কাছে পাঠিয়েছে—আসল কিতাব সে নিজে এনে পৌঁছে দেবে। দেবে আপনার কাছেই। সে লিখেছে তাই—নকল তোমার কাছে পাঠালাম—আসল আমি খুদ নিয়ে গিয়ে বড়ী বহেনসাহেবাকে নজরানা দেব।

—ঔরংজীব গজল বয়েতের কিতাব মসনভী নিয়ে আসবে ? শোভানাল্লা ! হেসে উঠলেন শাহজাদা দারা সিকো—তাহলে তার গুনাহ হবে না ? সে তো এসব শোনে না পড়ে না ছোঁয় না ! এক কোরান ছাড়া তো তার কাছে আর কিছু নাই যা পড়া উচিত বা পড়া যায়। আমাদের বড়ী বহেনসাহেবার ভাগ্য খুব ভাল !

জাহানআরাও একটু হাসলেন, কিন্তু বললেন—না—কথাটা তুমি একটু বেশী বলছ ভাইসাহেব। শাহজাদা ঔরংজীব গোঁড়া মুসলমান ; তার জন্য অনেক কৃচ্ছ্রসাধনও সে করে। তা বলে আমার বা আলাহজরতের প্রিয় যা তা পেলে সে আনবে না এ হতে পারে না। না না না। এ তুমি একটু বেশী বলছ।

হাসতে হাসতেই বললেন কথাগুলি। যাতে নাকি ভাইয়ের মনে আঘাত না লাগে। দারা সিকো তাঁর পরম প্রিয়। তবু দারা

সিকোর কথাটা খুব পছন্দ হল না। তিনি চুপ করে গেলেন, মুসম্মন বুরুজের বাইরে আটকোণা বারান্দার ওপারে যমুনার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

জাহানআরা বললেন—তাছাড়া কিতাবখানার জন্যে কিতাব সংগ্রহ এ তো বাদশাহ স্থলতানদের কর্তব্য। এখানে অধর্মের কথা ঠিক ওঠে না। তবে হ্যাঁ, আমাদের ভাই ঔরংজীব এসব পড়েন না। পড়া উচিত নয় বলে মনে করেন। সেটা তাঁর ব্যক্তিগত মত।

—হলে আমি খুশী হব বড়ী বেগমসাহেবা।

রৌশনআরা এবার বলে উঠলেন—তাহলে শাহ-ই-আলিজাকে এখুনি খুশী হতে হবে। কারণ ভাই ঔরংজীব তাঁর রুকায় লিখেছেন—বহেনজী, তোমার খত পাবার আগেই আমি এসব সম্পদ সংগ্রহ করেছি। বীজাপুরের স্থলতানকে আমি বলেছিলাম—স্থলতান, এসব রত্ন-সম্পদ হীরা মতি জহরতের চেয়ে দামী। তবে দুঃখ এই যে এ সম্পদ অত্যন্ত শীঘ্র নষ্ট হয়ে যায়। পোকায় কাটে, আগুনে পোড়ে, জলে পচে। স্থতরাং বাদশাহী তোষাখানায় রাখলে থেকে যাবে—আপনি নকল করিয়ে আমাকে দিলে আমি বাদশাহের কাছে পাঠাব। স্থলতান বাদশাহের খুশির জন্য নকল রেখে কতকগুলি আসল কিতাবই দিয়েছেন। 'জহূরী' তো অল্পকাল আগের মানুষ—তাঁর আসল কিতাব পাঠিয়ে দিয়েছেন।

হেসে জাহানআরা বললেন—মহম্মদ আদিলশাহ রসিকও বটেন চতুরও বটেন। নূরউদ্দিন জুহূরীর একটা বয়েৎ আছে—

গর্ অসকীর্-ই-স্-ররর্ব স্যূয় সাজন্দ
জখাক্ই গাকুএই বীজাপুর সাজন্দ!

বীজাপুরের পবিত্র মাটি আনন্দ সুখ আর সমৃদ্ধির সঞ্জীবনী রসের উৎস। তার মানেই হল বিজাপুরী স্থলতান-শাহীর দাক্ষিণ্য। ওটা নকলের চেয়ে আসলটা দেওয়াই ভাল। কেউ বলতে পারবে না যে এটা জাল। তবে ইরানী কবি 'বক্কর খুর্দ'-এর গজল হিন্দুস্তানের

লোকের না-জানা নয়। সাফা সে বলে দিয়েছে—এক গজনী আর এক হিন্দুস্তানের দক্ষিণে বীজাপুর এই দুই জায়গায় দরবার মোটা মগজের দরবার—এই দুটো জায়গাতেই আমাকে আদর করে না—গজনীতে করে হুসনকে আর বীজাপুরে আদর করে জুহূরীকে। যে কোন কাজেরই নয়।

সকলে হেসে উঠলেন। দারা সিকো বললেন—দুনিয়ার এই হাল। দুনিয়ার সব মানুষের চরিত্রই এই। সবাই ভাবে তার থেকে যোগ্যতর লোক আর কেউ নেই। এবং তার মনোমত সমাদর না হলেই দুনিয়ার সব দরবারই বেয়াকুবের দরবার, পক্ষপাতিত্বের দরবার! বহেন রৌশনআরা এতে নিশ্চয় আমার সঙ্গে একমত হবেন!

ঠিক এই সময়েই শাহবুরুজ থেকে বাদশাহ সাজাহানের আগমনবার্তা ধ্বনিত হল। কথায় ছেদ পড়ল। সকলেই উঠে সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে আলাহজরতকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করলেন। বাদশাহ সহাস্যমুখে ঘরে প্রবেশ করে তখত-ই-পোষের উপর বহুমূল্য শয্যায় বসে বললেন—বস—সকলে বস।

বাদশাহের মেজাজে খুশীর সুরের অভাব রয়েছে। কিন্তু সেটা ঠিক জানতে দিতে চাচ্ছেন না তিনি।

আসনে বসে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বাদশাহ প্রশ্ন করলেন—তোমাদের আসর যেন বেশ গরম বলে মনে হচ্ছিল। সকলেই এসে জমেছ এবং সকলের মুখেই যেন বেশ একটু রক্তোচ্ছ্বাস রয়েছে। মেজাজে তোমাদের কিসের ঢেউ লাগল জাহানআরা?

জাহানআরা মাথা একটু নীচু করে বললেন—কাব্যের কথা হচ্ছিল শাহানশাহ।

—কাব্যের কথা?

—হ্যাঁ। আজ আমি খবর শুনেছিলাম কি দক্ষিণ থেকে যে

সওয়ার এসেছে বাদশাহের কাছে শাহাজাদা ঔরংজীবের নিশান দরখাস্ত নিয়ে, সে বহেন রৌশনআরাকে কিছু কিতাব পাঠিয়েছে তার কিতাবখানার জন্য। বীজাপুরের নূরউদ্দিন জুহুরীর কোন কিতাবের নকল আছে কিনা জিজ্ঞাসা করলাম। তাই আলোচনা হচ্ছিল। রৌশনআরা বললে—বাদশাহী কিতাবখানার জন্য ভাই ঔরংজীব নাকি বহু মূল্যবান গ্রন্থ সংগ্রহ করেছেন। নিজে এসে তিনি বাদশাহের দরবারে উপঢৌকন দেবেন। দারা সিকো বলছিলেন—কবিতা গান নৃত্যকলা এ সব তো ঔরংজীবের কাছে অস্পৃশ্য। আমি বললাম—না না। এ সব দুর্লভ বস্তু বাদশাহী সংগ্রহশালার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয়। তা ছাড়া তিনি ভাল না বাসলে আমরা যেখানে ভালবাসি সেখানে কি তিনি উপেক্ষা করতে পারেন?

বাদশাহ একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন, বললেন—হ্যাঁ, ঔরংজীব মুসলমান হিসেবে বড় বেশী গোঁড়া। মেজাজও তার খুব কড়া। সংগীতজ্ঞ, কবি, নর্তকী এদের সে ভাল চোখে দেখে না। সে আগ্রা আসবে। বোধ হয় রওনা হয়ে গেছে।

আসরের বাতাস আরও একটু ভারী হয়ে গেল।

জাহানআরা বললেন—শাহানশাহ কি তাকে দক্ষিণ ছেড়ে আসবার আর্জি মঞ্জুর করেছিলেন? সে কি আর্জি করেছিল? কই শুনি নি তো!

—না। ঠিক আর্জিও সে করে নি, আমিও মঞ্জুর করি নি। তবে গোলকুণ্ডার উজীর মীরজুমলার কথা সে লিখেছিল আগে। এবং সেই সঙ্গে কতকগুলো এমন খবর দিয়েছিল যে আমি লিখেছিলাম এ সব কথা সাক্ষাতে আলোচনা করব। খুব সম্ভব মীরজুমলার ঘটনা জটিল হয়ে উঠেছে গোলকুণ্ডায়, আমি অনুমান করছি, কারণ লিখেছে শাহনশাহের কাছে সমস্ত নিভৃতে পেশ করতে চাই।

একটু চুপ করে থেকে বাদশাহ বললেন—দক্ষিণে বাহমনী রাজ্যের পর পাঁচ পাঁচ সুলতানশাহীর মধ্যে সত্যিই অনেক গুণী ব্যক্তি

এসেছেন। বীজাপুর গোলকুণ্ডা পাঁচ সুলতানশাহীর শিল্প সাহিত্য সম্পদ নিয়ে মৌজুদ করে রেখেছে। তার কিছু আগ্রায় এলে নিশ্চয় আমি খুশী হব।

দারা সিকো এতক্ষণ চুপ করেই ছিলেন, পিতার প্রিয়তম পুত্র, জ্যেষ্ঠ পুত্র, হিন্দোস্তানের ভাবী অধীশ্বর বলে বাদশাহ একরকম ঘোষণাই করেছেন—তবুও বাদশাহের আজকের মেজাজের গতি ঠিক ঠাওর করতে পারছিলেন না—এতক্ষণে তিনি বললেন—আমি একটা গুজব শুনেছি আলাহজরত—ঠিক গুজবও বলতে পারি না—দক্ষিণের কোন বিশ্বস্ত লোকের কাছে যা শুনেছি তা সত্য বলেই মনে করি, তবে বাদশাহ সে কথা বলবার অনুমতি না দিলে আমি বলতে পারব না।

—কি শুনেছ ?

—জাঁহাপনা কি আমাকে বলতে আদেশ করছেন ?

—শাহজাদা, বাদশাহ কি শুনেছ বলে প্রশ্ন করেই কি সে আদেশ করেন নি ? কথাটা বললেন জাহানআরা। একটু তীক্ষ্ণ কণ্ঠেই বললেন।

লজ্জিত হলেন দারা সিকো। বললেন—বড়ী বেগম-সাহেবা, বলতে আমি অস্বস্তি বোধ করছি। আমার ভাই ঔরংজীবের আমার প্রতি প্রীতির যেন অভাব আছে। তবু শাহানশাহ যখন হুকুম করেছেন তখন বলি—শুনেছি এই মীরজুমলা ইরান থেকে এসেছিল জহরতের ব্যবসা করতে। তারপর সে গোলকুণ্ডার উজীর হয়ে বসেছে। সে গোলকুণ্ডার খনি থেকে পাঁচ সাত মন জহরত সংগ্রহ করেছে। এবং অঢেল স্বর্ণেরও সে মালিক। নিজে একদল সুশিক্ষিত সওয়ার ফৌজ তৈরি করেছে যে ফৌজের বলে গোলকুণ্ডার মালিক প্রকৃতপক্ষে সেই। তাকে বাদশাহের অনুগ্রহ প্রসাদ যদি দেওয়াতে পারে তবে ভবিষ্যতে মীরজুমলা আমাদের ভাইএর বাহুবলই বৃদ্ধি করবে।

রৌশনআরা এবার ঈষৎ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠলেন—শাহবুলন্দ

ইকবাল শাহজাদা দারা সিকো হিন্দেস্তানের সব থেকে বড় মনসবের মালিক। তাঁর ফৌজের কুচকাওয়াজের আওয়াজে ইরানের শাহের কলিজা ভয়ে বন্ধ হয়ে গেল। ইরানী ফৌজ কান্দাহার ছিনিয়ে নিতে আসছিল—পথ থেকে ফিরে গেল—

—শাহজাদী রৌশনআরা!

মৃদু ধীর অথচ গম্ভীর কণ্ঠস্বরে বাদশাহ কথা কটি উচ্চারণ করলেন; মুহূর্তে রৌশনআরা স্তব্ধ হয়ে গেলেন। শুধু রৌশনআরাই নয়, সকলেই স্তব্ধ হয়ে গেলেন। আকবরাবাদী ফতেপুরী বেগম দুজনে পরস্পরে কথা বলছিলেন। বাদশাহ এবং পুত্র কন্যাদের কথার মধ্যে তাঁরা অংশ নিতে চান না। বিশেষ করে সপত্নীকন্যা জাহানআরার এবং সপত্নীপুত্র শাহজাদা দারার একাধিপত্য তাঁরা ঠিক বরদাস্ত করতে পারেন না। মমতাজ বেগম মারা গিয়েছেন—তাঁর মৃত্যুর পর যে অধিকার তাঁদের পাওয়া উচিত ছিল তা এরাই ছিনিয়ে নিয়েছে। সেই কারণে এদের ভাই বোনদের বিবাদে এঁরা নিরপেক্ষ থাকার ভান করলেও মনে মনে জাহানআরা এবং দারা সিকোর বিরোধীপক্ষের দিকই সমর্থন করে থাকেন। তাঁরা এতক্ষণ নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছিলেন। তাঁরাও এই কণ্ঠস্বরে ওই দুটি কথায় চুপ হয়ে গেলেন এবং ভীত হয়েই তাকিয়ে রইলেন বাদশাহের মুখের দিকে। বাদশাহ! যিনি বাদশাহ, শাহানশাহ, তিনি স্বামী হলেও আগে তিনি বাদশাহ শাহানশাহ তবে তিনি স্বামী! তিনি তাঁর পুত্র কন্যাদের কাছেও তাই—আগে বাদশাহ পরে তিনি পিতা! তিনি ক্রুদ্ধ হলে সে ক্রোধ শুধু বাপের ক্রোধ নয় সে ক্রোধ হিন্দুস্তানের বাদশাহের। বাদশাহ সাজাহান যখন শাহজাদা খুরম তখন তাঁর বাদশাহ পিতার ক্রোধ তাঁর পিছনে তাঁকে সারা হিন্দুস্তান তাড়া করে নিয়ে বেড়িয়েছিল। সে কথা আকবরাবাদী ফতেপুরী ভোলেন নি। জাহানআরা দারা সিকোরও তা মনে আছে।

কিছুক্ষণ স্তব্ধতার মধ্যে কেটে গেল। বাদশাহ তাঁর আসন থেকে পূর্ব-দক্ষিণ দিকে যমুনার ওপারে জ্যোৎস্নার মধ্যে তাজমহলের মোহময় শুভ্র স্বপ্ন-শোভার পানে চেয়ে রইলেন। থাকতে থাকতে আপন মনে আবৃত্তি করলেন—

"বুরদ্ খুন-ই আন্ কৌম্ দর্ গর্ দনাৎ।
বুবদ্ দস্ত-ই-জম' দর্ দামনৎ॥
হমান্ বিহ. কি বর্ স্বলঃহ রায় আরবী।
ত্বরীশ্ব-ই-মর্রৎ বজায় আর-রী।"

জাহানআরা মুখ আনত করলেন এবং একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। শাহাজাদা দারাও একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে অন্য দিকে মুখ ফেরালেন।

হিন্দুস্তানের মুঘল সম্রাট বংশের একটি ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিল সকলকে। হিন্দুস্তানের মুঘল বংশের প্রথম ভ্রাতৃবিরোধ এবং শোচনীয় পরিণাম। বাবর শাহ হিন্দুস্তান অধিকার করে পুত্র হুমায়ুনকে দিয়ে গিয়েছিলেন সে অধিকার। কিন্তু হুমায়ুনের ছোট ভাই কামরান তা স্বীকার করেন নি—তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। বাদশাহ হুমায়ুন ভাইকে ওই কবিতা লিখে পাঠিয়েছিলেন। "যুদ্ধে যে জাতি পরাজিত হয়—যারা মরে তাদের রক্তের অভিশাপ তোমার মাথার উপর ঝোলে। তারা বংশানুক্রমে তোমাকে নিন্দা করে। তার থেকে তুমি শান্তির চিন্তা কর। এর মধ্যেই তুমি মহৎ হয়ে উঠবে। মহত্ত্ব আপনি তোমাকে আশ্রয় করবে।"

কামরান কিন্তু নিরস্ত হন নি। জবাবে লিখেছিলেন—"অরুস্-ই-মুল্ক কসীদর্ কিনার গীরদ্ তন্‌গ্। কি বুসহ. বর লবব্-ই-শমশীর-ই-আব্‌দার্ দিহদ্" অর্থাৎ "ভাগলক্ষ্মীকে জয় সেই করতে পারে, তারই গলায় জয়লক্ষ্মী মাল্য দিয়ে বরণ করেন যে ধারাল অস্ত্রের মুখে চুম্বন দিয়ে তাকে চুম্বন করতে পারে।"

কামরান পরাজিত হয়েছিলেন—এবং—

তার পর থেকে পুরুষানুক্রমে এর পুনরাবৃত্তি হয়ে আসছে। বাদশাহ সাজাহানও নিজে সেই একই পাপ করেছেন। তিনি নিজে করেন নি—করতে হয় নি তাঁকে—তাঁর শ্বশুর—মমতাজের বাপ আসফ আলি এ কাজ সেরে রেখেছিলেন জামাইয়ের জন্যে।

আজ মধ্যে মধ্যে বাদশাহ এ চিন্তা করে অস্থির হয়ে ওঠেন। কি হবে ভবিষ্যতে। তিনি তখন হয়তো থাকবেন না।

হঠাৎ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চঞ্চল হয়ে উঠলেন ওই কথাটা স্মরণ করে। 'তিনি তখন থাকবেন না'—কথাটা সহজ কথা নয়। এই বাদশাহী। এই হিন্দুস্তান। দিল্লীতে তিনি নতুন শহর তৈরী করাচ্ছেন শাহাজানাবাদ, তার মধ্যে নতুন কেল্লা তৈরী হচ্ছে—লাল কেল্লা। এখানে তাজমহল সদ্যসমাপ্ত। লাল কেল্লার মধ্যে দেওয়ানী আম দেওয়ানী খাস রঙমহল গুসলখানা এমন সুন্দর করে তৈরী করাচ্ছেন যাকে অনায়াসে বলা যাবে—দুনিয়ায় স্বর্গ থাকলে তা এই—তা এইখানে, তা এইখানে।

"অগর ফিরদূস্ বার্-রুই জমীনস্ত
হামেনস্ত উ হামেনস্ত উ হামেনস্ত।"

নিজের এই কীর্তিময় মাটির দুনিয়া এ ছেড়ে যাওয়া তো সোজা কথা নয়। এবং এর ই দখল নিয়ে তো ঝগড়া লড়াই।

শাহানশাহ হঠাৎ তাঁর ডান হাতখানা তুলে নিজের নাকের কাছে ধরলেন। যেন শুঁকলেন। মুহূর্তের জন্য—তারপরই হাতখানা নামিয়ে নিয়ে বললেন—থাক, আজকের মত মজলিস শেষ করো। তোমরা এস সকলে। আমি বরং আকবরাবাদীর সঙ্গে এক বাজি আর ফতেপুরীর সঙ্গে এক বাজি শতরঞ্জ খেলব।

বাদশাহের ঘরের সামনেই কালো সাদা মারবেলের ছক কাটা শতরঞ্জ খেলার উঠান; অর্থাৎ উঠানটাই একটা ছক। এই ছকে রাজা উজীর ফিল ঘোড়া জাহাজ সিপাহী হবে বাঁদীরা; এরা বিশেষ পোশাক পরে তৈরীই থাকে; হুকুম হলেই এসে এরা ঘরে-

ঘরে দাঁড়িয়ে যায়। খেলোয়াড়ের হুকুম মত এ-ঘর থেকে ও-ঘরে যায় নিজেরাই। হারজিতের মধ্যে তারা একটু অভিনয়ও করে। এরই মধ্যে বাদশাহের সময় খানিকটা কাটে।

সকলে বাদশাহের হুকুম মত উঠে অভিবাদন জানিয়ে একে একে চলে গেলেন, সকলের আগে গেলেন রৌশনআরা এবং গৌহরআরা। তারপর গেলেন শাহজাদা দারা।

সকলের শেষে জাহানআরা নতজানু হয়ে বাদশাহের হাতখানি ধরে তাতে যেন একটি পরম শ্রদ্ধা সমাদরের চুম্বন এঁকে দিয়ে মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন।

বাদশাহও হাসলেন। তারপর বললেন—দেখ, তোমার মায়ের মৃত্যুর পর থেকে মনের মধ্যে মৃত্যুচিন্তা জেগে ওঠে। আপনা থেকে জাগে। তখন এই রকম খেলায় না মাতলে রেহাই পাই নে।

—না না, শাহানশাহ, আপনাকে এখন অনেক দিন বাঁচতে হবে। অনেক দিন অনেক কীর্তি করতে হবে আপনাকে।

হাসলেন বাদশাহ। বললেন—হ্যাঁ, তবে মর্জি খুদার আর পয়গম্বর রসুলের দয়া। জীবনকে যদি আপেলের সঙ্গে তুলনা করি তবে এ জীবন এই তো রসে আর সৌরভে পরিপূর্ণ হয়ে উঠছে।

জাহানআরা বললেন—হ্যাঁ পিতা। তার সৌরভ আমি প্রত্যক্ষভাবে পাই।

বাদশাহ আবার একটু হাসলেন।

* * *

জাহানআরা বেগম বেরিয়ে এসে একবার দাঁড়ালেন। রৌশনআরা চলে গেছেন নিজের মহলে। গৌহরআরাও গেছেন। শাহাজাদা দারা সিকো প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি দাঁড়িয়ে থাকেন প্রত্যহই। তাঁর সঙ্গে আরও কিছু কথাবার্তা না বলে তিনি যান না। নীচে রঙমহলের বাগিচার দরজায় তাঁর ঘোড়া অপেক্ষা করে আছে—কথা শেষ করেই তিনি ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে চলে যাবেন কেল্লার

বাইরে নিজের মঞ্জিলে। কেল্লার বাইরে শাহজাদারা আপনাপন রুচিমত মঞ্জিল তৈয়ার করিয়ে নিয়ে বেগম পরস্তার বাঁদী খোজা গোলাম প্রভৃতি নিয়ে আমীরের মতই বাস করেন।

বাগিচার উপরে দীর্ঘ অলিন্দ ধরে এগিয়ে এলেন শাহজাদী। মনে মনে ভাবছিলেন বাদশাহের কথা। পিতা হাত শুঁকে দেখলেন। মৃত্যুর কথা মুখেও বললেন। কথাটা মনগড়া নয় তবে ভয়টা অহেতুক। তিনিও বাদশাহের হাত শুঁকে দেখেছেন; হাতে পাকা আপেলের গন্ধ অম্লান রয়েছে।

অন্য কেউ জানে না এর রহস্য। জানেন বাদশাহ আর জানেন জাহানআরা। এ ছাড়া জানতেন তাঁর মা, মমতাজ বেগম। দারা সিকোও জানেন না। জাহানআরা বেগমের স্পষ্ট মনে পড়ছে। এক হিন্দু সন্ন্যাসী বাদশাহকে দুটি অকালপক্ক আপেল দিয়ে বলেছিলেন—আপনার বেগমকে দেবেন শাহানশাহ। মঙ্গল হবে।

বাদশাহ অকালের সেই সুপক্ক সৌরভযুক্ত ফল দুটি পেয়ে খুশী হয়ে বলেছিলেন—বাঃ, কি মিঠি খুসবু! এই গন্ধ যদি মানুষের দেহ থেকে ওঠে!

সন্ন্যাসী বলেছিলেন—শাহানশাহ, তোমাদের খুদা আল্লাহ্‌তয়লা আমাদের ভগবানের অনুগ্রহ বর্ষেছে তোমার উপর। না হলে হিন্দুস্তানের বাদশা কেউ হয় না। তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে বাদশাহ। তোমার হাতে এই পাকা আপেলের গন্ধ উঠবে। এও বলে দি জগদাশ্রয়, যে যেদিন দেখবে যে তোমার হাত থেকে এই গন্ধ চলে যাবে সেই দিন বুঝবে যে তোমার পরমায়ু ফুরিয়ে এসেছে। সন্ন্যাসীর কথা মিথ্যা হয় নি। বাদশাহের হাত থেকে পাকা আপেলের গন্ধ ওঠে।

বাদশাহ আরও প্রশ্ন করেছিলেন সেই সন্ন্যাসীকে—হজরত, দেখছি আপনার শক্তি অসীম। সত্যই আমার হাতে আপেলের গন্ধ স্থায়ী হয়ে গেছে মনে হচ্ছে। আপনাকে আর একটা প্রশ্ন করব।

আমাদের এই বাদশাহ বংশে শাহানশাহ আকবরের বিরুদ্ধে তাঁর পুত্র সেলিম বিদ্রোহ করেছিলেন—তিনি বাদশাহ হয়ে হলেন জাহাঙ্গীর—তাঁর বিরুদ্ধে তাঁর ছেলে খসরু বিদ্রোহ করেছিল—আমি তখন খুরম, আমিও করেছিলাম। এখন আমি বাদশাহ হয়েছি। আমার চার পুত্র—আমার কোন পুত্র কি আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে ?

সন্ন্যাসী বলেছিলেন—হ্যাঁ করবে। যে সর্বাপেক্ষা গৌরবর্ণ সেই করবে ; সঙ্গে সঙ্গে আরও বলেছিলেন—শাহানশাহ আকবর শাহ ঈশ্বরজানিত পুরুষ ছিলেন। মহাত্মা ব্যক্তি। তিনি একদিন শরতের রাত্রে আকাশের গায়ে ছায়াপথের শোভার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়ে স্বপ্ন দেখেছিলেন হিন্দুস্তানের বুকে সমুদ্রের তুফান উঠছে। একদিকে তার হিন্দু একদিকে তার মুসলমান। কেউ কারুর দিকে যেতে পারছে না। দুশমনির তুফান সব বরবাদ করে দিচ্ছে। এরই মধ্যে এক জ্যোতির্ময় পুরুষ তাঁকে বলেছিল—ওই ছায়াপথের মত সেতু বানাও। অনেক ফকীর সন্ন্যাসীর সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি সেতু বাঁধতে চেয়েছিলেন।

এই সেতু বাঁধবার মত সাধকও এসেছে তোমার ছেলে হয়ে—আবার এই সেতুকে যে নিজের তলোয়ার দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে কেটে সমুদ্রকে ডেকে সব কিছু ভাসিয়ে তছনছ করে দেবে এমন জনও তোমার সন্তান হয়ে এসেছে। জানি না কে জিতবে! তবে সব থেকে ফরসা যে ছেলে তার সম্পর্কে সাবধান।

জাহানআরা তখন বালিকা—তিনি শুনেছিলেন অবাক হয়ে। সম্রাট সাজাহান সেই অবধি ঔরংজীবকে দেখলে যেন অন্তরে কঠিন এমন কি বাইরে দেহেও শক্ত হয়ে ওঠেন।

ঔরংজীবকে একান্তে বলেন—"শ্বেত সর্প!"

চার ভাইয়ের মধ্যে ঔরংজীব সবচেয়ে ফরসা। কিন্তু আশ্চর্য—কি রোষে কি ক্ষোভে কি বেদনায় এই শুভ্রবর্ণের অন্তরালে রক্তোচ্ছ্বাস

নিজেকে প্রকাশ করে না। মনটা তাঁর রক্তমাংসের মানুষের মন নয়। মনটা তাঁর পাথরে গড়া মানুষের মন!

—বড়ী বহেন!

—কে? ও! দারা! প্রত্যাশা করছিলাম তুমি কোথাও অপেক্ষা করছ!

—হাঁ। বাদশাহ কত বিচলিত হয়েছেন দেখেছ?

—দেখেছি। দেখ তো আশেপাশে কোথাও কেউ আছে?

—না। আমি আগে থেকে দারোগাকে বলে রেখেছি কেউ যেন না থাকে এখানে।

—তবে বস। আজ কতকগুলো কথা তোমাকে বলব।

* * *

ওদিকে শতরঞ্জ খেলার আসরে পর পর দুই বাজি জিতে বাদশাহ একটু খুশী হয়ে উঠলেন। মনের চিন্তা ভাবনা যেন হালকা হয়ে গেল। বাদশাহ এবার বললেন কোন বীণাবাদিনীকে ডাক। বীন শুনব। বীণাবাদিনী বেহাগ রাগিণীতে বাজনা ধরল। বাদশাহ খুশী হয়ে বললেন—ওয়া! তারপর সামনে চোখ তুলে তাকালেন।

সামনে চন্দ্রালোকের মধ্যে পুঞ্জীভূত জ্যোৎস্নায় গড়া প্রাসাদের মত তাজমহল ঝলমল করছে।

ওরই অভ্যন্তরে মর্মর আবরণের মধ্যে ঘুমিয়ে আছে মমতাজ। বীণাবাদিনীর বীনের তারে ঝংকার তুলে বেহাগ রাগিণীতে বাজছে— "শুনু যা, শুনু যা পিয়া!"

হঠাৎ রঙমহলে একটা আর্ত চিৎকার উঠল।

প্রথমে একটি নারীকণ্ঠের করুণ আর্ত চিৎকার। তার পরই প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনিত হয়ে উঠল আরও কয়েকজনের। সে মর্মান্তিক চীৎকারে চমকে উঠলেন বাদশাহ। কি হল? কি হল?—তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করলেন।

এই কিল্লার মধ্যে অন্ততঃ তিন-চার হাজার মেয়ে বাস করে।

এবং শত সাবধানতা সত্ত্বেও বাইরে থেকে গুপ্তপথে অন্দরের বাগবাগিচায় পুরুষ আসে যায়। মধ্যে মধ্যে ধরা পড়ে। অন্য দুর্ঘটনাও ঘটে। সে বাদশাহ জানেন।

—জাঁহাপনা! বাদশাহী হারেমের খোজা খাদিম এসে দাঁড়িয়েছে।

—কি হল? কিসের চিৎকার?

—জাঁহাপনা, হজরত শাহজাদী জাহানআরা বেগমসাহেবার কাপড়ে আগুন লেগে দাউদাউ করে জ্বলে উঠেছিল।

—জাহানআরা?

—হাঁ—

বাদশাহ সঙ্গে সঙ্গে উদ্‌ভ্রান্তের মত বেরিয়ে পড়লেন—মুখে শুধু একটি শব্দ বার বার উচ্চারিত হয়ে চলেছে।

জাহানআরা! জাহানআরা! মা! জাহানআরা! জাহানআরা!

আঠারো

শাহজাদী জাহানআরাকে পত্রশয্যা রচনা করে তার উপর শুইয়ে দেওয়া হয়েছে—তিনি উপুড় হয়ে শুয়ে আছেন। তাঁর পিছন দিকের কাপড়ে আগুন লেগে জ্বলে উঠেছিল একমুহূর্তে। আগ্রা কেল্লার অন্দরমহলের সুদীর্ঘ অলিন্দে নানান রঙের ফানুসের মধ্যে বাতি জেলে দেওয়া হয়। লাল নীল সবুজ জরদা সাদা রঙের আলোর ছটার সংমিশ্রণে যে অপরূপ আলোকের রাজ্য সৃষ্টি করে তার মধ্যে যে সব মানুষ চলে, ফেরে, ঘোরে, তারা আর মাটির মানুষ থাকে না—তারা বেহেস্তের দেবদূত বা হুরী হয়ে যায়; শুধু চেহারাতেই নয়, তাদের মনের মধ্যেও একটা যেন উজ্জ্বল রঙের নেশা ধরে। সেই নেশায় তারা প্রমত্ত হয়, মাটির সুখ দুখ ঠিক বোধ হয় তাদের মনকে আর স্পর্শ করে না। আলোগুলি সারবন্দী ছাদের মাথা থেকে জিঞ্জিরে গেঁথে ঝুলানো থাকে। কখনও কখনও বাতাসে দোলে। তারই সঙ্গে মানুষের চোখে দুনিয়ার রঙ হরঘড়ি পালটাতে থাকে। কখনও লাল কখনও সবুজ কখনও নীল কখনও জরদা।

শাহজাদা দারা সিকোর সঙ্গে কথা বলেছিলেন শাহজাদী হজরত বেগম জাহানআরা। সব কথাবার্তাই হিন্দুস্তানের বাদশাহী নিয়ে কথা। বিশেষ করে এই কিছুক্ষণ আগে যে সব কথার আলোচনা হয়ে গেল আলমপনাহ বাদশাহের সমক্ষে তারই জের। ঔরংজীব দাক্ষিণাত্য থেকে রওনা হয়েছে। রওনা হয়েছে অনুমতির জন্য সওয়ারকে রওনা করে দিয়েই। যেন ধরে নিয়েছে ঔরংজীব যে বাদশাহী হুকুমত অবশ্যই মিলবে। আসল উদ্দেশ্য এখানে এসে বাদশাহের স্নেহের এবং বাদশাহী বিচারের পরখ করা। শাহজাদা দারা সিকো কান্দাহার নিয়ে ইরানের সঙ্গে লড়াই না করেই যে খেলাত মনসব পেলেন, সে খেলাত শাহজাদা ঔরংজীব দক্ষিণে নিজামশাহী রাজ্য গ্রাস করে ঔরঙ্গাবাদকে জমজমাট করে তুলে, কুতুবশাহী

সুলতানের ও আদিলশাহী সুলতানের আনুগত্য আদায় করে বহুমূল্য ভেট নিয়ে এসেও পায় কি না এইটে সে পরখ করে দেখতে চায়।

আলোচনার মধ্যে যে কথাগুলি বাদশাহের সামনে বলা যায় নি সেই কথাগুলি ভাই বোনের মধ্যে আলোচনা হচ্ছিল।

একটা কথা শাহজাদা দারা সিকো বলতে পারেন নি বাদশাহের সামনে। কথাটা কাশ্মীরী কবি সুভগ আর বাঁদী শিরিন সম্পর্কে। এ খবর কেউ বিশদ করে ঔরংজীবকে জানিয়েছে। সেটা রৌশনআরা ছাড়া কেউ নয়, এ সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ নেই।

জাহানআরা হাসলেন, বললেন—এ আমি অনেক দিন থেকেই জানি ভাইসাহেব। লাহোর কিল্লায় বসে যখন দিল্লীর খবর পেলাম যে কাম বিলকুল হাসিল হয়ে গেছে—কোন বাধা ঘটে নি, সেই তখন থেকে। তখনই খবর পেয়েছিল রৌশনআরা দিল্লী থেকে, তার কাছেও এক নিশান গিয়েছিল—পাঠিয়েছিল খুদ উজীর। তুমি তো জান তোমার প্রতি সে প্রীত নয়। সে ঔরংজীবের পক্ষে। তবে তারা জানতে পারে নি কবি সুভগ আর শিরিন গেল কোথায়। রৌশনআরা তখনই খবর পাঠিয়েছে ঔরংজীবের কাছে। তুমি খবর রাখ নি। কিন্তু তা নিয়ে চিন্তা করে ফল নেই। ঔরংজীব যতক্ষণ তাদের ধরতে না পারবে এবং প্রমাণ না পাবে ততক্ষণ তোমার বা আমার বিরুদ্ধে কোন নালিশ করবে না। ভাইসাহেব, শুধু একটু চতুরতার সঙ্গে এবং ধীরতার সঙ্গে কাজ করুন। আলাহজরত শাহজাদা শাহবুলন্দ ইকবালকে প্রাণের অধিক ভালবাসেন। তাঁর কানের কাছে শাহজাদার বড়ী বহেন সর্বদা পাহারা দিচ্ছে যেন কেউ সেখানে কোন বিষ ঢালতে না পারে। শাহজাদাকে এখন শুধু নজর দিতে হবে আমীরদের আনুগত্য এবং প্রীতির উপর। মহাবৎ খান শাহজাদার উপর সন্তুষ্ট নন। মামাজী সায়েস্তা খাঁ, দেওয়ান মীরজুমলা, আমীর খলিল উল্লাকে প্রীতি দেখিয়ে মিষ্ট কথায় খুশী করে তাঁদের সহানুভূতি আদায় করুন। মির্জা রাজা জয়সিং, চিতোরের রানা সাহেব এঁদের

প্রীতির উপর বেশী জোর দিন। মুঘল বংশের শ্রেষ্ঠ বাদশাহ শাহানশাহ আকবর শাহের পথ যখন অনুসরণ করবেন শাহজাদা তখন কাউকে উপেক্ষা করলে চলবে না। না হিন্দু রাজা মহারাজা মহারানা, না মুসলমান সুলতান নবাব আমীর মোল্লা মনসবদার। এদের ডান হাতে ধরুন—ওদের বাঁ হাতে ধরুন। এবং আরও একটা অনুরোধ শাহজাদাকে, তিনি যেন কার কাছে কোন কথা প্রকাশ করতে পারেন এটা বেশ বিবেচনা করে দেখেন।

শাহজাদা দারা সিকো চঞ্চল হয়ে উঠলেন, বললেন—কেন বড়ী বহেনসাহেবা, আমি তো অসতর্কভাবে কথা বলি না। আপনি কাকে সন্দেহ করছেন? উদিপুরী বাঈ না রানাদিল?

হেসে উঠলেন জাহানআরা বেগম। বললেন—তাহলে শাহজাদা, আরমানি মেয়ে উদিপুরী আর হিন্দু মেয়ে রানাদিলের কাছে এ সব কথার কিছু কিছু বলে থাকেন।

—না না না। দু একটা কথা বলে থাকি বা ওরা জানতে পেরে যায়—সেও সামান্য কথা।

—সেটা ভাইসাহেব তোমার অনুমান; সে অনুমান অবশ্যই তোমার নিজের স্বভাবের গণ্ডি দিয়ে ঘেরা। তার বাইরে যা থাকে তা দেখবার চোখও তার নেই—মেজাজও তার নেই। সরল সাদা স্বভাব যাদের তাদের অনুমানের চোখের নজর খুব বেশী দূর দেখতে পায় না ভাইজান। সরল উদার শাহজাদা দারা সিকো—দেবদূতেরা শয়তানের কুটিল বুদ্ধির কাছে প্রতারিত হয়, সেইটেই তাদের পুণ্য, সেইটেই তাদের শ্রেষ্ঠ পরিচয়। কিন্তু প্রতারিত হলেও খুদাতায়লার দুনিয়ায় তাদের কখনও হার হয় না। তারাই শেষ পর্যন্ত জেতে।

শাহজাদা দারা সিকো মুগ্ধদৃষ্টিতে বড়ী বহেনের অপরূপ সুন্দর এবং বুদ্ধিদীপ্ত মুখখানির দিকে তাকিয়ে ছিলেন। জাহানআরা বেগম চুপ করে গেলেন তবু তাঁর দৃষ্টি ফিরল না—মোহ ভাঙল না।

একটু লজ্জা পেলেন বোধ হয় জাহানআরা, তিনি ডাকলেন—দারা! মেরি পিয়ারা ভাই! রাত্রি অনেক হয়ে গেল।

চমক ভাঙল দারা সিকোর। বললেন—ও। হ্যাঁ। তাহলে আজ আমি যাই।

—এস। দেখগে বোধ হয় তোমার রানাদিল অভিমান করে বসে আছে। একটু সমাদর করলেই গলে যাবে। হাজার হলেও হিন্দু লেড়কী তো। হুঁশিয়ার হয়ো ওই আরমানি বাঁদীটা সম্পর্কে। এমন বিড়ালের মত চোখ!

দারা সিকো হেসে উঠে দাঁড়ালেন। জাহানআরাও উঠে দাঁড়ালেন। দারা কিন্তু উঠে দাঁড়িয়েই গেলেন না। জাহানআরা বুঝলেন তাঁর ভাই আরও কিছু বলতে চান কিন্তু কথাটা এমনই সংকোচের কথা যে সে কথা তিনি বলতে গিয়েও বলতে পারছেন না।

জাহানআরা কথাটা অনুমান করলেন। কথাটা তাঁর হৃদয়ের কথা। একেবারে অন্তরের অন্তস্তলের কথা। তাঁর বিবাহের কথা। নসীব মুঘল সম্রাটবংশের মেয়েদের—বিশেষ করে সম্রাটের কন্যাদের। আকবর শাহের আমল থেকে নিয়ম হয়ে গেছে যে সম্রাটের কন্যাদের বিবাহ হবে না। পিতার বাদশাহী মর্যাদাকে বাঁচাবার জন্য এবং বাদশাহী তক্তের উত্তরাধিকারকে মেয়েজামাইয়ের শরিকানী দাবির জটিলতা থেকে রেহাই দেবার জন্য মেয়েরা বিবাহ করবে না। বাদশাহ কন্যাদের তাই মেনে নিতে হয়েছে। সম্প্রতি দারা সিকো এই প্রথাকে ভাঙবার চেষ্টা করছেন। প্রথমেই মনে হয়েছে তাঁর কথা, বড় সমাদর ও শ্রদ্ধার বড়ী বহেনের কথা। বল্‌খের সুলতান-বংশের এক সুলতানজাদা বল্‌খ্‌ থেকে অধিকারচ্যুত হয়ে হিন্দোস্তানে এসে বাদশাহ দরবারে মনসবী পেয়েছেন, ওমরাহীও এসেছে তার সঙ্গে সঙ্গে। তাঁর নাম নজবৎ খান। বীর্যবান এবং কান্তিমান পুরুষ তাতে সন্দেহ নেই। সাহসী অপেক্ষাও কিছু বেশী নজবৎ খান। দুঃসাহসী! জাহানআরা তাঁকে দেখেছেন। বাদশাহের দরবারে

যখন ওমরাহদের সঙ্গে রাজকার্যের আলোচনা হয় তখন ওমরাহদের মধ্যে নজবৎ খানও থাকেন। লোকটির বীরত্ব আছে—বংশগৌরব আছে—পুরুষোচিত রূপও আছে। এই নজবত খানের সঙ্গে বড়ী বহেনের বিবাহের এক গোপন কল্পনা শাহজাদা দারা সিকোর মনে এসেছে। নজবৎ খানের সঙ্গে বড়ী বহেনের বিবাহ হলে নজবৎ খানের প্রভাব-প্রতিপত্তি হিন্দুস্তানে কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। এবং নজবৎ খানকে নিজের দক্ষিণহস্ত করে নিয়ে তক্তৃতাউসের দিকে অগ্রসর হলে তাঁর গতিরোধ কেউ করতে পারবে না। তবে এ মতলবের চেয়েও বড়ী বহেনের এই বিপুল সম্মান ও সমারোহ এবং সমাদরের অন্তরালে যে একটি নিঃসঙ্গ বেদনাদায়ক একাকীত্ব আছে—বিশুষ্ক হয়ে ঝরে-যাওয়া হৃদয়-কামনার যে বিষণ্ণ সৌরভটি অহরহ চিত্তলোকে সঞ্চরণ করে ফেরে তার প্রতিকার করাই দারা সিকোর প্রধান উদ্দেশ্য।

কথাটা অনুমান করে বললেন—আরও কিছু বলতে চাও ভাইসাহেব?

—বড়ী বহেন যদি ছোট ভাইয়ের গুস্তাকি মাফ করেন তবে বলতে পারি—

—বলবার জরুরৎ নাই ভাইসাহেব। তবে একটা কথা বলি—বল্‌খ্‌এর সুলতানজাদা কি হিন্দুস্তানে এসে হিন্দুস্তানের মাটি পানির মধ্যে মাতৃস্তন্যের আস্বাদ পেয়েছেন? স্বীকার করতে পারবেন হিন্দুস্তানকে মা বলতে? তিনি কি তোমার উদার মতকে কাফেরী মনে করবেন না? হিন্দুস্তানের রাজপুত মনসবদার এবং রাজা মহারাজা মহারানাদের সুচক্ষে দেখবেন? মির্জা রাজা জয়সিং বুন্দেলা রাজা ছত্রশাল—।

হঠাৎ চুপ করে গেলেন জাহানআরা। বললেন—রাত্রি বেশী হয়ে গিয়েছে ভাইসাহেব। এ সব কথা আজ থাক। বাদশাহের কন্যাদের নসীব তো বাদশা তৈয়ার করেন না দারা সিকো, সব

মানুষের নসীব যিনি রচনা করেন তিনিই রচনা করেন। বদল করতে হলে আগে তাঁর মরজি হতে হবে।

দারা সিকো বললেন—হয়তো বদল করবার মরজি তাঁর হয়েছে বড়ী বহেন—না হলে তাঁর এই বান্দার মধ্যে এমন একটি অভিপ্রায় জাগল কেন?

জাহানআরা হেসে বললেন—অঙ্কুর বেরিয়েছে—তাকে পরিপুষ্ট হতে দাও। ভাইসাহেব আমায়—

আবার থমকে গেলেন—উচ্চারণ করতে সাহস হল না যে কথা বলছিলেন। তিনি বলতে গিয়েছিলেন—ভাইসাহেব আমার বাদশাহ গাজী হয়ে তক্তাউসে বসুন। ফিরে এনে কায়েম করুন আকবর শাহের উদার ধর্মমত, তারপর এ প্রচলিত করবার চেষ্টা করবেন। তখন ইচ্ছা হলে যেমন রাজপুতানার কাশ্মীরের রাজা মহারাজাদের বেটী এনে বাদশাহেরা বেগম করেন, শাহজাদাদের সঙ্গে সাদী দেন তেমনি ভাবেই এদের উজ্জ্বল রাজা রাজপুত্রদের হাতে কন্যা তুলে দেওয়ার রেওয়াজও করতে পারবেন।

নারীচিত্ত—, বাদশাজাদীদের চিত্তও নারীচিত্ত। নারীচিত্ত চিরকাল চায় শ্রেষ্ঠ পুরুষকে। রূপে শ্রেষ্ঠ যে পুরুষ সেই তো পুরুষশ্রেষ্ঠ। প্রেম হয় পুরুষে এবং নারীতে। সে জাত বাছে না, ধর্ম বাছে না, সে মর্যাদার মিথ্যা বাধা মানে না—সে চায় তার মনের মত জনকে।

কিন্তু কথাটা উচ্চারণ করতে পারলেন না। সাহস হল না। মুঘল বাদশাহের অন্তঃপুর, এখানে চার পাঁচ হাজার মেয়ে থাকে, চার পাঁচটা দল আছে। তাদের চর আছে। কোথায় কে আছে কে বলবে? তাছাড়া প্রবাদে বলে দেওয়ালেরও কান আছে। দেওয়ালও কথা শুনে বহন করে নিয়ে যায় যথাস্থানে। বাদশাহ বর্তমানে অন্য কোন ব্যক্তি এমন কি তাঁর পরম প্রিয় জ্যেষ্ঠ সন্তান দারা সিকোকেও বলা চলে না "আগে তুমি বাদশাহ হও।"

না, চলে না। বললেই তার অর্থ দাঁড়াবে—'এ বাদশাহের বাদশাহী খতম হোক।'

তিনি চুপ করে গিয়ে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন, বললেন—আমি যাই। তুমিও যাও। রানাদিল রাত্রির সঙ্গে সঙ্গে সিরাজীর মত মদির হয়ে উঠছে।—হেসে তিনি কৌতুক করে নিজের বেদনাকেও চাপা দিলেন।

দারা সিকো চাপাটা খুলে দিলেন, বললেন—ঔরংজীব বুন্দেলখণ্ড হয়ে আসছে বড়ী বহেন। সম্ভবতঃ বুন্দেলা রাজা ছত্রশালের সঙ্গে একটা বুঝাপড়া করে আসবে।

চমকে উঠলেন জাহানআরা বেগম।

জাহানআরা বেগমের মনের একটি গোপন কক্ষ আছে যে কক্ষের মধ্যে বুন্দেলা ছত্রশালের স্মৃতি মণি-রত্নের মত মূল্যে এবং সমাদরে সঞ্চয় করা আছে।

শালপ্রাংশু মহাভুজ রাজপুত বীর শুধু যোদ্ধাই নন একজন প্রথমশ্রেণীর সংগীতজ্ঞ। ছত্রশালের গুণমুগ্ধা জাহানআরা বেগম। জাহানআরা আত্মসংবরণ ঠিক করতে পারেন নি, একটু ঘুরিয়ে প্রকারান্তরে তিনি রাজা ছত্রশালকে নিজের অন্তরের প্রীতি শ্রদ্ধা প্রেম নিবেদন করেছিলেন; তিনি পাঠিয়েছিলেন হিন্দুস্তানের বিচিত্র প্রথার রাখী। ভাদ্র মাসের পূর্ণিমায় রঙীন রাখী পাঠিয়েছিলেন, প্রকাশ্যেই পাঠিয়েছিলেন। বোন ভাইকে পাঠায়, ভাই ভাইকে পরায়, মানুষ মানুষকে পরায়। প্রীতির চিহ্ন প্রেমের চিহ্ন। লাল রেশমের সুতো দিয়ে তৈরী রাখীর তুই প্রান্তে মুক্তা ও টকটকে লাল চুনী পাথর বসানো ঝুমকো। তাঁর রাঙা অন্তরের বার্তাই তিনি ফুটিয়ে তুলেছিলেন ওই রাখীটির মধ্যে।

প্রতিদানে ছত্রশাল উপহার পাঠিয়েছিলেন একটি বিচিত্র মনোহর

সোনালী কাঁচুলি। তার উপর মণি মুক্তা পদ্মরাগ মণির অতি নিপুণ ও সযত্ন অলংকরণ শোভা।

এরপর গোপন পত্র বিনিময়ও হয়েছে। কথাটা আগ্রার যমুনাপুলিনে সন্ধ্যার বাতাসে আন্দোলিত সাইপ্রাস গাছের পাতার খসখস আওয়াজের মধ্যে ভেসে বেড়ায়। সে কথা জাহানআরা জানেন। বীর্যে শ্রেষ্ঠ, গুণে শ্রেষ্ঠ সেই পুরুষটির জন্য কুমারী ধর্ম তাঁর ঘৃতদীপের মত দীপ্যমান। এতটুকু অপবিত্রতা তাকে স্পর্শ করে নি। মসজিদে প্রার্থনাবেদীর সম্মুখে অকম্পিত শিখায় জ্বলছে। এ শুধু তাঁর মনের কামনা। এবং এও তিনি জানেন বাদশাহজাদীদের ভাগ্য অপবাদের ভাগ্য। অপবাদ দিয়ে থাকে দরবারের মক্ষিকার মত একদল পদস্থ কর্মচারী। সাধারণ মানুষ তা শুনতে ভালবাসে। কিল্লার ভিতর গুঞ্জন করে ছড়িয়ে পড়ে এ কিস্সা। কিন্তু এ কেউ গ্রাহ্য করে না। খুদ বাদশাহ বোধ হয় শোনেন না—কেউ শোনাতে সাহস করে না। তবে তিনি ঠিক শোনেন না জানেন না এ কথা কেউ হলপ করে বলতেও পারে না। তিনিও এ সম্পর্কে কোন কথা কখনও প্রশ্ন করেন না। শুধু বাদশাজাদীর চারিদিকের গুপ্তচর চক্র শক্ত এবং সংকীর্ণ হয়ে উঠে জীবনকে কিছু অস্বচ্ছন্দ করে তোলে।

এসব কথা আগ্রা কেল্লার মধ্যে জাহানআরা বেগম থেকে কেউ বেশী জানেন না। তবুও ঔরংজীব ছত্রশালের সঙ্গে বুঝাপড়া করবে বলে স্থির করেছে শুনে তিনি চমকে উঠলেন। এবং বলে উঠলেন—দারা!

—বড়ী বহেন!

—এ খবর কে এনেছে? কার কাছে পেলে?

—ঔরঙ্গাবাদে একজন নতুন গুপ্তচর পাঠিয়েছিলাম—সে এনেছে এ খবর।

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন জাহানআরা বেগম। তারপর হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে চলতে লাগলেন অলিন্দ ধরে। দারাও

চলে গেলেন সোপানশ্রেণী ধরে নীচের তলার দিকে। একেবারে দরজার সামনেই আছে তাঁর ঘোড়া এবং দেহরক্ষীরা।

*　　　*　　　*　　　*

জাহানআরা ইতিমধ্যে বোধ হয় মাসখানেক আগে পত্র দিয়ে একটি লোক পাঠিয়েছেন ছত্রশালের কাছে। পত্রে অবশ্য সাধারণ অর্থে এমন কিছু নেই—তিনি যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে আবরণ দিয়েই লিখেছেন—"আমার রাখীবন্ধ্ ভাই যে মহার্ঘ্য উপঢৌকন পাঠিয়েছেন তাতে আমার চিত্ত যেমন খুশী হয়েছে তেমনি তৃপ্তি পেয়েছি আমি ওই কাঁচৌলি পরিধান করে। বহুৎ আরামের জিনিস। এবার রাখীবন্ধ্ ভাইয়ের কাছে বহেন আর এক আবদার করছে। হাতীর দাঁতের উপর আঁকানো বীর ছত্রশাল ভাইয়ের এক তসবীর আমি 'যাচ্না' করছি। আশা করি এ যাচ্না রাখবেন বীর ছত্রশাল।"

ওই শেষ ছত্রটিতে একটু ভুল হয়ে গেছে। শুধু বীর ছত্রশালের পরিবর্তে লেখা উচিত ছিল আমার রাখীবন্ধ্ ভাই বীর ছত্রশাল।

হ্যাঁ, উচিত ছিল।

এরই মধ্যে কেউ চীৎকার করে উঠল—আগুন—শাহজাদী—আগুন!

চমকে উঠলেন শাহজাদী জাহানআরা। দুশ্চিন্তায় গভীর ভাবে মগ্ন অবস্থায় কখন যে তাঁর সূক্ষ্ম মসলিনের শাড়ির পিছন অংশের খানিকটা বাতাসে ফুলে উঠে ওই ঝোলানো বাতিদানের শিখার সংস্পর্শে এসে জ্বলে উঠেছে তা তিনি বুঝতে পারেন নি। বুঝবার আগেই দাউদাউ করে জ্বলে উঠেছে। একে ঢাকার মসলিনের পেশোয়াজ! থাকে থাকে পাঁচ সাত থাক ঘের দিয়ে তৈরী—তার উপর আতরের স্পর্শ মাখানো। আগুনের সংস্পর্শে আসবামাত্র লেলিহান শিখায় আগুন গ্রাস করেছে।

চীৎকার করে উঠেছে একজন বাঁদী।

—আগুন! আগুন!

সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসেছে পাঁচ সাতজন বাঁদী। শাহজাদীকে জড়িয়ে ধরে নেভাবার চেষ্টা করেও পারে নি নেভাতে। তারাও পুড়েছে। শেষে শাহজাদী নিজেই বুদ্ধি করে জলন্ত পিছন দিকটা মারবেলের মেঝের উপর চেপে ধরে শুয়ে পড়েছিলেন। তাতেই আগুন কায়দা হয়ে গিয়েছিল। তখনও আগুন চেষ্টা করছিল পিছন দিক থেকে উঠে সামনের দিকটা আক্রমণ করতে কিন্তু তা আর পারে নি; অনেক জনে এসে শাহজাদীর জ্বলন্ত পরিচ্ছদ ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে কিছুটা নিজেদের দেহের চাপান দিয়ে আগুন নিভিয়ে ফেলেছিল। তখনও শাহজাদী চেতনা হারান নি, তিনি বাঁদীর সাহায্যে উঠে দাঁড়িয়ে সর্বাগ্রে চেয়েছিলেন একটি কিছু আবরণ। তাঁর পরিচ্ছদ বিপর্যস্ত হয়ে গেছে সে সম্পর্কে তাঁর সচেতনতার তীক্ষ্ণতায় বাঁদীরা আশ্চর্য না হয়ে পারে নি।

আবরু হল ইজ্জতের পহেলা ফটক। আর ইজ্জত হল বংশের সম্মানের শিরপেঁচের উজ্জ্বল অমূল্য জহরত। যে মাথার উপর তাজ আর শিরপেঁচের শোভা নেই সে নাঙ্গা মাথার আর দাম কি? হাটে মাঠে ঘাটে শহরে বাজারে সে মাথাওলা মানুষ পিঁপড়ের চাপের মত ঘুরছে, দানার সন্ধানে; চিনির গুড়ের গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে শুঁকে শুঁকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মুঘল বাদশাহ শাজাহানের জ্যেষ্ঠা কন্যা—বাদশাহ হারেমের সর্বময়ী কর্ত্রী তিনি, এ হোঁশ তিনি সারা পিঠটা পুড়ে গেলেও তখনও হারান নি। বলেছিলেন—জলদি জলদি মুঝে লে চলো। জলদি। কামরার অন্দরে।

নূরজাহান বেগমের জেসমিন প্রাসাদের মধ্যে তাঁরই কামরাখানিই জাহানআরা বেগমের নিজস্ব কক্ষ ছিল। সেই কক্ষের মধ্যে এসে খাস বাঁদীকে বলেছিলেন—জলদি হকিম সাহেবের কাছে খবর পাঠা। আর খুলে নে—আমার পোশাক খুলে নে। বদলে দে।

যন্ত্রণা ক্রমশঃ বাড়ছিল। প্রথমটায় উত্তেজনার মধ্যে যন্ত্রণা ঠিক বুঝতে পারা যায় না—অনুভবের মধ্যে আসে না, ক্রমে আসে।

প্রথম কম—তারপর দ্রুতবেগে বাড়ে। এবং একসময় মানুষ চেতনা হারায়।

বাদশাজাদীর অসীম ধৈর্য—আশ্চর্য সহ্যশক্তি—দাঁতে দাঁত টিপে তিনি উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েছিলেন মেঝের উপর। বলেছিলেন—জলদি কলার পাতা কেটে খুব ভালো করে ধুয়ে বিছানার উপর বিছিয়ে দিয়ে আমায় উপুড় করে শুইয়ে দিস। আমি বোধ হয় বেহোঁশ হয়ে যাচ্ছি।

বলতে বলতেই তিনি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। এতক্ষণে এই অজ্ঞান বেহোঁশ অবস্থার মধ্যে বাদশাজাদীর শ্বাসপ্রশ্বাস নেওয়ার তালে তালে একটি যন্ত্রণাকাতর ধ্বনি ক্রমশঃ অস্ফুট থেকে স্ফুটতর হয়ে উঠছে। কাতরাচ্ছেন তিনি।

আঃ! আঃ! আঃ। আঃ! প্রত্যেকটি নিশ্বাস ত্যাগের সঙ্গে শব্দটি যেন আপনা-আপনি যন্ত্রণাকাতর দেহের কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসছে।

ঠিক এই মুহূর্তেই খোদ বাদশাহ সাজাহান উদ্‌ভ্রান্ত কণ্ঠে ডাকলেন—জাহানআরা! জাহানআরা! বেটী! মা! মা!

দুজন বাঁদী ঘরের প্রবেশদ্বারের পর্দা ধরে দাঁড়িয়ে ছিল, বন্ধ রাখবার জন্যেই ধরেছিল তারা। বাদশাহের কণ্ঠস্বর শুনে তারা পর্দা তুলে ধরে সরে দাঁড়াল। বাদশাহ উদ্‌ভ্রান্ত পদক্ষেপে ঘরে প্রবেশ করে সংজ্ঞাহীনা কন্যাকে দেখে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। চোখে তাঁর জিজ্ঞাসা। মনের জিজ্ঞাসা তাঁর দৃষ্টিতে ফুটেছে কিন্তু মুখে তিনি প্রশ্ন করতে পারছেন না। জিভ জড়িয়ে যাচ্ছে।

জীবন কি বেরিয়ে গেছে?—উচ্চারণ করতে পারছেন না।

বাঁদী বুঝতে পারলে বাদশাহের দৃষ্টিতে ফুটে ওঠা প্রশ্নের বক্তব্য। সে বললে—হকিম ডাকতে বলে শাহজাদী বেহোঁশ হয়ে পড়েছেন।

—বেহোঁশ? স্রিফ বে-হোঁশ!

—হাঁ জাঁহাপনা—এই তো শাহজাদীর কাতরানি উঠছে নিশ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে।

—হা! হা! হা! দীপ্ত হয়ে উঠল বাদশাহের দৃষ্টি। তারপর দ্রুতপদে বেরিয়ে গিয়ে ডাকলেন রঙমহলের দারোগাকে, বললেন—এখনি জরুরী তলব পাঠাও ওয়াজির খানকে!

বাদশাহের খাস হকিম। হকিম আলিমুদ্দিন ওয়াজির খান। বাদশাহের এবং তাঁর সন্তানসন্ততির ধাতুপ্রকৃতি হকিম সাহেবের নখদর্পণে। তাঁর নাড়িজ্ঞান অসাধারণ। হিন্দুস্তানের কবিরাজদের খ্যাতিও তাঁর কাছে ম্লান হয়ে যায়।

রঙমহলের বাসিন্দারা জানে কারুর বেমার হলে হকিম সাহেব রোগীর ঘরের দরজার বাইরে পৌঁছেই বুঝতে পারেন জানতে পারেন—রোগ কি? এবং ঘরে ঢুকে রোগীর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়েই বলতে পারেন—রোগী বাঁচবে কি না? বা কতদিন রোগে ভুগবে।

দারোগা বললে—সওয়ার অনেকক্ষণ চলে গেছে জাঁহাপনা—সঙ্গে পালকিও গেছে।

বাদশাহ বললেন—আরও লোক পাঠাও—হকিম মোমিনা শিবাজীর কাছে। প্রবীণ হকিম মোমিনা তাঁর পিতা বাদশাহ জাহাঙ্গীর শাহের আমলে শিরাজ থেকে হিন্দুস্তানে এসে মহবৎ খানের গৃহ-চিকিৎসক নিযুক্ত হয়েছিল। কিছুদিনের মধ্যেই মোমিনার নাম সারা পাঞ্জাবের ওমরাহ মনসবদার থেকে নবাব সুলতানদের দরবার পর্যন্ত ছড়িয়েছে। দু-চারবার বাদশাহের তলবেও সে এসেছে। বিচক্ষণ চিকিৎসক। বাদশাহ বললেন—ডাকো—তাকে ডাকো। হ্যাঁ। আরও শোন। জুমা মসজেদে ইমামসাহেবের কাছে খবর পাঠাও, যেন শাহজাদীর আরামের জন্যে খুদার দরবারে আরজ জানানো হয়। আরও শোন—এক হাজার রুপেয়া হররোজ রাত্রে রাখা হবে শাহজাদীর মাথার বালিশের তলায়, সেই টাকা সকালে ভিক্ষুক ফকীরদের দেওয়া হবে! তারা যেন শাহজাদীর আরাম আর

জিন্দাবাদীর জন্য পুকার দেয়। আর শোন—হিন্দু হকিম কবিরাজ কে আছে তাকেও তলব দাও।

* * *

শাহজাদী বেহোঁশ হয়েই পড়ে আছেন। পুরা চৈত্র মাস বেহোঁশ। ওদিকে আগ্রার আকাশে বৈশাখের সূর্য প্রচণ্ড উত্তাপে প্রখর হয়ে উঠেছে। খসখসের পর্দা আর পাংখাবরদারের পাংখার হাওয়া সে উত্তাপের এতটুকু উপশম করতে পারে না। মানুষের দেহ যেন জ্বলে যায়। এর মধ্যে বাদশাজাদীর গোটা পিঠ এবং দুই হাতের পিছন দিকটায় পোড়া ক্ষতের নিদারুণ যন্ত্রণা। চৈত্র মাস, বসন্তকাল—এ সময়টায় মানুষের শরীরে সামান্য ক্ষতও পেকে ওঠে। জাহানআরা বেগমের গোটা পিঠখানার পোড়া ক্ষত পেকে উঠবার উপক্রম করেছে। বড় বড় হকিমদের মলম প্রলেপ তেল এবং খাবার দাওয়াই ইলাজ সত্ত্বেও তার গতি রোধ করা যাচ্ছে না।

বাদশাহ দরবার করা ছেড়েছেন একরকম। ঘুরে ফিরে আসছেন রুগ্ণা অচেতন জাহানআরার বিছানার পাশে। প্রত্যহ সন্ধ্যায় কন্যার বিছানার পাশে নতজানু হয়ে বসেন এবং একই ভাবে বসে থাকেন মধ্যরাত্রি পর্যন্ত—হাত জোড় করে প্রার্থনা করেন আরোগ্যের জন্য—নিজে হাতে প্রত্যহ প্রাতে পিঠের ক্ষত পরিষ্কার করেন। ওষুধ লাগিয়ে দেন। খাওয়ান তাও নিজে হাতে। বাদশাহ আজ যেন মমতাজ বেগমের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। শাহজাদী উপুড় হয়েই শুয়ে আছেন। না থেকে উপায় নেই। বেহোঁশ বাদশাজাদী মধ্যে মধ্যে কাত ফিরতে চেষ্টা করেই কাতরে ওঠেন—সঙ্গে সঙ্গে বাঁদীরা সন্তর্পণে ধরে সযত্নে আবার উপুড় করে দেয়। কখনও মুখখানিকে এদিক থেকে ওদিকে ঘুরিয়ে দিয়ে কিছুটা আরাম দিতে চেষ্টা করে। বাদশাহ এসে ঝুঁকে পড়ে কন্যার শীর্ণ মুখখানির দিকে তাকিয়ে দেখেন। কিছুক্ষণ দেখে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সোজা হয়ে দাঁড়ান।

শাহজাদা দারা সিকো আসেন। তাঁর মহলের বেগমরা—নাদিরা

বেগম এবং রানাদিল সুলেমান সেকো প্রভৃতিকে নিয়ে আসেন। রৌশনআরা এবং অন্য বহেনরা আসেন।

ওদিকে অন্য শাহজাদারা রওনা হয়েছেন আগ্রার দিকে। বাংলা থেকে সুজা, গুজরাট থেকে মুরাদ। দক্ষিণ থেকে শাহজাদা ঔরংজীব রওনা হয়েছেন সর্বাগ্রে। বৈশাখের প্রথমেই তিনি এসে আগ্রা পেঁ ৗছে গেলেন।

আগ্রা শহরের একপ্রান্তে নূরমঞ্জিল শাহজাদা ঔরংজীবের নিজের বসবাসের খাসমহল মঞ্জিল। শাহজাদার উপযুক্ত প্রাসাদ। সেখানে তাঁর দপ্তরখানা আছে। সেখানে খবর এসেছে আগে থেকে, শাহী দরবারে খবর এসেছে, শহরে সসৈন্যে প্রবেশের যথারীতি হুকুমনামা নেওয়া হয়েছে। অন্য সময় হলে খানিকটা সমারোহ অবশ্যই হত। অন্ততঃ শাহজাদা ঔরংজীব খবর পাঠিয়ে লক্ষ্য রাখতেন কতটা কি হচ্ছে তার বেলায় এবং মিলিয়ে দেখতেন কতটা কি হয়েছিল বিনা যুদ্ধে বিজয়ী শাহজাদা দারা সিকোর লাহোর প্রবেশের বেলায়। কিন্তু বড়ী বহেন হজরত বাদশা বেগম জাহানআরার এই জীবন-সংকটের মধ্যে সে সব ভাববারও অবকাশ নেই।

শাহজাদা ঔরংজীব মঞ্জিলে প্রবেশ করার কিছুক্ষণের মধ্যেই আগ্রা কেল্লা থেকে একখানি শিবিকা এসে প্রবেশ করল নূরমঞ্জিলে। শাহজাদী রৌশনআরা এসেছেন প্রিয়তম ভাই ঔরংজীবের সঙ্গে দেখা করতে।

ঔরংজীব তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন।

উনিশ

বেগম রৌশনআরা শাহজাদা ঔরংজীবের চেয়ে বয়সে এক বছরের বড়, বাল্যকাল থেকেই পরস্পরের মধ্যে একটি নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছে; বাদশাহ সাজাহানের পুত্রকন্যারা—শাহজাদীরা জাহানআরা থেকে শাহজাদা ঔরংজীব পর্যন্ত পরস্পরের চেয়ে এক এক বছরের ছোট বড়। জাহানআরার থেকে দারা এক বছরের ছোট, দারা সিকো শাহ সুজা থেকে এক বছরের বড়, রৌশনআরা সুজা থেকে এক বছরের ছোট এবং ঔরংজীব থেকে এক বছরের বড়। এরপর শাহজাদা মুরাদ; তিনি কিন্তু শাহজাদা ঔরংজীব থেকে ছ বছরের ছোট এবং মুরাদ থেকে শাহজাদী গৌহরআরা সাত বছরের ছোট —এবং তিনিই সর্বকনিষ্ঠা। বাল্যকালেই এই এক বছরের ছোট বড় ভাইবোনদের মধ্যে বড় বোন এবং বড় ভাই পিতামাতার স্নেহ সমাদরের প্রায় সবটুকুই আত্মসাৎ করেছিলেন—এবং তার জোরেই বাদশাহী রঙমহলে তাঁদের প্রভুত্ব ছিল সূর্যের মত; তাঁদের খ্যাতি ও দীপ্তির ছটায় অন্য ভাইবোনেরা দিনের আকাশের তারার মত না হোক অপরাহ্ণের আকাশে শুক্লপক্ষের চাঁদের মত নিষ্প্রভ এবং এক রকম অবলুপ্ত হয়েই থাকতেন। তার ফলে ভাইবোনদের মধ্যে কয়েকটি বিপক্ষ দল গড়ে উঠেছিল। দল বলতে জাহানআরা ও দারার বিপক্ষে দল ছিল একটি—রৌশনআরা এবং ঔরংজীবকে নিয়ে একটি দল। বাকী শাহ সুজা এবং মুরাদবক্স ব্যক্তিগতভাবেই জাহানআরা ও দারার বিপক্ষে দাঁড়িয়ে গিয়েছেন এবং নিজেদের আশেপাশে শক্তিশালী মনসবদার এবং প্রতাপশালী খান-ই-খানান আমীর-উর্ল-মুল্ক মহারাজা রাজাদের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। গৌহরআরা কনিষ্ঠ ভগ্নী—তিনি কারুর দলে নন—তেমন সাহস বা তীক্ষ্ণবুদ্ধিও তাঁর নেই তবুও তিনি জাহানআরা ও দারা সিকোর সমর্থক নন —তাঁদের প্রতাপ ক্ষুণ্ণ হলেই যেন খুশী হন।

শাহজাদা ঔরংজীব আগ্রায় নূরমঞ্জিলে এসে পৌঁছুবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শাহজাদী রৌশনআরার শিবিকা এসে নূরমঞ্জিলের হারেমের মধ্যে প্রবেশ করল এবং শিবিকার দোর খুলে নামলেন বেগম রৌশনআরা। তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন শাহজাদা ঔরংজীবের দুই বেগম—বেগম দিলরাস বানু এবং সাহেবাই মহল।

—আসুন দিদিজী, আসুন আসুন। কি সৌভাগ্য আমাদের এই গরীবখানার—আপনার পায়ের ধূলো পড়ল, পবিত্র হল।

হাসলেন রৌশনআরা, বললে—হাঁ—আগ্রা কিল্লার বাদশাহী হারেমের কাছে শাহজাদা ঔরংজীবের নূরমঞ্জিল গরীবখানাই বটে। এমন কি আমাদের বড় ভাই শাহজাদা দারা সিকোর মঞ্জিলের কাছেও নূরমঞ্জিলের নূর ম্লান মনে হয়।

দিলরাস বানু বললেন—দিদিজী তাঁর ভাইকে বলুন—নূরমঞ্জিলের জলুস বাড়িয়ে তাকে উজ্জ্বল করে তুলুন। এটা আমাদেরও ভাল লাগে না।

সাহেবাই মহল মুখ টিপে হেসে বললেন—বড়ী বেগম দিদিজী এর উত্তরে তাঁর ভাইয়ের চেহারার জলুসের কথা বলবেন; বলবেন —আমার ভাইয়ের রঙ সব থেকে উজ্জ্বল—তাঁর চোখ সব থেকে তীক্ষ্ণ —তাতেই সব অভাব পূর্ণ হয়ে যাবে।

—কার কিসের অভাব হল আর পূর্ণই বা কিসে হল? —বলতে বলতে বাঁদিকের একটি দরজা—যে দরজাটি সদর এবং অন্দরের মধ্যে যোগাযোগের দরওয়াজা—সেই দরজা দিয়ে প্রবেশ করলেন শাহজাদা ঔরংজীব। এবং বহেন রৌশনআরাকে অভিবাদন করে সংবর্ধনা জানিয়ে বললেন—আপনার শরীর ভাল আছে দিদি বেগমসাহেবা?

রৌশনআরা ভাইয়ের দিকে উজ্জ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে ভাল করে দেখে বললেন—হাঁ, তবিয়ৎ ভালই আছে শাহজাদা, কিন্তু মনে তো

শান্তি পাই নে ভাইসাহেব। দিদিজী হজরত বেগমের পিঠখানা পুড়ে গেছে—কষ্ট তিনি খুবই পাচ্ছেন। কিন্তু বিপদ তাঁর কেটে গেছে—শিগ্‌গিরই সেরে উঠবেন, তখন ত কোন দাহ থাকবে না। কিন্তু দিলের ভিতরে দুখ এবং ক্ষোভ একবার জ্বললে সে আর নেভে না।

ঔরংজীব একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—মালিক খুদা আল্লাহ্‌তয়লা।

রৌশনআরা বললেন—কথাটা খুবই ঠিক শাহজাদা, কিন্তু তার সঙ্গে মানুষের চেষ্টা চাই।

—দিদিজী, শাহজাদা ঔরংজীবের সে চেষ্টা নিরন্তর এবং নিরবচ্ছিন্ন—এমন কি ঘুমের মধ্যেও সে চেষ্টার চিন্তা স্বপ্ন হয়ে জেগে থাকে। কোথাও কি কসুর দেখেছেন আপনি?

হারেমের অলিন্দপথে চলতে চলতে কথা হচ্ছিল। শাহজাদা এবং রৌশনআরা চলছিলেন পাশাপাশি—তাঁদের পিছনে ছিলেন শাহজাদার দুই বেগম।

—না। শাহজাদা ঔরংজীব সম্পর্কে সে অভিযোগ কেউ করতে পারবে না।

—আপনিও না?

—আমিও না ভাইসাহেব।

—বহুৎ খুব খুশী হল আমার দিদিজী!

ভাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রৌশনআরা বললেন—তুমি কিন্তু বড় সুন্দর এবং জঙ্গী জোওয়ান হয়ে উঠেছ ভাইসাহেব। দীর্ঘদিন পরে তোমাকে দেখছি। বোধ হয় চার বছর।

—হাঁ, চার বছর।

—মধ্যে মধ্যে ভাবি তুমি যদি আগ্রায় আলাহজরতের কাছে থাকবার সুযোগ পেতে!

ঔরংজীব উত্তরে বয়েৎ আওড়ালেন—তার অর্থ হল—বাদশাহ আর দরিয়ার পানি যেন বাঁধে বাঁধা পড়ে একজায়গায় স্থির হয়ে না

থাকে ; কেন ?—না, বাদশাহ একজায়গায় থাকলে হন আরামপ্রিয় এবং তাঁর বাকী বাদশাহী এলাকার হালের উপর তাঁর নজর পড়ে না ; আর পানির বহতা রুখে গেলেই সে পানি আর নির্মল থাকে না, তার জোর থাকে না, জলুস থাকে না, আওয়াজ থাকে না। দক্ষিণে আমি আরামে নেই কিন্তু—। একটু চুপ করে থেকে বললেন—দক্ষিণের পাহলবানীর আখড়ায় তাগদ্ আমার তৈয়ার হচ্ছে দিদিজী—সময় এলে হিন্দুস্তানের পাহলবানীর আখড়ায় লড়ে তার প্রমাণ দেব।

রৌশনআরা সপ্রশংস দৃষ্টিতে ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন—সে আমি জানি। পয়গম্বর রসুলের হুকুমৎ আর কানুন সারা হিন্দোস্তানে কায়েম করবার জন্য খোদাতয়লা তোমাকে তুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। তিনিই তোমাকে এত মেহনত করাচ্ছেন—এতেই তিনি তোমাকে মজবুদ করে তুলছেন—এরই মধ্যে তিনি তোমাকে দৌলত দিচ্ছেন। বিজাপুর আর গোলকুণ্ডার সঙ্গে যে কারবার করলে তাতে নাকি তোমার মুনাফা হয়েছে বহুৎ ; তার জন্য বড় তরফের তুশ্চিন্তার আর শেষ নেই। বাদশাহের মজলিসে বার বার সেকায়েৎ হচ্ছে।

ঔরংজীব গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন—আমাকে সে কথা লিখেছিলেন। আমি জানিয়েছি—দক্ষিণে আমাকে সুবাদারী দিয়েছেন—তার সঙ্গে বিজাপুর গোলকুণ্ডা আমেদনগরের সুলতানশাহী আর পাহাড়-পর্বতময় এলাকায় মারাহাটা রাজা যারা নামে রাজা, কাজে ডাকাইত, তাদের শাসনের ভার দিয়েছেন। এর জন্য যে পল্টন আর মনসব আমাকে পুষতে হচ্ছে তার খরচ দক্ষিণের খাজানা থেকে ওঠে না। আমি পুরা হিসাব দিতে তৈয়ার আছি—বিজাপুর গোলকুণ্ডা থেকে যা পেয়েছি তা পুরাই আমি বাদশাহী খাজাঞ্চীখানায় জিম্মা দেব—আমার খরচ আমাকে দেওয়া হোক। তার উত্তরে তো জবাব মেলে নি। জবাব নেবার জন্যেই আমি এসেছি। বলতে এসেছি—বিজাপুরের সঙ্গে যুদ্ধ করে যে মুহূর্তে বিজাপুরকে খতম করব সেই মুহূর্তে বাদশাহী হুকুমৎ গেল কি—না—আপোষ কর—

খতম করা ঠিক হবে না। গোলকুণ্ডার কুতুবশাহী সুলতান আলাহজরতের কখন কোন্ উপকার করেছিলেন—তাঁকেও বাঁচিয়ে রাখবার হুকুম হল। পুরা নুকসান। হাজার হাজার সিপাহীর জান নুকসান—আর নুকসান লাখো লাখো রূপেয়া। তার সঙ্গে আপসোস এই, সুলতানশাহীর সুলতানেরা শিয়া শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে ইসলামের নামে অনাচারে সারা মুলুক ভরে দিলে। বাদশাহ হিন্দুস্তানের শাহানশাহ—ইসলামের মেহেদী—নিজে সুন্নী হয়ে এইসব বরদাস্ত করছেন। তাঁর ঘরে তাঁর সব থেকে পেয়ারের বড় ছেলে—সে তো পয়গম্বর রসুলের ইসলাম বরবাদ করে দজ্জাল আকবর শাহের মত নয়া ধরনের পয়গম্বর বনতে চলেছে।

—তুমি বুন্দেলা রাজা ছত্রশালকে নিয়ে সারা আগ্রা শহরে যে গুজবের কানাকানি চলছে তা শুনেছ ?

—শুনেছি। লাল হয়ে উঠল ঔরংজীবের মুখ। বুক ভরে একটা নিশ্বাস নিয়ে কিছুক্ষণ ধরে রেখে অজগরের মত সেটা ছেড়ে দিয়ে ঔরংজীব বললেন—সারা হিন্দুস্তানের খবর আমি রাখি বহেনজী—তোমার মনে নেই, তুমিই আমাকে জানিয়েছ হজরত বেগম জাহানআরা বেগমসাহেবার গোপন মনের খবর। আমি সে খবর কিছু যাচাই করতে চেষ্টা করেছি। হাঁ, তাঁর মনের মধ্যে এমন স্বপ্ন আছে বলেই মনে হয়। শাহজাদা দারা শিকো সম্ভবতঃ ভরসাও দিয়েছেন যে হিন্দুস্তানের মসনদে বসে তিনি এই সাদী দিয়ে হিন্দু মুসলমান নিয়ে নতুন দেশ বানাবেন। নতুন বেহেস্তে সিঁড়ি বানাবেন। হিন্দুস্তানের এতকালের হিন্দু মুসলমানের আলগ আলগ পিঁড়ি ঘুচিয়ে এক বড়া পিঁড়ি বানিয়ে দেবেন।

—যেদিন দিদিজীর কাপড়ে আগুন লাগে সেদিন এই নিয়ে কিছু কথা যেন হয়েছিল—শাহজাদা কথাটা তুলেছিলেন। কিন্তু বহেনজী বলেছিলেন—সে কথা এখন বলো না, মুখে উচ্চারণও করো না ভাইসাহেব। আগ্রা কিল্লার হারেমের ইট কাঠ পাথর এগুলো

কথা শোনে—কথা কয়। এই যে সব থামগুলো দেখছ এগুলো মানুষ হয়ে কথা বলে। আগে তুমি মসনদে বস তারপর। এর পরই তিনি বহুৎ তুরন্ত পয়ের চালিয়ে আসছিলেন তাঁর মহলের দিকে—হঠাৎ কাপড়ে আগুন ধরে গেল।

—হজরত বেগমসাহেবা এখন কেমন আছেন? খবর শুনছি বিপদ কেটে গেছে।

—হাঁ, বেহোঁশ ছিলেন—হোঁশ ফিরেছে। আলাহজরতের আঁখের আঁসু শুকিয়েছে, মুখে হাসি দেখা দিয়েছে, দরবারে এখন গিয়ে কিছুক্ষণ করে বসছেন—নইলে তো সবই প্রায় ছেড়ে দিয়েছিলেন। এখন তুমি এসেছ খুব ভাল হয়েছে, সকলের আগেই এসে গেছ। সুজা আসছে রাজমহল থেকে, মুরাদ আসছে। তুমি রওনা হয়েছ এ নিয়ে সেদিন তো অনেক কথা হয়েছিল; বিজাপুর গোলকুণ্ডায় তুমি কত টাকা জমিয়ে নিলে, কত ফৌজ বাড়ালে—এ নিয়ে শাহজাদা দারা তো গোস্সা করেছিলেন। শাহানশাহ বললেন—সে তো তোমাদেরই ভাই—আমার ছেলে—সে যদি তার দিলের টানে আসে তবে তাতে দোষের কি আছে? চুপ করে গেল ওরা দুজনে।

—সে সব খবরও পেয়ে গেছি আমি এরই মধ্যে।

মুগ্ধ বিস্ময়ে রৌশনআরা ভাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—আমিও তোমাকে বহুৎ সাবাস দিচ্ছি ভাইসাব। হাঁ, তোমার ব্যবস্থায় কোথাও এতটুকু গলতি নেই। আমি জানি এ শুধু তোমার দ্বারাই সম্ভব।

নূরমঞ্জিলের খাস কামরার মধ্যে ততক্ষণে তাঁরা এসে বসেছিলেন। সময়টা গ্রীষ্মের সময়, বৈশাখ মাস, হিন্দুস্তানের প্রখর গ্রীষ্ম সবে উঠতে শুরু করেছে। ঘরখানার দুই দিকে প্রশস্ত অলিন্দ, অন্য দুই দিকে ঘর; জানলায় দরজায় পুরু পর্দারও ওপাশে খসখসের পর্দা ঝুলানো হয়েছে, পিচকারি ভরে তাতে জল দিয়ে ভিজানো হচ্ছে

কিছুক্ষণ পরপর; ভিজে খসখসের একটি মৃদু মিষ্ট গন্ধে ভরে গিয়েছে কামরাখানা—তার সঙ্গে জ্বলন্ত আগরবাতির গন্ধ। দুজন বাঁদী পাখা দিয়ে বাতাস করছে। তেপায়ার উপর সোনার পরাতের উপর শ্বেতপাথরের গ্লাসে ঠাণ্ডাই শরবত রাখা রয়েছে। বেলা প্রথম প্রহর সবে পার হয়েছে, এরই মধ্যে বাইরে গরম বাতাস বইতে শুরু করেছে। বাতাসের দাপাদাপিতে মধ্যে মধ্যে জানালার দরজার পর্দা ঠেলে গরমের ঝলক এসে ঘরে ঢুকছে।

শাহজাদা ঔরংজীব বহেন রৌশনআরার কথায় চঞ্চল হয়ে উঠলেন। রৌশনআরা তাঁকে সাবাস দিয়ে বললেন—তোমার ব্যবস্থায় কোন ত্রুটি নেই—ফাঁক নেই। এই মিষ্ট প্রশংসার কথাটাই অকস্মাৎ শাহজাদাকে যেন একটা নাড়া দিয়ে চঞ্চল করে দিলে। শাহজাদা চঞ্চলভাবে ঘাড় নেড়ে বাঁদী দুজনকে দেখে নিয়ে বললেন—যাও, তোমরা বাইরে যাও। জরুরত নেই পাংখার।

অভিবাদন করে বাঁদী দুজন ঘর থেকে চলে গেল। ঔরংজীব পত্নী সাহেবাইমহলের দিকে তাকিয়ে বললেন—নবাববাঈ, বেটা সুলতান মহম্মদ বোধ হয় অনেকক্ষণ তোমায় দেখে নি—তা ছাড়া দিদিজী রৌশনআরা বেগমসাহেবা এসেছেন—বেটী জেবউন্নিসা মহম্মদ সুলতান এরা কেমন বড় হয়েছে দেখতে তাঁর নিশ্চয় কৌতূহল হয়েছে—

নবাববাঈ উঠে দাঁড়ালেন—তাঁর সঙ্গে বড়ী বেগম দিলরাস বানুও উঠলেন—শাহজাদা বাইরে যাওয়ার জন্য সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন। কথাটা বলেছেন নবাববাঈকে সম্বোধন করে কিন্তু বেটী জেবউন্নিসার নামটা ওর মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন—"বেগম দিলরাস বানু, কথাটা শুধু নবাববাঈকেই বলি নি, তোমাকেও বলছি।" বেগম দিলরাস বানু ইরানের খুব বড় আমীর বংশের সন্তান, শাহনাওয়াজ খাঁর বেটী—তাঁর ইজ্জত বংশগৌরব চাঘ্‌তাই বংশের গৌরব ইজ্জত থেকে কম নয়। এবং সে বিষয়ে তাঁর বিচার-বোধ

এবং স্পর্শানুভূতি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ—তার চেয়েও তীক্ষ্ণতর তাঁর বাক্য ; ঔরংজীব তাঁকে ভয় করুন বা না করুন, সমীহ করেন। তাই বেটী জেবউন্নিসার নাম করে সরাসরি তাঁকে যাবার ইঙ্গিত দেন নি। কিন্তু দিলরাস বান্থ ভুল করেন নি, তিনিও উঠলেন এবং রক্তাভ ঠোঁট দুটিকে বাঁদিকে একটু বাঁকিয়ে হেসে বললেন—বেয়াদপি মাফ করবেন বেগমসাহেবা, আমি কিছুক্ষণের জন্যে ছুটি চাচ্ছি। বেটী জেবউন্নিসাকে আমি গিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপনারা ভাই বহেন মিলে শলাহ যা আছে নিশ্চিন্ত হয়ে শেষ করুন। বন্দেগী শাহজাদা।

বলেই তাঁর দীর্ঘ বেণী আন্দোলিত করে রক্তাভ গৌরবর্ণা তন্বী পারস্য কন্যাটি মখমলের চটি পায়ে গালিচামোড়া মেঝেতেও পদক্ষেপে কিছু শব্দ তুলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। তাঁর পিছনে পিছনে বেরিয়ে গেলেন নবাববাঈ সাহেবাইমহল। তাঁর দেহ ঈষৎ ভারী। তবু এতটুকু শব্দ উঠল না। পদক্ষেপ তাঁর বিনম্রই নয় শুধু কিছুটা ভীতও বটে। তবে সতীনের এই ননদের প্রতি উষ্মাটুকু তাঁকে খুশী করেছে। নতমুখে বেরিয়ে গেলেন তিনি কিন্তু তাঁর ঠোঁটের কোণে একটু হাসি লুকোনো ছিল।

কিছুই কিন্তু ঔরংজীবের চোখ এড়াল না। এবং তাঁর অতিশুভ্র গাত্রচর্ম অত্যন্ত স্পর্শকাতর। উত্তাপ এতটুকু হলেও তাঁর শরীরকে সেটা জানিয়ে দেয় তাঁর সুন্দর শুভ্র গাত্রচর্ম, কিন্তু দেহের ও মনের সহ্যশক্তি অসাধারণ। ঈষৎ নিমীলিত চোখে তিনি একধরনের নিস্পৃহ চেয়ে দেখা সম্ভবতঃ বাল্যকাল থেকে অভ্যাস করেছেন। সেই দৃষ্টি মেলে তিনি বসে রইলেন। বেগমের পদধ্বনি অলিন্দে মিলিয়ে গেলে ঔরংজীব বললেন—আপনার নিশ্চয় মনে আছে দিদিজী, একবার আলাহজরত আমাকে সেকায়েৎ করে লিখেছিলেন —"আমি বাদশাহ সাজাহান, তুমি আমার পুত্র শাহজাদা ঔরংজীব ; তোমার ইজ্জত হিন্দুস্তানে কুতবমিনারের চেয়েও উঁচু। সেই তুমি বাদশাহী দরবারের নোকর গোলামদের সঙ্গে সমান ইজ্জত সম্ভ্রম,

দিয়ে কথাবার্তা বল—তাদের সঙ্গে কামকারবার কর—এতে চাঘ্‌তাই বংশের এবং তার সঙ্গে বাদশাহ সাজাহানের ইজ্জত খাটো হয়। এটা ঠিক নয়। তুমি তাদের মনিব এইটে সর্বদা ইয়াদ রেখে কথাবার্তা বল, কামকারবার কর এই আমি চাই।" মনে আছে আপনার?

—আছে বইকি। এটা আমাদের চোখেও লাগে ভাইজী!

—লাগে। লাগবার কথাই বটে। কিন্তু খান-ই-খানান আলিমর্দান খাঁ, খান-ই-খানান সাদুল্লা খাঁ, বড়ার হজরত সৈয়দ মীরন, খান-ই-খানান আফজল খাঁ, মির্জারাজা জয় সিং, যশোবন্ত সিং মহারাজা সাহেবদের মনিব বাদশাহ সাজাহান বটেন কিন্তু শাহজাদারা নয়। শাহবুলন্দ ইকবাল শাহজাদা দারা সিকো তাঁদের সঙ্গে মনিবের মত ব্যবহারই করেন তা দিদিজী জানেন। কিন্তু দিদিজী কি জানেন যে আলাহজরত বার বার শাহজাদা দারা সিকোকে বারণ করেছেন—বলেছেন—ভবিষ্যতে হিন্দুস্তানের বাদশাহ যদি হতে চাও তবে ওদের সঙ্গে আজ থেকেই মনিব নোকরের মত ব্যবহার করো না। কি রকম ব্যবহার করতে হয় সেটা ঔরংজীবের কাছে শিখো। কিন্তু দাদাসাহেব শাহজাদা শাহবুলন্দ ইকবাল তো শুধু হিন্দুস্তানের ভাবী বাদশাহই নন আকবর শাহের ইলাহী ধর্মের নয়া পয়গম্বর—হয়তো বা ইসলামের পয়গম্বর রসুলের মত শেষ পয়গম্বর রসুল—তিনি দুনিয়াতে শুধু জায়গীর জহরত খেলাত খেতাব দিয়েই জিন্দগী জিন্দাবাদীতে ভরে দেবেন না, ইন্তেকালের পর তিনিই তাদের মুক্তি দেবেন—বেহেস্তে পাঠাবেন; তিনি বাদশাহের কথা রাখতে চেষ্টা করেও পারেন নি। নসিব যাকে যেমন করে তার বাইরে সে যাবে কি করে!

একটু হাসলেন ঔরংজীব; সে হাসি যত তিক্ত তত প্রখর বা ধারাল বা হিংস্র।

রৌশনআরা বললেন—না, শেষ কথাটুকু আমি শুনি নি।

ঔরংজীব বললেন—আমাকে জানিয়েছিলেন উজীরসাহেব

জাফর খাঁ সাহেব। তারপর শাহানশাহ যখন দেখলেন শাহবুলন্দ ইকবাল মেজাজে মনিব হয়ে গেছেন, ওর আর প্রতিকার নেই তখন তিনি আমাকে ওই কথা লিখে নিশান পাঠান। কেন জানেন ? আমিও যদি মেজাজকে চড়িয়ে দিই কড়া করি মানুষকে আঘাত দিই তাহলে উমরাহদের যে ভালবাসাটুকু আমি জিন্দগীর মুনাফা পেয়েছি সেটুকুও হারাব। তাতে নুকসান. সবই আমার, নাফা যা হবার হবে শাহবুলন্দ ইকবালের। উজীরসাহেব জাফর খাঁ কি করে যে সবটা জেনেছিলেন জানি না। তবে তিনি আমাকে বলেছিলেন—শাহজাদা, দুনিয়াতে মানুষকে থোড়া কুছ মান ইজ্জত দিলে যদি তাদের ইমান পান তবে তার থেকে বড় আর কিছু নেই। বাদশাহী এনে দেয় সোনা রূপা হীরা জহরতের দৌলত নয়—বাদশাহী এনে দেয় মনসবদার আমীর আর সিপাহী ইমান। আমি আলাহজরতকে জবাবে লিখেছিলাম—"শাহানশাহের উপদেশ আমার জ্ঞানচক্ষু খুলে দিয়েছে। আপনি যা লিখেছেন, আমি দিব্যদৃষ্টিতে তার ভিতরের সত্য দেখতে পাচ্ছি। তবে আমি এতদিন এই সত্যকে মানতে চেয়েছি যে যে-লোক পরের ইজ্জত রাখতে নিজেকে খাটো করে খুদ আল্লাহ্ তয়লা আর পয়গম্বর রসুল তার ইজ্জত রক্ষা করেন। আমি চেষ্টা করব। তবে নসিব, যার ভাগ্যফলের কম্বলখানা কালো পশমের দড়িতে বুনে কালো করেই তৈয়ার করে সে কম্বলকে কি জম্‌জম্ বা কৌসরের পানিতে ধুয়ে কালো ঘুচিয়ে সাদা করা যায় ? এই ভাগ্যফলেই আমি সব খবর পেয়ে থাকি দিদিজী। আপনি যে সব খবর আমার কাছে পাঠিয়েছেন সে সব খবর আরও কয়েকজনেই আমার কাছে পাঠিয়েছেন। বাঁদী শিরিন আর কাশ্মীরের হিন্দু সায়র সুভগের খবর পেয়েছি ; সেই জহরতবালা মহম্মদ সৈদ আর বানিয়া লেড়কা অভয়চান্দের খবরও এঁরা দিয়েছেন। বিজাপুরের সুলতানের সুদীর্ঘকাল পরে সন্তান হয়েছে—তার জন্য শাহজাদা দারা সিকো উল্লাস প্রকাশ করেছেন—তাও আমি

খবর পেয়েছি। তাঁর হারেমে এক আর্মানী পরস্তার আছে—তার নাম উদিপুরী বাঈ—তার সফেদ মাখনের মত গায়ের রঙ আর নীল চোখে হিংসার আগুন চমকে ওঠে রানাদিলের মত একজন কাফির নাচওয়ালী মেয়ে সঙ্গী করার জন্যে আর তাকে পরস্তার করে রাখার জন্যে—এ খবরও আমি জানি।

বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন রৌশনআরা তাঁর ভাইয়ের মুখের দিকে।

ঔরংজীব বললেন—আরও নতুন খবর—নেহাতই সামান্য খবর—সেটা খুবই টাটকা—সেটাও আপনাকে বলি—ভাইসাহেব দারা সিকো তাঁর মঞ্জিলে হিন্দুস্তানের এই কড়া গরমকালে আরামে থাকবার জন্যে যমুনার কিনার ঘেঁষে মাটির তলায় এক কামরা তৈয়ার করাচ্ছেন।

হেসে উঠলেন রৌশনআরা, বললেন—তাও খবর রেখেছ তুমি।

—হাঁ দিদিজী সে খবরও আমি রাখি।

—তুমি এমনি একখানা আরাম কামরা বানাও ভাইজী!

ঔরংজীব বললেন—দিদিজী, আরাম করবার কাল আমার এখন নয়। এখনও অনেক দূরে। আর আরাম কামরা এই সামান্য মঞ্জিলে করিয়ে কি ফায়দা? কি হবে? ও সব শাহ-ই-বুলন্দ ইকবালের পক্ষেই ভাল। হাঁ—। তিনি হয়তো—

মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন রৌশনআরা।

ঔরংজীব কথাটা শেষ করতে যাচ্ছিলেন কিন্তু রৌশনআরা বললেন—থাক, বলতে হবে না ভাইজী। ও আমি সমঝে নিয়েছি। ভোগকে দূরে ঠেলে রাখাই ভাল। নসিব, পাওনা ভোগ মিটিয়ে দিতে পারলেই খালাস পেয়ে তার নিষ্ঠুর পাওনা আদায় করে নেয়।

ঔরংজীব যেন কেমন স্বপ্নাতুর হয়ে উঠলেন, বললেন—দিদিজী, ঔরংজীব দুনিয়াতে পয়দা হয়েছে পয়গম্বর রসুলের নোকর গোলাম হিসেবে। সে সুন্নী। দারু সিরাজী সে স্পর্শ করে না, নাচা গানা

বাজনা এ তার পক্ষে নিষিদ্ধ; দুনিয়াদারীর কারবারে যে দৌলত তার হাতে এসেছে সে দৌলত তার নয়—সে স্রিফ তার জিম্মাদার,—হিন্দুস্তানে ইসলামের একচ্ছত্র অধিকার—দিদিজী, ঝুটা মুসলমানী শিয়াবাদী নয়, সুন্নী মতের একচ্ছত্র অধিকার কায়েম করবার জন্যে তা খরচ হবে। আমি জীবনে ফকীর। আপনি বিশ্বাস করুন আমি ফকীর, শুধু পয়গম্বর রসুলের গুলাম হিসেবে আমি জিম্মাদার হতে চাই। আমি আমার নিজের জন্যে কোরান নকল করে রোজগার করি, টুপি সেলাই করে রোজগার করি—

বলতে বলতে তাঁর মুখ টকটকে রাঙা হয়ে উঠল। তিনি বলে গেলেন—গোলকুণ্ডাতে মহম্মদ সৈদ সারমাদ নাম নিয়ে ফকীর হয়েছে—লৌণ্ডা অভয়চান্দকে কখনও ছোকরী সাজায় কখনও যোগী সাজায়। কবীরপন্থীদের গানা গায় অভয়চান্দ—নাচে নটী সেজে। সারমাদ পারসীতে গজল মসনবী বানায়—তাও গায়। লোকটা গোলকুণ্ডা থেকে চলে এসেছে। শিরিন সুভগ চলে গেছে সম্ভবতঃ পূরব মুল্কে। এমন পাপ হাজারও হচ্ছে দিদিজী। এ সমস্ত বন্ধ করতে হবে। তারই জন্য ঔরংজীব হিন্দুস্তানের জিম্মাদারী চায় ইসলামের গোলাম হিসেবে নোকর হিসেবে। নইলে সে ফকীর।

ঠিক এই সময়ে দরজার ওপাশে পদশব্দ শোনা গেল—দরজায় মোতায়েন তাতারিনী এসে এত্তেলা জানাল—শাহজাদী জেবউন্নিসা আর শাহজাদা সুলতান মহম্মদকে নিয়ে এসেছেন বেগমসাহেবা সাহেবাইমহল।

রৌশনআরা বললেন—নিয়ে এসো নিয়ে এসো।

তাতারিনী চলে গেল। রৌশনআরা বললেন—তুমি ওবেলা কিল্লাতে গিয়ে বহেনসাহেবাকে দেখতে যাবার হুকুম চেয়েছ তো?

—নিশ্চয়।

—হাঁ। এ সময় তাঁকে দেখতে গেলে আলাহজরত খুশী হবেন। বলেই যেন হঠাৎ বলে উঠলেন—দেখ আমার একটা কথা মনে

হয়, তুমি এই সময়,—দিদিজীর হোঁশ হলেও খানিকটা সেরে উঠলেও এখনও পুরা সেরে ওঠেন নি, এখনও তাঁর ক্ষমতা হয় নি কৌশলে নালিশ চাপা দিতে,—এই সময় অন্ততঃ শিরিন আর সুভগের কথাটা তুমি তুলতে পার। আমি সব প্রমাণ প্রয়োগ ঠিক করে রেখেছি।

ঔরংজীবের কপাল কুঁচকে উঠল। একটু ভেবে বললেন—দিদিজী, আমি হিন্দুস্তানকে চিনি। দারা সিকো ইলাহী মতকে নতুন করে বাঁচাতে চান—তিনি হিন্দুস্তানকে চেনেন না। হিন্দু মুসলমান হয়ে গেলে আর সে হিন্দু হতে পারে না। হতে চাইলেও হতে দেয় না, কাছে নেয় না। দিদিজী, দুনিয়াতে কোন মুল্কে রাজার বাদশাহের জাতকে এত ছোট কেউ ভাবে না—এত ঘেন্না কেউ করে না। এটাই পয়গম্বর রসুলের মেহেরবানি। এইখানেই ইসলামের ভরসা। শিরিনকে একদিন ফিরে আসতে হবে। তার সঙ্গে সুভগকেও মুসলমান হয়ে ফিরে আসতে হবে আগ্রায়। তার সঙ্গে আরও একটা কথা বলি—শাহজাদা দারা সিকো হিন্দুদের যত ভালবাসতে যাবেন পেয়ার করবার চেষ্টা করবেন, তত তাঁকে হিন্দুরা অবিশ্বাস করবে। মুসলমান যখন হিন্দুর দুশমনি করে তখন তারা লড়াই করে—হয় মরে নয় জেতে। কিন্তু যখন দোস্ত সেজে হিন্দুর সঙ্গে মিলতে যায় তখন তারা পিছিয়ে যায়, তাদের চোখে অবিশ্বাস ফুটে ওঠে।

সাহেবাইমহল জেবউন্নিসা এবং সুলতান মহম্মদকে নিয়ে প্রবেশ করলেন। রৌশনআরা হাত বাড়ালেন—সস্নেহে বললেন—আ—কি খুবসুরত হয়েছ তোমরা! আঃ হা! বেটী জেবউন্নিসা যেন বসরাই গুলাব। সুলতান মহম্মদ বড়াভারী বীর হবে! বাঃ বাঃ!

এবং হাত বাড়িয়ে ডাকলেন—আ যাও!

—পহেলে তসলীম রাখো। তোমাদের ফুফুজী, আমার দিদিজী, শাহজাদী রৌশনআরা বেগমসাহেবা—

জেবউন্নিসার বয়স ছয়, সুলতান মহম্মদের বয়স পাঁচ। তারা

এর মধ্যেই বাদশাহী হারেমের কায়দাকানুনে দস্তুরমত পোক্ত হয়ে উঠেছে, তারা ফুফুজীকে কুর্নিশ জানিয়ে ঝুপ করে পায়ের কাছে বসে তাঁর পদচুম্বন করে 'কদমবুচি' করলে।

রৌশনআরা ওয়া ওয়া করে কেরামত করে তাদের দুজনকেই কাছে টেনে নিয়ে বুকে চেপে ধরলেন। তারপর সাহেবাইমহলকে বললেন—বেগমসাহেবাদের দুজনের কোলে তো আরও দুজন এসেছে গো। তারা কই? তোমার ভাগো তো দেখি দুইই বেটা, কি নাম ছোটর?

—মহম্মদ আজম।

—বড়ী বেগমসাহেবার ছোটি বেটী—তার নাম?

—জিন্নতউন্নিসা।

—তাদের আনলে না!

—তারা ঘুমুচ্ছে।

ওদিকে দুপহরের ঘড়ি বাজল। ঔরংজীব উঠলেন—নামাজের সময় হয়েছে। রৌশনআরা বললেন—সন্ধ্যায় কিল্লায় আসছ?

—নিশ্চয়। আলাহজরত বালবাচ্চাদের নিয়ে যেতে বলেছেন। দেখবেন তাদের।

বাইরে বেরিয়ে আসতেই গরম হাওয়ার ঝলক লাগল মুখে। মনে হল ঝলসে গেল মুখ। বোরকা চড়িয়ে তার ঢাকাটা ফেলে দিতে দিতে বললেন—ভাইজী, মাটির নীচে তুমি একখানা ঘর বানাও।

ঔরংজীব কিছু বললেন না। চললেন নামাজ পড়বার জন্য তাঁর নির্দিষ্ট কক্ষে।

কুড়ি

মাসখানেক পর।

শাহজাদা দারা সিকোর মঞ্জিলে সেদিন লোকজন, বান্দা বাঁদী, মহলদারোগা, ফরাশবরদার, সিপাহী, বর্কআন্দাজ, খাদিম খাদিমান, বাবুর্চী, খানসামা থেকে শুরু করে খুদ শাহজাদা এবং নাদিরা বেগম সকলেই খুব ব্যস্ত। এ ব্যস্ততার মধ্যে কোন ত্রস্ত ভাব নেই— সকলেই বেশ খুশী, মুখে চোখে একটা দীপ্তি।

আজ খুদ বাদশাহ আসছেন শাহজাদার মঞ্জিলে। একলা বাদশাহ নন, তাঁর সঙ্গে আসছেন আরও তিন শাহজাদা—শাহজাদা সুজা, শাহজাদা ঔরংজীব এবং শাহজাদা মুরাদবক্স। শাহজাদা শাহবুলন্দ ইকবাল মহম্মদ দারা সিকো। তাঁর মঞ্জিলে মাটির নীচে এক আরামখানা তৈয়ার করিয়েছেন—সেই আরামখানা দেখতে আসছেন বাদশাহ। কামরা তৈরি হয়ে রয়েছে বৈশাখের প্রথমেই কিন্তু আজও অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠের প্রথম সপ্তাহ হয়ে গেল এখনও শাহজাদা দারা সিকো সে আরামকামরায় আরাম করেন নি। আজ বাদশাহ এসে এই কামরায় বসবেন—কিছুক্ষণ আরাম করবেন ভরা দুপহরে, তারপর এই কামরা ব্যবহার করবেন শাহজাদা দারা সিকো।

এতদিন পর্যন্ত বাদশাহ সাজাহানের জীবনে এক দারুণ দুঃসময় এসেছিল, বাদশাহের সঙ্গে সবার দুঃসময়—বলতে গেলে গোটা বাদশাহীই যেন মুহ্যমান হয়ে বিষণ্ণ হয়ে পড়েছিল। হজরত বেগম শাহজাদী জাহানআরার কাপড়ে আগুন ধরে তাঁর গোটা পিঠটা পুড়ে গিয়েছিল, দীর্ঘদিন প্রায় মাস দুয়েক নিদারুণ উৎকণ্ঠার মধ্যে দিন কেটেছে, শাহজাদী বেহোঁশ হয়ে ছিলেন, শুধু কাতরেছেন, তাঁর বিছানার পাশে বসে বাদশাহ কেঁদেছেন আর আল্লহ্ তায়লার কাছে প্রার্থনা করেছেন। দান খয়রাত, মানত ইত্যাদির আর শেষ ছিল না। দিল্লী আগ্রার বিখ্যাত হকিমেরা চিকিৎসা করেছেন।

একজন করে মোতায়েন থেকেছেন কিল্লার মধ্যে। এই কারণেই বাদশাহের অবকাশ ছিল না। বাদশাহেরও অবকাশ ছিল না—শাহজাদা দারা সিকোর আরামখানায় আরাম করবার মত মন ছিল না মেজাজ ছিল না। তাঁর বড়ী বহেন হজরত বেগম জাহানআরা তাঁর প্রিয়তমা দিদি, তাঁর শ্রেষ্ঠ মন্ত্রণাদাতা, তাঁর শ্রেষ্ঠ শুভার্থিনী। মায়ের মত স্নেহ করেন, বন্ধুর মত দুঃখের সুখের অংশ গ্রহণ করেন; এবং বেগম জাহানআরা সাক্ষাৎ দেবীর মত পবিত্র এবং সম্ভ্রমের পাত্রী শাহজাদার কাছে। তাঁর এই নিদারুণ অসুস্থতার মধ্যে আরামের কথা তাঁর মনে হয় নি। আজ সপ্তাহখানেক বেগমসাহেবার জীবন সংকট অবস্থার উপশম হয়েছে, যন্ত্রণা কমেছে, তাঁর হোঁশ ফিরেছে, তিনি কথা বলছেন। দু'এক সময় দু'একবার ক্ষীণ রেখায় ক্লান্ত হাসি ফুটে উঠছে তাঁর শুষ্ক ওষ্ঠাধরে। পরশু থেকে দু'এক টুকরো লঘু হাস্যপরিহাসের কথা তাঁর মুখ থেকে আপনা থেকে সহজ ছন্দে বেরিয়ে আসছে, কোন দুর্লভ লতা থেকে বাতাসে ঝরে পড়া দু'চারটে ফুলের মত।

শাহজাদারা চার ভাই তাঁদের পরিবারবর্গ নিয়ে তাঁকে দেখবার জন্য এসেছেন—অপরাহ্লের পর সন্ধ্যার মুখে নামাজের পর সকলে এসে সমবেত হন, তাঁর চারপাশে ঘিরে বসেন। তাঁরা উৎকণ্ঠিত এবং ত্রস্তভাবে নীরবেই বসে থাকতেন; শাহজাদী জাহানআরা একটু নড়লে বা তাঁর কণ্ঠ থেকে একটু আওয়াজ বের হলেই সকলে—কি হল?—এই নীরব প্রশ্ন দৃষ্টিতে ফুটিয়ে পরস্পরের দিকে চেয়ে থাকতেন। জাহানআরা বেগম নিজেই সেটা ঘুচিয়ে দিয়েছেন এই লঘু হাস্যপরিহাসের ফুল ঝরিয়ে। এই হাস্যপরিহাসের ফলে যে হাস্যপরিহাসের ধ্বনি প্রতিধ্বনি উঠেছে তা এমনই মিষ্ট এবং নির্মল যে সকলের অন্তরই একটি দুর্লভ প্রসন্নতায় ভরে গেছে। বাদশাহ নিজেও তা অনুভব করেছেন।

এমন মিষ্ট মধুর নির্মল প্রসন্ন আবহাওয়া বাদশাহের সংসারে

দুর্লভ বললে কিছুই বলা হল না—সুদুর্লভ অতি সুদুর্লভ—মরুভূমিতে জলের মত, পাহাড়ের বুকে হিমপ্রবাহের মধ্যে আগুনের উত্তাপের মতই সুদুর্লভ। এ প্রসন্নতা বাদশাহী সংসারে অনেক দিন ফুরিয়েছে। শাহজাদারা যতদিন শিশু ছিলেন ততদিন এমন আবহাওয়া দুর্লভ ছিল না। কিন্তু বয়স পনের ষোল হতে হতে এমন প্রসন্নতা চিরদিনের মত হারিয়ে গিয়েছে। হঠাৎ এই বিপদকে আশ্রয় করে সে আবার দেখা দিয়েছে কয়েকদিন। আবার দিন কয়েকের মধ্যেই এ আবহাওয়া মরীচিকার রূপ নিয়ে পালিয়ে যাবে এ কথা সকলেই জানে। তবু এ কটা দিন সকলেরই বড় আনন্দে কাটছিল।

শাহজাদী জাহানআরাই পরশু মনে করিয়ে দিয়েছেন শাহজাদা দারা সিকোর এই ভারী শখের আরামকামরার কথা।

সেদিন খুব গরম উঠেছিল দুপহরে; খসখসের পর্দায় ঝারি ঝারি পানি ঢেলে এবং অনবরত পাংখাবরদারে পাংখা চালিয়েও উত্তাপের জ্বালা ও দাহের এতটুকু উপশম করতে পারে নি, সন্ধ্যার পর সে তাপ কমে এলেও তখনও যেন আগুনের আঁচ রয়েছে বাতাসে। বড়ী বহেন বড় ভাইকে দেখে হঠাৎ বললেন—তুমি নিশ্চয় বেশ কয়েক মুঠি ঠাণ্ডাইয়ের আরাম এনেছ দারা ভাইসাব; আমরা সকলেই গরমে আইঢাই করছি; তোমার পথ চেয়ে আছি। দাও ছড়িয়ে দাও ঠাণ্ডাই আরাম মেহেরবানি করে। আমরা বাঁচি।

সকলেই বিস্মিত হয়ে গেলেন—অর্থ বুঝতে কেউই পারলেন না। খুদ দারা সিকোও না। তিনি বললেন—বড়ী দিদিসাহেবা কি বলছেন আমি তো—

—বুঝতে পারছ না ভাইসাব? না না তুমি নিশ্চয় গোপন করছ আমাদের কাছে। মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন জাহানআরা, তারপর ভাইদের দিকে তাকিয়ে বললেন—তোমরা সকলে বল না দারা ভাইসাবকে। আরামের ভাগ আমাদেরও একটু দিন। শুধুই কি বেগমদের নিয়ে ভোগ করবেন? আগ্রার এই গরমে দুপহর

বেলায় আরামখানায় যমুনাকিনারে আজ কোন্ বেগম ছিল ভাইসাব ? আবার একটু মৃদু শব্দ করে হাসলেন শাহজাদী। সঙ্গে সঙ্গে অন্যেরাও মুচকে মুচকে হাসলেন। হাসলেন না শুধু তৃতীয় ভাই ঔরংজীব।

শাহজাদা দারা সিকো বললেন—আপনি মঞ্জিলের আরামখানার কথা বলছেন দিদিজী। কিন্তু সে আরামখানা আজও কেউ ব্যবহার করে নি। আপনার এই অসুখের মধ্যে আরামখানার কথা মনেই হয় নি। আপনি ভাল হয়ে উঠুন—

হঠাৎ বাইরে একটা ব্যস্ততার সাড়া উঠল। সে ব্যস্ততার ধারাধরনের সঙ্গে পরিচয় সকলেরই নিবিড়; বুঝতে বাকী রইল না যে আলাহজরত অর্থাৎ পুত্র-কন্যাদের বাদশাহ পিতা আসছেন। সংসারে সব গৃহেই পিতার পরিচয় বিশিষ্ট হয়ে ওঠে গৃহের পরিচয় বৈশিষ্ট্যে। যে গৃহের বৈশিষ্ট্য নেই সে গৃহে পিতা শুধুই পিতা—তা ছাড়া কোন বৈশিষ্ট্য নেই। কিন্তু বাদশাহী হারেমে বা মুলুকের মালিক বাদশাহ যেখানেই থাকুন—দরবার রণক্ষেত্র তাঁবু—সর্বত্রই তাঁর বাদশাহ পরিচয়টাই বড়। সে বাদশাহী হারেমে প্রিয়তমা বেগম থেকে পুত্রকন্যাদের কাছেও; তিনি সর্বপ্রথম বাদশাহ, তারপর তিনি তাঁদের স্নেহময় পিতা। শাহজাদা শাহজাদীরা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। উঠে দাঁড়ালেন। শুধু অসুস্থ শাহজাদী উপুড় হয়ে যেমন শুয়ে ছিলেন শুয়ে রইলেন।

বাদশাহ এসে সকলের অভিবাদন গ্রহণ করে, প্রিয়তমা কন্যা জাহানআরার পালঙ্কের পাশে তাঁরই জন্য রাখা আসনটির উপর বসে কন্যার কপালের উপর হাত রেখে বললেন—কেমন আছো মা ? বলতে বলতেই কন্যার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—ভালো আছ মনে হচ্ছে।

—হাঁ হজরত, আল্লার মেহেরবানি আর আপনার স্নেহে আমি আজ অনেকটা সুস্থ বোধ করছি।

স্বস্তির একটা গভীর নিশ্বাস ফেলে বাদশাহ বললেন—যে ভয় আমার হয়েছিল মা! এবং যে ভাবে তোমার গোটা পিঠখানা পুড়ে ঝলসে গেছে—! ওঃ! আল্লা মেহেরবান—তাঁর করুণা আর তোমার পুণ্যবল। যে দুশ্চিন্তা হয়েছিল। তোমার মা থাকলে তিনি তাঁর ভাগ নিতে পারতেন—হয়তো তোমাকে অনেক বেশী যত্ন করতে পারতেন।

জাহানআরা হেসে বললেন—হজরত, আমার ইচ্ছে করছে—মনে মনে আমি চাইছি যেন অসুখ সারতে আমার দেরি হয়। যত দেরি হবে তত বেশী আপনার স্নেহধারায় খুশী হব আমি। আমার অসুখ যত দিন থাকবে তত দিন যদি আপনি হররোজ আমাকে এক মুঠি করে আপনার স্নেহ দেন তবে এক রোজে এক মুঠি স্নেহ পেলে দু রোজে দু মুঠি তিন রোজে তিন মুঠি—

বাদশাহ বাধা দিয়ে বললেন—বেটী, বাপের কলিজার সব স্নেহ অনেক আগেই তোমাদের সকলকে উজাড় করে দিয়ে বসে আছি—এখন সেই স্নেহের মাসুল দিই মা, তোমাদের বেমারী হলে বুকের অসহনীয় উৎকণ্ঠা বহন করি বেশী। আর তোমাদের না দেখিয়ে চোখের জল ফেলি। আমার চোখের পানি যদি তোমার বেশী পরিমাণে কাম্য হয় বেটী তাহলে অবশ্য যা বলছিলে তা বলতে পার। কিন্তু তাতে লাভ কিছু নেই। তোমার কষ্ট হবে। তার উপর সারা মুলুক আছে, সারা মুলুকের কত নালিশ কত আরজি পড়ে রয়েছে—নজর দিতে পারছি না। তার উপর এই দারুণ জৈঠ মাসের গরম দিনে দিনে চড়ে চড়ে যাচ্ছে—সামনে আষাঢ় আসছে —তুমি স্নান করতে পারছ না। তুমি জলদি জলদি সেরে ওঠ।

শাহজাদা দারা সিকো বললেন—আলাহজরত যখন বলেছেন তখন তাঁর কথা নিশ্চয় সত্য হবে। তিনি শাহানশাহ, আল্লাহ্-তায়লার অফুরন্ত আশীর্বাদ তাঁর উপর, পয়গম্বর রসুলের তিনি ইমাম। তাঁর কথা মিথ্যা কখনও হবে না। তা ছাড়া—

হঠাৎ সাজানো গোছানো কথাগুলিকে সরিয়ে দিয়ে দারা সিকো বলে উঠলেন—তা ছাড়া এই ভাবে পড়ে আছেন বহেনসাহেবা, সারা আগ্রা শহর গরমে ধুঁকছে—কোথাও কোন আনন্দ নেই জলুস নেই, আপনি সেরে উঠুন—আমরা খুব বড় একটা ধুমধাম করি।

সকলেই কথায় সায় দিল।

স্বয়ং বাদশাহও বললেন—দারা সিকো ঠিক বলেছেন। জিন্দগীতে রোশনি না জ্বলে যদি আঁধিয়ারা ঘিরে থাকে তবে মানুষ তা সহ্য করতে পারে না।

জাহানআরা হেসে বললেন—আমি তাহলে ভালো হয়ে উঠছি হজরত। আপনার হকিমদের বলুন এর চেয়েও ভালো দাওয়াই দিতে। হাঁ আমার অসুখের জন্য আলাহজরতের কষ্টের শেষ নেই। তাঁর যত্ন পেয়েও তো আমার আফসোস যায় না—আমি তার সেবা-যত্ন করতে পারি না। ভাইসাহেবরা সব আপন আপন সুবা থেকে এখানে বসে আছেন আমার জন্যে। ঔরংজীব ভাইসাব বিজাপুর গোলকুণ্ডা থেকে অনেক কিছু এনেছেন—তার মধ্যে পুঁথি আছে কিতাব আছে—দেখতে পাচ্ছি না। শাহজাদা বাদশাহের কাছে বোধ হয় আজও খেলাত পান নি। শাহবুলন্দ ইকবাল দারা সিকো তাঁর মঞ্জিলে মাটির তলায় যমুনার কিনারায় আরামখানা করেছেন—তার পুবদিকে পাঁচিলের গায়েই নাকি দরিয়ার পানি বয়ে যাচ্ছে। দুপহরে আরামখানায় যেন কাশ্মীরের ঠাণ্ডি আরাম মেলে। এবং সে আরামখানার ভিতরটায় নাকি ফিরিঙ্গীস্তানের উমদা উমদা আয়না যা পুরা মানুষের সমান তাই দিয়ে সাজিয়েছেন; সে ঘরে আজও শাহবুলন্দ একদিন আরাম করেন নি আমার জন্যে।

দারা সিকো একটু অপ্রতিভ হয়ে বললেন—না না—তার জন্য আমার কোন দুখ নেই আফসোস নেই দিদিসাহেবা—

—তোমার নেই আমার আছে। আমার ভাইসাহেবের বেগমসাহেবাদের জরুর আছে। নাদিরা বেগম তোমার কাছে বসে

সে ঘরে এই গরমে আরাম করতে পারতেন। রানাদিল বেগম তোমাকে গানা শোনাতে পারতেন। উদিপুরী তোমার হুকুম তামিল করে তোমাকে খুশী করে খুশী হতে পারতেন।

শাহজাদার মুখ চোখ রক্তাভ হয়ে উঠল লজ্জার মাধুর্যে। জাহানআরা তাঁকে সব থেকে বেশী ভালবাসেন—এ তিনি জানেন। এবং তিনি তাঁর প্রিয়তম ভাই বলেই আজ দীর্ঘ অসুস্থতার পর শাহজাদীর সকল প্রসন্ন কৌতুক ও রসিকতার সব ছটাগুলিই তার আলো প্রতিফলিত করে বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

জাহানআরা বললেন—শাহানশা যদি মেহেরবানি করে দু'চার রোজের মধ্যেই শাহবুলন্দের মঞ্জিলে গিয়ে আরামখানায় প্রথম ঢুকে কিছুক্ষণ আরাম করে আসেন তবে আর শাহজাদার আরামখানায় আরাম করতে বাধা থাকবে না।

বাদশাহ প্রসন্নমুখেই বললেন—শাহবুলন্দ ইকবাল যদি বাদশাহকে আরজি জানিয়ে নিমন্ত্রণ করেন তবে অবশ্যই আমি সে আরজ মনজুর করব। যখন আমার প্রিয়তমা কন্যা জাহানআরা তাঁর হয়ে ওকালতি করেছেন তখন সে ওকালতিতে আমাকে তাঁর দিকেই রায় দিতে হবে। অবশ্য একলা আমাকেই নিমন্ত্রণ করবেন না সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভাইদেরও নিমন্ত্রণ জানাবেন।

দারা সিকো এর জন্য ঠিক প্রস্তুত ছিলেন না। প্রস্তাবটা তাঁর খুশীর ব্যাপার, কিন্তু এমন অতর্কিতে এল যে তিনি চমকে গেলেন। খুদ বাদশাহ বলছেন নিমন্ত্রণ করতে।

তাঁর নতুন আরামখানা তৈয়ারী হয়ে বন্ধ হয়ে পড়ে আছে বড়ী বহেনের এই বিপদের জন্য—তার জন্য কখনও সখনও হয়তো নিজের নসিবের উপর একটা অভিযোগ কাঁটার মত তাঁর মনে বেঁধে এ কথা ঠিক, কিন্তু তার জন্য কোন নালিশ কখনও তাঁর মনে ওঠে না। বরং মনশ্চক্ষে ভেসে ওঠে তাঁর দিদির মুখখানি। দিদির সঙ্গে এ নিয়ে অনেক শলাপরামর্শ করেছেন—কল্পনা করেছেন। তিনি ভাল

না হয়ে উঠলে এ ঘর ব্যবহার করতে গিয়েও দুঃখ পাবেন তিনি। আজ হঠাৎ দিদি নিজে সেই প্রস্তাব বাদশাহের সামনে পেশ করলেন এবং খুদ শাহানশাহ সঙ্গে সঙ্গে তা মঞ্জুর করলেন—সমস্ত ব্যাপারটা এমন এককথায় এত আকস্মিক ভাবে ঘটল যে তিনি বিব্রত এবং অপ্রতিভ হয়ে গেলেন একসঙ্গে।

কালই নিমন্ত্রণ করা সোজা নয় সহজ নয়; বাদশাহের উপযুক্ত অভ্যর্থনা হওয়া চাই; ভাইরা আসবেন—তাঁদের কাছে ঐশ্বর্যের জাঁক দেখানো চাই। তবু তিনি হঠলেন না। হঠবার উপায়ও নেই। একটু ভেবে নিয়েই বার বার কুর্নিশ জানিয়ে বলতে লাগলেন—জরুর জরুর। হাজারোবার লাখোবার। শাহানশাহের এই গরীব প্রজা—তাঁর আশ্রিত স্নেহতৃপ্ত সন্তান শাহানশাহের দরবারে আলাহজরতকে এবং তাঁর সঙ্গে শাহজাদা সুজা শাহজাদা ঔরংজীব শাহজাদা মুরাদবক্সকে আমার গরীবখানার সামান্য আরাম-কামরায় পায়ের ধূলা দিতে সালামত জানাচ্ছে। পরশু। পরশু এই গরীব সাগ্রহে প্রতীক্ষা করে অপেক্ষা করবে।

জাহানআরা বললেন—আলাহজরত অবশ্যই শাহজাদা ঔরংজীবের কথা স্মরণে রেখেছেন; শাহজাদা দক্ষিণে যে বাদশাহী জঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন—বিজাপুর গোলকুণ্ডার সুলতানশাহীকে দিল্লীর বাদশাহীর কব্জায় নিয়ে এসেছেন, পুরা নিজামশাহীকে জয় করেছেন তার উপযুক্ত সম্মান খেলাত দেবেন।

দারা সিকো কিছু বলবার জন্য যেন উন্মুখ হয়ে উঠেছিলেন। সম্ভবতঃ ঔরংজীবের বিরুদ্ধে তাঁর নালিশ ছিল। কিন্তু জাহানআরা উপুড় হয়ে শুয়েই তাঁর দিকে বক্র তীব্র দৃষ্টিপাতের ইঙ্গিতে যেন কিছু বললেন। যেন বললেন—না কিছু বলো না!

* * * *

শাহবুলন্দ ইকবাল শাহজাদা দারা সিকো, হিন্দুস্তানের বাদশাহ শাহানশাহ সাজাহানের প্রিয়তম জ্যেষ্ঠ পুত্র; সকলেই মোটমাট

এতকালের কানাঘুষো এবং বাদশাহের অনুগ্রহবর্ষণের ধারা দেখে জেনেছে এবং বুঝেছে যে শাহানশাহের ইচ্ছা তাঁর পরে হিন্দুস্তানের মসনদে বসবেন শাহজাদা দারা সিকো। তাঁর মঞ্জিলে বাদশাহ আসবেন, তাঁর সঙ্গে আসবেন তাঁর ছোট তিন ভাই; তাঁদের অভ্যর্থনার জন্য উপযুক্ত আয়োজন করেছেন শাহবুলন্দ ইকবাল। তবে বড়ী বহেন—ভাই বোনদের সকলের শ্রেষ্ঠ এবং জ্যেষ্ঠ জাহানআরা বেগম আজও সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হন নি সে কথা স্মরণে রেখেই তিনি আয়োজনটি যথাসম্ভব উল্লাস সমারোহের প্রগল্‌ভতাকে সংযত করেই ব্যবস্থা করেছেন।

আগ্রায় যমুনার তটভূমির উপরেই বিশাল বাদশাহী কিল্লার দক্ষিণ-পূর্বে কিছুটা দূরে তাজমহল এবং এই ইলাকার চারিপাশেই বাদশাহের খাস ইলাকা—এই ইলাকার মধ্যেই আরও নানান মঞ্জিল হাবেলী ছড়িয়ে আছে। খাস শহর ইলাকা আর খানিকটা দূরে। যমুনার তটভূমি ঘেঁষেই উত্তরদিকে বড় বড় রাজা মহারাজারা এবং ওমরাহেরা—যাঁরা বাদশাহী জমানার দিকপাল—দশ বিশ হাজারের মনসব নিয়ে বাদশাহীকে স্তম্ভের মত ধরে রেখেছেন—তাঁদের হাবেলীগুলি সারি সারি না হলেও কিছু দূর ফরাক রেখে গড়ে উঠেছে। এই দিকটাই আরামের। যমুনার হাওয়াটা মেলে। এবং হাবেলীর সঙ্গে সরাসরি দরিয়ার ঘাটের যোগ রাখা যায়। এর মধ্যে কিল্লার সব থেকে কাছে হল শাহবুলন্দের মঞ্জিল।

গোটা মঞ্জিল আগের দিন ঝাড়াই মোছাই হয়ে গেছে। আজ সকাল থেকে মঞ্জিলের পহেলা ফটক থেকে ভিতর পর্যন্ত গাঢ় লাল কাশ্মীরী গালিচা বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে; গালিচা বিছানো রাস্তার দুই পাশে ফটক থেকে খাস মঞ্জিলের সদর দরওয়াজা পর্যন্ত মাথায় আচ্ছাদনী খাটিয়ে পথটিকে ছায়াচ্ছন্ন করা হয়েছে। রাস্তার দুই পাশে আচ্ছাদনী ধরে রাখার খুঁটিগুলি লাল মখমল দিয়ে জড়ানো।

মঞ্জিলের প্রবেশদ্বারে ভারী মখমলের পর্দা। সুন্দরী বাঁদীরা রূপার পিচকারি হাতে দাঁড়িয়ে আছে, পাশের রূপার বালতিতে রয়েছে বালতিভরতি উৎকৃষ্ট গাজিপুরী গুলাবপানি।

সব থেকে বড় বৈশিষ্ট্য হল এই যে মঞ্জিলের ভিতর বাহিরের গোটা ইলাকাটা খসখস আতরের গন্ধে ভরপুর হয়ে আছে।

দারা সিকো নিজে দাঁড়িয়ে ছিলেন একখানা কামরায়, দেখছিলেন ফুলের সমারোহ। জ্যৈষ্ঠ মাস এখন, ঠিক গুলাবের সময় নয় এটা। তবু তাঁর মঞ্জিলের বাগিচায় বিচক্ষণ মালী নানান রকমের তদ্বির এবং যত্ন করে কিছু গুলাব ফোটায়; তবে এ সময় গুলাব না ফুটলেও হিন্দুস্তানের হরেকরকম ফুল ভারে ভারে ফুটে থাকে। বেলা, চামেইলী, জেসমিন, চাঁপা, টগর; সব থেকে সেরা হয়তো বা বসরাই গুলাবের চেয়েও ভাল হিন্দুস্তানের গুলেকণ্ডল অর্থাৎ কমলপুষ্প। রাশি রাশি লাল পদ্ম, শ্বেত পদ্ম আনা হয়েছে। তার পাপড়ি ছাড়ানো হচ্ছে।

এদেশে অর্থাৎ হিন্দুস্তানে ফুলের পাপড়ি ছড়িয়ে অভ্যর্থনার রেওয়াজ আছে। সে রেওয়াজ দারা সিকোর খুব পছন্দ—ভারী ভাল লাগে। তিনি মতলব করেছেন বাদশাহের প্রতি পদক্ষেপের স্থানটিতে পথের পাশে দাঁড়িয়ে একজন বাঁদী পাপড়ি ছড়িয়ে দেবে, বাদশাহ তাতে পা দিয়ে যাবেন। তিনি দাঁড়িয়ে পাপড়ি ছাড়ানো দেখছিলেন আর ছবিটি কল্পনা করছিলেন। ইচ্ছা তাঁর হয়েছিল হিন্দুদের মত মাথার উপরেও ফুলের পাপড়ি ছড়িয়ে অভ্যর্থনা করবেন কিন্তু তাতে তিনি নিবৃত্ত হয়েছেন পাছে বাদশাহ—বিশেষ করে শাহজাদা ঔরংজীব যেখানে সঙ্গে আছে সেখানে এ অভ্যর্থনা ভালভাবে গৃহীত হবে না। ঔরংজীব তাঁকে কাফের বলে থাকে তাঁর উদারতার জন্য, সে তিনি জানেন, কানে তাঁর এসেছে। তার জন্য তিনি চিন্তিত নন—তাকে আদৌ গ্রাহ্য তিনি করেন না। এক খুদা আর এক পিতা বাদশাহ ছাড়া কাউকেই তিনি গ্রাহ্য করেন না।

তবুও তাঁর মঞ্জিলে ঔরংজীব পাছে কোন খোঁচা তুলে বসে তাই সে ব্যবস্থা করেন নি।

হঠাৎ একজন সিপাহী এসে তাঁকে অভিবাদন করে দাঁড়াল। তাঁর অতিবিশ্বস্ত অনুচরদের মধ্যে সে অন্যতম ব্যক্তি।

শাহজাদা তার দিকে তাকিয়ে ভ্রূর কুঞ্চনে প্রশ্ন তুললেন। সে আবার অভিবাদন জানালে কিন্তু যতক্ষণ শাহজাদা মুখ ফুটে প্রশ্ন না করেন ততক্ষণ সে কিছু বলতে সাহস করলে না।

শাহজাদা এবার প্রশ্ন করলেন—কি ? কি বলতে এসেছ ?

—হুজুরআলি, যমুনার কিনারায় মঞ্জিলের ঘাটের থেকে কিছু দূরে বাগিচার ওপাশে একজন হিন্দু ফকীর আপনার কাছে দেখা করতে চায়। সিপাহীরা তাকে গিরপ্তার করেছিল কিন্তু তার কাছে রয়েছে হুজুরআলির সহি-করা এক দস্তক।

—আমার সহি-করা দস্তক ?!

—হাঁ জনাবআলি, খুদ মুন্সী সাহেব দেখে বললেন এই কথা। তাতে লেখা আছে "এই পণ্ডিত আর শায়র সুভগকে তার প্রয়োজন-মত সাহায্য করলে আমি খুশী হব।"

—কে ? কি নাম বললে ? শায়র সুভগ—।

—হাঁ হুজুরআলি, কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ। মাথায় পাগড়ি আছে, কপালে তিলক আছে, কাঁচা সোনেকা মাফিক গায়ের রঙ।

শায়র সুভগ! মনে মনে চঞ্চল হয়ে উঠলেন শাহজাদা দারা। কবি সুভগ ?! আগ্রা শহরে ?! এবং ঠিক আজকের দিনটিতেই সে তাঁর কাছে সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়ে এসেছে ?!

মনে পড়ে গেল বাদশাহী দরবারে কবি সম্মেলনের মুশায়ারার কথা। বাদশাহের প্রশ্ন—"জাঘ্ অজ্ দহান পরীদ্।"

"ছোট কালো পাখীটি কোথায় উড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।"

তার পাদপূরণ আর কেউ করতে পারে নি। পারবে কি করে ?

বাদশাহের জীবনের ছোট একটি কৌতুকের কথা কে জানবে ?

জেনেছিল এই কবি সুভগ।

তাঁকে জানিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে আর একখানি সুন্দর মিষ্ট মুখ মনে পড়ে গেল।

কাশ্মীরী ব্রাহ্মণের মেয়ে হরিপীতম। ঔরংজীবের বেগম নবাববাঈ সাহেবাইমহল রহমতউন্নিসার প্রিয় সখী। নবাববাঈয়ের সঙ্গে দিল্লীর হারেমে এসে ইসলামে দীক্ষা নিয়ে হয়েছিল শিরিন।

সব মনে পড়ে গেল। অনেক বিপদের ঝুঁকি নিয়ে তিনি আর বড়ী বহেন দিদিসাহেবা তাদের মিলিয়ে দিয়ে বের করে দিয়েছিলেন বাদশাহী হারেমের ভিতর থেকে, বাদশাহের নজরের ইলাকার মধ্য থেকে। তাঁর স্পষ্ট মনে পড়ছে তিনি বলে দিয়েছিলেন—দিল্লী না, আগ্রা না; কাশ্মীর না, পাঞ্জাব না—কারণ এই দিকেই বাদশাহের চলাফেরা বেশী, নজর বেশী।

দক্ষিণ তরফেও যেতে বারণ করেছিলেন।

ওদিকে আছে খুদ শাহজাদা ঔরংজীব। বাদশাহ বলেন সাদা সাপ। বাঘের হাতে নিষ্কৃতি আছে, সাপের হাতে নেই। যত তার আক্রোশ তত তার বিষ!

বলেছিলেন—পুব তরফ চলে যাও। অন্ততপক্ষে কাশী তক। এক হাজার আশরফি আর কিছু নগদ সিক্কা টাকা দিয়ে কাশীতে গিয়ে ঘর বাঁধতে বলেছিলেন। একটা কাজকামেরও বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন।

কাশীতে কবীন্দ্রাচার্য সরস্বতীর কাছে এক নিশান লিখেও দিয়েছিলেন।

উদার পণ্ডিত কবীন্দ্রাচার্য সরস্বতী। জ্ঞানযোগে তিনি তামাম দিন দুনিয়ার আর মানুষের জিন্দিগীর বিলকুল খবর জানেন। তাঁর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়েই তিনি হিন্দুর শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র বেদান্ত এবং যোগরহস্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন।

কবীন্দ্রাচার্যের বাছাই করা একদল হিন্দু পণ্ডিত এবং যোগীর সঙ্গে হিন্দু শাস্ত্র এবং হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে তিনি আলোচনা করেন। তাঁর আহ্বানে তাঁরা আগ্রায় আসেন। তাঁদের সাহায্যেই তিনি পারসীতে উপনিষদ অনুবাদ করছেন। শাহজাদা ভেবেছিলেন, সুভগ কাশ্মীরী পুরোহিত ব্রাহ্মণের ছেলে—সে এর মধ্যে অনায়াসে শিরিনকে নিয়ে সুখে বাস করবে। তাঁর কল্পনার ধর্ম, যে ধর্মের মধ্যে মুসলমান ক্রীশ্চান জৈন বৌদ্ধ এবং শাক্ত শৈব বৈষ্ণব প্রভৃতি নানান পন্থী হিন্দুরা এক হয়ে মিলে যাবে, যে ধর্মের মধ্যে খুদাতায়লা ঈশ্বর ভগবান জিহোবা গড একাত্ম এবং এক ও অদ্বিতীয়রূপে অবস্থান করবেন সেই ধর্মের প্রথম দম্পতি হবে ওরা।

তিনি নিজে তাদের দীক্ষা দেবেন।

বাইরে ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ বেজে উঠল।

—হুজুরআলি!

একজন সওয়ার এসে অভিবাদন করে দাঁড়াল।

চিন্তামগ্নতা থেকে অল্প একটু চমকে উঠে সজাগ হয়ে উঠলেন শাহবুলন্দ ইকবাল।

—কে? ও। কি? শাহানশাহ কিল্লা থেকে রওনা হয়েছেন?

—হয়তো এতক্ষণ রওনা হয়ে গেলেন। আমি দেখে এসেছি শাহজাদা ঔরংজীব এসে কিল্লায় পৌঁছলেন। শাহজাদা সুজা শাহজাদা মুরাদবক্স আগেই এসে পৌঁছে অপেক্ষা করছিলেন শুধু শাহজাদা ঔরংজীবের। তিনি পৌঁছতেই আমি রওনা হয়ে এসেছি হুজুরআলিকে খবর দিতে।

—বাদশাহী নাকাড়ার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে?

—না হুজুরআলি—এখনও—। হাঁ হুজুর—ওই যেন—।

—হাঁ। নাকাড়ার আওয়াজ উঠেছে। কিল্লার ফটক থেকে শাহানশাহ বের হলেন।

দারা সিকো চঞ্চল হয়ে উঠলেন বাইরে যাবার জন্য। ফুল নিয়ে যারা সাজাচ্ছিল তাদের ভার একজন দারোগাকে ডেকে দিয়ে বললেন—জলদি বাঁদীদের এক এক ঝুড়ি ভরতি পাপড়ি নিয়ে গুলাব-পাশওয়ালাদের পাশে খাড়ি করে দাও। হাঁ!

দারোগা কুর্নিশ করে বললে—হাঁ হুজুরআলি।

দারা সিকো পা বাড়ালেন, এমন সময় যে সিপাহী সুভগের সংবাদ এনেছিল সে অভিবাদন করে হুজুরআলির নির্দেশ প্রার্থনা করলে।

শাহবুলন্দ ইকবাল বিব্রত বোধ করলেন। এই সময়ে কবি সুভগ! বাদশাহ তাকে চেনেন। শাহানশাহের স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। তিনি খবর পেয়েছেন দক্ষিণ থেকে যে ঔরংজীবও সুভগ শিরিনের সব খবর পেয়েছে। সে জানে।

চারিদিক তাকিয়ে দেখে একজন খোজাকে বললেন—কাগজ কলম নিয়ে এস। জলদি। বহুৎ জলদি।

কাগজ কলম নিয়ে তিনি লিখলেন শুধু একটি কথা।—"কাল।"

সিপাহীকে বললেন—মঞ্জিলের ইলাকা বরাবর নদীর কিনারায় এদিকে ওদিকে যেন কেউ না থাকে। কোই না। এক আদমী না। যদি কেউ থাকে, তবে তাকে নৌকায় চাপিয়ে যমুনার ওপারে গিয়ে রেখে এস। মুন্সীকে বলো এই আমার হুকুম। কিন্তু জুলুমবাজি না হয়। হাঁ! বাদশাহ এখানে পৌঁছুবার আগেই!

বলেই তিনি দ্রুতপদে বেরিয়ে গেলেন। বাদশাহী নাকাড়ার আওয়াজ ক্রমশঃ উচ্চ হয়ে উঠছে। রাস্তার দু'ধারে সমবেত দর্শনার্থী জনতার কণ্ঠে জয়ধ্বনি উঠছে।—

দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা! জয় দিল্লীশ্বর!

শাহানশা হিন্দুস্তান কি বাদশাহ, ইসলামকে মেহেদী হজরত বাদশাহ সাজাহান জি—ন্দা—বা—দ!

কুসুমাস্তীর্ণ পথের উপর দিয়ে ধীর পদক্ষেপে বাদশাহ সাজাহান শাহবুলন্দ ইকবালের মঞ্জিলে প্রবেশ করে হেসে বললেন—শোভানআল্লা, এ তুমি করেছ কি দারা সিকো—এ যে বেহেস্তের খুসবয় তৈরি করেছ! চোখ বন্ধ করলে মনে হবে বিলকুল আর তুনিয়ায় নেই আমরা!

কথাটা মিথ্যা নয়।

মঞ্জিলের দরজায় জানালায় প্রত্যেকটিতে গরমের সময় খসখসের পর্দার আবরণ; তাতে অনবরত পিচকারি দিয়ে জলসিঞ্চন করা হচ্ছে; ভিজে খসখসের মিঠা গন্ধের সঙ্গে খসখসের আতরের গন্ধ মিশেছে। মঞ্জিলের দরজা জানালার বাইরের দিকে খসখসের পর্দা—ভিতর দিকে মখমলের; তাতে খসখসের আতর মাখানো হয়েছে অন্য অন্য জিনিসে—বসবার আসনে, চাদরে জাজিমে গুলাবের আতর মাখানো হয়েছে, তার সঙ্গে গুলাবপানি ফোয়ারার মত ধারায় দেওয়ালে ছিটিয়ে দেওয়া হচ্ছে গুলাবপাশ দিয়ে।

বড় একটা পরাতের উপর একরাশি পদ্ম। তার সঙ্গে বেলা চামেইলী চাঁপা ইত্যাদি। এইসব গন্ধদ্রব্য এত পর্যাপ্ত পরিমাণে ব্যবহার করেছিলেন দারা সিকো যে তাকে যেন মাত্রাছাড়ানো বেশী বলা চলে। তার সঙ্গে জ্বলছে ধূপদানে ধূপ লাবান এবং আগরবাতি।

শাহজাদা ঔরংজীব বললেন—শাহবুলন্দ ইকবাল আমার কথায় যেন দোষ ধরবেন না; শাহানশাহ যা বলেছেন তা অত্যন্ত খাঁটি সত্য; তুনিয়া থেকে মানুষ যখন বেহেস্তে যায় তখন তার সর্বপ্রথম দম বন্ধ হয়ে যায়। খুসবয় আর ধূপের ধোঁয়ায় বাতাস এখানে এত ভারী হয়েছে যে দম বন্ধ হয়েই আসছে।

পাংখাবরদারেরা ঘরের দেওয়ালের পাশে এবং কোণে কোণে

দাঁড়িয়ে পাংখা চালাচ্ছিল—শাহজাদার চোখের ইঙ্গিতে পাখার গতি দ্রুততর করলে। শাহজাদা দারা সিকো বললেন—আলাহজরতের কি অসুবিধা হচ্ছে?

হেসে বাদশাহ বললেন—না না। ঔরংজীব কিছু শক্ত মানুষ—তার এসব ভাল লাগে না, বিলাস মনে হয়। সে নাচা গানা শোনে না, সে শরাব ছোঁয় না—সে বহুত গোঁড়া সুন্নী।

মুরাদবক্স কিছুটা জবরদস্ত উচ্ছ্বাস উল্লাসের তরুণ। তিনি বললেন—মাফি মাংছি আমি হজরত, গোঁড়া সুন্নীদের বেহেস্তে তাহলে আছে কি? নাচা গানা নেই, হুরী নেই, জলুস নেই, জলসা নেই, খুসবয় নেই!

দারা সিকো বললেন—আলাহজরত, যাঁরা পুণ্যাত্মা পীর ফকীর দরবেশ সন্ন্যাসী—সে কি মুসলমান কি হিন্দু কি কেরেস্তান, সকলেই বলেন—সকল শাস্ত্রেই বলে যে, এই দুনিয়ার জিন্দিগী—এতে বহুত দুখ বহুত মেহন্নত বহুত আফসোস। এ থেকে ছুট্টি মিললেই তবে বেহেস্তে যাওয়া যায়। আর সব শাস্ত্রেই বলে যারা জ্ঞানী যারা খুদার ভক্ত তাদের হরবখ্‌ত্‌ তৈয়ার থাকা উচিত বেহেস্তের ডাকের জন্য। হিন্দুরা বলে এ জিন্দিগী হল গুলেকগুলের পাতার উপর পানির দানার মত। হরবখ্‌ত্‌ টলমল করছে। পাতার উপর গড়িয়ে বেড়ানো ইরানের দরিয়ার নিটোল মুক্তার মত। কখন যে গড়িয়ে পানির দানা দরিয়ার তুফানের সঙ্গে মিশে যাবে কে বলতে পারে! ভাইসাব ঔরংজীব জ্ঞানী লোক—তাঁর এইটুকুতেই দম বন্ধ হওয়ার কথা শুনলে লোকে বলেবে কি?

শাহজাদা ঔরংজীবের মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠল। সহ্যশক্তি তাঁর অসীম। অনায়াসে দেহে মৃত্যুযন্ত্রণা সহ্য করতে পারেন কিন্তু তাঁর ধর্মবিচার বা ধর্মাচরণ সম্পর্কে কোন কথা তাঁর পক্ষে অসহ্য। তাঁর মুখ লাল হয়ে উঠল, তিনি কথা কম বলেন, প্রগল্‌ভ তিনি নন কিন্তু বাক্‌যুদ্ধে পিছু হটেন না—এবং বাক্যগুলি তাঁর যুক্তিসহতার

দিক দিয়ে ইস্পাতের মত শক্ত এবং ক্ষুরের মতই ধারাল। তিনি সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠলেন—শাহ্‌বুলন্দ তাঁর ছোট ভাইকে মার্জনা করবেন—আমি মুসলমান—পয়গম্বর রসুলের গুলাম, আমি পাঁচওয়াক্ত নামাজ পড়ি, হিন্দুদের প্রাণায়াম আমার অভ্যাস নেই। শুনেছি প্রাণায়াম করলে দম বন্ধ করেও বেঁচে থাকা যায়।

শাহজাদা মুরাদ এবং সুজা এরপর হেসে ফেললেন; বাদশাহের সামনে উচ্চহাসি হাসা যায় না, আত্মসম্বরণ করেও মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন, মধ্যে মধ্যে অতিতরুণ এবং অতিউল্লাসে অভ্যস্ত শাহজাদা মুরাদের হাসির দু এক টুকরো সশব্দ হয়ে উঠল।

শাহজাদা দারার মুখ এবার লাল হয়ে উঠল। খুদ বাদশাহ উপস্থিত না থাকলে হয়তো এ বাক্‌যুদ্ধ অনেকদূর অগ্রসর হতে পারত; শাহজাদা দারা সিকো পিতার জ্যেষ্ঠপুত্র এবং সবচেয়ে সমাদরের পুত্র হিসাবে কিছুটা অসহিষ্ণু মেজাজের মানুষ; এক্ষেত্রে হয়তো তাঁর মুখ থেকে উত্তপ্ত বাক্য বের হয়ে আসত এবং কোরান উপনিষদ দুয়ের তত্ত্ব নিয়ে প্রমাণ করতে চাইতেন দুই এক—সূর্যের এ পিঠ এবং ও পিঠ—এ দু পিঠে কোন ফরখ্‌ নেই, এদিকেও যত আলো ওদিকেও তত আলো। কিন্তু বাদশাহ খুদ উপস্থিত রয়েছেন—তার উপর তাঁর মঞ্জিলেই আজ তাঁরই নিমন্ত্রণে ভাইরা এসেছেন তাই তিনি আত্মসংবরণ করতে চেষ্টা করলেন। তাতে সাহায্য করলেন বাদশাহ পিতা নিজে। দুই ছেলেকেই তিনি জানেন, তিনি জানেন দারা সিকোর চরিত্রে অসহিষ্ণুতা থাকলেও অসহিষ্ণু ক্রুদ্ধ দারা সিকোর গর্জন, ঔরংজীবের চাপা ঠোঁটে খেলে যাওয়া ঈষৎ বক্র হাস্যরেখার থেকে অনেক কম ভয়ংকর বা মারাত্মক। সাপের ফোঁসানি এবং ঝড়ের গোঙানিতে অনেক তফাত। একটা বিষাক্ত অন্যটায় সোজা শক্তির আঘাত, তোমার শক্তি থাকলে তুমি রুখতে পার।

বাদশাহ বললেন—একটু চড়াই না হয় হয়েছে খুসবয়, তা বলে তা নিয়ে এত তকরার কেন? ধূপ লাবান আগরবাতি না হয় দূরে

সরিয়ে দাও। শাহবুলন্দ ইকবালের মেহমান ছোট ভাইয়ের যদি এতে তকলিফ হয় কাশি লাগে তো কাজ কি? তা ছাড়া ওদিকে বেলা চড়ছে—বাইরে ধূপ ফি ঘড়িতে কড়া হয়ে উঠছে—এখন কি আমরা এমনি বসে তকরার করব? তার থেকে চল আমরা শাহজাদার অনেক শখের সেই আরামখানায় গিয়ে বসে আরাম করি।

সুজা এবং মুরাদ বলে উঠলেন—নিশ্চয় নিশ্চয়। এর থেকে আচ্ছা বাত আর কি হতে পারে।

বাদশাহ বললেন—চল দারা সিকো।

দারা সিকো বললেন—একটুক্ষণ অপেক্ষা করুন হজরত মেহেরবানি করে। বেটা সুলেমান সিকো বেটী পাকনিহাদবানু ওই এসে পৌঁছে গেছে—তারা হজরতকে সালামত জানিয়ে কদমবুঁচি জানাবে। তারপর তার চাচাদের।

সত্যই তখন বাদশাহের পিছন দিকে মঞ্জিলের হারেমের দিকের দরজার মুখে এসে দাঁড়িয়েছে দশ বছরের সুলেমান সিকো এবং চার বছরের পাকনিহাদবানু। তাদের সঙ্গে রয়েছে একজন বাঁদী এবং একজন খোজা বান্দা। তাদের পেছনে একজন বান্দা মাথায় করে বয়ে নিয়ে এসেছে একখানা সোনার পরাত।

পরাতে সাজানো রয়েছে মোহর, মুক্তার মালা, এবং স্বতন্ত্র একখানা থালায় একহাজার সিক্কা টাকা—বাদশাহের অমঙ্গল দূর করবার জন্য ফকীর এবং গরীবদের বিতরণের জন্য 'নিসার' হিসেবে দেওয়া হল।

ভাইদেরও কিছু কিছু উপঢৌকন এবং স্মৃতিচিহ্ন দেওয়া হল।

সুকুমার একটি কিশোর কন্দর্প এবং অপরূপা একটি ছোট মেয়ে তখন নতজানু হয়ে বসে বাদশাহ পিতামহের পদচুম্বন করে তাদের প্রণতি জানাল। পিতামহের পর পিতৃব্যদের পদচুম্বন করলে তারা।

সকলের মুখেই আশ্চর্য তৃপ্তি এবং অপরূপ প্রসন্নতার দীপ্তি ফুটে উঠেছে। নির্মেঘ সন্ধ্যাকাশে নীল কয়েকটি তারার মতই পিতা পুত্র

এবং পৌত্র পৌত্রী কয়েকজনে যেন ঝলমল করে উঠলেন কিছুক্ষণের জন্য

বাদশাহ বললেন—এই তো বেহেস্ত !

দারা সিকোর মঞ্জিলের মাটির তলায় বেশ গভীরে ঘরখানি বেশ
একদিকের দেওয়ালের প্র গায়েই যমুনার কিনারা
কিনারা ঘেঁষে বহমানা যমুনার জল এখন খুব বেশী নয়। কিন্তু ভাদ্র আশ্বিনে জল যখন কিনারা ছাপিয়ে উঠবে তখন জল এসে ঠেকবে দেওয়ালের গায়ে।

নীচের তলা অর্থাৎ মাটির তলা থেকে সোজা সিঁড়ি নেমে গেছে আরামখানায়—সিঁড়ির পরেই একটি প্রশস্ত চত্বরের মত, সেই চত্বরের সামনেই পিতল রূপার কারুকার্যকরা বেশ মজবুত কাঠের দরজা। দরজাটি বিশেষ করে তৈরী হয়েছে যাতে উপরের গরম বাতাসের দমকা বা ঝলক এসে ঘরে না ঢোকে।

শাহজাদা দারা সিকো অগ্রগামী হয়ে সকলকে নিয়ে এসে ঘরে ঢুকলেন। বাইরে যে তাতারিনী প্রহরিণী দাঁড়িয়ে ছিল সে আস্তে আস্তে দরজাটি বন্ধ করে দিলে।

ঘরে ঢুকবার জন্য সিঁড়ি বেয়ে নামবার সময়েই আবহাওয়ার উত্তাপ ক্রমশঃ শীতল থেকে শীতলতর হয়ে আসছে। ঘরের মধ্যে ঢুকবামাত্র সমস্ত দেহ যেন জুড়িয়ে গেল। মনে হল ফাল্গুনের সকালে বা সন্ধ্যায় যে প্রসন্ন শীতলতা এ শীতলতা সেই শীতলতা। এতে শীত নেই, শুধু শীতল একটি আমেজ ও আনন্দ আছে। একটা লাগে দেহে অন্যটা লাগে মনে।

সুন্দর কারুকার্যখচিত ছাদ। ছাদে এবং দেওয়ালে তাজমহলে যেমন মূল্যবান নানা রঙের পাথর কেটে বসিয়ে লতাপাতা ফুলের নকশা আঁকা আছে তেমনি নকশা আঁকা। মূল্যবান পুরু গালিচা দিয়ে ঢাকা আছে মেঝে, যেটুকু দেখা যাচ্ছে সে সবটুকুই সাদা মার্বেল

বসানো। ঘরের মেঝের উপর সারিবন্দী বসবার জন্য মসনদ বা সুখাসন পাতা আছে। এবং ঘরের দেওয়ালে মানুষের চেয়ে আকারে দীর্ঘ বহুমূল্য আয়না সারিবন্দীভাবে টাঙানো। এ সব আয়না এক ফরাসী কোম্পানি সরবরাহ করেছে। সুখাসনে বসে আয়নার দিকে তাকালে মনে হয় ঘরখানার আর আদি অন্ত নেই এবং এক একজন মানুষ অন্ততঃ পাঁচ সাত দশ জন হয়ে বসে আছে এই আদি-অন্তহীন ঘরে। পাঁচ সাত কেন আরও অনেক বেশী; আয়নায় প্রতিফলিত হয়ে চলেই গেছে চলেই গেছে।

এ ঘরের মধ্যেও খুসবয় উঠছে। তবে মাটির তলার জানালাহীন ঘর—এ ঘরে গুগগুল বা ধূপ লাবান কি আগরবাতি জ্বালানো হয় নি বা গোলাপপানি ছেটানোর ব্যবস্থা নেই, শুধু খসখসের আতরের গন্ধ উঠছে।

বাদশাহ ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে চারিদিক দেখে বললেন—বাঃ! সুন্দর হয়েছে। এ তো যেমন আরামদার তেমনি বাহার, এখানকার খুসবয়ও ঠিক যেমনটি হওয়া উচিত তেমনিটি—বহুৎ মিঠি তেমনি নরম।

তাঁর মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল। হাসতে হাসতে এসে তিনি দারা সিকো যে আসনখানির দিকে হাত বাড়িয়ে ছিলেন সেই আসনে বসলেন। আসনখানি ঠিক মধ্যস্থলে এবং খানিকটা উঁচু একটি বেদীর উপর পাতা। তাঁর আসনের দুই পাশে দুখানি করে চারখানি আসন। প্রতি আসনের সামনে অতি সূক্ষ্ম কারুকার্যখচিত জয়পুরী মীনকরা গোল থালার মত পাত্র কাঠের পায়ার উপর বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। কাশ্মীরী কাঠের কারুকার্য-করা ছকোনা ত্রিপায়াজাতীয় আসবাব।

বাদশাহ আসন গ্রহণ করবার পরই দারা সিকো ভাইদের দিকে ফিরে বললেন—ভাইসাহেব সব এবার তোমরা বস।

তাঁরা সকলে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন। মুগ্ধ হয়েই দেখছিলেন।

দারা সিকো আবার বললেন—বস। ভাই সুজা!

—হাঁ ভাইজী।

—বেরাদারজান ঔরংজীব—মুরাদবক্স। বস।

তাঁরা কিছু বলবার আগেই বাদশাহ হেসে বললেন—কেমন হয়েছে বল। কেমন লাগছে? শাহজাদা সুজা কি বল? ঔরংজীব? মুরাদ? বল, তোমাদের কার কি মত বল?

ঘরের কোণে কোণে সুন্দরী বাঁদীরা পরিচর্যার জন্য দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল, তারা সুখাসনগুলিকে অকারণে ঝেড়ে নেড়ে দিয়ে বোধ হয় বসবার কথা মনে করিয়ে দিল।

বাদশাহের প্রশ্নে সুজা একটু চমকে উঠে বললেন—খুদ আলাহজরত এখানে রয়েছেন—তাঁর থেকে রুচি এবং সৌন্দর্যের সমঝদার, বিশেষ করে ইমারতের—এ আর কেউ দুনিয়ায় নেই।

মুরাদ উৎসাহভরে রায় দিলেন—বেশক্।

—সুতরাং যা বলবার তিনিই বলবেন, আমরা শুনব।

বাদশাহ বললেন—ঔরংজীব!

ঔরংজীব ঠিক দরজার মুখটিতেই প্রায় দাঁড়িয়ে স্থির-দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে আছেন। কিছু ভাবছেন, যেন গভীরভাবে চিন্তামগ্ন। এক একবার পিছনের দিকে তাকাচ্ছেন—পিছনে বন্ধ দরজাটা।

বাদশাহ আবার ডাকলেন—ঔরংজীব!

এবার ঔরংজীবের খেয়াল হল, সাড়া দিলেন—হজরত!

—কি ভাবছ তুমি?

—না হজরত। কিছু না। দেখছি। দেখছি ওই আয়নার মধ্যে কত বড়ভাই দারা সিকো সারিবন্দী পর পর দাঁড়িয়ে আছেন।

—কেন, সে তো আমরা সকলেই রয়েছি।

—আমি হজরত শাহবুলন্দের প্রতিবিম্বগুলিই দেখছি।

দারা সিকো বললেন—তুমি বস ভাইজান! আলাহজরত জিজ্ঞাসা করছেন এ ঘর তোমার কেমন পছন্দ হয়েছে, বল।

বাদশাহ বললেন—প্রথমে বস তুমি। সকলেই বসেছে, তুমিই দাঁড়িয়ে আছ। বুঝতে পারছি না কি ভাবছ। আয়নার মধ্যে প্রতিবিম্ব—এ তো আগ্রা কিল্লার হারেমে বা তোমাদের মঞ্জিলে নতুন নয়। তাছাড়া আগ্রা কিল্লার হামামের ভিতর আয়নার তো অন্ত নেই। আকবর শাহের আমলে হয়েছে সে হামাম।

ঔরংজীব বার বার অভিবাদন করে বললেন—সে প্রশ্নের যে জবাব ভাইসাহেব শাহজাদা সুজা দিয়েছেন—ভাই মুরাদবক্স সায় দিয়েছেন তার থেকে তো দুসরা কিছু হতে পারে না। কেমন হয়েছে সে হজরত বলবেন, আমরা শুনব।

দরজার বাইরে চত্বরে মানুষের পায়ের শব্দ উঠল। এই মাটির তলার ঘরে ধ্বনির প্রতিধ্বনি অনেকগুণে বেশী উঁচু জোরালো হয়ে ওঠে; এতটুকু শব্দ এতবড় হয়; মৃদু ঝরনা ঝরার মত হাসির শব্দ পাগলাঝোরার মত খলখল করে ওঠে। বাইরে উপর থেকে যে সিঁড়ি নেমে এসেছে তাতে পায়ের ধ্বনি এবং সেই ধ্বনির সঙ্গে আভরণের রিনিঠিনি শব্দ সেতার ঝংকারের মত বাজতে শুরু করেছে। বুঝতে পারা যাচ্ছে কোমল এবং কঠোর পদধ্বনি একসঙ্গে আসছে, অলংকারের ঝংকারও বাজছে, বান্দা এবং বাঁদীরা নেমে আসছে।

দারা সিকো এগিয়ে গেলেন দরজার মুখে, ঔরংজীব একটু সরে দাঁড়ালেন। দারা সিকোর সঙ্গে এসে ঘরে ঢুকল খাদিম ও খাদিমানের দল। তারা বয়ে নিয়ে এসেছে ঠাণ্ডাই শরবতের গ্লাস বসানো পরাত। শ্বেতপাথরের গ্লাসে কয়েক রকম শরবত স্বতন্ত্রভাবে পরাতে পরাতে সাজানো। পোড়ানো আমের শরবত, তরবুজার শরবত, ঘোলের শরবত; তাছাড়া রেকাবে রেকাবে সাজানো শুকনো মেওয়া ফল; টাটকা আঙুর, কাটা খরবুজা, কাটা টুকরো করা ল্যাঙড়া আম, গুলাবজাম। অন্য একজন নিয়ে এসেছে পান মসলা।

শাহজাদা দারা সিকো রেকাবগুলি নিজের হাতে তুলে বাদশাহের সামনে ধরে ধরে সাজিয়ে দিলেন। বাদশাহের পর ভাইদের শরবতের গ্লাস এবং রেকাব এগিয়ে দিতে উদ্যত হলেন।

বাদশাহ একটি শরবতের গ্লাস তুলে নিয়ে চুমুক দিয়ে বললেন—শাহজাদা দারা সিকো, আমি যদি বলি তোমার এই আরামকামরার আরাম বহুত উমধা কিন্তু কামরার সাজাই কিছু বেশী কিছু চড়া হয়ে গেছে তাহলে তুমি ক্ষুণ্ণ হবে না তো?

থমকে দাঁড়ালেন দারা সিকো। একবার ঘরের ছাদ এবং দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে দেখে নিয়ে বললেন—বেশী হয়েছে?

—হয়েছে শাহজাদা! জলুস জমক জেরাসে কমতি হলে ভাল হত!

—বাদশাহ যা বলছেন তা নিশ্চয় সত্য। কিছু সাজসজ্জা জলুস কমিয়ে দেব।

—আলাহজরত দুনিয়ার সব থেকে বড় রইস—হিন্দুস্তানের মুলুকে মালিক শাহানশাহ সাজাহানের চোখের নজর আর রুচিকে আমার হাজারো লাখো সালাম। এর থেকে নির্ভুল বিচার আর হয় না, হতে পারে না।

কথাটা বললেন শাহজাদা ঔরংজীব। বাদশাহ তার দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বিস্মিত হয়ে গেলেন। একা বাদশাহ নন, তাঁর সঙ্গে শাহজাদা সুজা মুরাদও। এখনও ঔরংজীব সেই দরজার মুখে প্রবেশপথের ধারেই বসে আছেন। যাওয়া আসা যারা করছে তাদের পায়ের ধুলো কিছুটা যে তাঁকে ছিটে লাগছে এতে সন্দেহ নেই।

বসবার আসন সবই মেঝেতে বিছানো গালিচার উপর পুরু গদি ও মসনদ (তাকিয়া) দিয়ে সাজানো। সে আসনে না বসে ঔরংজীব একটা তাকিয়া টেনে নিয়ে ওই দরজার পাশেই বসেছেন।

শাহানশাহ সবিস্ময়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন—বেটা ঔরংজীব, তুমি ও কোথায় বসেছ? বসবার জন্য আসন ছেড়ে দরজার সামনে যাওয়া আসার পথের ধারে ও কোথায় বসেছ?

শ্বেতপাথরে গড়া মুখের মত ঔরংজীবের ভাবলেশহীন শুভ্রবর্ণ মুখ। তিনি বললেন—বেশ বসেছি হজরত।

—বেশ বসেছ! ওই কি বেশ বসা? বললেন শাহানশাহ।—যাওয়া আসার পথের পাশে বান্দা বান্দীর পায়ের ধুলোও লাগতে পারে। বেটা, তুমি শাহানশাহের বেটা শাহজাদা। তোমার মর্যাদার উপযুক্ত আসনে বসা উচিত।

—হজরতের সামনে আমি ধূলার উপর বসলেও আমার ইজ্জতের এতটুকু বেইজ্জতি হবে না।

শাহজাদা দারা এবার হেসে বললেন—এবার বেরাদারজান শাহজাদা ঔরংজীব যে একজন শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী তার পরিচয় দিয়েছেন। ছুনিয়াতে মানুষ শ্রিফ মুসাফের, সে চলনেবালা, পথের ধারেই সে বিশ্রামের সময়টুকুর জন্য ডেরা বাঁধে—তাই বোধ হয় আমাদের শিখিয়ে দিচ্ছেন!

*　　　*　　　*

বিচিত্র ঔরংজীব। চাঘ্তাই বংশে এত বিচিত্র জটিল মন এবং এত বিপুল সাহস ও ইচ্ছাশক্তি নিয়ে বোধ হয় কেউ জন্মায় নি।

এখনও তাঁর কানের কাছে বড় ভাই শাহজাদা দারা সিকোর কয়েকটা কথা যেন ফিসফিস করে কেউ পুনরুক্তি করে তাঁকে অতি সতর্ক এবং সজাগ করে রেখেছে।

এ মঞ্জিলে প্রবেশ করেই কড়া খুসবয়ের প্রসঙ্গ নিয়ে যে ধূপের ধোঁয়ায় এবং উগ্র সুগন্ধে দম বন্ধ হওয়ার কথা তিনি বলেছিলেন তার জবাবে শাহজাদা দারা সিকো যে জবাব দিয়েছিলেন সেই কথাগুলি কেউ যেন ফিসফিস করে অনবরত বলছে কানের পাশে।

"ছুনিয়ার সব শাস্ত্রেই বলে যে, যারা জ্ঞানী, যারা খুদার ভক্ত তাদের হরবখ্‌ত্‌ তৈয়ার থাকা উচিত বেহেস্তের ডাকের জন্য। কার যে কখন ডাক পড়বে এ কে বলতে পারে? হিন্দুদের শাস্ত্রে বলে এ জিন্দিগী পদ্মের পাতার উপর জলবিন্দুর মত অস্থির—সর্বদা টলমল

করছে, কোন্ মুহূর্তে ওই জিন্দিগীর জলবিন্দু দরিয়ার তুফানে পড়ে মিশে এক হয়ে যাবে সে কে জানে? ভাইসাব ঔরংজীব জ্ঞানী, এত অল্পে দম বন্ধ হবার ভয় করলে চলবে কেন?"

ওই শেষ কথাটা "এত অল্পে দম বন্ধ হবার ভয় করলে চলবে কেন" একটা ভয়ংকর চেহারা নিয়েছে এই ঘরের মধ্যে। তিনি ওই আয়নার মধ্যে নিজেদের ঠিক দেখছেন না, দেখছেন, শুধু দারা সিকোকে। এক দারা সিকো দশ বিশ চালিশ পচাশ শও—কত জন হয়ে ঘিরেছে তাদের মাটির তলার এই ঘরের মধ্যে।

তুনিয়ার কোলাহল জীবনস্পন্দন কোথায়? কত দূরে? ও! একটি শব্দ আসছে না আগ্রা শহরের! একটি ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ না! একটি নাকাড়ার শব্দ না!

এই ঘরটিতে ঢুকেই তিনি চমকে গেছেন। এ কি করলেন শাহানশাহ! তিনি করুন করুন—সুজা মুরাদ করুন—তিনি কেন করলেন এ মারাত্মক ভুল!

শাহজাদা দারা সিকো তাঁদের একদম বোকা বানিয়ে এই ঘরে বলে-কয়েই তো এনেছেন—"এত অল্পে দম বন্ধ হবার ভয় করলে চলবে কেন?"

তার অর্থ কি তবে এই? এই একদরজাওয়ালা মাটির তলার ঘরে তাঁদের বসিয়ে তাঁদের আপ্যায়ন করবার জন্য দারা সিকো অনবরত বাইরে যাচ্ছেন ভিতরে ঢুকছেন। কখনও আনছেন শরবত কখনও ফলের টুকরো, কখনও এটা কখনও সেটা। এইভাবে যাওয়া-আসা করতে করতে যদি একবার বাইরে গিয়ে এই মজবুদ দরওয়াজাটা বাইরে থেকে সজোরে টেনে তালা বন্ধ করে দেন তাহলে কে কি করবেন? কি করবেন শাহানশাহ? কি করতে পারেন তাঁরা তিন ভাইয়ে? প্রাণ ফাটিয়ে চীৎকার করলে কি বাইরের জগৎ একবিন্দু শব্দ শুনতে পাবে? তাঁরা সকলে মিলে লাথি মারলে কি এ দরজা ভাঙবে?

"এত সহজে দম বন্ধ হবার ভয় করলে চলবে কেন ?"

ঠিক কথা, ঘড়িতে ঘড়িতে প্রহর, আট প্রহরে এক রোজ; ক' রোজে এই ঘরে দম বন্ধ হয়ে তাঁরা মরবেন তা কে জানে ?

সেই চিন্তা তাঁর মনের মধ্যে পাক খাচ্ছে। এবং সেই মুহূর্ত থেকে তিনি এই যাওয়া-আসার পথের ধারে দরজার ঠিক মুখে বসে আছেন।

সজাগ এবং সতর্ক রয়েছেন—যে মুহূর্তে দারা সিকো বাইরে গিয়ে ভারী দরজাটা ঠেলবার জন্য হাত বাড়াবেন সেই মুহূর্তে তিনি তাঁর উপর ঝাঁপ দিয়ে পড়বেন।

মূর্খ তিনি নন। না— ; নন।

কুটিল ? হ্যাঁ তিনি তা বটেন। দুনিয়াকে তিনি চেনেন। মানুষের প্রকৃতিকে তিনি জানেন।

—ঔরংজীব ! শাহানশাহ আবার ডাকলেন।

—হজরত !

—এখানে এসো ; তোমার জন্য পাতা আসন খালি রয়েছে ; বস। এসো।

—আমি এখানে বেশ আছি হজরত। আপনাকে আমি পরে জানাবো—বলবো ; এখন আমাকে অনুগ্রহ করে আর হুকুম করবেন না।

শাহানশাহ স্তম্ভিত হয়ে গেলেন ঔরংজীবের স্পর্ধা দেখে ! দুঃসাহস দেখে ! তিনি হয়তো কঠিন আদেশ করতেন কিন্তু সেই মুহূর্তেই পরমাসুন্দরী একটি মেয়ে বীণা হাতে এবং একটি মেয়ে পায়ে ঘুঙুর বেঁধে নাচের জন্য তৈরি হয়ে ঘুঙুর বাজিয়ে ঘরে এসে ঢুকল।

বাদশাহ সাজাহান মেয়ে দুটির মুখের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। সুজা এবং মুরাদবক্সও অপলকদৃষ্টিতে তাদের দেখছেন। তারা শাহানশাহকে কুর্নিশ করে সামনে বসল।

বীণাবাদিনীর আঙুলের স্পর্শে বীণা ঝংকার দিল। নর্তকীর পায়ের নড়াচড়ায় রূপোর ঘুঙুর মৃদু শব্দ করে উঠল।

কয়েক মুহূর্ত পরেই বীণা বাজিয়ে গাইয়ে মেয়েটি তার সুর মেলালে—আ—

অতি মধুর কণ্ঠস্বর!

*　　*　　*

গান যখন শেষ হল তখন শাহানশাহ বার বার বাহ্ বাহ্ শব্দে সাধুবাদ দিলেন। এতক্ষণে তিনি দরজার দিকে তাকালেন—দেখলেন শাহজাদা ঔরংজীব নেই।

তিনি এই গানের মগ্নতার মধ্যে কখন বেরিয়ে চলে গেছেন তা কেউ জানতে পারেন নি।

দরজার তাতারিনী প্রহরিণী বললে—জহুরের অর্থাৎ দুপহরের নামাজের সময় হয়েছে বলে তিনি চলে গেছেন।

শাহানশাহের মুখ রাঙা হয়ে উঠল। এতবড় স্পর্ধা এতবড় দুঃশীলতা তিনি কখনও বরদাস্ত করেন নি।

অন্য কেউ হলে তাকে এখুনি কারারুদ্ধ করবার হুকুম জারি করতেন।

বাইশ

শাহবুলন্দ ইকবাল শাহজাদা দারা সিকোর আরামখানা থেকে দুপহরের নামাজের সময় হয়েছে বলে শাহজাদা ঔরংজীব বেরিয়ে চলে এসেছিলেন, বাদশাহের অজ্ঞাতসারে; বাদশাহ কেন শাহজাদা দারা বা শাহজাদা সুজা বা মুরাদ এঁরাও কেউ ঘুণাক্ষরে বুঝতে পারেন নি। কখন যে শাহজাদা ওই মাটির নীচের আরামখানা থেকে বেরিয়ে চলে এসেছিলেন সে এক বাঁদীরা, যারা ওই দরজার পাশেই দাঁড়িয়েছিল—তারা ছাড়া আর কেউ দেখে নি, দেখবার অবকাশও পায় নি।

অত্যন্ত দ্রুত এবং যেন চকিতের মধ্যেই তিনি উঠলেন এবং মুক্ত দ্বারপথে বেরিয়ে চলে গেলেন।

যে বাঁদী দুজন বীণা ও সেতার নিয়ে এসে বাদশাহের সামনে বসল তারাই ওই ঘরে ঢুকবার দরজাটি খুলেছিল; সেই খোলা দরজাটি দরজার পাশের তাতরিনী বন্ধ করবার জন্য যেমনি দরজাটা ঠেলেছে অমনি শাহজাদা ঔরংজীব তাঁর পা বাড়িয়ে পা দিয়ে দরজাটা রুখে দিয়ে হাতের ইশারাতে জানালেন—সবুর।

তখন ঘরের সকলের দৃষ্টি ওই গায়িকা দুটির উপর। বাদশাহ সাজাহান সংগীতবিলাসী এবং রূপের সুরতের কদরদান লোক, সুন্দরী বাঁদীর ঠোঁটের উপরে বা গালে সযত্নে আঁকা তিলটিকে তিনি চুম্বন করে ঠোঁট দিয়ে তুলে নেন; শাহজাদা সুজা রূপযৌবনের বন্যায় ভেসে যাওয়াটাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ সুখ বলে মনে করেন, শাহজাদা মুরাদের তো কথাই নাই, তাঁর এই নতুন যৌবন—সবে আঠারো বছর বয়স—এখন থেকেই নারীদেহ ভোগে কুরঙ্গিণী-প্রিয় বাঘের মত তাঁর লোলুপতা এবং গ্রাস, এবং সে বিষয়ে তাঁর অহংকার আছে। তাঁর চোখ দুটোর মধ্যে মুহূর্তে মুহূর্তে লালসার চমক খেলে যাচ্ছে। এই অবস্থার মধ্যে ধর্মপ্রাণ কঠোরচরিত্র ঔরংজীব

নিঃশব্দে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে নিজে হাতে দরজাটি বন্ধ করে দিয়ে বললেন—দ্বিপ্রহরের নামাজের সময় হয়েছে। আমি যাচ্ছি। বাদশাহ যদি আমার কথা জিজ্ঞাসা করেন তবে বলো নামাজের জন্যই আমি চলে যাচ্ছি। গীত গানা হচ্ছে—এর মধ্যে আমি নামাজের কথা মনে পড়িয়ে দিয়ে ব্যাঘাত করতে চাই নে।

তিনি হনহন করে সিঁড়ি অতিবাহন করে উঠে এলেন মাটির তলা থেকে মাটির উপরে। এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়ালেন, তারপর উপরের দিকে মুখ তুলে মৃদুস্বরে বললেন—এয় মেহেরবান খোদা! তোমার মেহেরবানি এমনিভাবেই যেন তোমার এই গোলামকে চিরদিন সচেতন করে রাখে। সে যেন কোন কিছুর মোহে নিজেকে হারিয়ে না ফেলে।

বলতে বলতেই তিনি মঞ্জিল থেকে বেরিয়ে এলেন।

সেই দিন সন্ধ্যার সময় রৌশনআরা বেগমের তাঞ্জাম এসে ঢুকল শাহজাদা ঔরংজীবের মঞ্জিলে।

শাহজাদা চিন্তান্বিত মুখেই বসে ছিলেন।

বড় ভাই দারা সিকোর আরামখানা থেকে ওইভাবে চলে তিনি এসেছেন, খোদাতায়লাকে বার বার হাজার ধন্যবাদ জানাচ্ছেন কিন্তু তাঁর মন শান্ত হচ্ছে না। সেই তখন থেকেই ক্ষণে ক্ষণে মনে প্রশ্ন জেগে উঠছে—কাজটা কি ঠিক হয়েছে?

—কাজটা— ?

বার বার নিজেই বলছেন—ঠিক হয়েছে। নিশ্চয় ঠিক হয়েছে। ঠিক করেছি আমি। হাজারবার ঠিক করেছি।

—শাহানশাহ ক্রুদ্ধ হবেন। বদ্‌তমীজি করেছ তুমি—বেতরিবতি করেছ তুমি। শাহানশাহের সম্মানের হানি হয়েছে এতে।

—কি করব? কি করতে পারি? শাহানশাহ পিতা—তিনি নিশ্চয়ই তুনিয়ার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ পূজ্য জন সম্মানের পাত্র। কিন্তু

খুদা—লা ইলাহি ইল্লাল্লা—দিন দুনিয়ার বাদশাহের বাদশাহ—তাঁকে স্মরণের সময় চলে যাচ্ছিল, কুরানের নির্দেশ অমান্য হচ্ছিল—

—থাম থাম। তুমি বলে আসতে পারতে। শাহানশাহের অনুমতি নিতে পারতে—

বুকখানা যেন ধড়ফড় করে ওঠে। দুর্দান্ত সাহসী শাহজাদা ঔরংজীব যেন একটা অসহনীয় অস্বস্তিতে অধীর অস্থির হয়ে ওঠেন। নিজের সুখাসন থেকে উঠে অস্থির ভাবে পায়চারি করতে শুরু করেন। ব্যাপারটা লক্ষ্য অনেকেই করেছে—মায় দিলরাস বানু এবং নবাববাঈ পর্যন্ত—কিন্তু এ প্রশ্ন তাঁকে করবে কে?

সারা দিনটাই প্রায় এমনিভাবে কেটেছে। নিদারুণ গরমের মধ্যেও তিনি একবার চোখ বোজেন নি। স্থির হয়ে বসে পাখার হাওয়ার আরাম নেন নি।

সন্ধ্যার সময় গোসল করে নামাজ সেরে সবে এসে খোলা ছাদের উপর বসেছেন এমন সময় ইত্তালা এল—দিদিসাহেবা শাহজাদী রৌশনআরা এসেছেন।

উদগ্রীব আগ্রহে চঞ্চল হয়ে উঠলেন শাহজাদা। বললেন—নিয়ে এস—শীগগির নিয়ে এস।

এবং নিজে দরজার মুখে দাঁড়ালেন। আলোকিত অলিন্দের মধ্যে খানিকটা দূরে আসছিলেন রৌশনআরা, সঙ্গে নবাববাঈ। দিলরাস বানু নেই। পারস্যদেশের এই আমীর কন্যাটির মেজাজ বড় চড়া। গুণ-দেওয়া ধনুকের ছিলার মত যেন চব্বিশ ঘণ্টাই টং টং করে বেজে উঠছে। ভালই হয়েছে। ঔরংজীব দিলরাস বানুর সামনে কেমন যেন শক্ত এবং আড়ষ্ট হয়ে গেছেন বলে অনুভব করেন। নবাববাঈ অনেকটা আদর পিয়াসিনী বিল্লীর মত। হিন্দুস্তানের মেয়েগুলোর ধারাই এই।

রৌশনআরা এসে থমকে দাঁড়ালেন। মুখ তুলে তাঁর মুখের

দিকে তাকালেন। তাঁর মুখে এবং চোখের দৃষ্টিতে একটি ভাষা ছিল। উৎকণ্ঠা প্রশ্ন উদ্বেগ—অনেক কিছু ছিল তার মধ্যে।

ঔরংজীব বললেন—আমি উৎকণ্ঠিত আগ্রহে দিদিসাহেবার পথ চেয়ে রয়েছি। মনে মনে যেন তোমাকেই স্মরণ করছি সেই দুপুরবেলা থেকে।

—উৎকণ্ঠার সীমা আমারও নেই ভাইজান। অনেক আগেই আসবার ইচ্ছা ছিল। অন্ততঃ লোক পাঠাবার জন্যও মন অধীর হয়েছিল। কিন্তু বিলকুল বাদশাহী হারেম থেকে দপ্তর পর্যন্ত যেন থমথমে হয়ে উঠেছে। মনে হচ্ছে এমন গরম হয়ে উঠেছে আবহাওয়া যে একটা প্রচণ্ড আঁধি উঠবে। পারলে হয়তো ধুলোর রাশ উড়িয়ে আমাদের চাপা দিয়ে যাবে। কিন্তু কি করেছ তুমি? কেউ বলছে মেজাজ খারাপ করে তুমি উঠে চলে এসেছ, কেউ বলছে তুমি শাহানশাহের হুকুমত না মেনে নামাজের সময় হয়েছে বলে বুক ফুলিয়ে চলে এসেছ—

বাঁশের চাপে চাপা-পড়া ভর্তি জোয়ান রাজগোখুরা সাপের মত যন্ত্রণাকাতর এবং ক্রুদ্ধ একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে শাহজাদা বললেন—হ্যাঁ, চলে এসেছি।

—চলে এসেছ নামাজের সময় হয়েছে বলে—

—হ্যাঁ নামাজের সময় তখন হয়েছিল। ওঁরা বাঁদীদের গানা শুনে ভুলে গেলেন—আমি ভুলতে পারি নি। কিন্তু—

—শাহানশাহকে না বলেই তুমি চলে এলে?

—হ্যাঁ তা এসেছি। না এলে—।

—না এলে? কি ভাইসাহেব? আমি আশ্চর্য হয়ে গেছি ঔরংজীব, যে তুমি এমন ভুল করলে!

—ভুল?

—হ্যাঁ ভুল। প্রকাণ্ড ভুল—চরম ভুল। বাদশাহ গোস্সায় আগুন হয়ে গেছেন।

—কিন্তু না এলে হয়তো, হয়তো কেন দিদিজী, এমন ভুল করতাম যে তার সংশোধন আর কেউ করতে পারত না।

—ভাইজী, এ কথা তুমি না বলে অন্য কেউ বললে আমি বলতাম যে সে পাগল হয়ে গেছে। এ তুমি কি বলছ?

—ঠিকই বলছি দিদিজী। শাহানশাহ আলাহজরত শাহবুলন্দ ইকবাল দারা সিকো অন্ত প্রাণ। তিনি স্নেহান্ধ। শাহজাদা সুজা দারা সিকোর ঐশ্বর্যে ঈর্ষান্বিত কিন্তু সে কামুক এবং সংগীত ও সুরাবিলাসী। ছোট ভাই মুরাদ—সে একটি বুদ্ধিহীন গোঁয়ার—তার সঙ্গে সুজার চেয়েও কামুক এবং মাতাল। শাহবুলন্দ ইকবাল দারা সিকো শাহানশাহের আদরে এবং তাঁর সিংহাসনের ডান পাশে বসে নিজের চারিদিকে একটা সংগঠন তৈরি করে রেখেছেন। বলতে পার দিদিজী ওই মাটির তলার ঘরে পাতালপুরীতে সিংহাসনের দাবিদার এবং মালিক সকলকে ওই ঘরের মধ্যে ভুলিয়ে রেখে দারা সিকো যদি একসময় সকলের অলক্ষ্যে বেরিয়ে এসে ওই লোহার গুল মারা দরওয়াজাখানা বন্ধ করে দিত তাহলে কি হত?

—ঔরংজীব! বিস্ফারিত দৃষ্টিতে রৌশনআরা তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

—দিদিজী! নীচে ঘরে পৌঁছুন পর্যন্ত আমার মনে কোন সন্দেহ জাগে নি। ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। সর্বাগ্রে শাহজাদা দারা সিকো। এবং চারখানা দেওয়ালে পাশাপাশি অসংখ্য বিলায়েতি আয়না। দেখলাম এক দারা সিকো এই ঘরের মধ্যে অসংখ্য দারা সিকো হয়ে আমাদের ঘিরে ফেলেছে। চমকে উঠে তাকালাম—কোন্ দিকে দরজা, বের হওয়ার পথ? দেখলাম আমাদের পিছনে যে দরজাটি দিয়ে ঢুকেছি সেই দরজাটিই ঘরের একমাত্র দরজা। আর দ্বিতীয় দরজা নেই। শাহানশাহ স্নেহের চশমা চোখে দিয়ে কোন সন্দেহের হেতু দেখছেন না। বাকী দুই ভাই কামান্ধ। তারা ওই বাঁদীদের দিকে তাকিয়ে আছে বাঘের উপস্থিতিতে নেকড়ের মত

হরিণীগুলোর দিকে। অগত্যা আমি বসলাম দরজার মুখে। যদি দারা সিকো বেরিয়ে যেতে চায় আমি সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসব বা তাকে বাধা দেব। সে যেন বেরিয়ে এসে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আমাদের ওই পাতালপুরীতে জীবন্ত কবর না দিতে পারে। বল তো বহেন যদি সে তাই করত—এবং আমার বিশ্বাস তাই সে আজ করত—যদি আমি সতর্ক না হতাম তাহলে কি হত। ওই মাটির তলার ঘরে বন্দী ক'জন মানুষের চীৎকার কি মাটি ফুঁড়ে উপরে আসতে পারত ? কেউ শুনতে পেত ?

ঔরংজীবের মুখ লাল হয়ে উঠেছিল উত্তেজনায়। তিনি যেন চোখে দেখতে পাচ্ছিলেন যা তিনি বলছিলেন। বললেন—বহেন, শেষ পর্যন্ত আমি আর উৎকণ্ঠা বহন করতে পারলাম না। একটি সুযোগ পেলাম—দেখলাম অপরূপ রূপসী দুটি বাঁদীর মুখের দিকে ওঁরা সকলেই অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। আমি নিঃশব্দে উঠে বেরিয়ে চলে এলাম। এরপর দারা সিকো যদিই কিছু করত তবে তার প্রতিকার করবার জন্য একজনও অন্ততঃ বাইরে থাকত।

রৌশনআরা স্তব্ধ বিস্ময়ে তাকিয়েই রইলেন—যেমন ছিলেন। ঔরংজীব কিছুক্ষণ প্রতীক্ষা করে বললেন—দিদিজী !

—ভাইজান।

—এবার বল আমি অন্যায় করেছি কি না ?

—অন্যায় ?

—হ্যাঁ।

—তুমি যে তীক্ষ্ণবুদ্ধির অধিকারী সে বুদ্ধি পৃথিবীতে বহু বৎসরে এক আধজনের হয়। তুমি অনেক দূর দেখতে পাও। অনেক দূর। অন্ততঃ অন্ধকারের মধ্যে তোমার নজর দেখতে পায় শেরের মত। কিন্তু তুমি কি শাহানশাহকে কোনরকমে জানিয়ে আসতে পারতে না ?

—হ্যাঁ। সেটা আমার ভুল হয়ে গেছে। তার জন্যই আমার

আজ সারাটা দিন অস্বস্তিতে কেটেছে। এক দণ্ড বসতে পারি নি। একবারের জন্য সারা দুপহর চোখের পাতা বন্ধ করতে পারি নি। কথাটা শাহানশাহকে জানাই কি করে? সেই জন্যেই তোমার পথ চেয়েছিলাম। আমি জানতাম তুমি আসবে!

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে রৌশনআরা বললেন—ভুলের জন্য তোমাকে দোষ আমি দিচ্ছি না ভাইজান। ভুল যা হয়ে গিয়েছে তা ফিরবে না। তবে রঙমহলে এ নিয়ে খুব ফিসফাস চলছে। দারা সিকোর আরামখানায় যে সব বান্দা বাঁদী ছিল তার মধ্যে আমায় খবর দেবার লোক আছে। সে আমাকে বললে দারা সিকো বাদশাহকে খুব উত্তেজিত করেছে, বলেছে—এ শাহানশাহ বাদশাহের সামনে শুধু দিল্লগী করাই হয় নি শাহানশাহকে অপমান করা হয়েছে। আমি গৃহস্থ—আমার নিমন্ত্রণে এসেছিল—আমাকে বলে যাওয়া উচিত ছিল—সে যায় নি যায় নি—কিন্তু বাদশাহ—আপনি আমাদের পিতা হলেও বাদশাহ। বাদশাহ যখন ঘুমিয়ে থাকেন তখনও তিনি বাদশাহ।

ঔরংজীব গম্ভীর হয়ে মাটির দিকে তাকিয়ে রইলেন। কয়েক মুহূর্ত পরে বললেন—শাহানশাহ কি উত্তর দিয়েছেন?

রৌশনআরা বললেন—আলাহজরত খুব রেগে গেছেন সে তাঁর রক্তবর্ণ মুখ দেখেই বোঝা যায়, তবে মুখে তিনি খুব ক্রোধ প্রকাশ করেন নি, বলেছেন—এর আমি বিচার করব শাহজাদা। সবই আমি চোখে দেখেছি সুতরাং বেশী কথা বলে কথাটা বাড়িয়ে বা ঘাঁটিয়ে লাভ নেই।

—ভাই সুজা আর মুরাদ কিছু বলে নি?

—বলেছে।

—কি বলেছে?

—তারা এতে খুব খুশী হয় নি ভাইজান। অখুশীই হয়েছে। সুজা বলেছে—এ ঔরংজীবের বে-আদপী, বদতমিজী। মুরাদ বলেছে—

এ হল ঔরংজীবের ধার্মিকপনার গোড়ামি দেমাক; তার থেকেও বেশী—শাহানশাহকে বলা হয়েছে অধার্মিক!

চমকে উঠলেন ঔরংজীব। এ যে ভয়ংকর সেকায়েৎ! মুরাদ এই কথা বলেছে! তবে তাকে কোন বিশ্বাস নেই—সে গ্রাহ্য করে না কাউকেই—পরওয়া করে না কিছুরই—যা মনে হয় তাই বলে দেয়। একমাত্র গ্রাহ্য করে বাদশাহ পিতাকে। সেও পিতা বলে নয়। বাদশাহ বলে। হিন্দুস্তানের সমস্ত আদমীর গর্দানার মালিক বলে।

রৌশনআরা বললেন—বাদশাহ আজ সন্ধ্যাবেলা শাহবুরুজে এ নিয়ে উজীর সাহেবের সঙ্গে শলাহ করবেন।

—কি শলাহ করবেন?

—সম্ভবতঃ তোমার কি শাস্তি হওয়া উচিত এই নিয়ে।

—বাদশাহ সুজা বা মুরাদের মত স্থুলবুদ্ধি নন। তিনি একসময়ে বিমাতার প্রভাবে মোহগ্রস্ত পিতার বিরুদ্ধে জীবন বিপন্ন করে বিদ্রোহ করেছিলেন। এবং পাঞ্জাব থেকে দক্ষিণে সুদূর গোলকুণ্ডারও দক্ষিণ পর্যন্ত জঙ্গলের জানোয়ারের মত তাড়া খেয়ে খেয়ে পালিয়েছিলেন। তারপর ঘুরে উড়িষ্যা বাংলাদেশ হয়ে ফিরে তবে হার মেনেছিলেন। সেদিন যদি বিদ্রোহ না করে তিনি নূরজাহান বেগমের মালিকানি মেনে নিতেন তাহলে কোনদিন তিনি সিংহাসনে বসতেন না। তিনিও এটা বুঝতে পারলেন না? বুঝতে পারলেন না—সন্দেহ হল না দারা সিকো ওই এক দরওয়াজাবালা মাটির তলার ঘরে—।

বাইরে থেকে তাতারিনী প্রহরিণী এসে অভিবাদন জানিয়ে দাঁড়াল। অর্থাৎ সংবাদ আছে।

শাহজাদা মুখ তুলে তাকালেন।

—ইত্তালা এসেছে যে বাদশাহের দরবার থেকে খুদ উজীর সাহেব এসে নীচে অপেক্ষা করছেন তাঁর জন্যে। খুব জরুরী কথা আছে।

ঔরংজীব উঠে দাঁড়ালেন।

রৌশনআরা বললেন—ভাইজ্ঞান।

—দিদিজী!

—একটা কথা বলব?

—ফরমাইয়ে।

—উজীরকে সব কথা খুলে বল তুমি।

—না দিদিজী। তা হয় না। এ কথা আমি বলতে পারি আলাহজরতকে। খুদ বাদশাহকে। আর যাকে বলতে পারি তাকে বলেছি।

একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন—না। বাদশাহকেও আর বলা উচিত নয়। বলে কোন লাভ নেই। আমি জানি বাদশাহ এখন দারা সিকোকে এত বিশ্বাস করে বসেছেন এবং আমার উপর এত নারাজ হয়েছেন যে আমার কৈফিয়ত শুনলেই আমাকে 'ডরপোক্না' ভীরু বলে উপহাস করে অট্টহাস্য করে উঠবেন। ভুলে যাবেন এই আগ্রা কিল্লার ওপাশে যমুনার কিনারে হাতীর লড়াইয়ের সময়ে হাতী পাগলা হয়ে গেল—তখন সকলে পালাল—পালায় নি এই ঔরংজীব। আমাকে সেদিন 'বাহাদুর' খেতাব দিয়েছিলেন, মনসব দিয়েছিলেন। আজ হয়তো—। না দিদিজী সে হয় না। ভুল আমার হয়ে গেছে। কিন্তু সে ভুল উপহাসের পাত্র হয়ে আমি সংশোধন করতে যাব না। না। উজীরকে কৈফিয়ত আমি দেব না।

—ঔরংজীব! যদি দক্ষিণের সুবাদারি কেড়ে নিয়ে বাদশাহ—

—সে তিনি নেবেন দিদিজী আমি জানি। দক্ষিণের সুবাদারি যাবে আমার—তিনি বরখাস্ত্ করবেন। আমার মনসবও রাখবেন না, আমার তলবানা তাও আমি পাব না। সম্ভবতঃ দরবারে যেতে আমাকে বারণ হয়ে যাবে। কোন নেমন্তন্নও আমি পাব না।

একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন—কি করব? তার

আর আমি কি করব! সইতে হবে আমাকে। সইব আমি। কিন্তু এ সব কৈফিয়ত আমি দেব না। না—দেওয়া যায় না। না।

তিনি পা বাড়ালেন। রোশনআরা বললেন—দাঁড়াও। আর একটা খবর দেবার আছে।

ঔরংজীব দাঁড়ালেন।

রোশনআরা বললেন—কাশ্মীরী কবি সুভগকে দেখা গেছে দারা সিকোর মঞ্জিলে। শাহানশাহ আসার পর সে যমুনার ওপার থেকে নৌকা করে এসে মঞ্জিলে ঢোকে। সঙ্গে তার দারা সিকোর বিশ্বস্ত লোক ছিল।

—শিরিন?

—না শিরিনের খবর কিছু মেলে নি। তবে সুভগের কপালে হিন্দুর তিলক ছিল, গলায় তুলসীকাঠের মালা ছিল।

একটু চুপ করে থেকে ঔরংজীব বললেন—সুভগ শিরিন এদের কথা তুলে কোন ফায়দা নেই। একজন সুভগ একটা শিরিনকে দুনিয়া থেকে যে কোন মুহূর্তে সরিয়ে দিয়ে সাজা দেওয়া যায় কিন্তু তাতে ফল কি হবে? দিদিজী, আজ যদি দারা সিকো ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ওই মাটির তলার আরামখানায় বাদশাহ এবং তিন শাহজাদাকে জীবন্তে কবর দিয়ে দিতে পারত তবে সারা হিন্দুস্তানই শিরিন আর সুভগে ভরে যেত। এখনও তার সম্ভাবনা প্রবল—অত্যন্ত প্রবল। বলতে গেলে একরকম জীবন্ত কবরই হতে চলেছে আমার, যে এর বিরোধী যে এর প্রতিবাদ করে, করতে পারে তার। আমার সুবাদারি কেড়ে নেওয়া হবে, তলবানা তন্‌খা বন্ধ হয়ে যাবে, মনসব চলে যাবে, দরবারে যাবার পথ বন্ধ হবে—এও তো জীবন্ত কবর!

কথা শেষ করে তিনি ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে গেলেন সম্মুখের দিকে। দীর্ঘ অলিন্দপথ। আলোয় আলোকিত—তার মধ্যে শুভ্রবর্ণ সোজা মানুষটি ধীর পদক্ষেপে চলে গেলেন।

তেইশ

শাহজাদা ঔরংজীব অলিন্দ অতিক্রম করে যেতে যেতে থমকে দাঁড়ালেন। অলিন্দ থেকে বাতায়নপথে আকাশের দিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে বললেন—এয় মেহেরবান খোদা, তোমার এই গরীব গোলামের উপর তোমার অসীম করুণা, অফুরন্ত মেহেরবানি। পয়গম্বর রসুল হজরত মহম্মদ তোমার ইসলামের একজন একান্ত অনুগত ভৃত্য ভক্ত। তোমার ইসলামকে বরবাদ দেবে কেউ এ আমি সহ্য করব না। হজরত, তুমি আমাকে এমনি করেই যেন সকল সংকটের মধ্যে হাত ধরে পথ দেখিয়ো; যখন তামাম দুনিয়া অন্ধকারে ঢেকে থাকে তখন তুমি আলো জ্বেলে ইশারা দিয়ো। লা ইলাহী ইল্লাল্লা হে মোহাম্মদ রসুলে আল্লাহ্, তুমিই আমার ভরসা তুমিই আমার বল।

বলেই তিনি ঘুরলেন।

তাঁর সঙ্গের যে প্রহরিণী পিছন পিছন তাঁকে অনুসরণ করছিল তাকে বললেন—তুমি যাও, শাহানশাহের উজীর সাহেবকে গিয়ে বলো, শাহজাদা তাঁর উপাসনার ঘরে আছেন, জপ করছেন। জপ শেষ হলেই তিনি এখুনি আসবেন; খান-ই-খানানকে তিনি জানিয়েছেন যে তিনি যেন মেহেরবানি করে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেন।

বলেই তিনি ফিরলেন। ফিরে গিয়ে ঢুকলেন তিনি নিজের খাস কামরায়। কামরায় ঢুকেই কামরার দরজায় মোতায়েন প্রহরিণীকে বললেন—কোন বাঁদীকে বল আমার খান-ই-সামানকে ডাকবে। তাকে আমার এখনি দরকার জলদি দরকার। বহুত জলদি!

ঘরে ঢুকে গেলেন। পিছনে দরজার মুখে টাঙানো ভারী পর্দাটাকে খুব ভাল করে টেনে দিতে বললেন একজন বাঁদীকে। তারপর তাকে বললেন—তুমি যাও এখান থেকে।

কিছুক্ষণ পরই খান-ই-সামান এসে ঘরে ঢুকে শাহজাদাকে

অভিবাদন জানালে। শাহজাদা ঔরংজীব তখন গভীর চিন্তামগ্ন। তার মুখের দিকে চিন্তাবিভোর হয়ে সম্পূর্ণ অর্থহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। কোন কথা বললেন না। খান-ই-সামান অত্যন্ত অস্বস্তিবোধ করলে এই দৃষ্টির সম্মুখে। পৃথিবীতে বাদশাহ শাহজাদা আমীর এরা মানুষ হয়েও মানুষ নয়। এরা হল মানুষের মালেক। কখন যে এদের কি খেয়াল হয় কি ইচ্ছা হয় সে কেউ বলতে পারে না। তার উপর এই মানুষটি অন্য কেউ নন—ইনি শাহজাদা ঔরংজীব! যাঁর চোখের দৃষ্টিতে এমন কিছু আছে যার সামনে মানুষ যেন অবশ হয়ে যায়। খান-ই-সামান কাঠের পুতুলের মত শক্ত এবং অবশ হয়ে যাচ্ছিল মুহূর্তে মুহূর্তে। তবে তার ভাগ্য ভাল, অল্পক্ষণের মধ্যেই শাহজাদার দৃষ্টিতে সহজ ভাব ফিরে এল, শাহজাদা খান-ই-সামানকে চিনে বললেন—তুমি এসেছ! শোন!

বলেই তিনি তাঁর মাথার টুপি খুলে সযত্নে খান-ই-সামানের সামনে রাখলেন, তারপর খুললেন তাঁর গলা থেকে মুক্তার মালা। একটার পর আর একটা।

বিস্ময়ের সীমা রইল না খান-ই-সামানের। কিন্তু কোন প্রশ্ন করতে সে সাহস করলে না।

কোমর থেকে বহুমূল্য রত্নখচিত কোমরবন্ধ খুলে রাখার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর তলোয়ারও রেখে দিলেন। ঘরখানা হয়েছিল সম্পূর্ণরূপে নিস্তব্ধ। শুধু দুটি মানুষের শ্বাসপ্রশ্বাস শোনা যাচ্ছিল এবং দু'একবার খাপসুদ্ধ তলোয়ারখানা রাখবার সময় ঠুনঠুন শব্দ শোনা গেল। এবার মুখ তুলে শাহজাদা বললেন—দেখ তো খুব সাদা খুব সাধারণ পোশাক কি আছে। আর টুপি—দেখ আমার নিজের হাতে তৈরী করা টুপি যেন ছিল। দাও জলদি বের করে দাও। জলদি। হুকুম তামিল কর। কেন—জানতে চেয়ো না।

*　　　*　　　*　　　*

আরও কিছুক্ষণ পর শাহজাদা ঘর থেকে বের হয়ে এলেন।

সারা অঙ্গের মধ্যে একটি কোন রত্নাভরণ নেই, স্বর্ণাভরণ নেই, পরনের আংরাখা সেও অতি সাধারণ, সে মসলিন না সে রেশম না, সে সাধারণ তাঁতের সাধারণ কাপড়ের আংরাখা। মাথায় টুপি—সেও তাই। তাতে কোন পালকবন্ধ নেই কোন কামদারি নেই, একেবারে সাধারণ মানুষের মাথার টুপির মত টুপি। এই সজ্জায় সেজে শাহজাদা ঔরংজীব এসে তাঁর মঞ্জিলের মাননীয় অতিথি অভ্যর্থনার কক্ষে প্রবেশ করলেন।

উজীর-এ-আজম খান-ই-খানান সাতুল্লা খান তাঁকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন এবং অভিবাদন জানিয়ে কিছুক্ষণ সবিস্ময়ে তাঁর এই অভিনব বেশভূষার দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর বললেন—আমি খুদ শাহানশাহ বাদশাহের এক জরুরী হুকুমনামা বহন করে এসেছি শাহজাদা। হজরত বাদশাহের হুকুম তাঁর এই হুকুম অবিলম্বে আপনাকে জানাতে হবে।

প্রত্যভিবাদন করে শাহজাদা ঔরংজীব সসম্ভ্রমে বললেন—উজীর-এ-আজম আমার এই গরীবখানায় এসেছেন, তার জন্য আমি খুবই খুশী হয়েছি এবং নিজেকে সম্মানিত বোধ করছি। আপনি অনুগ্রহ করে ওই সামান্য মসনদের উপর আপনার তশরীফ রাখলে আমি আরও আনন্দ পাব। উজীর-এ-আজম আসনে বসলেন, তারপর শাহজাদা বসলেন। বসে বললেন—এবার ফরমায়েশ করুন, কোন্ শরবত নিয়ে আসবে।

প্রতিটি সুখাসনের পিছনে দুজন করে বাঁদী ময়ূরের পালক দিয়ে তৈরী গোল পাখা দিয়ে বাতাস করতে শুরু করলে।

উজীর বললেন—শরবত?

—হাঁ, শরবত; হিন্দুস্তানের এই গরমী—এতে তো পাথর ফেটে যায় ছাতি শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়; এই ধূপের মধ্যে আপনি এসেছেন—নিশ্চয় আপনি তিয়াস মালুম করে থাকবেন। শরবত নিয়ে আসুক—শরবত পান করতে করতে আপনি মেহেরবান

বাদশাহের দিলখুস্‌করা যে হুকুমনামা এনেছেন তা জারি করবেন শাহানশাহের এই গরীব পুত্রের উপর।

—শাহজাদা!

—মহামান্য উজীর সাহেব, ফরমায়েশ করুন।

—আমার একান্ত অনুরোধ শরবত পান এসবের আতিথ্যে আমাকে আপ্যায়িত করতে চেষ্টা করবেন না শাহজাদা—

—কেন উজীর সাহেব, আতিথ্যধর্ম হল ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অনুশাসন। অতিথি আপ্যায়ন না করলে খুদাতয়লা না-রাজ হন। পয়গম্বর রসুল গোসা হন।

—শাহজাদা, আমি লজ্জিত হচ্ছি। শাহানশাহ আজ যে হুকুমনামা আমার মারফত শাহজাদার উপর জারি করেছেন সে হুকুমনামা—। থেমে গেলেন উজীর, যেন বলবার মত কথা ঠিক খুঁজে পেলেন না।

একটু হেসে শাহজাদা ঔরংজীব বললেন—দক্ষিণে শাহানশাহের এই গরীব পুত্র যে কাজ করেছে প্রতিদানে তার ঠিক উপযুক্তমত পুরস্কার মনসব শাহানশাহ দেন নি? কিন্তু তার জন্য আপনি দুঃখিত হবেন কেন উজীর সাহেব—কারণ আজ কোন খেলাত কোন মনসব কোন দৌলত, কোন জায়গীরেরই প্রতি আমার এতটুকু লালছ নেই। এই দুনিয়ার এই বাদশাহী, এই আমিরী, এই দৌলতদারি এই সুখ-সম্ভোগ সবই আমার কাছে তুচ্ছ হয়ে গেছে।

উজীর বিস্মিত হয়ে শাহজাদার দিকে তাকালেন।

শাহজাদা তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—জানি না অকস্মাৎ কি হয়েছে আমার। কিছুদিন থেকেই হয়েছে। আমার যেন মনে হচ্ছে যেন কোন অদৃশ্য কণ্ঠ আমার কানের কাছে বলছে—ঔরংজীব, ইসলামের ইজ্জত, ইসলামের জৌলুস, ইসলামের গৌরব হিন্দুস্তানে চাঘ্‌তাই বংশের বাদশাহীর আমলে বিলকুল বরবাদ যেতে বসেছে, এখনও বুঝতে পারছ না—এখনও ঠিক চোখের নজরে মালুম হচ্ছে

না—হিসাবে ঠিক ধরা পড়ছে না কিন্তু যেতে বসেছে তা ঠিক। নদীর স্রোতের মধ্যে যখন দাঁড়িয়ে থাকে মানুষ তখন তার পায়ের তলা থেকে বালি সরে ভেসে যায়, কিন্তু প্রথম প্রথম কেউ গ্রাহ্য করে না। কিন্তু তারপর একটা সময় আসে যখন হঠাৎ বালির তলা থেকে বেরিয়ে পড়ে চোরাবালির স্তর, তখন মানুষ একেবারে তলিয়ে যায় একনিমেষে। তখন হাতের কাছে কিছু আঁকড়ে ধরবার থাকে না, চিৎকার করে অন্য লোকের সাহায্য মেলে না। হিন্দুস্তানে ইসলামের অবস্থা ঠিক তাই হয়ে এসেছে। পয়গম্বর রসুল বলছেন—ইসলামের খাদিম কে আছে, কে আছে শহীদ হবার মত আদমী তাকে আজ এগিয়ে আসতে হবে। রাজ্যসম্পদ, ধনদৌলত, মসনদ, সুবাদারী, মনসবদারী সব ছেড়ে দিয়ে ইসলামের সেবার জন্য ফকিরী নাও। এ দুনিয়ায় সত্য একমাত্র ধর্ম, ধর্ম একমাত্র ইসলাম, সেই ইসলামের সেবার জন্য ফকিরীর আহ্বান এসেছে আমার মনে ; সুতরাং বলুন আপনি—শাহানশাহের হুকুম যতই আপনার কাছে বেদনাদায়ক মনে হোক—আপনি বলুন। আমি সবই হাসিমুখে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে মাথা পেতে গ্রহণ করব। প্রসন্ন হাসির রেখায় স্মিত মুখেই ঔরংজীব কথা শেষ করে তাকিয়ে রইলেন উজীরের দিকে।

উজীর সাদুল্লা খান তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ, তারপর বললেন—শাহজাদা ঔরংজীব, আপনি খুদাতয়লার এবং পয়গম্বর রসুলের আশীর্বাদধন্য মানুষ। আশীর্বাদ নিয়েই আপনি জন্মেছেন। ইসলাম আপনার কাছে অনেক প্রত্যাশা করে। আপনি শক্ত মানুষ—আরও শক্ত হতে বলি। দুনিয়ার মানুষের পরিত্রাণের জন্য পয়গম্বর রসুল ইসলাম এনেছেন। আপনি ঠিক বলেছেন—হিন্দুস্তানে ইসলামের আলো ম্লান হয়ে আসছে। আপনি দীর্ঘজীবী হোন!

ঔরংজীব একটু হাসলেন।

উজীর-এ-আজম খান-ই-খানান সাদুল্লা খান অন্তরে অন্তরে

শাহজাদার সমর্থক সেকথা তাঁর অজানা নয়। দিদি রৌশনআরার মারফতে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ। সরাসরি যোগাযোগ রাখা উজীর সাহেবেরও পছন্দ নয়, তাঁরও নয়। শাহজাদা দারার প্রভুত্বজনক ব্যবহার এই সব প্রবীণ আমিরেরা ঠিক বরদাস্ত করতে পারেন না। তার সঙ্গে শাহজাদা দারার ইসলামবিরোধী এক বিচিত্র ধর্মমত তাঁদের পক্ষে অসহনীয় মনে হয়।

বাদশাহ জালালউদ্দীন আকবর শাহ থেকে ইসলামের এই অবহেলিত দশা শুরু হয়েছে। হিন্দুর মেয়ে বিয়ে করে আকবর শাহ হারেমে যোধপুরীবাঈ মহলে তুলসীগাছ পুঁতেছিলেন। মুঘল হারেমে মেয়েরা শিবপূজা করেছে। কানাইয়ার পূজা করেছে। গঙ্গামাটির তাল জমা করে রেখেছে মার্বেলের মেঝের উপর। শুধু এই সব নয়, এর পরও আছে। আকবর শাহ বাদশাহ হয়েও খুশী হন নি। বাদশাহ আকবর ইলাহি ধর্ম সৃষ্টি করে তার পয়গম্বর হতে চেয়েছিলেন। কাফের হিন্দুদের ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীদের নিয়ে, কেরেস্তানদের পাদরীদের নিয়ে, ইহুদীদের রাবিদের নিয়ে, ইসলামের একদল কাপুরুষ অর্থলোভী মোল্লাদের নিয়ে ইলাহি ধর্ম। মুসলমান আর হিন্দু আর কেরেস্তান আর ইহুদী—খুদার কাছে সব এক। সকলকে খুদা সমান চক্ষে দেখেন। এয় খোদা! এয় পয়গম্বর রসুল! এই কখনও সত্যি হতে পারে? মুসলমান কখনও এই ফতোয়া মানতে পারে?

মানে নি। আকবর শাহের এ ফতোয়া মানে নি মুসলমানেরা। জাহাঙ্গীর শাহের কথা বাদ দাও। সারাটা জিন্দগী দারু আর ঔরৎ নিয়ে কেটেছে তাঁর। বিশ্বাস তাঁর অদ্ভুত। কাফের হিন্দু যোগীকে দেখে দরবারের মধ্যে মসনদ থেকে উঠে তাকে আহ্বান করেছেন। সমাদর করে আসন দিয়ে বসিয়েছেন। একসঙ্গে নাস্তা করেছেন একসঙ্গে আহার করেছেন। জাহাঙ্গীর শাহ এর তসবীর আঁকিয়ে রেখেছেন।

এরপর শাহানশাহ সাজাহানকে পেয়ে মুসলমানেরা খুশী হয়েছিল।

শিয়ারা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বেঁচেছিল। ভেবেছিল এবার ইসলামের বাতিদানের ফানুসে যে কালি পড়েছে সে কালি মুছে যাবে—আবার উজ্জ্বল হয়ে জ্বলবে শিয়া মতবাদসম্মত ইসলামের রোশনি। সাজাহান বাদশাহ হয়েই হিন্দু মর্দানার মুসলমানের বেটী সাদী করার হক বরবাদ করে যে ফরমান জারি করেছিলেন তাতেই সমস্ত শিয়ারা সাধুবাদ জানিয়ে তাঁকে খেতাব দিয়েছিল—মেহেদী। সেই বাদশাহ সাজাহানের বড় ছেলে শাহজাদা শাহবুলন্দ ইকবাল দারা সিকোর ঘাড়ে চেপেছে আকবরশাহী সেই ইলাহি ধর্মের ভূত। শিয়ামতে বিশ্বাসীদের উপর তাঁর গোসা হলেও তারা সইতে পারত; ছেলেমানুষের ছেলেমানুষি বলে সহ্য করে হাসত; কিন্তু দারা সিকো তাদের অবজ্ঞা করেন ঘৃণা করেন। অপদস্থ করবার চেষ্টা করেন। শিয়ামতাবলম্বী আমীরেরা আজ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছেন।

*　　　*　　　*

শাহজাদা ঔরংজীবকে শাহানশাহ বাদশাহ সাজাহান এই হুকুমনামায় এই নির্দেশ দিচ্ছেন যে শাহজাদা ঔরংজীব আজ থেকে আর দক্ষিণের সুবাদার নন। দক্ষিণের সুবাদারের দায় দায়িত্ব খুদ বাদশাহ নিজের হাতে নিলেন। শাহজাদার যে সমস্ত চিজ বিজ সামান ঔরংগাবাদের সুবাদার মহলে মওজুত রয়েছে তা বাদশাহের হুকুমে যথাসময়ে আগ্রার নূরমঞ্জিলে এসে পৌঁছুবে। শাহজাদা ঔরংজীব আজ থেকে আগ্রার নূরমঞ্জিলে বাস করবেন। বিনা বাদশাহী হুকুমে বাইরে কোথাও যাবেন না।

দশহাজারী মনসব বাদশাহী মেহেরবানিতে তিনি যা পেয়েছিলেন সে মনসব আর তাঁর রইল না। তাঁর সুবাদারীর তনখা আজ থেকে বন্ধ হল—আর তিনি তা পাবেন না।

শাহজাদা হিসেবে তিনি যে মাসোহারা বাদশাহী খাজাঞ্চীখানা থেকে পেয়ে থাকেন তার অংশমাত্র পাবেন, পুরা পাবেন না।

আজ থেকে শাহজাদা ঔরংজীবের বাদশাহী দরবারে দেওয়ানী

আম বা দেওয়ানী খাসে হাজিরা দিবার কোন জরুরৎ নেই; কোন কারণে তিনি দরবারে প্রবেশ করবেন না। কোন শাহী দরবার বা জলুস বা জলসাতেও শাহজাদার প্রবেশের একতিয়ার রইল না; তিনি যেন প্রবেশ না করেন।

শাহজাদা হুকুমনামা পড়ছিলেন, উজীর-এ-আজম সাদুল্লা খান বিস্মিত এবং বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন শাহজাদা ঔরংজীবের মুখের দিকে।

অচঞ্চল, স্থির; সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গে কোথাও এতটুকু স্পন্দন নেই। স্থির হয়ে পড়ে যাচ্ছেন। যেন কিছু হয় নি। এতটুকু চিন্তিত হবারও প্রয়োজন নেই। বাদশাহী দরবারে যাঁরা কাজকাম করেন—সে বাদশাহের ওকীল থেকে শুরু করে উজীর মীরবক্সী সুবাদার থেকে সামান্য লোক পর্যন্ত যেই হোক—এই হুকুমনামা পড়ে মুখ বিবর্ণ হত না, বুক শুকিয়ে যেত না, হাত পা ঘেমে উঠত না, বা কাঁপত না এমন কাউকে তিনি কল্পনা করতে পারেন না।

বাদশাহী রীতি পদ্ধতির কানুনের কায়দা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। যখন ভদ্রতা দেখায় মহত্ত্ব দেখায় তখন বাদশাহের দরবারের পোশাকপরা চেহারার মত চেহারা সে ভদ্রতার সে মহত্ত্বের। আবার যখন ক্রোধ হিংসায় অধীর হন বাদশাহ তখন যে সে কি চেহারা হয় তা ভাবতেও শিউরে ওঠে বাদশাহী নোকরেরা। তখন ভাই বলে নিষ্কৃতি থাকে না, বাপ বলেও থাকে না, পুত্রেরও না। না, সন্তানেরও নিষ্কৃতি থাকে না।

শাহজাদা সেলিম আকবর শাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। সেলিম জাহাঙ্গীর শাহ হলে—শাহজাদা খসরু বিদ্রোহ করেছিলেন। আজকের বাদশাহ সাজাহান সেদিন খুরম ছিলেন—তিনিও বিদ্রোহ করেছিলেন। বাপেরা সে বিদ্রোহ দমন করেছিলেন কঠোর হাতে।

মানসিংহ শাহজাদা সেলিমকে বন্দী করে এনে দিয়েছিলেন

আকবর শাহের কাছে। পায়ের উপর গড়িয়ে পড়তে হয়েছিল শাহজাদা সেলিমকে। শাহজাদা সেলিম জাহাঙ্গীর শাহ হয়ে বড় ছেলে খসরুকে অন্ধ করে দিয়েছিলেন। তাঁর জীবন—তাও গিয়েছিল তাঁর হুকুমে। শাহজাদা খুরম—বাদশাহ সাজাহান বাদশাহ বাপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে সারা হিন্দুস্তান ছুটে বেড়িয়েছেন স্ত্রী পুত্র নিয়ে এবং নিজের মান ইজ্জত নিয়ে। পাঞ্জাব থেকে দক্ষিণে গোলকুণ্ডা পর্যন্ত পাহাড় পর্বত নদী নালা বন জঙ্গল পার হয়ে ছুটেছিলেন। পিছন পিছন বাদশাহী ফৌজ নিয়ে তাঁকে বিতাড়িত করে নিয়ে চলেছিলেন খান-ই-খানান মহাবৎ খাঁ। দিল্লী থেকে পালাতে পালাতে বুরহানপুরে শাহজাদা খুরম বিশ্বাসঘাতক খানখানান দারাব খাঁর কাছে নতজানু হয়ে বলেছিলেন—আপনাকে মুক্তি দিলাম—আপনি বাদশাহী শিবিরে খানখানান মহাবৎ খানের কাছে গিয়ে একটা মিটমাট করে দিন। এ অসহ্য হয়ে উঠেছে।

দীর্ঘকাল বাদশাহী দরবারে কাজ করছেন সাদুল্লা খান। দেখেছেন অনেক। অনুমানও করতে পারেন অনেক কিছু। অনুমান করা খুব কঠিন নয়। তিনি সারা হিন্দুস্তানের উজীর। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তাঁর। তিনি দেখতে পাচ্ছেন বইকি। দেখতে পাচ্ছেন, অন্ততঃ দেখতে পাচ্ছিলেন তিনি, ভবিষ্যতে বাদশাহ সাজাহানের পর চার ভাইয়ের মধ্যে এই হিন্দুস্তানের মসনদ নিয়ে যুদ্ধ হচ্ছে। হ্যাঁ তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন, এখনও আংশিকভাবে পাচ্ছেন। দেখতে পাচ্ছিলেন চার ভাই চারদিক থেকে আপন আপন সৈন্য নিয়ে লড়াইয়ে নেমেছেন। রক্তে ভেসে যাচ্ছে হিন্দুস্তান। তাতে বিজয়ী যে হবে তার মূর্তি অস্পষ্ট হলেও মনে হচ্ছিল তার বর্ণ সব ভাই থেকে উজ্জ্বল। কিন্তু গঠনের দিক থেকে তাকে দুর্বল মনে হয়। তাকে শাহজাদা ঔরংজীবের মতই মনে হচ্ছিল। কিন্তু—।

কিন্তু আজ অকস্মাৎ এ কি হল? বাদশাহ সাজাহান যে হুকুমনামা জারি করলেন, বাদশাহের চোখে যে রক্তাভা তিনি দেখে

এসেছেন তাতে তাঁর কল্পনায় সে ভবিষ্যতের ছবি যেন গাঢ়তম অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে গেল। হিন্দুস্তানের আগ্রা দিল্লী অঞ্চলে মধ্যে মধ্যে আঁধি ওঠে এই গরমীকালে। ধুলো ঝড়। সব ধুলো দিয়ে একেবারে আচ্ছন্ন করে ঢেকে দেয়। বেমজবুদ বাড়িঘর একেবারে আছাড় মেরে ফেলে দিয়ে যায়—উড়িয়ে নিয়ে চলে যায়।

শাহজাদা ঔরংজীব এ কি ভুল করে বসলেন?

কথাটা না বলে পারলেন না উজীর সাতুল্লা খান।—আপনি কেন এমন করেছেন আমি বলতে পারব না শাহজাদা কিন্তু মারাত্মক ভুল করেছেন।

ঔরংজীব তাঁর মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বললেন—মালিক খুদা আর পয়গম্বর রসুল।

—তিনি আপনার মঙ্গল করুন।

—আমার অনেক অনেক সালাম আপনাকে খান-ই-খানান।

—আমি কি কিছু বলব জাঁহাপনাকে?

—কি বলবেন?

—আপনি যা বললেন, যা দেখলাম? আপনার মাথায় একটা সাধারণ লোকের টুপি, মজত্বর চাষীরা যা পরে, পরনে মোটা কাপড়ের আংরাখা, আপনার সারা অঙ্গে একটা জহরত নেই—একছড়াও মতির মালা নেই।

—বলবেন আমি সুবাদারি থেকে মুক্তি পেয়ে শাহানশাহের কাছে গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। তিনি আমার পিতা আমার গুরু। তিনি আমাকে এই যে খুদাকে ডাকবার অখণ্ড অবকাশ দিলেন এর থেকে বড় দেওয়া কিছু হয় না, হতে পারে না। এটিই আমার চিরদিনের আকাঙ্ক্ষা। হাজারো লাখো লাখো কদমবুচি জানাচ্ছি তাঁকে আমি। তাঁর হুকুম অক্ষরে অক্ষরে পালিত হবে।

সাতুল্লা খান আসন ছেড়ে উঠলেন এবং শাহজাদাকে অভিবাদন

করে বললেন—আমি বিদায় নিলাম শাহজাদা। কামনা করে যাই এ দুর্যোগের যেন অল্প কিছুদিনের মধ্যেই অবসান হোক।

সাদুল্লা খান চলে গেলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শাহজাদার বিশ্বস্ত ভৃত্য ঘরে ঢুকল—তার হাতে একখানি পত্র।

শাহজাদা তার মুখের দিকে তাকালেন।

ভৃত্য বললে—কেল্লা থেকে এসেছে। সীল দেখলেন। বুঝলেন বহেন রৌশনআরা গিয়েই কোন জরুরী খবর পাঠিয়েছেন। খুলে ফেললেন পত্রখানা। বহেন রৌশনআরা ব্যগ্র হয়ে জানতে চেয়েছেন উজীর-এ-আজম কি খবর দিয়ে গেলেন। প্রসঙ্গক্রমে লিখেছন—কবি সুভগ শাহবুলন্দ ইকবালের মঞ্জিলে এই মুহূর্তে মওজুদ হয়ে রয়েছেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলছেন।

কবি সুভগ শাহজাদা দারা সিকোর সামনে হাত জোড় করে বসে ছিল—মুখ চোখ তার কেমন যেন অন্তরের কোন আবেগের উচ্ছ্বাসে অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। কাশ্মীরী ব্রাহ্মণের ছেলেটির শুভ্র বর্ণচ্ছটাকে যেন মুহূর্তে মুহূর্তে গাঢ় রক্তাভ করে তুলছে। ঠোঁট দুটি কাঁপছে থরথর করে। চোখ দুটিও রাঙা দেখাচ্ছে। চোখের কোল দুটি ফুলো ফুলো হয়ে উঠেছে। বোঝা যাচ্ছে সে কেঁদেছে। চোখ থেকে চোখের জলের ঢল নেমেছিল।

—আমাকে আপনি মাফ্ করুন আলিজাঁহা, এই গরীব কবিকে আপনি মাফ্ করুন। হিন্দুস্তানের শাহজাদা শাহবুলন্দ ইকবাল, আপনি এই গরীবকে নিয়ে কেন এই খেলা খেললেন? আমি তো বেশ ছিলাম—এ যে আপনি অনির্বাণ এক চিতা জ্বেলে আমাকে তার উপর শুইয়ে দিয়েছেন, আমি অহরহ পুড়ছি তবু ছাই হয়ে যাচ্ছি না। আলিজাঁহা জনাব-এ-আলি, আপনার সামনে আমি ওই উপরে ভগবানের নাম নিয়ে কসম খেয়েছিলাম, এই দুনিয়ায় আমার বাপের, আমার সাতপুরুষের নাম নিয়ে কসম খেয়েছিলাম, বলেছিলাম, আমার এই জান থাকতে আমি শিরিনকে ত্যাগ করব না, তাকে এতটুকু অনাদর করব না। হিন্দুস্তানের ভাবী শাহানশাহ আপনি আমাকে বলেছিলেন, শিরিনও ঠিক এই কসম খেয়েছে আর কেঁদেছে বেগম-সাহেবার সামনে আপনার সামনে। আপনার কাছে আজ আমি মাফি মাঙছি। হুজুরআলি, এই গরীবকে মেহেরবানি করে খালাস দিন। দিনরাত্রি অহরহ হরদম আংরার বিস্তারার উপর আমাকে যেন বেঁধে ফেলে রেখে দিয়েছে আমার নিজের খাওয়া সেই কসম।

শাহজাদা দারা সিকোর চোখ মুখ লাল হয়ে উঠেছে। সুগৌর মসৃণ ললাটের ওপর শিরাগুলি মোটা হয়ে ফুলে উঠেছে। শাহজাদা দারা সিকোর অন্তর ছিল উদার এবং আবেগে পরিপূর্ণ। বাস করতেন

তিনি স্বপ্নলোকে। তাঁর জীবন অন্তরের ওই আবেগের প্রেরণায় পরিচালিত হত, মন শত বাধাবিঘ্ন বাস্তবতার সকল সম্ভাব্যতাকে অতিক্রম করে ধুলোমাটির ছুনিয়া বা ছুনিয়ার ধুলোমাটির স্পর্শ থেকে সরে উর্ধ্বাকাশের কোন এক কল্পলোকে বিচরণ করতে চাইত। তাতে এতটুকু বাধা বা প্রতিবাদ এলে কি হলে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতেন। এই কারণেই হিন্দুস্তানের যুবরাজ সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারীর উপর কেউ পরিতুষ্ট ছিলেন না। উজীর মীরমুনসী দেওয়ান প্রভৃতি কর্মচারীরা তাঁকে মনে মনে পছন্দ করতে পারতেন না। শাহজাদা দারা সিকো শাহবুলন্দ ইকবালও এঁদের গোঁড়ামি পছন্দ করতে পারতেন না। কবি সুভগের এই কথাগুলিতেও শাহজাদা মুহূর্তে উত্তপ্ত হয়ে উঠলেন। তাঁর দেহের রক্তধারা সেই উত্তেজনার চাপে মাথার দিকে ছুটে চলেছে; মুখ চোখ লাল হয়ে উঠেছে। তিনি সহ্য করতে পারছেন না।

অনেক কষ্টে আত্মসংবরণ করে বললেন—কবি সুভগ, তুমি কি বলছ? এ তো আমার বোধের মধ্যেই আসছে না। তুমি কি পাগল হয়ে গেছ?

বার বার অভিবাদন করে কবি সুভগ বললে—হয়তো তাই সত্য আলিজাঁহা, শাহজাদা আমি হয়তো পাগলই হয়ে গেছি কিন্তু—

—কিন্তু কি বল?

—আমার উপর আপনি রুষ্ট হবেন না শাহজাদা, আমি প্রতিদিন স্বপ্ন দেখি—আমার পিতা পিতামহ প্রপিতামহ রাজপুতানার মরুভূমির উপর ছুপহরের ধূপের মধ্যে ছুই হাত জোড় করে আঁজলা পেতে দাঁড়িয়ে কাতর কণ্ঠে বলছেন—পানি পানি; তিয়াসে ছাতি ফেটে গেল—কলেজা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছে—জেরা সা পানি—একটু জল একটু জল। জনাবআলি, আমি ছুটে যাই বাড়ির ভিতর জল আনবার জন্যে—দেখি জলের কলসী মাথায় নিয়ে উঠানে দাঁড়িয়ে আছে শিরিন। তাকে ডেকে আনি—বলি পানি দাও—দাও

পানি পিতাজীকে, দাও পানি দাদোকে—কিন্তু জনাবআলি দেখি বাপ দাদো হাত গুটিয়ে নিয়ে পিছন ফিরে চলে যান। আমি ডাকি—পিতাজী দাদোজী! আসুন পানি পিয়ে যান—কিন্তু তাঁরা ফেরেন না, শুধু মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে আমাকে যেন ঘৃণা করে তাঁরা চলে যান

শাহজাদা দ [illegible] সিং [illegible] উঠলেন, জিজ্ঞাসা করলেন-শিরিন কোথায়?

—শিরিন আছে বানারসে।

—কার কাছে রেখে এসেছ তাকে?

—আলিজাঁহা, সে বানারসের দালকামণ্ডির বাজারে এক মোকামে গিয়ে বাসা নিয়েছে।

—সেখানে তো তওয়াইফ বাঈজীরা থাকে।

—শাহজাদার জায়গীরের এলাকা বানারস। শাহজাদার অজানা নাই সে কথা। আলিজাঁহা, শিরিনেরও আমার মতই পাগল হবার উপক্রম হয়েছিল। শেষ সে আমাকে বললে—আমি ইসলাম ধর্ম নিয়ে মুসলমানী হয়ে গেছি। আজ আল্লাহতয়লা ছাড়া আমার উপাস্য কেউ নেই। পয়গম্বর রসুল ছাড়া ইমাম কেউ নেই। হিন্দু কাফের ধর্মের ওই সব পাথর—ওই তোমাদের বিশ্বনাথ—ওই তোমাদের ঢুণ্ডুগণেশ—ওই তোমাদের অন্নপূর্ণা ওসব বিলকুল আমার কাছে বরবাদ হয়ে গেছে। কোন দাম নেই। ওসবকে পূজো করতে আমি পারব না। তাইবা কেন, তুমিও পূজো করতে পাবে না, তোমাকে পূজো করতে দেব না আমি। আলিজাঁহা, আমি আপনার সামনে ঈশ্বরের নাম নিয়ে খুদাতায়লার নাম নিয়ে কসম খেয়ে বলেছিলাম আমি কখনও পরিত্যাগ করব না শিরিনকে—সেই কসমের জন্যে আমাকে যেতে হয় সেই দালকামণ্ডির মোকামে। মেহেরবান শাহজাদা, আপনি ঈশ্বরজানিত ব্যক্তি। আপনি উদার, আপনি হিন্দুস্তানের ভাবী বাদশাহ, কিন্তু তার থেকেও আপনি বড় সাধু ব্যক্তি

হিসেবে; আপনি পারেন আমাকে এই কসমের বন্ধন থেকে দায় থেকে মুক্তি দিতে।

শাহজাদা দারা স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। যে-ক্রোধ এবং যে-ক্ষোভ তাঁর হয়েছিল, সুভগের কথা শুনে এবং তার কাতরতা দেখে সে-ক্রোধ এবং ক্ষোভ ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এল। তিনি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সকরুণ মর্মবেদনায় চোখ বুজলেন। মুহূর্ত কয়েক পরেই চোখ থেকে নেমে এল জলের ছুটি ধারা।

কবি সুভগের মনে হল শাহজাদা দারার উপমা একখানি জলভারসমৃদ্ধ মেঘের সঙ্গে। মুহূর্তে সেই মেঘে ঝলসে ওঠে বজ্রাগ্নি, বিস্ফোরণ ঘটানোর মত চীৎকারে পৃথিবী কেঁপে ওঠে, তার পরমুহূর্তেই জলধারা ঝরতে থাকে ঝরঝর শব্দে; বলে ভয় নাই ভয় নাই পৃথিবী। এই দেখ আর তো আমি ক্রুদ্ধ নই। আমি বিগলিত হয়ে গেছি। আমার বিগলিত করুণায় তুমি স্নাত হও। 'পৃথ্বি তং শীতলা ভব।'

শাহজাদা রুমাল দিয়ে চোখ থেকে গড়িয়ে আসা জলের ধারা ছুটি মুছে নিয়ে বুক পুরে নিশ্বাস নিয়ে বললেন—

কুফর্ ওঅ ইসলাম দর রহশ্ পোয়ান্।
'ও অহ্ দহু লা শরীক লহু' গোয়ান্॥

সুভগজী তুমি কিসের কবি? আর শিরিন হায় হতভাগ্য নারী তুই কিসের নারী? ভালবাসতে পারলি না? ধর্মের জন্যে? তুমি যাকে ধর্ম বল বা তুমি যাকে অধর্ম বল কাফেরই বল আর ইসলামই বল ছুইয়ের মধ্যেই তিনি আছেন—ছুই গিয়েছে তাঁর দিকে। তিনি এক—তিনি ছুই নন—তাঁর কোন শরীক নেই। হায় রে হায়—। তুমি তাকে বুঝাতে পারলে না সুভগ? তুমি তার জন্যে সব কিছু গঙ্গার পানিতে ভাসিয়ে দিতে পারলে না? "বিস্‌মিল্লাহি-র্-রহমানি-র্-রহিম, ব-নাম-ই-আন কি নামে ন-দারদ। ব-হর-নামে কি থানি সব্‌বর্ আরদ।" ঈশ্বর আল্লা রাম রহিম নিয়ে

বিবাদ করে তোমরা কি করলে সুভগ ? যে নামে তুমি তাঁকে ডাকবে তিনি তো তাতেই সাড়া দেন। এ তো তুমি মানো। এ তুমি নো। আমার সঙ্গে তোমার যে আলাপ হয়েছিল আগ্রায়, সেই সেদিনের মুশায়ারার পর সেদিন তো তুমিই আমাকে তোমার গীত শুনিয়েছিলে—স্বর্গে সুখ অফুরন্ত বলেই স্বর্গ কাম্য নয়, স্বর্গে ঈশ্বর বিরাজ করেন বলেই স্বর্গ কাম্য ; তাঁকে পাবার সৌভাগ্যের জন্যই আদমের বংশধরেরা সেখানে যেতে চায়। দুনিয়াতেও তাই, অফুরন্ত জমীনের সীমানা—হীরা মণি মাণিক্য সেই জমীনের বুকে ছড়িয়ে আছে,—তার অফুরন্ত উর্বরাশক্তিতে সে ফসল উৎপাদন করে বলেই দুনিয়ার মানুষেরা মরতে চায় না, অনন্তকাল বেঁচে থাকতে চায়—এ কথা সত্য নয়, এ ঝুট বাত, বিলকুল ঝুট ; দুনিয়ায় মহব্বতি আছে—দুনিয়ায় ভালবাসলে দেহের আধারে আত্মাকে—প্রদীপের বুকে জ্বলন্ত শিখার মত ভালবাসার জনকে পায় বলেই দুনিয়ায় মানুষ মরতে চায় না। স্বর্গে ঈশ্বর আর মাটির দুনিয়ায় মহব্বতি—এই হল পরম সত্য। এই গীত শুনেই আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম কবি সুভগ। না-হলে আমি এত বড় বিপদের ঝুঁকি নিয়ে শিরিনকে দাওয়াইয়ের ঘোরে—ওঃ—সে উদ্বেগ তো তুমিও কম ভোগ কর নি।

চুপ করে রইল সুভগ। মাথা তার হেঁট হয়ে গেল আপনা থেকেই।

শাহজাদাও চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ, তারপর আবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সবিস্ময়ে বললেন—কবি সুভগ, শিরিন তোমার সঙ্গে ঘর বেঁধে আনন্দ পেলে না ? সে বলেছে, সে বলেছে— ; কি বলেছে সুভগ ? বলেছে—আমি মুসলমানী হয়েছি—আমি পয়গম্বর রসুলের প্রবর্তন করা ধর্মের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্ তায়লাকে জেনেছি—আল্লাহ্ তায়লাকে যে ঈশ্বর ভগবান বলে ডাকে তাকে আমি ভালবাসতে পারব না ?

সুভগ বললে—হাঁ শাহজাদা, সে বললে—দেখ আমি ইসলাম ধর্মে কলমা পড়ে মুসলমানী হয়েছি। পয়গম্বর রসুলের বাঁদী আমি—আমি কসবী হয়ে কাফেরকে দেহ বেচতেও পারি কিন্তু তাকে সাদী তো করতে পারি না। তার আওরৎ তো হতে পারি না। আলিজাঁহা, আমি যে পূজা করি তা তার গুনাহ বলে মনে হয়।

—থাক, সুভগ থাক। আমি আর শুনব না। শুনতে আমি আর চাই নে। আমার এক মহান স্বপ্ন রচনার কল্পনা আছে সুভগ। সে এক নয়া দুনিয়া—এক নয়া জিন্দিগী। তোমাদের গড়তে চেয়েছিলাম—তোমাকে আর শিরিনকে দুজনকে গড়তে চেয়েছিলাম আদম আর ইভের মত প্রথম দুটি পুতুল। কিন্তু—

—আমাকে আমার কসমের দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিন শাহজাদা। আমাকে আপনি মেহেরবানি করুন।

—তোমাকে মুক্তি দেব। বলব—শিরিনকে তুমি পরিত্যাগ কর। শিরিনকে বলব—শিরিন, তুমি সুভগকে পরিত্যাগ কর। যে স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ আমি দিতে চেয়েছিলাম তা ঝুট, বিলকুল ঝুট। ভাল—একটা কথা আমাকে বল তো সুভগ; সাচ্ জবাব দেবে।

সুভগ তাঁর মুখপানে তাকিয়ে রইল।

—সুভগ, তোমরা যে পরস্পরের সঙ্গে পৃথক হয়ে যেতে চাচ্ছ তাহলে কি তোমাদের ভালবাসা সে ঝুট, তার কোন দাম নেই? কোন আনন্দ তাতে পাও না?

—না জনাবআলি সে ভালবাসা সূর্যের আলোর মত সত্য—রাত্রির বিশ্রামের মত আনন্দপূর্ণ।

—তবে?

—তবু জনাব আমরা স্বামী স্ত্রী হতে পারি না। আমিও পারি না সেও পারে না। অশান্তির আগুনে আমরা জ্বলে যাচ্ছি। আপনি মুক্তি দিন।

—আমি মুক্তি দেব—তোমার এতকালের সেই গাঢ় ভালবাসা

যার জন্যে কবি তুমি দেওয়ানা হয়েছিলে—তাকে ছেড়ে তুমি বাঁচবে, সে বাঁচায় তুমি আনন্দ পাবে ?

কবি সুভগ তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে সবিস্ময়ে বললে—না জনাবআলি, তাকে ছেড়ে তো থাকব না। শুধু একসঙ্গে স্বামী স্ত্রী হয়ে আমরা বাস করব না। আলাদা মোকামে থাকব। সে বাঈজীর গানাবাজানা করবে। আমি জনাব আমার শাস্ত্রচর্চা করব। ব্রাহ্মণের লেড়কা—ব্রাহ্মণের কাম করে কিছু রোজগার করব। শাহজাদা যে সব সংস্কৃত শাস্ত্র পারসীতে তর্জমা করাচ্ছেন, তা যেমন করছি তাই করব। আমরা শুধু পতি পত্নী হব না শাহজাদা—

মুহূর্তে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন দারা সিকো। দারা সিকোর চরিত্রের এইটেই বিশেষত্ব। বিশেষত্ব বল বিশেষত্ব—দুর্বলতা বল দুর্বলতা—যে যা বলবে তাই। সম্রাট সাজাহানের নয়নের মণি পরম সমাদরের এই জ্যেষ্ঠ পুত্রটি জন্মাবধি যখনই যা পাবার ইচ্ছা করেছেন তখনই তাই পেয়েছেন। যখনই যা হোক বলে মনে ভেবেছেন তখনই তাই হয়েছে—মুখের কথা মানুষের কানে উঠতে না উঠতে তাই প্রতিপালিত হয়েছে তাই ঘটেছে। বাল্যকাল থেকে স্বপ্ন দেখেছেন। স্বপ্ন দেখেছেন সেই স্বপ্ন যে স্বপ্ন দেখেছিলেন বাদশাহ জালালুদ্দীন আকবর শাহ।

হিন্দুস্তানের ভাগ্যবিধাতা—দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা। না, তার থেকে আরও কিছু বেশী। কত সম্রাট কত বাদশাহ এসেছেন গিয়েছেন—কবরের তলায় তাঁরা সমাহিত রয়েছেন—প্রকাণ্ড সমাধিসৌধ, লোকে এসে সবিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে দেখে, তারপর চলে যায়। কিন্তু যাঁরা ধর্মগুরু যাঁরা সাধু যাঁরা পয়গম্বর পীর জীবনকালে তাঁরা গাছতলায় আসন পাতেন—মাথায় সামান্য সেলাইকরা টুপি পরেন—মণি নেই মাণিক্য নেই সোনা নেই রূপো নেই কিংখাব নেই সাটিন নেই মখমল নেই মলমল মসলিন নেই রেশম নেই পশম নেই—

তবু হাজারে হাজারে মানুষ তাঁর দর্শন পেতে ব্যাকুল—পায়ের ধুলো পেতে ব্যাকুল। তিনি খেলাত দিতে পারেন না—জায়গীর দিতে পারেন না—শুধু আশীর্বাদ—তারই দাম বাদশাহী জায়গীর থেকে বেশী। তিনি তাই হতে চান। বাদশাহ ধর্মপ্রবর্তক একাধারে। হিন্দুদের রাজপুত্র এবং অবতার যেমন হয়েছিলেন শ্রীরামচন্দজী—শ্রীকিষেণজী। তেমনি। এই আকাঙ্ক্ষায় দারা সিকো বহু শাস্ত্রচর্চা এবং বহু সাধু সন্ত পণ্ডিতদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মধ্যে যেন একটি অপরূপ স্বপ্নের মধ্যে বিভোর থাকতেন। সেই স্বপ্নবিভোরতা কোনক্রমে কারুর দ্বারা এতটুকু ক্ষুণ্ণ হলেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতেন তিনি।

পতি পত্নী হয়ে থাকতে পারবে না। উপপতি উপপত্নী হয়ে বাস করতে সুভগের বা শিরিনের কারুরই আপত্তি নেই।

—চন্দ্রভান! চন্দ্রভান!

ডাকলেন শাহজাদা। ব্রাহ্মণ চন্দ্রভান শাহজাদা দারা সিকোর খাস মুন্সী। অত্যন্ত বিশ্বস্ত ব্যক্তি। চন্দ্রভান শাহজাদার স্বপ্নকে অবাস্তব ভাবে না। চন্দ্রভান শাহজাদার সুখ কিসে তা বোঝে। তার চেয়েও বেশী বোঝে শাহজাদা দুঃখ পান কিসে। বেদনা পান কিসে।

পঁচিশ

শাহজাদা দারা সিকো বললেন—চন্দ্রভান, আমি জানতাম না, আমি বুঝতে পারি নি, এই কাশ্মীরী ব্রাহ্মণের ছেলে, নিজে ও গজল বানায় রুবাই লেখে, আমি জানতাম না চন্দ্রভান, যে যারা মগজহীন বোকা—'কুঁদ-ফাহমানি-ঘয়ের-বিন'—এ লোকটা তাদেরই একজন। মাথার মধ্যে এতটুকু বোধশক্তি নেই—কলিজার মধ্যে যে হৃদয় ভালবাসার ধনের জন্য নিজে জান দিতে পারে, মান দিতে পারে, সবকিছু দিতে পারে, তার এতটুকুও কিছু নেই। বলতে পার চন্দ্রভান, একে নিয়ে আমি কি করব?

মুন্সী চান কাব সুভগকে চিনত অচেতন শিরিনের দেহ কবর খুঁড়ে তুলে তুঘলকাবাদের বস্তিতে কবি সুভগের হাতে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা মুন্সী চন্দ্রভানই করেছিল। সেই বিখ্যাত দিল্লীর হেকিমকে যোগাড় করার কাজ সেও সেই করেছিল। এমন কি কবি সুভগ এবং শিরিনের ভবিষ্যৎ জীবনের ছক সেই ছকে দিয়েছিল।

শাহজাদা দারা সিকো বললেন—দেখ চন্দ্রভান, আমার প্রপিতামহ আকবর শাহের কল্পনাকে আমি রূপ দেব। আমি সংকল্প করেছি এক নতুন হিন্দুস্তান তৈয়ার করব। সেই সংকল্প করেই এই কবি ব্রাহ্মণ আর শিরিনের ছেঁড়া জিন্দিগী আমি ফের জুড়ে দিয়েছিলাম। ইসলামের গোঁড়ামি একদিন জবরদস্তি করে শিরিনকে ছিঁড়ে আলাদা করে দিয়েছিল। ওরই কাছ থেকে নিয়েছিল। আমি তাকে জুড়ে দিলাম। তোমাকে আমি বলি নি—আমার মনে আমি কল্পনা করেছিলাম, আমার নয়া হিন্দুস্তানের এরাই হবে প্রথম দম্পতি। কিন্তু হায় চন্দ্রভান, এ কি হল?

চন্দ্রভান এসেই শাহজাদার মুখের দিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিয়েছিল। আর সে তাঁর মুখের দিকে তাকাতে সাহস করে নি। শাহজাদার মুখখানা রক্তোচ্ছ্বাসের প্রাবল্যে থমথম করছিল। প্রশস্ত

ললাটের উপর ত্রিশূল চিহ্নের মত তিনটে শিরা মোটা হয়ে ফুলে উঠেছিল। মুন্সী চন্দ্রভান এক মুহূর্তে বুঝতে পেরেছিল যে শাহজাদা আজ ক্ষোভে ক্রোধে আগুন হয়ে জ্বলে উঠতে চাচ্ছেন। এর পর আর সামান্য উত্তাপ প্রয়োজন যেটুকু যুক্ত হলেই দপ্ করে জ্বলে উঠবেন।

হিন্দুস্তানের বাদশাহ সাজাহানের প্রিয়তম জ্যেষ্ঠপুত্র শাহবুলন্দ ইকবাল দারা সিকো। প্রকৃতিতে শাহজাদা শিষ্ট দয়ালু ধার্মিক মধুর হলেও তিনি শাহজাদা। রাজা মহারাজা বাদশাহদের একটা মেজাজ আছে—সেটা চন্দ্রভান ভুলে যায় নি কোনদিন। চন্দ্রভান খুঁজে পাচ্ছিল না কি বলবে—কি উত্তর দেবে!

শাহজাদা আবার অধীরভাবে প্রশ্ন করলেন—চন্দ্রভান!

চন্দ্রভান বলে ফেললে—মুখ থেকে আপনি যেন বেরিয়ে এল—হজরত আলিজা, আপনি হিন্দুস্তানের ভবিষ্যৎ শাহানশাহ শাহজাদা—

—চন্দ্রভান, শাহজাদা আমি বটে—বাদশাহ আলাহজরত আমাকে শাহবুলন্দ ইকবাল খেতাব মনসব দিয়েছেন কিন্তু আমি 'খুদপরস্তি'—পথের পন্থী। আমি শুধু হজরত বাদশাহ শাহজাদার চেয়ে যে হজরতেরা বড় আমি সেই হজরত। আমি গুহ্যাদ্ গুহ্যতম যা তার সন্ধানী, তাকে জানি তাকে চিনি তাকে বুঝি। কিন্তু এই বেওকুফকে আমি এই সাদা কথাটা বোঝাতে পারছি না চন্দ্রভান যে পাঁচটা পাঁচ রঙের সীসার গেলাসে গঙ্গার পানি ঢাললে রং তার একরকম থাকে না। রঙের তফাত হয় কিন্তু ওই গঙ্গার পানির স্বাদের ফরক্ হয় না—পানির ঠাণ্ডা গুণের বদল হয় না, পানি পানিই থাকে, সিরাজীও হয় না শরবতও হয় না। তুমি বুঝিয়ে দিতে পার এই বেওকুফ কবিকে সে কথা?

—হজরতের হুকুম হলে ব্যবস্থা আমাকে করতেই হবে। হজরতের দিব্যদৃষ্টিতে কিছুই নিশ্চয় অজ্ঞাত নেই। সবই জানেন আপনি—আমি শুধু মনে পড়িয়ে দিচ্ছি। মনে পড়িয়ে দিচ্ছি এই যে

হুজরত যে নয়া হিন্দুস্তান গড়বেন সেই গড়বার কাজকে জিন্দা করে তুলবার জন্যেই আপনাকে বাদশাহী মসনদে বসতে হবে। আমি হুজরতের শিষ্য চেলা নোকর। কথাটা মনে পড়িয়ে দেওয়া আমার কর্তব্য।

শাহজাদা একটু চকিত হয়ে উঠলেন, নিজেকে কিছুটা সংযত করে বললেন—হ্যাঁ চন্দ্রভান, কথাটা তোমার ঠিক। মাঝে মাঝে আমি সমস্ত ভুলে যাই। বিলকুল ভুল হয়ে যায়।

—শাহজাদার দুই চোখ অহরহ নিবদ্ধ থাকে আকাশের দিকে। এক চোখ দেখে সূর্যকে, এক চোখ দেখে চন্দ্রকে; মাটির উপর যে সব পোকামাকড় বিচ্ছু, বিশেষ করে সয়তানের চেলা শিষ্য বিষাক্ত সাপ ঘুরে বেড়ায় তাদের সম্পর্কে খেয়াল থাকে না। শাহজাদার অনিষ্ট সহজে কেউ করতে পারবে না। হুজরত আপনি—আপনি খুদাকে জানেন, ব্রহ্মকে জানেন—তাঁদের সঙ্গে পয়গম্বর রসুল সাধু সন্তদের অফুরন্ত আশীর্বাদ আপনার উপরে। কিন্তু দুনিয়ায় দু'চারটে সাপ আছে যে সাপের বিষ ভয়ানক মারাত্মক। হুজরত, একটি সাপের কথা আপনাকে মনে পড়াতে চাই যে সাপের রঙ সাদা!

—হাঁ হাঁ হাঁ। দারা সিকো বার বার ঘাড় নেড়ে বললেন—হাঁ। এমনি একটা সাঁপ কাল বেদের ঝাঁপিতে বন্দী হয়েছে চন্দ্রভান। সফেদ সাঁপ। সাদা সাঁপ! ঠিক বলেছ তার বিষ মারাত্মক। এবং সে কেবলই আমাকে ছোবল মারবার সুযোগ খুঁজে বেড়াচ্ছে তার সারা জিন্দিগী—। হাঁ।

—শাহজাদার কাছে আমার আরজ, শাহজাদা যেন এই ব্রাহ্মণের ভার আমার উপর দেন। এবং এখনি আপনি ওর কাছ থেকে চলে যান। আলিজাঁহার এখন বিশ্রাম প্রয়োজন। কথা শেষ করে চন্দ্রভান শাহজাদার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

চন্দ্রভানের দৃষ্টিতে একটি কোন অর্থ বিচ্ছুরিত হচ্ছে এ কথা শাহজাদা নিশ্চয় বুঝেছিলেন কিন্তু সে অর্থটি যে কি তা ঠিক যেন

ধরতে পারছিলেন না। তবে এ-প্রসঙ্গের জের টানা যে ঠিক হবে না তা উপলব্ধি করলেন এবং ভ্রূ কুঁচকে চন্দ্রভানের দিকে তাকিয়ে বললেন—চন্দ্রভান!

চন্দ্রভান অভিবাদন করে বললে—কবি সুভগকে আমি বাইরে রেখে এখুনি আসছি জনাবআলি।

—কোথায় নিয়ে যাবে ওকে? তুমি নিশ্চয় জান চন্দ্রভান সাপের উপদ্রব হয়েছে আগ্রায়।

সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রভান উত্তর দিলে—জানি হুজুরআলি;—ঘরের মধ্যে চুহা বাসা গাড়লে সাপের উপদ্রব বাড়ে এ কথা সকলেই জানে—কিন্তু আমি তার ভুক্তভোগী। আমার বাড়ির আশেপাশে একটা সাদা সাপের বাস আছে। সাপটা দূরে দূরেই থাকে—এমনিতে হুঁশিয়ার থাকে কিন্তু চুহার সাড়া পেলেই সাদা সাপটা মানুষের ভয় ভুলে গর্জাতে থাকে।

—তাহলে?

—সুভগকে আমি শাহজাদার দেহরক্ষীদের মনসবদারের জিম্মায় রেখে এখুনি ফিরে আসছি। এস কবি সুভগ আমার সঙ্গে এস।

সুভগ শেষদিকের কথাবার্তাগুলি যেন ঠিক শুনছিল না—অন্য কোন একটা গভীর চিন্তায় সে যেন একেবারে নিঃশেষে মগ্ন হয়ে ছিল। সে শুধু ঘাড় ফিরিয়ে মুন্সী চন্দ্রভানের দিকে তাকালে।

তাকে আর একটু সচেতন করে তোলবার অভিপ্রায়েই চন্দ্রভান তাকে আবারও একবার নাম ধরে ডাকলে—কবি সুভগ!

সচেতন হয়ে কবি সুভগ একটু হেসে এবার সাড়া দিলে—জী হাঁ। তারপর ভূমি স্পর্শ করে শাহজাদাকে অভিবাদন করে বললে—সারা হিন্দুস্তানের ভাবী বাদশাহ, শাহবুলন্দ ইকবাল, সারা দুনিয়ায় মানুষ তার খাবার জন্যে অনেক জানবার জবেহ করে, কাটে—সেটা পাপ—নিশ্চয়ই পাপ। কিন্তু মানুষ যখন খুদার নাম করে কোন দুম্বাকে জবেহ করে কি কোন বকরাকে কাটে তখন জীবনহানির পাপ

মানুষকে স্পর্শ করে না হুজুরআলি। আমি এ সত্যকে মানি—একে স্বীকার করি। শাহজাদা, আমি এও বিশ্বাস করি যে এই কুরবানির ফলে মানুষের অনেক বিপদের অবসান হয়। অনেক সৌভাগ্যের উদয় হয়। আপনার মঙ্গল হোক শাহজাদা!

শাহজাদার মুখ গাঢ় রক্তবর্ণ হয়ে উঠল। চোখের দৃষ্টিতে উত্তাপ ফুটছে। কিন্তু তিনি কিছু বলবার আগেই চন্দ্রভান বললে—কবি সুভগ, তুমিও ব্রাহ্মণ আমিও ব্রাহ্মণ—আমরা নিজেকে চিনি না তবে তোমার আচরণ আমি বুঝি আমার আচরণ তুমি বুঝতে পার। আমরা বুদ্ধিমান কিন্তু আমরা ব্রাহ্মণেরা বীরের জাত নই। আমরা শস্ত্রবিদ্যা জানি, যুদ্ধ পরিচালনাও করতে পারি কিন্তু নিজেরা ঠিক বড় যোদ্ধা নই। এবং খুব বেশী সাহসও আমাদের নেই। আমরা সংকল্প করে অনশনে মরতে পারি। নিজের ধর্মের দেবতার মঙ্গলের জন্য হাড় দিয়ে বজ্র তৈরি করবার জন্যেও আমরা মরতে পারি তবু এটা ঠিক যে আমরা ক্ষত্রিয়ের মত সাহসী এবং সহিষ্ণু নই। তুমি আর একটু সহিষ্ণু হলেই পারতে। অনাবশ্যক জীবনের জন্যে ভয় প্রকাশ করে তুমি উপহাসাস্পদই হলে। তোমাকে আমি আশ্বস্ত করছি, আমি ব্রাহ্মণ—ব্রহ্মের নামে, বিষ্ণুর নামে, রুদ্রের নামে শপথ নিয়ে বলছি তোমার তেমন আশঙ্কার কোন কারণ নেই। শাহজাদা দারা সিকো তাঁর ক্ষমাধর্মের জন্য তাঁর উদারতার জন্য হিন্দুস্তানের ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবেন। তোমাকে কুরবানি করে শত সৌভাগ্যও যদি পাওয়া সম্ভবপর হয়-তাহলেও তুমি শাহজাদার করুণার অনুগ্রহে সম্পূর্ণ নিরাপদ।

চন্দ্রভান নীরব হতেই সমস্ত ঘরখানা যেন অস্বাভাবিকরূপে স্তব্ধ হয়ে গেল। হয়তো তা হয় নি—অর্থাৎ স্তব্ধতা যতটুকু স্বাভাবিক ততটুকুই স্তব্ধ ছিল কিন্তু তিনজনের মনের কাছে মনে হল ঘরখানা যেন অস্বাভাবিকরূপে স্তব্ধ হয়ে গেছে।

কবি সুভগ মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল—নিজের কাছেই তার লজ্জার আর শেষ ছিল না।

সেই অস্বাভাবিক স্তব্ধতা ভঙ্গ করে শাহজাদা দারা সিকো বললেন—কবি সুভগ, তুমি সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং মুক্ত। এই মুহূর্তেই যদি ইচ্ছা কর তবে এই মুহূর্তেই তুমি মঞ্জিল নিগমবোধ পরিত্যাগ করে চলে যেতে পার। এবং ভবিষ্যৎকালে তুমি যেমন ইচ্ছা তেমনিভাবেই থাকতে পার। তাতে আমি কোন আপত্তি কোন দিন করব না।

হঠাৎ সুভগ নতজানু হয়ে বসে হাত জোড় করে বললে—শাহজাদা, আপনার আত্মা অতি পবিত্র আত্মা—

—তুমি ক্ষান্ত হও কবি সুভগ। আমার আত্মাকে তুমি জান না চেন না, কারণ তুমি তোমার নিজের আত্মাকে চেন না। এ দুনিয়ায় আমি তোমাকে চিনি একথা বলতে পারে সেই যে নিজের নিজেকে চেনে। তুমি আমার যে আমাকে চেন সে আমি শুধু এই আমার দেহখানা। তুমি বল সুভগ তুমি কি এখানে নিরাপদ বোধ করছ না?

—না শাহজাদা তা আমি ঠিক বলছি না। আমি বলছি—

—তুমি কি বলছ তা জানবার আমার কোন কৌতূহল নেই কোন ইচ্ছা নেই ; তুমি শুধু আমাকে বল কোথায় তুমি যেতে চাও?

—হজরত, আমি আজ এই দিনটিতে এই প্রহরে কোথাও নিরাপদ নই। কোথাও না।

চন্দ্রভান এবার বললে—হেঁয়ালি করে কথা বলো না কবি সুভগ। এটা ঠিক মুশায়ারার মজলিস নয়। তুমি হিন্দুস্তানের শাহজাদা শাহবুলন্দ ইকবালের সামনে দাঁড়িয়ে আছ।

—চন্দ্রভানজী, সে কথা আমি খুব ভাল জানি। সেই কথাটাই আমি জানাতে চেয়েছিলাম শাহজাদাকে।

গম্ভীর কণ্ঠে শাহজাদা দারা সিকো বললেন—তোমাকে আমি

পূর্ণ স্বাধীনতা দিলাম কবি সুভগ, সঙ্গে সঙ্গে সেই মন্দভাগিনী মেয়েটা সেই শিরিনকেও আমি স্বাধীনতা দিলাম—তোমরা দুজনে যেমন ভাবে ইচ্ছা বাস করতে পার। তোমাদের পাপ-পুণ্য তোমাদের—আমার তাতে কোন দায়িত্ব রইল না। খুদার দরবারে আমি সব দায় থেকে খালাস। জীবনে স্বামী এবং স্ত্রীর পবিত্র অধিকারকে বড় করে তুলে সংসার বাঁধতে যদি তোমাদের মনে হয় হিন্দু এবং ইসলাম ধর্ম-বিরোধী কাজ করছ—গুণাহ হচ্ছে তোমাদের তাহলে যে উপপত্নী-উপপতি সম্পর্কটাকে আঁকড়ে ধরতে চাচ্ছ সেইটেকেই বড় করে ধরো। মৃত্যুর পর এর জন্য যে জবাবদিহি সে তোমরাই করবে। সেখানে খুদার দীন সেবক এই দারা সিকোর কোন দোহাই তোমাদের চলবে না।

বলেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং চন্দ্রভানকে বললেন—মুন্সী চন্দ্রভান!

—আলিজাঁহা!

—এই ব্রাহ্মণকে নিরাপদে মঞ্জিল নিগমবোধ থেকে বের করে দাও। কেউ যেন এর একগাছি কেশও স্পর্শ না করে।

বলেই তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য পা বাড়ালেন।

কবি সুভগ কিছু বলতে চাচ্ছিল। মুন্সী চন্দ্রভান তাকে মৃদুস্বরে বললে—শাহজাদারা ভগবানের তপস্যা করলেও তাঁদের একটা শাহজাদা চেহারা থাকে কবি সুভগ! যুঁই ফুল আর সাধারণ আগাছার ফুল—দুইই ফুল। কিন্তু যুঁই ফুল অত্যন্ত শীঘ্র অত্যন্ত কম রৌদ্রের উত্তাপেই ম্লান বিষণ্ণ হয়ে খসে পড়ে।

—মুন্সী চন্দ্রভান! আপনি—আপনি দয়া করে আমার কথা শুনুন। আমি যে কথাগুলি বলতে চাই সেইগুলি শুনুন।

—চল কবি সুভগ, বাইরে চল।

—মুন্সী চন্দ্রভান—

—কবি সুভগ! তুমি বাইরে চল। তোমার কথা শুনবার

আমার অধিকার নেই। শাহবুলন্দ ইকবাল শাহজাদা দারা সিকো তোমাকে নিরাপদে বাইরে পাঠিয়ে দিতে বলেছেন। চল, অন্যথায় আমাকে সিপাহীকে হুকুম দিতে হবে তোমাকে হাত পা বেঁধে তুলে নিয়ে এই মঞ্জিলের বাইরে কোথাও ফেলে দিয়ে আসবে।

হাত জোড় করে গভীর আকুতির সঙ্গে কবি সুভগ বললে—বিশ্বাস কর চন্দ্রভানজী আমি যা বলতে এসেছি যা বলতে চাচ্ছি তা আমার নিজের জন্য নয়, সব শাহজাদার মঙ্গলের জন্য। হয়তো আমার ভুল হয়ে গেছে—হয়তো ভুল করে আগেই বলে ফেলেছি আমাদের যে মর্মযাতনা অনুভব করছি তারই কথা।

মুন্সী চন্দ্রভান হাততালি দিলে। সঙ্গে সঙ্গে একজন রাজপুত সিপাহী এসে প্রবেশ করে দাঁড়াল। মুন্সী বললে—এই ব্রাহ্মণের হাতে পায়ে বেঁধে তুলে নিয়ে মঞ্জিলের বাইরে কোথাও রেখে দিয়ে এস। নিয়ে যাও—একে হাতে ধরে টেনে নিয়ে যাও এখান থেকে।

ঠিক তখন দুপহরের ঘড়ি বাজছে আগ্রা কিলায়। কবি সুভগ চীৎকার করে উঠল—মুন্সী চন্দ্রভানজী, অন্ততঃ আরও আধাঘড়ি—আর আধাঘড়ি আমাকে এখানে থাকতে দাও। না—। কোথাও লুকিয়ে রাখ।—

* * * *

সেই আধাঘড়ি পর—।

শাহজাদা দারা সিকো বিমর্ষ হয়ে বসে ছিলেন। সামনে দাঁড়িয়ে ছিল মুন্সী চন্দ্রভান। চন্দ্রভান বলছিল—ছুরিখানা গভীর হয়ে বসে গেছে বুকে ঠিক পাঁজরার পাশে। বুকের মাঝখানে নয়। বলতে পারি না বাঁচবে কি না! শাহজাদার হুকুমমতই আমি তাকে বার বার বলেও যখন বাইরে চলে যাওয়াতে পারলাম না তখন আমার অধীনের ডোগরা রাজপুত সিপাহীকে ডেকে হুকুম দিলাম—এর হাত পা বেঁধে একটা ডুলিতে তুলে নিয়ে আগ্রার কোন নির্জন পথের ধারে একে ছেড়ে দিয়ে এস। সে তার হাত ধরে টেনে নিয়ে

গেল। তারপর এই এক্ষুণি সেই সিপাহী হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এসে বললে কোথা থেকে একদল হাতিয়ারবন্ধ্ আদমী ছুটে এসে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। দলে তারা ভারী ছিল। পাঁচ সাতজন হাতিয়ারবন্ধ্ আদমী। এরা একলা কি করবে? বেহারা ডুলি ফেলে ছুটে পালিয়ে যায়। সিপাহী গজেন্দর সিং সেও সেখান থেকে পিছু হটে চলে আসতে বাধ্য হয়। কিন্তু সে কিছুদূর হটে এসে গাছের আড়াল থেকে সব দেখেছে।

শাহজাদা বললেন—ডাকো তাকে।

মুন্সী চন্দ্রভান বাইরে গিয়ে গজেন্দর সিংকে নিয়ে এসে খাড়া করে দিয়ে বললে—এই সেই গজেন্দর সিং হুজুরআলি।

গজেন্দর সিং মাটিতে হাত ঠেকিয়ে সেই হাত কপালে ঠেকিয়ে অভিবাদন জানালে।

শাহজাদা বললেন—কি দেখেছ তুমি?

—ওরা আমাদের উপব ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমি একা রুখতে পারলাম না সাত আদমীকে—

—ওরা সাতজন ছিল?

—হাঁ হুজুরআলি।

—তারপর?

—আমি কাঁধে সামান্য চোট খেয়েছি--

—দেখতে পাচ্ছি কাঁধের কাছটায় এখনও রক্ত পড়ছে। পোশাক ভিজে গেছে। তারপর?

—বেহারারা ডুলি ফেলে পালাল—

—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাই পালায়। আর কিই বা করতে পারে তারা?

—আমিও সরে এলাম। সেখানেই আমি জান দিতে পারতাম কিন্তু ডুলির ভিতর থেকে ওই লোকটি আমাকে বলেছিল—আমি কাশ্মীরী ব্রাহমণ। তুমি ডোগরা রাজপুত। সিপাহীজী, খুব সম্ভব

পথে আমার এই ডুলির উপর আক্রমণ হবে। তুমি যেন ধরা পড়ো না সিপাহীজী—তুমি ফিরে গিয়ে মুন্সী চন্দ্রভানজীকে আর শাহজাদা হজরত শাহবুলন্দ ইকবালকে খবরটা দিয়ে বলো আমি ঝুট্ বাত বলি নি। আমার এই চিঠিখানা তাঁকে পড়তে বলো। লোকটি বলেছিল—সিপাহীজী, দেখ আমার আংরাখার ভিতর দিকে একটা জেব আছে। ঐ জেবের মধ্যে আমার লেখা একটা খত্ আছে। শাহজাদার নামে লেখা। সেটা তুমি বের করে নাও। আমি ব্রাহমণ, আমি বলছি তোমার অনেক মঙ্গল হবে। এই উপকারটি করো। আলিজাঁহা, আমি তার সে অনুরোধ রাখার পথে কোন বাধা দেখি নি। কোন অন্যায়ও মনে হয় নি। আমি খত্খানা বের করে নিয়ে আমার কোমরবন্ধের তলায় রেখেছিলাম।

—তারপর ?

—ডুলিখানা ফেলে বেহারারা পালাল, আক্রমণকারীরা লোকটিকে টেনে ডুলি থেকে নামালে। তাজ্জব কি বাত হুজুরআলি, তখন হাত পা বাঁধা লোকটি আচম্বিতে থু থু করে থুথু ছিটিয়ে দিলে ওই সিপাহীদের গায়ে; একজন সিপাহী হেঁট হয়ে ওকে টেনে তুলতে যাচ্ছিল কিন্তু লোকটি তার মুখে থুথু দিলে। সঙ্গে সঙ্গে সে তার কোমরবন্ধে গোঁজা ছোরাটা টেনে বের করে তার বুকে বসিয়ে দিলে। এরই মধ্যে একদল বাদশাহী রিসালা, কোতোয়ালীর সিপাহীই হবে বোধ হয়, এসে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে লোকগুলো ছুটে পালাল। তবে তারই মধ্যে লোকটার কাপড়চোপড় খুঁজে তারা কিছু নিয়ে পালিয়েছে এ আমি নিজের চোখে দেখেছি।

—কই তোমার সে খত্? সে চিঠি ?

গজেন্দর সিং তার কোমরবন্ধের ভিতর থেকে একটা খত্ বের করে মুন্সী চন্দ্রভানের হাতে তুলে দিলে।

মুন্সী চন্দ্রভান চিঠিখানার দিকে তাকিয়ে সবিস্ময়ে বলে উঠল—একি—এ তো শাহজাদী রৌশনআরার নাম লেখা!

চমকে উঠলেন শাহজাদা—কি? কার নাম লেখা? শাহজাদী রৌশনআরার নাম? তাজ্জব কি বাত!

সিপাহী গজেন্দর সিং বললে—যে হাতিয়ারবন্ধ্ লোকেরা ডুলির উপর চড়াও হয়েছিল তাদের মধ্যে একজন আমার খুব জানা লোক আলিজাঁহা, তার নাম সুলেমান। লোকটা আগে ছিল থাট্টা কলাচীর ওদিকে।

—সিন্ধী—

—না জনাবআলি, লোকটা আসলে বাংগালী। বাংগালী হিন্দু, ভাল ঘরের ছেলে, পরে মুসলমান হয়েছে। লোকটা দয়ামায়াহীন পাষণ্ড। সুরাট অঞ্চল থেকে কি একটা খবর বেচতে এসেছিল আগ্রা। দামী খবর। বোধ হয় শাহজাদী সেই খবরটা কেনেন। আর তখন থেকেই সে আছে শাহজাদী রৌশনআরার নোকরীতে।

—চিঠিখানা আমাকে দাও চন্দ্রভান।

হাত বাড়ালেন শাহজাদা।

ছাব্বিশ

অশেষ মহিমান্বিত শাহজাদা শাহবুলন্দ ইকবাল মহম্মদ দারা সিকো দীনজন প্রতিপালকেষু অশেষ করুণানিলয়েষু—

কবি সুভগের পত্রখানি খুললেন শাহজাদা। প্রথমেই আকর্ষণ করল তার সুন্দর হস্তাক্ষর। মুঘল আমলে বাদশাহী বংশে সুন্দর হস্তাক্ষরের চর্চা একটা বিশেষ সমাদরের যোগ্য গুণ বলে বিবেচিত হত। বাদশাহদের হস্তাক্ষর সত্যই সুন্দর ছিল। শাহজাদা হিসেবে তাঁদের জীবনের শিক্ষার প্রারম্ভে এই হস্তাক্ষরের চর্চার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হত। শাহজাদা দারা সিকোর নিজের হস্তাক্ষরের প্রশংসা সকলেই করে থাকে। এবং মূল ধ্বনি থেকে প্রতিধ্বনি যেমন পটভূমি বিশেষে উচ্চতর হয়ে থাকে তেমনি ভাবে সত্যের থেকেও সত্যের প্রকাশ অপর পাঁচজনের সমবেত কণ্ঠে উচ্চতর শব্দে ধ্বনিত হত। শাহজাদা দারা নিজে এ সত্য জানতেন—তিনি জানতেন যে, তাঁর হস্তাক্ষর অতি সুন্দর, এবং এও জানতেন যে, লোকে যে সেই অতি সুন্দর হস্তাক্ষরকে অতি-অতি সুন্দর বলে থাকে তার মধ্যে বাড়তি অতিটা তাঁর মনতোষণের জন্য। কিন্তু বিচিত্র শাহজাদার মন—হয়তো বা শাহজাদা শাহবুলন্দ ইকবালের মনই এমনই বিচিত্র যে, সব জেনে-শুনে এবং বুঝে-সুজেও তিনি বিশ্বাস করতেন তাঁর লেখা অতি-অতি সুন্দর কেন অতি-অতি-অতি সুন্দর। সুভগের হস্তাক্ষরের দিকে তাকিয়ে তাঁর দৃষ্টি বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে উঠল।

এত সুন্দর লেখা এই কাশ্মীরী ব্রাহ্মণপুত্রের! এই কবি সুভগের! শাহজাদা দারা সিকোর চোখে ফুটে উঠল বিস্মিত দৃষ্টি, সঙ্গে সঙ্গে ললাটে ফুটে উঠল কয়েকটি রেখার কুঞ্চন। তাঁর হস্তাক্ষরের চেয়েও সুন্দর। হ্যাঁ সুন্দর।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চিঠিখানা পড়তে শুরু করলেন—

"শাহজাদা শাহবুলন্দ ইকবাল, আপনি আমার মুখের কথা শুনবেন না—অধীর হয়ে উঠবেন—আমার মুখ বন্ধ করে আপনার সম্মুখ থেকে জোর করে দূর করে দেবেন এ আমি জানি বলেই এই পত্র লিখলাম। কোন রকমে এই পত্রখানা যদি হজরতের হাতে পৌঁছয় তবে মেহেরবানি করে এই পত্রখানি পরবেন। আমার আজ দ্বিপ্রহরে একটি সাংঘাতিক বিপদ আছে যা আমাকে মৃত্যুর দ্বার-সমীপস্থ করবে। মরব কি না সে কথা আমাকে বলেন নি। যিনি এই ভবিষ্যৎ গণনা করেছেন তিনি এক মহাপুরুষ। শাহজাদা, আমি হিন্দু—আমি বহু দেবতায় বিশ্বাস করি—আমার নিশ্চিত ধারণা তিনি মহাপুরুষের ছদ্মবেশে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের একজন। হয়তো বা তিনি লোকপিতামহ ব্রহ্মা হবেন।

হজরত, আপনি সত্যকারের ধার্মিক—খাঁটি মুসলমান—আপনি সকল ধর্মের সারতত্ত্বসন্ধানী। সকল ধর্মের প্রতিই আপনার সমান বিশ্বাস আছে তাই উপরের বিশ্বাসের কথা লিখতে সাহসী হলাম।

শাহজাদা, তিনিই আমাকে বলেছিলেন—সুভগ, শাহজাদা দারা সিকো সত্যকারের তত্ত্বজ্ঞানী। আমাদের শাস্ত্রে এক শ্রেণীর মানুষকে হংসের সঙ্গে তুলনা করে যারা নীরের মধ্য থেকে ক্ষীরটুকু গ্রহণ করবার শক্তি নিয়েই জন্মগ্রহণ করে। শাহজাদা দারা সিকো তাই। কিন্তু তবু তিনি শাহজাদা। হিন্দুস্তানের বাদশাহের জ্যেষ্ঠপুত্র। এইখানেই অবস্থান করছে তাঁর জন্মকুণ্ডলীতে এক অশুভগ্রহ। তাঁর প্রকৃতির মধ্যে সে-গ্রহ অসহিষ্ণুতা-ধর্মের রূপ গ্রহণ করে তাঁর সকল কর্মের উপর তার প্রভাব বিস্তার করছে। তাঁর শাহজাদাত্ব তাঁর এই সকল ধর্মের সার গ্রহণ করে নবধর্মের পয়গম্বরত্বের পথে পর্বতের মত বাধা হয়ে জন্মাবধিই দণ্ডায়মান রয়েছে। তুমি তাঁকে তোমার বক্তব্য যতই বিনয়ের সঙ্গে নিবেদন করতে চেষ্টা করবে ততই তিনি অসহিষ্ণু হয়ে উঠবেন। এবং অবশেষে তোমাকে হস্তে পদে রজ্জুবদ্ধ করে পথিপার্শ্বে নিক্ষেপ করবেন। সুতরাং তুমি পূর্বাহ্ণ থেকে পত্র লিখে

রেখো এবং শাহজাদার যে প্রহরী তোমাকে হস্তে পদে রজ্জুবদ্ধ করে মঞ্জিল নিগমবোধ থেকে বের করে নিয়ে দূরে পথিপার্শ্বে কোন স্থানে নিক্ষেপ করবার ভারপ্রাপ্ত হবে তাকেই এই পত্রখানি দেবার চেষ্টা করো।

তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীগুলি আমি শুধু কানেই শ্রবণ করি নি শাহজাদা আমি মনশ্চক্ষেও প্রত্যক্ষ করেছিলাম। সে সমস্ত ভবিষ্যতের কথা পত্রে খুলে লিখতেও আমার সাহস নেই। সে ভবিষ্যৎ ভীষণ—সে ভবিষ্যৎ ভয়ংকর। সে ভবিষ্যৎ আমার পক্ষে ভয়ংকর—সে ভবিষ্যৎ শিরিনের পক্ষে ভয়ংকর—সে ভবিষ্যৎ তামাম হিন্দুস্তানের বাদশাহের পক্ষে বাদশাহীর পক্ষে ভয়ংকর। শাহজাদা—হে আমার কল্পনার রাজ্যের মহান নায়ক শাহবুলন্দ ইকবাল, সে যে আপনার পক্ষে কি তা বলতে পারব না। না, সে বর্ণনা করবার শক্তি আমার নেই। শাহজাদা, সে ভবিষ্যৎ তামাম হিন্দুস্তানের হিন্দু এবং মুসলমানের ভবিষ্যৎ। আমি স্বচক্ষে—হাঁ শাহজাদা ওই মহাপুরুষ আমার হাত ধরে নিজের মুঠির মধ্যে চেপে ধরে বলেছিলেন—"বাচ্চা, এখন তুমি দেখ। নিজের চোখে প্রত্যক্ষ কর।"

শাহজাদা, মেহেরবানি করে সহিষ্ণু হয়ে আপনার অনুগত এই কাশ্মীরী ব্রাহ্মণসন্তানের চিঠিখানি পড়ে যাবেন—গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত পড়বেন। আপনি বাদশাহের জ্যেষ্ঠপুত্র—অতি সমাদরের পাত্র। শাহানশাহ বাদশাহ জালালউদ্দিন আকবর-শাহ তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র সেলিমকে যত স্নেহ করতেন তার থেকে আপনি কম স্নেহের পাত্র নন। সমান তো বটেই হয়তো বা তার থেকেও বেশী।

আপনি তার যোগ্যও নিশ্চয়।

শাহজাদা সেলিম কেবলমাত্র বাদশাহের উত্তরাধিকারী ভাবী বাদশাহই ছিলেন না সেই হিসাবে যোদ্ধা ছিলেন বীর ছিলেন প্রজাপালকও ছিলেন—খেয়ালী ছিলেন—সেই সঙ্গে বিলাসী ছিলেন এবং—এই দীন কবিকে মার্জনা করবেন—সুরা ও নারীতে কিছু

অধিক পরিমাণেও আসক্ত ছিলেন। সিংহাসনের জন্য তিনি পুত্র খসরুকেও মার্জনা করেন নাই। কিন্তু শাহজাদা দারা সিকো শুধু শাহজাদা নন—তিনি এক নবধর্মকে তাঁর অন্তরলোকে সৃজন করছেন লালন করছেন—এই হিন্দুস্তানের মানুষের জীবনাকাশে তাকে উদিত করে দেবেন যার আলোকে উত্তাপে এই হিন্দুস্তানের মানুষেরা পাবে এক নয়া জমানা। শাহজাদা, পূর্বেই বলেছি আপনি শাহজাদা শুধু নন আপনি তার সঙ্গে সঙ্গে নতুন এক ধর্মের দেওয়ান, হজরত, পয়গম্বর।

এইখানেই আপনি অতি মহান—আপনি বিরাটের অংশ—আবার সেইখানেই আপনি খণ্ডিত।

আমার অপরাধ আপনি মার্জনা করবেন। আপনি হয়তো উষ্ণ উত্তপ্ত হয়ে উঠছেন। এইখানেই আপনার বিপদ। কারণ কোন বাদশাহের পুত্র তার অহংকার নিয়ে উত্তপ্ত না হয়ে পারবেন না।

এ আমার কথা নয় শাহজাদা। এ কথা এই মহাপুরুষের। মহাপুরুষ বললেন—সুভগ, আমাদের দেশে রাজকুমার সিদ্ধার্থ বুদ্ধত্ব অর্জন করেছিলেন। কিন্তু তার জন্য তিনি পরমাসুন্দরী স্ত্রী—তার কোলে পুত্র এবং কপিলাবাস্তুর সিংহাসনের উত্তরাধিকার ত্যাগ করে একদিন রাত্রে ভিক্ষুকের বেশ ধারণ করে তপস্যার জন্য বনে চলে গিয়েছিলেন। মরণ সংকল্প করে তপস্যা করে তিনি নূতন উপলব্ধি লাভ করে তাকেই নূতন ধর্মরূপে পৃথিবীর মানুষকে দান করেছিলেন। বলেছিলেন এই হল মুক্তির পথ। তাঁর নিজের সন্তানকেও তিনি সন্ন্যাসধর্ম দিয়েছিলেন। নিজের স্ত্রীকে নিজের মাতৃস্থানীয়া মাতৃস্বসাকেও সন্ন্যাসিনী হতে অনুমতি দিয়েছিলেন। রাজপুত্র গৌতম বুদ্ধ যতক্ষণ পর্যন্ত যুবরাজের আভিজাত্য অহংকার মর্যাদাবোধ অসহিষ্ণুতা ত্যাগ করতে না পেরেছিলেন ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি তাঁর জন্মগত অনন্যসাধারণ চৈতন্যশক্তির জন্য শুধু মানবজীবনের দুঃখ-বেদনারই সম্মুখীন হয়েছিলেন। সেই দুঃখ-বেদনা তো এই সংসারে

সমুদ্রবক্ষের জোয়ার-ভাটার মত নিরন্তর উচ্ছ্বসিত হচ্ছে—তার আবর্তে তো পৃথিবীর মানুষ অহরহ নিষ্ঠুর ঝড়ে ভগ্নপক্ষ বিহঙ্গমের ন্যায় বিপর্যস্ত হচ্ছে আছাড় খেয়ে পড়ছে—কোথায় কোন্ নিরুদ্দেশে হারা হয়ে যাচ্ছে কিন্তু তবু তো মানুষ ওই যে ত্যাগ সংযমন ও সাধনায় অকম্পিত বৃক্ষটি অনন্ত কাল ধরে অবস্থান করছে, তার শাখায় গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে না তপস্যায় রত হচ্ছে না। শুধু এই ঝড়-ঝঞ্ঝায় বিপর্যস্ত হয়ে ডানা ভেঙে পড়বার সময় আকুল ক্রন্দনকে মিশিয়ে দিচ্ছে ওই ঝড়ের বিক্ষুব্ধ গর্জনের সঙ্গে। রাজপুত্র গৌতম সিদ্ধার্থ রাজপুত্রের অধিকার এবং তার সঙ্গে রাজপুত্রের মনকেও রাজপরিচ্ছদ ও আভরণের সঙ্গে পথের ধূলার উপর পরিত্যাগ করে কঠোর তপস্যার মধ্যে পেয়েছিলেন তাঁর ধর্মকে।

শাহজাদা, আপনার মধ্যেও ঠিক সেই আকৃতি এবং আকুলতা রয়েছে যা ছিল মহারাজ শুদ্ধোদনের পুত্র যুবরাজ গৌতম সিদ্ধার্থের মধ্যে। কিন্তু যে ত্যাগ ও তপস্যায় সেই বেদনা ও আকৃতির প্রতিকার আপনি আবিষ্কার করতে পারেন—জীবনে আনন্দলোক সুখের জগতের সিংহদ্বার আপনার সম্মুখে উন্মুক্ত হতে পারে অভাব রয়েছে তার।

শাহজাদা, এই স্থানে আপনি অধীর হবেন—আপনার ইচ্ছা হবে পত্রখানাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে দেন। আপনার শাহজাদাত্বের অহংকার এবং উত্তাপ এই সত্যের খোঁচায় দপ করে জ্বলে উঠবে। এই সত্যকে সহ্য করবার মত যে সুমহান সবিনয় সহিষ্ণুতা তা শাহজাদাত্বের মধ্যে থাকে না। শাহজাদা, বিশাল বনস্পতির সহ্যশক্তি বিপুল কিন্তু তৃণের মত নিরভিমান কোমল প্রসন্নতা তার থাকে না।

শাহজাদা দারা সিকো, আপনি উদার আপনি মহৎ কিন্তু আপনি সমুদ্রহৃদয়—আপনি আকাশ নন।

মহাপুরুষ আমাকে বললেন—সুভগ, শাহজাদা মাটির দুনিয়ার

উপর বিগলিত আকাশ অর্থাৎ সমুদ্র হয়ে ঝরে পড়েছেন। কিন্তু আকাশের মত নিস্তরঙ্গশীল প্রসন্ন প্রশান্ত হতে পারছেন না। তারই ঢেউ তোমার সংসারে এসে লেগেছে।

তোমার সংসার সৃষ্টি করেই তো শাহজাদা দারা সিকো হজরত দারা সিকো প্রথম নয়া দুনিয়া, নয়া জিন্দিগী সৃষ্টি করেছেন—কিন্তু তোমার সংসারে শান্তি কোথায়? কেন এত অশান্তি? কেন এত বিক্ষোভ? কেন এত উত্তাপ? কেন তুমি শিরিনকে বুকে চেপে ধরে সেই শান্তি পাচ্ছ না যে শান্তি লোকে প্রত্যাশা করে এবং যে শান্তি লোকে যুগে যুগে ধর্মের সংসারে পেয়ে এসেছে?

শাহজাদা, আমাদের একটি সন্তান হয়েছিল। আমার ঔরসে শিরিনের গর্ভে। শাহজাদা, আমাদের সংসারে আমরা দুজনেই প্রত্যাশা করছিলাম আমাদের দুজনের জীবনের ফুল থেকে যে ফল ধরল সে ফল নিশ্চিতরূপে হবে অমৃতফল। সন্তানের প্রত্যাশা যে কি প্রত্যাশা সে শাহজাদা জানেন।

শাহজাদার প্রথম সন্তান কন্যা। সে সন্তান বিগত হলে শাহজাদা উন্মাদের মত হয়ে গিয়েছিলেন কিছুদিন। শুনেছি সেই দুঃখ এবং মর্মান্তিক বেদনার মধ্যেই শাহজাদা আবিষ্কার করেছিলেন তাঁর অন্তর্নিহিত ঐশী শক্তিকে। এরই মধ্যে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, তিনি শুধু এই মাটির দুনিয়ায় যে সব মানুষেরা কীটপতঙ্গের মত দুনিয়াকে কুরে কুরে খায় এবং খাবার অধিকার নিয়ে পরস্পরের মধ্যে নানান অজুহাতে বিবাদ করে, কলহ করে, পরস্পরকে আঘাত করে নিহত করেই ক্ষান্ত হয় না, জন্তুর মত আচরণ করে, আপনি তাদের একজন নন—আপনি স্বতন্ত্র—আপনি সাধারণের থেকে অনন্য হয়ে অনন্যসাধারণ একজন। কিন্তু সে থাক শাহজাদা। বার বার আমার সূত্র হারিয়ে যাচ্ছে। আমি বলতে চাচ্ছি—হে মহান শাহজাদা শাহবুলন্দ ইকবাল—হে নবধর্ম জীবনের পয়গম্বর—আপনি বুঝতে

পারবেন আমরা কি প্রত্যাশায় এই দিনটি গণনা করছিলাম। বা দিনটির দিকে তাকিয়ে ছিলাম।

শাহজাদা, আমি এবং শিরিন আপনার কাছে যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছিলাম কাশীতে গিয়ে সে প্রতিশ্রুতি আমরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলাম। সে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছিল—সেই ধর্মই সে পালন করত। আমি ব্রাহ্মণ—আমি ব্রাহ্মণের কর্ম এবং ধর্ম পালন করেছি। অসুবিধা অনেক হয়েছে শাহজাদা কিন্তু আপনার প্রতিষ্ঠিত যে নয়া দুনিয়া আমাদের গৃহস্থালীর অঙ্গনে আমরা পেতেছিলাম সেখানে শত অসুবিধার মধ্যেও তাতে আঘাত পড়তে দিই নি। শাহজাদা, রমজানের সময় আমি শিরিনের সঙ্গে রোজা পালন করেছি। অবশ্য সারা হিন্দুস্তানে বহু হিন্দুই রোজার উপবাস করে। কোরান পাঠ করে আমি শিরিনকে শুনিয়েছি। শিরিনের সঙ্গে নামাজ প্রার্থনা তাও আমি করেছি। আবার শিরিনও জন্মাষ্টমীতে, রামনবমীতে, শিবচতুর্দশীতে উপবাস করেছে। আমাদের পিতৃতর্পণের সময় শিরিন বলেছে তার হিন্দু পিতাকে তর্পণ করতে—তা করেছি। আমি পিতৃশ্রাদ্ধ করেছি—সে অদূরে হাত জোড় করে বসে থেকেছে।

শাহজাদা, ঝুলনের সময় ঘরে হিন্দোলা খাটিয়ে তার উপর রাধাকৃষ্ণের তসবীর স্থাপন করে আমরা দুজনে দুদিক থেকে দোলা দিয়েছি এবং লীলা গান করেছি।

শাহজাদা, আমাদের গৃহাঙ্গনের মধ্যে আপনার নূতন ধর্ম যেন মূর্তি ধরে গড়ে উঠছিল। আমাদের দুজনের উপাসনা ও পূজার দুখানি স্বতন্ত্র ঘর ছিল। ওর ঘরে ছিল বেদির উপর আমার হাতের নকল করা কোরানশরীফ, কাবার স্পর্শপূত মক্কা থেকে আনা একখানি মখমলের উপর সেই পবিত্র গ্রন্থ স্থাপন করে রাখা ছিল। অন্য ঘরে ছিল আমার উপাসনাগৃহ। একখানি সিংহাসনের উপর প্রথম বৎসর রেখেছিলাম নানান দেবদেবীর মূর্তি, গীতা মহাভারত

রামায়ণ ইত্যাদি গ্রন্থ। পরে মূর্তিগুলিকে বাদ দিয়ে আমার পূজার সিংহাসনে রেখেছিলাম শুধু গ্রন্থগুলি।

শিরিন সন্তানসম্ভবা হওয়া সম্পর্কে দুজনেই যখন বহু আশায় আশান্বিত হয়ে উঠেছিলাম তখন এই পূজার ঘর দুখানিকে এনেছিলাম পাশাপাশি ঘরে।

শিরিনই এ প্রস্তাব করেছিল; বলেছিল—দুই ঘরের সামনের বারান্দায় আমাদের বাচ্চাকে এনে ভোরবেলা তার মাথা ঠেকিয়ে দেব। একটু বড় হলে শুইয়ে দেব। এক প্রণাম আমাদের দুজনের ভগবানের দুই রূপের পায়ের তলে গিয়ে পৌঁছুবে।

বড় ভাল লেগেছিল এ প্রস্তাব।

পরের দিনই নতুন একখানি ঘর তৈয়ার করার ফরমায়েশ করেছিলাম। সামনে একটি বারান্দা বা চত্বর। পাশাপাশি দুখানি ঘর। এক ঘরে কোরানশরীফ রাখবার জন্য বেদি। অন্য ঘরে আমার গীতা রামায়ণ মহাভারত রাখবার সিংহাসন। সম্মুখের চত্বরটিকে তৈরি করিয়েছিলাম পরম যত্নের সঙ্গে। শাহজাদা, আপনার নবধর্মের প্রথম জাতক ওই চত্বরে হামাগুড়ি দিয়ে জীবনে প্রথম ধর্মের পাঠ গ্রহণ করবে।

শাহজাদা, আমাদের কল্পনার আর শেষ ছিল না। আপনি আপনার যে নূতন ধর্ম প্রবর্তন করবেন তার জন্য বেদ বেদান্ত কোরান বাইবেল ইত্যাদি নিয়ে—মোল্লা ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী পাদরীদের নিয়ে সারা দিন রাত্রি ধরে যেমন আলাপ আলোচনা করেন তেমনি ভাবেই আমরা দুজনে আমাদের সন্তান সম্পর্কে নানান কল্পনা করে আপনার ধর্মকে বাস্তবে রূপ দিতে চেষ্টা করেছিলাম।

আমাদের সন্তানের নাম কি হবে তাই নিয়ে রাত্রির পর রাত্রি আমরা আলোচনা করেছি। কোন্ নাম?

শাহজাদা, সে বলত ছেলে হলে নাম হবে 'পীতম'। মেয়ে হলে

হবে 'লায়লী'। আমি বলতাম—না, ছেলে হলে নাম রাখব 'একবাল'। ছুনিয়াতে সে হবে সৌভাগ্যবান শক্তিধর।

এ নিয়ে কত দিন আমরা ছেলেখেলার মত খেলা করেছি। কাগজে নাম লিখে মুড়ে পড়শীদের বাচ্চাদের দিয়ে উঠিয়ে দেখেছি।

কোন দিন উঠল—পীতম।

কোন দিন উঠল—একবাল।

আমরা কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারলাম না। শাহজাদা সাত আট মাসের মধ্যে নিত্যই এ খেলা খেলেছি। তর্কতকরার করেছি। অনেক তকরার।

—কেন? পীতম নামে আপত্তি কেন?

—একেবারে হিন্দু নাম হয়ে যাচ্ছে না? ইসলাম যাদের ধর্ম তাদের মধ্যে কি কখনও কারও পীতম নাম শুনেছ?

শিরিন বলত—কিন্তু তাতে কি? নামটি যে বড় মিষ্টি।

আমি বলতাম—আমরা শপথ করেছি শাহজাদার কাছে সে কথা ভুলে যেও না শিরিন। তার থেকে 'একবাল'ই ঠিক নাম হবে। তুমি কাশ্মীর পাঞ্জাব দিল্লী আগ্রার অঞ্চল মনে করে দেখ যেখানে হাজার হিন্দুর ছেলের নাম শিখের নাম রয়েছে 'একবাল'।

—কিন্তু ওটাও তো এদেশী নয়।

—না। ও আর বিদেশী একেবারেই নয়। সম্পূর্ণ এদেশী হয়ে গেছে। পীতমে তবুও মনের মধ্যে হিন্দুর বাঁশরীবালা প্রিয়তমকে মনে পড়বে। একবালে তা পড়বে না। একবালই থাক।

একদিন এই নাম নিয়েই আমাদের কলহ হচ্ছিল। সে-দিনটি শাহজাদা আমাদের সন্তানের জন্মের ঠিক পূর্বদিন।

বেলা তখন প্রায় প্রথম প্রহর পার হয় হয় এমন সময় বাইরের দরজায় কে হাঁক দিলেন—

পরমেশ্বর পরমাত্মার জয় হোক। গৃহস্থ তোমার কল্যাণ হোক।

শাহজাদা, তার কণ্ঠস্বরে আশ্চর্য একটি আকর্ষণ ছিল। সে

আকর্ষণে আমরা দুজনেই উঠে গিয়ে দরজার সম্মুখে দাঁড়ালাম। দেখলাম আশ্চর্য একটি মানুষকে।

আমাদের দেখে আবার বললেন—লা ইলাহি ইল্লাল্লা—বেগর আল্লা দুনিয়ায় মাবুদ নাই। আল্লাতায়লা তোমাদের মঙ্গল করুন।

শাহজাদা, ইনিই সেই মহাপুরুষ।

আমি প্রণাম করে বললাম—প্রভু!

শিরিনও প্রণাম করে বললে—হজরত!

তিনি বললেন—তোমরা এই মোকামের মধ্যে নয়া দুনিয়ার অঙ্গন পেতেছ—আমি সেখানের আকর্ষণে এসেছি।

চমকে উঠলাম শাহজাদা। বললাম—কি বলছেন প্রভু গোস্বামীজী!

হেসে তিনি বললেন—আমাকে দেখাবে না? এই নয়া দুনিয়াকে কামনা প্রত্যাশা করছেন খুদ পরমাত্মা, খুদ খুদাতায়লা। কিন্তু হতে পারছে না। মানুষেরাই পেরে উঠছে না। ভেঙে যাচ্ছে—বার বার ভেঙে যাচ্ছে। এও ভেঙে যাবে—তবু তোমরা পেতেছ সাজিয়েছ খেলাঘর—সে-ঘর দেখতে ইচ্ছা হচ্ছে। দেখাবে না?

আমি অবাক হয়ে বললাম—আপনি কেমন করে জানলেন? কে বললে আপনাকে?

—সে শক্তিটুকু আমার আছে। এই বাড়ির আকর্ষণই আমাকে টেনে এনেছে অনেক দূর থেকে।

শিরিন বললে—আসুন হজরত আসুন।

সন্ন্যাসীকে এনে আমাদের উপাসনাঘর দুটির সামনে চত্বরে আসন পেতে দিয়ে দুটি ঘরেরই দরজা খুলে দিলাম।

শাহজাদা, শাহবুলন্দ একবাল; হিন্দোস্তানে হিন্দু-মুসলমানের জীবন মন্থনে যে বিষ উঠেছে সেই বিষের জ্বালা এবং ক্রিয়া থেকে মানুষকে পরিত্রাণ করবার জন্য আপনি চিহ্নিত নীলকণ্ঠ!

হজরত আপনি হিন্দুর পুরাণ পড়েছেন। আপনি সমুদ্রমন্থনের বিষের কথা জানেন। নীলকণ্ঠ কে তার কাহিনী আপনার অজ্ঞাত নয়।

আমি আপনাকে এই নাম দিই নি।

দিয়েছিলেন সেই আগন্তুক অদ্ভুত সন্ন্যাসী।

* * * *

সেই সন্ন্যাসী শিরিনের পেতে দেওয়া আসনে বসে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন আমাদের স্বামী স্ত্রীর আলাদা অথচ পাশাপাশি দুটি উপাসনাঘরের দিকে। তারপর বললেন—এ কি? এ তো দুই মন্দিল আর মসজেদ। এ তো পুরানা। এ তো সেই কোন্ শও শও বরিষ ধরে রয়েছে। নই দুনিয়া কোথায়? মাঝখানে পাঁচিল রেখেছ কেন? ভাঙতে পার নি?

আমরা দুজনে সবিস্ময়েই তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম।

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সন্ন্যাসী বললেন—হায় হায় হায়, তোমরা জানো না—তোমরা দেখতে পাও না—তোমাদের কাছে খবর আসে না পরমাত্মার কলিজার দুঃখের। অনেক দুঃখ তাঁর। তোমরা জানো না, তাঁর কলিজা কাঁপিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে। পড়ে তাঁর দুনিয়ার মধ্যে তাঁরই ইচ্ছায় যে জীবন তৈয়ার হয়েছে তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ যে মানুষ সেই মানুষের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ দেখে। সে হিংসা-বিদ্বেষ যখন তাঁকে কেমন করে পূজো করবে এই নিয়ে আগুনের মত জ্বলে উঠে সংসারের সুখের ঘরগুলি পুড়িয়ে ছাই করে দেয় তখন তিনি আপসোস করেন—হায় হায় হায়! তখন তাঁর

চারিপাশে থাকেন যে সব ফিরিস্তারা তাঁর ভক্তরা তাঁরা নেমে আসতে হুকুম চান সেই পরমাত্মা সেই খুদাতয়লার কাছে। তিনি কখনও না বলেন না। আমাদের হিন্দু শাস্ত্রে বলে অনেক সময় তাঁর খণ্ডাংশ নেমে এসে মানুষ হয়ে জন্মায়। কিন্তু দুনিয়ায় এই যে হিংসা-বিদ্বেষ—এই যে অহং এবং স্বার্থের খেল এ থেকে তাঁরাও পরিত্রাণ পান না।

এবার এসেছেন এক ফিরিস্তা। এক মহাপুরুষ। কিন্তু—।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—হজরত, কিন্তু বলে চুপ করলেন কেন?

তিনি একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আমার মুখের দিকে তাকালেন। বললেন না কিছু। আবার জিজ্ঞাসা করলাম—প্রভু!

—বেটা। কি বলব? কি বলব তা ঠিক বুঝতে পারছি না। ফিরিস্তা এসে জন্মালেন বাদশাহের ঘরে। সারা হিন্দুস্তান জুড়ে তাঁর বাদশাহী। ওদিকে বলখ বদকশান থেকে ওদিকে কামরূপ তক। কাশ্মীর থেকে দক্ষিণে বিজাপুর তক। যাঁর তোশাখানায় সোনা রূপা জওহরত ধনদৌলত এত যে সারা দুনিয়ার দৌলত জড়ো করলেও সমান হবে না।

তিনি চুপ করলেন। আমি অপেক্ষা করে রইলাম তাঁর কথা শুনবার জন্য। এর জবাবে তো কোন কিছু বলার আমার ছিল না। প্রশ্ন করবার অনেক ছিল। প্রশ্ন ছিল অনেক, কিন্তু সে প্রশ্ন করতে সাহস ছিল না। কেমন যেন ডর লাগছিল। আমরা যেন বিস্ময়ে ভয়ে বোবা হয়ে যাচ্ছিলাম।

হজরত বললেন—ফিরিস্তা যখন দুনিয়াতে আসেন তখন তিনি নিজেই বেছে নিয়েছিলেন বাদশাহের ঘর। আর খুদা মেহেরবানি করে তাঁর বাদশাহ পিতার বুকের মধ্যে দিয়েছিলেন অগাধ স্নেহ। সঙ্গে সঙ্গে একটি দীর্ঘনিশ্বাসও ফেলেছিলেন। কেন জানো? দৌলত আর বাদশাহী মুলুকের মালিকানি এ হিংসা-বিদ্বেষ কমায় না। দুনিয়ার হিংসা-বিদ্বেষের সূতিকাগারই হল দৌলত আর মুলুকের

মালিকানি। একটুকরা জমীন একটা চাঁদির রূপেয়া যার আছে সেও দুনিয়াতে অনেক আদমীর হিংসার পাত্র। তার ঐ টাকাটি চুরি করবার জন্যে বা রাহাজানি করে কেড়ে নেবার জন্যে চোরেরা ডাকুরা রাহাজানেরা তার আশেপাশে ঘোরে। তার ওই একটুকরা জমীনের পাশে যার মুলুকের মত বিশাল আয়তনের জমীন আছে সেও তার ওই একটুকরা জমীন ছিনিয়ে নিয়ে নিজের জমীনকে আরও একটু বাড়াতে চায়।

ফিরিস্তা, এ তুমি কি করলে? বেছে বেছে তামাম হিন্দুস্তানের মালিক, তক্তেতাউসাসীন শাহানশাহের ঘরে জন্ম নিয়ে হিন্দোস্তানের সমস্ত লোকের বিদ্বেষভাজন হলে!

ফিরিস্তা বলেছিলেন—হে মেহেরবান দিনদুনিয়ার মালিক, হে বিশ্বপিতা, ওই শাহানশাহী হিন্দুস্তানের বাদশাহী আর দৌলতই হবে আমার সব থেকে বড় সহায়। মেহেরবান খোদা, তোমার প্রতিনিধি হয়ে শাহ তক্তে বসে জারি করব তোমার ফরমান। এক আঙিনায় চারো তরফ—সেই চার তরফের একদিকে গড়ে দেব মসজিদ অন্যদিকে গড়ব মন্দির—আর দিকে গড়ব গির্জা আর এক তরফে বৌদ্ধ বিহার। তারই অঙ্গনের মধ্যে গড়ে তুলব নই দুনিয়া।

নই দুনিয়ায় নয়া মানুষেরা সেখানে জমায়েত হয়ে নূতন মন্ত্রে করবে উপাসনা—পূজা। নিবেদন করবে প্রণাম। কিন্তু—। আবার স্তব্ধ হলেন সন্ন্যাসী।

* * * *

হজরত শাহজাদা দারা সিকো! জনাবআলি! এমনভাবে এই সন্ন্যাসী কথা বলে যাচ্ছিলেন যে মনে হচ্ছিল তাঁর অন্তরের মধ্যে যেন চাপা কান্না গুমরে গুমরে উঠছে এবং সেই কান্না তাঁর কথা বলার ভঙ্গির মধ্যে এবং কণ্ঠস্বরের সুরের মধ্য দিয়ে বাইরে এসে উপছে পড়ছে শ্রোতাদের কাছে। তাঁর চোখের জলবিন্দু তাঁর চোখের পাতার উপর লেগেছিল শীতের সকালে ময়দানের ঘাসের পাতার উপর

শিশিরবিন্দুর মত। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি যেন ক্রন্দন করে উঠলেন। বললেন—তা হল না। তা হল না। ফিরিস্তার পিছন পিছন এসেছে তাঁর বিরুদ্ধ শক্তি। এ নিয়ম। ঈশ্বরের রাজ্যে খুদাতয়লার দুনিয়ায় এই হল নিয়ম। আলোর সঙ্গে সঙ্গে ছায়া—ভালকে আঘাত কররার জন্য মন্দ—শুভকে বাধা দিতে অশুভ চিরকাল আসে। সে এসেছে।

ফিরিস্তা শাহজাদা হয়ে জন্মেছেন। মসনদ পিছন দিক থেকে মোহ বিস্তার করে তাঁকে টানছে। বিপদ সেইখানে।

ধর্মের পথ ত্যাগের পথ তপস্যার পথ।

অনেককাল আগে এদেশে ঈশ্বরের অংশের অবির্ভাব হয়েছিল রাজার ঘরে। কিন্তু তিনি প্রথম যৌবনে সিংহাসনের সকল আকর্ষণ ছিন্ন করে, পরমাসুন্দরী স্ত্রী এবং সদ্যোজাত শিশুপুত্রের মমতার মোহ নিঃশেষে মুছে ফেলে সর্বত্যাগী হয়ে কঠোর তপস্যা করে পেয়েছিলেন মানুষের অন্তরলোক থেকে, পৃথিবীর বুক থেকে হিংসা-বিদ্বেষ মুছে দেবার শক্তি। নিজের অন্তরলোকে স্ফুরিত হয়েছিল অফুরন্ত অক্ষয় প্রেমের উৎস। সে উৎস-উৎসারিত প্রেমের প্লাবন পৃথিবীতে মানুষের সমাজে বইয়ে দিয়েছিল আনন্দ এবং শান্তির ধারা। কিন্তু হায় হায় হায়!

আমি আবার তাঁকে প্রশ্ন করলাম—আমাদের এ কথা কেন বলছেন হজরত?

—তোমাদের ঠিক বলি নি বেটা। আমি আগ্রা শহরে শাহানশাহের প্রাসাদে সেই দেবদূতকে দেখে এসেছি—তার সঙ্গে যে সেই দেবদূতের বিরোধী শক্তি হয়ে জন্মেছে, তাকেও দেখে এসেছি। দেখে এলাম দেবদূতের এক চোখ আবদ্ধ সিংহাসনের দিকে—এক চোখ ধ্যানমগ্ন শান্তি এবং পুণ্যের পথ সন্ধানে। কিন্তু সে ধ্যানও তাঁর বার বার ভেঙে যাচ্ছে। কিন্তু দেবদূতের বিরোধী যে তার দৃষ্টির

একাগ্রতাকে ক্ষুণ্ণ হতে দেখি নি—তার উপর কোন ছায়া পড়তে দেখি নি; ধীর অকম্পিত পদক্ষেপে সে সামনে এগিয়ে চলেছে মসনদের দিকে। মসনদের উপব একচক্ষুনিবদ্ধ দেবদূতের পদক্ষেপ স্বাভাবিক ভাবে দ্বিধাগ্রস্ত। তাঁর যে চক্ষু ধ্যানমগ্ন তার সম্মুখের অন্ধকারও ঠিক এই কারণে অপসারিত হচ্ছে না। কারণ সেখানে ছায়ার অন্ধকার বিস্তার করে রেখেছে এই মসনদ আর হিন্দুস্তানের শাহানশাহী।

গুরুর কৃপায় আমার চোখের সম্মুখে ভবিষ্যৎ প্রকাশিত হয়। আমি দেখতে পাই সে ভবিষ্যৎ। এই যে ভবিষ্যৎ এ ভবিষ্যতেব পশ্চাতে খুদার একটি অভিপ্রায় আছে; কিন্তু সে অভিপ্রায়ের পিছনে তাঁর কোন মদত নেই। তিনি চান যা শুভ তাই হোক তাই ঘটুক, কিন্তু অশুভ মন্দ যা মানুষের কর্মফলে দুনিয়ায় ধোঁয়ার মত, খারাপ দূষিত বাতাসের মত, বাঁধভাঙা জলের মত গ্রাস করতে আসে ভাসিয়ে দিতে আসে তাকে একটি আঙুল তুলেও বলেন না—থাম। সে আসে—ভাসিয়ে নিয়ে যায় শুভকে—নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে যায়।

আমি দেখতে পেলাম তেমনি এক আগুনলাগা কালের আগুনের ধোঁয়ায় অন্ধকার এবং উত্তপ্ত যুগ আসছে। দেখতে পেলাম একটা কালো দূষিত জলের তুফান কল্লোল তুলে ছুটে আসছে, সব ভাসিয়ে দেবে। দুয়ের আগেই দেখলাম।—

সন্ন্যাসী থামলেন, আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—বেটা, তুমি সায়ের, তুমি কবি—তুমি রামায়ণের কাব্যকথা জান। তুমি জান ভগীরথ তপস্যা করে গঙ্গাকে নামিয়ে এনেছিলেন এই হিন্দুস্তানে। নিয়ে যাচ্ছিলেন তাঁর পিতৃপুরুষদের উদ্ধার করবার জন্য। কিন্তু মাঝপথে এক অশুভ শক্তি মানুষদের বেশ ধরে এসে তাঁকে নিয়ে গিয়েছিল ভুল পথে শাঁখ বাজিয়ে। ঠিক তেমনি ভাবেই বেটা, এই কালীর তুফানকে শাঁখ বাজিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ওই দেবদূতের বিরোধী শক্তি।

দেবদূত দিন দিন শক্তিহীন দুর্বল হয়ে পড়ছেন। পড়ছেন, তাঁর জীবনের তপস্যা দু'ভাগ হয়ে গেছে। ভবিষ্যতের ছবির মধ্যে আমি দেখতে পাচ্ছি দেবদূত চলছেন দুর্বল শরীরে ভগ্ন মনে, উদ্‌ভ্রান্তের মত। চলছেন আগ্রা থেকে দিল্লীর পথে ; দিল্লী থেকে লাহোরের পথে ; দেখছি হিন্দোস্তানের চারিদিকে পড়ে আছে মৃতদেহ আর মৃতদেহ আর মৃতদেহ—। তারপর—।

দেবদূত মেহেরবান শাহজাদা, তিনি পুণ্যবান তিনি হজরত। তারপর বলতে আমার জিভ জড়িয়ে যাচ্ছে।

আর কিছু লিখতে আমারও সাহস নাই হজরত—লিখতে আমার হাতের শক্তি নাই—আমি তা পারব না। সে এক ভয়ানক ভবিষ্যৎ। এক রক্তাক্ত ভীষণ ভবিষ্যৎ।

সন্ন্যাসী তাঁর দুই হাতে আমাদের দুজনের হাত চেপে ধরে বলেছিলেন—আমি যা বলছি তা ঝুট নয়, মনগড়া কথা নয়। তোমরা দুজনে দেখো।

আমরা তা চোখে দেখেছি। দেখে চীৎকার করে উঠেছি। শিরিন জ্ঞান হারিয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। আমি ভয়ে বোবা হয়ে গিয়েছিলাম।

সন্ন্যাসী বলেছিলেন—কবি সুভগ, দেবদূতকে বলতে পার—মসনদ যদি চান তবে মসনদ পাবার জন্য দু'চোখ খুলে সেই দিকে তাকিয়ে এগিয়ে চলুন। অমৃতের সন্ধান পরমতত্ত্বের তপস্যা এসব বর্জন করুন। আর দুনিয়াতে যদি শান্তি আনতে চান—প্রেমকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান—ধর্মের মধ্যে সত্যকে খুঁজতে চান তবে সিংহাসনের দিকে পিছন ফিরুন। গৃহত্যাগ করুন। ফকিরী নিয়ে বেরিয়ে এসে যে কোন ময়দানে দাঁড়িয়ে মানুষকে ডাকুন—শোন তোমরা শোন। তোমরা যা চাও তা আমি এনেছি। তার জন্যই

আমি হিন্দুস্তানের বাদশাহীর দাবি ছেড়ে দিয়েছি। শোন—এগিয়ে এস—নাও হাত পাতো। হিন্দু নাই মুসলমান নাই কেরেস্তান নাই—মানুষ তুমি হাত পাতো।

* * *

পত্রখানা পড়তে পড়তে শাহজাদা দারা সিকোর সমস্ত দেহ যেন একটা বিতৃষ্ণায় বিরক্তিতে অসহনীয় জ্বালায় জ্বলতে লাগল। তিনি চিঠিখানাকে দুই হাতে মুচড়ে দলে ঢেলার মত পাকিয়ে দূরে ফেলে দিলেন।

আঠাশ

পরের দিন।

রোগশয্যায় শুয়ে শাহজাদী জাহানআরা নিজের অবস্থার কথা বিস্মৃত হয়ে উত্তেজনায় এবং বিস্ময়ে উঠে বসতে গিয়ে যন্ত্রণায় অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলেন। কাত হয়ে বা উপুড় হয়ে ছাড়া শোবার তাঁর উপায় ছিল না। প্রায় গোটা পিছন দিকটাই পুড়ে গেছে।

প্রথম দিকে সকলেই আশঙ্কা করেছিলেন, চিকিৎসকেরা কণ্ঠস্বরে আশার জোর আনতে পারেন নি—বিষণ্ণ কণ্ঠে কথা বলেছিলেন।

স্বয়ং বাদশাহ বালকের মত অশ্রুবিসর্জন করেছেন। প্রথম কয়েকটা দিন তো কন্যার শয্যাপার্শ্ব ছেড়ে নড়েন নি। মসজিদে মসজিদে ইমামেরা প্রার্থনা করেছেন—বাদশাহ নিত্য প্রভাতে কন্যার প্রাণভিক্ষা কামনা করে খুদার কাছে আরজ করেছেন—মুঠো মুঠো টাকা দান করেছেন ফকির দরবেশ সন্ন্যাসী এবং অন্ধ খঞ্জ আতুর ভিক্ষুকদের।

সে অবস্থা কেটে গেছে কিছুদিন। বাদশাহের খাস হাকিম আলিমুদ্দিন ওয়াজির খাঁন এবং হাকিম মোমিনা শিরাজীর চিকিৎসায় শাহজাদী অনেকখানি সুস্থ হয়েছেন। ক্ষত এখনও শুকোয় নি—ভিতরে ভিতরে ঘা এখনও রয়েছে, তবুও জীবন এখন নিরাপদ। এরই মধ্যে শাহজাদী জাহানআরা সকলের খবরাখবর করেন। প্রত্যহ প্রভাতে তাঁর কাছে খবর আসে আগ্রা কিল্লার রঙমহলের। খবর আসে শাহজাদা শাহবুলন্দ ইকবাল দারা সিকোর মঞ্জিল নিগমবোধের এবং শাহজাদা ঔরংজীবের নুরমঞ্জিলের খবর আসে। খবরাখবর শুনে তিনি অপেক্ষা করে থাকেন বাদশাহের। পিতা বাদশাহ সাজাহান দেওয়ানী আমে যাবার আগে কন্যাকে দেখে তার খবর নিয়ে যান। শাহজাদী জাহানআরা নিজের খবর ছোট্ট ভালো আছি এই দুটি কথায় শেষ করে সকৃতজ্ঞ সশ্রদ্ধ একটু হাসির সঙ্গে

শাহানশাহকে তাঁর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং তারপরই নিবেদন করেন—শাহানশাহের কাছে কিছু দরখাস্ত্ পেশ করবার আছে আমার।

শাহানশাহ প্রসন্ন হেসে বলেন—বলো মা, কি তোমার দরখাস্ত্?

জাহানআরা বলে যান একের পর এক।

বাদশাহ বলেন—বলো বেটী তুমি বলো একে কি মঞ্জুর করতে হবে।

জাহানআরা এ উত্তর পাবেন তা তিনি জানেন। উত্তর তাঁকেই ঠিক করে রাখতে হয়—তিনি বলেন—এই হলেই সেটা দিল্লীশ্বরের ঠিক উপযুক্ত হবে বলে মনে করি।

—মনে যদি করো তবে তাই মঞ্জুর হলো।

বাদশাহ একে একে সব দরখাস্ত্ শুনে জাহানআরার ইচ্ছানুযায়ী সব মঞ্জুর করে তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বেরিয়ে যান।

শাহজাদী রঙমহলের দারোগাকে ডেকে বাদশাহের হুকুম পাঠিয়ে দেন রঙমহলের নাজিরের কাছে।

সেদিন সকালে মঞ্জিল নিগমবোধের এক বাঁদী একখানি চিঠি এনে তার হাতে দিয়ে বললে—বড়ী বেগমসাহেবা পাঠিয়েছেন।

বড়ী বেগমসাহেবা অর্থে শাহজাদা দারা সিকোর প্রথমা পত্নী বেগম করিম-উন্নেসা অর্থাৎ নাদিরা বেগম। শাহজাদী জাহানআরার সঙ্গে বড় ভাই দারা সিকোর সম্পর্ক নিবিড় এবং গভীর। দারা সিকো জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর প্রতি শুধু গভীর শ্রদ্ধাই পোষণ করেন না—শাহজাদী জাহানআরা শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই তাঁর সমর্থক নন—শাহজাদা দারা সিকোর ধর্মমত এবং মর্মমতের মুগ্ধ পৃষ্ঠপোষকও বটেন এবং ভক্তও বটেন। দুজনেই মোল্লাশাহ বাদাকশীর শিষ্য। শুধু তাই নয়, দুজনেই দুজনের অন্তরের উদ্বেলতা যেন অনুভব করতে পারেন।

বাঁদীকে দেখেই যেন অকারণে চমকে উঠলেন শাহজাদী। তারপর

বললেন—কি? কি খবর? সকালবেলাতেই নাদিরা চিঠি লিখেছে কেন? শাহজাদার খবর ভাল তো?

—চিঠিতেই সব খবর আছে হুজুরাইন।

—শাহজাদাকে তুমি সকালে দেখ নি?

—না শাহজাদী।

—শাহজাদা কাল রাত্রে নাদিরার মহলে ছিলেন না?

—রাত্রে এসে শুয়েছিলেন। কিন্তু সকালে তাঁকে মহলে দেখি নি।

চিন্তিত হয়ে জাহানআরা চিঠিখানা খুলে ফেললেন। চিঠিখানা পড়ে তাঁর বিস্ময়ের সীমা রইল না। শুধু বিস্ময়ই নয় উদ্বেগে এবং উৎকণ্ঠায় যেন অধীর হয়ে উঠলেন। নাদিরার চিঠিখানি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত—তিনি লিখেছেন—"কাল রাত্রি থেকে শাহজাদা অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে লৌহখণ্ডের মত প্রবেশ করে বর্ণে অগ্নির মত এবং উত্তাপে ও ধর্মেও অগ্নির মত হয়ে উঠেছেন। আমার নিজের মধ্যে সেই শীতল জল পাই নি যা ঢেলে সেই অগ্নিতে রূপান্তরিত শাহজাদাকে আবার দুনিয়াবিজয়ী ইস্পাতের তরবারিতে রূপান্তরিত করতে পারি। বহু ভাগ্যবশে রানাদিল তার নৃত্যগীতে শাহজাদার চিত্তকে শান্ত করেছে। তিনি গতকাল সারাটা দিন কাটিয়েছেন বাদশাহ এবং শাহজাদা ভাইদের অভ্যর্থনা প্রভৃতির সমারোহের মধ্যে। তারপরই আর কেউ এসেছিল। যে আসার ফলে শাহজাদা অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন। এবং সমস্তদিনই তিনি নিজের মনে মনে কোন একটা গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। রাত্রে যখন দু'পহরের ঘড়ি বাজল তখন অকস্মাৎ আমি ঘুম থেকে জেগে উঠে দেখলাম শাহজাদা বিছানায় নেই। চমকে উঠে বসে আমাদের শয়নকক্ষের প্রহরিণীকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম শাহজাদা আমাদের উদ্যানের মধ্যে নেমে গেছেন। একজন প্রহরিণী তাঁকে অনুসরণ করতে চেষ্টা করেছিল কিন্তু তিনি পিছন না ফিরেই বলেছিলেন—যে আমার পিছনে আসছ বা আসতে চাচ্ছ সে ফিরে যাও। আমার অন্তরের মধ্য থেকে

ফারিস্তা গেব্রিয়েল আমার 'কোয়াতি বাতিনে' বেরিয়ে এসে আমাকে সামনে ডেকে নিয়ে চলেছেন, আমার সঙ্গে তাঁর অনেক কথা আছে। তোমরা এসো না। এ শুনবার তোমরা হকদার নও। ফিরে যাও। তুমি ফিরে যাও। তাতারিনী ভয় পেয়ে আর তাঁর পশ্চাদনুসরণ করে নি। সেইখানেই সে দাঁড়িয়েছিল। সে আমাকে বলেছে, শাহজাদা এরপর যেন কার সঙ্গে কথাবার্তা কইতে আরম্ভ করলেন।

আমি যখন গেলাম তখন শাহজাদার চোখের দৃষ্টি দেখলাম বিহ্বল। তাঁর সর্বাঙ্গে দেখলাম রোমাঞ্চ। তিনি গদগদকণ্ঠে কোন অদৃশ্য ব্যক্তি বা সত্তার সঙ্গে কথা বলছিলেন—কি বলছেন? বলছেন হিন্দুস্তানের মসনদ ছেড়ে দিয়ে ফকীরি নিয়ে এগিয়ে যেতে। হিন্দুস্তানের হিন্দু মুসলমানকে আমার ঝাণ্ডার তলায় ডাক দিতে।

আপনিই এসব কথা বলেছেন কবি সুভগকে। আপনিই দেখতে পাচ্ছেন মসনদের দিকে এক চোখ এবং খুদার উদ্দেশে ব্রহ্মের উদ্দেশে আর এক চোখের দৃষ্টি রেখে পথ চলতে গেলে পাহাড়ের মাথা থেকে পা হড়কে পড়তে হবে—নীচে!

—না। আপনার বাত্ ঠিক নয়। আপনি ঠিক দেখতে পাচ্ছেন না ভবিষ্যৎ। ওই তো—ওই তো আপনার ঠিক পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে, আমার উপর খুদার দয়া এবং পয়গম্বরের প্রেরণ করা ওই তো সেই অপরূপা সুন্দরী হুরী—আপনাদের হিন্দুদের শাস্ত্রে যাকে বলে অন্তরের আধ্যাত্মিক শক্তি সে এক অপরূপা পরীর মূর্তি ধরে আপনাদের দেবদূতী! তাকে কি আপনি দেখতে পাচ্ছেন না? তার কথা কি আপনি শুনতে পাচ্ছেন না? তিনি বলছেন—শাহজাদা দারা সিকো, তুমি ওই ভ্রান্ত সন্ন্যাসীর কথা শুনো না। তুমি ফারিস্তা, তুমি দিব্যাত্মা, তুমি ঈশ্বরের অংশ। ঈশ্বর সমুদ্র এবং তুমি তোমার ও দারা সিকো নামধারী দেহভৃঙ্গারে সেই সমুদ্রেরই জল। এই পৃথিবীর সমুদ্র স্বাদহীন নদ নদী এবং হ্রদ পুষ্করিণী সরোবরে সেই সমুদ্রের স্বাদকে আস্বাদন করাবার জন্য

এসেছে। তোমার এক এক বিন্দু নদনদী নির্ঝরিণীকে সমুদ্র-স্বাদে পূর্ণ করবে। তুমি ভুলো না দারা সিকো বহু কাল বহু যুগ পর তুমি জন্মেছ 'রাজর্ষি' হয়ে। তুমি ভবিষ্যতে রাজর্ষি হবে। বাদশাহী মসনদে বসেও হবে তুমি সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। তুমি হবে ফকীর। তুমি হবে নয়া পয়গম্বর।

শাহজাদী, আমি ছুটে গিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরবার জন্য চেষ্টা করলাম। কিন্তু পারলাম না। আমার ভয় হল। শাহজাদাকে ডাকলাম। শাহজাদা ধ্যানমগ্নের মত নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলেই যাচ্ছিলেন। আমার কোন কথা যেন তাঁর কানে ঢুকছিল না।

অবশেষে বহু কষ্টে বহু মিনতি করে তাঁকে ফিরিয়ে আনলাম এবং ডাকলাম রানাদিলকে। তাকে বললাম—রানাদিল, শাহজাদা একদিন তোমার রূপে তোমার নাচে গানে মুগ্ধ হয়ে তোমাকে চেয়েছিলেন। তুমি ছিলে পেশাদার নর্তকী। সেই তোমাকে শাহজাদা ধর্মমতে সাদী করে এনে বেগমের মর্যাদা দিয়েছেন। তোমার রূপে আজও শাহজাদার চোখে সিরাজীর নেশার মত লাল আভা ফুটে ওঠে। তোমার গান শুনে মশগুল হয়ে যান। তোমার স্পর্শে তাঁর মোহ জাগে আমি জানি। তুমি তাঁকে আজ ভুলিয়ে রাখ। ভুলিয়ে দাও। আমার ভয় হচ্ছিল শাহজাদী। আমি যেন দেখছিলাম মহাশক্তিশালী কেউ তাঁকে বৈরাগ্যের পথে আহ্বান করছেন। বলছেন—নেমে এস শাহজাদা—আগ্রার মর্মর প্রাসাদ থেকে পথের উপর নেমে এস। কিন্তু শাহজাদী রানাদিলের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। নাচবার জন্যে তার পা উঠল না—কণ্ঠস্বরে তার গান ফুটল না—সে শুধু আমার দিকে তাকিয়ে বললে—আমি পারছি না বেগমসাহেবা আমি পারছি না।

অকস্মাৎ খুদার যেন দয়া হল। পয়গম্বর রসুলের মেহেরবানি হল। কেরেস্তানী মুলুকের শরাব আনতে বলেছিলাম বাঁদীকে।

সেই শরাব নিয়ে এল শাহজাদার কাশ্মীর থেকে কেনা নতুন বাঁদী আরমানী মেয়ে যার নাম হয়েছে উদিপুরী বেগম।

কিশোরী মেয়েটি রূপসী। জ্যোৎস্নার মত তার দেহের বর্ণ—আকাশের নীল রঙ তার চোখের তারায়। শুধু তাই নয়। মেয়েটি এই অল্পবয়সেই মোহবিস্তার করতে পেরেছে। অন্ততঃ তাই দেখলাম।

মেয়েটি এগিয়ে গিয়ে শাহজাদাকে অভিবাদন করে নতজানু হয়ে বসল। শাহজাদার চোখ হঠাৎ তার উপর পড়ল। তিনি ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে দুই হাতে তার মুখখানি ধরে বললেন—তুমিই কি—তুমিই কি এতক্ষণ কথা বলছিলে? তুমি দেহ ধরে এসেছ? সে তুলে ধরলে সিরাজীর গ্লাস। শাহজাদা পান করলেন। বললেন—আবার দাও।

আমরা এবার ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। শাহজাদা রইলেন ঘরের মধ্যে উদিপুরী বাঈকে নিয়ে। আজ তাঁর ভোরবেলা ঘুম ভাঙে নি। এবং আজ সকালে তাঁকে দরবারে যেতে দিতে চাই নে।

আজ দরবারে অনুপস্থিতির জন্য শাহানশাহকে যা বলবার তা বিবেচনা করে আপনিই বলবেন।"

শাহজাদী জাহানআরার মনে পড়ে গেল নিজের কথা। মুল্লাশাহ তাঁরও গুরুস্থানীয়—গুরু। মনে পড়ছে একদিন পশ্চিমমুখে মক্কা-শরীফের দিকে ফিরে বসে থাকতে থাকতে তিনি যেন পয়গম্বর রসুলকে দেখেছিলেন। সে এক আশ্চর্য অবস্থা তাঁর। শাহজাদীর বেশ মনে পড়ছে সে অবস্থা অতি বিচিত্র অবস্থা—সে ঘুমন্ত অবস্থাও নয় সে জাগ্রত অবস্থাও নয়, সেই বিচিত্র অবস্থার মধ্যে তিনি দেখলেন পয়গম্বর রসুল তাঁর চার সহচরকে নিয়ে বসে আছেন—আর একজন আছেন তাঁদের সঙ্গে। তিনি তাঁর গুরু শাহজাদার গুরু মুল্লাশাহ। মুল্লাশাহের আহ্বানে তাঁর সেই না-ঘুমন্ত না-জাগ্রত অবস্থায় দেহের মধ্য থেকে তাঁর আত্মা বেরিয়ে সন্তর্পণে ভক্তিগদগদ-চিত্তে এসে প্রণত হয়েছিল পয়গম্বর রসুলের পায়ের তলায়।

স্বপ্নাতুর দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলেন শাহজাদী।

ঊনত্রিশ

শাহজাদী জাহানআরার ভাবান্তর অর্থাৎ তাঁকে ওইভাবে আকাশের দিকে ধ্যানমগ্নার মত তাকিয়ে থাকতে দেখে তাঁর খাদিমান অর্থাৎ পরিচারিকারা শঙ্কিত হয়ে উঠল।

এ কি হল শাহজাদীর!

শাহজাদীর সারাটা পিঠজোড়া পোড়া ঘা এখন কিছুটা কমতিমুখ হলেও সেটার দাম খুব বেশী নয়; আজ কমেছে একগুণ কালই হয়তো চারগুণ পাঁচগুণ কি তারও বেশী বেড়ে উঠবে; হয়তো কোন কারণে বিষিয়ে উঠবে, যাতনা বাড়বে, লাল হয়ে উঠবে, ফুলতে থাকবে, জ্বর দেখা দেবে; কে বলতে পারে কখন হবে? বা কিভাবে হবে? শাহী হকিম আলিমুদ্দীন ওয়াজির খাঁ সাহেব এবং ইরানী হকিম মোমিনা সিরাজী তুজনেই এ বিষয়ে বার বার সাবধান করে দিয়ে গিয়েছেন।

—বহুৎ হুঁশিয়ারি চাই। বহুৎ। নইলে কোন রকমে যদি বিষিয়ে ওঠে কি পাকতে শুরু করে তাহলে রোগীকে বাঁচানো কঠিন হবে। চব্বিশ ঘণ্টা নজর রাখবে। নজর রাখবে পোড়া ঘায়ের বাইরে শাহজাদীর সফেদ দেহবর্ণে যতটুকু লাল রঙের আমেজ লেগে আছে সেটা বেড়েছে কি কমেছে।

জেরা-সে বেশী হলেই হুঁশিয়ার হতে হবে। শাহজাদীকে জিজ্ঞাসা করবে যন্ত্রণা বেড়েছে কি না, গায়ের তাপ দেখবে—দেখবে তাপ বেড়েছে কি না। বুখার বলে মনে হচ্ছে কি না। চোখের দিকে তাকিয়ে দেখবে—শাহজাদীর ওই সাদা পদ্মের ভিতরের পাপড়ির মত সফেদ নরম চোখের ক্ষেতে লাল রঙের ঘোর লেগেছে কি না। সঙ্গে সঙ্গে সাবধান হবে। এই বড়ি দেওয়া রইল—এই বড়ি গরম তুধের সঙ্গে খাইয়ে দেবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ইত্তালা পাঠাবে।

কেটে গেছে বেশ কিছু দিন; এখন ঘাগুলিতে অবশ্য মড়মড়ি বেঁধে এসেছে; যেখানে ঘা হয় নি সেখানে চামড়া কালো হয়ে পিঠের সঙ্গে লেগে গেছে; তবুও বিষিয়ে ওঠার আশঙ্কা এখনও যায় নি। এ সময় এইভাবে বেহোঁশের মত কেন হয়ে গেলেন শাহজাদী? কিন্তু কে প্রশ্ন করবে? এবং উত্তরই বা কে দেবে?

খাদিমানেরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে চোখের ভাষায় পরস্পরকে প্রশ্নই করছিল, কেউ কাউকেই কোন উত্তর দিতে পারছিল না।

মঞ্জিল নিগমবোধ থেকে যে বাঁদী চিঠি এনে শাহজাদীকে দিয়েছিল সেও হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করছিল—এ কি হল?

হঠাৎ শাহজাদী চোখ নামিয়ে চঞ্চল ও ত্রস্তভাবে নিজের রুগ্ণ অবস্থার গুরুত্বের কথা ভুলে গিয়েই উঠে বসতে চাইলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলেন ক্ষতের যন্ত্রণায়। ক্ষতে টান পড়েছে, কয়েকস্থানে অল্প অল্প ফেটে গেছে।

খাদিমান দুজন ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে এসে তাঁকে হাতে চেপে ধরলে। এবং শঙ্কিত কণ্ঠে বললে—শাহজাদী! হুজুরাইন!

শাহজাদী ধীরে ধীরে পিঠ সোজা করে নিয়ে বসে বললেন—ছোড় দো, মুঝে ছোড় দো।

বয়স্কা খাদিমানটি কাতর অনুনয়ে বললে—শাহজাদী, আপনার অসুখ বেড়ে যাবে। হয়তো ক্ষতস্থান ফেটে গিয়ে রক্তপাত হবে—

—তা হোক। ছাড় তোমরা আমাকে ছাড়! ছাড়!

সে কণ্ঠস্বর লঙ্ঘন করবার সাহস তাদের ছিল না। তারা তাঁকে ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়াল।

শাহজাদী বললেন—নাদিরা বেগমসাহেবার বাঁদী তুই এখানে থাক, তোরা দুজনে বাইরে যা। যা।

তারা বাইরে যেতেই শাহজাদী বললেন—কাল রাত্রে তুই

কোথায় ছিলি? কাল নিগমবোধ মঞ্জিলে কি ঘটেছে তুই কিছু জানিস? কিছু শুনেছিস?

—না হুজুরাইন। বেগমসাহেবা বাঁদীদের কাউকে তাঁর কাছে থাকতে দেন নি। শাহজাদার যেন তবিয়তের কিছু গোলমাল হয়েছিল—মেজাজ যেন কিছু এদিক ওদিক হয়েছিল—

—হুঁ। বুঝেছি।

জাহানআরা বুঝলেন, বুদ্ধিমতী নাদিরা বাঁদীদের সরিয়ে দিয়েছিল। এ উপদেশ তাঁরই উপদেশ। ভাইসাহেব শাহবুলন্দ একবাল দারা সিকোর জীবনে এই সব অলৌকিক এবং অপার্থিব শক্তি ও সত্তার সঙ্গে যোগাযোগের কথা গোপন করে রাখতেই তিনি বলে দিয়েছেন। তিনি জানেন, দারা সিকোর উপর এই শক্তির বা সত্তার যখন ভর হয় তখন তাঁর এই লৌকিক জীবনের গণ্ডী যেন হারিয়ে যায়, এ জীবনের পরিচয় যেন তাঁর বৃহৎ জীবনমূল্যের কাছে নগণ্য হয়ে যায়; তিনি যা বলেন যা করেন তা বিস্ময়কর—হয়তো পরমাশ্চর্য। এবং তাঁর এই সময়ের যে পরিচয় তা এত বৃহৎ এবং এত মহান ও এমন উদার যে তাকে পৃথিবীর কোন ধর্মমতের গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ বা অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। সে সময় তাঁর ব্যক্তিত্বের মহত্তম প্রকাশের সম্মুখে বাদশাহ এবং ভিক্ষুকের সঙ্গে কোন প্রভেদ থাকে না। তখন তিনি যে কোন ব্যক্তির সম্মুখে, সে ব্যক্তি স্বয়ং আলাহজরত বাদশাহ সাজাহানও হতে পারেন—তাঁর সম্মুখেও বলে বসতে পারেন—"আমি ইসলামের নূতন ব্যাখ্যা দেব। আমি নূতন ধর্ম প্রবর্তন করব। প্রপিতামহ বাদশাহ শাহ জেলালউদ্দিন আকবর ইলাহী ধর্ম প্রবর্তন করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছিলেন। তাঁর অসম্পূর্ণ কাজ আমি সম্পূর্ণ করতে এসেছি। এই পথেই শান্তি—এই পথেই জীবনের মুক্তি।"

দিব্যলোকের সঙ্গে দিব্যজীবনের সঙ্গে যুক্ত সে দারা সিকোর পিতা হয়েও হয়তো পরমস্নেহময় আলাহজরত বাদশাহ সাজাহান

সহ্য করতে পারবেন না। মুঘল বাদশাহীর আমীরেরা—নবাব সুলতান রাজা মহারাজা হিন্দু মুসলমান কেউ তাঁর এই কথা গ্রহণ করতে পারবে না। আগুনের মত উত্তপ্ত মনে হবে। অসহ্য মনে হবে তাদের। একবার বিবেচনা করেও দেখবে না। জ্বলন্ত অঙ্গারখণ্ডের মতই দূরে নিক্ষেপ করবে। এবং এই মহৎ পবিত্র জীবনটিকে দলিত করবার চেষ্টা করবে। সামন্ত হিন্দু রাজারা এবং মুসলমান নবাব সুলতানেরা দু'দিক থেকে তাঁকে আক্রমণ করবে।

সব থেকে বেশী আশঙ্কা তাঁদের এই তৈমুরশাহী বাদশাহ পরিবারের শ্বেতসর্পটিকে।

ভীষণ উগ্র তার বিষ। ভীষণ উগ্র তার কুটিল হিংসা। ভীষণ উগ্র তার ধর্মের গোঁড়ামি।

প্রপিতামহ আকবর শাহের মত পুণ্যশ্লোক উদার মানুষকে সে অত্যন্ত তীব্র অসহিষ্ণুতার সঙ্গে বলে—'দজ্জাল আকবর শাহ। ইলাহী ধর্মের নামে অধর্মের প্রবর্তন করে তিনি ইসলামের শত্রুতাই করে গিয়েছেন। আল্লা তাঁকে ক্ষমা করেন নি। পয়গম্বর রসুল তাঁকে রেয়াৎ করেন নি।'

এই শ্বেতসর্প ঔরংজীব এখন আগ্রায়। পিতার কোপদৃষ্টিতে পড়ে এখানে হতাদর ও দুর্ভাগ্যের মধ্যে বাস করছে; সে এ সংবাদ পেলে সারা হিন্দুস্তানের মোল্লা মহলকে উত্তেজিত করে সর্বনাশ করে দেবে। এই যে দারা সিকো নামক স্বর্গীয় একটি পুষ্প যা বোধহয় আজকের দুনিয়ায় মাত্র একটিই ফুটেছে খোদাতায়লার ইচ্ছায়, অনুজ্ঞায়, তাকে অসাবধানতার সুযোগে শয়তানের কুটিল শক্তি সক্রিয় হয়ে উঠে ছিঁড়ে ফেলে পায়ে পায়ে ছেঁটে মেরে দলিত করে দেবে।

হিন্দুস্তানের অনেক গল্প তিনি শুনেছেন।

শ্রীবৎস নামে এক রাজা লক্ষ্মীদেবীর মত শান্ত দেবীকে শ্রেষ্ঠ বলায় মন্দ কুটিল গ্রহ শনিগ্রহের কোপে পড়ে চরম নিগ্রহে নিগৃহীত

হয়েছিলেন। নল নামে এক রাজা কলি নামক পাপশক্তির কোপে পড়ে নিষ্ঠুর নিগ্রহ ভোগ করেছিলেন।

হিন্দুদের পুরাতন গল্প তিনি পড়েছেন। আকবর শাহ অনেক কিছুর আরবী পার্সী অনুবাদ করিয়েছেন। উর্দুতেও অনুবাদ করিয়েছেন। আজ দারা সিকো সেই কর্ম অব্যাহত রেখেছেন।

নাদিরা বেগমকে মনে মনে ধন্যবাদ দিলেন শাহজাদী। সে উত্তম কর্ম করেছে। সে বিচক্ষণ কাজ করেছে। আরও সাবধান হতে হবে। যেন এ খবর ঘুণাক্ষরে প্রকাশ না পায়।

কিন্তু শাহজাদা কি বললেন—কি দেখলেন? কোন্ ভবিষ্যৎকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন তা জানবার জন্য তাঁর সারা অন্তর আগ্রহে অধীর এবং ব্যগ্র হয়ে উঠেছে। জানতেই হবে। তাঁকে জানতেই হবে।

নাদিরা বেগমের বাঁদী তাঁর সম্মুখে মাটির পুতুলের মতই দাঁড়িয়ে ছিল। বিমুগ্ধ এবং বিস্মিত দৃষ্টিতে শাহজাদীর সেই ধ্যানকল্পনাবিভোর পরমসুন্দর মুখখানির দিকে তাকিয়ে ছিল। এবং ভাবছিল—আহা কি সুন্দর! খুদাতায়লা যাকে দেন তাকে কি এমনই করেই ঢেলে দেন! এই রূপ এই রঙ এই সুন্দর গঠন, এই অপরূপ দুটি চোখ—এই তাঁর আগ্রা কিল্লায় বাদশাহী রঙমহলের মত বাসস্থান—এই বাদশাজাদীর আসন এই ঐশ্বর্য এই ভোগ এই সমাদর—এই এতই কি দেন? যমুনার প্রবাহের মত অজস্র ধারায়, পাহাড়-পর্বতের মত স্তূপাকারে! নিজের সঙ্গে তুলনা করে আক্ষেপ অনুভব করবার মত মনের জীবন্ত অবস্থাটুকুও তার নেই। অথবা ততটুকু জীবনী-শক্তিও নেই তার মনের। হিংসা করবার মত সাহস নেই শক্তি নেই। সেকালের ভাগ্যের হাটে কয়েক মুষ্টি রৌপ্যমুদ্রায় বিক্রীত মেয়েটি মুগ্ধ অভিভূত এবং কিছুটা ভীত হয়ে বাদশাজাদীর মুখের দিকে তাকিয়ে হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

শাহজাদী স্তব্ধতা ভঙ্গ করে বললেন, অত্যন্ত মৃদুস্বরে বললেন—বড়ী বহুবেগমসাহেবাকে বলবি সে যেন শাহজাদাকে বলে—।

থেমে গেলেন তিনি।

তারপর বললেন—না। অনেকটা যেন নিজেকেই বললেন। তারপর একটু উচ্চকণ্ঠে ডাকলেন—বাঁদী!

বাঁদী আসতেই বললেন—লিখবার সরঞ্জাম দে।

*　　*　　*

কাগজ কলম নিয়ে সযত্নে পত্র রচনা করে নিজেই পড়ে দেখলেন—

ভাই জীউ,

মেহেরবানের মেহেরবান—সকল করুণার আধার—যিনি ভিন্ন দুনিয়ায় মাবুদ নাই; যিনি সকল পবিত্রতার আধার; সকল বিদ্যার উৎস; যিনি সকল জ্ঞানের জ্ঞাতা; যিনি শাফেয়েল কাফী আজিমেল বাকী—যিনি একক অদ্বিতীয় তিনি সকলের প্রতিই সদয় কিন্তু তোমার প্রতি তিনি বিশেষরূপে সদয়।

এই দয়া অযাচিতভাবে অজস্রধারায় তাঁর উপর বর্ষিত হয় যিনি এই বিশেষ দয়ার পাত্র। কিন্তু সেই দয়ার পাত্রকে এ বর্ষণের কথা সংগোপনে রাখিতে হয়। ইহা গুহ্য। আমাদের গুরু পয়গম্বরের প্রিয়পাত্র মুল্লাশাহ এ কথা একদা আমাদিগকে বলিয়াছিলেন—তোমাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি।

গত রাত্রে মহাসৌভাগ্য নাকি তোমার উপর নিদাঘ রাত্রের বর্ষণের মত বর্ষিত হইয়াছে।

আমার অগ্নিদগ্ধ দেহে ও মনে উৎকণ্ঠা জ্বালার মত যুক্ত হইয়া আমাকে অসহনীয় পীড়নে ও উদ্বেগে পীড়িত ও উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছে। সেই উত্তাপের মধ্যে বর্ষণসিক্ত রাত্রির স্পর্শধন্য তোমার স্নেহস্পর্শের জন্য আমি উদ্‌গ্রীব।

তুমি দীর্ঘজীবী হও—তুমি জীবনে সফলকাম হও—এই যে

হিন্দুস্তান এই হিন্দুস্তানে এসে বসবাস স্থাপন করেছিলেন তৈমুর বংশের মহাত্মা বাবর শাহ ; খোদার নির্দেশে তিনি পেয়েছিলেন এই তামাম ভূখণ্ডের শাহানশাহী বাদশাহী। তৈমুরশাহী বংশের প্রতি সেই অদ্বিতীয় আল্লাহ্ তায়লার করুণায় বাবরশাহের পৌত্র জালালুদ্দিন আকবর শাহের দৃষ্টির সম্মুখে উন্মুক্ত হইয়াছিল এই পুণ্যভূমির শাশ্বত সাধনা সম্পদ। হিংসাদ্বেষহীন কলুষগ্লানিহীন প্রেম-অভিষিক্ত শান্তির শাশ্বত সম্পদ। সেই শাশ্বত সম্পদকে মানুষের দীর্ণ জীবনে তিনি বিতরণ করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁর সেই অসমাপ্ত কর্ম ও তাঁর সেই নিত্য-দেখা-স্বপ্ন সার্থক ও সফল হোক তোমার জীবনে।

গতকল্য সেই সম্পর্কিত কোন অভিনব বার্তা তুমি পাইয়াছ ভাই জীউ ? তোমার উৎকণ্ঠিত ভগ্নী তাহা অবগত হইবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া আছে। আজ আমি সন্ধ্যার সময় প্রাসাদে গোয়ালিয়র হইতে ক্রীত গুলরুখ নাম্নী নর্তকীর নৃত্যের আয়োজন করিলাম। যখন সকলে ওই নৃত্যগীত শুনিবে তখন আমি তোমার নিকট এই স্বর্গীয়-বার্তা শ্রবণ করিব। ইতি—

তোমার স্নেহময়ী ভগ্নী

বেগম জাহানআরা।

ত্রিশ

সেদিন প্রভাতে উঠতে দেরি হয়ে গিয়েছিল শাহজাদা দারা সিকোর। আগের দিন সন্ধ্যার পর থেকেই ঘটেছিল তাঁর জীবনের সেই দিব্যজীবনের অলৌকিক এক আকস্মিক প্রকাশ। যার কথা বেগম নূরমহল বা নাদিরা বেগম জানিয়েছিলেন জাহানআরা বেগমসাহেবাকে। তিনি অসুস্থ—সারা হিন্দোস্তান তাঁর জন্য উদ্বিগ্ন—তবে এখন কিছুটা ভাল আছেন; বিপদ উত্তীর্ণ হয়েছে কিন্তু পোড়া ঘা এখনও সারে নি—এখনও সতর্ক চিকিৎসকের চিকিৎসাধীনে রয়েছেন, তবুও একথা নাদিরা বেগম তাঁদের অর্থাৎ তাঁর স্বামী শাহজাদা শাহবুলন্দ একবালের একান্ত হিতৈষিণী বেগমসাহেবাকে না জানিয়ে পারেন নি। শাহজাদী জাহানআরা বলে পাঠিয়েছেন আজ সন্ধ্যায় যেন শাহজাদাকে নিয়ে নাদিরা বেগম অবশ্য অবশ্য আসে তাঁর কাছে। এবং শাহজাদার ভবিষ্যৎ যাতে ভাল থাকে তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে।

শাহজাদা গভীর রাত্রি পর্যন্ত কথা বলেছেন কোন এক অদৃশ্য ব্যক্তিত্বের সঙ্গে। না—একজনের সঙ্গে নয়, দুজনের সঙ্গে। একজন কোন এক সন্ন্যাসী, অন্যজন কোন এক অপরূপ রূপসী নারী। শাহজাদা তাঁর সেই বিহ্বলতার মধ্যে বার বার তাকে বলেছেন হিন্দু দেবদূতী। ক্রীশ্চান পরস্তার উদিপুরী যখন সিরাজীর গ্লাস হাতে নিয়ে তাঁকে আহ্বান জানাল তখন শাহজাদা তাকেও বলেছেন—তুমিই তো সেই হিন্দু দেবদূতী! আকাশের মত নীল তোমার চোখ, তোমার বর্ণসুষমায় বেহেস্তের ফুলের লাবণ্য, তোমার স্পর্শে হিন্দুদের রতি-বিলাসের শিহরন! তুমিই সেই হিন্দু দেবদূতী?

উদিপুরী বালিকা কিন্তু সে সুচতুরা সুনিপুণা। সে এরই মধ্যে যুবতীর মত লাস্যময়ী এবং পরিপূর্ণা পরিপক্কা নারীর মত ছলনাময়ী।

সে বলেছিল—হ্যাঁ আমিই সেই শাহজাদা। সে তার দেহভাণ্ড উজাড় করে শাহজাদাকে মর্ত্যজীবনরস পান করিয়ে মাটিতে নামিয়ে এনেছিল; তাঁকে সিরাজী পান করিয়ে ধীরে ধীরে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিল। ভোরবেলা যখন জামামসজেদে আজানের ধ্বনি উঠেছিল এবং তার সঙ্গে সঙ্গে সারা আগ্রায় এবং ক্রমে ক্রমে পাশাপাশি গ্রামে গ্রামে সে আজানধ্বনি ব্যাপ্ত হয়ে সারা দেশ জুড়ে ধ্বনি তুলে তুলে ছড়িয়ে পড়ছিল—যখন পাখীরা সুর মেলাচ্ছিল আজানের সঙ্গে—যখন মুসলমানেরা জাগছিল হিন্দুরা জাগছিল—হিন্দুদের মন্দিরে মন্দিরে আরতির কাঁসর ঘণ্টা বাজছিল তখন শাহজাদাকে ডাকবার জন্য দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিল বেগম রানাদিল।

এদেশী হিন্দুর মেয়ে রানাদিল।

তার বাপ মায়ের খবর কেউ জানে না। মানুষ করেছিল এক পথে-পথে ঘুরে বেড়ানো দলের নাচওয়ালী। সে তাকে নাচওয়ালী করেই মানুষ করেছিল। দিল্লীর রাজপথে এই কিশোরী মেয়েটি নাচ করে বেড়াতো। সঙ্গে থাকতো ঢোলকদার—মন্দিরা বাজাতো সেই প্রৌঢ়া এবং তার সঙ্গে গানও গাইতো; আর এই মেয়ে রানাদিল পায়ে ঘুঙুর বেঁধে নাচতো ঝমঝম ঝমঝম শব্দ তুলে।

'বাঁশুরিয়া রে—' বলে সুর টেনে একটু সামনে ঝুঁকে একটু থেমে পায়ে পায়ে ঠেঁদে একটি কটাক্ষ হেনে মুচকি হেসে গাইতো—'না মারো নজরিয়া।—বাঁশুরিয়া রে—!' আবারও একটু কটাক্ষ হেনে শেষ করতো কলিটি।

লোকে ফুলের মালা ছুঁড়তো। রুমালে বেঁধে ইনাম ছুঁড়তো। তারা হাতে তুলে ধরতো—রানাদিল সমুদ্রের দুলন্ত ঢেউয়ের মত নাচতে নাচতে এসে প্রায় ঝাঁপ দিয়ে পড়ে কেড়ে নিয়ে যেত সেই হাতে রুমাল।

এরা চিরকাল আছে। পথে পথে জীবন যৌবন বিলিয়ে

বেড়াবার জন্যেই এরা ধুলোর পথে নেমেছে। নামিয়েছে নসীব নামিয়েছে খুদাতায়লা নামিয়েছে ভগবান।

শাহজাদা দারা সিকো মেয়েটিকে দেখে প্রমত্ত হয়ে গিয়েছিলেন। মনে হয়েছিল রানাদিলকে একান্ত করে না পেলে তাঁর জীবন বৃথা ব্যর্থ। তিনি তাকে অন্তঃপুরে মুঘল-বাদশাহের রঙমহলে আহ্বান জানালেন।—এসো রানাদিল—তুমি রঙমহলে এসো। আমার হতে হবে তোমাকে।

রানাদিল হাত ছাড়িয়ে সরে দাঁড়িয়ে বলেছিল—শাহজাদা, যতক্ষণ আমি পথের ধুলোর উপর আসর পেতে নাচ করে বেড়াই পথের ধুলোর নাচওয়ালী, তয়ফাওয়ালী, কসবী ততক্ষণ আমার ধুলোর ঘরে খোলা দরজা দিয়ে তোমার নিমন্ত্রণ অবারিত রইল। কিন্তু আমাকে যদি রঙমহলে ঢুকতে হয়, যদি আমাকে আমার ধর্ম দিতে হয়—হিন্দু থেকে মুসলমান হতে হয় তাহলে বাঁদী হয়ে ঢুকব না ঢুকতে পারব না, যদি উপপত্নী পরস্তার করে নিয়ে যেতে চাও তাহলে তা আমি পারব না। আমি যাব না। জান কবুল আমার। ইজ্জত আমার নেই। ইজ্জত আমি পয়সা নিয়ে বেচি কিন্তু আমাকে আমি বেচি না। যদি আমার নিজেকে তোমাকে দিতে হয়—যদি আমাকে তুমি কিনতে চাও শাহজাদা তাহলে আমাকে উপপত্নী নয় পত্নীর ইজ্জত দিয়ে কিনে নাও। আমার দেহের সঙ্গে আমার আত্মার আনুগত্য চাইলে আমাকে তোমার বিয়ে করতে হবে। সাক্ষী রাখতে হবে দুনিয়াকে—নাম নিতে হবে দিন দুনিয়ার মালেকের। না হলে কভি না কভি না কভি না শাহজাদা। আমি নাচওয়ালী আমি তয়ফাওয়ালী আমি কসবী, আমি জওহর খেয়ে মরতে পারি। বিয়ে না করে আমাকে তুমি বাঁদী কি পরস্তার হিসেবে কখনও পাবে না। কভি না কভি না কভি না।

শাহজাদা তখন উন্মত্ত রানাদিলের জন্যে।

কিন্তু বাদশাহ সাজাহান বলেছিলেন—না। একটা পথের অতি

সামান্য কসবীর বেটী কসবী তয়ফাওয়ালীর বেটী তয়ফাওয়ালী এসে হারেমে ঢুকবে চাঘতাইয়া বংশের বহু হয়ে! না না। তা হয় না। পরস্তার পর্যন্ত হতে পারে—তার বেশী বেগম—না না। কভি না কভি না কভি না।

রানাদিলকে অর্থ দিতে চেয়েছিলেন প্রচুর। কিন্তু রানাদিলের সেই এক কথা—কভি না।

সে অনেক কথা। অনেক বিরহবেদনার কাহিনী। শাহজাদা শয্যা পেতেছিলেন। রানাদিল পণ ছাড়ে নি।

শেষ পর্যন্ত বাদশাহ মত দিয়েছিলেন। না দিয়ে তাঁর উপায় ছিল না। রানাদিল শাহজাদা দারা সিকোর বিবাহিতা বেগম হয়ে এসেছে মুঘল হারেমে।

বিচিত্র মেয়ে রানাদিল।

যেমন রূপ তেমনি কণ্ঠস্বর তেমনি সংগীতবোধ তেমনি নৃত্যপারঙ্গমতা।

রূপের মধ্যে সব থেকে আগে চোখে পড়ে তার কেশদাম। চুল বললে যেন রানাদিলের কেশশোভাকে ঠিক বোঝানো যায় না। রেশমের মত নরম আর তারই সঙ্গে কুঞ্চিত এবং তেমনি ঘন কালো তার বর্ণ। সেই বর্ণচ্ছটার ঘেরের মধ্যে তার মুখের বর্ণের মাধুরী আর লাবণ্যের সুষমা যেন পাতার ঘেরের মধ্যে সদ্যফোটা গোলাপের মত ঝলমল করে। কিন্তু এহ বাহ্য। এ বাইরের কথা। আশ্চর্য রানাদিল তার অন্তরের ঐশ্বর্যে।

নাচগান করে যখন সে বেড়াতো তখন সে ছিল যেন জঙ্গলে আকীর্ণ যমুনার পতিত তটভূমি। সে রূপ এখন সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। এ রানাদিলের মধ্যে সেই নৃত্যগীতপটিয়সী চঞ্চল-কটাক্ষক্ষেপনিপুণা তয়ফাওয়ালীর কোন সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় না। এ যেন যমুনার তটভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত একটি দেবমন্দির; মর্মরে

গড়া একটি সমাধিমন্দির। যেমন গড়ে উঠেছে মমতাজমহলের সমাধিমন্দির।

বেগম রানাদিল রাত্রে মোহিনীবেশিনী হয়ে সুরাপাত্র হাতে শাহজাদাকে তাঁর সেই দিব্যজীবনের জাগ্রত স্বপ্ন থেকে টেনে এনে মাটিতে নামাতে পারে নি। তাঁর দৃষ্টির সম্মুখে নিজের সুরভিত যৌবনকে প্রমত্ত এবং লোভনীয় ভঙ্গিতে অনাবৃত করে ধরতে পারে নি। কিছুতেই কোনমতে সে তার জীবনের অতীতকে জাগিয়ে তুলতে পারে নি। সে অসহায়ের মত ফিরে গিয়েছিল—না এ সে পারবে না। পারবে না। পারবে না।

ছি! ছি! ছি!

ফিরে গিয়েছিল অভিমানাহত অন্তর নিয়ে।

হায় শাহজাদা, আমার মধ্যে খুঁজে পেলে না তুমি দেবদূতীকে। কিন্তু রানাদিল যে অনুভব করছে সত্যকারের দেবদূতী তার মধ্যে যেন উঁকি মারছে।

তাই সে ভোরবেলা আজানের সঙ্গে সঙ্গে এসে দাঁড়িয়েছিল শাহজাদার শয়নকক্ষের দ্বারে।

ভারী পর্দা ফেলা। পর্দার সামনে তাতারিণী প্রহরিণী।

কিন্তু শাহজাদার ঘুম ভাঙে নি। ক্রীশ্চান মেয়ে শুভ্র-তুষারবর্ণা উদিপুরীর কিশোর তনুকে জড়িয়ে ধরে এখনও তিনি গাঢ় নিদ্রায় মগ্ন।

সে ঘুম ভাঙল আর এক ঘড়ি পর। তখন রোদ উঠেছে। শাহজাদা উঠলেন—উদিপুরী তখনও ঘুমুচ্ছে।

অনাবৃতদেহ কিশোরী।

শাহজাদা বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে।

সামনেই দেখলেন দাঁড়িয়ে রানাদিল। তার হাতে ফুলের মালার থালা। তুই চোখের কোণে তু'ফোঁটা লুকিয়ে থাকা

শাহজাদাকে দেখে রানাদিল হাসলে।

সঙ্গে সঙ্গে চোখের কোণতুটি ঝিকমিক করে উঠল।

—দিল! রানাদিল! মেরি দিল!

টপটপ করে জল ঝরে পড়ল মর্মর মেঝের উপর।

একত্রিশ

রানাদিল একদিন ছিল পথের নর্তকী। পথেই ছিল বাস। জীবনের বাসনা কোন দিন একটুকরো মাটিকে আশ্রয় করে শিকড় মেলে ডালপালায় ফুল ফোটাতে পারে নি। জানত না সে কোন্ জাত। তবে একটি হিন্দু সংস্কার যেন কেমন ধানের ক্ষেতে ঝরে পড়া ধান থেকে জন্মানো আগাছাজাতীয় গাছের মত জন্মেছিল। মনে-মনে তার বিশ্বাস জন্মেছিল শাহজাদা দারা সিকো তার জন্ম-জন্মান্তরের প্রিয়তম এবং সে তাঁর অন্যতমা প্রিয়া। দেহের থালায় যত অপরূপ আরতির প্রদীপ জ্বলছে তার থেকেও শতগুণ উজ্জ্বল স্নিগ্ধ আরতিপ্রদীপ জ্বলছে তার মনের থালায়।

সে জানে দেহের থালায় যে প্রদীপ জ্বলে সে প্রদীপ দুর্লভ সুরভিত তেলে জ্বালানো আলো—আর মনের থালায় যে প্রদীপ জ্বলে সে প্রদীপ হল আরতিশেষে কর্পূরে জ্বালানো আলোর শিখা।

সে মনে মনে শাহজাদাকে মেলাতে চেষ্টা করে রামায়ণ মহাভারতের কোন এক ঈশ্বরের অংশাশ্রিত পুরুষের সঙ্গে এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও মেলাতে চায় তাঁরই কোন এক প্রেমধন্যা প্রেয়সীর সঙ্গে। মেলে না। তবু মেলাবার চেষ্টার আর তার অন্ত নেই।

গত রাত্রে শাহজাদা যখন এক আশ্চর্য ভরের মধ্যে নিজের স্বরূপকে আবিষ্কার করছিলেন তখন সে এসেছিল তার দেহের আরতিথালা নিয়ে তাঁকে আরতি করতে। কিন্তু এসেও সে তা পারেনি। দেহে সাজানো আরতিথালার প্রদীপ নিভে গিয়েছিল—সকল উপকরণ লজ্জিত হয়েছিল। মনের থালায় কর্পূরের আরতি শাহজাদাকে প্রীত করতে পারে নি। সে আলোয় তিনি তাঁর পূর্বজন্মের স্মৃতি থেকে রানাদিলকে চিনতে পারেন নি। লজ্জিত হয়েছিল রানাদিল—অপ্রতিভ হয়েছিল। যে আরতির থালাখানিকে পথের ধারের গাছতলা থেকে শাহজাদা কদর করে কুড়িয়ে এনেছিলেন সে থালায়

কাল সে কেন আলো জ্বালতে পারলে না? কেন লজ্জা পেলে? আর্মানী পরস্তার উদিপুরী তার সদ্যযুবতী দেহখানিতে কেমন পঞ্চ-প্রদীপের পঞ্চশিখাকে উন্মুখ করে শাহজাদার সামনে উজ্জ্বল হয়ে ঝলমল করে জ্বলে উঠল। সে পারলে না। শাহজাদা তার মনের থালায় জ্বালানো কর্পূরের শিখার আরতির দিকে পিছন ফিরে রইলেন। সেই লজ্জায় এবং সেই অভিমানে—একই সঙ্গে বেদনা ও অভিমান দুই আবেগেই সে কেঁদে ফেললে। তার চোখ থেকে জল টপটপ করে ঝরে পড়ল প্রাসাদের মার্বেলের মেঝের উপর।

দারা সিকো সমাদর করে তাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বললেন—মেরি দিল তুমি কাঁদছ? কাঁদছ কেন? রোতি কিউ?

রানাদিল আজ আর তাঁকে বাধা দিল না, ধরা দিল তাঁর বাহুবন্ধনের মধ্যে। তারপর বললে—আপনি কেন আমাকে কাল চিনতে পারলেন না আমার মালিক?

একটু বিস্মিত হয়ে শাহজাদা বললেন—চিনতে পারলাম না? সে কি? কখন?

—কাল রাত্রে যখন আপনি ধ্যানস্থ হয়ে পড়লেন—যখন আপনি নিজেকে চিনতে পারলেন—যখন আপনার জন্মজন্মান্তরের কথা মনে পড়ল—যখন আপনি বলছিলেন, 'এবার আপনি একসঙ্গে দিনদুনিয়ার শাহানশাহী আর সারা দুনিয়ায় একটি ধর্মের পয়গম্বরী করবার জন্যে এসেছেন', তামাম দুনিয়ায় ধর্মে ধর্মে বিরোধের, হিংসার রক্তক্ষয়করা যুদ্ধের অবসান করে যে নই দুনিয়া কায়েম করবেন, সেই ঠিক তখনই আমি গিয়ে আপনার সামনে হাতজোড় করে দাঁড়ালাম; মনে মনে বললাম—আমি তোমার জন্মজন্মান্তরের দাসী; তুমি আমার গিরধারী নাগর, আমার মাশুক, আমার আশিক্, আমি তোমার জন্যে জন্ম নিয়েছি পথে—এ জন্মে আমি রানাদিল—গত জন্মে আমি কে ছিলাম বল—।

কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল।

দারা সিকো বললেন—আমি তোমায় চিনতে পারলাম না—সাড়া দিলাম না।

রানাদিল কথা বলতে পারলে না, ঘাড় নেড়ে জানালে—হ্যাঁ তাই।

শাহজাদার সুন্দর মসৃণ ললাটখানির উপর চিন্তার রেখা ফুটে উঠল—সারি সারি কয়েকটা রেখা। রেখাগুলিও সুন্দর সমান্তরাল এবং এপ্রান্ত থেকে প্রায় ওপ্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। রানাদিল রেখাগুলির দিকে তাকিয়ে আরও শ্রদ্ধান্বিত হয়ে উঠল। সাধারণ মানুষের কপালে এমনভাবে রেখাগুলি যত্ন করে আঁকা ত্রিপুণ্ড্রক রেখার মত ফুটে ওঠে না। শাহজাদাকে এই মুহূর্তে যেন এক ত্রিকালজ্ঞ যোগীর মত মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে ধ্যানস্থ হয়ে যেন দিব্যচক্ষে ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান তিন কালকেই প্রত্যক্ষ করছেন।

শাহজাদা নিজেও এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী ছিলেন। এর মধ্যে কোন কপটতা ছিল না ভণ্ডামি ছিল না; মনে মনে চিন্তায় কল্পনায় একধরনের ভূত ভবিষ্যৎ প্রত্যক্ষও তিনি করতেন। কাল রাত্রেই তা করেছেন। ওই কবি সুভগের পত্রখানা পড়ে তাঁর চিত্তে জেগে উঠেছিল একটা আলোড়ন। একটা ক্ষোভ। কে কোথাকার এক হিন্দু যোগী ওই গোঁড়া হিন্দু যুবক কবিকে তাদের বিশ্বাসমত বলেছে—"শাহজাদা দারা সিকো একসঙ্গে এই হিন্দুস্তানের সাম্রাজ্য এবং ধর্মরাজ্য দুই রাজ্যের দিকে দুই চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে দুটি রাজ্য থেকেই পরাজিত হয়ে, ব্যর্থ হয়ে এক রক্তাক্ত পিচ্ছিল জীবনক্ষেত্রের উপর আছাড় খেয়ে পড়বেন।" ওই অল্পবুদ্ধি আধ্যাত্মিক-জ্ঞানবুদ্ধিহীন, ঈশ্বরের আশীর্বাদ-বঞ্চিত ওই যুবক তাই বিশ্বাস করে তাই তাঁকে লিখেছে; তাঁর হিতার্থী সাজতে গিয়েছে; মহাবিজ্ঞের মত এবং হিতৈষীর মত সকাতর উপদেশ দিতে সাহস করেছে। তাতে তাঁর ক্ষোভ স্বাভাবিক। তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তি মুহূর্তে ঝড় তুলেছে তাঁর বিশ্বাসের নির্মল নীল আকাশমণ্ডলে।

হ্যাঁ, কাল তিনি অতীতকালকে স্মরণ করেছিলেন। ধ্যানস্থ

হয়েছিলেন। নিজের আধ্যাত্মিক ও আত্মিক পরিচয় তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। কিন্তু—। কিন্তু তার মধ্যে কখন রানাদিল এসে তাঁকে ডেকেছিল? রানাদিল—রানাদিল! কে ছিল রানাদিল তাঁর? সে তাঁর কে ছিল সেই অতীত জন্মান্তরে? কাল কি তিনি তাকে অতীত জন্মান্তরের রূপে দেখতে পেয়েছিলেন? মনে পড়ছে না!

মনে পড়ছে তাঁর এক বিচিত্র মানসিক অবস্থার কথা। মনে পড়ছে—হ্যাঁ, যা তিনি মধ্যে মধ্যে ভাবেন—যা তাঁর মনে হয় তাই—মনে হয় তিনি এক ঐশ্বরিক শক্তি এই বিশ্বজগতে এসে পড়েছেন—কিন্তু অহরহ আকর্ষণ করছে তাঁকে ঈশ্বরের প্রবলতর শক্তি। তিনি ঊর্ধ্বলোকে হাউইয়ের মত চলে যেতে যাচ্ছেন, কত সময় মনে মনে অনুভব করছেন যে তাঁর পায়ের তলা থেকে কোমল সবুজ ঘাসে ঢাকা মাটি, যার স্পর্শ-কোমলতা, স্পর্শস্বাদ যুবতী নারীদেহের মত, সেই মাটি সরে গেছে—আর নেই। তিনি উপরে উঠে যেতে চাচ্ছেন—ক্রমশঃ ঊর্ধ্বে ক্রমশঃ ঊর্ধ্বে—তখন নীচ থেকে পৃথিবী তাঁকে ডাকে—তার কুসুমিত যৌবন নিরাবরণ করে সেখানে আসন পেতে তাঁকে ডাকে—ফিরে এস ফিরে এস। আমাকে তুমি ভোগ কর, আমাকে তুমি রক্ষা কর—শয়তানের পীড়ন থেকে ধর্ষণ থেকে বাঁচাও।

তিনি তার সকাতর আহ্বানে নেমে আসেন।

আসন পেতে বসেন যুবতী-যৌবনোপম এই সাম্রাজ্যের মধ্যস্থলে। হ্যাঁ, কাল উদিপুরী ওই আর্মানী মেয়েটির অনাবৃত শুভ্রকোমল সুরভিলিপ্ত সত্মযুবতী দেহের পাশে তিনি বসেছিলেন। মনে হয়েছিল উদিপুরীই তাঁর সাম্রাজ্য; ভবিষ্যৎকালে হিন্দুস্তানের বাদশাহী। হ্যাঁ। মনে হওয়া নয়। সত্য, এ তাঁর সেই ধ্যানের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা সত্য। কাল তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন যে, ভাবী হিন্দুস্তানের প্রতীক বিচিত্রভাবে নাদিরা বেগম নয়, রানাদিলও নয়; ভাবী হিন্দুস্তানের প্রতীক নারী হল ওই আর্মানী মেয়ে, যাকে তিনি এনেছিলেন কাশ্মীর থেকে—যার নাম দিয়েছেন উদিপুরী বেগম।

উদিপুরী এক অপূর্ব নারী—অতুলনীয় শ্বেতাঙ্গিনী কোমল শ্বেত গোলাপ বা শ্বেত পদ্মের মত। তর গন্ধ অপূর্ব, তার স্পর্শ অপূর্ব। কিন্তু এতে শাহজাদা দারা সিকো খুশী হতে পারেন নি। উদিপুরীকে তাঁর মানসকল্পনার হিন্দুস্তানের বাদশাহীর প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করতে তাঁর কেমন যেন লাগে!

এ তো কেবল গত রাত্রের কথা নয়, এমন যে আরও কয়েকবার হয়েছে।

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে রানাদিল বললে—আমার মালিক, তুমি আমার তো শুধু বাদশাহ নও—তুমি আমার স্বামী প্রভু—তুমি আমার প্রিয়তম—তুমি আমার ঈশ্বর। সীতার কাছে রাম যেমন আমার কাছে তুমি ঠিক তেমনি।

ঠিক এই সময়ে বাঁদী এসে বললে, খুদ্ বেগমসাহেবা এত্তেলা পাঠিয়েছেন, শাহজাদার সঙ্গে দেখা করতে চান। খুদ্ বেগমসাহেবা অর্থে স্বয়ং নাদিরা বেগম।

রানাদিল ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে গেল, বলে গেল—আমি নিয়ে আসছি এখুনি। রানাদিল শাহজাদার প্রথম ধর্মপত্নী নাদিরা বেগমসাহেবার প্রতি অশেষ শ্রদ্ধা পোষণ করে।

শাহজাদা তখনও চিন্তা করছিলেন কাল সেই ধ্যানমগ্নতার মধ্যে রানাদিলকে কেন দেখেন নি তিনি? কেন? উদিপুরীকে মনে হয়েছে বাদশাহী এই মাটির রাজ্য; নাদিরা তাঁর বেহেস্ত; কিন্তু রানাদিল—?

কেন দেখলেন না? হঠাৎ একটা কথা মনে হল। তিনি প্রফুল্ল হয়ে উঠলেন। ঠিক এই মুহূর্তটিতেই নাদিরা বেগম এসে অভিবাদন করে দাঁড়ালেন। শাহজাদা তাঁকে সমাদর করে আসনে বসিয়ে বললেন—নাদিরা, তুমি আমার প্রিয়তমা। তুমি আমার বেহেস্ত। কাল রাত্রে আমি যখন ধ্যানের মধ্যে পরমেশ্বরের আকর্ষণে উর্ধ্বে উঠে যাচ্ছিলাম তখন তুনিয়ার বাদশাহী যেন আমাকে কাতরস্বরে ডাকলেন—আমি তাকিয়ে দেখলাম সে এক পরমাসুন্দরী

কন্যা—তুষারশুভ্র তার গায়ের রঙ, চোখের তারায় তার নীলের আভাস—সে বললে—হজরত, আপনার জন্যই খুদা আমাকে এমন সুন্দরী করেছেন। আপনি আমাকে রক্ষা করুন। ভোগ করুন। আমি দৃষ্টি আরও আনত করলাম—তারপর তাকে চিনলাম। সে উদিপুরী বেগম। খুদা আমার অন্তরের মধ্য থেকে বলে উঠলেন—হ্যাঁ, সত্য কথা। এ নারীরূপিণী সাম্রাজ্য তোমার জন্যই তৈরি হয়েছে। তুমি পরিত্যাগ করলে একে শয়তানে ভোগ করবে। আমি নেমে এলাম। উদিপুরীর অনাবৃত দেহের পাশে বসলাম। সে আমার মুখে শিরাজী তুলে দিলে। কিন্তু অন্তরের মধ্য থেকে আর একজন কাঁদল। কে কেঁদেছিল তা তখন বুঝতে পারি নি, বড় করুণ সুরে কেঁদেছিল সে। আজ সকালে বুঝলাম—সে কে?

—কে সে শাহজাদা?

—সে আমার সোহাগিনী রানাদিল!

একটু স্তব্ধ থেকে শাহজাদা আবার প্রশ্ন করলেন—কাল রাত্রে উৎকণ্ঠিত হয়েছিলে নিশ্চয়?

—হ্যাঁ শাহজাদা! তবে আমি তো আপনার সাধনার কথা জানি!

—হ্যাঁ। তুমি জানবে বইকি। তুমি যে আমার বেহেস্ত। আমার যত পুণ্য যত সৌভাগ্য সে তো সবই বেহেস্তেরই দান। একটু থেমে রানাদিলের দিকে তাকিয়ে বললেন—আমার যত কান্না, যত আঁখের আঁসু সে সব হল আমার এই কলিজার অন্তরের যে দিল আছে তার। কিন্তু এমন ব্যস্ত হয়ে মহল ছেড়ে রানাদিলের মহলে আমার সন্ধানে এসেছ? আমি কেমন আছি দেখতে এসেছ?

—হ্যাঁ শাহজাদা! তবে তা ছাড়াও জরুরী কিছু তলব আছে। বড়ী বহেনসাহেবাকে এ খবর আমি পাঠিয়েছিলাম।

—কেন পাঠাতে গেলে ?

—শাহজাদা, এ হুকুম তো আপনার হুকুম। বিলকুল সব দিদিজীউকে জানাতে হবে। তা ছাড়া রাজধানীতে দক্ষিণ মুলক থেকে এখন সাদা সাপ এসে গর্তের মধ্যে আক্রোশবশে ফুঁসছে। আপনার এই ধ্যানের খবর—এ তার কাছে পৌঁছলে—

—হ্যাঁ। গোপন রাখা উচিত।

—সেই কারণেই দিদিজীউয়ের পরামর্শ চেয়েছিলাম।

—কি বলেছেন তিনি ?

—তিনি বলেছেন এ খবর যেন কেউ না জানতে পারে। আর বলেছেন সন্ধ্যার সময় শাহজাদা যেন অবশ্য অবশ্য গিয়ে দিদিজীউয়ের সঙ্গে দেখা করেন।

—আচ্ছা। সে আমি নিত্যই যাই—আজও যাব।

—আরও একটা জরুরী খবর আছে শাহজাদা !

—কি খবর ?

—সেই বাঁদী শিরিনকে মনে আছে আপনার ?

চমকে উঠলেন শাহজাদা। শিরিন ? কাল সুভগের সঙ্গে দেখা হয়েছে। তার পত্র পড়তে পড়তেই তাঁর চিত্তে জেগে উঠেছিল ক্ষোভ—জেগে উঠেছিল এই ধ্যানের আবেগ। আবার শিরিন ? সে কোথা থেকে এল ? তার নাম করে কেন নাদিরা ? সুভগ বলেছিল সে তাকে পরিত্যাগ করেছে—বলেছে ইসলামকে সে যখন গ্রহণ করেছে তখন ইসলামের শাসনকে সে অমান্য করতে পারবে না। সে সুভগকে পরিত্যাগ করে বাঈয়ের তয়ফাওয়ালীর পেশা নিয়েছে।

সুভগ চেয়েছিল তার ছেলে হবে হিন্দু।

শিরিন সম্মতি দিতে পারে নি। তার ছেলে হবে মুসলমান।

নাদিরার দিকে মুখ তুলে শাহজাদা প্রশ্ন করলেন—শিরিন ? কেন ? তার নাম কেন ? কি তার খবর ? কোথায় সে তুমি জান ?

—সে আগ্রায় এসেছে।

—আগ্রায় ?

—কবি সুভগের সন্ধানে এসেছে সে।

বিস্ময় বিস্ফারিত দৃষ্টিতে নাদিরা বেগমের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন শাহজাদা। নাদিরা বললেন—তখন আপনার উপর ভর হয়েছে—আমি ভাবছি কি করব? ঠিক এই সময় কানে এল কোন এক ভিখারিনী মেয়ে গাইছে আমাদেরই মঞ্জেলের পাশে—আশ্চর্য গান।

"তান-হা না হামিন, দায়ের উ হারেম, খানা ই উস্ত
ইয়েন অর্জ-উ সামা তামান কাশানা ই উস্ত
আলম হামা দিওয়ানা আফসানা উস্ত
আকিল বুদ আন কাসে কি দিওয়ানা উস্ত।"

চমকে উঠলেন শাহজাদা। এ তো অপূর্ব বাণী। এ যেন তাঁরই অন্তরের প্রতিধ্বনি। মন্দির মসজিদ গির্জা দেবালয়েই তো তিনি নেই—তিনি তো এই মৃত্তিকাময়ী ধরণী থেকে আকাশ পর্যন্ত সর্বত্র বিরাজিত—সবই তাঁর পাদপীঠ। মানুষ তাঁর অলৌকিকত্ব নিয়েই বিস্মিত হয়ে রইল—তাঁর কথা ভাবলে না। ওই নিয়েই পাগল হল। হায় হায়। তাঁকে নিয়ে যে পাগল হয় সেই তো ছুনিয়ায় পবিত্রতম মানুষ—

নাদিরা বললেন—আমার চিন্তার উত্তর পেলাম। শাহজাদা তাঁকে নিয়ে পাগল—তিনিই দিনছুনিয়ায় ধন্য। পরিত্রাতা।

—এ গান শিরিন কার কাছে শিখলে? পেলে? এ মেয়ে শিরিন?

—হ্যাঁ শাহজাদা। এ মেয়ে শিরিন। কবি সুভগের সঙ্গে তার বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। কবি সুভগ কাশীতে তাকে ফেলে এসেছিল দিল্লী। শিরিন তয়ফাওয়ালী হয়েছিল। তারপর সে আবার ব্যাকুল হল সুভগের জন্যে। এবং তার সন্ধান করে করে এল দিল্লী।

সেখানে এক আশ্চর্য ফকীরের আশ্রয় পেয়েছে। জীবনের দ্বন্দ্ব তার মিটে গেছে। তিনি তাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। বলেছেন, যাও শাহজাদা দারা সিকোর কাছে তার সন্ধান মিলবে। তাই শিরিন এসেছে এখানে। এসেছে কবি সুভগের সন্ধানে আপনারই কাছে।

বিস্ময়ের আর অবধি রইল না শাহজাদার।

সবিস্ময়ে তিনি প্রশ্ন করলেন—এ ফকীরটি কে জান ?

—নাম শুনলাম সারমাদ। নাঙ্গা হয়ে থাকেন। ভালবাসেন এক বালককে। লোকে খারাপ কথা বলে—তিনি গ্রাহ্য করেন না। তিনি বলেন—মৃত্যুকে আমি ভয় করি না। এবং অভয়চাঁদই আমার এই দুনিয়ায় প্রত্যক্ষ ঈশ্বর। আমি তার প্রেমেই দিওয়ানা।

—সারমাদ ? অভয়চাঁদ ?

অভয়চাঁদই তাঁর দুনিয়ার প্রত্যক্ষ ঈশ্বর ! তার প্রেমেই ফকীর সারমাদ দিওয়ানা।

“নাম-ই জানম্ দারিন চর্খ ই কাহন দায়র।
খুদা ইমান অভয়চান্দস্ত ইয়া ঘয়ের।”

বত্রিশ

শিরিনের কণ্ঠ বরাবরই সুকণ্ঠ। সে সুকণ্ঠী গায়িকা হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছিল সে-কালে বাদশাহের কাছে।

তার সেই সুকণ্ঠ যেন সুন্দর থেকে আরও কিছু বেশী হয়ে উঠেছে। সংগীতের আনুষঙ্গিক যত বিশেষণ আছে তাতেও যেন এই বেশীত্বটুকুর সঠিক অভিব্যক্তি হয় না। এ গান যেন ঠিক মাটির দুনিয়ার গান নয়, এ যেন স্বর্গীয় কোন কণ্ঠের গান। শিরিন একেবারে যেন সমাহিত হয়ে গাইছিল। শুনছিলেন শাহজাদা দারা সিকো।

তাঁর একপাশে নাদিরাবানু বেগম অন্যপাশে বেগম রানাদিল।

যমুনাগর্ভের জলধারাকে পাশে রেখে তাঁর সেই অনেক শখের তাওয়াখানায় বসে গান শুনছিলেন।

নাদিরাবানুর কাছে ওই গানের কয়েক ছত্র শুনে শাহজাদা যেন চমকে উঠেছিলেন। এ যে তাঁরই অন্তরের অব্যক্ত বাণী—একান্ত গোপন মর্মযাতনা—যা তিনি অনুভব করেন অথচ ভাষায় ঠিক প্রকাশ করতে পারেন না। সে-বাণীকে সে-মর্মযন্ত্রণাকে কে এমন করে কথায় ছন্দে অপরূপ করে প্রকাশ করলে?

শাহজাদা ব্যাকুল হয়ে বলেছিলেন—শিরিনকে ডাকো।

শিরিন এসেছে।

আপাদমস্তক তার দিকে তাকিয়ে দেখে শাহজাদা বলেছিলেন—শিরিন!

বারবার অভিবাদন করে শিরিন বলেছিল—হ্যাঁ মহামান্য শাহজাদা শাহবুলন্দ ইকবাল—দুনিয়াতে খুদা এবং ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সেবক—আমি শিরিনই বটে।

—আমি তো শুনেছিলাম তুমি বানারসে নাচাগানার কারবার নিয়ে সুভগের সঙ্গ ছেড়ে তাকে তালাক দিয়েছ।

—তালাক নয় শাহজাদা। আমরা দুজনে দুজনকে বরদাস্ত করতে পারি নি। যতদিন আমাদের সন্তান হয় নি ততদিন—

—সে সব আমি শুনেছি শিরিন। তুমি ইসলাম আঁকড়ে ছিলে—সুভগ হিন্দুধর্ম আঁকড়ে রইল। সে শুনেছি। কিন্তু হঠাৎ এই গান নিয়ে তুমি দেওয়ানার মত ভিখারিনীর মত কোত্থেকে এলে! এ তো কোন নাচগানওয়ালীর গান ঠিক নয়—

"তান্-হা না হামিন দায়ের উ হারেম, খানা ই উস্ত
ইয়েন অর্জ-উ সামা তামান-কাশানা ই উস্ত,
আলম হামা দিওয়ানা আফসানা উস্ত
আকিল বুদ আন কাসে কি দিওয়ানা উস্ত।"

এ তো আমারই মনের কথা। ঠিক এমনি করেই তো আমি বলতে চেয়েছিলাম কিন্তু পারি নি। এ গান কি করে পেলে? কার কাছে পেলে?

—আমার নতুন গুরুর কাছে হজরত।

—তোমার নতুন গুরু?

—হ্যাঁ হজরত।

—তিনিই কি সেই আকিল?

—জানি না হজরত। তবে তিনিই আমার গুরু। দিল্লীর লোকে—তাঁকে গোঁড়া মুসলমান যারা তারা—ঘেন্না করে। বলে তাঁর গুনাহের আর শেষ নেই। মোল্লা মওলবীরা তোওবা উচ্চারণ করেন। তিনি একদম নাঙ্গা। উলঙ্গ ফকীর তিনি। তবু তাঁকে দেখে আমার কোন শরম হয় নি; আমি অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিলাম প্রথম দিন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন আমার মনের প্রশ্ন। হজরত, প্রশ্ন শুধু আমার মনেই ছিল না, প্রশ্ন আরও অনেক লোকের মনেই ছিল। কিন্তু তিনি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আমার দিকেই এগিয়ে এলেন। এসে গাইলেন—

"আনকাস্ কে তুরা কর-এ-জাহানবানী দাদ
মা-রা হমা আসবাবে-এ পরিসানি দাদ
পশামদ লিবাস-এ হর কে-বা আয় বি বুদ
বে আয়বান রা-লিবাসে উরিয়া নি দাদ।"

দারা সিকো চমকে উঠে বললেন—এই বললেন?

—হ্যাঁ হজরত।

সবিস্ময় মুগ্ধতার মধ্যে যেন আত্মহারা হয়ে গিয়েই শাহজাদা বলে গেলেন—কি অপূর্ব উত্তর! দুনিয়ার দারিদ্র্য আর দুশ্চিন্তা। সর্বরিক্ত ফকীর তো। "পৃথিবীতে যাদের জীবনে আছে পাপ অন্তরে আছে কুটিলতা তিনি তাদের জন্য দিয়েছেন পোশাক আর পরিচ্ছদ। জীবনে যার পাপ নেই অন্তরে যার কুটিলতা নেই তিনি তাদেরই দিয়েছেন নগ্নতা।" সত্যই তো কি প্রয়োজন তাঁর পরিচ্ছদের? তাই তো!

শিরিন বললে—হজরত, আমি অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম—কখন যে তাঁর সামনে নতজানু হয়ে বসেছি সে আমি নিজেই জানতে পারি নি বুঝতে পারি নি। হাত জোড় করে তাঁকে বললাম—আমার যে অনেক গুনাহ হজরত। গুনাহগারির যে শেষ নেই। তিনি আমার মাথার উপর হাত রেখে বললেন—কি হয়েছে তাতে? এ দুনিয়ায় কোন কালে কোন মানুষ গুনাহগারি থেকে মুক্ত? বল বেটী—পাপ কে করে নি। বল বেটী—দুনিয়াতে গুনাহগারি থেকে সরে থেকে কি বাঁচা যায়?

"নাকদরে গুনাহ দ'র জহান কিস্ত বাগো
ওয়ানবস গুনাহ নাকর্দ চুন জিস্ত বাগো!"

শাহজাদা দারা সিকোও যেন অভিভূত হয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ক্লান্ত কণ্ঠে বললেন—এই অমৃতবাণী শুনবার জন্য আমার চিত্ত উন্মুখ হয়ে ছিল। শিরিন, সেই বাণীর সন্ধান তুমি আমাকে এনে দিলে। আমার মনে হচ্ছে এঁকেই যেন আমি খুঁজ ছিলাম।

শিরিন বললে—হজরত, তিনি আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন।

—তিনি তোমাকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন? আমার কাছে? কেন?

—তাঁর এক জিজ্ঞাসা আছে শাহজাদা। সে জিজ্ঞাসা কার কাছে রাখবেন তাই তিনি ভাবছিলেন। সারা হিন্দুস্তান সে মানুষকে তিনি খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। আমাকে বললেন—শিরিন, অনেক মুল্লা দেখলাম, মৌলভী দেখলাম, ফকীর দেখলাম দরবেশ দেখলাম; পণ্ডিত দেখলাম ব্রাহমণ দেখলাম সাধু দেখলাম সন্ত দেখলাম; পাদরী দেখলাম জেইস্যুট দেখলাম কিন্তু সেই মানুষকে খুঁজে পেলাম না। তাকে খুঁজে পেলাম না। ইরান থেকে তিনি এসেছিলেন ব্যবসা করে সোনা রূপা হীরা জহরতে দৌলত রোজগারের জন্যে। সেই রোজগার দিয়ে তিনি ভেবেছিলেন তার কলেজার পিজরায় পুষবার জন্যে এক অপূর্ব চিড়িয়া কিনবেন। এদেশে যখন এলেন তখন সে চিড়িয়া হারালো। তিনি ভুলে থাকতে চাইলেন সওদাগরি নিয়ে। করাচী থেকে লাহোর ইলাকায় সওদাগরিতে তার নাম ছিল—খুব বড় নাম।

—কি তার নাম?

—সে নাম ছিল তাঁর সৈদ মহম্মদ।

—হাঁ। সে নাম আমি শুনেছি। ইরানের মুক্তা আর গালিচার কারবারে খুব বড় ভারী সওদাগরই সে ছিল। তার কাছ থেকেই একটা পায়রার ডিমের মত নিটোল মুক্তা কিনে এনে আলাহজরতকে নজরানা দিয়েছিল তোমাদেরই রাজৌরীর মহারাজা। সে মুক্তা বাদশাহের বহুৎ নজরে ধরেছিল। তিনি আরও মুক্তা চেয়েছিলেন। কিন্তু সৈদ মহম্মদের কোন খোঁজ মেলে নি। এক বানিয়া লৌণ্ডাকে নিয়ে সে নাকি দেওয়ানা হয়ে গিয়েছে।

শিরিন বললে—হাঁ শাহজাদা, সেই হিন্দু লৌণ্ডার নাম অভয়চান্দ।

অভয়চান্দকে নিয়ে তাঁর সমাদরের শেষ নেই। তাকে নিয়ে কোন শরম নেই। উঁচু গলায় সকলকে বলেন—

"নাম-ই জানম দারিনচর্খ-ই কাহনদায়য়
খুদা ই-মান অভয়চান্দস্ত ইয়া ঘয়ের!"

ধীরে ধীরে দারা সিকো উচ্চারণ করলেন—"খুদা-ই-মান অভয়চান্দস্ত ইয়া ঘয়ের!"

—হাঁ শাহজাদা। একথা তাঁর মুখে লেগেই আছে। 'খুদা-ই-মান অভয়চান্দস্ত ইয়া ঘয়ের।'

স্তব্ধ হয়ে রইলেন শাহজাদা।

নাদিরা বেগমসাহেবা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মৃদুস্বরে বললেন—শাহজাদা!

দারা সিকো নিজের মধ্যে মগ্ন হয়ে গেলেন। গভীর চিন্তার মধ্যে ডুবে গেছেন।

নাদিরা বেগম আবার তাঁকে ডাকলেন—শাহজাদা!

তাঁর অঙ্গ স্পর্শ করলেন। রানাদিলও ওপাশ থেকে ডাকলেন—শাহাজাদা! জনাব!

তাঁদের দিকে ফিরে তাকালেন এবার দারা সিকো।—কিছু বলছ?

নাদিরা বললেন—বলছি শাহজাদা। তার জন্য আপনার কাছে অনুমতি চাচ্ছি।

—বল।

—জনাব! এ কথা যে বলে সে হয় ফিরিস্তা নয় শয়তান। জনাব, আপনি এ লোকের সঙ্গে—

—এ লোকই যে আমি খুঁজছিলাম নাদিরাবানু।

—জনাব, আপনার তিসরা ভাই আগ্রাতে হাজির রয়েছে। আপনার এই তাওয়াখানাতেই এসে ঝঞ্ঝাট বাধিয়ে আলাহজরতের অপ্রিয় হয়ে আপনাকেই অভিসম্পাত করছে। আপনি শিরিনের কথায় কান দেবেন না। আমি কুক্ষণে ওর ওই প্রথম গান শুনে

আপনার কাছে ছুটে এসেছিলাম—ওকে নিগমবোধে ঢুকতে দিয়েছিলাম।

দারা সিকো উত্তরে কোন কথা বললেন না।

শিরিনের মুখের দিকে শুধু তাকিয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ পর বললেন—তার এক ফরিয়াদ আছে বলছিলে তুমি শিরিন। না?

—হাঁ হজরত। আমি তাঁর কাছে আপনার কথা বলেছিলাম। আপনার কথা বহুজনেই তাঁর কাছে বলেছে। হিন্দুস্তানের শাহজাদা শাহবুলন্দ ইকবাল দয়ালু ধার্মিক দারা সিকোর কথা কে না জানে! তিনিও জানতেন। তবু আমার কাছে যখন শুনলেন সুভগ হিন্দু আমি মুসলমানী হয়েও কারুর জাত না খুইয়ে আমরা ঘর বেঁধেছিলাম আর সে ঘর বাঁধতে ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন আপনি—আপনি বলেছিলেন পাশাপাশি ঘরে বা বেদীতে থাকবে কোরান শরীফ আর ভাগবত—আমি পড়ব নামাজ সুভগ করবে আরতি তখন তিনি বললেন—শিরিন, আমার এক ফরিয়াদ আছে—সে ফরিয়াদের কোন জবাব আমি কোথাও পেলাম না। কেউ দিতে পারলে না। যে শুনলে সেই আমাকে গাল দিয়ে ভয়ে কানে আঙুল দিয়ে চলে গেল। তুমি এই শাহজাদার কাছে নিয়ে যাবে আমার এই ফরিয়াদ?

—বল কি তাঁর সেই ফরিয়াদ।

শিরিন বললে—হজরত, কাবার যে কালো পাথরখানি খুদার ভক্তেরা মাথায় ঠেকায় চুম্বন করে—আর হিন্দুদের মন্দিরে যে কালো পাথরের বিগ্রহ আছে এ দুইই কি পাথর নয়—আর দুই পাথরই কি এক নয়?

নাদিরা বেগম অস্ফুট কঠিন স্বরে বলে উঠলেন—চুপ শিরিন চুপ। চুপ করে যা তুই। বাঁদী, আমি বলছি, তুই চুপ কর্! শি—রি—ন!

শিরিন স্তব্ধ হয়ে গেল।

দারা সিকোও চুপ করে রইলেন।

অনেকক্ষণ স্তব্ধতার পর শাহজাদা বললেন—এক। কাবার কালো পাথর আর হিন্দু মন্দিরের কালো পাথরের বিগ্রহ দুই-ই পাথরের। আর দুই পাথরই এক। দুই সত্য—সমান সত্য। ঈশ্বর যেমন সত্যনাম খুদা তেমনি সত্যনাম—ঈশ্বর খুদা এক অভিন্ন। তাঁর মূর্তি নাই এ যেমন সত্য তাঁর অনন্তমূর্তি অনন্তরূপ এও তেমনি সত্য। সমান সত্য কাবার কালো পাথর মন্দিরের কালো পাথরের মূর্তি—এক—এক।

—শাহজাদা—!

—ভয় পেয়ো না নাদিরা। কিসের ভয়? কেন ভয়? ভয় নেই। সেই জিন্দিগী সেই দুনিয়াকে জাগাতে হবে। শুনতে পাচ্ছ না? ফকীর আমাকে ডাক দিয়েছেন। আমি যাব। আমি দিল্লী যাব। সারমাদকে দেখে আসব। তাঁকে সালাম দিয়ে আসব।

তেত্রিশ

দিল্লী শহরের উপকণ্ঠ, তোগলকাবাদের এক প্রান্তে মানুষজন নারী পুরুষ বালক বৃদ্ধের একটা ভিড় লেগে গিয়েছে। দল বেঁধে সকলে চলেছে তোগলকাবাদের ওই এক প্রান্তের দিকে। এক সিদ্ধ ফকীরসাহেবের আবির্ভাব হয়েছে সেখানে। ফকীর শহরে যান নি। তিনি বাসা বেঁধেছেন নির্জনে। কিন্তু লোকে ছাড়বে কেন? মধু যেখানে থাক মৌমাছি তার সন্ধান পাবেই এবং ছুটে সেখানে যাবেই।

তখন শাজাহানাবাদ তৈরি হচ্ছে—লালকেল্লা জুমা মসজেদ এসব প্রায় শেষ হয়ে এসেছে—নতুন শহরের চারিপাশে দেওয়ালবন্দী তৈরী হচ্ছে, মধ্যে মধ্যে ফটক তৈরী হয়েছে; দিল্লী ফটক কাশ্মীরী ফটক আজমীরী ফটক তুর্কমান ফটক লাহোর ফটক—যত যত বড় বড় সড়ক এসে দিল্লী পেঁ ৗছেছে ফটকও প্রায় ততসংখ্যক তৈরী হয়েছে। ফটকের বাইরের দিকে সরাইখানা তৈরী হচ্ছে হয়েছে যাতে করে বিদেশ থেকে আগন্ত লোকেরা রাত্রির জন্য বাইরে অপেক্ষা করতে পারে। রাত্রি প্রথম প্রহর যেতে যেতেই সব ফটক বন্ধ হয়ে যাবে, ভিতর দিকে বাদশাহী সিপাহীরা পাহারা দেবে। সপ্তদশ শতাব্দী—তখনকার কালে ছদ্মবেশী শত্রু লুটেরা দস্যু এ সবের অভাব ছিল না।

নতুন শহরের বাইরে পুরানো কেল্লার দিকে তখন শহরের গুরুত্ব ক্রমশঃ যেন কমে আসছে; সকলেই গিয়ে জায়গা পেতে চাচ্ছে নতুন শহর শাজাহানাবাদের মধ্যে। বড় জলুসের এবং বাহারের শহর তৈরি করছেন বাদশাহ শা-জাহান।

বাদশা তো বাদশা বাদশাহ শা-জাহান; খাঁটি শাহ-ইন-শাহ—শাহানশাহ। বাদশাহের তাজের মাথায় বসানো আছে এক হীরে যার নাম কোহিনূর। সে হীরের উপর আলো পড়লে তার যে

ঝলক সে ঝলক কেউ চোখে নিতে পারে না। দরবারের জন্য বাদশাহী তক্ত তৈরি করিয়েছেন ময়ুর সিংহাসন; এমন সিংহাসন সারা তুনিয়ার মধ্যে কোন মুল্কের দরবারেই নেই।

বাদশাহের শাহীবেগম মমতাজ বেগমসাহেবার এক কবর তৈরি করাচ্ছেন যার জোড়া আর তুনিয়ায় কখনও ছিল না আজও নাই—এবং লোকে বলে কখনও হবে না।

কেল্লা তৈরি করাচ্ছেন দিল্লীতে—লালকেল্লা। জুমা মসজেদ তৈরি করাচ্ছেন। এদেরও জোড়া তুনিয়ায় মেলে না। লালকেল্লার ফটকের সামনে থেকে রাস্তা তৈরি করিয়েছেন—সোজা সিধে চলে গেছে, রাস্তার মাঝখানে শহর—তুই দিকে বাঁধের উপর চলার পথ। তার তু'পাশে নতুন শহর নতুন বাজার চৌক বাজার তৈরী হচ্ছে। হচ্ছে নয় তৈরী হয়েই গেছে প্রায়। কাজেই পুরানো কেল্লার অঞ্চলটা যেন কানা পড়ে গেছে। তবে বাদশাহী দপ্তরের অনেক দপ্তর এখনও ওই পুরানো কেল্লাতেই আছে।

এই পুরানো কেল্লাকে ঘিরে যে পুরানো শহর—যে শহর মথুরা সড়কের তু'পাশে গড়ে উঠেছে, সেই শহরটাই সেই শের শা বাদশাহের আমল থেকে হিন্দুস্তানের রাজধানী ছিল—সে শহর কিছুটা মলিন হলেও তার গৌরব এখনও যায় নি। এই শহরেরই দক্ষিণ প্রান্তে হুমায়ুন বাদশার সমাধি, নিজামুদ্দিন আউলিয়ার দরগা এবং বহু বাদশাহ বংশধর ও আমীর ওমারহের সমাধি। এরই পাশ দিয়ে ডান দিকে পশ্চিম মুখে বেঁকে চলে গেছে এক সড়ক, সেই সড়কের পাশেই পড়ে তোগলকাবাদ। পাগল বাদশাহ মহম্মদ তোগলক তৈরি করিয়েছিলেন এই শহর। এও দিল্লী শহর। দিল্লী শহর যে কতবার কতজনে গড়েছে আবার কাল তাকে কতবার ভেঙেছে তার ঠিকঠিকানা নেই।

লোকে বলে রাজঘাটে পাণ্ডবদের রাজসূয় যজ্ঞ হয়েছিল। ওখানেই ছিল ইন্দ্রপ্রস্থ নগর। পৃথ্বীরাজ যখন দিল্লীর অধিপতি তখন

দিল্লীর অবস্থিতি ছিল কুতুবমিনার যেখানে সেখানে। খিলজী বংশের ইমারতগুলো এখনও অটুট রয়েছে। এবং সেখানেও লোকজন বাস করছে—বাজার হাটও রয়েছে।

পথে পড়ে এই তোগলকাবাদ; তোগলকাবাদে লোকজনে ভিড় করে চলেছে। সাধারণ গৃহস্থ থেকে শেঠ আমীর পর্যন্ত—হিন্দু চলেছে মুসলমান চলেছে।

সকলে চলেছে ফকীরকে দর্শন করতে।

আশ্চর্য এক ফকীর এসেছেন। এমন আশ্চর্য মানুষ নাকি কেউ দেখেনি। আশ্চর্য নাকি তাঁর ক্ষমতা। আশ্চর্য নাকি তাঁর রূপ। এবং আশ্চর্য নাকি তাঁর সাধনা।

শোনা যায় তাঁর এক শিষ্য আছে—সেই শিষ্যের মধ্যে ঈশ্বর এসে আবির্ভূত হন।

খুদা আসেন। তার সঙ্গে কথা বলেন।

কেউ বলে—খুদা, কেউ বলে—খুদা হতে পারেন না খুদা নন, তিনি দেবদূত।

কেউ বলে—না, খুদাও নন দেবদূতও নন—ওই শিষ্যের মধ্যে এসে আবির্ভূত হন হিন্দুদের নওলকিশোর। কখনও কিশোর কখনও কিশোরী।

ছেলেটাকে কখনও ছেলের মত সাজান। কখনও মেয়ের সাজে সাজান। তিনি মুখে মুখে অনর্গল রুবাই গজল রচনা করেন, তাঁর শিষ্যকে শেখান, শিষ্য সেই গান গেয়ে যায়। সে গান নাকি এমন গান যে, যে শোনে সেই আত্মহারা হয়ে যায়। যে শোকতপ্ত সে শোক ভুলে যায়, যে দুঃখী সে দুঃখ ভোলে, যে অহংকারী সে অহংকার ভোলে, এমন কি বিষধর সাপ যে সাপ সে সাপও কামড়াতে ভুলে যায়। সব থেকে বিস্ময়কর লাগে মানুষের যে ফকীর একেবারে উলঙ্গ। নাঙ্গা। দিল্লীর প্রখর রৌদ্রে তাঁর শরীরে আবরণের প্রয়োজন হয় না—প্রচণ্ড শীতেও একটুকরা বস্ত্র আচ্ছাদন দেন না

গায়ে। হিন্দু সন্ন্যাসীদের মত ছাইও মাখেন না। হাজার হাজার নরনারীর সম্মুখে তিনি কোন লজ্জাও অনুভব করেন না, এবং সুন্দরী যুবতী মেয়ে দেখেও কোন চঞ্চলতা তাঁর মধ্যে কেউ কখনও দেখতে পায় না।

আশ্চর্য যোগসিদ্ধ পুরুষ। সিদ্ধ ফকীর। ক্ষমতাও তেমনি নাকি বিস্ময়কর।

তাঁকেই দর্শন করতে চলেছে লোকে। ফকীর দিল্লীতে এসেছেন মাত্র মাস কয়েক, এসে এই তোগলকাবাদের এক প্রান্তে একটা পরিত্যক্ত ভাঙা ঘরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ভিক্ষাজীবী তিনি নন। লোকের বিশ্বাস নিত্য ভোরবেলা তিনি ঘুম থেকে উঠবামাত্র নাকি একজন দেবদূত এসে তাঁকে একটি স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে যায়, সেই স্বর্ণমুদ্রাটি থেকে তাঁর খরচ-খরচা চলে। তাঁর অনুচরও আছে জন কয়েক। তাঁর চ্যালা।

নিত্য অপরাহ্নে সন্ধ্যার নামাজের সময় পার হলেই তাঁর ওই আশ্রমে রুবাই গজলের এক আসর বসে। ফকীর নিজে হাতে তালি দেন এবং গান করে যান—তাঁর সেই গানের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গান ধরে বেরিয়ে আসে এক আশ্চর্য রূপসী কিশোরী। তার রূপ যেন তৃতীয় প্রহর রাত্রে পূর্ণিমার চাঁদের জ্যোৎস্নার মত গলে গলে ঝরে ঝরে পড়ে। সে গানও গায় এবং সঙ্গে সঙ্গে নাচে। সে-নাচ যে দেখেছে সে বলে জীবন ধন্য হয়ে গেছে—এমন নাচ কেউ কখনও দেখে নি।

অনেকে বলে দিল্লীর বড় বড় বাঈজীরা তয়ফাবালীরা বুরখা পরে মুখ ঢেকে নিজেদের পরিচয় গোপন করে এখানে এসে ওই নাচ দেখে গেছে। এবং লজ্জা পেয়েই ফিরে গেছে।

লজ্জা পেয়েছে রূপের কাছে।

তার চেয়েও লজ্জা পেয়েছে তার নাচের কাছে।

অথচ এ কিশোরী কিশোরী নয়, এ হল সেই কিশোর।

এর নাম নাকি অভয়চান্দ।

ফকীর বলেন ওই অভয়চান্দই তাঁর ঈশ্বর। সেই যদি না হবে তবে ঈশ্বরকে দেবার জন্য যে সমুদ্রের মত ভালবাসা সে ভালবাসা ঢেলে দিলাম তাতেও অভয়চান্দ ভেসে গেল না কেন? আমি যখন যেমন রূপে তাকে দেখতে চাই ঠিক সেই রূপেই তাকে দেখতে পাই কেন?

মুসলমান উলেমা মৌলবীরা বলে—কাফেব। অবিশ্বাসী অধার্মিক।

হিন্দু পণ্ডিত শাস্ত্রজ্ঞেরা বলে—যবন—সমকামী কামুক। পাপিষ্ঠ।

ফকীরের মুখের উপরেও একথা বলেছে—ফকীর হেসেছেন। কোন উত্তর দেন নি। তবে তিনি নাকি বলেন—।

* * *

জনতার ভিড়ের মধ্য দিয়ে চলেছিলেন জনকয়েক অশ্বারোহী। অশ্বারোহীদের মধ্যে অধিকাংশই সওয়ার সিপাহী। ছুজন অশ্বারোহীকে দেখেই বোঝা যাচ্ছিল যে তাঁরা পেশাদার সওয়ার সিপাহী নন—তাঁরা বিশিষ্ট ব্যক্তি। ব্যক্তিত্বের ছাপ আছে মুখে চোখে। পোশাকে পরিচ্ছদেও পরিচয় আছে। তাঁরা আমীর বা শেঠ সওদাগর বলে মনে হচ্ছিল। একজন মুসলমান একজন হিন্দু। অবশ্য তাঁদের দল ছাড়াও আরও অনেকে ছিলেন যাঁরা ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছিলেন। পায়ে হেঁটে চলছিল মানুষ, ঘোড়ায় চড়ে চলছিল মানুষ, ডুলিতে চলছিল মানুষ, বয়েল-গাড়িতেও চলছিল মানুষ। এরই মধ্যে ওই দলটি সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট এবং দেখলেই বোঝা যায় যে মুল্কের সরকারের সঙ্গে এদের সম্পর্ক আছে।

হিন্দু এবং মুসলমান বিশিষ্ট ব্যক্তি ছুটি পরস্পরের মধ্যে কথা বলতে বলতে চলছিলেন। ওই মুসলমান আমীরটিই বললেন—হ্যাঁ শুনেছি, বাদশাহও এ কথা শুনেছেন—ফকীর নাকি বলে—আমি ইহুদীও বটে আমি মুসলমানও বটে আমি কাফের হিন্দুও বটে।

আমি ইহুদীও নই আমি মুসলমানও নই আমি হিন্দুও নই। এ কথার অর্থ কি?

হিন্দু বিশিষ্ট জনটি বললেন—হাঁ খাঁসাহেব, এই কথাই বলে ফকীর। এর মানে কি এ কথা লোকে বুঝতে পারে না কিন্তু অবাক হয়ে যায়। ওর মধ্যে অবাক হবার মত কিছু আছে।

মুসলমান আমীরটি বললেন—শাহজাদা দারা সিকো এ খবর পেয়ে অবধি যাকে বলে ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন; তাঁর ধারণা ইনি এসেছেন সেই 'পীর' যাঁর প্রতীক্ষা করছেন তিনি। যাঁর সঙ্গে যোগাযোগ হলে এই যে মিট্টির তুনিয়া এই মিট্টির তুনিয়ার রঙ বদলে যাবে রস বদলে যাবে—বিলকুল সব বদল হয়ে যাবে। এই যে মানুষে মানুষে হিংসা—এই মানুষে মানুষে হানাহানি—এই যে অন্ধকার, এই যে পাপ এ সবের আর কিছুই থাকবে না। হিন্দুস্তানে হিন্দু আর মুসলমানের মধ্যে যে এই ঝগড়া এ সব মিটে যাবে। তুনিয়া বেহেস্ত হয়ে উঠবে। কথাটা শেষ করে হাসলেন তিনি।

হিন্দুটি এবার বললেন—শাহজাদা তো নিজেকে নতুন পয়গম্বর বলেন শুনেছি।

—চুপ করুন।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন—দেখুন আমি মুসলমান কিন্তু ওই সব গোঁড়া মোল্লা মৌলভীদের মত নই। কিন্তু কথাটা শুনলে আমার সমস্ত অন্তরটা রি-রি করে ওঠে। পয়গম্বর! রসুলে আল্লা! খোদা মেহেরবান আমাদের উপর দয়া করুন। আমাদের অপরাধ ক্ষমা করুন। এ কথা শুনলেও পাপ হয়।

হিন্দুটি বললেন—বুঝতে পারছি আপনার মনের কথা। এই যে ঠিক সেই রকমই আমাদের হিন্দুদের মনে হয় যখন এই ফকীর ওই একটা বেনিয়ার লেড়কা ওই অভয়চান্দকে বলে নওলকিশোর। অবশ্য নিজের কানে কখনও শুনি নি।

মুসলমানটি বললেন—চলুন আজ নিজের কানে শুনবেন চোখে দেখবেন—যাচাই করবার সুযোগ পাবেন।

—হ্যাঁ চলুন।

মুসলমানটি বললেন—শাহানশাহ বড় ছেলে আর বড় মেয়ের স্নেহে একেবারে অন্ধা হয়ে গেছেন। বাদশাহ শাজাহানকে কেউ কখনও অধার্মিক অমুসলমান বলতে পারবে না। এক তাঁর ঔরং নিয়ে কিছু গুনাহ আছে। না হলে তিনি তাঁর বাপ জাঁহাগীর বাদশার মত মদ খান না—হিন্দু যোগীদের নিয়ে মাতামাতি করেন না—

বলতে বলতে থেমে গেলেন, বললেন—মাফ করবেন দ্বিবেদীজী আমার মনে ছিল না—

অর্থাৎ হিন্দু বলে মনে ছিল না।

দ্বিবেদীজী বললেন—না না খাঁসাহেব এতে কিছু মনে করব কেন বলুন। কোন হিন্দু রাজাও যদি এইভাবে মুসলমান ফকীর নিয়ে মাতামাতি করেন তবে অবশ্যই ঠিক এই কথাই মনে হবে আমার।

—হ্যাঁ, এই কারণেই বাদশাহ আমাকে যখন বললেন—ইনায়েৎ খাঁ, একমাত্র তোমাকে আমি বিশ্বাস করতে পারি। কারণ তুমি ইসলামের বিশ্বস্ত মুরীদ, খাঁটি মুসলমান তুমি। অথচ তুমি মোল্লাদের মত গোঁড়া নও। তার সঙ্গে শাহজাদা দারা সিকোর হিতৈষী তুমি। শাহজাদা অধীর হয়ে উঠেছে এই ফকীরের সঙ্গে দেখা করবার জন্য। শাহজাদা দারা সিকো পণ্ডিত—সে মূর্খ নয়—সে কবি, কোরান তার কণ্ঠস্থ—কিন্তু সে বড় ভাবপ্রবণ। তুমি যাও, গিয়ে সে ফকীরকে যাচাই করে এস। আমি তখন বললাম—জাঁহাপনা, এই হিন্দুস্তান মুল্ক বড় আশ্চর্য মুল্ক—তাজ্জবের এলাকা। এখানকার জলে বাতাসে যেন জাদু আছে। এখানে কাফেররা পাথর পূজো করে গাছ পূজো করে, আবার নরঞ্জন ব্রহ্মকেও পূজো করে। পীরকেও প্রণাম করে—

আল্লার কাছেও দোয়া চায়। এখানকার সাধারণ মুসলমানরাও দেখি ওই পাথর গাছ পুতুলের মন্দিলে যায় মানত করে, সে মানত নাকি তাদের পূর্ণও হয়। এই ফকীরকে বিচার করতে একলা আমার ভরোসা হয় না। কোন হিন্দু পণ্ডিতকে আমার সঙ্গে দিন। হিন্দুদের মধ্যে 'নাঙ্গা' ফকীরীর রেওয়াজ আছে। তারা ভিন্ন ধর্মের লোক। কিন্তু তাদের তো আমি জানি। তারা ভণ্ড নয়। এ ফকীর যদি হিন্দুমতেই নাঙ্গা ফকীরী নিয়ে থাকে তবে আমি এর বিচার ঠিক করতে পারব না। তখন বাদশাহ আমাকে বললেন আপনার কথা। বললেন—ত্রিলোচনধারী দ্বিবেদী হলেন একজন মস্ত হিন্দুশাস্ত্রজ্ঞ মানুষ। তাঁর পাণ্ডিত্যে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। তাঁকে জায়গীর দিয়েছি। তুমি তাঁকে সঙ্গে নিয়ে যাও।

—এই এই এই—আরে হটো হটো হটো। তাঁদের সামনের সওয়ারেরা পথের জনতাকে হটিয়ে দিয়ে পথ করে নিচ্ছিল।

দূর থেকে গান ভেসে আসছিল—

তান্-হা না হামীন দা যার হরম খানা-এ-উস্ত—
এইন আরজু সামা তামাম খাসা না-এ উস্ত—
আলম হমা দীওয়ানা আএসানা উস্ত—
আকীল বুদ আন কাসে কে দীনওয়ানা উস্ত।

দ্বিবেদী এবং ইনায়েৎ খাঁ দুজনে একসঙ্গেই বলে উঠলেন—সাবাস! দ্বিবেদী বললেন—অপূর্ব! মন্দির আর মসজেদেই থাক না তুমি, এই মাটি থেকে আকাশ পর্যন্ত সমস্ত কিছুই তোমার আসন, তোমার বেদী, তোমার ঘর। সমস্ত দুনিয়া পাগল হয়ে গেল তোমার স্বরূপ নির্ণয়ের জন্যে। কিন্তু সেই হল রসিক সেই হল জ্ঞানী যে তোমাকে ভালবেসে পাগল হয়।

সাবাস সাবাস সাবাস!

চৌত্রিশ

বিচিত্র দেশ হিন্দুস্তান। হিমালয় পাহাড় গঙ্গা যমুনা সিন্ধু নদনদী গুজরাটের মরুভূমি কাশ্মীরের রূপ এ সব হল বাইরের বৈচিত্র্য, এর কথা নয়। এ দেশে যত সম্পদ যত সমৃদ্ধি তত দারিদ্র্য তত অভাব—এও নয়; এখানে যত শস্য যত ফসল তত অনাহার—এও নয়। এ সব হল আলো আর অন্ধকারের মত সুখ আর দুঃখের মত পাশাপাশি অবস্থান। এ সব দেশেই অল্পবিস্তর আছে। রাজায় রাজায়, ভাইয়ে ভাইয়ে লড়াই সব দেশেই হয়—এ দেশেও হয়। তাও নয়। তবে—।

খাঁসাহেব বললেন—এ দেশের তাজ্জব কি বাত কি জানেন—তাজ্জব কি বাত হল এই নাঙ্গা ফকিরী। এটা অবশ্য আপনাদেরই ছিল—ইসলামে এই নাঙ্গা থাকা হল গুনাহ। খুদা জানোয়ারকে জানোয়ার করেছেন—মানুষ জানোয়ার নয়। জানোয়ারের শরম নাই—বেশরমী; তাদের পোশাকের জরুরৎ নেই। কিন্তু মানুষের আছে। মানুষের নাঙ্গা থাকা গুনাহ—এতে তার অধিকার নেই। কিন্তু যে মানুষ নাঙ্গা হতে পারে সে হল আশ্চর্য মানুষ।

ত্রিলোচন বললেন—পারে দু জাতের মানুষ। সব মানুষ পারে না। এক যারা পাগল। উন্মাদ। আর পারেন তাঁরাই যাঁরা জীবন মৃত্যুকে সমান করতে পেরেছেন—যাঁরা দেহকেই বলেন বন্ধন। যাঁরা পরম সত্য শেষ তত্ত্বকে জেনেছেন তাঁরাই।

ইনায়েৎ খাঁ বললেন—এ লোকটি কি? চোখে দেখে কি একে পাগল বলে আপনার মনে হয়?

—না। আপনি কি ভাবছেন?

—না, পাগল কোনমতেই বলতে পারব না। কিন্তু আপনি কি আপনাদের শাস্ত্র অনুযায়ী বিচার করে সেই সব মহাপুরুষের একজন মনে করতে পারেন যাঁরা নগ্ন থাকতেও লজ্জা সংকোচ অনুভব করেন

না, যিনি দেহকে বন্ধন বলে মনে করেন? দেহের সকল আকর্ষণের ঊর্ধ্বে যাঁরা অবস্থান করেন?

দ্বিবেদী বললেন—লোকটির দৃষ্টি বড় বিচিত্র রকমের খাঁ-সাহেব। এর ভিতরকার সঠিক সত্য আবিষ্কার করা কঠিন।

* * *

অপরাহ্ণবেলা সন্ধ্যার মুখে এসে উপনীত হয়েছে। বেলা ফুরিয়েছে। ফকীর সারমাদ সাহেবের আশ্রমের সম্মুখে তখনও গান এবং নাচ হচ্ছিল। নাচছিল সেই বেনিয়া বালক—সেই অভয়চাঁদ। গানও করছিল সেই; তার সঙ্গে সারেঙ্গী বাজিয়ে গলা মিশিয়ে আরও কয়েকজন মুরীদ সংগত করছিল। শ্রোতা ও দর্শকদের দলের মধ্যে আশ্চর্য একটি শান্ত স্তব্ধতা। তারই মধ্যে একদিকে দাঁড়িয়ে ছিলেন আমীর ইনায়েৎ খাঁ এবং তাঁর সঙ্গী ত্রিলোচন দ্বিবেদীজী।

বাদশাহ সাজাহান ইনায়েৎ খাঁ এবং দ্বিবেদীকে পাঠিয়েছেন ফকীর সারমাদের সত্যকারের মূল্য কি তাই নির্ণয় করবার জন্য। শাহজাদা দারা সিকো ফকীর সারমাদের গান শুনে প্রায় ছোট ছেলের মত অধীর হয়ে উঠেছেন। তাঁর দৃঢ় ধারণা তাঁর জীবনে যে এক মহান উদ্দেশ্য আছে, যে মহান উদ্দেশ্যের সাধনের জন্য খুদা তাঁকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন সেই উদ্দেশ্য সাধনে সাহায্য করবার জন্যই খুদা এই ফকীরকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। খুদা দুনিয়ায় মানুষকে পাঠান দুটো চোখ দিয়ে; সে চোখ দিয়েই শুধু দুনিয়া দেখা যায় না— তার জন্যে দরকার হয় আলোর। আকাশে সূর্য ওঠে, সারা দিনটা দুনিয়াকে আলো করে রাখে, তখন মানুষের চোখ দুনিয়াকে দেখে তাকে চেনে, পথ রচনা করে তারপর সেই পথে চলে—আর দুনিয়ার তামাম মুসাফেরকে বলে—এসো মুসাফের, এই হল পথ— এসো, এই পথে এসো। মধ্যপথে দিন শেষ হয়, রাত্রি নামে, দুনিয়া আঁধারে ডুবে যায়, মুসাফেররা ভয় পায়, চোখ বন্ধ করে বসে থাকে অথবা মারামারি করে হানাহানি করে; তখন ওই পথিকৃত মানুষ

ডাক দিয়ে বল্লে—'ভয় নাই ভয় নাই। এই পথ—এই পথে এসো।'
তাকে সাহায্য করবার জন্য খুদাতয়লা পাঠান দেবদূতদের, ফেরেস্তাদের ; তারা দুনিয়ায় এসে কাঠে কাঠে ঘষে জ্বালিয়ে তোলে আগুন ; আগুন থেকে হয় আলো। সেই আলো হাতে চলে সে মশালচীর মত—তার পিছনে পিছনে চলে যে জন্মেছে মানুষকে ডাক দেবার জন্যে—যার গলার আওয়াজে মানুষ বাঁশীর সুর শুনতে পায় সেই ডাকদেনেওলা মানুষ।

দারা সিকো হিন্দুস্তানে আজ সেই মানুষ। তিনি নিজে তাই মনে করেন। তাই বলেন। খুদা তাঁকে পাঠিয়েছেন তাঁর কাজ করবার জন্য।

চাঘতাই ঘরানার মুঘল সম্রাটবংশ স্থাপন করেছিলেন বাবর শাহ। বাবর শাহের পর হুমায়ুন বাদশাহের আমলে সে বাদশাহী একবার ভেঙে পড়তে বসেছিল আবার বিচিত্রভাবে ভাঙতে ভাঙতে গড়ে উঠেছিল। হুমায়ুন বাদশাহের পর বাদশাহ জালালউদ্দীন আকবর শাহ।

সারা হিন্দুস্তানে সেই খিলজীবংশের সময় থেকে এ পর্যন্ত মুসলমান আর হিন্দুর লড়াই নিয়ে যে-অশান্তি, যে-রক্তপাত, যে-হিংসা, যে-বিষজর্জরতা এমন একটি আশ্চর্য শান্তিতপোবনের মত দেশটিকে অভিশপ্ত এবং উত্তপ্ত করে রেখেছে যে তার জন্য খুদা নিজে পীড়া অনুভব করেছিলেন ; তিনি নিজে এ দেশকে, এ দেশের মানুষকে এ উত্তাপ এ বিষ থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন।

মুসলমান সেই, ইসলাম সেইখানেই, যেখানে খুদার প্রতি ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্য আছে ; যেখানে ন্যায় আছে যেখানে করুণা আছে যেখানে তপস্যা আছে যেখানে সত্য আছে যেখানে সাধনা আছে। কাফের তারাই যারা সারা দুনিয়ার মানুষকে অধর্মী দেখে বিধর্মী দেখে—যারা স্বার্থপর যারা কুটিল যারা হিংসায় জর্জর তারাই কাফের। বিধর্মী অবিশ্বাসী।

পাঁচওয়াক্ত নামাজ পড়ে আর গোপনে গোপনে গুনাহগারী করে কোরানের বয়েৎ রপ্ত করে মুল্লা মৌলবী সাজা যায় কিন্তু তার হুকুমতে বেহেস্তের দরওয়াজা খোলেও না বন্ধও হয় না। তাদের সীলমোহর দস্তখতে বেহেস্তের ছাড়পত্র তৈয়ার হয় না।

এই হিন্দুস্তানে তিনি পয়দা হয়েছেন হিন্দুদের অবতারের মত। ইসলাম মতে তিনি নতুন ধর্মের পয়গম্বর অথবা ইসলামেরই নতুন ব্যাখ্যাকার।

একদিন রাত্রে।

ইনায়েৎ খাঁ বললেন—শাহজাদাকে এক 'হাতিফ' একদিন রাত্রে দেখা দিয়ে বলে গেছে খুদা মেহেরবান খুদা কদরদান—তিনি তোমাকে যে মেহেরবানি করেছেন যে কদর তোমাকে দিয়েছেন শাহজাদা দারা সিকো, আজও তক কোন শাহজাদা কি রাজাকে তা দেন নি। দুনিয়ার সমস্ত তত্ত্বজ্ঞান তোমার মনে আপনাআপনি ফুলের মত ফুটে উঠবে। নিত্য নতুন উপলব্ধি হবে। এর জন্য খুদার অনুগৃহীত সাধু সন্তেরা আপনি তোমার পাশে এসে সমবেত হবেন।

দ্বিবেদীজী বললেন—জানি খাঁসাহেব। এ কথা তো আর চাপা নেই। কথাটা তো হিন্দু মুসলমান দুই সমাজের মধ্যে জানাজানি হয়েছে—এ নিয়ে কানাকানির তো শেষ নেই। রাগ গোস্যারও অন্ত নেই। আপনাদের মুসলমান-সমাজে বাদশাহের দরবার থেকে হারেম রঙমহল পর্যন্ত অল্প কিছু লোক বাদে সবাই এতে নারাজ অখুশী। আর আমরাও মানে হিন্দুরাও এতে যে খুশী তা নয়। শুধু সাধারণ বোকা লোকেরা যারা বোকাসোকা মানুষ—কেবলই শান্তিতে নির্ঝঞ্ঝাটে থেকে মনে করে এর থেকে পুণ্য আর হয় না—তারা ছাড়া সকলেই মনে মনে এতে নারাজ। হ্যাঁ, তবে শাহজাদার কল্যাণে তাঁকে ধরে পেড়ে যতখানি নিজেদের স্বার্থটা সিদ্ধি হয়ে যায় ততটা গ্রহণ করতে নারাজ নয়।

ইনায়েৎ খাঁ বললেন—বাদশাহের বড় ছেলে শাহজাদা শাহবুলন্দ

ইকবাল—ওদিকে তাঁর সঙ্গে প্রায় একই মতের হলেন বড়ীবেগম-সাহেবা শাহজাদী জাহানআরা ; সে কারণেই কিছু বলছে না। বাদশাহ সাজাহানের কাছে মুসলমানেরা কৃতজ্ঞ। বাদশাহ আকবর ইলাহী ধর্ম করে তার পয়গম্বর সেজেছিলেন—বাদশাহ জাঁহাগীর তো কিছুই মানতেন না। বাদশাহ সাজাহান তা নন। কিন্তু বাদশাহ যে কেন শাহজাদাকে কিছু বলেন না, কেন তাঁকে বোঝান না তা জানি না। ধর্মের ব্যাপারে মুসলমানেরা এক কালিফ ছাড়া কোন রাজা বাদশাকে মানে না। শাহজাদা ঔরংজীব খাঁটি মুসলমান—

—চুপ! অকস্মাৎ ইনায়েৎ খাঁর হাত টিপে ধরে দ্বিবেদীজী বললেন—চুপ!

কোন প্রশ্ন না করে ইনায়েৎ খাঁ তাকালেন দ্বিবেদীজীর মুখের পানে।

—শুনুন। পাশে যারা বসে আছে তারা কি বলছে শুনুন। অত্যন্ত মৃদু স্বরে বললেন দ্বিবেদীজী।

—কি বলছে? ইনায়েৎ খাঁও মৃদু স্বরে প্রশ্ন করলেন।

—বলছে এই ফকীর সম্পর্কে।

তাঁদের পাশেই বসে ছিল একদল সাধারণ মানুষ। তখনও সন্ধ্যার সবে প্রারম্ভ, দিনের আলো কিছুটা ম্লান হয়ে এলেও একেবারে অন্ধকার হয় নি। তার উপর পশ্চিম দিগন্তে আজ সূর্যাস্তের সময় লাল রঙের ঘোর লেগেছে। সেই আলোয় ইনায়েৎ খাঁ তাদের দেখে চিনতে পারলেন—এরা দিল্লী শহরের মস্তান শ্রেণীর লোক। শক্ত সবল শরীর—মুখে চোখে একটা বেপরওয়া ভ্রূক্ষেপহীন ভাব—তার মধ্যে একটা নিষ্ঠুর হৃদয়হীনতার পরিচয় কি ভাবে যে অভিব্যক্ত হচ্ছে তা ঠিক বুঝে ধরা যায় না তবে ধরা ঠিক যায়।

—বাংলা মুল্কে আমরা বলি পাঁঠা। বোকরাকে আমরা পাঁঠা বলি। উ হারামী তো ওই পাঁঠা বোকরা হ্যায়। শালা ফকীর বন গেয়া। শালা বানিয়া লেড়কাকে লেকে—তোবা তোবা—। থু থু।

একটু ওদিক থেকে একজন বলে উঠল—সাধুদের সম্পর্কে এসব কথা বলো না। তোমার ভালো না লাগে তুমি চলে যাও।

এই লোকটি ব্যঙ্গভরে বললে—শুনতে যদি খারাপ লাগে তো কানে তুলো লাগাও মিঞা। সত্যি কথা এমনি মনে হয়। ওই লোকটাকে আমি চিনি—ওর নাম মহম্মদ সৈদ—ও আগে থাট্টায় সওদাগরি করত। আর ওই বাচ্চাটার নাম অভয়চাঁদ। ও হল এক বানিয়ার বাচ্চা। ইরানের ওই সওদাগরটা পহেলা নম্বরকে লুচ্চা।

অন্য একজন বললে—চুপ মিঞা, কি দরকার তোমার ওর সঙ্গে তকরার করে?

—সে কথা ওই মিঞাকে বল, আমাকে বলছ কেন। আমি সত্যি কথা বলছি। আমি নিজে জানি। ওই সৈদ মহম্মদকে জানি; থাট্টাতে ও মিঞা ইরান থেকে আসা চোরাই নৌকা থেকে গালিচা মুক্তা খালাস করত। আমার নৌকার কারবার ছিল—আমি ওর কাম করেছি। আমার সঙ্গে শেষ পর্যন্ত লোকটা বেইমানি করেছে—ছোট আদমীর মত ব্যবহার করেছে।

—চুপ হো যাও ভাই। এখানে মিছিমিছি ঝগড়া বাধিয়ে কি লাভ?

—আরে মিঞা, লাভের হিসাব থাক—লাভ না হোক নুকসানটাই বা কোথায় বলো? আমি কাউকে ভয় করে বাত বলি না। দেখ মিঞা, আমার জিন্দগীতে মার খেয়েছি তো কম না, খেয়েছি অনেক; আবার মেরেছি তাও কম না। মোট কথা যার সাহস তারই জিত। জিন্দাবাদ তো তাকৎকে জিন্দাবাদ। মুর্দাবাদ তো ডরকে, ডরপোক্‌নাকে মুর্দাবাদ। আমার কোমরে এই যে দেখছ দাও একে আমাদের দেশে বলে রামদাও। বাংলা মুল্কের গোষ্ঠ কামারের হাতের তৈরী 'রামদাও'। এ তো কম লোকের খুন করায় নি। মুণ্ডুও অনেক গড়িয়ে পড়ে গেছে। আমাকে ওই মহম্মদ সৈদ অনেক

অপমান করেছে। ওর সঙ্গে থাট্টায় আমার ঝগড়া হয়েছিল। তারপর—

চুপ করে গেল সে।

একজন বললে—থামলে কেন?

—মেরা খুস।

—তুমারা খুস?

—তো ক্যা?

—বহুৎ আচ্ছা—চুপ রহো বাবা সাব। নেহি তো উঠো হিঁয়াসে।

—জবরদস্তি?

—হ্যাঁ। জোর থাকলেই জবরদস্তি হবে। জোর তোমার একলারই নেই। অন্যেরও আছে।

—থাকলে তার পরখ হয়ে যাক মিঞা। সুলেমান খাঁ তৈয়ার আছে। এস, চলে এস।

বলতে বলতেই লোকটা উঠে দাঁড়াল। তারপর সে যা করলে তা এক উন্মাদ ছাড়া আর কেউ পারে না। লোকটি—যার নাম সে নিজেই বলেছিল সুলেমান খাঁ—উন্মাদের মত চীৎকার করে বলতে শুরু করেছিল—এ মহম্মদ সৈদ থাট্টার সওদাগর—ভণ্ড ফকীর—।

মুহূর্তে সেই অপূর্ব মধুর সংগীতসমৃদ্ধ শান্ত বিমোহিত আসরটি চঞ্চল বিক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। তারাও চীৎকার করে প্রতিবাদ জানিয়ে উঠে দাঁড়াল কিন্তু এই সুলেমান তাতে ভ্রূক্ষেপ করলে না—সে বলেই চলল—বলুক ওই নাঙ্গা ফকীর—সারমাদ শাহ ফকীর বলো—থাট্টার দরিয়ায় নৌকোর উপরে রাত্রে যখন চোরাই চালান খালাস করতে যাচ্ছিলে তখন আমি বলেছিলাম সাহেব মাথার পাগড়িটা খুলে নামাও। নইলে কোন নৌকো থেকে কে কোন্ ফিরিঙ্গী ডাকু কি বাদশাহী নোকর তোমার ওই সাদা পাগড়ি তাগ করে করে বন্দুক দেগে দেবে। ওই মহম্মদ সৈদ আমাকে বেতরিবৎ

বেতমিজ বলে গাল দিয়েছিল। বলেছিল—উল্লুক জানে না শির নাঙ্গা করলে কি শরীর নাঙ্গা করলে ইসলামের মতে গুনাহ হয়। আজ তুমি আমাকে জবাব দাও ফকীর—তুমি এইভাবে আজ নাঙ্গা হয়ে এত আদমীর সামনে বেশরমীর মত দাঁড়িয়ে আছ কি করে? কোন্ ধর্ম অনুসারে? বল!

এর পরও সে চীৎকার করে বলেছিল—সে শুধুই গালাগাল—লম্পট লুচ্চা, লৌণ্ডা নিয়ে লুচ্চামি কর আর নাঙ্গা হয়ে তুমি ঘুরে বেড়াও। তোমার সাজাই কেন হয় না তা বুঝতে পারি না।

জমায়েত জনতার কোলাহলের মধ্যে তার কণ্ঠস্বর ঢাকা পড়ে গেল; সঙ্গে সঙ্গে ক্ষিপ্ত জনতা এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওই পাগলের মত লোকটার উপর। সুলেমানের উপর। সম্ভবতঃ টুকরো টুকরো করে দেবে অথবা থেঁতলে দেবে জাঁতেপড়া ইঁদুরের মত। বহুজনের কণ্ঠস্বর কিন্তু কথা একটাই। সকলেই বলছিল—ছিঁড়ে নাও। ওর ওই বিষাক্ত জিভখানা ছিঁড়ে নাও।

হয়তো তাই হতো। অথবা জিভ ছিঁড়তে গিয়ে আরও মর্মান্তিক কিছু ঘটতে পারত। কিন্তু এই মুহূর্তেই উঠে দাঁড়ালেন ফকীর সারমাদ সাহেব।

পিঙ্গল রুক্ষ চুল পিঙ্গল দাড়ি গোঁফ পিঙ্গল চোখ স্বর্ণাভ দেহবর্ণ—সারা অঙ্গে এক টুকরা বস্ত্র নেই—উলঙ্গ কিন্তু অসংকোচ—প্রসন্ন অথচ উদাসীন। উঠে দাঁড়িয়ে তিনি হাত তুললেন।

—মেহমান লোক! দোহাই খুদার! দোহাই পয়গম্বর রসুলের! দোহাই তোমাদের! মেহমান লোক।

শেষ 'মেহমান লোক' ধ্বনিটি উচ্চারিত যখন হল তখন সারা মজলিস নিস্তব্ধ এবং স্থির ও শান্ত।

কেবল জন চারেক লোক সেই সুলেমান নাম যার তাকে ধরে রেখেছে; সুলেমানের মুখ রক্তাক্ত হয়ে গেছে—মুখের উপর ঘুঁষি কিল চড় পড়েছে, দাঁত ভেঙেছে, নাক থেকে রক্ত পড়ছে, কপাল

ফুলে উঠেছে; একজন তার চুলের মুঠো ধরে আছে দৃঢ়
লোকটা ধুঁকছে।

ফকীর সারমাদ সাহেব হাত তুলে বললেন—শুনো ভাই, নালিশকরনেবালা—শুনো ভাই মেহমান লোক, মান যাও ভাই। শান্ত হো যাও। প্রথমে আমার মেহমান লোক, তোমাদের বলি, তোমরা ওই নালিশকরনেবালাকে ছেড়ে দাও। হাঁ। তারপর শোন। নালিশকরনেবালার নালিশ তো ঝুটা নয় মেহমান লোক। বল তো মেহমান—

না করঙ্গে গুনাহ দর জেহান কিস্ত বাগো—
আঙ্কাস্ গুনাহ না করদ্ চুন জিস্ত বাগো—

আমরা তুনিয়ার ইনসান—রক্তমাংসে গড়া আমাদের দেহ—তুনিয়ায় পয়দা হয়ে গুনাহ না করতে হয়েছে কাকে? বল মেহমান—এ তুনিয়ায় চারিদিকে যেখানে গুনাহগারির হাতছানি—যেখানে গুনাহ মাটির ধুলোর সঙ্গে মেশানো সেখানে গুনাহ না করে কি বাঁচে মানুষ? আর বল তো মেহমান গুনাহ যদি নাই করি তবে আমার পয়গম্বর আমার খুদাতয়লা আমার কোন অপরাধ মাফ করে আমার সামনে আমার অন্তরে করুণাময় হয়ে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবেন?

আনো মেহমান—ওই নালিশকরনেবালাকে নিয়ে এস। আমার কাছে নিয়ে এস। নালিশকরনেবালা তুমি মাফ করো মুঝে। আমাকে মাফ করো। মেহেরবান তুমি করুণাময় মূর্তিতে উদ্ভাসিত হও।

সমবেত জনতা জয়ধ্বনিতে যেন উথলে উঠল। দ্বিবেদীজী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন ফকীরের দিকে। অস্ফুটকণ্ঠে আপনাআপনি একটা প্রশ্ন বেরিয়ে এল তাঁর মুখ থেকে—দেবতা না পাষণ্ড?

ইনায়েৎ খাঁর দৃষ্টি সারমাদের দিকে নিবদ্ধ ছিল না। তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল ওই আহত উদ্ধত অবিশ্বাসী মুসলমান যুবকটির উপর।

তিনি সুলেমান খাঁকে দেখছিলেন। সুলেমান খাঁও বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ফকীর-সাহেবের দিকে। পুঞ্জীভূত বিস্ময় আর অতলস্পর্শ ঘৃণা দুই যেন একসঙ্গে তার মুখের উপর জমে রয়েছে। বিস্ময়ের সঙ্গে ঘৃণার বিরোধ নেই যেন—বিস্ময় যেন তার ঘৃণার বিশেষণ। সবিস্ময়ে যেন বলতে চাচ্ছে—মানুষ এতখানি ভণ্ড এতখানি কলুষতুষ্ট হতে পারে ?

ইনায়েৎ খাঁ এগিয়ে গেলেন এবং যারা লোকটিকে তখনও ধরে ছিল তাদের বললেন—বাদশাহ দপ্তরের আমি একজন আমীর। আমি বলছি এই ছোকরাকে তোমরা ছেড়ে দাও। খুদ ফকীরসাহেব বলেছেন ওকে ছেড়ে দিতে। সুতরাং এমন ভাবে এখনও ধরে রাখার কোন কারণ নেই। ছোড় দেনা উস্‌কা। ছোড় দো।

আরও এক পা সামনে ফেলে বললেন—ছোড়ো।

ইনায়েৎ খাঁর পোশাকপরিচ্ছদ চেহারার মধ্যে আভিজাত্যের ছাপ এবং কণ্ঠস্বর ও বাক্যবিন্যাসের মধ্যে ব্যক্তিত্বের প্রকাশের সামনে তারা অভিভূত হয়ে গেল ধীরে ধীরে। তাদের হাতগুলি আপনাআপনি শিথিল হয়ে যেন খসে পড়ে গেল।

ইনায়েৎ খাঁ বললেন—তোমার নাম সুলেমান খাঁ ?

—হাঁ হুজুরআলি, আমার নাম সুলেমান খাঁ।

—কোন্ দেশে বাড়ি তোমার ? পাঞ্জাব কি ঔধিয়া তো নয় ? বলছিলে থাট্টায় থাকত এই ফকীর।

—হাঁ হুজুরআলি। আমি থাট্টায় থেকেছিলাম এক নাগাড় ছ' সাত বছর। বাংলা মুল্ক আমার দেশ। আমি বাঙালী।

—কিন্তু তোমাকে দেখে কি তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে না যে তুমি মাঝিমাল্লা ঘরের ছেলে—

সুলেমান খাঁ একটু হাসলে—সে হাসি দেখে শিউরে উঠলেন ইনায়েৎ খাঁ—এমন বিষজর্জর হাসি যে মানুষের মুখে ফুটতে পারে তা তাঁর ধারণায় ছিল না। ঠোঁট দুটো ঈষৎ ভিন্ন হয়ে দাঁতগুলি

বেরিয়ে পড়ল—কিন্তু তার মধ্যে প্রসন্নতা কি আনন্দ কি উল্লাস বিন্দুমাত্র পরিমাণেও ছিল না। যা ছিল তা কটু তা তিক্ত তা বিষাক্ত তা ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ ; চোখের জল এবং বিষণ্ণতাকে বিকৃত করে বা বিচিত্র কোন পাকপ্রণালীতে এই হাসিতে রূপান্তরিত করা হয়েছে। পপিতার শরবত খাওয়ানোর প্রথা আছে বাদশাহী রেওয়াজে। এ সেই ঠিক পপিতার শরবতের মত। হাসির মধ্যে মৃত্যু-যন্ত্রণার ইঙ্গিত ফুটে উঠছে।

ইনায়েৎ খাঁ কি বলবেন কথা খুঁজে পেলেন না। সুযোগ পেয়ে কথা বললেন দ্বিবেদীজী—বললেন—নওজোয়ান, তুমি এই ফকীরকেই অবিশ্বাস কর না ধর্মে ঈশ্বরে সব কিছুতেই অবিশ্বাস কর ?

সুলেমান বললে—বাংলা মুল্কে মাটির ঠাকুর তৈরি করে পূজো করে—তখন কাঁদে—তারপর জলে ভাসিয়ে দেয় ; মাটির ঠাকুর জলে গলে একাকার হয়ে যায়। আর অবাঙমনসোগোচর যিনি ব্রহ্ম তিনি শূন্য-ও বটেন পূর্ণ-ও বটেন—তার মানেই নাস্তিবাদ। পণ্ডিতজী, আপনার কপালে তিলক এঁকেছেন। ও তিলক কত মিথ্যে আপনার থেকে কেউ বেশী জানে না। আমার কথা খাঁ-সাহেব বুঝতে না পারেন আপনি জরুর পারবেন।

সবিস্ময়ে ইনায়েৎ খাঁ বললেন—তুমি কে ?

দ্বিবেদীজী তাঁর কথার সঙ্গে মিলিয়েই বলে উঠলেন—তুমি হিন্দু ?

—হাঁ ছিলাম। এখন আমি সুলেমান খাঁ।

—তুমি কি কাজ কর ?

—কিছু না। ধাট্টা কলাচীতে মাল্লামাঝির কাম করতাম। এখন এসেছি দিল্লীতে—নোকরি খুঁজছি।

—অপেক্ষা কর।

—তার থেকে আপনার ঠিকানা বলে দিন, আমি জরুর

আপনার কাছে গিয়ে দেখা করব। এখন আমি চলে যেতে চাই। লোকগুলো নেকড়ের মত এক সঙ্গে জুটে আমাকে জখম করে দিয়েছে। আমার রামদাওটা কখনও এমন করে বৈষ্ণবীমতে কালী-পূজো করে নি।

ইনায়েৎ খাঁ বললেন—কি?

সুলেমান হেসে বললে—হুজুর, সে আপনার সমঝমে আসবে না। এই পণ্ডিতজী বুঝবেন হয়তো।

লোকটা চলে গেল। তার সঙ্গে সঙ্গে আরও ক'জন।

ইনায়েৎ খাঁ তার গমনপথের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

দ্বিবেদীজী বললেন—লোকটা এককালে হিন্দু ছিল।

পঁয়ত্রিশ

রাত্রি তখন প্রথম প্রহরের প্রথম দিক প্রারম্ভ; তুঘলকাবাদ থেকে শাজাহানাবাদ দূর অনেকটা। রাত্রি তখনও সবে শুরু—কোলাহল কলরব স্তব্ধ হয় নি; শাজাহানাবাদে বাদশাহ শাজাহানের নতুন কিলা লাল কিল্লার ফটকে ঘণ্টা বেজে থাকে প্রত্যেক ঘড়িতে; তবুও তারই মধ্যে দুটো কি তিনটে ঘণ্টার শব্দ লোকেদের কানে এসেছে। লাল কিল্লার মাথায় ঘণ্টাটা বাজে—সে ঘণ্টাটা প্রকাণ্ড একটা ঘণ্টা আর তার তেমনি কি আওয়াজ! বাদশাহী কাজকারবারের রকমই আলাদা। বাদশাহের শখ দিল্লীর কিলার ফটকের মাথার ঘড়িঘরে ঘণ্টা বাজবে—আর সেই ঘণ্টার আওয়াজ চলে যাবে চারিপাশের হাওয়ার উপর ভর করে পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ। লোকে শুনবে গুনবে, বুঝবে এত ঘড়ি বেলা হল কি রাত হল। আর বলবে বাজছে বাদশাহী কিলায়। শাহানশাহ বাদশাহ হিন্দুস্তানের মালেক-ই-মুল্কের কিলায়।

তুঘলকাবাদে ফকীরসাহেবের আস্তানায় ভজনের আসর শেষ হল। ছেলেটি অর্থাৎ অভয়চান্দ একসময় দশাগ্রস্তের মত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করলে—তারপর শুয়ে পড়ল ফরাশের উপর।

গানে সে গাইছিল,—অর্থাৎ তার অর্থ হল, "প্রেমকে সৃষ্টি করলে প্রেমিককে সৃষ্টি করলে প্রেমিকাকে সৃষ্টি করলে—করলে তুমি, তুমিই প্রেম তুমিই প্রেমিক তুমিই প্রেমিকা—তবে এ বিরহ কেন? এ বিরহ কিসের? তোমার মধ্যেই তো আমার বাস। তোমার মধ্যে তোমার নিবিড় আলিঙ্গনের মধ্যে থেকেও তোমাকে পাই নি বলে কত কাঁদব আমি? নিজেকে তুমি প্রকাশ কর। আমার কানে কানে বল আমি এসেছি। আমার ঠোঁটে চুম্বন দিয়ে সর্বাঙ্গে শিহরনের ঢেউ বইয়ে দিয়ে বুঝিয়ে দাও তোমার অস্তিত্ব।"

গানখানা গাইতে গাইতেই সে কাঁদতে শুরু করেছিল। দরদর ধারায়

ছু'চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল ; সংগীতের ছেদের মধ্যে অকস্মাৎ সে বসে পড়ল, তারপর বিহ্বলের মত কোনমতে দুই হাতে ভর দিয়ে বসে চোখের দৃষ্টি দূর দিগন্তের দিকে নিবদ্ধ করে গাইতে লাগল—মেরি পিয়ার মেরি মাশুক, তুমি বল বল, মিলনই যেখানে কোনকালে ঘটবে না ঘটাবে না, সেখানে কেন ঘটালে বিরহ। দুঃখই যদি দেবে রহিম, সুখের নাম তবে শোনালে কেন? তিয়াসই যদি মিটতে নাই দেবে তবে ঝরনার সৃষ্টি করলে কেন, পানির সৃষ্টি করলে কেন? মেঘের মধ্যে বজ্রও আছে বারিবর্ষণও আছে কিন্তু তোমার এই সৃষ্টির মধ্যে শুধু বিরহই আছে, মিলন নেই কেন?

গাইতে গাইতে তার দশা হল, থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে ওই চৌদ্দ পনের বছরের সুকুমার কিশোরটি যেন বিবশতনু হয়ে ঢলে পড়ে গেল ওই আসরের উপর। ফকীর সারমাদও তার পাশে এসে হা-হা করেই কাঁদছেন।—অভয়চান্দ! অভয়চান্দ! অভয়চান্দ!

এ দেশ বিচিত্র।

—তাজ্জব কি মুল্ক দ্বিবেদীজী! ইয়ে তো তাজ্জব হ্যায়!

—হ্যাঁ। বিচিত্রই বটে খাঁসাহেব!

—এ কি? আপনার চোখেও যে আঁসু নিক্‌লে এসেছে দেখছি?

দ্বিবেদীজীর চোখেও জল এসেছিল, তিনি তাঁর উত্তরীয়ের খুঁট দিয়ে চোখ মুছলেন। তাঁর দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে ইনায়েৎ খাঁ বললেন—কিসের জন্য কাঁদছেন পণ্ডিতজী? কি দেখলেন? কি পেলেন এর মধ্যে বাতাইয়ে তো।

দ্বিবেদীজী বললেন—জনাবআলি, গানের মধ্যে কিচ্ছু কি পেলেন না আপনি?

—কি পেলাম? যা পেলাম তা তো ঝুট্ বাত। সাজানো কথা। ওর তো কোন মানে হয় না।

দ্বিবেদীজী বললেন—ঈশ্বরই তো তাই। নয় কি?

একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ইনায়েৎ খাঁ বললেন—কি জানি ?

দ্বিবেদীজী বললেন—ওই বাচ্চা—

—কোন বাচ্চা—ওই লৌণ্ডা—

—যো আপকা খুস বোল সক্‌তে হেঁ। লৌণ্ডাই কহিয়ে। উ যো রোতা হ্যায় উ ভি ঝুট্‌ হ্যায় ?

চুপ করে রইলেন ইনায়েৎ খাঁ।

দ্বিবেদীজী বললেন—আমি ফকীরকে সাচ্চা আদমী বলতে গিয়েও ঠিক বলতে পারছি না।

—কথাটা তো ঠিক সমঝমে এলো না দ্বিবেদীজী। সাচ্চা আদমী ওকে কে বলবে ? ঝুটা আদমীকে ঝুটা আদমী বলুন।

—না খাঁসাহেব। এরপর আর ঝুটা আদমী বলতে পারব না। সাচ্চা বলতে পারলে খুশী হতাম। কিন্তু—

—কিন্তু কি ?

—কিন্তু তা যেন পারছি না—আটকাচ্ছে। সম্ভবতঃ আমার নিজের মধ্যে কোথাও গলদ আছে। চোখে যা দেখি তার অর্থ দুনিয়াতে একটাই নয়। কারণ আমি যা দেখি আর একজন অন্য একদিক থেকে দেখে অন্যরকম। আর দিক থেকে আর একজন তার ঠিক উলটোটা ঘটতেও দেখতে পারে।

ওদিকে লোকজনেরা মজলিস ভেঙে চলে যাবার জন্য উঠে ছড়িয়ে পড়ছিল এদিকে ওদিকে সেদিকে। অধিকাংশ মানুষের মুখের উপর একটি প্রসন্নতার আভা পড়েছে। তারা সীয়ারাম সীয়ারাম পয়গম্বর রসুল খুদা মেহেরবান আল্লা কদরদান বলতে বলতে বাড়ি ফিরছে। কিছু কিছু লোক তখনও চোখ মুছছে আঁচলের খুঁট দিয়ে। কত জনে ওই গানের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে চলেছে প্রায় বিভোর হয়ে। কদাচিৎ দু একজন লোক বলছে—বিলকুল ঝুট হ্যায়। ফকীর বদমাশ হ্যায়। লুচ্চা হ্যায়। কিন্তু আস্তে আস্তে বলছে। অন্যে যেন না শোনে বা শুনতে পায়। ইতস্ততঃ সঞ্চরমান জনস্রোতের মধ্যে ইনায়েৎ খাঁ এবং

দ্বিবেদীজী কতকটা চিন্তায় আত্মমগ্ন এবং কতকটা যেন বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে আছেন।

তাঁরা ফকীর সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্তেই আসতে পারেন নি।

দ্বিবেদীজীর সারা অন্তর বিশ্বাস করবার জন্য ব্যাকুল হয়ে রয়েছে কিন্তু বিশ্বাস করতে পারছেন না—ভয় হচ্ছে।

ইনায়েৎ খাঁর অবিশ্বাস শাণিত তরবারির মত তীক্ষ্ণ এবং উজ্জ্বল কিন্তু সে তরবারি যেন কোষের মধ্যে আটকে গেছে—তাকে টেনে বের করে ঊর্ধ্বে তুলে আঘাত করবার মত উপায় নেই।

একে একে সমবেত মানুষেরা চলে গেল। এরই মধ্যে কত কথাই তাঁদের কানে এল। সব কথাগুলিই যেন তাঁদের মনের ওই নীরব নিঃশব্দ ধারণার প্রতিধ্বনি। একজন বলে গেল—যে যে-সংকল্প বা যে-মনস্কামনা নিয়ে আসে তাকে সে-মনস্কামনার কথা বলতে হয় না—ফকীরসাহেবের কথাবার্তা আলাপ-আলোচনার মধ্যে থেকেই বা তাঁর গানের মধ্যে থেকেই তার উত্তর মিলে যায়। যে জন মনের প্রশ্নের উত্তরের জন্য কান পেতে থাকে সে সে-উত্তর শুনতে পায় ধরে নেয়। বুঝতে পারে। যে কান পাতে না সে পায় না।

একজন বললে—আরে বাবা, তারই বা জরুরৎ কি কহো? আরে তুমি খুদ্ চলে যাও ফকীর সাহেবের সামনে—তসলীম জানিয়ে বলো—ফকীরসাব এই আমার ঝঞ্ঝাট—এই নিয়ে মুশকিল—দয়া করে একটা ফয়সালা করে দাও। নয়তো গিয়ে বলো—এই তো আমার প্রশ্ন, এর জবাব কি তা বলো। ঠিক তোমাকে বলে দেবে। আমাকে ঠিক বলে দিলে।

—কি বলে দিলে? কি জিজ্ঞাসা করেছিলে?

—গিয়েছিলাম ফকীরসাহেবের চ্যালা হতে।

—তুমি ফকীর সাহেবের চ্যালা?

—না। ফকীরের চ্যালা কেউ নেই। ফকীর কাউকে চ্যালা করে না। তবে মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে বাড়ি ফিরে এলাম—এসে দেখলাম যার

জন্যে বিবাগী হয়ে ফকীর হতে গিয়েছিলাম তা আমার হয়ে গেছে। আমার পিতাজী ছিল মস্ত ধনী—মহাজনী ছিল তার পেশা। হঠাৎ মরে গেল। দেখলাম সিন্দুকে দু চার হাজার টাকা পড়ে আছে, আর কিচ্ছু নেই। কোথায় গেল কোন হদিস মিলল না। একদম একরাত্রে যাকে গরীব বনে যাওয়া বলে তাই। খাতকেরা বললে টাকা সব শোধ করে দিয়েছে তারা। এদিকে আমার পাওনাদারেরা ধরলে চেপে। শ্বশুর বললে বৌকে পাঠাবে না। কি করব? ঠিক করলাম ফকীর হয়ে যাব। ফকীরসাহেবের কাছে এলাম হুজরত, আমি আপনার চ্যালা হব। ফকীর বললেন—নেহি। বললাম—নেহি বললে আমি ছাড়ব না। খুদা আমাকে ফকীর করেছেন। যা কিছু ছিল সব উপে গিয়েছে। এখন তোমাকে ধরেছি ছাড়ব না। ফকীর বললেন—সাত রোজ বাদ এস। ছ রোজের রোজ সন্ধান মিলে গেল মাটির তলায় এক কুঁইয়ার। তার মধ্যে শিকলে বাঁধা চার চার সিন্দুক। সাত রোজের রোজ একমুঠা আশরফি এনে হুজরতের পায়ে দিয়ে তসলীম জানালাম। হুজরত বললেন—আশরফি ভাঙিয়ে টাকা পয়সা করে দে সব গরীবানকে বিলিয়ে। যা ঘর যা।

এমনি ধারার গালগল্পের আর শেষ ছিল না। কে একজন বললে—তার ফুফা এক খালিফা আদমী—তার কাছে কারুরই পার নেই; সে তার বুদ্ধির জোরে সাদাকে কালা বানায় কালাকে সাদা বানাতে পারে। সে এসেছিল এক বাজারু ঔরৎকে নিয়ে যে সকলের সামনে গিয়ে বলবে ফকীরকে—ভণ্ড বুজরুক আদমী কাঁহাকা—তুমি আমার গর্ভে সন্তান উৎপাদন করে আমাকে ছেড়ে দিয়ে এবার ধরেছ এই লৌণ্ডাকে। হ্যাঁ, লৌণ্ডা নিয়ে কারবারের সুবিধা আছে।···লেকেন তাজ্জব কি বাৎ—বাপরে বাপ—এখানে এসেই, বাস্, একদম বেহোঁশ হয়ে পড়ে গেল; সেই বেহোঁশ অবস্থাতেই রোনে লাগি।

কাঁদতে কাঁদতে সব কথা বলেছে চীৎকার করে আর মাফি

চেয়েছে।—মেহেরবান, কসুর হয়ে গেছে। মাফ করো হজরত। গরীব পরবর আমি গরীব। এই বদমাশ আদমী আমাকে টাকার লোভ দেখিয়েছিল। আমি খারাপ মেয়ে আমি কসবী। কিন্তু হজরত আমি টাকার লোভে করেছি—তোমার মত দেবদূতের গায়ে কাদা ছেটাতে আমি ইচ্ছা করে আসি নি। আমি জানতাম না আমি জানতাম না।

তখন নাকি ফকীরসাহেব তাঁর বদনা থেকে এক আঁজলা জল নিয়ে তার মুখে ছিটিয়ে দিয়ে বললেন—আরাম হো যাও। বাস্, সঙ্গে সঙ্গে সে আরাম হয়ে গেছে।

একজন বললে—আমার এক দোস্তের চাচা দিল্লীতে এসে একদম দেউলে বন গিয়েছিল। বিগড়ে গিয়েছিল মগজ। একদম ভুলে গিয়েছিল নিজের নাম নিজের বাড়ি নিজের সব কিছু। আমার দোস্ত তাকে খুঁজতে এসেছিল দিল্লী। তারপর তাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল এই তুঘলকাবাদের পাশ দিয়ে। কি খেয়াল হল দোস্তের ভাবলে একবার এই পীর সাহেবের কাছ হয়ে যাই। বাস্, এখানে এসে দাঁড়াবামাত্র দোস্তের চাচা একদম সহজ মানুষ হয়ে গেল। তখন বললে—একদিন এই পথে যেতে যেতেই এই নাঙ্গা ফকীরকে দেখে তাকে গাল দিয়েছিলাম। বাস্, তারপরই সব ভুলে গিয়েছিলাম। ফকীরের কাছে মাফ চাইতে গিয়েছিল দোস্তের চাচা। ফকীর হেসে বলেছিলেন—ঠিক হ্যায় মিয়াসাহেব, ঠিক হ্যায়। পত্থল তো পত্থল হ্যায়। হীরা ভি পত্থল পোখরাজ ভি পত্থল নীলা ভি পত্থল পত্থল ভি পত্থল। আদমী আদমী হ্যায়। সবকোই পয়দা হোতা হ্যায় সবকোই মর যাতা হ্যায়। পত্থলকে পত্থল বলেছ তার জন্যে আমার কাছে তোমার কোন কসুর হয় নি। মাফি মাঙনা হ্যায় তো মাঙো পয়গম্বর রসুলের কাছে—মাঙো আল্লাহতায়লার পাশ।

নির্বাক হয়ে দুজনে তাঁরা শুনেই যাচ্ছিলেন। নিজেদের মধ্যে আলোচনা অনেকক্ষণ আগেই থেমে গেছে। দুজনেই দাঁড়িয়ে আছেন

একটি ধারণার এপ্রান্তে আর ওপ্রান্তে। কিন্তু কেউই নিজস্ব ধারণায় নিঃসংশয় নন।

এরই মধ্যে কে একজন মৃদুস্বরে বলে উঠল—হাঁ, পীরসাহেবের এলেম আছে; বানিয়া লেড়কার ছাতিকে পর একদম ঔরতের ছাতিয়া বেমালুম বৈঠা দিয়া হ্যায়। শালা—। কি করবে এর কাছে খুবসুরত লেড়কী! বাবা পীর, তোমার কাছে মানসিক করে যাচ্ছি বাবা—রোজ রাত্তিরে যেন একটা করে হুরী এসে হাজির হয় দুপহর রাতে। রোজ আসব আর এক এক মোহর দিয়ে যাব সালামী।

ইনায়েৎ খাঁ লোকটার দিকে তাকালেন—সে দৃষ্টিতে তাঁর ক্রোধ ছিল এবং সে ক্রোধ অত্যন্ত নিষ্ঠুর ক্রোধ। খপ করে তিনি বাঁ হাতে তার ঘাড়টা চেপে ধরে নিজের তলোয়ারের বাঁটে হাত দিয়ে বললেন—বেশরমী বেতরিবৎ আদমী! বান্দর লুচ্চা!

লোকটা স্বাভাবিকভাবেই অতর্কিতে আক্রান্ত হয়ে যতখানি উঠেছিল চমকে ততখানিই কি তার থেকেও বেশী খানিকটা উত্তাপে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল তার সমস্ত অন্তর। আতঙ্ক এবং ক্রোধ মেশানো কণ্ঠস্বরেই সে প্রশ্ন করেছিল—কে?

—কি দরকার তাতে তোর?

লোকটা কোনক্রমে আমীর ইনায়েৎ খাঁর বেশভূষা দেখে ভয় পেয়ে গেল। বললে—কি কসুর হল আমার গরীব পরবর?

—এই কথা তুই বলছিস? ঝুটা আদমী কাঁহাকা! কি বলছিলি? আঁ?

দ্বিবেদীজী মৃদু মিষ্ট স্বরে খানিকটা বিনীতভাবেই বললেন—আমার যদি কসুর হয় তো মাফ্ করবেন খাঁ-সাহেব। তবে আমার অনুরোধ আপনি এই ইতর লোকটাকে ছেড়ে দিন। জোনাকি পোকা অন্ধকার রাত্রে দিপ্ দিপ্ করে জ্বলতে জ্বলতে চলে—সেটা তাদের স্বভাব। ওর মধ্যে আগুনও নেই আলোও নেই। ছেড়ে দিন।

ইনায়েৎ খাঁ লোকটাকে ছেড়ে দিলেন। নিজের কাছে যেন কিছুটা অপ্রতিভ তিনি ইতিমধ্যেই হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তবুও তাকে এইভাবে হঠাৎ ধরে ফেলে ছেড়ে দিতে পারছিলেন না। তার জন্যও যেন তাঁর নিজের কাছে একটা কৈফিয়তের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন।

দ্বিবেদীজী বললেন—বিলকুল কথা। এইসব জনতার কথা—এ হয় আজগুবী নয় অশ্লীল খিস্তি। এরা যে এখানে আসে তাও আসে হয় ওই আজগুবী দেখতে নয়তো ওই খিস্তির খোরাক যোগাড় করতে। জনাবআলি, একই পুণ্য পবিত্র দেবস্থানে গিয়েছিল দুই ঔরৎ—একজন সতীসাধ্বী অন্যজন কসবী। সতীসাধ্বী যে সে চেয়েছিল দেবতার দয়ায় যেন তার স্বামী রাজা হন। আর কসবী চেয়েছিল—। সে যা চেয়েছিল জনাব তা এই লোকটার মুখ থেকেই শুনেছেন। ছেড়ে দিন ওকে।

ইনায়েৎ খাঁ ছেড়ে দিলেন লোকটার হাত। লোকটা সভয়ে প্রায় লেজ-গুটনো কুকুরের মত পালিয়ে গিয়ে বাঁচল।

দ্বিবেদীজী বললেন—চলুন।

—চলে যাব?

—কি করবেন? ফকীরের উপর নজর রেখে বসে থাকবেন?

—কিন্তু আমরা কি বলব বাদশাহকে?

—বলব দিন আর রাত একজায়গায় মিশে যায় শাহানশাহ। দুটো ওয়াক্তেই চিড়িয়ারা কলকল করে ডাকে। রাত কালো দিন আলো কিন্তু দিনরাতের মেলামেশি যে ওয়াক্ত তার চেহারা একরকম। বলব আমরা কিছু বলতে গেলে চিড়িয়ার মত চিল্লানোই হবে—তার বেশী কিছু হবে না।

ঠিক এই সময়টিতেই ফকীরসাহেবের একজন অনুচর এসে দাঁড়াল এবং অভিবাদন করে সম্ভ্রমভরে বললে—হজরতসাহেব আপনাদের সালামত্‌ জানিয়েছেন। বলেছিলেন ওই হতভাগা লোকটাকে

মেহেরবানি করে ছেড়ে দেবার জন্য। সে আপনারা আগেই দিয়েছেন।

ইনায়েৎ খাঁ বললেন—ছেড়ে দিতে বললেন? কেন বললেন? ও কি করেছিল ফকীর কি তা জানেন?

—না জনাবআলি, তা জানি না। সে উনি নিজে বলতে পারেন। তবে আমরা যারা হজরতের মুরীদ তারা জানি যে উনি সবই জানেন। উনি আমাকে ডেকে বললেন—

—কি বললেন?

—বললেন সেলিম,তুমি ওই আমীরসাহেবকে আর ওই পণ্ডিতজীকে গিয়ে আমার সালামত জানিয়ে বল যে ওই গরীব সরল মানুষটাকে—যে কসুরই তার হয়ে থাক তা যেন মাফ করে তাকে ছেড়ে দেন। বলো যে দুনিয়াতে এমন জানোয়ার হাজারো লাখো লাখো আছে যারা দিনে একদম বের হয় না। দিনে তারা লুকিয়ে থাকে গর্তে। যে আলো লাখো লাখো প্রাণীকে অভয় দেয় সেই আলোকে তারা ভয় করে। আঁধিয়ারায় তারা দিনের চেয়ে আলোর চেয়ে ভালো দেখতে পায়। আলোর সঙ্গে আঁধার মেশে না। তারা পাশাপাশি দাঁড়ায় সকালে আর সন্ধ্যায়। প্যাঁচারা আলোকে গাল দিতে দিতে কোটরে গিয়ে ঢোকে, সাপেরা গর্জাতে গর্জাতে গর্তে গিয়ে ঢোকে, বাঘেরা ঢোকে গুহায়, পাখীরা কলকল করে আনন্দধ্বনি দেয়। মানুষেরা আজান দেয়। আবার সন্ধ্যেতে ঠিক তার উলটো। ওই গরীব নিরীহ মানুষটি যদি খোদাবন্দকে কিছু অন্যায়ই বলে থাকে তবে ফকীরের অনুরোধ—তাকে মাফ করবেন।

চমকে উঠলেন ইনায়েৎ খাঁ।

দ্বিবেদীজীও চমকে উঠলেন। চমকে উঠেই দুজনে দুজনের দিকে তাকালেন।

ফকীরসাহেবের অনুচর বললে—হজরত বলে দিয়েছেন এর পরও যদি কিছু জিজ্ঞাসা করবার থাকে তবে আমীরসাহেব আর পণ্ডিতজী

যেন বহুৎ মেহেরবানি করে তাঁর গরীবখানায় তশরীফ নিয়ে আসেন। তাতে হুজরত নিজেকে কৃতার্থ মনে করবেন।

*   *   *

ফকীরসাহেবের আস্তানা সামান্য রকমেরই আস্তানা। একান্ত-ভাবে উত্তর ভারতের খাপরার চাল আর ভাঙাচোরা পাথর ও কাদায় গড়া দেওয়াল। সামনে একটি বারান্দা। তার সামনে ওই চত্বরটা, যে চত্বরে এতক্ষণ ধরে ওই অভয়চান্দ মেয়ের পোশাক পরে নাচছিল এবং গান গাইছিল। চত্বরটার চারিপাশে শামিয়ানা খাটাবার শক্ত মোটা খোঁটা পোঁতা রয়েছে। এখন চারিধারে কানাত পরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এইখানেই বোধহয় রাত্রে ফকীরের শিষ্য সেবকেরা বিশ্রাম করবে।

ইনায়েৎ খাঁ এবং দ্বিবেদীজী এসে চত্বর অতিক্রম করে বারান্দায় উঠলেন। ফকীর অজ্ঞান অভয়চান্দের মাথাটি কোলে করে বসে ছিলেন, অতি সন্তর্পণে এবং সযত্নে তার মাথাটি একটি বালিশের উপর রেখে উঠে দাঁড়ালেন অভ্যাগত সম্মানিত অতিথিদের অভ্যর্থনার জন্য।

সামনের খুঁটিতে জ্বলছিল একটি উজ্জ্বল আলো। সেই আলো পরিপূর্ণভাবে গিয়ে পড়ল নগ্ন সন্ন্যাসী বা ফকীরের উপর। ইনায়েৎ খাঁ শুনেছিলেন ফকীরের একসময় নাম ছিল মহম্মদ সৈদ। তাঁর দেশ ইরানেরও উত্তর অংশে কাশান প্রদেশে। লোকটি নাকি জন্মেছিল ইহুদীর ঘরে। ফকীরের সারা অবয়ব—উজ্জ্বল সোনার মত দেহবর্ণ, পিঙ্গলাভ চুল দাড়ি, নীলাভ চোখ, টিকালো নাক দেখে ইনায়েৎ খাঁর সে বিষয়ে আর কোন সংশয় রইল না।

প্রসন্ন হাস্যের সঙ্গে ফকীর বললেন—আসুন মেহেরবান আমীরসাহেব আসুন। সুজন পণ্ডিতজী আসুন। আমার এই গরীবখানা সামান্য ফকীরের আশ্রম—নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর এই অভ্যর্থনা। মেহেরবানি করে গ্রহণ করুন। এই সামান্য আসনে বসুন।

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ফকীরকে দেখছিলেন দুজনে। ইনায়েৎ খাঁর সে মানুষের শরীরে যেন বিদ্ধ হবার মত দৃষ্টি।

ফকীর একটু হেসে বললেন—এবার সর্বপ্রথম আপনাদের কাছে কসুরের জন্য মাফ চেয়ে নিচ্ছি। আমীরসাব, পণ্ডিতজী, খুদা দিনদুনিয়ার মালেক রাজাকে বাদশাহকে দিলেন মুল্কের রাজগী দুনিয়ার বাদশাহী। তাকে দিলেন রাজবেশ তাকে দিলেন বাদশাহী পোশাক—মাথার উপরে তাজ। আমাকে দিলেন ফকীরী—সঙ্গে সঙ্গে সব পোশাক এমন কি লেঙ্গোটি পর্যন্ত কেড়ে নিল। তার কাছে নালিশ করতে গিয়েও বোবা হয়ে যাই। কেঁও কি রাজা বাদশাহকে সাজতে হয়—তার অনেক খুঁত ঢাকতে হয়। ফকীরের খুঁত নেই, ঢাকতে হয় না।

তবু খুদাকে বলি—নালিশ করি—

"আনকাস কি তুরে কর-এ জাহান বানী দাদ
মারা-হমা বা-আসবাব-এ পরিসানী দাদ॥
পশানাদ লিবাসি-ই-হর কি রা অইবি দাদ,
বী আইবান রা লিবাসি-ই উরিয়ানী দাদ॥"

রাজা বাদশাহকে রাজ্য দিলে বাদশাহী দিলে আমাকে দিলে দুঃসহ দারিদ্র্যের চিন্তাজর্জরতা। রাজা বাদশাহকে দিলে পোশাক পরিচ্ছদ আমার কোমরের কৌপীনটাও খুলে নিয়ে দুনিয়ার বুকে নাঙ্গা খাড়া করে দিলে। বললে—জরুরৎ নেই—তোর তো ঢাকবার মত খুঁত নেই।

ইনায়েৎ খাঁ প্রশ্ন করলেন—ফকীরসাহেব কি মানুষের জিজ্ঞাসা আগে থেকেই জানতে পারেন?

—খুদা কসম। কোন জাদু আমি জানি না জনাবআলি। কোন ফিরিস্তা কি কোন দেবদূত আমি দেখি নি। আমি দেখেছি এই লেড়কাকে। এই অভয়চান্দকে।

ছত্রিশ

—দিনদুনিয়ার মালিক আপনি, হিন্দুস্তানে খুদাতায়লার খাদিম আপনি—পয়গম্বর রসুলের করুণার অধিকারী—আপনার সামনে ঝুটা বাত আমি বলব না। সে নাঙ্গা-ফকীর সারমাদকে মুসলমান আমি বলতে পারব না। সে নাঙ্গা থাকে, সে এক হিন্দু লৌণ্ডাকে পিয়ার করে, মনে হয় তার মহব্বতিতে সে দেওয়ানা; সে কা'বার কালো পাথরের সঙ্গে কাফের হিন্দুদের পাথরের পুতুলের সঙ্গে কোন তফাত দেখতে পায় না, বলে এ দুয়ে কি তফাত? এরপর কি করে আমি তাকে মুসলমান বলব? কিন্তু তবু জাঁহাপনা—আমি তাকে ঝুটা আদমী বলতে পারব না, বদমাশ লুচ্চা বেইমান বলতে পারব না। জাদুগরও সে নয়।

বাদশাহ ভ্রূ কুঞ্চিত করে বললেন—তুমি কি বলছ ইনায়েৎ খাঁ, এর কোন অর্থ হয়? ভেবে দেখেছ?

ইনায়েৎ খাঁ সসম্ভ্রমে অভিবাদন করে বললেন—দেখেছি জাঁহাপনা! আমি জানি আমি কি বলেছি এবং কি বলছি। জাঁহাপনা, আমি বলছি ফকীর সারমাদকে মুসলমান আমি কখনই বলব না কিন্তু মানুষ হিসেবে সে সাচ্চা। সে নাঙ্গা বটে, সম্পূর্ণ উলঙ্গ কিন্তু যাকে বলে বর্বর অশ্লীল সে বর্বর অশ্লীল তাকে বলতে পারব না। আমার সঙ্গে দিল্লীর বিখ্যাত পণ্ডিত দ্বিবেদীজী ছিল, সেও আমাকে বলেছে—নাঙ্গা বলে সারমাদ নাগা সন্ন্যাসী নয়, আবার অভয়চাঁদকে পিয়ার করে বলে সে গুনাহগারির আসামীও নয়। লেকেন পাকা সোনার মত সে খাঁটি। ফকীর নিজে বলেছে কোন জাদু আমি জানি না আমীরসাব, কোন ফিরিস্তা কি দেবদূত আমি নই। তাদের আমি চোখেও দেখি নি। কিন্তু তবু শাহানশাহ এ ফকীর এসব ছাড়া এমন কিছু যার উপর কোন শাস্ত্রের কোন পরওয়ানা জারি করে কোন দায়ে দায়ী করা যায় না। হয়তো এ কৈফিয়তও

আমার হেঁয়ালির মত হল কিন্তু কি করব, সে ফকীর নিজেই এক হেঁয়ালি। সে নিজে বলেছে—হেঁয়ালি যদি বল আমীর তবে তাই, লেকেন তার মানে আমি জানি না।

* * * *

দিল্লীর তুঘলকাবাদে ফকীর সারমাদের আস্তানায় আমীর খানখানান ইনায়েৎ খাঁ এবং হিন্দু পণ্ডিত দ্বিবেদী অর্থাৎ দুবেজী ফকীরসাহেবের সঙ্গে যে দেখা করেছিলেন, তাঁর সঙ্গে যে কথাবার্তা বলেছিলেন, ফকীর সম্পর্কে সাধারণ মানুষের যে সমস্ত কথাবার্তা শুনেছিলেন, সে ভালোমন্দ দুইই বলছিলেন ইনায়েৎ খাঁ। বলছিলেন খুদ বাদশাহ শাহানশাহ সাজাহানকে। পূর্বেই বলেছি যে বাদশাহ নিজে পাঠিয়েছিলেন ইনায়েৎ খাঁকে। একলা পাঠান নি, বিখ্যাত হিন্দু শাস্ত্রজ্ঞ ত্রিলোচনধারী দ্বিবেদীকেও সঙ্গে নিতে বলেছিলেন। তাঁরা দেখতে গিয়ে দেখেছিলেন বাঙালী হিন্দু থেকে মুসলমান সুলেমানকে, দেখেছিলেন অভয়চান্দকে ফকীর সারমাদকে। সেই দেখে আসার বিবরণ ইনায়েৎ খাঁ বাদশাহের কাছে পেশ করছিলেন।

দিল্লীর ঘটনার দিন পনের পর।

সময়টা হিন্দুস্তানের কার্তিকের শেষ। হিন্দুস্তানের দেওয়ালীর সমারোহ চলে গেছে। উত্তর ভারতের বর্ষা অল্প কিছুদিনের, সে বর্ষা শেষ হয়েছে; বর্ষণ এবার ভালোই বলতে হবে; রবিফসল চাষের আয়োজন চলছে। গ্রামে গ্রামে ছট্‌ পর্বের সাড়া পড়েছে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আরও একটি বিশেষ সমারোহ বা আনন্দোৎসব।

শাহজাদী জাহানআরা বেগমসাহেবা সাত মাস আগে, গেল বছরের ফাল্গুন মাসের শেষ বরাবর আকস্মিকভাবে কাপড়ে আগুন লেগে পুড়ে গিয়েছিলেন। পিঠের দিকটায় গোটা পিঠটাই এমন ভীষণভাবে পুড়েছিল যে প্রথম দিকটায় শাহজাদীর জীবনের আশা কেউ করে নি। তাঁর গায়ের আগুন নেভাতে গিয়ে কয়েকজন বাঁদীও ছিল কাপড়ে আগুন লেগে। তাদের মধ্যে দুজন মারা গেছে।

শাহজাদীর নসীব আর শাহানশাহের উপর খুদার এবং পয়গম্বর রসুলের অসীম করুণা ও অনুগ্রহ যে শাহজাদী ধীরে ধীরে এই সাত মাস পোড়া ঘায়ের জ্বালা যন্ত্রণা উত্তাপ সব সহ্য করেও সেরে উঠেছেন।

শাহানশাহ এই কয়েক মাস প্রায় রমজানের মত কঠিন তপস্যা করেছেন। নিজে নিত্য নিয়মিত দু বেলা কন্যার রোগশয্যার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে খুদার কাছে প্রার্থনা করেছেন। তাঁর দু চোখ বেয়ে জলধারা গড়িয়ে পড়েছে ; শাহানশাহ সকরুণ ভগ্নকণ্ঠে বলেছেন—খুদা মেহেরবান, মেহেরবানি করো। লা ইলাহি ইলাল্লা দয়া করো।

মসজিদে মসজিদে ইমামসাহেবরা শাহজাদীর জন্য প্রার্থনা জানিয়েছেন। হিন্দুদের মন্দিরে মন্দিরে পূজক পুরোহিতেরা শাহজাদীর আরোগ্য কামনা করেছেন। মন্দিরে মসজিদে ফুল ধূপ বাতি জ্বালাবার জন্য খাস বাদশাহের তহবিল থেকে টাকা গেছে নিত্য নিয়মিত।

ভিক্ষুকদের বিশেষ দান করা হয়েছে শাহজাদীর আরোগ্যের জন্য। রোজ সন্ধ্যাবেলা বাদশাহ শাহজাদীর রোগশয্যার পাশে হাঁটু গেড়ে প্রার্থনায় বসবার সময় হাজার রূপেয়ার একটা মখমলের থলি শাহজাদীর মাথার বালিশের তলায় রেখে দিয়েছেন—পরদিন সকালে এসে প্রার্থনা সেরে সেই থলি বের করে হাজার রূপেয়া দান করেছেন আগ্রা কেল্লার সামনে সমবেত ভিক্ষুকদের মধ্যে। তারা খুদার কাছে ভগবানের কাছে শাহজাদীর আরোগ্য কামনা করে জয়ধ্বনি দিতে দিতে ফিরে গেছে।

এ ছাড়াও বাদশাহ আরও করেছেন। একসময় তাঁর মনে হয়েছিল যে যে-সব কর্মচারীদের তিনি বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন দণ্ডে দণ্ডিত করেছেন তাদের মধ্যে যারা তহবিল তছরুপের জন্য দণ্ডিত তাদের দণ্ড হয়তো ঠিক হয় নি ; তাদের দণ্ড মকুব করেছেন। কারণ তাঁর মনে হয়েছে যে, তহবিল তছরুপের মধ্যে যে-অন্যায় সে-অন্যায় তো তাঁরই উপর বা তাঁরই বিরুদ্ধে। পার্থিব সম্পদে তাঁর ভাণ্ডার, তাঁর দুই হাত তাঁর জীবন ভরে দিতে তো খুদা এতটুকু কার্পণ্য করেন নি। আর

যারা তাঁর সেই তহবিল তছরুপ করেছে তারা কে লোভে করেছে, কে অভাবে করেছে তাই বা কে জানে এবং কারুর সাজার দুঃখ যে তাঁর উপর অভিশাপ হয়ে দাঁড়ায় নি তাই বা কে বলবে ? তিনি তো জানেন যে, তহবিল তছরুপ যেখানে ঘটে, সেখানে যে শুধু চুরির কারণেই ঘটে তা নয়, অন্য কারণেও ঘটে। বে-হিসাবের জন্যও ঘটে। অপব্যয়ের জন্যও ঘটে। আবার অনেক ক্ষেত্রে চুরি করে একজন, দায় পড়ে অন্য জনের উপর। অনেক ক্ষেত্রে বাদশাহের কর্মচারীদের পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা বিদ্বেষের জন্যও এমন ঘটনা ঘটে। ষড়যন্ত্রের ফলে একজন নিরীহ সৎ মানুষ চোর বনে যায়। তাদের দীর্ঘনিশ্বাসের কথা ভেবে বাদশাহ ফরমান জারি করে তাদের মাফ করেছেন ; এদের মধ্যে পাঁচ লক্ষ টাকা তছরুপকারী আসামীও আছে। তারা বাদশাহী গারদখানা থেকে খালাস পেয়েছে এই কয়েক মাস ধরে। তারাও দু হাত তুলে আশীর্বাদ প্রার্থনা করে গেছে।

বাদশাহের ভাগ্য। খুদার মেহেরবানি। পয়গম্বর রসুলের আশ্চর্য মর্জি। এই সময়েই ইরান থেকে ইরানের শাহের গোসা থেকে রেহাই পেতে পালিয়ে এসেছিলেন ইরানের বিখ্যাত হকিমসাহেব। তাঁকে বাদশাহের কাছে এনে হাজির করেছিল এমনি মাফপাওয়া একজন কর্মচারী। এই হকিমের চিকিৎসাতেই তাঁর দাওয়াইয়েই শাহজাদীর সব থেকে বড় সংকট কেটেছে। শাহজাদী তখন বেহোঁশ বেঘোর। পিঠের দগদগে পোড়া ঘায়ের তাড়সে সারা শরীরখানা আনারের ফুলের মত লাল হয়ে উঠেছে। তার উপর দেখা দিল জ্বর। বিরাম-হীন একজ্বরী জ্বর। দিল্লীর হকিমেরা শঙ্কিত হয়ে উঠল। বাদশাহের প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে থমকে চুপ করে যাচ্ছিল। সেই জ্বরকে দিন সাতেকের মধ্যে কমিয়ে আনলেন ইরানী হকিম। জ্বর সম্পূর্ণ সারতে অবশ্য চলে গেছে পূর্ণ দু মাস। অল্প অল্প মৃদু জ্বর মাস দুয়েক চলেছে। তারপর নিঃশেষে ছেড়েছে। তারপর ঘা সারিয়েছে বাদশাহের এক বান্দা গোলাম—তার নাম আরিফ। সে নিজে হাতে

মলম তৈরি করে দিয়েছিল—সেই মলমের গুণে ঘা সারল দু মাসে। তারপর আরও দেড় মাস গেছে, এখন শাহজাদী জাহানআরা সম্পূর্ণ সুস্থ। এখন স্বচ্ছন্দে কাঁচুলি পরে তার উপর পোশাক চড়িয়েছেন, স্বচ্ছন্দে যেমন খুশি তেমনি ভাবেই বিছানায় শুতে পারছেন। সকল বিপদ সম্পূর্ণ কেটে গেছে। সেই শাহজাদী হজরত বেগম জাহানআরা সাহেবার আরোগ্যের জন্য বিপুল সমারোহের আয়োজন চলছে রাজধানীতে।

বাদশাহ আগ্রা কেল্লার দেওয়ানী খাসের সামনে যে খোলা ছাদ সেই ছাদের উপর বসে কথা বলছিলেন ইনায়েৎ খাঁর সঙ্গে।

ইনায়েৎ খাঁর কথা শুনে তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন—দুবেজীও বিচারে ঠাওর করতে পারেন নি। তিনিও তোমারই মতই লিখেছেন, শাহানশাহ, কোন মানুষ সৎ কি অসৎ চোর কি সাধু এ বিচার দুভাবে আমরা করি তার কৃত-কর্মগুলির ফলাফল দেখে অথবা কর্মগুলির শাস্ত্রীয় মতে লক্ষণ বিচার করে। এ ব্যক্তির কৃতকর্মের ফলাফলের বিচার আমার সাধ্যাতীত। শাস্ত্রমতে ওই হিন্দু বালকটিকে নিয়ে তার আচার ব্যবহার দেখে ঘৃণা করতে যাই কিন্তু পারি না। শাস্ত্রমতে এ অধর্ম—কারণ সে বলে অভয়চান্দ আমার ঈশ্বর। শুনে বিস্ময় যত হয় তত ভয় হয়। এবং এই সাধু যখন বলে ওই বালকের দেওয়ান হয়ে সে এই দুনিয়ায় এসেছে। ওই অভয়চান্দের মধ্যেই সে খুদাকে পাবে। অভয়চান্দ যেদিন খুদা হয়ে তাকে দেখা দেবেন সেদিন এই হিন্দুস্তানের তামাম দুঃখ তামাম বিরোধ মিটে যাবে। যেমন খুদা তৈরি করেছেন এই দুনিয়া আর বেহেস্তের মধ্যের ফরাকের উপর নীল আকাশে ছায়াপথের সেতু তেমনি সেতু তৈরী হবে সকল সুখ আর দুঃখের মধ্যে, সকল পাপ আর পুণ্যের মধ্যে, সকল সত্য আর মিথ্যার মধ্যে, সকল দিন আর রাত্রির মধ্যে। ইনায়েৎ খাঁ, তুমি যেমন হেঁয়ালি হয়ে গেছ-

তুমি যেমন সব গুলিয়ে গোলমাল পাকিয়ে দিয়েছ ঠিক তেমনি হেঁয়ালি এই ত্রিলোচন ডুবের খং। অথচ—।

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন ইনায়েৎ খাঁ।

—ইনায়েৎ খাঁ!

—জাঁহাপনা!

—আমি যদি পরওয়ানা জারি করি, খানখানান ইনায়েৎ খাঁ, আমি ফকীর সারমাদের মৃত্যুদণ্ডের পরওয়ানা জারি করছি—তুমি হাসিল কর এই পরওয়ানা, পারবে তুমি?

—জাঁহাপনা, পরওয়ানা সহি করে জারি করলে করতেই হবে। তবে আমি হাজির থাকব না। আর মনে মনে বলব, খুদা, আমি বাদশাহের নোকর, হুকুম তামিল করতে আমি বাধ্য। কিন্তু এর জন্য যে-গুনাহ তার থেকে আমাকে রেহাই দিয়ো।

—তাহলে?

এ প্রশ্ন শাহনশাহ ইনায়েৎ খাঁকে করলেন না। করলেন নিজেকে। ইনায়েৎ খাঁ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

শাহানশাহ বললেন—ইনায়েৎ খাঁ, শাহজাদী জাহানআরা আজকের দিনের মত দিনে দুটি প্রার্থনা জানিয়েছেন। তার একটি হল—শাহজাদা দারা সিকো হজরত সারমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান—সে প্রার্থনা পূর্ণ করতে হবে।

ইনায়েৎ খাঁ এবারও চুপ করে রইলেন।

বাদশাহ বললেন—ফকীরকে তুমি যদি ভণ্ড বলতে কি লুচ্চা বদমাশ বলতে, কোন সাজা দিতে বলতে তাহলে আমি অনায়াসে 'না' বলতাম। অথচ শাহজাদা দারা সিকোর এই ধরনের ধর্মাচরণের উদারতা মুসলমানেরা ঠিক সহ্য করতে পারছে না। তাদের মনের উত্তাপ আমি অনুভব করতে পারি। এবং আমার মনের উত্তাপকেও আমি কমাতে পারছি না। আমি—

বাদশাহ বলতে বলতে থেমে গেলেন। কয়েক মুহূর্ত পরে বললেন—আচ্ছা তুমি যাও।

ইনায়েৎ খাঁ অভিবাদন করে চলে গেলেন।

বাদশাহ বিবেচনা করেই কথাগুলি বলতে বলতেও বললেন না। যেটুকু বলে ফেলেছেন তার জন্যও আপসোস হচ্ছে। না বলাই উচিত ছিল।

হিন্দুস্তানের বাদশাহী নিয়ে তাঁর জীবনের অতীত তাঁর মনে পড়ছে। বাপ বাদশাহ জাহাঙ্গীর শাহের বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ করেছেন। ঠিক বাদশাহের বিরুদ্ধে নয়, বিমাতা নূরজাহান বেগমসাহেবার বিরুদ্ধে। তার জন্য খানখানান মহাবৎ খান তাঁকে সারা দাক্ষিণাত্য, সুদূর গোলকুণ্ডা পর্যন্ত তাড়া করে নিয়ে গিয়েছিলেন বন্য জন্তুর মত। শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করেছিলেন তিনি পিতার কাছে। পিতার স্নেহের জন্যই বেঁচেছিলেন তিনি। তিনি তখন শাহজাদা খুরম।

তিনি নিজে তাঁর বড় ভাই শাহজাদা খসরুকে—

ওঃ! অন্ধ করে—শেষ পর্যন্ত—! ওঃ—। অকস্মাৎ বাদশাহ একান্ত কাতরভাবে আপনাকে ভুলে গিয়ে সামান্য মানুষের মত বলে উঠলেন—এয় খুদা!

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ঝরে পড়ল। সম্ভবতঃ তাঁর সকল আত্মসংবরণের চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়েই ঝরে পড়ল।

তাঁর চার সন্তানের মধ্যেও ঠিক এই প্রতিযোগিতা চলছে। শাহজাদা সুজা শাহজাদা মুরাদ দুজনে নিতান্তই এই মাটির দুনিয়ার মানুষ। এদের দুজনকে তিনি বুঝতে পারেন, এদের তিনি বাঘ সিংহের মত শিকলিতে বেঁধে অথবা আগুনে লাল করে তাতানো বল্লম বর্শা দেখিয়ে শাসনে রাখতে পারেন; হয়তো কোন একটা সুবার মালেকানি দিয়েও নিরস্ত করতে পারেন কিন্তু শাহজাদা দারা আর শাহজাদা ঔরংজীব এরা তা নয়। এদের শিকলিতে বাঁধা যায় না।

এদের জাত আলাদা এবং ধাত আলাদা। শাহজাদা দারা সিকো স্বপ্ন দেখছে এক আশ্চর্য হিন্দুস্তানের। যে স্বপ্ন, না, স্বপ্ন নয়, আকবর শাহ সে হিন্দুস্তানের বনিয়াদ গেড়ে গেছেন। শাহজাদা দারা সিকো হিন্দু মুসলমান ক্রীশ্চান ইহুদী ধর্মশাস্ত্রবিদদের নিয়ে সেই হিন্দুস্তান গড়ার মসল্লার মত কানুন তৈয়ার করবার চেষ্টা করছে।

মধ্যে মধ্যে শিউরে ওঠেন বাদশাহ।

দারা সিকো নাকি নতুন ধর্মের প্রবর্তন করবে, সে হবে তার পয়গম্বর।

এয় খোদা, তুমি তাকে মাফ করো। পয়গম্বর রসুল হজরত মহম্মদ, সকল মুসলমানের গুরু, তুমি রুষ্ট হয়ো না।

দারা সিকো তাঁর প্রিয়তম পুত্র। জাহানআরা তাঁর প্রিয়তমা কন্যা। এই দুজনেই এই বিচিত্র স্বপ্ন দেখেন। আশ্চর্য প্রকৃতির মিল তাঁদের। একরকম! উদার—মহৎ।

বাদশাহ নিজে ঠিক তা নন।

তিনি নিজেকে গোঁড়া না হলেও খাঁটি মুসলমান বলে মনে করেন।

আল্লা খুদা ছাড়া বিশ্বস্রষ্টার অন্য নাম নেই। হতে পারে না। তাঁর কোন আকার নেই। তবু তিনি আছেন। কোরান ছাড়া আর কোন শাস্ত্র নেই। মহম্মদ ছাড়া খুদার প্রকৃত সেবক প্রতিনিধি নেই। ইসলামের পথ ছাড়া পথ নেই।

শাহজাদা ঔরংজীব অত্যন্ত গোঁড়া মুসলমান। কঠিন মানুষ। নির্ভীক বীর কিন্তু হৃদয়হীন নিষ্ঠুর। উদার শাহজাদা দারা সিকোর প্রতি বিদ্বেষেই বোধহয় সে এমন কঠোর নিষ্ঠুর এবং এতখানি গোঁড়া হয়ে উঠেছে।

ওদিকে সারা হিন্দুস্তানে হিন্দু রাজারা গোঁড়া হিন্দু, অন্তরে অন্তরে মুসলমান সমাজ ও ধর্মের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিদ্বেষ ও আক্রোশ পোষণ করে। মুসলমানেরাও তার থেকেও অনেক বেশী পরিমাণে

হিন্দু মানুষের প্রতি অবজ্ঞা এবং ধর্মের উপর ক্রোধ পোষণ করে। হাজার হাজার ভাঙা দেবমন্দির তার সাক্ষ্য বহন করছে।

হিন্দু রাজারা একে জিইয়ে রেখেছে। এর মধ্যেই আছে তাদের দিল্লীর মুসলমান বাদশাহের হাত থেকে আত্মরক্ষার মূলধন।

মুসলমান নবাব সুলতান বাদশাহদেরও তাই। এরই জোরে তারা হিন্দুস্তানে আজ মালিক হয়ে বসে আছে। দারা সিকোর এই উদার পরিকল্পনাকে হিন্দুও গ্রহণ করতে নারাজ মুসলমানও নারাজ। উজীর মনসবদার থেকে সাধারণ মুসলমান সিপাহী পর্যন্ত এর নামে ক্ষেপে যায় জ্বলে যায়। তেমনি হিন্দুরাও যায়।

রাজপুতানার দিকে তাকিয়ে দেখ।

রাজা ভগবানদাস আকবর শাহকে ভগ্নীদান করেছিল। জাহাঙ্গীর শাহকে কন্যাদান করেছিল। তার জন্য সারা রাজপুতানার রাজপুত রানা মহারানারা তাদের একরকম পতিত করে রেখেছে সেই আকবর শাহের আমল থেকে। চিতোরের মহারানা প্রতাপসিংহের বাড়িতে গিয়ে রাজা মানসিংহ আতিথ্য স্বীকার করেছিল। অভিপ্রায় ছিল রাজপুতানার মুকুটমণি চিতোরের মহারানার অতিথি হিসাবে একসঙ্গে আহারের সুযোগ পাবে, তার বিনিময়ে সে যোগ দেবে মহারানার সঙ্গে। রাজা মানসিংহ বাদশাহ আকবর শাহের শ্রেষ্ঠ সেনাপতি। এতবড় দূরদর্শী এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন দুর্ধর্ষ যোদ্ধা ও সেনাপতি বহুকালে একটা আধটা দেখা যায়। মহারানা প্রতাপসিংহের সঙ্গে রাজা মানসিংহের মিলন ঘটলে বাদশাহ আকবর শাহের আগ্রায় পাতা মুঘল মসনদ টিকত কিনা সন্দেহের কথা। কিন্তু সে মিল ঘটে নি। মহারানা প্রতাপসিংহ রাজা মানসিংহের সঙ্গে একসঙ্গে বসে খান নি। শিরঃপীড়ার ভান করেছিলেন। অপমানিত হয়ে মানসিংহ চিতোর ধ্বংসের প্রতিজ্ঞা নিয়ে চলে এসেছিল। এ বিরোধ মিটবার নয়। এ বিরাধ সত্যের সঙ্গে মিথ্যার।

ইসলামের সঙ্গে হিন্দুধর্মের। যে হিন্দুধর্মে পাথর কেটে ঈশ্বরের মূর্তি তৈরি করে বলে—এই ঈশ্বর।

ফকীর সারমাদ বলে—মন্দিরের পাথরের বিগ্রহে আর কাবার কাল পাথরটিতে কি ফরক আছে। কোন ফরক নেই।

এয় খোদা! সে কখনও ধার্মিক বা সিদ্ধপুরুষ হতে পারে? তার কাছে কখনও সত্যের হদিস সন্ধান মেলে?

অস্বস্তি এবং উদ্বেগে বাদশাহ অধীর হয়ে উঠলেন। প্রিয়তমা কন্যা জাহানআরা বেগমের রোগমুক্তি উপলক্ষে কাল সমারোহ দিবস। কাল বাদশাহ দান খয়রাত করবেন। হিন্দুরা বলছে বাদশাহ কল্পতরু হয়ে বসবেন। মসজিদে মন্দিরে দান করবেন, প্রিয়তমা কন্যা জাহানআরাকে জহরতে অলংকারে স্বর্ণমুদ্রায় দশ লক্ষ টাকা দেবেন। অন্যান্য পুত্র-কন্যাদেরও দেবেন এক এক লক্ষ টাকা। সুবা বাংলা থেকে এসেছে শাহজাদা সুজা, দক্ষিণ থেকে এসেছে কনিষ্ঠ পুত্র মুরাদ।

ঔরংজীব এখানেই আছে।

সে নজরবন্দী হয়ে রয়েছে।

শাহজাদা দারা সিকো বানিয়েছিল আরামখানা মাটির নীচে ঘর, সেখানে শাহজাদা ঔরংজীব অমার্জনীয় ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে বাদশাহের বিনা অনুমতিতেই উঠে চলে আসার শাস্তি হিসেবেই আজ এই সাত মাস আগ্রায় নিজের মঞ্জিলে সব কিছু থেকে বঞ্চিত হয়ে বাস করছে।

সাদা সাপ। ঔরংজীবকে তিনি বলেন সাদা সাপ। সাদা সাপ দুর্লভ সাপ। দুর্লভ কিন্তু ভয়ংকর বিষাক্ত।

ঔরংজীবকে কি দেবেন ঠিক করে উঠতে পারেন নি। কন্যা জাহানআরা তার জন্যে দরবার করেছেন। তিনি জানিয়েছেন ঔরংজীবের সেদিনের আচরণের কৈফিয়ত। ঔরংজীবের কাছে জেনে নিয়ে বাদশাহকে জানিয়েছেন জাহানআরা। ঔরংজীব বলেছে,

সেদিন ওই একটিমাত্র দরওয়াজাওলা মাটির তলার ঘরে ঢুকেই তার অন্তর শিউরে উঠেছিল। বাদশাহ এবং শাহজাদাদের ওই ঘরে আসন গ্রহণের পর যদি গৃহস্বামী কোন অজুহাতে ঘর থেকে বেরিয়ে ওই ভারা দরওয়াজাটি বন্ধ করে দেয় তাহলে মাটির উপরে জাগ্রত সারা হিন্দুস্তানের মানুষের পক্ষে তাদের প্রিয়তম বাদশাহের সন্ধান করে মাটির উপরে সূর্যের আলো আর মুক্ত বাতাসের মধ্যে ফিরিয়ে আনার ক্ষমতা হবে না। সেই আশঙ্কা করেই ঔরংজীব বাদশাহকে এবং অন্য দুই ভাইকে রক্ষা করবার জন্য ওই দরজার মুখটি আগলে বসে ছিল। এবং সেই কারণেই সে বেরিয়ে চলে এসেছিল মাটির উপর; প্রয়োজন হলে সেই ছুটে যেত বাদশাহকে রক্ষা করবার জন্য।

আশ্চর্য ঔরংজীব! আশ্চর্য তার মন! তেমনি বিচিত্র তার চিন্তা।

জাহানআরা সবিনয়ে প্রার্থনা করেছেন—আজ তাঁর এই আরোগ্যসমারোহে বাদশাহের কাছে তাঁর প্রার্থনা—ঔরংজীবকে বাদশাহ মাফ করুন।

তাকে গৃহে বন্দী করে রেখেছেন, দরবারে প্রবেশাধিকার পর্যন্ত কেড়ে নিয়েছেন। আজ এই উপলক্ষ্যে বাদশাহ তাকে মুক্তি দিন—তার অধিকারগুলি ফিরিয়ে দিন।

শাহজাদা দারা সিকো তাতে সম্মতি দিয়েছেন। বলেছেন—বড়ীবহিন হজরত বেগম শাহজাদী জাহানআরাজী যখন আরজ জানিয়েছেন তখন তিনি কোন আপত্তি জানাবেন না। ভাই ঔরংজীবের বিলকুল কসুর মাফ করতে বাদশাহের দরবারে তিনিও আর্জি জানাচ্ছেন।

জাহানআরা আরও এক আর্জি জানিয়েছেন। জানিয়েছেন, "শাহজাদা দারা সিকো দিল্লীর সিদ্ধফকীর হজরত সারমাদের সঙ্গে

দেখা করতে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছেন। তাঁকেও এ সাক্ষাতের অনুমতি দেওয়া হোক।

"হজরত সারমাদ এক নাঙ্গা ফকীর। কিন্তু তিনি নাকি আশ্চর্য মানুষ। সিদ্ধযোগী।

"শাহজাদা দারা সিকো স্বপ্নে জেনেছেন এই ফকীরের সঙ্গে তাঁর অদৃষ্ট একসূত্রে গাঁথা। দেখা করা তাঁর একান্ত প্রয়োজন।

"বাদশাহ এ প্রার্থনা মঞ্জুর করুন।"

বাদশাহ দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। এই কারণেই তিনি ইনায়েৎ খাঁকে সারমাদকে যাচাই করতে পাঠিয়েছিলেন।

ফকীর সারমাদ সম্পর্কে নানান গুজব। কিন্তু উচ্চপদস্থ জ্ঞানী মুসলমান মহলের নিদারুণ ঘৃণা আর ক্রোধ এই সারমাদের উপর।

হায়! ইনায়েৎ খাঁ যদি তাঁকে বলত—জাঁহাপনা, সারমাদ নিঃসংশয়ে ভণ্ড! তাহলে তিনি খুশী হতেন। তা হলে তিনি দারা সিকোকে বলতে পারতেন—না, দেখা করা হবে না।

কিন্তু তা সে বলতে পারলে না। বললে—ধর্ম অধর্ম আলো কালো ভালো মন্দ এসবের গণ্ডীর বাইরে বাস করে—তার মানে ফকীর অসাধারণ মানুষ!

এখন তিনি কি করবেন?

সাঁইত্রিশ

সেদিন ভোরবেলা। শীতের আমেজ ঘন হয়ে এসেছে। শহর আগ্রায় শীত এবং গ্রীষ্ম যেন একটু একটু বেশী বেশীই হয়ে থাকে। অগ্রহায়ণের প্রথম সপ্তাহ পার হয়ে গেছে। ভোররাত্রে একটু একটু কুয়াসা দেখা দিচ্ছে ক'দিন থেকে। কিন্তু আজ কুয়াসা হয় নি। আকাশ স্বচ্ছ নীল। ভোররাত্রে তারাগুলি একে একে নিভে আসছে। যমুনার ওপারে পূর্বদিকের আকাশে ধকধক-করা জ্যোতিতে জ্বলছে শুকতারা।

শাহজাদা ঔরংজীব অভ্যাসমত ভোরে উঠেছেন, প্রাতঃকৃত্য ওজু শেষ করেছেন। তাকিয়ে আছেন ওই শুকতারার দিকে। সারা শহর জুড়ে আজানের আওয়াজ উঠছে। রোজই ওঠে কিন্তু আজকের আজানের ধ্বনির মধ্যে কিছু বিশেষত্ব আছে। আজ যেন আজানের আওয়াজের মধ্যে খুদাতায়লা লা ইলাহি ইলাল্লার শুধু গুণগান হচ্ছে না, তার সঙ্গে আনন্দ উল্লাস প্রকাশিত হচ্ছে।

তাঁর খাস অনুচর এসে নামাজের জন্য আসন বিছিয়ে দিল। শাহজাদা নামাজ পড়বেন। তারপর জপে বসবেন। বত্রিশশো জপ শেষ করে উঠবেন। অনুচরটি একটু অপেক্ষা করে শাহজাদার মনোযোগ আকর্ষণ করে অবশেষে ডাকলে জনাবআলি, আলি-জাঁহা!

বলতে চাইলে নামাজের আসন বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ কথা কখনও বলতে হয় না আলিজা শাহজাদা ঔরংজীবকে। আজ একটু বিস্মিত হয়েছে সে। আজ শাহজাদার অনেক কাজ রয়েছে।

আজ সকালেই যেতে হবে আগ্রা কিল্লাতে খুদ বাদশাহকে অভিবাদন জানাতে। বড়ীবহিন হজরত জাহানআরা বেগমসাহেবা আজ সুস্থ হয়েছেন, আরোগ্যস্নান করে তাঁর রোগশয্যা ছেড়ে বাদশাহের কাছে আসবেন, বাদশাহ তাঁকে আশীর্বাদ করবেন,

তারপর খেলাত দেবেন। তারপর বেগমসাহেবাকে নজরানা দেবেন অন্যান্যেরা। বাদশাহর পরই শাহবুলন্দ ইকবাল শাহজাদা দারা সিকো, তারপর শাহজাদা সুজা, তারপর শাহজাদা ঔরংজীব, তারপর ছোট শাহজাদা মুরাদ বক্স। শাহজাদী রওশনআরা, তারপর ছোটবহেন এবং বহুবেগমেরা। তারপর নজরানা আসবে আমীর ওমরাহ এবং মনসবদারদের কাছ থেকে।

সারা শহরের ভোররাত্রির আকাশ যেন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। উল্লাস আনন্দের একটা রাগিণী যেন শহরের বাতাসময় ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে যার স্পর্শে মানুষের ঘুম ভাঙছে।

শহরের রাস্তায় এরই মধ্যে কোলাহল উঠছে। গোলমাল করতে করতে চলেছে ভিক্ষাজীবীর দল। চলেছে আগ্রা কেল্লার সামনে। বাদশাহ আজ শাহজাদীকে দেবেন দশ লাখ টাকার হীরা-জহরতের খেলাত। আর এই সব ভিক্ষুকদের দেবেন দু লাখ টাকা।

এ ছাড়া মসজিদে মসজিদে বাদশাহী খরচায় যে রুটি ভিক্ষে দেওয়ার বরাদ্দ আছে তাও আজ দুনা হয়ে গেছে। ভিক্ষুকের দল ছুটতে ছুটতে চলেছে—আগের সারিতে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। চলো চলো চলো।

আগে চলা নিয়ে ঠেলাঠেলি চলছে, ঝগড়া চলছে, মধ্যে মধ্যে মারপিটও হচ্ছে ছোটখাটো ধরনের।

এরই আকর্ষণে কি শাহজাদা ঔরংজীবের মত মানুষ এমন করে চুপ করে পথের দিকে তাকিয়ে আছেন?

সে আবার একবার আসনখানাকে ঝেড়ে দিয়ে জলপূর্ণ পাত্রটিকে একটু সরিয়ে শব্দ করে অবশেষে ডাকলে—আলিজাঁহা!

—হুঁ। ফিরে তাকালেন শাহজাদা ঔরংজীব। তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে জানালার ধার থেকে এসে নামাজের আসনের উপর দাঁড়ালেন। লা ইলাহি ইলাল্লা!

তোমার অসীম মেহেরবানি আল্লাহতায়লা খুদা মেহেরবান

পয়গম্বর রসুল হজরত মহম্মদ—! আজ একটা দীর্ঘ অন্ধকার রাত্রির শেষ হল। শাহজাদী হজরতবেগম বড়ীবহিনসাহেবা তুমি দীর্ঘজীবী হও, তোমার মঙ্গল হোক। তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা ঔরংজীব ভুলবে না।

হাঁটু গেড়ে বসলেন শাহজাদা।

—এয় আল্লা এয় খোদা, তুমি ভিন্ন মাবুদ নাই—।

* * * *

দীর্ঘ ছ'মাস জোড়া একটা দুর্যোগের রাত্রির মত কাল। শাহজাদা দারা সিকোর আরামখানায় ঘটেছিল একটা দুর্ঘটনা। দুর্ঘটনাটা যে কতদূর শোচনীয় দুর্ঘটনা হতে পারত তা বাদশাহ অনুমানও করতে পারেন না। মাটির তলায় সেই প্রচণ্ড ভারী কাঠের একটি দরওয়াজাওয়ালা আরামখানার মধ্যে জীবন্ত কবর হয়ে যেতো বাদশাহ সাজাহানের—তাঁর সঙ্গে তাঁর তিন পুত্র শাহজাদা সুজা শাহজাদা ঔরংজীব এবং শাহজাদা মুরাদ বক্সের। ভারী দরওয়াজাটা ঠেলে দিয়ে বেরিয়ে আসত কেবল শাহজাদা দারা সিকো।

স্নেহে অন্ধ বাদশাহের প্রিয়তম পুত্র অধার্মিক ভণ্ড এই দারা সিকো। শাহজাদা ঔরংজীব বেরিয়ে এসেছিল সেই আরামখানা থেকে। বেরিয়ে এসেছিল শুধু নিজের জান বাঁচাবার জন্যেই নয়, বেরিয়ে এসেছিল আলাহজরত হিন্দুস্তানের বাদশাহ শাহানশাহ সাজাহান, এবং আপনার জন্যও বটে।

বাদশাহ তা বুঝতে পারেন নি, সম্ভবতঃ বুঝতে চানও নি। নইলে হিন্দুস্তানের বাদশাহ শাহানশাহ জাহাঙ্গীর বাদশাহের দ্বিতীয় পুত্র শাহজাদা খুরম আপনি, একটু চেষ্টা করলেই অনায়াসে বুঝতে পারতেন। আপনার বড় ভাই শাহজাদা খসরুর সঙ্গে আপনি কি করেছিলেন তা আপনি নিশ্চয়ই ভুলে যান নি।

শাহানশাহ বাদশাহ, আপনার কাছে এমন পক্ষপাতিত্ব কেউই প্রত্যাশা করে না। আপনি পুত্রের পিতা। হয়তো বে পুত্রকে

কোন কারণে বা অকারণে বেশী ভালবাসতে আপনি পারেন। কিন্তু বাদশাহ শাহানশাহ যখন আপনি, তখন পুত্রের পিতা হয়েও তা পারেন না আপনি। যোগ্যতায় যিনি শ্রেষ্ঠ তিনিই আপনার শ্রেষ্ঠ স্নেহ সমাদর পাবার অধিকারী। আপনি মুসলমান; আপনার ছেলেদের মধ্যে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ধার্মিক মুসলমান তিনিই আপনার শ্রেষ্ঠ অনুগ্রহ পাবার অধিকারী। হজরত মহম্মদ পয়গম্বর রসুলের ফরমান নিয়ে তুমি হিন্দুস্তানের বাদশাহ। তুমি দুনিয়ায় শুধু সোনা রূপা তামা চাঁদি জহরত হীরা মোতি পান্না নীলা জড়ো করতে আসো নি, শুধু তুমি ফলের রস মিঠাই গোস্ত পুলাও খেতে আসো নি, তুমি সিরাজী সরাব খেতে আসো নি, তুমি ঔরৎ ভোগ করতে আসো নি, তুমি নাচা গানা বাজা নিয়ে রাতের পর রাত কাবার করতে আসো নি। তুমি এসেছ দুনিয়ার আল্লাহতায়লার যে ফরমান, যে পরওয়ানা, যে-কানুন পয়গম্বর রসুল হজরত মহম্মদের কাছে দৈববাণী হয়ে পৌঁছেছিল সেই কুরানের নির্দেশ ফরমান দুনিয়ায় জারি করতে।

মাঝখানে এই মাটির দুনিয়া, এর আধখানা আলো আধখানা কালো; দুনিয়ায় হয়েছে মানুষের পয়দা; জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তার আধখানা সুখ আধখানা দুঃখ। এর এক দিকে বেহেস্ত এক দিকে দোজখ। পয়গম্বর রসুল হজরত কোরানের হদিশে বলে গেছেন কেমন করে সবটাকেই আলো করা যায়, কেমন করে দুঃখ বিলকুল ঘুচিয়ে শুধু সুখের জিন্দগী করা যায়, কেমন করে দোজখ নরকের দিকটা দেওয়াল গেঁথে বন্ধ করে দুনিয়ার সঙ্গে বেহেস্তের যোগ করা যায়, সড়ক বানিয়ে দেওয়া যায়, পুলবন্দী করে দেওয়া যায়।

শাহানশাহ, যে শাহ হয় তাকে এই দায় ঘাড়ে করতে হয়। তোমার আদরের দুলাল দারা সিকো কাফের। সে বিধর্মী সে অধার্মিক। সে ভণ্ড। তোমার দারা সিকো হিন্দু কাফেরের পুতুল-পূজোর অধর্মের মধ্যে ধর্ম আবিষ্কার করতে চায়, তাদের নিয়ে মাতামাতি করে; জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ সেজে সে সুকৌশলে এই হিন্দুর দেশ হিন্দুস্তানে

বাদশাহ হয়ে বসতে চায়। বাদশাহীর দামের তুলনায় তার কাছে ইসলামের কোরান তুচ্ছ ক্ষুদ্র। তার স্পর্ধা বাদশাহ, সে আকবর শাহের ইলাহি ধর্মের মত নতুন ধর্ম জারি করে তার পয়গম্বর সাজতে চায়। হিন্দু মুসলমানকে এক করে সে খিচড়ি বানাতে চায়। ইসলামকে বরবাদ দিতে চায়।

বাদশাহ, ওই আসমানের দিকে তাকিয়ে দেখ। ওই দেখ সাদা কুয়াসায় গড়া কি মেঘ দিয়ে গড়া ওই বেহেস্তের পথ, ওই ধর্মের পথ, ইসলামের পথ। মাটির দুনিয়া থেকে মানুষের জন্য ইসলামের পথ বানিয়ে তোমাকে যোগ করে দিতে হবে ওই পথের সঙ্গে। মানুষ ওকে বলে ছায়াপথ। ছায়াপথ মায়া নয়। ও পথ সত্য। ওর সঙ্গে যোগ করে দিতে হবে এই মাটির দুনিয়ার।

শাহজাদা ঔরংজীব শেষবারের জন্য নতজানু হয়ে মাথা নামালেন মাটিতে। মনে মনে বললেন—দারা সিকো বাদশাহের স্নেহের সুযোগ নিয়ে তাঁকে প্রতারিত করতে পেরেছে কিন্তু খুদাতায়লাকে প্রতারিত করতে পারে নি। তা পারা যায় না। পয়গম্বর রসুলকেও বোকা বানানো যায় না। তাঁদের খাদিম এই ঔরংজীবও তাতে প্রতারিত হবে না। তার পথও কেউ আটকাতে পারবে না। তার প্রমাণ ঔরংজীব আজ পেয়েছে। আজ সাত মাস শাহজাদা ঔরংজীব আগ্রা শহরে আপন মঞ্জিলের মধ্যে নজরবন্দএর মত বাস করেছে, মুখ লুকিয়ে থেকেছে। বাদশাহী দরবারে তার যাবার অধিকার ছিল না। তার নাকাড়া ছিল না। দক্ষিণের সুবাদারী কেড়ে নেওয়া হয়েছে। তার মনসব পর্যন্ত বাতেল্এর সামিল। তার মঞ্জিলের সামনে শাহজাদা দারা সিকের চরেরা কড়া নজর রেখেছে। শাহজাদা ঔরংজীব এই মঞ্জিলের মধ্যে মুখ লুকিয়ে রয়েছে গর্তে লুকানো সাপের মত, গহ্বরে লুকানো জখম শেরের মত। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছে আর ডেকেছে খুদাতায়লা, দিন দুনিয়ার মালিক, সকল বিচারকের শ্রেষ্ঠ

বিচারক, তুমি বিচার করো। তুমি বলো মেহেরবান, ঔরংজীবের কসুর কোথায়। কোথায় তার অন্যায়, কোথায় তার অপরাধ কসুর? খুদাতায়লা, তুমি ভিন্ন বিশ্বস্রষ্টার অন্য নাম যে স্বীকার করে পাথরের মাটিতে মূর্তি গড়ে যে তাকেই বলে তোমার মূর্তি সে কাফের না ঔরংজীব কাফের? গুনাহ কসুর তার? না যে পয়গম্বর রসুলের ইসলামের নির্দেশমত তোমাকে মানে তার?

এয় খোদা! তুমি মেহেরবান! তুমি সত্যের পৃষ্ঠপোষক! তুমি অন্ধকারকে বিদীর্ণ করে সূর্যের উদয়ের মত মিথ্যাকে ছিন্নভিন্ন করে সত্যকে প্রকাশ করো। ইসলামের এই বান্দা পয়গম্বর রসুলের খাদিম এই ঔরংজীবের উপর চাপানো মিথ্যা অপবাদ এবং দুর্ভাগ্যের বোঝাকে তুমি ঠিক সেই ভাবে বিদীর্ণ করে তোমার মহিমাকে প্রকাশ করেছ। আল্লা ভিন্ন মাবুদ নাই—পবিত্রতার উৎস—দিন-রাত্রির স্রষ্টা। শোভানাল্লা খালেকে রাজ্জাকে! আজিজেল গানিয়ে! বিশ্বস্রষ্টা আহারদাতা হে প্রবল হে নির্ভর! তোমার অপার করুণা—সূক্ষ্মতম তোমার বিচার—কাফেরের চক্রান্ত তুমি ছিন্ন করেছ—তোমার বিশ্বস্ত অনুগত পয়গম্বর রসুল হজরত মহম্মদের এই গরীব খাদিমকে তুমি সকল সংকট এবং সংশয় থেকে উত্তীর্ণ করেছ। তোমার অনুগত ঔরংজীব চিরদিনই তোমার খেদমতে নিজেকে সমর্পণ করেছে—তবু আজ প্রতিজ্ঞা করছে সে যে একদিন তোমার এই বান্দা এই হিন্দুস্তানে কাফেরদের অধর্ম এবং অবিশ্বাসের যে পাপ অন্ধকার তাকে বিদীর্ণ করে তোমার আসন কায়েম করবে। ঔরংজীব তার জান দিয়ে তার জিন্দগী দিয়ে জানিয়ে যাবে ইসলাম ছাড়া সত্য ধর্ম নাই। আল্লা ভিন্ন বিশ্বস্রষ্টার অন্য নাম নাই। আল্লা ভিন্ন মাবুদ নাই। যারা অন্য ধর্মের সত্যকে মানতে যায় তারা নিছক ভণ্ডামি করে। তারা কাফেরের মধ্যেও কাফের। তারা কেবল স্বার্থসিদ্ধির জন্য কাফেরদের আনুগত্যের প্রতি লক্ষ্য রেখেই এ ভণ্ডামি করে। ঔরংজীব কখনও তাদের ক্ষমা করবে না।

শাহজাদা নামাজ শেষ করে একবার আকাশের দিকে তাকিয়ে একটা স্বস্তির দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

ওঃ, এই বন্দীদশার কথা মনে পড়ছে! কি সে অসহনীয় নিষ্ঠুর অবস্থা এবং কাল! এয় খোদা!

প্রতিমুহূর্তটি যেন বুকের উপর পাহাড় হয়ে চেপে বসতে চেয়েছে।

বাড়ির সামনে গুপ্তচর। দারা সিকোর নিযুক্ত চর। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছে। আমীর মনসবদার রাজকর্মচারীদের মধ্যে যারা তাঁর প্রতি অনুরক্ত তারা কেউ তাঁর মঞ্জিলের ফটকের সামনে দাঁড়াতে ভরসা পায় নি। চলে যেতে যেতে ফিরে তাকাবারও সাহস হয় নি তাদের।

একমাত্র বহেন রওশনআরা বেগমসাহেবা এসেছেন গিয়েছেন—সকল খবরাখবর দিয়ে তাঁকে সব বিষয়ে ওয়াকেবহাল রেখেছেন। এই বাদশাহী সংসারে তিনিই তাঁর একমাত্র সহায়।

তবে এ কথা আজ স্বীকার তিনি করবেন এবং এইমাত্র নামাজ সেরে উঠেছেন তিনি—এই মুহূর্তে তিনি স্বীকার করছেন হজরত বড়ীবহেন সাহেবা বেগম জাহানআরা আপনি জিন্দাবাদ। দীর্ঘজীবিনী হান আপনি। আপনি নিরাময় হয়ে উঠেছেন এইটে শাহজাদা ঔরংজীবের মহাভাগ্য। আপনার কল্যাণেই, আপনার চেষ্টাতেই আজ এই গরীব ভাই আপনার সর্ব দুর্ভাগ্য থেকে মুক্তি পেলে।

বহেন জাহানআরা মাসখানেক মাস দেড়েক আগে থেকেই অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছেন এবং তাঁর ঘরে বসেই তামাম হারেম এবং বাদশাহের সন্তানসন্ততিদের খোঁজখবর রেখে আসছেন। তিনিই খোঁজখবর করে জেনেছিলেন তাঁর সমস্ত কথা। তিনিই তাঁকে ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—ভাইজান, লোকে বলে শাহজাদা ঔরংজীব সাহসে রুস্তম। কালো পাহাড়ের মত পাগলা হাতী সুধাকরের সঙ্গে চৌদ্দবছরের শাহজাদার সে লড়াইয়ের কথা সারা আগ্রা—তাই বা কেন সারা হিন্দুস্তানের কোন লোক ভোলে

নি। বাদশাহী দপ্তরের কর্মচারীদের সকলে একবাক্যে শাহজাদা ঔরংজীবের ব্যবহারের কথায় পঞ্চমুখ। সেই তুমি এমন বে-তরিবং বে-কায়দা বে-কানুনের কাম কেন করলে? আলাহজরত যেখানে তশরীফ নিয়ে বসে আছেন—তোমার আর তিন ভাই রয়েছেন, সেখানে কেন তুমি বিনা-হুকুম এতালায় উঠে চলে এলে?

শাহজাদা গোপন করেন নি কারণ। অকপটে বলেছিলেন কারণ। বলেছিলেন—ঔরংজীব সাজা পেয়েছে—বাদশাহের করুণা থেকে বঞ্চিত হয়ে সামান্য নজরবন্দের মত আগ্রায় অতিকষ্টে দিন কাটাচ্ছে তাতে তার দুঃখ নেই। এই দুঃখ থেকে নিষ্কৃতি পেতে সে বাদশাহের কাছে মক্কাশরীফ যাবার আরজি জানিয়েছিল—ফকিরী নিতে চেয়েছিল—বাদশাহ তাও দেন নি। তাতেও তার দুঃখ নেই শরম নেই। তার সান্ত্বনা যে বাদশাহ হিন্দুস্তানের শাহানশাহ তাঁর তিন বেটা শাহজাদা সুজা, শাহজাদা গরীব ঔরংজীব এবং শাহজাদা মুরাদ বক্সকে নিয়ে শাহবুলন্দ ইকবাল শাহজাদা দারা সিকোর মাটির নীচের আরামখানায় জীবন্তে বদ্ধ হয়ে কবরনশীন হন নি। বাদশাহ এবং তাঁর তিন ছেলে যতই সাহসী এবং শক্তিমান হোন তাঁরা চারজনে বুক দিয়ে ঠেলেও ওই বদ্ধ-হয়ে-যাওয়া আরামখানার লোহার মত ভারী দরওয়াজা ভাঙতে পারতেন না। তাঁদের চার চারখানা তলোয়ারে যত ধার থাক, তাঁদের কবজিতে যত জোর থাক ওই পাথরের মত শক্ত দরওয়াজাতে কোপের পর কোপ মেরেও তার কিছু করতে পারতেন না।

চমকে উঠেছিলেন জাহানআরা বহেন, সাজাহান বাদশাহের হারেমের সর্বময়ী কর্ত্রী। তাঁর প্রিয়তম কন্যা।

—কি বলছ শাহজাদা?

—বড়ীবহেন—তুমি—হজরত বেগমসাহেবা, কসুর নিয়ো না আমার। যদি বড়ভাই শাহবুলন্দ ইকবাল শাহজাদা দারা সিকো

ঘর থেকে কোন অছিলায় বেরিয়ে এসেই দরওয়াজাটা ঠেলে বন্ধ করে দিতো তো কি হতো ?

—ঔরংজীব !

—দিদিজী !

—এ কি কখনও হয় ? হতে পারে ? দারা সিকো কখনও এমন করতে পারতো না। কভি না।

—দিদিজী ! বাদশাহী মসনদ বড় বিচিত্র জিনিস ! আমাদের স্নেহময় আলাহজরত হিন্দুস্তানের বাদশাহ সাজাহান—যে সাজাহান বাদশাহের গুণপনার জন্য কাফের পণ্ডিতেরা বলে দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা সেই বাদশাহ যখন শাহজাদা খুরম ছিলেন তখন মসনদের জন্যে তাঁর পিতা বাদশাহ জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে কি বিদ্রোহ করেন নি ? শাহজাদা সেলিম তাঁর বাবা বাদশাহ আকবর শাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন নি ?

—ঔরংজীব—ভাইসাব—তবু আমি বলব আমাদের বড়ভাই শাহজাদা দারা তা করতেন না।

—হয়তো করতেন না। কিংবা—। থাক দিদিজী, তিনি হয়তো করতেনই না। কিন্তু আমি এতখানি উঁচু মানুষ নই। আমি ভেবেছিলাম হয়তো শাহজাদা তা করতে পারেন। ঘরের দরজার মুখে অভদ্রের মত শীলতা লঙ্ঘন করে যদি আমি না বসতাম তাহলে শাহজাদা দারা সিকো যে তদ্বির তদারক করতে বার বার বাইরে যাচ্ছিলেন দরজার মুখ পর্যন্ত তার মধ্যে কোন এক সময় মনে হতো—বন্ধ করে দিলে কি হয় ? সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে ভেসে উঠত দিল্লীর মসনদ !

জাহানআরাজী চুপ করে ছিলেন এর পর।

ঔরংজীব বলেছিলেন—আমি হয়তো লজ্জিত হবার মত কাজ করেছি কিন্তু বহেনজী দুঃখিত তাতে হই নি। দুঃখ অনেক এসেছে কিন্তু তা আমি সহ্য করেছি মুখ বুজে। কারণ আমি জানি আমি যা

করেছি তাতে আমাদের আলাহজরত হিন্দুস্তানের বাদশাহের এক নির্ধারিতপ্রায় ভয়ংকর অনিষ্ট ঘটতে পারে নি।

জাহানআরাজিউ বলেছিলেন—ভাইজান, আমি তোমার জন্যে বাদশাহের কাছে দরবার করব। বলব—আমাকে এই আমার আরোগ্য উপলক্ষ্যে যে খেলাত দিচ্ছেন তার মধ্যে এক প্রার্থনা আমার—ভাইজান ঔরংজীবের যে কসুরই হয়ে থাক তাকে মাফ করুন। এবং বলব—ভাইজান কোন বদমতলবে এ কাজ করে নি। সে আলাহজরতকে নিরাপদ দেখতে চেয়েছিল বলেই এ কাজ করেছিল।

ঔরংজীব বলেছিলেন—আপনার এ মেহেরবানির কথা ঔরংজীব কখনও ভুলবে না দিদিজী। আল্লাতায়লার কাছে প্রার্থনা করি আপনি দীর্ঘজীবিনী হোন, আপনার সৌভাগ্য ঐশ্বর্য খুদার করুণায় জীবনের পাত্র থেকে উপচে পড়ুক।

শাহজাদী হজরত জাহানআরা বেগমসাহেবা—স্নেহময়ী দিদিজী জিন্দাবাদ। তোমার প্রার্থনায় বাদশাহ আজ শাহজাদা ঔরংজীবকে নজরবন্দ থেকে মুক্তি দিয়েছেন। তাঁর মনসব তিনি ফিরে পেয়েছেন।

লোকে বলছে শাহজাদা দারা সিকোও মহত্ত্ব দেখিয়েছেন। এতে আপত্তি জানান নি তিনি। অট্টহাস্য করে ঔরংজীবকে সন্দিগ্ধচিত্ততার জন্য উপহাস করে বলেছেন—সাপের মত একটু আওয়াজে কুঁকড়ে যায়। ডরপোক্না।

তাই। তাই ঔরংজীব।

বেগম দিলরাসবানু এসে অভিবাদন করে তাঁর সামনে দাঁড়ালেন। পোশাক-পরিচ্ছদের বিন্যাসে বোঝা যায় বেগমসাহেবা বাইরে বের হবার জন্যে তৈয়ার হয়ে গেছেন। যাবেন কেল্লার ভিতর শাহী হারেমে। জাহানআরা বেগমসাহেবার আরোগ্যোৎসবে যোগ দিতে

যাবেন। শুধু তাই নয় আজ তাদেরও আনন্দের দিন। নজরবন্দ অবস্থা থেকে মুক্তির দিন।

শাহজাদা ঔরংজীব বললেন—তুমি তৈয়ার?

দিলরাসবানু বললেন—না, এখনও পুরা তৈয়ার হতে পারি নি। শেষ হয় নি। একটা জরুরী খবর দিতে এসেছি।

—জরুরী খবর?

—হাঁ। শাহজাদী রওশনআরা বেগমসাহেবার লোক এসেছে। এসেছে শাহজাদার কাছেই। কিন্তু শাহজাদার নামাজের সময় সামনে আসে নি। আমার কাছে গিয়ে আমাকে খবরটা বলে সে তুরন্ত চলে গেছে।

—কি খবর?

—শাহজাদা দারা সিকো মিরজারাজা জয়সিংজীর সঙ্গে কি যেন একটা কায়েমী সম্বন্ধ পাতাবেন আজ।

—হুঁ। শুনেছি কিছু। মিরজারাজার বহেনের বেটী ভাগ্নীর সঙ্গে শাহজাদার বড়ছেলে সুলেমান সিকোর সাদীর একটা কথা হয়ে আছে। চলছে।

—বোধ হয় হজরত বেগমের আরোগ্য উপলক্ষ্যে কথাটা পোক্ত হবে। শাহজাদী রওশনআরা বলেছেন আজ রাত্রে বা কাল রাত্রে আপনার মঞ্জিলে আপনার এই মুক্তি উপলক্ষ্যে আমীরদের মনসবদারদের নিমন্ত্রণ করেন।

শাহজাদা বললেন—হুঁ।

পূর্ব-আকাশে তখন সূর্যোদয় হচ্ছে। আগ্রার পথঘাট জেগে উঠেছে। জেগে উঠেছে উৎসবোল্লাসে উল্লসিত মন নিয়ে।

কোলাহলে ভরে উঠেছে বায়ুস্তর।

আলসের উপর ঝুঁকে নীচের দিকে তাকালেন শাহজাদা। কাতারে কাতারে লোক চলেছে। সব ভিক্ষুক এরা।

বেগম দিলরাসবানু বললেন—তিনি আরও বলেছেন—"শাহজাদা

ঔরংজীব সম্ভবতঃ বড়ীবহেন হজরত বেগমের প্রতি কৃতজ্ঞতায় নুয়ে পড়েছে ; তাকে আরও একটা খবর দিয়ো যে, শাহজাদা ঔরংজীবের জন্যেই জাহানআরা দিদিজিউ বাদশাহের কাছে প্রার্থনা জানান নি, শাহজাদা দারা সিকোর জন্যেও একটা প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। দিল্লীতে এক নাঙ্গা ফকীর—নাম তার সারমাদ—এসে আড্ডা গেড়েছে তুঘলকাবাদে, তার সঙ্গে আছে এক বানিয়া লৌণ্ডা—নাম তার অভয়চান্দ। সে কোন ধর্মই মানে না এবং এই হল সব ধর্ম মানা। এই সত্য। দারা সিকো দুনিয়ার সার সত্য পরম তত্ত্ব জানবার জন্যে এই ফকীরের সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি চেয়েছিলেন—আর চেয়েছিলেন নতুন শহর শাজাহানাবাদের ভিতরে তার জন্যে জমীন। বাদশাহ তাও মঞ্জুর করেছেন।”

শাহজাদা ঔরংজীব একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। সে নিশ্বাস উত্তপ্ত ক্রুদ্ধ। আল্লা—তুমি মেহেরবান। কিন্তু কখনও যেন অধর্মকে অনাচারকে ব্যভিচারকে তুমি ক্ষমা করো না। হিন্দুস্তান কাফেরার দেশ, পুতুল পুজোর দেশ—এদেশে তোমার মহিমা তোমার হুকুমত জারি করবার জন্যে ইসলামের চেরাগ হাতে পাঠিয়েছ, সে চেরাগ যে নেভাতে চাইবে ওই আগুনে তুমি তাকে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়ো।

আটত্রিশ

সারা হিন্দুস্তানের শাহানশাহ সারা দুনিয়ার মধ্যে সিংহের মত বিক্রমশালী বাদশাহ সাজাহানের বাদশাহীতে শাহজাদী হজরত জাহানআরা বেগমের এই রোগমুক্তি উৎসব অন্যতম শ্রেষ্ঠ উৎসব।

সারা হিন্দুস্তানে এ উৎসবের সাড়া পড়েছিল। মসজিদে শাহজাদীর আরোগ্যের জন্য নামাজ পড়া হয়েছে—খুদাতায়লার কাছে তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা করা হয়েছে। ভিক্ষুক ভিক্ষা পেয়েছে—দরবেশ ফকীর সাধুসন্তদের খয়রাত করা হয়েছে। বাদশাহ শাহজাদাদের নিয়ে শাহী মসজেদে নামাজ পড়ে এসেছেন। তারপর শাহানশাহ খেলাত বিতরণ করেছেন।

সকালবেলা থেকেই কেল্লার ফটকের মুখে ভিক্ষাপ্রার্থীদের কলরোল উঠছে। সেখানে ভিক্ষা দেওয়া চলছেই।

সমবেত কণ্ঠে জয়ধ্বনি উঠছে—শাহজাদী দীর্ঘজীবিনী হোন। বেঁচে থাকুন শাহজাদী—চিরায়ু হোন।

বাদশাহ দরবার করেছেন—দরবারের মধ্যে উজীর মীরবক্সী মীরআতিস থেকে আরম্ভ করে সকলেই যে-যেমন সে-তেমন বাদশাহী খেলাত মনসব পেয়েছে। বান্দা বাঁদী গোলামেরা বকশিস পেয়েছে।

দেওয়ানী আমে ময়ূরসিংহাসনে বসেছেন শাহানশাহ। তাঁর মসনদের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন উজীর। সামনে রয়েছেন চার শাহজাদা—শাহবুলন্দ ইকবাল মহম্মদ দারা সিকো, শাহজাদা শাহ সুজা, শাহজাদা ঔরংজীব, শাহজাদা মুরাদবক্স। তার পর নবাব সুবেদার মনসবদার মহারাজা রাজারা দাঁড়িয়ে আছেন—যাঁর যেমন মনসব। সামনের প্রশস্ত প্রাঙ্গণ দিয়ে একে একে চলে গেল অশ্বারোহী উষ্ট্রারোহী পদাতিক সৈন্যসামন্ত—তার পর চলতে লাগল বাদশাহী ঐশ্বর্যের মিছিল। সুসজ্জিত বলীবর্দযুথ—বিশালকায় হাতীর বাহিনী। হাতীগুলির মাথার চারিদিক সিন্দুর দিয়ে চিত্রিত করা—

গলায় রূপোর ঘণ্টা—কানের পাশে পাশে ঝুলছে তিব্বতী চামর। পিঠের উপর বহুমূল্য রেশমী ও মখমলের আচ্ছাদনী দিয়ে ঢাকা কিংখাব দিয়ে সাজানো হাওদা। বড় বড় দাঁত তাদের সোনার খাপ দিয়ে মোড়া। কয়েকটা হস্তিনীর পাশে পাশে চলছিল তাদের কয়েকটা ছোট বাচ্চা। হাতীর পর উটের সারি। তার পর গেল খাঁচায় বন্দী কয়েকটা বাঘ—তারপর গেল শিকলে বাঁধা হরিণের দল—তার পর গেল মধ্যএশিয়ার একদল জোয়ান—তাদের হাতে চামড়ার দস্তানা—তার উপর বসে আছে সরু রূপোর শিকলি দিয়ে পা-বাঁধা বাজপাখী—তাদের তীক্ষ্ণ ধারালো ঠোঁট এবং তার চেয়েও তীক্ষ্ণ কঠিন-দৃষ্টি চোখ দেখে একটা আশ্চর্য অনুভূতি জেগে ওঠে। তার পিছনে চলছে শিকারী কুকুরের দল।

দেওয়ানী আমের দোতলার ঝরোকার পিছনে বসে আছেন বেগম শাহজাদী এবং অন্তঃপুরচারিণীদের দল। ঝরোকায় চোখ রেখে তাঁরা এ শোভাযাত্রা দেখছেন।

মৃদুস্বরে পরস্পরের মধ্যে কথাবার্তাও চলছে। টুকরো টুকরো কথা টুকরো টুকরো হাসি—হীরা-জহরতের গায়ে আলো বেজে ঠিকরে পড়া ছটার মত।

বেলা দুপহরের ঘড়ি বাজল—শেষ হল দরবার। বাদশাহ উঠলেন—সকলে অভিবাদন জানালেন। বাদশাহ প্রসন্ন হাসিমুখে অভিবাদন গ্রহণ করে চলে গেলেন দ্বিপ্রহরের নামাজের জন্য।

শাহজাদা দারা সিকো দাঁড়িয়ে আছেন কেমন যেন আচ্ছন্নের মত। দৃষ্টি যেন তাঁর চলে গেছে অনেক দূরে। তাঁর চিত্ত যেন ঘুমন্ত। কোন স্বপ্ন বা চিন্তা তাঁকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। সে আচ্ছন্নতার মধ্যে দুশ্চিন্তা ব্যাকুলতার কোন নিদর্শন নেই। কিন্তু একটি বিষণ্নতার স্পর্শ আছে।

শাহজাদা মুরাদবক্স স্ফূর্তিবাজ মানুষ; যেমন সাহসী তেমনি বিলাসী তেমনি হল্লাহুল্লোড়ে তাঁর অনুরাগ—নারী ও সুরার প্রতি

তাঁর আসক্তি। সারা হিন্দুস্তান—তাই বা কেন হিন্দুস্তানের বাইরে ইরান তুরান বল্‌খ্‌ বাদাকশান জর্জিয়া উজবেগীস্তান যেখানে যেখানে গোলামের হাট আছে সেখান পর্যন্ত এ খবর সুবিদিত না হোক অনেকের কাছেই বিদিত। গোলামব্যবসায়ীরা সুন্দরী বাঁদী কিনবার সময় যে সব বাদশাহ শাহজাদা আমীর রইসদের কথা ভাবে তাদের মধ্যে প্রথম দু'তিনজনের মধ্যেই শাহজাদা মুরাদবক্স একজন।

শাহজাদা মুরাদবক্স এগিয়ে এসে দারা সিকোকে বললেন—সালাম দাদাজীউ শাহবুলন্দ ইকবাল, কি ভাবছ বল তো? দিল তোমার কেমন যেন মুষড়ে পড়েছে ভাইসাব! সিরাজী পিয়েছ বলে তো মনে হচ্ছে না।

দারা সিকো ম্লান হেসে বললেন—ভাবি নি কিছু। কিন্তু কেন জানি না মন কেমন যেন উদাস হয়ে গেছে।

শাহজাদা ঔরংজীব পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন—কথাটা সহজেই এবং স্বাভাবিকভাবেই তাঁর কানে গিয়েছিল—তাঁর মুখ কঠিন হয়ে উঠল—তিনি বললেন—ভাই মুরাদ কি জান না যে শাহবুলন্দ ইকবাল, আমাদের দাদাসাহেব, খুদার বিশেষ অনুগৃহীত জন—শুধু খুদার নন, কাফের হিন্দুদের, খেরেস্তানদের—ভগবান ঈশ্বরের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ হয়। খুদার সঙ্গে একত্ব অনুভব করার কথা তুমি আমি ভাবতেই পারি না। কিন্তু শুনেছি কাফেরদের এমন হয়—কারুর বা কিছুর সঙ্গে মিল হয়। কেউ এসে ভর করে। তখন মাতোয়ারা হয়ে যায় মানুষ। সুফীরাও অবশ্য বলে এ কথা। শুনে থাকবে তুমি।

শাহজাদা দারা সিকো মুহূর্তে সজাগ এবং সচেতন হয়ে উঠলেন। চোখদুটি গাঢ় রক্তবর্ণ হয়ে উঠল। একটা আগুনের শিখা যেন মাথার মধ্যে আগ্নেয়গিরির মুখের আগুনের মত দপ করে জ্বলে উঠল। নাসারন্ধ্র স্ফীত হয়ে উঠল—নিশ্বাসের উষ্ণতায় তিনি নিজেই পীড়িত

হয়ে উঠলেন। ঔরংজীবের এই কঠিন তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ তাঁর মর্মের মধ্যে যেন একটা তপ্ত লোহার শলাকার মত বিদ্ধ করল।

ঔরংজীব কিন্তু গম্ভীর স্থির—সারা মুখের মধ্যে কোথাও কোন একটি রেখা ফুটে ওঠে নি যাতে করে তাঁর আসল মনের এতটুকু পরিচয় পাওয়া যায়। ধীর স্থির গম্ভীর ঔরংজীব স্থিরদৃষ্টিতে শাহজাদার দিকে তাকিয়ে আছেন। শাহজাদা সিকো আত্মসংবরণ করলেন।

মুরাদবক্স বললেন—শাস্ত্রের নামে আমার মাথা ধরে। ওসব তত্ত্ব আমি বুঝতেই পারি না। কেন যে তোমরা ওইসব নিয়ে মাথা ঘামাও তা আমি জানি না। তুনিয়াতে এসেছ—খাওয়ো-পিওয়ো আরাম করো—গানা বাজানা নাচা নিয়ে আনন্দ করো—ব্যস।

তারপর ঔরংজীবের দিকে তাকিয়ে বললেন—তুমিও তো কম যাও না। তোমার জিন্দগীটাই তো তুমি শুকনো কাঠ করে ফেলেছ। এক ফোঁটা দারু কি সিরাজী তুমি খাও না—নাচওয়ালীর নাচ দেখ না গান শোন না। দিনরাত তো জপের মালা ঘোরাচ্ছ! শুনেছি ভোরবেলা উঠে গোসল সেরে তুমি বত্রিশশো বার জপ কর।

ঔরংজীব বললেন—আমি সামান্য মুসলমান মুরাদবক্স ভাইজী—তার বেশী কিছু নয়। খুদাতায়লার খাদিম—পয়গম্বর রসুলের গোলাম। শাহবুলন্দ ইকবালকে লোকে বলে—আল কামিল। উনি হলেন খুদপরস্ত—উনি পরকে পূজা করেন না, পূজা করেন নিজেকে।

এবার তাঁর মুখে রমজানের চাঁদের আভাসের মত একটি অতিক্ষীণ হাস্যরেখা ফুটে উঠল।

দারা সিকো এতক্ষণে উত্তর দিলেন—বললেন—ঔরংজীব, আমি মুসলমান—কোরান আর খুদাতায়লা আমার কাছে প্রথম সত্য, সবচেয়ে বড় সত্য। মুসলমানের অন্তরের মধ্যে তুয়ের স্থান নেই। স্থান আছে একের। এক অদ্বিতীয়ের। তিনি আর তুয়ের মধ্যে আমার আমিকে ঘোচাতে পারলে, তাঁর সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পারলে তবে তিনিই এক অদ্বিতীয় হয়ে থাকেন—আমার আমির সঙ্গে এক

হয়েই থাকেন। বুন্দেলখণ্ড কি দক্ষিণে ছোট ছোট হিন্দু রাজাদের বিরুদ্ধে জেহাদের চেয়ে নিজের অন্তরের মধ্যে আমার অহংয়ের বিরুদ্ধে জেহাদ আমার কাছে বড় জেহাদ। খুদপরিস্তি সহজ নয় ভাইজান। আচ্ছা ভাইজান, এখন চলি। নিগমবোধ মঞ্জিলে আজ ফকীর সাধুসন্তদের আসবার কথা আছে।

শাহজাদা মুরাদ বললেন—একটা কথা—

—কি বল?

—শুনলাম বাচ্চা সুলেমান সিকোর নাকি সাদীর কথা হচ্ছে—

—হাঁ। কথা উঠেছে।

—মির্জারাজা জয়সিংজীর ভাগ্নীর সঙ্গে?

—হাঁ। মিথ্যে শোন নি। মির্জারাজার ভাগ্নীটি বড় ভাল মেয়ে—দেখতেও সে সুন্দরী।

—হেনাবন্দী কবে হবে?

—জানি না। সেটা ঠিক করবেন দিদিজী হজরত বেগমসাহেবা আর আলহজরত শাহানশাহ।

—আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা—খুব খুশির খবর। আর একটা খবর—শুনছিলাম—

—কি বল?

—কাশ্মীর থেকে নাকি এক আশ্চর্য বাঁদী কিনেছ?

—বাঁদী তো হামেশা হামেশা কেনা হয় মুরাদবক্স। হাঁ, কিনেছি এক বাঁদী—সে এখন পরস্তার। আচ্ছা চলি আমি।

শাহজাদা দারা সিকো আর অপেক্ষা করলেন না, একবার পিছন ফিরে মেজভাই শাহজাদা সুজার সঙ্গে সাধারণ সম্ভাষণ সেরে নিয়েই অগ্রসর হয়ে গেলেন সামনের দিকে। দরবারের আমীর ওমরাহদের মধ্যেও তখন সম্ভাষণের পালা চলছিল, ইনি তাঁর সঙ্গে, তিনি এঁর সঙ্গে সম্ভাষণ সেরে নিচ্ছিলেন। সাধারণ কুশলবার্তা বিনিময়। তার বেশী এখানে কথাবার্তা বড় একটা হয় না। হওয়া নিরাপদও

নয়। আবার কথাবার্তা না-হওয়ারও বিপদ আছে। না হলে দরবার শেষ হওয়ার প্রহর খানেকের মধ্যেই সারা রাজধানীতে রটনা হয়ে যাবে যে এই আমীরের সঙ্গে এই মনসবদারের দারুণ বিরোধ ঘটে গেছে। হয়তো বা এর ফলে একটা রক্তারক্তি না হয়ে এর শেষ হবে না।

শাহজাদা দারা সিকোকে দেখে আলাপরত আমীরেরা সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দিলেন এবং সকলেই তাঁকে অভিবাদন জানালেন। তিনিও প্রত্যভিবাদন জানিয়ে এগিয়ে গেলন।

শাহজাদা থমকে দাঁড়ালেন মির্জারাজা জয়সিংহের সামনে। মির্জারাজা কথা বলছিলেন মহারানা যশোবন্তসিংহের সঙ্গে।

মির্জারাজা অভিবাদন জানালেন—বন্দেগী শাহজাদা।

সঙ্গে সঙ্গে মহারাজা যশোবন্তসিংহও।

শাহজাদা দারা সিকো মির্জারাজা ও যশোবন্তসিংহকে প্রত্যভিবাদন জানিয়ে বললেন—নমস্তে রাজাসাহেব। সালাম।

শাহজাদা এগিয়ে চলে গেলেন কিছুদূর—যেতে যেতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে একজন অনুচরকে বললেন—মির্জারাজাসাহেবকে গিয়ে বল রাজাসাহেব যদি আজ বা কাল বিকেলের দিকে আমার গরীবখানায় তাঁর তশরীফ নিয়ে আসেন তাহলে শাহজাদা দারা সিকো খুব খুশী হবেন।

মির্জারাজা মহারানা যশোবন্তসিংহের সঙ্গে মৃদুস্বরে কথা বলতে বলতে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, তবে ধীর গতিতে। চাচ্ছিলেন শাহজাদার দল আগে চলে যান। ওঁরা দুজনে যে কথা বলছিলেন তা তাঁদের একান্তভাবে নিজেদের কথা।

কথা সেই সনাতন কথা।

দিল্লীর বাদশাহ বা অন্য কোন নবাব সুলতান যখনই কোন রাজপুত রাজা বা সর্দারের কন্যার পাণিপ্রার্থী হন তখনই এই কথা উঠে থাকে রাজপুত রাজাদের মধ্যে, রাজপুতদের সমাজের মধ্যে।

কন্যা তারা দেয়; সে দেয় বিসর্জন দেওয়ার মত। শক্তিশালী সুলতান নবাবদের হুকুম অমান্য করলে বিপদ আছে। এই কন্যা যখন তাঁরা চান তখন সে চাওয়াটায় প্রার্থনা থাকে না অনুরোধও থাকে না—অনুরোধের খোলে বা খাপে পোরা ছোরা বা তলোয়ারের মত থাকে হুকুম। বাদশাহদের কন্যা চাওয়া সে তো প্রত্যক্ষভাবেই হুকুম। তার তো কোন আবরণের বালাইই নেই। তবে তাদের অন্তর উত্তপ্ত হয়। উত্তাপ জমা হয়ে থাকে আগ্নেয়গিরির আগুনের মত।

কথা হচ্ছিল শাহাজাদা দারা সিকোর বড়ছেলে শাহজাদা সুলেমান সিকোর সঙ্গে মির্জারাজার ভাগ্নীর বিবাহ প্রস্তাব সম্পর্কে। জয়পুর রাজ্যের কন্যা এর আগেও এসেছে বাদশাহী হারেমে। কোন্ রাজা বা রানার ঘরই বা বাকী আছে। এক চিতোর উদয়পুর ছাড়া প্রায় সকল রানা বা রাজবংশেই এ দাগ লেগেছে। পুরাকালের রাজপুত মর্যাদার জেদ ক্রমে ক্রমে হিসেবের নিক্তির ওজনে ওজন করতে গিয়ে হালকা হয়ে এসেছে। রাজ্য সম্পদ জীবন বেঁচে থাকার কাছে একটি কন্যাকে চিরদিনের মত দিয়ে দেওয়া শ্রেয়ঃ মনে হয়েছে। কিন্তু তবু এর জন্যে বেদনা তারা বোধ করে থাকে। চিতোরের মহারানা প্রতাপসিংহের মত অনমনীয় পর্বতশৃঙ্গ-মত তুল্য ব্যক্তিত্বের যুগ যেন ধীরে ধীরে শেষ হয়ে আসছে। রাজপুত কবি রানা পৃথ্বিরাজের মত কবিও আর নেই।

আজ দুই রাজপুত রানার মধ্যে ঠিক সেই কথাই হচ্ছিল। দরবারে এসে মহারানা যশোবন্তসিংহ একসময় অতিমৃদুস্বরে মির্জারাজা জয়সিংহের কানের কাছে বলেছিলেন—মহারানা, একটা সংবাদ শুনলাম—

মির্জারাজা বলেছিলেন—হুঁ।

—জিজ্ঞাসা করতে পারি?

—পারেন। কারণ বাজপাখী যখন নীচের আকাশে পাকখাওয়া পারাবত পরিবারের উপর ঝাঁপ খায় তখন সে শূন্য নখ নিয়ে ফেরে না।

—তাহলে কথা সত্য ?

—মিথ্যা নয়।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে যশোবন্তসিংহ বলেছিলেন—আপনার ভাগ্নীর সৌভাগ্য কামনা করি। সে সুখী হোক। হয়তো একদিন ভারতসম্রাজ্ঞী হবে সে।

—মহারানা, যে কন্যাকে সিন্ধুর জলস্রোতে ভাসিয়ে দিলাম সে পারস্য উপসাগরের মুক্তামালা পরবে এ সৌভাগ্য কামনা করে কি লাভ ?

—লাভ হবে মহারানা। শাহবুলন্দ ইকবাল বাদশাহের জ্যেষ্ঠপুত্র এবং প্রিয়তম পুত্র—তিনিই পরে বাদশাহ হবেন এ অধিকাংশ লোকেই অনুমান করে।

—বলতে পারি না।

—কেন মহারাজা ?

—সে আলোচনার ক্ষেত্র এ নয়।

—কেন—আপনি কি মনে করেন অন্য কোন— ? মানে কে ?—ওই খল কুটিল ওই—

—চুপ করুন। আমি সে কথা বলি নি। আমি বলছি মহারানা, শাহবুলন্দ ইকবাল আজ হিন্দুভারতের কাছে সবথেকে বড় আশঙ্কার কারণ হয়ে উঠেছেন। তিনি মুসলমানদের কাছে বলেন—আল কামিল। তা বলুন—তাতে কোন আপত্তি নেই আমাদের। কিন্তু তিনি যখন বলেন 'ব্রহ্মোস্মি' আমিই ব্রহ্ম তখন শিউরে উঠতে হয়।

—বলেন কি মহারাজা ?

—উনি হিন্দুদের অবতার সেজে বসতে চাচ্ছেন—মুসলমানদের পয়গম্বর হতে চাচ্ছেন—দুই একসঙ্গে। হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান সব ধর্মের মানুষের কাছে শুধু দণ্ডমুণ্ডের মালিক, ইহকালের সম্রাট নয়, পরকালের জন্মজন্মান্তরের বিধাতা হতে চাচ্ছেন। মহারানা, মুঘল বাদশাহদের মধ্যে হিন্দুদের বড় ক্ষতি করেছিলেন বাদশাহ

জালালউদ্দিন আকবর। তারপর এসেছেন এই মুহম্মদ দারা সিকো! বাদশাহ সাজে সয়—এ তো সহ্য হবে না মহারানা।

ঠিক এই সময় সামনে এসে থমকে দাঁড়ালেন শাহবুলন্দ ইকবাল শাহজাদা দারা সিকো। দারা সিকো চলে গেলেন। মহারানা আলোচনার পরিত্যক্ত সূত্র তুলে নিয়ে বললেন—আপনি অত্যন্ত বক্রদৃষ্টিতে সমস্ত কিছুকে দেখছেন মহারাজা।

—চুপ করুন—শাহজাদা ঔরংজীব শাহজাদা মুরাদবক্স আসছেন।

—বন্দেগী শাহজাদা!

—সালাম। মহারাজা জয়সিং আপনি আমাদের আত্মীয় হচ্ছেন কিছুদিনের মধ্যে। অত্যন্ত আনন্দের সংবাদ।

—অবশ্যই আনন্দের কথা হবে শাহজাদা। বাবর-শাহের বংশের সঙ্গে সম্বন্ধসূত্রে আমরা বরাবরই গৌরব অনুভব করি। আপনাদের এ অসীম অনুগ্রহ! তবে আজ আমরা আপনার সৌভাগ্যে সবথেকে সুখী হয়েছি। দীর্ঘদিন পর শাহজাদা ঔরংজীব আজ দরবারে এসে দরবারের শোভা বৃদ্ধি করেছেন।

—মহারাজার এ কথাগুলি আমার অন্তরে লেখা হয়ে রইল—চিরকাল মনে থাকবে। কোন দিন মহারাজা যদি আমার গরীবখানায় আসেন তাহলে সুখী হব।

মহারানা যশোবন্তসিংহ ততক্ষণে অনেকটা সরে গেছেন সেখান থেকে। তিনি এই শাহজাদাটিকে আদৌ পছন্দ করেন না।

শাহজাদা এগিয়ে গেলেন।

শাহজাদা দারা সিকোর লোক এসে দাঁড়াল মির্জারাজার কাছে।

ঊনচল্লিশ

"ভাইজান, বাদশাহ আকবরশাহ সাদি করেছিলেন আম্বেরের রানা ভগবানদাসের বহেনকে। হিন্দুস্থানে কাশ্মীর পাঞ্জাব আর রাজস্থানে রূপ আছে। বাকী হিন্দুস্তানের কোথাও রূপ নেই। নিতান্তভাবেই কালাআদমীর মুল্ক। কিন্তু আকবরশাহ ভগবানদাসের বহেনকে রূপের জন্য সাদি করেন নি। করেছিলেন হিন্দুস্তানের মসনদ কায়েম করবার জন্য। ভগবানদাসের বহেনকে সাদি করে মহারানা মানসিংহের মত মহাবীরকে পেয়েছিলেন তাঁর সেনাপতি হিসেবে। ছেলে শাহজাদা সেলিমের সাদি দিয়েছিলেন ভগবানদাসের বেটীর সঙ্গে। আরও এক রাজপুত মেয়ের সঙ্গে ছেলের সাদি দিয়েছিলেন—মোটারাজা উদয়সিংহের বেটী রাজকুমারী মানমতীর সঙ্গে। রাজকুমারী মানমতী—জগৎগোসাঞীন—আমাদের দাদিয়া। বাদশাহ সাজাহানের মা। আকবরশাহের আমল থেকে তিন তিন পুরুষ চাঘতাই বাদশাহ বংশের সব থেকে বড় ভরসা রাজপুত তলোয়ার। আজও মির্জারাজা জয়সিংহ বাদশাহের সব থেকে বিশ্বাসভাজন এবং সব থেকে বড় ভরসাস্থল। মহারানা যশোবন্তসিংহ আগুনের মত প্রচণ্ড; তার ঔদ্ধত্য এবং উগ্রতা সর্বজনবিদিত। কিন্তু তাও হিন্দুস্তানের বাদশাহকে সহ্য করতে হয়। তার কারণ এদের রাজপুত সৈন্যবল এবং এদের বিশ্বস্ততা। এরা যাকে কথা দেয় তার জন্য প্রাণ দেয়। বিশ্বাস এরা রাখতেই জানে—ভাঙতে জানে না। যুদ্ধক্ষেত্রে এরা শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করে প্রাণ দেয় কিন্তু প্রাণ বাঁচানোর জন্য পরাজয় মেনে নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালায় না। এই সমস্ত কারণেই আজও বাদশাহ সাজাহানের বাদশাহীর আমলেও মহাবৎ খাঁ দিলীর খাঁ মাতুল সায়েস্তা খাঁয়েদের মত মনসবদার জঙ্গবাহাদুর থাকতেও কাফের রাজা মির্জা জয়সিং মহারানা যশোবন্তসিং হিন্দুস্তানের মসনদের দুই পাশে দুজন দাঁড়িয়ে আছে।

শাহজাদা ঔরংজীব, তুমি দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান, শ্রেষ্ঠ সাহসী কঠোর বাস্তববাদী—কিন্তু তুমি শাহবুলন্দ ইকবাল শাহজাদা দারাসিকো এবং হজরতবেগম জাহানআরা দিদিজীর সুলেমান সিকোর সাদির সম্বন্ধের মতলবটাকে ঠিক ঠাওর করতে পারছ না কেন? করতে পারছ না এ কথা আমি বিশ্বাস করি না—মনে হচ্ছে তুমি যেন উপেক্ষা করছ। এর উপর যেন আমরা যে গুরুত্ব দিতে চাই তুমি তা দিতে চাচ্ছ না।

সুলেমান সিকোর এই বিবাহপ্রস্তাব যখন প্রথম হয় তখনকার কথা তোমার নিশ্চয় মনে আছে। দিদিজী জাহানআরা বেগমের আরোগ্য সমারোহের সময়। আজ থেকে আট বছর আগে।

বাদশাহ নবাব সুলতানদের বাড়িতে তাঁদের লেড়কারা চোদ্দ পনের বছরে পড়লেই তাদের তরিবত তালিম দেওয়া হয়; তামাকুন থেকে ঔরতের আস্বাদের মধ্যে দিয়ে আমীরীর সহবত শেখানো হয় তাদের। সতেরো আঠারো বছরে পড়লেই তাদের সাদির সম্বন্ধ হয়। সাদিও হয়।

শাহজাদা শাহবুলন্দ ইকবালের সাদি হয়েছে আঠারো বছরে। তোমার সাদি হয়েছে উনিশ বছরে। শাহজাদাদের সাদি কম বয়সেই হয়ে থাকে। এবং সাদি যখন হয় তখন শুধু মেয়ের সুরত আর সহবতই দেখা হয় না, শুধু বংশগৌরবও দেখা হয় না, দেখা হয় মেয়েদের বাপেদের গুষ্ঠী কতখানি রাজ্যের বাদশাহীর কাজে লাগবে। এ সবই সত্যি। কিন্তু নয় দশ বছরের শাহজাদা সুলেমান সিকোর সাদির প্রস্তাবের কথা উঠতেই তোমাকে বলেছিলাম এর ভিতর থেকে তুমি বের করো লুকানো মতলবের গুরুত্ব।

আম্মাজানের মৃত্যুর পর আলাহজরত একদিকে দিদিজী জাহানআরা বেগমের অন্যদিকে ভাইসাহেব দারাসিকোর হাতের খেলার পুতুল হয়ে উঠেছেন। তাঁর সব স্নেহ সব মমতা তাঁদের উপর। তোমাকে তিনি সন্দেহ করেন সে তুমি জান। তোমাকে

বলেন সাদা সাপ। তাই জাহানআরা বেগম এবং দারাসিকোর এই মতলববাজিকে তিনি বুঝেও সমর্থন করছেন। না হলে শাহানশাহ কখনও ওই দশ বছরের পৌত্র সুলেমান সিকোর সঙ্গে মির্জারাজা জয়সিংহের ভাগ্নীর বিয়ের প্রস্তাবের মধ্যে তামাম হিন্দুস্তানের হিন্দু-মুসলমানের কল্যাণ দেখতে পেতেন না।

শুধু তাই নয়, শাহজাদা দারাসিকোর ইসলাম-বিরোধী কার্যকলাপ তুমি দেখেও দেখলে না। দারাসিকো যত সুফী মৌলানা ভ্রষ্ট ফকীর, হিন্দু সন্ন্যাসী পণ্ডিত, ক্রীশ্চান পাদরী, ইহুদী রাব্বিদের নিয়ে নূতন ধর্মমত সৃষ্টি করে মুসলমানের কাছে পীর আর হিন্দুর কাছে অবতার সাজতে চাচ্ছে, সে চেষ্টাকেও তুমি বাধা না দিয়ে প্রকারান্তরে সমর্থন করেছো ভাইজান। এ বিষয়ে তোমাকে আমি বার বার হুঁশিয়ার করেছি। তুমি এদিকে ফিরে তাকাও নি।

শাহজাদা দারাসিকো চিরকালই মধ্যে মধ্যে পয়গম্বর সেজে বসবার মত পাগলামি করে সে তুমি জান। তার মাত্রা আজকাল বেড়েছে। তার নাকি দিব্যদর্শন হয়। স্বর্গের দেবদূতরা তাকে দেখা দেয়, কথা বলে। শাহজাদা দারাসিকো নয়া হিন্দুস্তান তৈরি করবে। সে হিন্দুস্তানে হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানের কোন বিদ্বেষ থাকবে না। সারা হিন্দুস্তান চাঘতাই বংশের দারাসিকোর মধ্যে শুধু এক বাদশাহকেই পাবে না—তার মধ্যে মুসলমানেরা পাবে এক নতুন পয়গম্বরকে আর হিন্দুরা পাবে তার মধ্যে এক নতুন অবতারের মত পুরুষকে। অর্থের জন্য হিন্দু পণ্ডিতেরা ও হিন্দু সন্ন্যাসীরা এতে সায় দেবে। তুমি জান কাশী থেকে দিল্লী পর্যন্ত হিন্দুদের তীর্থস্থলে দারাসিকো দান করে এবং হিন্দু শাস্ত্র আরবী পারসীতে অনুবাদ করিয়ে তা থেকে নতুন শাস্ত্রের মৌলানা হবার চেষ্টা অনেক দিন থেকেই করছে। এই কয়েক বছরের মধ্যে দারাসিকোর নাম করতে হিন্দু পণ্ডিতেরা সন্ন্যাসীরা বিগলিত হয়।

এর সঙ্গে আছে সুফী মৌলানার একদল। আর আছে একদল

মুসলমান ফকীর। এ কুহকের দেশ ঔরংজীব। এদেশে বাস করে এদেশের পানি আর এদেশের হাওয়াতে নিশ্বাস নিয়ে ইসলামের খ দিমেরও বিভ্রম জন্মায়। জোলা মুসলমানের ছেলে কবীর কাফেরের ধর্মের হরিকে কিষণকে ভজন করে। হিন্দু মুসলমান দুই দলেরই সাধারণ মানুষের কাছে কবীর সন্ত।

সন্ত কবীরের এক শিষ্য হিন্দু ফকীর বাবালাল দারাসিকোর কাছে গুরুর মত। এই কাফের সন্ন্যাসী নাকি অনেক বুজরুগি জানে। দারাসিকো বাবালালের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে চলেছে।

মুল্লা শাহ ফকীর বিখ্যাত ফকীর। তিনি দারাসিকোর গুরু। তাঁর সমস্ত যোগশক্তি দারার কল্যাণে তিনি ব্যবহার করছেন। দিদিজী জাহানআরা তাঁর দীক্ষিত শিষ্যা। দিদিজী নাকি মুল্লা শাহের অনুগ্রহে যোগবলে খুদ পয়গম্বর রসুলকে দেখতে পেয়েছে ধ্যানের মধ্যে। শাহজাদা দারাসিকো তাঁর অনুগ্রহে দেবদূতদের দেখতে পাচ্ছে, কথাবার্তা বলছে। সারা হিন্দুস্তানে তার সঙ্গে দক্ষিণেও ঠিক এইভাবে ইসলামকে কাফেরী মিথ্যার মধ্যে মিশিয়ে দিয়ে বরবাদ করার একটা চেষ্টা দিন দিন প্রবল হয়ে উঠছে—এটা কি তুমি দেখতে পাচ্ছ না ঔরংজীব?

সব থেকে আপসোস কি বাত ভাইসাব যে শাহানশাহ বাদশাহ সাজাহান যিনি তাঁর বাপ জাহাঙ্গীরের মত নন। যিনি তাঁর পিতামহ আকবরশাহের মতও নন। বাদশাহ জাহাঙ্গীর ছিলেন দারু আর ঔরতের নেশায় প্রমত্ত—এক গুনাহগারির আসামী; বাদশাহ আকবর ছিলেন অতি চতুর সুকৌশলী নাস্তিক। দারাসিকোর প্রথপ্রদর্শক তিনি। ইসলামের খাদিম হয়েও তিনি হিন্দুস্তানে বাদশাহী কায়েম করবার জন্য ইলাহী ধর্ম চালাতে চেয়েছিলেন। নিজে হতে চেয়েছিলেন তার পয়গম্বর। আকবরশাহকে মুসলমানেরা বলে দজ্জাল। কিন্তু শাহানশাহ সাজাহান তাঁদের মত নন। হিন্দুরা তাঁকে ভয়ে বলে দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা। মুসলমানেরা শ্রদ্ধার সঙ্গেই বলে

'মেহেদী'। এই বাদশাহ সাজাহান পুত্রস্নেহে এবং কন্যাস্নেহে অন্ধ হয়ে দারাসিকোর এই অধর্মের পাপের গুনাহের এই নয়া মঞ্জেলের ভিত্ কে স্নেহের এবং প্রকারান্তরে সমর্থনের মসল্লা যুগিয়ে মজবুদ্ করে দিচ্ছেন। খুদ বাদশাহ সমর্থন করলে সারা মুসলমান জাত শক্তিহীন হয়ে যায়। অন্যদিকে দারাসিকো হিন্দু সন্ন্যাসী হিন্দু পণ্ডিতদের হিন্দু দেবস্থানে নাথরাজ দিয়ে দান করে তাদের সমর্থন পেয়েই বসে নেই। হিন্দুস্তানের রাজা মহারাজাদের সে নিজের দলে টানছে। নিজের জীবনের সঙ্গে জড়াচ্ছে। শাহজাদা ঔরংজীব জানে যে যশোবন্তসিংহ তার দারুণ বিরোধী। চিতোরের মহারানার বিরোধ মুঘল বাদশাহীর সঙ্গেই। তবু তিনি বোধ হয় দারাসিকোর পক্ষপাতীই হবেন। এর উপর এবার মির্জারাজা জয়সিংহের সঙ্গে শাহবুলন্দ ইকবাল ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধসূত্রে জড়াচ্ছেন নিজেকে। আট বছর আগে সুলেমান সিকোর সঙ্গে মির্জারাজার ভাগ্নীর সঙ্গে সাদির একটা কথা হয়েছিল। এবার সেটা পাকাপোক্ত হতে চলেছে শাহজাদা ঔরংজীব। এ সম্বন্ধে আমি আট বছর আগের সেই প্রথম দিন থেকেই সতর্ক ছিলাম। এবং তোমাকেও সতর্ক করতে চেয়েছিলাম। তোমার নিশ্চয় মনে আছে, আমি তোমাকে সেই দিদিজীর আরোগ্য সমারোহের দিন—কথাটা প্রথম কানে আসতেই—ওয়াকিবহাল এবং হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলাম। বলেছিলাম মির্জারাজা যাতে এ প্রস্তাবে মত না দেন তার জন্যে তুমি চেষ্টা করো। জানি এ অত্যন্ত দুরূহ কাজ। বাদশাহ সাজাহানের পৌত্রের সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান আর শেরের বাড়ানো থাবার তলা থেকে তার মুখের আহার মাংসের টুকরা কেড়ে নেওয়া এ দুয়ের মধ্যে কোন তফাত নেই। যে নিতে চেষ্টা করে তার জান যাবেই শেরের থাবায়। আর বাদশাহের প্রস্তাব প্রত্যাখানের জবাব যে জহ্লাদের কুঠার মারফত আসে এ কারুর অজানা নয়। তবু এ চেষ্টা তোমার করা উচিত ছিল। তা তুমি কর নি।"

*

শাহজাদা ঔরংজীব একখানা চিঠি পড়ছিলেন ; চিঠিখানি লিখেছেন তাঁর প্রিয় বহেন দিদিজী রৌশনআরা বেগমসাহেবা।

শাহজাদী জাহানআরা বেগমের আরোগ্য সমারোহের দিন থেকে আট বছর চলে গেছে। অনেক পরিবর্তন হয়েছে, অনেক ঘটনা ঘটেছে। অনেক।

শাহজাদা ঔরংজীব সেদিন বাদশাহের মার্জনা পেয়েছিলেন। দারাসিকোর মঞ্জেলে মাটির নীচে আরামখানায় যে ঘটনা ঘটেছিল—ঔরংজীব যা করেছিলেন তার গূঢ় অর্থ বা মর্ম না বুঝেই বাদশাহ তাঁর সব অধিকার কেড়ে নিয়ে তাঁর বাড়িতেই নূরমঞ্জেলে একরকম কয়েদ করে রেখেছিলেন। জাহানআরা বেগমই তাঁর আরোগ্য সমারোহের দিনে বাদশাহকে এই গূঢ় অর্থ বুঝিয়ে বলেছিলেন এবং বাদশাহ বুঝেছিলেন। বুঝে ঔরংজীবকে মার্জনা করে দরবারে আসবার অধিকার ফিরে দিয়েছিলেন—তাঁর মনসব ফিরে দিয়েছিলেন—তাঁকে নতুন খেলাতও দিয়েছিলেন। এবং মাস দেড়েকের মধ্যেই তাঁকে গুজরাটের সুবাদার করে পাঠিয়েছিলেন গুজরাট আহমেদাবাদ।

গুজরাটের সুবাদারি সহজ নয়। সে এক কঠিন দায়িত্ব। গুজরাট অনুর্বর দেশ। ঊষর প্রান্তর আর সমুদ্রতটে লবণাক্ত জলাভূমি গুজরাটের বিশাল অংশ জুড়ে রয়েছে। অন্নহীনের দেশ। দেশে দুর্ভিক্ষ আর দৌরাত্ম্য চিরস্থায়ী বাসা বেঁধে রয়েছে। মানুষেরা অশান্ত ; অন্নহীনের শান্তি কোথায় ? চুরি ডাকাতি রাহাজানি এখানে চলে আসছে আবহমানকাল ধরে। মানুষেরা এখানে দেহের বল আর মনের ক্ষোভ নিয়ে বসে আছে। যে কোন একজন নেতা পেলেই হল—তারা লুঠেরার বা ডাকাতের দল তৈরি করে রাজস্থানের মরুভূমি থেকে আরব সাগরের তটভূমির জলা অঞ্চল পর্যন্ত অবাধে চালিয়ে যাবে হত্যা আর লুণ্ঠন, লুণ্ঠন আর হত্যা। বিশেষ করে কাথী আর কুলি সম্প্রদায়ের দুর্ধর্ষপনায় গুজরাটকে চিরদিন সমস্যাজটিল করে রেখেছে।

রাজনৈতিক দুরাকাঙ্ক্ষা যারা তারা এখানে এসে বসলেই অল্প দিনের মধ্যে একটি দুর্ধর্ষ সৈন্যদল গড়ে তুলতে পারে। বেতন তোমাকে নগদ দিতে হবে না। শুধু এই অঙ্গীকারটুকু দিতে হবে যে, লুণ্ঠনরাজ্যে কোন বাধানিষেধ থাকবে না। বাদশাহ আকবরশাহ গাজীর আমল থেকেই বাদশাহী দপ্তরে গুজরাটকে বলা হয় 'লস্কর খেজ'। অর্থাৎ ভাড়াটে সিপাহীর মুল্ক। আকবরশাহের আমলে গুজরাট ছিল সেই অশান্ত গুজরাট, ডাকাতি রাহাজানির সুবা গুজরাট। জাহাঙ্গীরশাহের আমলেও গুজরাট সেই গুজরাট। শুধু দুই বাদশাহ এইটুকু করেছিলেন যে শহর এবং নগরগুলিকে পাঁচিল দিয়ে ঘিরে খানিকটা নিরাপদ করে তুলতে পেরেছিলেন। শহরের ভিতরে গুজরাটের শিল্প তখন জন্ম নিতে শুরু করেছিল। বাদশাহ সাজাহান তাঁদের পর গুজরাটকে খানিকটা কবজায় এনেছেন। খানখানান আজম খাঁ সাহেবকে সুবাদার করে পাঠিয়েছিলেন। কড়া মানুষ, সাহসী মানুষ আজম খাঁ খান-ই-খানান সাহেব। তিনি সারা গুজরাট চষে বেড়িয়েছেন তাঁর দুর্ধর্ষ ফৌজ নিয়ে। বড় বড় ডাকাতের দলকে তাড়া করে নিয়ে গিয়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করতে বাধ্য করেছেন। যুদ্ধে তারা অধিকাংশই মরেছে। কিছু হার মেনে ধরা পড়েছে। তাঁদেরও তিনি মাফ্ করেন নি। জহ্লাদ দিয়ে তাদের মাথা গড়িয়ে দিয়েছেন।

নওয়ানগরের নবাব এই ডাকাতদলের পৃষ্ঠপোষক ছিল। তাকে শায়েস্তা করেছেন। নিয়মিত বাদশাহী সেলামী আর খাজনা পাঠাচ্ছিল নবাব তখন। পথঘাটও কিছু কিছু নিরাপদ হয়েছে। গুজরাট তখন অপেক্ষাকৃত শান্ত। কিন্তু আগুন নেভেনি। যেখানে যে মাটিতে অন্ন ফলে না, যে মাটির তলায় ধরিত্রীমায়ের স্নেহ নেই, স্তন্য নেই—সেখানে জমা আছে বুকের আগুন। সে আগুন নেভে না। অন্ততঃ সেকালে লোকে তাই ভাবত। এই গুজরাটে বাদশাহ পাঠালেন শাহজাদা ঔরংজীবকে।

অবশ্য বাদশাহ তাঁকে দিল্লীতে রাখতেও চেয়েছিলেন। বোধহয় চোখের উপর রাখতে চেয়েছিলেন। তাতে ঔরংজীবের আপত্তি ছিল না। কিন্তু বড়ভাই দারাসিকোর প্রাধান্য এবং কাফেরী এ তাঁর কাছে ছিল অসহ্য। আগ্রা শহর বাদশাহী দরবার থেকে যে কোন দেশে চলে যেতে চেয়েছিলেন তিনি।

বাদশাহ জিজ্ঞাসা করেছিলেন—গুজরাটে যাবে তুমি? রাজী আছ?

বলেছিলেন নিজে নয়, দিদিজীউ জাহানআরার মারফত।

ঔরংজীব বলেছিলেন—গুজরাট শাসন করে বাদশাহের বাদশাহীর গৌরববৃদ্ধির জন্য নিজেকে নিয়োগ করতে পারব এ আমার কাছে আগ্রার শান্তি এবং সুখ থেকে অনেক বেশী মূল্যবান। আমি যেতে পারলে সুখী হব। গৌরবান্বিত বোধ করব।

বাদশাহ তাঁকে গুজরাটে পাঠিয়েছিলেন।

শাহজাদা ঔরংজীব গুজরাটে এসেই সুবাদার খানখানান আজম খাঁয়ের কড়া শাসনকে আরও কড়া করে তুলেছিলেন। কয়েক মাসের মধ্যেই একটা প্রকাণ্ড বড় রাহাজানের দলকে বন্দী করে এনে কঠিনতম শাস্তিবিধান করে সারা গুজরাটকে আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলেছিলেন।

প্রায় ষাট জন অপরাধী।

বয়স ষোল থেকে ষাট। দুর্ধর্ষ নিষ্ঠুর কঠিনচিত্ত মানুষ সব।

শাহাজাদা দিয়েছিলেন মৃত্যুদণ্ড। কিন্তু সে দণ্ড একেবারেই শিরশ্ছেদ নয়। ধীরে ধীরে অঙ্গচ্ছেদ করতে করতে শেষ হবে শিরশ্ছেদ।

প্রথমে আঙুল কাটা হবে। দ্বিতীয় দিন কজা থেকে হাতের তালু। তারপর এক এক করে হাত। তারপর পা। তারপর নাক কান। অবশেষে গর্দানে কুঠারের আঘাত করে মুণ্ডটাকে গড়িয়ে দেওয়া হত।

এই দুর্ধর্ষ ডাকাতগুলি যারা বাদশাহী ফৌজের সঙ্গে সমান বিক্রমে লড়াই করে—যারা দুর্দান্ত সাহসে মরুভূমির ঝড়ের মত ঘুরে বেড়ায়—যারা নিষ্ঠুর যন্ত্রণার মধ্যেও মুখ বন্ধ করে রাখে লোহার সাঁড়াশির মত শক্ত করে, তারাও দু দিন বা তিন দিনের পর চিৎকার

করেছে। চীৎকার তারা করত যখন তাদের নাক কান কাটা হত তখন। আগুনের আঁচে লাল করে সাঁড়াশি তাতিয়ে সেই সাঁড়াশি দিয়ে ধরে নাকটাকে টেনে ছিঁড়ে নেওয়া হত।

জহ্লাদেরা পর্যন্ত ক্লান্ত এবং আতঙ্কিত হয়ে পড়ত। কিন্তু শাহজাদা ঔরংজীব যেমন শক্ত মানুষ তেমন শক্ত এবং কঠিন মানুষও স্বাভাবিকভাবে তাঁর কাছে এসে জুটেছিল। আগ্রা থেকে তাঁর সঙ্গে এসেছিল সুলেমন খাঁ।

এ সুলেমন সেই সুলেমন। যে সুলেমন দিল্লীর তুঘলকাবাদে ফকীর সারমাদের প্রার্থনাসভায় গোলমাল করে লাঞ্ছিত হয়েছিল। যে থাট্টা বন্দরে ইরানী সওদাগর সৈদ মহম্মদের সঙ্গে ঝগড়া করেছিল।

সুলেমন খাঁর বাড়ি বাংলাদেশে।

বাংলাদেশের সম্পত্তিবান ঘরের ছেলে। যার বোনকে নদীপথে ডাকাতেরা লুঠ করে নিয়ে যায়। বোনকে সে উদ্ধার করেছিল কিন্তু তাকে তার স্বামী শ্বশুরেও নেয় নি—তার বাপ মায়েও নেয় নি। সঙ্গে সঙ্গে সুলেমনও ঘর ছেড়েছিল। ছেড়েছিল জাত ধর্ম। তারপর আট দশজন জাত-যাওয়া জেলের ছেলেকে নিয়ে একখানা বড় নৌকায় ভেসেছিল দরিয়ার জলে। বাংলা মুল্ক থেকে এসেছিল করাচী। করাচী থেকে এসেছিল আগ্রা। আগ্রা থেকে এসেছে সে শাহজাদা ঔরংজীবের সঙ্গে।

আশ্চর্য কঠিন এবং অনুত্তপ্ত মানুষ সুলেমন খাঁ।

একলা সুলেমন খাঁ তামিল করেছিল শাহজাদার হুকুম। ষাটজন জোয়ানের আঙুল থেকে একে একে কব্জি হাত পায়ের খানিকটা, সব শেষে তপ্ত সাঁড়াশি দিয়ে নাক কান ছিঁড়ে নিয়ে তাদের মুণ্ড কেটেছে। একনাগাড়ে সাত দিন ধরে চলেছিল এই শাস্তিদানপর্ব। দর্শকেরা দেখতে পারে নি। রাজপুরুষেরাও রাত্রে দুঃস্বপ্ন দেখেছে। কিন্তু সুলেমন খাঁ বিচলিত হয় নি।

শুধু একবারই নয়। বৎসরখানেক ধরে শাহজাদা ঔরংজীব এই অভিযান চালিয়েছিলেন। এবং এই সময়ের মধ্যে সারা গুজরাটের বিকেলে পেটের জ্বালায় ক্ষুব্ধ ক্ষুধাতুর মানুষেরা, যারা লুঠেরা এবং ডাকাত হয়েছে বংশানুক্রমিকভাবে, তারাও বিভীষিকাগ্রস্ত হয়ে পিছন হটেছিল। বাদশাহী সিপাহীরা যারা শাহী অধিকার নিয়ে শাসনের নামে নরহত্যা করে যুদ্ধের নামে, তারাও ক্লান্ত হয়েছিল। কর্মচারীরাও ক্লান্ত হয়েছিল। সকলেই চেয়েছিল—হত্যা কর একেবারে কর। যুদ্ধে পরাজিত মানুষদের মানুষের মত মরবার সুযোগ দাও অধিকার দাও। জন্তুর মত মেরো না। কিন্তু শাহজাদা ঔরংজীব তা শোনেন নি। তিনি স্থির অটল ছিলেন আপনার সংকল্পে। তাতে অক্লান্ত সহায়তা করেছে এই সুলেমন খাঁ। ফল ফলল তার। সারা গুজরাটের বালি পাথর ভরা বন্ধ্যা মাটি জলাভূমি শিউরে উঠল। শান্ত হয়ে এল গুজরাট।

শাহজাদা ঔরংজীব ডাকাত লুঠেরাদের পৃষ্ঠপোষক জমিদার বানিয়া এবং কয়েকটা মঠের ভণ্ড মহান্তদের শাস্তি দিয়ে তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে দিল্লীতে বাদশাহের দরবারে নজরানা উপঢৌকন পাঠালেন এবং পাঠালেন গুজরাটের খাজানা।

সুবা গুজরাটের জমা ওয়াসিল বাকীর কাগজে নতুন হিসাবের পত্তন হল। শাহানশাহ বাদশাহের পুত্রস্নেহেরও ঊর্ধ্বে আছে সদাজাগ্রত বাদশাহী বিচারবোধ। রাখতে তিনি বাধ্য হন। হয়তো বা তাঁর হৃদয়ের মিনতিকে লঙ্ঘন করে এই বিচারবোধকে প্রাধান্য দিতে হয়। বাদশাহ শাহজাদা ঔরংজীবের পদমর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। মনসব বাড়িয়েছেন, তনখা বাড়িয়েছেন। পোশাক পাঠিয়েছেন।

শাহজাদা ঔরংজীব সেদিন প্রসন্ন হাস্যের সঙ্গেই বাদশাহের পাঠানো পোশাক পরে দরবার করেছিলেন। সুলেমনকে তিনিও পুরস্কৃত করেছিলেন। কিন্তু গুজরাটের সুবাদারী বেশীদিন স্থায়ী হয় নি। অকস্মাৎ তাঁকে বদলী করা হয়েছিল বল্‌খে।

বল্‌খ্‌ বাদাকশান। হিন্দুকুশের এলাকায়।

বল্‌খ্‌ বাদাকশান—তার সঙ্গে কান্দাহার। সুদীর্ঘ এবং নিষ্ঠুর সংগ্রাম। প্রথম শাহজাদা ঔরংজীব ভেবেছিলেন তাঁর উপর এই ভারার্পণ শাহানশাহ পিতার গুণগ্রাহিতার পরিচয়। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর শক্তির পরিমাণ এবং সেই শক্তিকে সফল হবার সুযোগ দিতে চেয়েছিলেন।

অকস্মাৎ বাদাকশান আক্রমণ করে বসেছিল হিন্দুস্তানের বাদশাহী ফৌজ। আক্রমণ করেছিল এবং জয় করেছিল। তারপর উজবেগইস্তানের উজবেগদের সঙ্গে বেধেছিল লড়াই।

সেই লড়াইয়ে হিন্দুস্তানের বাদশাহের ইজ্জৎ রাখবার জন্যই বাদশাহ সাজাহান নির্বাচিত করেছিলেন শাহজাদা ঔরংজীবকে।

প্রথমটা তাই অন্ততঃ ভেবেছিলেন শাহজাদা ঔরংজীব। বাদশাহ লাহোরে এসে দরবার করে শাহজাদা ঔরংজীবকে বল্‌খ্‌ বাদাকশানের কাবুলের সুবাদার নিযুক্ত করে পোশাক মুক্তার মালা খেলাত দিয়েছিলেন। পঞ্চাশ লাখ রূপেয়া সিক্কার থলি ছিল তাঁর সঙ্গে। সগৌরবে বাদশাহী খেলাত তিনি গ্রহণ করেছিলেন। ভাবতে পারেন নি তিনি—। হ্যাঁ, তিনি ভাবতেও পারেন নি যে, বাদশাহ তাঁর অপদার্থ, ভণ্ড, ধর্মবিশ্বাসহীন, কাফেরের চেয়েও কাফের, দারাসিকোর পথের কাঁটা তিনি, তাঁর ধার ভোঁতা করবার জন্য এবং তাঁর অর্জিত সকল গৌরবকে হিন্দুকুশের পথের ধুলা আর তুষারের মধ্যে চিরকালের মত চাপা দেবার জন্য ইচ্ছা করেই তাঁকে এইভাবে ঠেলে দিয়েছেন। এ বিশ্বাস সেদিন তিনি করেন নি, ভাবতেই পারেন নি। কিন্তু আজ এতে আর তাঁর বিন্দুমাত্র সংশয় নেই।

শাহজাদা ঔরংজীবের মুখ লাল হয়ে উঠল।

বাদশাহ সাজাহান তাঁকে বলেন সাদা সাপ। শাহজাদা ঔরংজীবের দেহবর্ণ সকল ভাই বোনের মধ্যে উজ্জ্বল। শুভ্র বর্ণ। চোখের তারা দুটি একসঙ্গে নীল এবং পিঙ্গল দুই-ই। চোখের ক্ষেত

বরফের মত ঝকঝক করে। শাহজাদার মুখ চোখের হরিদ্রাভ শুভ্রতা অকস্মাৎ রক্তোচ্ছ্বাসে ভরে উঠল। নিষ্ঠুর ক্রোধে আক্রোশে কপালের শিরাগুলি দপদপ করে লাফাচ্ছে। শাহজাদা একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পিছনে আবদ্ধ হাত দুখানির বাঁধা মুঠি ছেড়ে দিয়ে ডান হাতে রগ টিপে ধরলেন—বাঁ হাতে ধরা চিঠিখানিকে আবার চোখের সামনে এনে ধরলেন।

* * * *

শাহজাদা তাঁর প্রিয় ভগ্নী শাহজাদী রৌশনআরা বেগমসাহেবার পত্র পাঠ করছিলেন। শাহজাদী পত্র পাঠিয়েছেন। দীর্ঘ পত্র।

রৌশনআরার মত শুভাকাঙ্ক্ষিণী কি শুভাকাঙ্ক্ষী দ্বিতীয় কোন জন আর নাই এ দুনিয়ায় এ কথা ঔরংজীব জানেন।

বহেন রৌশনআরা লিখেছেন—"ঔরংজীব, বাবরশাহের প্রতিষ্ঠিত এই হিন্দুস্তানের বাদশাহী মসনদে দারাসিকোর মত একজন ভণ্ড আধা কাফের বসবে—ইসলামকে বরবাদ করবে এ আমি ভাবতেও শিউরে উঠি। আমি জানি সে তুমিও ওঠো। কিন্তু আমার নালিশ—তুমি গুজরাটে বাদশাহী শাসন কায়েম করে শৃঙ্খলা এনে বাদশাহী সমাদর পেয়ে এবং বল্‌খ্‌ বাদাকশানে যে অপূর্ব বীরত্ব দেখিয়ে বাদাকশানের দুর্ধর্ষ অধিবাসীদের উজবেগইস্তানের উজবেগদের পরাস্ত করেছ, শ্রদ্ধা অর্জন করেছ, তার গৌরবের আনন্দের মধ্যে তুমি ভবিষ্যতের কথা ভুলে গিয়েছিলে।

মির্জারাজা জয়সিংহ সারা হিন্দু ভারতের সম্ভবতঃ শ্রেষ্ঠ বিচক্ষণ রাজা। শুধু রাজাই তিনি নন। তিনি যোদ্ধা—যুদ্ধ পরিচালক, শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ্‌। শাহজাদা দারাসিকোর তিনি মেহমান হবেন। শাহজাদা দারাসিকোর জ্যেষ্ঠপুত্র শাহজাদা সুলেমান সিকো। একদিন দিল্লীর মসনদে বসবে সুলেমান। মির্জারাজা কেনা হয়ে গেলেন। বেটীর খৎ কঠিন খৎ শাহজাদা ঔরংজীব।

এই খতের দায় বন্ধকী তমুসুদ খতের মতই কঠিন—সারা জিন্দগী

তমুস্সুদ খতে বাঁধা পড়ে। এ তমুস্সুদ কখনও শোধ হয় না। সুদের উপর সুদ চড়ে যায়। যে চালাতে পারে তার সুদের সুদ চলে। এই খতের ভয়েই বাদশাহ আকবরশাহ রেওয়াজ করে গেছেন যে চাঘতাই বাদশাহ বংশের শাহজাদীদের সাদী হবে না।"

শাহজাদা ঔরংজীব চিঠিখানা আবার চোখের সামনে থেকে নামালেন। একটি অতি বিচিত্র হাসি তাঁর দুটি ঠোঁটের মিলিত রেখার গণ্ডীর মধ্যে ফুটে উঠল। তিনি আসন ছেড়ে উঠে একটি সুদৃশ্য পেটিকা বের করলেন একটি সিন্দুক থেকে। পেটিকাটি খুলে বের করলেন কয়েকখানি চিঠি। কয়েকখানার মধ্যে একখানা খুললেন। পড়লেন—।

"মহারানা যশোবন্তসিংহ হিতাহিতজ্ঞানরহিত একজন উদ্ধত গোঁয়ার ছাড়া অন্য কিছুই নহে। তাহার বীরত্বের মূল্য যুদ্ধজয়ের দিক দিয়া খুব বেশী নহে। তবে হ্যাঁ, দাঁড়াইয়া মরিবার হিসাব কষিলে মূল্য একটা আছে। সে আমার নিন্দা রটনা করিতেছে একটা গুজবের উপর। একটি দশ বৎসরের বালকের সঙ্গে একটি পাঁচ ছয় বৎসরের বালিকার বিবাহের কয়েকটা কথার মূল্য কতটুকু বলুন।

আমিও ক্ষত্রিয়। আমার মধ্যেও সে গৌরববোধ আছে। রাজা ভগবানদাস রাজা মানসিংহ আকবরশাহ এবং জাহাঙ্গীরশাহকে ভগ্নীদান করিয়া সারা রাজস্থানে নিন্দাভাজন হইয়াছিলেন। সর্বশেষে মহারানা প্রতাপের কাছে নিদারুণ অপমানে অপমানিত হইয়াছিলেন, সে অপমান রাজপুত হৃদয়কে যতখানি নির্মম আঘাত করে, রাজপুত হৃদয় ঠিক ততখানি সমর্থনও করে মহারানা প্রতাপসিংহকে।

মহারানা প্রতাপসিংহের বংশের পবিত্রতা কে না অক্ষুণ্ণ রাখিতে চায়? বংশধারাকে কে কলঙ্কিত দেখিতে চায়? বিষয়মূল্য অপেক্ষা আত্মিক পবিত্রতার মূল্যকে কে না বড় মনে করে?

হিন্দুর কাছে, বিশেষ করিয়া রাজপুতের কাছে রাজভয়ে ভীত

হইয়া বা রাজ-অনুগ্রহ লাভের জন্য কন্যাদান করিয়া বংশগৌরবকে ক্ষুণ্ণ করার মত অপমান আর হয় না। লঙ্কার যুদ্ধে লক্ষ্মণ শক্তিশেলে আহত হইয়াছিলেন। সে শক্তিশেল উৎপাটিত করিয়া ভগবান রামচন্দ্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই কন্যাদানের শক্তিশেল বংশের ইতিহাসের বুকে চিরকাল গ্রথিত হইয়া থাকিবে। রাজপুত রাজা যে কন্যাকে ভয়ে ভীত হইয়া বা কোন লোভে লুব্ধ হইয়া ভিন্নধর্মাবলম্বীকে দান করে তখন সে কন্যা তাহার নিকট মৃত হইয়া যায়। সে আর কখনও গৃহে ফেরে না।

ইহাতে যখন বাধ্য হইতে হয় তখন আর জ্বালা ও ক্ষোভের সীমাপরিসীমা থাকে না ইহা ভোলা যায় না।

যাই হোক আমার ভাগ্নীর সঙ্গে বাদশাহের পৌত্রের বিবাহপ্রস্তাব নিতান্তই গুজবের সামিল। পুতুলখেলার কথাবার্তার মত। এখনও অনেক দেরি আছে। তবে ভবিষ্যতে এমন যদি ঘটেই; ঘটিতে পারে, বাদশাহী ঘরে পুতুল লইয়া কারবার করিতে গেলেও তার গুরুত্ব অনেক; তাহা হইলেও মির্জারাজা জয়সিং ওই পুতুলটিকে মৃত ভাবিয়াই নিজের রাজধর্ম ও ক্ষাত্রধর্মকে অক্ষুণ্ণ রাখিবেন ইহা নিশ্চিত।”

পত্রখানি থেকে মুখ তুললেন শাহজাদা।

সেই মৃদু হাসিটি এখনও ঠোঁটে ফুটে রয়েছে। পত্রখানি মির্জারাজা লিখেছিলেন তাঁর বিশ্বস্ত বন্ধু এবং তাঁরই সামন্ত নরপতিকে। পথে পত্রবাহককে হত্যা করে পত্রখানিকে সংগ্রহ করে এনেছিল তাঁর বিশ্বস্ত অনুচর সুলেমন খাঁ।

সুলেমন খাঁ সেদিন তাঁকে বলেছিল—খোদাবন্দ, মির্জারাজা যা লিখেছেন তার থেকে সত্য কথা আর হয় না। জনাবআলি, কোন হিন্দুর মাকে যদি কোন ভিন্নধর্মাবলম্বী হরণ করে কি লুঠ করে তবে মাকেও ফিরে নিতে না পারে ছেলে। এত বড় নিষ্ঠুর ধর্ম, এমন পশুর ধর্ম আর নেই। আর এত বড় জ্বালাও আর হয় না খোদাবন্দ।

জাত যাওয়ার মত জ্বালা হিন্দুর জীবনে আর হয় না। জনাবআলি, আমি যে ওই হিন্দু লুঠেরা আর ডাকাতদের কেটে কেটে ক্লান্ত হই না তার কারণ ওই জ্বালা।

শাহজাদা ঔরংজীব পত্রখানি পেটিকার মধ্যে রেখে পেটিকাটিকে সিন্দুকে রেখে বন্ধ করলেন সিন্দুকটি।

আবার খুললেন বহেনজী রোশনআরা বেগমসাহেবার খৎ।—

"আট বছরের পর সেই সম্পর্ক পাতা হতে চলেছে।"

বহেন রৌশনআরা বেগমসাহেবা লিখেছেন—"আমার পিয়ারা ভাইজান নিশ্চয় জানেন যে, কান্দাহার কিল্লা ইরানীদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া সব থেকে কঠিন কাজ জেনেই শাহানশাহ দিদিজী সাহেবা এবং শাহজাদা দারাসিকোর পরামর্শক্রমে তোমাকে সেখানে পাঠিয়েছিলেন। শাহানশাহ শাহবুলন্দ ইকবাল-গত প্রাণ, তার উপর তাঁর প্রিয়তমা কন্যা বড়িবহেন আগ্রা শাহী হারেমের মালকানী হজরত জাহানআরা বেগমসাহেবা শাহজাদার পিয়ারা বহেন। দুজনেই আজমীঢ় দরগার মুরীদ। তিনিও চান যে, শাহানশাহ শাজাহানের পর শাহজাদা দারাসিকো বসেন হিন্দোস্তানের মসনদে ময়ূরতক্তে। জাহানআরা বেগমসাহেবাও তোমাকে এই বিপদের এবং স্থিরনিশ্চিত বার্থতায় লাঞ্ছিত এবং হতমান করবার জন্য কান্দাহার দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। কান্দাহারে ভাগ্যবান দারাসিকো প্রথমবার বিনাযুদ্ধে জয়ী হয়ে ফিরে এসে শাহবুলন্দ ইকবাল হয়েছিলেন। ইরানের, শাহ শাহ আব্বাস পরমেশ্বর লা ইলাহি ইল্লালার অভিপ্রায়ে দুনিয়াদারীর খেলা শেষ করে শেষ ঘুমে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।

শাহজাদা ঔরংজীব, তুমি দুর্দান্ত সাহসী—তুমি রুস্তমের মত বীর। বাল্যবয়সে তুমি উন্মত্ত হাতীর সঙ্গে একা লড়াই করেছ; জয়ীও হয়েছ; কিন্তু সর্বত্রই তুমি অসমসাহসিকতার মধ্যে যে অবিবেচনা এবং বিচক্ষণতা-হীনতা আছে তার পরিচয় দিয়েছ। তুমি জান আগ্রাতে তুমি অতি কূটবুদ্ধির পরিচয় দিতে গিয়ে দারাসিকোর আরামখানা থেকে চলে এসে বাদশাহের যে রোষদৃষ্টিতে পড়েছিলে তা থেকে তুমি যে অব্যাহতি পেয়েছ তা ঠিক তোমার কৈফিয়তের যুক্তিপূর্ণতার জন্য নয়; তোমার যুক্তি অবশ্যই খানিকটা কাজ করেছে। বাদশাহ যখন শাহজাদা খুরম ছিলেন তখন তিনি নিজে পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন—তাঁর বড়ভাই মহারাজা মানসিংহের বহেনের বেটা

শাহজাদা খসরুকে বিদ্রোহ করতে দেখেছেন; তিনি মসনদের প্রলোভনের শক্তি কত তা জানেন। কিন্তু তবুও বলব তোমাকে তিনি শুধু এই যুক্তি এবং নজীরের বলেই মাফ করেন নি। সে-সময় বড়িবহেনসাহেবা আরোগ্য লাভ করে, তাই অন্তরে অন্তরে সত্যই খুব নরম হয়েছিলেন। এ বোধহয় প্রকৃতির নিয়ম—সব মানুষই প্রকৃতির অধীন। এর মূল্য অত্যন্ত কম; এর জন্য অনেক খেসারত দিতে হয়। শাহজাদা ঔরংজীব, এ কথা সেই দিনই আমি তোমাকে বলেছিলাম—তোমার নিশ্চয় মনে আছে। এখানে তোমার কোন ত্রুটি নেই। ত্রুটি তোমার এই অসমসাহসিকতার প্রতি ঝোঁকের মধ্যে। লা ইলাহি ইল্লালা দিনদুনিয়ার মালেকের উপর ভরসার কথা আমি জানি। তুমি বল্‌খ্‌ বাদাকশানে উজবেগদের সঙ্গে লড়াইয়ের কালে দুপহরের নামাজের সময় হাতির উপর থেকে নেমে যুদ্ধক্ষেত্রে নামাজ পড়েছ—এ খবর শাহানশাহ শুনে তারিফ যেমন করেছেন তেমনি গম্ভীরও হয়ে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন—ঔরংজীবকে এর জন্য মাশুল দিতে হবে। কারণ খুদাতায়লা একা ঔরংজীবকেই দয়া করে যাবেন এ হতে পারে না।

শাহানশাহের কথারই পুনরুক্তি করে আমি বলছি ঔরংজীব যে, এমন ক্ষেত্রে বিপক্ষের কোন স্থিরলক্ষ্য সাহসী বন্দুকবাজ, যুদ্ধক্ষেত্রে তুমি নামাজ করছ বলে তুমি এক মহা বিস্ময় এবং তুমি অজেয়, এই চলতি সংস্কারের কবচ তাগাকে খুলে ফেলে দিয়ে বন্দুক দাগতে পারে—তাহলে যে কি হবে তা আমি ভাবতেও শিউরে উঠি। কারণ আমি জানি বন্দুকের লক্ষ্য স্থির হলে খুদা তা রুখবার জন্য আঙুলটিও উদ্যত করেন না। আমি অবিশ্বাসিনী নই ভাইজান, কিন্তু আমি বাস্তববাদিনী। এবং আমি জানি তুমি আমাপেক্ষাও কঠোরতর বাস্তববাদী।

থাক। এখন অতিবাস্তববাদী হতে গিয়ে এই ধরনের ঝুঁকি নিয়ে বাদাকশান বল্‌খে তুমি জিতেছ বটে কিন্তু কান্দাহারে তোমাকে পরাজিত হতে হয়েছে। তোমার মাথা হেঁট যারা করতে চেয়েছিল

তাদের আনন্দের এবং উল্লাসের সীমা নেই। সংবাদ পাচ্ছি নিরন্তর তোমার নামে সেকায়েৎ হচ্ছে। গুজরাটে তোমার অসামান্য সাফল্যের গৌরব ম্লান হয়েছে এতে তারা অত্যন্ত খুশী।

সে-খুশির নজীর, সে-সব উল্লাসের দৃষ্টান্ত তুমি চোখে দেখে গিয়েছ। সে-সময় আমি তোমাকে বার বার অনুরোধ করেছিলাম, হিন্দুস্তানের রাজপুত সামন্ত রাজা এবং রাজপুত সেনাপতিদের সঙ্গে একটা আপোষ সমঝোতায় পৌঁছুবার চেষ্টা করতে। কিন্তু মেঝ ভাইসাব শাহজাদা শাহ সুজার বেটী গুলরুখবানুর সঙ্গে তোমার ছেলের বিয়ের সম্বন্ধ পাকা করেই তুমি নিশ্চিন্ত থাকলে—কিন্তু এদিকে তুমি কোন চেষ্টা করলে না।

শাহজাদা শাহ সুজার মেয়ের সঙ্গে তোমার ছেলের বিয়ে দিয়ে অবশ্যই তোমরা দুজনে একটা জোট বাঁধছ বটে, এর দামও আছে তাও স্বীকার করছি—কিন্তু তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে যে মসনদ নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে এ সত্যকে তুমি অস্বীকার করতে পার?

তা ছাড়া এই বিবাহের সম্বন্ধের কথাটা আজ আর গোপন নেই। প্রকাশ হয়ে পড়েছে।

কারণ কি জান?"

*   *   *

বহেনসাহেবা শাহজাদী রৌশনআরা বেগমের চিঠিখানা থেকে চোখ ফিরিয়ে নিলেন শাহজাদা ঔরংজীব।

"কারণ কি" জানাতে চেয়েছেন দিদিজী। কারণ শাহজাদা ঔরংজীব জানেন।

"দিদিসাহেবা, তুমি শাহজাদা ঔরংজীবের শুভাকাঙ্ক্ষিণী—হয়তো সর্বাপেক্ষা বড় শুভাকাঙ্ক্ষিণী একথ ঔরংজীব জানে। জানে এবং অন্তরে অন্তরে মানে। বেগম দিলরাসবানু, বেগম নবাববাঈ থেকেও তুমি বড় শুভাকাঙ্ক্ষিণী বলেই মানে ঔরংজীব, কারণ তুমি তাদের

থেকে অনেক বেশী বুদ্ধিমতী এবং দীপ্তিমতী। এবং বড়িবহিন জাহানআরা দিদিসাহেবার ঈর্ষায় তুমি দাহিকাশক্তিসম্পন্না। তোমার শুভাকাঙ্ক্ষার মূল্য অনেক বেশী। দিদিজী, ঔরংজীবের কাছে জলন্ত মাটির প্রদীপের মূল্য তেল-সলতে-হীন ধাতুর প্রদীপের চেয়ে অনেক বেশী। ঔরংজীব তবুও কিন্তু তোমার কাছে সব কথা বলে না—বলতে পারে না।

মানুষের চরিত্র অত্যন্ত জটিল রৌশনআরা বহেন।

অনেক মাসুল দিয়ে-দিয়ে এ শিক্ষা ঔরংজীবের হয়েছে।

গুজরাট থেকে যেদিন ঔরংজীবের কৃতিত্বের জন্য খুশী হয়ে তার মনসব জায়গীর আর তন্‌খা বাড়িয়ে মূলতানের সুবাদারীতে পাঠিয়েছিলেন বাদশাহ, সেইদিনই ঔরংজীব তার তীক্ষ্ণদৃষ্টি প্রসারিত করেছিল আরও পশ্চিম দিকে। মূলতানের পশ্চিমে আফগানেস্তান, তার ওদিকে বল্‌খ বদাকশান, এদিকে ইরানের সীমান্তে কেল্লা কান্দাহার এবং জেলা কান্দাহার।

কেল্লা কান্দাহার জেলা কান্দাহার নিয়ে ইরানের সঙ্গে হিন্দুস্তানের কাড়াকাড়ি দীর্ঘদিনের। বাদশাহ জাহাঙ্গীরশাহের আমল থেকে কান্দাহার কেড়ে নিয়েছে ইরান। শাহানশাহ সাজাহান যখন বল্‌খ বদাকশানের উজবেগিস্তানের পাহাড়ে মুল্ক পর্যন্ত সীমানা বাড়াতে উৎসুক তখন কান্দাহার ইরানের দখলে থাকাটা অত্যন্ত অপমানজনক। ইরানী মনসবদার হিন্দুস্তানে পালিয়ে এসে মেওয়া ফল, ইরানী ঘোড়া, জহরত, কিংখাবের সঙ্গে কান্দাহার কেল্লা নজরানার মত বাদশাহের পায়ের তলায় রেখে দিয়েছিল। সে-দখলও হিন্দুস্তান রাখতে পারে নি। তাই বাদশাহ যখন আমাকে পাঠালেন তখন আমি এ-ঝুঁকির সম্পূর্ণ গুরুত্ব বুঝেই স্বেচ্ছায় তুলে নিয়েছিলাম বহেনজী।

তুমি দোষ দিয়েছ—বলেছ, আমার জীবনের ত্রুটিই হল এই অসমসাহসিকতার প্রতি আগ্রহ।

তুমি সত্য বলেছ। কিন্তু একটা কথা জান না। জান না যে আমি ঝোঁকের বশে ঝুঁকি নিই না। আমি খুব বিবেচনা করে খতিয়ে দেখে ঝুঁকি নিই।

দিদিজী, ঔরংজীব বার বার চেষ্টা করেছে শাহানশাহকে সেবা করে তুষ্ট করতে। সে বড়ভাই দারাসিকোর প্রতি পিতার পক্ষপাতিত্বের জন্য ক্ষুব্ধ। বড়ভাই দারাসিকোর কাফেরীয়ানার জন্য সে তার প্রতি ক্রুদ্ধ। আর দাম্ভিকতার জন্য সে তাকে পছন্দ করে না। কিন্তু তবুও সহোদর ভাই সে, সেই হিসেবে তাকে ভালও সে বাসতে এককালে চেয়েছিল।

সেই কারণে কান্দাহারের ভার আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলাম শেষ চেষ্টা হিসাবে।

বাদশাহকে কান্দাহার কেল্লা এবং জেলা জয় করে দিয়ে তাঁকে বোঝাতে চেয়েছিলাম শাহজাদা ঔরংজীবকে সাদা সাপই বলুন আর যাই বলুন সেই তাঁর সন্তানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং তাকে কোন মতেই উপেক্ষা করা যাবে না। এবং শাহজাদা দারাসিকোকেও বুঝাতে চেয়েছিলাম আমাকে অবজ্ঞা বা উপেক্ষা করার তার অধিকার নাই। তার সঙ্গে মিলে মিশে হিন্দুস্তানের বাদশাহী ভোগ করবার শেষ চেষ্টা করতে চেয়েছিলাম আমি। দারাসিকো যে বড়িবহিন জহারআরা দিদিজীউয়ের প্রস্তাব—ঔরংজীবকে মাফ করার প্রস্তাবের বিরোধিতা করে নি তার জন্যে এটা আমি প্রতিদান দিতে চেয়েছিলাম। এবং কান্দাহার কেল্লা ফতে করতে আমি নিশ্চয় পারতাম। আমি জানি আমি পারতাম। আজও পারি। কিন্তু বাদশাহ সাজাহানই আমাকে পারতে দেন নি। পদে পদে বাধা দিয়েছেন।

আমি বল্‌খ বদাকশান ফতে করলাম; আমি স্বীকার করছি বহেনজীউ যে, যুদ্ধক্ষেত্রে হাতি থেকে নেমে দুপহরের নামাজ করার মধ্যে আমি আমার ধার্মিকতা আর অসমসাহসকে জাহির করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু বিশ্বাস কর, সেটা সম্পূর্ণ সঠিক সচেতন

ভাবে নয়। কেমন যেন মনে হল—। মনে হল এই মুসলমানেরা বুঝুক যে আমি খাঁটি মুসলমান। মুসলমানকে শাসনের অধিকার একমাত্র খুদার প্রতি আস্থাবানেরই আছে। রাজার নাই, সুলতানের নাই, শাহের নাই। এবং সঙ্গে সঙ্গে জানতাম যে সাধারণ মানুষ যারা, তাদের দেহের শক্তি তাদের জঙ্গীবাজি যেমন এবং যত বড়ই হোক, তারা আমার এই যুদ্ধক্ষেত্রে নামাজ পড়া দেখে বিহ্বল হয়ে যাবেই।

এ আমি স্বীকার করছি।

বাদশাহও চমকে গিয়েছিলেন এতে। তিনি খুদ তাঁর ওমরাহদের নিয়ে চলে এলেন আফগানেস্তান—চেপে বসলেন কাবুল শহরে। কাবুল শহর চাঘতাই বংশের প্রথম সৌভাগ্যসোপান।

সুলতান বাবর এসে প্রথম আফগানেস্তানেই চাঘতাই বাদশাহী ইমারতের বনিয়াদ গেড়েছিলেন।

কাবুল শহর আফগানেস্তান হিন্দুস্তানের তুলনায় অনেক ছোট শহর, ছোট মুল্ক। কিন্তু হিন্দুস্তানের গুলেকমল যত বড় এবং তাতে যত সংখ্যাকই না পাপড়ি থাক এবং যেমনই তার খুসবু হোক, গুলাবের কদর এবং বাহার এবং খুসবু তার থেকে কম নয়। কাবুল শহরের ঠাণ্ডা আরাম আর কাবুলের আঙুরের ক্ষেত তার খরবুজা তরবুজার স্বাদ এবং ঐশ্বর্য অতুলনীয়। এই স্বাদ এবং ঐশ্বর্য ভোগের জন্য বাবরশাহ নিয়মিত আসতেন কাবুল। এরই জন্য তিনি মৃত্যুর পর তাঁর বিশ্রামস্থান নির্দিষ্ট করে গিয়েছিলেন এই কাবুলে।

থাক বহেনজী। ঔরংজেব একটু আবেগপ্রবণ হয়ে গেছে মনে হবে। কিন্তু না। আমি বলছি বাদশাহ যদি কাবুলে এসে স্রিফ আরাম করতেন—আঙুর খরবুজা আর পোলাও গোস্ত খেতেন—এমন কি এখানকার বিখ্যাত গোলামের হাটে জর্জিয়া তুর্কিস্তান গ্রীস থেকে যে আমদানী বাঁদী বিক্রী হয় তাই বাছাই করে কিনতেন এবং তাদের ঘুঁটি করে শতরঞ্জ খেলতেন আমীরদের সঙ্গে, তাহলেও আমি

খুশী হতাম। কারণ আমি কান্দাহার কেল্লা ফতে করতাম নিশ্চয়। আমি জানি আমি করতাম—করতে পারতাম।

তা তিনি করেন নি।

তিনি ভার দিলেন আমাকে এবং বসে রইলেন কাবুলে আর সেখান থেকেই তিনি সাদুল্লা খানের মারফত হুকুম পাঠাতে লাগলেন।

বহেনজী, কাবুল থেকে পাক্কা ঘোড়সওয়ার হুকুম নিয়ে আসত, তাতেও চার দিন লাগত বাদশাহী হুকুমত পৌঁছতে। সাদুল্লা খানের হাতে ছিল তোপখানা। তাঁর কোন্ তোপটা কোনখানে বসানো হবে তাও ঠিক করে দিতেন শাহানশাহ। যুদ্ধক্ষেত্রের নকশা দেখে তিনি তা স্থির করতেন। কান্দাহার কেল্লার দক্ষিণে বসানো হয়েছিল একটা ভারী কামান। সেটাকে উত্তর-পশ্চিমে বসানো দরকার হল। কান্দাহার কেল্লার ওই দিকের পাঁচিলে একটা জায়গা দুর্বল ছিল। আমরা খবর পেলাম গুপ্তচর মারফত যে, ইরানীরা রাজমিস্ত্রী মজদুর জমায়েত করে সেটাকে মেরামতে লেগেছে। কিন্তু শাহজাদা ঔরংজীবের সে এখতিয়ার ছিল না। তাকে হুকুমত আনাতে হল কাবুল থেকে। হুকুমত এল, বাদশাহ হুকুমত দিলেন—তুরন্ত এই কামান ওই দিকে বসিয়ে কামান দাগো—ভেঙে পড়ুক পাঁচিল। কিন্তু ততদিনে দুর্বল পাঁচিল নতুন মেরামতিতে বহুৎ জবরদস্ত শক্ত হয়ে উঠেছে। আমরা তবু কামান দাগলাম। গোলার পর গোলা ছুটল। কিন্তু তাতে পাঁচিল ভাঙল না, কামানটাই অকেজো হয়ে গেল। তার জন্যে দায়ী হল শাহজাদা ঔরংজীব।

বাদশাহ আমার হাত থেকে দায়িত্ব কেড়ে নিলেন। তিরস্কার করে নিশানে লিখলেন—"এর দায়দায়িত্ব সাদুল্লা খাঁকে বুঝিয়ে দিয়ে তুমি চলে যাও দক্ষিণ-মুল্ক। দাক্ষিণাত্যের সুবাদারী কর গিয়ে। এ কাম তোমার দ্বারা হবে না সে আমি বুঝেছি।"

আমিও সঙ্গে সঙ্গে বুঝলাম বহেনজী যে আমাকে বাদশাহ ভালো

করে বুঝেই কান্দাহার থেকে সরিয়ে দিচ্ছেন। বহেনজী, তিনি বুঝতে পেরেছেন যে আমার হাতে পুরো ভার ছেড়ে দিলে এতদিন কোন্‌দিন কান্দাহার কেল্লা ফতে হয়ে যেতো। তার সঙ্গে এও বুঝেছেন যে আর কিছুদিন সময় দিলে এসব বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও কান্দাহার কেল্লা শাহজাদা ঔরংজীব ফতে করবেই করবে। এবং শাহজাদা ঔরংজীব কান্দাহার কেল্লা জয় করলে হিন্দুস্তানের মসনদের ভবিষ্যৎ চিরকালের মত নির্ধারিত হয়ে যাবে। বল্‌খ বদাকশানের যুদ্ধক্ষেত্রে চারিপাশের গোলাগুলি তীর বর্শার মধ্যে যে দুপহরের নামাজ করেছে সে যদি কান্দাহার কেল্লার লড়াই ফতে করে সন্ধ্যার নামাজ সারতে পায় তাহলে পশ্চিম দিগন্তে মক্কাশরীফের কাবা মসজেদ থেকে অবধারিতরূপে আশীর্বাদবাক্য উচ্চারিত হবে। তাই তিনি ঔরংজীবের মাথায় ব্যর্থতার বোঝা চাপিয়ে দিয়ে নতমস্তক করে পাঠিয়ে দিলেন দক্ষিণ—দৌলতাবাদ। তিনি শাহবুলন্দ ইকবালকে কান্দাহার জয়ের গৌরব অর্জনের সুযোগ দেবেন তা আমি জানি।

আগ্রায় ভাইসাব শাহ সুজার সঙ্গে হঠাৎ দিল খুলবার একটা অবকাশ হয়ে গেল।

হাঁ। আমি কিছু বিভ্রান্ত বিমূঢ় হয়েছিলাম। শাহজাদা ঔরংজীব পাথর এবং লোহার থেকেও শক্ত। কিন্তু সে মানুষ। বিভ্রান্ত হওয়াটাই হল মানুষের বেঁচে থাকার একটা লক্ষণ।”

বিভ্রান্ত হয়েছিলেন শাহজাদা ঔরংজীব।

*　　*　　*　　*

কান্দাহার কাবুল হিন্দুকুশ পাহাড়ের কোলের ঠাণ্ডা অঞ্চল। সেখান থেকে নিজের ফৌজ নিয়ে আগ্রা শহরের দারুণ গ্রীষ্মের মধ্যে এসে পৌঁছে নূরমঞ্জিলে বসে হতাশায় ভেঙে পড়তেই যাচ্ছিলেন। নিদারুণ চিন্তার ভারবোঝা মাথায় নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াবার শক্তি যেন শেষ হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছিল।

মসনদ তো শুধু বাদশাহী সৌভাগ্য নয়। মসনদই হল শাহজাদা

সুলতানজাদা নবাবজাদাদের জিন্দিগীর কিল্লা। ওর বাইরে আর নিশ্বাস নেবার মত বাতাস নেই, দাঁড়াবার মত জায়গা নেই।

যে মসনদ পায় সেই বাদশা হয়ে বেঁচে থাকে। বাকী ভাইদের মরতে হবেই। না মেরেও যে উপায় নেই। যাকে তুমি ভাই বলে মমতা করে বাঁচিয়ে রাখবে সেই তোমাকে হত্যা করবে। অন্ততঃ ষড়যন্ত্র করবে তাতে সন্দেহ নেই। শুধু তো শাহজাদা নয়—তার স্ত্রী; সে সুন্দরী হলে বিজয়ী ভায়ের উপভোগ্যা হবে। নাহলে হয়তো বিলিয়ে দেওয়া হবে তাকে।

ছেলে থাকলে তারও বেঁচে থাকবার অধিকার নেই। থাকলে আছে অন্ধ হয়ে অথবা বন্দী হয়ে কোন কেল্লার মধ্যে। দিনের পর দিন পোস্তদানার শরবত খেয়ে খেয়ে তাকে ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে শুকিয়ে মরতে হবে। এর বাইরেও যদি কেউ বাঁচতে চায় তাকে বাঁচতে হবে চণ্ডু খেয়ে, গুলি খেয়ে; ঘৃণ্য নেশাখোর হয়ে বেঁচে থেকেছে কেউ কেউ; তার নজীর আছে। হয়তো আলাউদ্দিন খিলজীর কোন বংশধরকে খুঁজলে পাওয়া যেতে পারে কিন্তু তাকে না পাওয়াই ভাল। কারণ তার সঙ্গে আর প্রেতাত্মার সঙ্গে কোন প্রভেদ নেই।

বিভ্রান্ত হয়ে শাহজাদা ঔরংজীব কোন আলোকিত দিগন্তই দেখতে পাচ্ছিলেন না। সে যেন এক কবরস্তানের মধ্যে তিনি গাঢ় অন্ধকার রাত্রে দিশা হারিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। মনে হচ্ছিল কবরগুলির মুখ খুলে গেছে এবং সেই কবরের ভেতর থেকে তাঁকে ডাকছে বাদশাহ সুলতান ভাইয়ের হাতে নিহত শাহজাদা, সুলতানজাদারা।

তারা বলছিল—ভয় কিসের? এস—এই মাটির নীচে চলে এস। কাফনের মধ্যে বহুৎ আরাম। পরম নিশ্চিন্ততা। সব থেকে নিরাপদ ভরসা এখানে এই যে, কোন বাদশাহের হাত এখানে পৌঁছয় না। এস—তোমার আব্বাজান আমাকে খুন করিয়েছিল। আমি খুসরু—তোমার চাচা।

বীরত্বে এবং দুঃসাহসে শাহজাদা ঔরংজীবের জোড়া কেউ নেই ; সেই শাহজাদা শিউরে উঠেছিলেন এবং ভয়ও পেয়েছিলেন।

চীৎকার করে ডেকেছিলেন—লা ইলাহি ইল্লালা, মেহেরবান খোদা, আমাকে পথ বলে দাও। এইভাবে মরতে আমি চাই না—পারব না। আমার সন্ততিদের এইভাবে মরতে দিতে পারব না।

এই চিন্তাভার মাথায় নিয়েই শাহজাদা গিয়েছিলেন তাজমহলে আম্মাজানের সমাধিতে ফুল দিতে, ধূপ এবং লাবান জ্বালাতে, চেরাগ মোমবাতি জ্বালিয়ে দিয়ে প্রার্থনা জানাতে।

আম্মাজান, পথ দেখাও। দারাসিকো আমাকে বাঁচতে দেবে না আম্মাজান। আমি জানি। সে আমাকে ভয় করে, আমাকে অকারণে ঘৃণা করে। তার হাত থেকে বাঁচতে দাও আমাকে—আমার ছেলে মেয়ে, আমার বংশধরদের বাঁচতে দাও—বাঁচাও।

নতজানু হয়ে তিনি বসেছিলেন কবরের পাশে। চোখ দুটি বন্ধ করে মনে মনে জননী মমতাজমহলকে স্মরণ করছিলেন।

হঠাৎ আরও কেউ যেন প্রবেশ করেছিল এই সময়। বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন মনে মনে : কে? কে এ-সময় প্রবেশ করেছে?

বাদশাহ মহলের কেউ নিশ্চয়।

কিন্তু কে?

শাহবুলন্দ ইকবাল? শাহজাদা দারাসিকো? শাহজাদা ঔরংজীবের সমস্ত শরীরের মধ্যে একটা হিমপ্রবাহের মত প্রবাহ বয়ে গিয়েছিল। একমুহূর্তে অনেক কথা মনে হয়ে গিয়েছিল ; একখানা ছুরির আঘাত পর্যন্ত। মুহূর্তে তিনি চোখ খুলেছিলেন।

চোখ খুলে আশ্বস্ত হয়েছিলেন—না, প্রবেশকারী শাহবুলন্দ ইকবাল কাফের দারাসিকো নয়। প্রবেশ করেছিলেন মেঝভাই শাহজাদা শাহ সুজা। সুবা বাংলা বিহার উড়িষ্যার সুবাদার তিনি।

গভীর সোয়াস্তির একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছিলেন ঔরংজীব :

একটি প্রসন্ন হাসি তাঁর ঠোঁট দুটির রেখায় রেখায় বিকশিত হয়ে উঠেছিল। অকস্মাৎ শাহ সুজা ভাইসাহেবকে বড় ভাল লেগেছিল।

সমাধিকক্ষের প্রবেশদরজায় দাঁড়িয়ে শাহ সুজাও ঠিক এমনই একটি প্রসন্নতা অনুভব করেছিলেন।

বড়ভাই দারাসিকোর প্রতি বাদশাহের পক্ষপাতিত্বের জন্য তিনিও মনে মনে ক্ষুব্ধ এবং পীড়িত হয়ে উঠেছিলেন। শুধু ক্ষোভই নয় তার সঙ্গে ছিল আশঙ্কা। আশঙ্কা—জীবনের আশঙ্কা। শুধু নিজের জীবনেরই নয়। সন্তানসন্ততিদের জন্যও তো আশঙ্কা কম ছিল না।

সারা হিন্দুস্তানে চাঘতাই বাদশাহীর মধ্যে কোনখানে তাদের বেঁচে থাকবার মত জায়গা মিলবে তো?

এ-কথা ভাই শাহ সুজা ঔরংজীবকে পরে স্বমুখে বলেছিলেন। কিন্তু সে পরের কথা। সে দিন আম্মাজানের কবরের সামনে দাঁড়িয়ে শাহ সুজারও মনে একটা আশ্চর্য ভাবের উদয় হয়েছিল।

শাহজাদা শাহ সুজা এবং শাহজাদা ঔরংজীব কোনকালেই অন্তরঙ্গ ছিলেন না। দুজনের প্রকৃতি বিপরীতমুখী। শাহজাদা শাহ সুজা দারাসিকোকে বলতেন কাফের—ঔরংজীবকে বলতেন মোল্লা। বরং ক্ষেত্রবিশেষে দারাসিকোকে বিশ্বাস করতেন কিন্তু ঔরংজীবকে কোন ক্ষেত্রেই বিশ্বাস করতে প্রস্তুত ছিলেন না।

শাহবুলন্দ ইকবাল যাই হোন তাঁর জবানের দাম আছে। ঔরংজীব সম্পর্কে বলতে গেলে বলতেন—শোভান-আল্লা! সাপকে তুমি দুধ কলা দিয়ে পালন করো তাতে তার বিষের থলির বিষ কথনও অমৃত হবে না। মুল্ক বাঙ্গাল সাপের মুল্ক। আমি সেখানে অনেক সাপ দেখেছি। সব সাপকে বেদেরা ধরে বিষদাঁত ভেঙে খেলা দেখায় কিন্তু সেখানে রাজগোখরা বলে সাপ আছে—তার রঙ একদম সা—দা—। এই সাদা সাপকে বাংলাদেশের বেদেরাও ভয় করে। তারা সাদা সাপ দেখলে সরে দাঁড়ায়। নেহাৎ মুখোমুখি হয়ে গেলে

ধরতে চেষ্টা করে না ; মেরে ফেলে। সাদা সাপের স্বভাব হল হয় মারবে নয় মরবে কিন্তু ধরা দেবে না।

এ সব কথা শাহ সুজা বলেছেন তাঁর পারিষদদের কাছে; আমীরদের কাছেও বলেছেন। কানাঘুষা হতে হতে এ সব কথা এসে পৌঁচেছে ঔরংজীবের কাছে। ঔরংজীবও তাঁকে বিলাসী নারীলোলুপ বুদ্ধিহীন মদ্যপ বলে পরিহাস করেছেন—অবজ্ঞা করেছেন —তাও শাহ সুজার কানে পৌঁচেছে। তবুও সে দিন আম্মাজান হজরত মমতাজ বেগমসাহেবার সমাধিকে সামনে রেখে তাঁর মনে হল আম্মাজান তাঁর মনের কাতর প্রার্থনা বুঝতে পেরেই তার উপায় দেখিয়ে দিচ্ছেন। বলছেন—ঔরংজীব, বেটা, আমি মা। আমার কাছে আমার সন্তানেরা সকলেই সমান। আজ কবরের তলায় শুয়েও তোমাদের জন্য দুশ্চিন্তার আমার শেষ নেই।

তোমাদের আব্বাজান পিতা হয়েও পক্ষপাতিত্ব করেছেন। আমি বেঁচে থাকলে তাঁকে বুঝিয়ে এর প্রতিকার করতে পারতাম। কিন্তু আমি আজ কবরের তলায় শুয়ে আছি। এর প্রতিকার আজ তোমাদের নিজেদের করতে হবে। তুমি হাত মেলাও তোমার অন্য ভাইদের সঙ্গে। সুজার সঙ্গে তুমি মিলিত হও। তোমরা দুজনে হাত মিলিয়ে দাড়ালে দারাসিকো বুঝতে পারবেন, বাদশাহ বুঝতে পারবেন তোমাদের—।

ঔরংজীবের মনের মধ্যে আম্মাজান মমতাজ বেগমসাহেবা তাঁর কল্পনার যে সব কথা বলেছিলেন সে সব কথা ঔরংজীব প্রকাশ করতে চান না। প্রকাশ করার সময় এখনও আসে নি। যখন আসবে তখন প্রকাশ করবেন।

তবে তিনি এইটুকু প্রকাশ করেছেন—আম্মাজান ঔরংজীবকে বলেছেন—ঔরংজীব, আমি মা—আমার কাছে আমার সকল ছেলেই সমান। তবু আমি বলছি, তুমিই আমার ধার্মিক পুত্র। দারাসিকো আমার জ্যেষ্ঠপুত্র, বাদশাহের পরম প্রিয়পাত্র, বহুজনের স্তাবকতায়

সে বিভ্রান্ত, কিন্তু সে কাফেরিকে প্রশ্রয় দিয়েছে। শরিয়তের নির্দেশ এবং পয়গম্বরের হুকুমতকে অগ্রাহ্য করেছে। সে কাফের! সে ভণ্ড!

ইসলামের একজন সামান্য সেবিকা হিসেবে—পয়গম্বর রসুলের একজন মুরীদা হিসেবে আমি বলতে বাধ্য যে, এক তোমা হতেই ইসলাম বাঁচবে এই হিন্দুস্তানে। না হলে সর্বনাশ হবে। দারাসিকো ইসলামের নির্দেশের অপব্যাখ্যা করে বরবাদ দেবে ইসলামকে। তুমি বাঁচো ঔরংজীব। তুমি শাহ সুজার সঙ্গে হাত মেলাও।

তোমার বড়ছেলে সুলতান মুহম্মদ রয়েছে তোমার সামনে—সুজার মেয়ে রয়েছে গুলরুখবানু।

আশ্চর্যের কথা, ওই একই কথা মনে হয়েছিল শাহজাদা শাহ সুজারও মনে মনে। চোখের ভাষার নিমন্ত্রণ দুজনের চোখেই ভেসে উঠেছিল প্রথম চাহনির মধ্যে। এমন প্রসন্নভাবে পরস্পরের প্রতি কখনও দৃষ্টিপাত করেছিলেন বলে শাহ সুজারও মনে হয় নি, ঔরংজীবেরও মনে হয় নি।

কবরের পাশে বসে নামাজ ও প্রার্থনা শেষ করে বাইরে এসে সুজার জন্য দাঁড়িয়ে ছিলেন ঔরংজীব। শাহ সুজা বেরিয়ে এসে প্রসন্ন হাসিতে উদ্ভাসিত মুখে ঔরংজীবকে বলেছিলেন—আমার মনের আরজ খুদা নিশ্চয় শুনেছেন। আম্মাজানও শুনেছেন। মনে মনে কি বলছিলাম জানো—বলছিলাম ভাইজান, ঔরংজীব যেন চলে না যায়।

শাহজাদা ঔরংজীবও বলেছিলেন—তুমি আমার জ্যেষ্ঠ, তোমাকে সম্ভাষণ এবং সম্মান না জানিয়ে কি যেতে পারি? তোমার মনমেজাজ তোমার তবিয়ৎ ঠিক আছে তো দাদাজীউ?

তাঁর দুই হাত চেপে ধরে শাহ সুজা বলেছিলেন—আজ তোমাকে কাছে পেয়ে যে কি ভালো লাগছে ভাইজান, তোমাকে কি বলব!—ওঃ, বাল্যকালের অসংখ্য স্মৃতি মনে পড়ছে!

দুজনেই কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বলবার মত কথা যেন খুঁজে পাচ্ছিলেন না। কত কথা কত স্মৃতি—কিন্তু তবু যেন সব হারিয়ে যাচ্ছিল। বলবার মত বলে মনে হচ্ছিল না। সে সব কথার মধ্যে, ঘটনার স্মৃতির মধ্যে বড়ভাই দারাসিকো যেন অকারণে মুখ বাড়িয়ে হাসছিলেন। তার জন্য কথাগুলি যেন অত্যন্ত লজ্জা পাচ্ছিল।

হঠাৎ শাহ সুজা বলেছিলেন—আজ সন্ধ্যায় আমার গরীবখানায় এস না ভাইজান। আসবে? ভয় নেই, আমি সরাব খেতে বলব না, বা গানবাজনার আসর পাতব না। শুধু দুজনে ছেলেবেলার গল্প করব।

শাহজাদা ঔরংজীব সাগ্রহে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন। এব সন্ধ্যায় এগার বছরের পুত্র মুহম্মদকে সঙ্গে নিয়ে এসে উঠেছিলেন শাহ সুজার মঞ্জিলে।

একচল্লিশ

বিস্তৃত বিবরণের মত ঘটনাগুলি মনের মধ্যে ছবির মত ভেসে উঠছে। সে অনেক ছবি। কিন্তু সে সব থাক। শাহজাদা ঔরংজীব নিজের চিবুকে হাত বুলিয়ে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। ঔরংজীবের স্মৃতি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। মনে পড়ছে তাঁর ছেলে মুহম্মদের চোখের সে-এক আশ্চর্য সুন্দর বিহ্বল দৃষ্টি। দাদাজীউ শাহ সুজার কন্যা গুলনেয়ারের চোখ দুটি ভারী সুন্দর, সেই সুন্দর চোখ দুটির ডান চোখটির ঠিক নীচে গালে একটি কালো তিল ছিল ; সেই তিলটির দিকে মুহম্মদ লোলুপদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। গজল গীত কবিতা ঔরংজীব তৈরি করেন না ; না হলে তিনি বলতেন—গুলনেয়ারের গালের তিলটি একবিন্দু মধু এবং তাতে মুহম্মদের দৃষ্টি এসে মাছির মত বসে গায়ে পাখায় মধুর আঠায় আটকে গেছে সারা জিন্দিগীর মত। একটু হাসি তাঁর মুখে ফুটে উঠেছিল।

শাহ সুজার দৃষ্টিতেও এ ঘটনাটুকু না পড়ে পারে নি। বালক বালিকার মন, সে-মন শরতের আকাশের মত নীল ; সেখানে মেঘ আসে কিন্তু দাঁড়ায় না—ভেসে যায়। সূর্য চন্দ্র তারার প্রকাশকে ঢেকে রাখে না। শাহ সুজাও হেসেছিলেন এ দৃশ্য দেখে। বলেছিলেন—দেখ, কেমনভাবে এরা পরস্পরকে দেখে মুগ্ধ হয়েছে দেখ। এদের দুজনকে পরস্পরের পাশে যেমন সুন্দর মানায় তেমনটি কি আর অন্যের সঙ্গে মানাবে ?

ঔরংজীব চুপ করে ছিলেন। তিনি ভাবছিলেন।

ভাবছিলেন এমন ধরনের কথা, যে ধরনের তিনি সচরাচর ভাবেন না। ভাবছিলেন এর মধ্যে একটা নির্দেশ রয়েছে। কার নির্দেশ তা ঠিক বুঝতে পারেন নি। একবার মনে হয়েছিল সর্বশক্তিমান খুদার নির্দেশ। তিনি এদের দুজনকে এইভাবে পরস্পরের জন্যই

বিশেষভাবে গড়ে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। পাঠিয়েছেন হিন্দুস্তানের মসনদের জন্য।

হাঁ। হিন্দুস্তানের মসনদকে উজ্জ্বল করে মুহম্মদ সুলতান একদা বাদশাহ এবং গুলনেয়ার হিন্দুস্তানের শাহী হজরত বেগম হয়ে বসবে। হাঁ। মহিউদ্দিন ঔরংজীবের জ্যেষ্ঠপুত্র মুহম্মদ সুলতান বাদশাহ হবে। বাদশাহ হবে বাদশাহ ঔরংজীবের উত্তরাধিকারী হিসাবে। মনে হয়েছিল ভবিষ্যতের এই সহজ সত্যটি যে মালিক ভবিতব্য হিসাবে সৃষ্টি করেছেন তিনি লা ইলাহি ইল্লালা মেহেরবান খুদাতায়লা; কিন্তু সে-সত্যটিকে আজ দেখিয়ে দিলেন আম্মাজান, হজরত বেগম মমতাজমহল; তিনিই আজ এই নিষ্ঠুর দুশ্চিন্তার মধ্যে আকর্ষণ করেছিলেন তাজমহলে; তাঁর সঙ্গে ভাইসাহাব শাহ সুজাকেও আকর্ষণ করেছিলেন। এবং আজ সন্ধ্যায় যা ঘটছে তা সবই ঘটছে তাঁরই ইচ্ছায় এবং অভিপ্রায়ে।

শাহ সুজা তাঁর কথার উত্তর না পেয়ে প্রশ্ন করেছিলেন—ভাইজান!

—দাদাজীউ!

—আমি কি কথাটা ভুল বলেছি? পুত্র মুহম্মদ সুলতানের পাশে কি তুমি গুলনেয়ারের চেয়ে আরও ভালো মানায় এমন কোন লেড়কী দেখেছ?

—না, তা দেখি নি। কিন্তু তার জন্যে আমি চুপ করে নেই।

—তবে কিসের জন্যে চুপ করে আছ?

—ভাইসাব, শুধু মানানটাই দেখলেন। এর অন্তরালে আরও কিছু কেন দেখলেন না তা জানি না। আমি তাই দেখছি।

—কি বল তো?

—এরা দুজন মিলিত হলে যেমন সবচেয়ে ভালো মানাবে তেমনি শুভ হবে এদের পিতা মাতাদের। এরা মিলিত হলে আমরা আরও ঘনিষ্ঠ হব। আমরা দুজনে মিলিত হলে আমরা অধিকতর শক্তিমান

হবে। পয়গম্বর রসুল এবং খুদাতায়লার দিল খুশ হয়ে উঠবে। বাদশাহ আকবর শাহের পর থেকে চাঘতাই বংশের বাদশাহদের দেহের রক্ত আধা হল হিন্দুস্থানী রক্ত আর তার সঙ্গে রাজপুত রক্তও বটে। বাদশাহ জাহাঙ্গীর বাদশাহ সাজাহান দুজনের রক্তের মধ্যেই কাফের হিন্দুদের প্রতি মেহমানির একটা টান আছে। শাহানশাহ সাজাহানের ছেলেরা আমরাই খাঁটি ইসলাম মায়ের কোলে জন্মেছি। শাহজাদা দারাসিকো শাহজাদী জাহানআরা আবার সেই আধা হিন্দুস্থানী রক্তের ধারাকে ফিরিয়ে আনছেন। বড় ভাইসাহেবের বড়ছেলে সুলেমন সিকোর প্রথম সাদি হচ্ছে মির্জারাজা জয়সিংহের ভাগ্নীর সঙ্গে। ভাইসাব, যদি বলি হিন্দু স্ত্রীদের শাহীবেগমের গদিতে বসিয়ে তাদের ছেলেদের মসনদের সব থেকে সামনে দাঁড় করিয়ে একটা সুলেনামা কি ফয়সালা করতে চাচ্ছেন তাহলে কি ভুল বলা হবে?

শাহ সুজা দীপ্ত এবং মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাঁর কনিষ্ঠের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

শাহজাদা ঔরংজীব আজও তাঁর চোখের সামনে দেখেছেন শাহ সুজার সেই মুগ্ধ মুখ, সেই মুগ্ধ দৃষ্টি।

হিসাবে আজ কয়েকটা বৎসর চলে গেছে, তবু অম্লান রয়েছে। ঔরংজীবের স্মৃতি অসাধারণ উজ্জ্বল এবং তীক্ষ্ণ। কিন্তু এই সময়ের জন্য ঘটনার ছবি এত উজ্জ্বল নয়।

রোশনআরা বহেনজী—ঔরংজীব হলফ করে বলতে পারে যে, সে সেদিন কথাগুলো মনে মনে মিথ্যেকে সাজিয়ে গুছিয়ে সত্য বলে চালায় নি।

বার কয়েক কেশে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে একটু হাসলেন ঔরংজীব। হাসির কারণ হল এই যে, তাঁর মনে পড়ে গেল পিতা শাহানশাহ সাজাহান তাঁকে চিঠিতে সেকায়েৎ করে লিখেছিলেন—

"শাহজাদা ঔরংজীব বাদশাহের পুত্র হিন্দুস্তানের শাহজাদা, বাদশাহ তাঁকে যেখানেই পাঠান বাদশাহের প্রতিনিধি সুবার সুবাদার করে পাঠান। সেখানে তিনি বাদশাহের ইজ্জতে অধিষ্ঠিত। অথচ তিনি মনসবদার আমীর রাজা প্রভৃতিদের সঙ্গে সেই ইজ্জত না রেখে সমান বন্ধুর মত ব্যবহার করেন।"

বাদশাহের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ঔরংজীবের বুকের গভীরে প্রবেশ করে আলো ফেলেছে। বাদশাহ ঠিক ধরেছেন। এ মেজাজ ঔরংজীব অভ্যাস করে তৈরি করেছে। হিসেব করে দেখে বুঝেই তৈরি করেছে। মুখোশ যদি বলে কেউ তা বলতে পারে।

দারাসিকো তাঁর পিয়ারের বড়ছেলে দাম্ভিক।

ঔরংজীব অত্যন্ত বিনম্র বিনীত না হোক সে সদাচারী ভদ্রজন বলে নিজেকে প্রমাণিত করেছে। হিন্দুস্তানের আমীরদের মধ্যে যাঁরা সত্যিকারের আমীরী মেজাজ রাখেন, ইজ্জতকে দাম দেন, তাঁরা এর জন্য ঔরংজীবের ব্যবহারে প্রীত মুগ্ধ এবং কৃতজ্ঞ। শুধু মুসলমানেরাই নন, হিন্দুরাও বটেন।

দিদিসাহেবা রোশনআরা বহেনজীউ, হিন্দুরা বেশী। অনেক বেশী। হিন্দুরা আমাকে হিন্দুবিদ্বেষী জেনেও শাহবুলন্দ ইকবাল দারাসিকোর থেকে বেশী পছন্দ করে।

স্থূলবুদ্ধি ভোঁতা গোঁয়ার মেজাজের আদমীরা যখন চালাক হতে যায় তখন এমনই হয়। তারা তাদের ধর্ম এবং আচার আচরণ, তাদের কাফেরী শাস্ত্রের প্রতি মুগ্ধ এই ভ্রষ্ট মুসলমানটিকে এই অতিবুদ্ধির বিচারে বন্ধুর বদলে শত্রু বলেই ধরে নিয়েছে।

তুমি অসাধারণ বুদ্ধিমতী দিদিজী। তুমি খাস আগ্রার রঙমহলে বাস কর। আগ্রা কেল্লার মধ্যে রঙমহলে বাদশাহী দরবারে দরবারের বাইরে সারা শহরের মধ্যে লোকজন ছড়িয়ে রেখেছ। তুমি সব খবর পাও। খবরগুলোকে ভালো করে যাচাই কর না কেন। চুলহার মধ্যে ছাই দেখে যে মনে করে ছাই—বিলকুল ছাই, তার বুদ্ধির

তারিফ করে না পণ্ডিতেরা। ছাই উড়িয়ে দেখতে হয়। অন্ততঃ হাত দিয়ে উত্তাপ অনুভব করেও দেখতে হয়।

শাহবুলন্দ ইকবাল বাদশাহকে অনুরোধ করে মেবারের নওজোওয়ান রানা রাজসিংহের সঙ্গে বিবাদ মিটিয়ে দিলেন। মেবার প্রায় জয় করেও প্রিয় পুত্র দারার অনুরোধেই বাদশাহ রানা রাজসিংহকে মাফ্ করলেন। এতেও তুমি শঙ্কিত হয়েছ, লিখেছ— ভবিষ্যৎ কালে হিন্দুস্তানের তামাম রাজপুত রাজারা তাদের সমস্ত শক্তি নিয়ে দারাসিকোর পিছনে দাঁড়াবে।

বিল্‌কুল্ চুক্ হয়েছে তোমার। তোমার চুক্ এবং এ আন্দাজ ঝুট্। এ অনুমান তোমার মিথ্যা।

হাঁ। মিথ্যা। একেবারে মিথ্যা।

আকবর শাহ যোধপুরী বেগমকে শাহীবেগমের ইজ্জত দিয়েছিলেন। তাঁর শালার ছেলে মানসিংহকে করেছিলেন প্রধান সেনাপতি। মানসিংহের বহেনের সঙ্গে সাদি হয়েছিল শাহজাদা সেলিমের। সারা হিন্দুস্তানে দিল্লীর মুঘল দরবারে মহারানা মানসিংহের থেকে বড় ইজ্জত বেশী প্রাধান্য কারুর ছিল না। সময়ে সময়ে শাহজাদা সেলিম ক্ষোভে ক্রোধে নিজের মাথার চুল ছিঁড়তেন। কিন্তু তুমি জান, এই মহারানা মানসিংহ যেচে দুটি অন্ন ভিক্ষা করে খেতে গিয়েছিলেন চিতোর নগরে। মহারানা প্রতাপসিংহের অতিথি হয়ে তাঁর পাশে বসে একসঙ্গে খাওয়ার সৌভাগ্য লাভ করার বদলে এই রাজপুত মনসবদার তাঁর মনিব বাদশাহ আকবর শাহের মত মনিবের এবং তার ফুফুর এবং তার সঙ্গে তাঁর ভগ্নী এবং ভগ্নীপতি এবং ভাগ্নের উচ্ছেদ করতে চেয়েছিলেন। সেদিন মহারানা প্রতাপ যদি গোঁয়ারতুমি না করতো তাহলে হিন্দুস্তানের বাদশাহী ঢঙ বিলকুল বদলে যেত। হয়তো রৌশনআরা ঔরংজীব দারাসিকোর এই কহনীয়া খুদাতয়লা তৈয়ারই করতেন না।

তুমি ভেবো না দিদিজীউ।

তোমার ভাই ঔরংজীব ঘুমিয়ে থেকেও খুদার কৃপায়, হিন্দুস্তানের ছকের উপর যে শতরঞ্জ খেলা চলছে তার দাবা ব'ড়ের কোথায় কোন চাল বদল হচ্ছে তা সে দেখতে পায়। স্বপ্নের মধ্যেও এক ছক তার মনের চোখে ভাসে।

মির্জারাজা জয়সিংহের ভাগ্নীর সঙ্গে শাহজাদা দারাসিকোর পুত্র সুলেমানসিকোর সাদির পাকাপাকিতে দারাসিকোর জোর বাড়ে কি, বাড়বে না। তাতে মির্জারাজা মাথা হেঁট করেছে। আর একবার সারা রাজস্থানে রাজারা মির্জারাজার দিকে তাকিয়ে ঠোঁটের কোণে কোণে একটু একটু বাঁকা হাসি হাসবে। পাঁচটা কথার মধ্যে অন্তত একবারও খুব বিনয়ের সঙ্গে বলবে—"মির্জারাজাসাহেবের অপার সৌভাগ্য। এবং আম্বেরের রানাবংশের অশেষ গৌরব! শাহবুলন্দ ইকবাল তাঁর বেয়াই হচ্ছেন। তাঁর ভাগ্নী একদিন দুর্লভ পারস্য সাগরের মুক্তার মালায় সজ্জিত হয়ে মসনদে বসবে।"

তুমি জানো না, (জানো নাই বলছি, কারণ জানলে তুমি এই বিবাহ নিয়ে এত চিন্তিত হতে না)—তুমি জানো না যে, এর উত্তরে রাজাসাহেবের বুকের ভিতরটা গর্জে উঠে বলতে চাইবে—না না না; এ সৌভাগ্য নয়। দুর্ভাগ্য। যে কন্যাকে জলে ভাসিয়ে দিলাম সে জলের তলায় বা ভেসে গিয়ে কোন্ সোনার চড়ায় ঠেকল তার হিসেব করে তাকে সৌভাগ্য বলে অন্ততঃ আমি মানি না। এ দুর্ভাগ্য। চরম দুর্ভাগ্য।

দিদিজী, রাজাসাহেবের এই কথাটা আমার কানে এসেছিল আগ্রার দেওয়ানী খাসের দরবারে। বড়িবহেনসাহেবার সেই আরোগ্যদিনের সমারোহের মধ্যে। দুর্দান্ত গোঁয়ার এবং অত্যন্ত হঠকারী মহারানা যশোবন্তসিংহ ঠিক এই পারস্য সাগরের মুক্তামালা পরবার সৌভাগ্যের কথা বলেছিলেন মির্জারাজার ভাগ্নীর সৌভাগ্যের প্রশংসা করে; তার উত্তরে মির্জারাজা ঠিক এই কন্যাকে জলে ভাসিয়ে দেওয়ার কথাই বলেছিলেন।

*

রানা রাজসিংহ মেবারের মহারানা। সমস্ত রাজপুতানার রাজাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সারা হিন্দুস্তানের রাজপুতেরা মেবারের মহারানার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। এ কথা সত্য। এও সত্য যে সারা হিন্দুস্তানের মধ্যে এই একটা জংলী রাজ্য এবং এই রাজ্যের গেঁয়ার রাজা এবং তার বাসিন্দারা সেই মহম্মদ ঘোরীর আমল থেকে এ পর্যন্ত ইসলামের সঙ্গে এবং দিল্লীর মুসলমান সুলতান আর বাদশাহদের সঙ্গে সমানে টক্কর দিয়ে লড়াই দিয়ে আসছে। অল্পস্বল্প সময়ের জন্যে হার মানলেও ঠিক হার তারা মানে নি। জাহাঙ্গীর বাদশার আমলে মহারানা অমরসিং নামে দিল্লীর প্রাধান্য স্বীকার করলেও কাজে করে নি। ভিতরে ভিতরে চেষ্টা করেই যাচ্ছে কখন এই অধীনতা অস্বীকার করবার সুযোগ আসবে এবং তারা দামামা বাজিয়ে জানিয়ে দেবে—আজাদ মেওয়ার জিন্দাবাদ! মহারানা চিতোর জিন্দাবাদ!

সম্প্রতি সেই ধরনের চেষ্টা একটা করছিল রানা রাজসিংহ। চিতোর কেল্লার ভাঙা পাঁচিল ভাঙাই থাকবে—মেরামত করবে না এই শর্ত হয়েছিল সন্ধির সময়। সেই সন্ধি লঙ্ঘন করে রানা রাজসিং চিতোর কেল্লা মেরামত করছিল, নতুন করে পাকাপোক্তভাবে গড়ছিল। মতলব ছিল মেরামত সেরে নিয়ে সে ওই দামামা বাজিয়ে দেবে।

খবর পেয়ে বাদশাহ চিতোর আক্রমণ করেছিলেন। শাহজাদা দারাসিকো তাঁর নিজের অভ্যাসমত ঠিক মাঝখানে এসে পড়েছিলেন। এবং বাদশাহের সঙ্গে রানার বিবাদ মিটিয়েও দিয়েছেন। বহেনজী ঠিক খবরই লিখেছেন।

শাহজাদা দারাসিকো এর জন্য মির্জারাজাকে এক পত্র লিখেছিলেন —সে-পত্রের কথাও বহেনজী শুনেছেন। তাতে তিনি খুবই উদার চরিত্রের পরিচয় দিয়েছেন বলে হিন্দুস্তানে রটনা হয়েছে। তাও আমি জানি। মির্জারাজাকে যা লিখেছেন তার মধ্যে "হিন্দুস্তানে মেবারের মহারানা চিতোরের অধীশ্বর হিন্দু ভারতের গৌরবস্বরূপ। তাঁর জন্য

আমি শ্রদ্ধা পোষণ করি—তাঁর কল্যাণ কামনা করি" এ কথা আছে এও সত্য। কিন্তু তাতে দারাসিকোর কল্যাণ হয় নি। রাজপুতানার অন্য রাজপুত রাজারা এর জন্য বিক্ষুব্ধ। মহারানা যশোবন্তসিং মির্জারাজা জয়সিং—এ ছাড়া ছোট বড় মাঝারি রানারা যাদের কানে এই কথা গিয়েছে তাদেরই মুখ লাল হয়ে উঠেছে এবং তারাই বলেছে —বাদশাহ সাজাহান পর্যন্ত কোন রকমে জান মান নিয়ে বাঁচা গেল। কিন্তু বাদশাহের পরে এই শাহজাদা মসনদে বসলে জান থাকবে, মান থাকবে না।

আর খোদ মহারানা রাজসিংহের কথা শুনবেন বহেনজী? তাহলে মেহেরবানি করে শুনুন।

গোপন রাখবেন কথাটা।

শাহজাদা দারাসিকো যে মহারানাকে হিন্দুর প্রধান এবং বহু গৌরবের অধিকারী বলে শ্রদ্ধা করেন এবং যাঁর জন্য তিনি শাহানশাহ বাদশাহকে অনুরোধ করে মেবার অবরোধ তুলিয়ে নিয়ে সন্ধি করিয়ে দিয়েছেন সেই মহারানা এই সন্ধির পর আমাকে এক পত্র লিখে তাঁর দুজন প্রতিনিধিকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন। একজন উদয়করণ চৌহান আর একজনের নাম শঙ্কর ভট্ট।

কারণ শুনুন। কারণ এই সন্ধিতে মহারানা অক্ষত মেওয়ার ফিরে পান নি। খানখানান সাদুল্লা খাঁ সাহেব মুঘল বাদশাহীর নিরেট পাথরের থাম্বা। তিনি অটল থেকেছিলেন তাঁর দাবিতে। দুটো পরগনা তিনি বাজেয়াপ্ত করেছেন। কিন্তু উদ্ধত গোঁয়ার অবুঝ এই রাজপুত যুবকের ঔদ্ধত্যে আমি বিস্মিত হয়েছিলাম বহেনজীউ! শাহজাদা দারাসিকোকে সে দায়ী করে লিখেছে—"শাহবুলন্দ ইকবাল শাহজাদা দারাসিকো বাদশাহের জ্যেষ্ঠপুত্র এবং প্রিয়তম পুত্র বলেও লোকে বলে তিনিই ভারতের ভবিষ্যৎ বাদশাহ। তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, তিনিই মিটিয়ে দেবেন। আমি তাঁকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেছিলাম। আশা করেছিলাম সম্মানজনকভাবেই মিটে যাবে।

আমি বাদশাহের সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করে নেব, একটা করও দেব। এবং বাদশাহ আমার মেওয়ারের যা অধিকার করেছেন তা আমাকে ছেড়ে দিয়ে যাবেন। কিন্তু তা তিনি দিলেন না। খানখানান সাদুল্লা খাঁকে হয়তো সামনে খাড়া করে নিজে নির্দোষ সেজে রইলেন। না হলে বাদশাহের জ্যেষ্ঠপুত্র, ভাবী বাদশাহের এই অনুরোধ না রেখে বাদশাহ সাদুল্লা খাঁর কথা বহাল করতেন এ কথা কে বিশ্বাস করবে? সুতরাং মেবার রানাবংশের এই বেইজ্জতির কারণ সাদুল্লা খাঁ নন—কারণ খুদ্ শাহজাদা দারাসিকো। শাহজাদা দারাসিকো মির্জারাজাকে চিঠি লিখে অনুরোধ করেছেন রাজপুতানার রাজপুত রাজাদের সকলকে জানাতে যে, শাহজাদা দারাসিকো তাঁদের অতীত গৌরবের সব থেকে বড় সমঝদার। তাঁদের বন্ধু হতে চান তিনি। তাঁদের তিনি ঐকান্তিক হিতৈষী। হিন্দুদের ধর্মের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা এবং সম্ভ্রমের কথাও তিনি জানিয়েছেন। তিনি হিন্দুর ধর্মশাস্ত্র, মুসলমানের ধর্মশাস্ত্র, কেরেস্তানী শাস্ত্র পড়ে নিজে এক নতুন শাস্ত্র রচনা করছেন, এবং নিজেকে সে ধর্মের পয়গম্বর ঘোষণা করবেন বা করতে চান এ কারুর কাছে অবিদিত নেই। খাঁটি মুসলমান হিসেবে আপনি যেমন এর প্রচণ্ড বিরোধী তেমনি হিন্দুদের প্রতিনিধি হিসাবে মেবারের রানাও এর প্রচণ্ড বিরোধী। মহারানা প্রতাপসিংহ এলাহি ধর্মের পয়গম্বর বাদশাহ জালালউদ্দিন আকবর শাহকে স্বীকার করেন নি। মহারানা রাজসিংহও সেই এলাহি ধর্মকে নিয়ে দারাসিকোকেও স্বীকার করবে না।

শাহজাদা, আপনি অতি গোঁড়া মুসলমান। কিন্তু খাঁটি। আমিও গোঁড়া হিন্দু। এবং খাঁটি হিন্দু। আপনার সঙ্গে আমার আপাতদৃষ্টিতে বিরোধ। কিন্তু আজ একস্থানে আপনি আমি উভয়েই বিপন্ন! এই নতুন ধর্মের পয়গম্বরের এই বিচিত্র আক্রমণে ইসলাম এবং সনাতন ধর্ম সমান বিপন্ন। সেই কারণেই শাহজাদার গৌরবোজ্জ্বল দরবারে আমার প্রতিনিধি উদয়করণ চৌহান এবং শঙ্কর ভট্ট শাহজাদার

প্রতি আমার সম্ভ্রম এবং শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ সামান্য উপঢৌকন এবং আমার সালামৎ বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। শাহজাদা খুশী হয়ে খুশ মেজাজ আর উদার দরাজ দিলের সঙ্গে গ্রহণ করে যদি এই হিন্দু প্রতিনিধি চিতোরের মহারানাকে আপনার অনুগত জন বলে বিশ্বাস করেন তবে আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করব। রাজপুত আনুগত্য স্বীকার করলে বিনা আঘাতে বা বিনা অসম্মানে সে আনুগত্যকে অস্বীকর করে না।"

আরও অনেক বড় বড় কথা আছে বহেনজী। সে সব আপনি জানেন একান্তভাবেই মামুলী, সে সব তরিবতের সহবতের কসরত। সে-সব থাক। আমি এই চিতোরাধিপতিকে ঘৃণা করি না কিন্তু এর উপর আমার অত্যন্ত ক্রোধ। চিতোরের উপর প্রসন্ন দিল্লীর বা হিন্দুস্তানের কোন মুসলমান বাদশাহ বংশধর কি সুলতান বংশধর হতে পারে না। তবু আমি ঔরংজীব রানার এই পত্রের তারিফ করছি। এবং আপনাকে জানাই যে ঐ পত্রের জবাবে আমি মহারানাকে তাঁর পত্রের প্রস্তাব গ্রহণ করলাম বলে আশ্বাস দিয়ে পত্র লিখেছি।

লিখেছি—"রানাসাহেব, আপনি আমাকে খাঁটি মুসলমান বলে জেনেছেন এবং সেই কারণে শ্রদ্ধা করেন জেনে খুশী হয়েছি। হাঁ, আমি খাঁটি মুসলমান। খুদাতায়লা লা ইলাহি ইল্লালা এবং তাঁর অনুগৃহীত পয়গম্বর রসুল মহম্মদ ছাড়া আর কোন বা কেউ আমার উপাস্য নেই। কাফেরের ধর্মকে আপনাদের ঈশ্বরকে মিথ্যা এবং ভ্রান্তি বলেই মনে করি। আমার সারা জীবন ধরে ইসলামের সামান্য একজন খাদিম হিসাবে ইসলাম ছাড়া বেবাক ধর্মের উপর জেহাদ চালাব আমি। কিন্তু এই যে বিপদ যেখানে ইসলাম এবং হিন্দু ধর্ম সমান বিপন্ন সেখানে আপনার এই আনুগত্যকে সম্ভ্রমের সঙ্গে গ্রহণ করতে চাই। সেই সঙ্গে এই আশ্বাসও জানাই যে নতুন কালের ভণ্ড নতুন ধর্মধ্বজীর মিথ্যার দ্বারা আপনার ধর্ম আক্রান্ত হলে আমি আপনাকে সাহায্য করব।

এমন ধর্মধ্বজী ভণ্ড শাহবুলন্দ ইকবাল শাহজাদা দারাসিকো একা নন হিন্দুস্তানে। রানাসাহেব, আজ হিন্দুর মন্দিরে ইসলামের নানান দরগায় সন্ন্যাসী এবং ফকীরের সাজে সেজে অসংখ্য প্রতারক আড্ডা গেড়েছে। নানান চোখা চোখা মিঠি মিঠি বুলি আউড়ে মানুষদের বিভ্রান্ত করছে।

হিন্দুরা আজ মুসলমান জোলার ছেলে কবীরের থোড়া কুছ দোঁহা আর গীত আর বয়েৎ নিয়ে ওয়া ওয়া করে কবীরপন্থী হচ্ছে। ওদিকে পাঞ্জাবে মুসলমানেরা হচ্ছে নানকপন্থী। এমন হাজার হাজার পন্থওয়ালা সারা হিন্দুস্তানে ইসলাম এব অন্য ধর্মকে সমান বরবাদ করছে। জাহান্নামে পাঠাতে চাচ্ছে।

সুদূর বদাকশান থেকে এমনি একজন এসেছে—মুল্লাশাহ। মুল্লাশাহ বদাকশানি মিয়া মীরের সুফীত্বের ভণ্ডামির কথা শুনে এসে কাশ্মীরে আড্ডা গেড়েছে। মুসলমান হয়েও সে শরিয়ৎকে না মেনে কাফের বনেছে। হাজার হাজার হিন্দু মুসলমান তার মুরীদ। শাহজাদা দারাসিকো তার দোস্ত।"

বহেনসাহেবা রৌশনআরা, আমি সত্য কথার খাতিরেও লিখতে পারি নি যে বহেন জাহানআরা বেগমসাহেবাও মুল্লাশাহ সাহেবের প্রতি ভক্তিতে গদগদচিত্ত। হরবখত তিনি চিঠি লিখছেন।

শরম কি বাত বহেনজী, আমাকে সত্য গোপন করতে হল। আমি কি করে স্বীকার করব একজন পাহাড়িয়া কাফের রাজপুত রাজার কাছে যে বাদশাহ সাজাহানের বড়ি বেটী—বাদশাহী হারেমের মালিকিন্—সারা হিন্দুস্তানে যার খেতাব হল 'হজরত বেগম' তিনি হারেমে বসে চিট্‌ঠি লেখেন কাশ্মীরের এক ফকীরকে। যে ফকীরীর নামে কাফেরী আচরণ করে, জাহির করে যে খুদাকে সে দেখেছে।

এয়, পয়গম্বর রসুল, তোমাকে অস্বীকার করলে!

তার সঙ্গে সুর মিলিয়ে জাহানআরা বেগম লেখেন, ফকীরসাহেবের কৃপায় তিনিও দেখেছেন পয়গম্বর রসুলকে। আগ্রার হারেমের মক্কাশরীফের দিকে মুখ করে বসে চোখ বন্ধ করতেই আমার মনের মধ্যে ভেসে উঠল সহাস্যমুখে দাঁড়িয়ে আছেন পয়গম্বর রসুল!

এর জন্য দায় আমাদের বড়ভাই শাহজাদা দারাসিকোর। এ কথা আমি রানাকে লিখতে পারি নি। তবে লিখেছি—

শেখ মহিবুল্লা ইলাহিবাদীর কথা লিখেছি। বহেনজী, যদি কোনদিন ইসলামের এই মুরীদ মহীউদ্দিন ঔরংজীব দিন পায়, খুদা যদি তাকে অধিকার দেন, পয়গম্বর রসুল যদি মেহেরবানি করেন তবে এই ইলাহিবাদী ফকীর মহিবুল্লার কাছে সে কৈফিয়ত নেবে; তার ওই কেতাব মিরাৎ উল খেয়ালের জন্য কৈফিয়ত নেবে। ছাড়বে না। পবিত্র শরিয়ৎকে এমনভাবে বরবাদ দিয়ে নয়া কানুন নয়া রাস্তার হদিস কেউ বাতলায় নি।

থাক বহেনজী। রানাসাহেবকে কি লিখেছি তাই বলি—।

এস্‌া দিন নেহি রহেগা। দিন তো বদল্‌ যায়েগা। আজ সারা হিন্দুস্তানে ইসলামের বড় দুদিন। বাদশাহের জ্যেষ্ঠপুত্র ইসলামকে বরবাদ দিতে কোমর বেঁধেছে। মহারানাজী, আপনে ঠিক বাতায়া, সাচ দেখা হ্যায় আপনে। শুধু ইসলাম নয় হিন্দুস্তানের সমস্ত ধর্মকে বরবাদ দিতে কোমর বেঁধেছে শাহজাদা দারাসিকো। সে এই সব ভণ্ড ধর্মধ্বজীদের, অধার্মিক শয়তানদের হুজুর মালেক-ই-মুল্ক হয়ে দাঁড়াতে চাচ্ছে।

কাশ্মীরে আর এক ফকীর আছে মহারানাজী—শেখ মহসীন ফানি। শাহানশাহ বাদশাহের নোকর ছিল লোকটা। এলাহিবাদে সদর্‌ আদালতে হাকিম ছিল। শাহানশাহ তাকে বরখাস্ত করলেন বে-ইমানির জন্য। সেই বেইমান পর্যন্ত শাহবুলন্দের কাছে আজ একজন অলৌকিক পুরুষ। সে গুপ্ত এক হৌজখানা বানিয়ে

বসেছে কাশ্মীরে। দু'পহরের সময় সব বুরবক বুদ্ধিহীন সরল মানুষেরা আসে—তাদের কাছে ফকীর বলে ঝুটা ধরমের বাত। মহারানাজী, এক নাচওয়ালী ফকীরের মহব্বতিতে পড়েছে। ফকীরও পড়েছে। নাচওয়ালী নিয়ে যে ব্যভিচার করে—প্রকাশ্য ব্যভিচারের গুনাহগারী সত্ত্বেও সে আজ সমাজের গুরু। ধর্মের প্রচারক। বাদশাহের বড়ছেলে যে নাকি বড় ভারী পণ্ডিত—যে নিজেকে বলে পয়গম্বর—আপনাদের ধরমমতে সে নিজেকে আরও বড় বল মনে করে—নিজেকে বলে সে ঈশ্বরের অবতার! আমি অবাক হয়ে যাই মহারানাজী যে শাহজাদা দারাসিকো এই মহসীন ফানিকে পবিত্র ঈশ্বরজানিত ব্যক্তি বলে মনে করে। ফকীর বলে মনে করে।

মহসীন ফানি এক নাচওয়ালী ঔরৎ নিয়ে দিবারাত্রি মেতে রয়েছে। ঔরতের নাম "নাজি"।

হায় হায়! নাজি শাহজাদা দারাসিকোর অত্যন্ত পরিচিত। সে বাদশাহী হারেমের একজন বাঁদী। তারও আগে ছিল সে কাশ্মীরের এক ব্রাহ্মণের বেটী। মহারানাজী, কোনমতে সে বাদশাহী হারেমে আসে। নাম হয় শিরিন। বাদশাহ তাকে সুনজরে দেখেছিলেন। বাদশাহের সেবার ভারও সে পেয়েছিল। কিন্তু তার কুমারী জীবনে সে ভালবেসেছিল একজন কাশ্মীরী ব্রাহমণ নওজোয়ানকে। লেড়কী এল বাদশাহী হারেমে, তার দুঃখে ব্রাহমণ ছেলে হয়ে গেল দেওয়ানা। তার থেকে সে হল একজন 'শায়ের'। তারপর সে অনেক কথা মহারানাজী। এই দেওয়ানা শায়ের এসে বাদশাহের দরবারে মুশায়ারায় বাদশাহকে খুশী করে। শিরিন তাকে দেখে হারেমের ঝরোকা থেকে। পুরানো মাশুককে দেখে সে কাঁদে।

সে কান্না কেউ দেখেছিল। এবং কানে তুলেছিল শাহজাদা দারাসিকোর। দারাসিকো তাঁর নতুন ধর্মের জন্য মুরীদ মুরীদা খুঁজছিলেন হিন্দু সাদি করবে মুসলমানকে। ঘরের এক দিকে থাকবে আপনাদের পুতুল ঠাকুর। অন্য দিকে থাকবে মসজিদের ব্যবস্থা।

দম্পতির মধ্যে যে হিন্দু সে ঠাকুর পূজো করবে—যে মুসলমান সে নামাজ পড়বে। লেড়কা লেড়কী হলে সে পাবে তার বাপের জাত। হিন্দুস্তানে যে ব্যভিচার ধর্মের যে বিকৃতি আগে চলছিল তাই। যা শাহানশাহ ফরমান জারি করে বন্ধ করেছেন তাই। যা আপনারাও স্বীকার করতেন না তাই।

যাক—। নাজি বা শিরিনের কথা বলি।

শিরিনকে এবং তার কুমারী জীবনের হিন্দু প্রেমিককে নিয়ে দারাসিকো পত্তন করলেন তাঁর ধর্ম সম্প্রদায়ের। শিরিন এবং কবি শপথ করে রাজী হল। শাহজাদা দারাসিকো হজরতবেগম জাহানআরার সঙ্গে বন্দোবস্ত করে তাকে বিষে অচেতন করে রেখে ঘোষণা করলেন বাঁদী মরে গেছে। এবং কবর দেবার অছিলায় কেল্লার বাইরে কবরস্থানে এনে অচেতন শিরিনকে তুলে দিলেন এই ব্রাহমণ ছেলের হাতে। বড় হকিম তৈয়ার ছিল দাওয়াই নিয়ে। সে বাঁচালে শিরিনকে।

শিরিন আর এই ব্রাহমণ কবিকে ঘরও বেঁধে দিয়েছিলেন শাহজাদা দারাসিকো কাশীতে। কিন্তু বিনা বনিয়াদে ঘর টেকে না মহারানাজী। শিরিন মুসলমানী হয়েছিল—সে ইসলামকে অস্বীকার করতে পারলে না। ব্রাহমণ কবি, সেও তার নিজের ধর্মকে অস্বীকার করতে পারলে না। দুজনে দুজনকে ছেড়ে দিয়ে আশ্রয়ের জন্য, শান্তির জন্য দুনিয়ার বুকে বেরিয়ে পড়ল কাঁদতে কাঁদতে। দুজনেই এসেছিল শাহজাদা দারাসিকোর আগ্রার মঞ্জিল নিগমবোধে, সেকায়েৎ জানাতে এসেছিল।

—এ কি করলেন শাহজাদা? এতে কোথায় ঈশ্বর? কোথায় শান্তি? কোথায় আলো? কোথায় সুখ?

কিন্তু—সে থাক। নাজির কথা বলি।

ব্রাহ্মণের শান্তি হারাল, সুখ হারাল। কিন্তু নাজির অশান্তি অল্প ক'দিনের—সে অল্প ক'দিন পরেই নতুন গুরুর সন্ধান পেলে।

নতুন গুরু কে জানেন?

এ সব ঔরতের নতুন গুরু তারাই যারা তার মনোহরণ করতে পারে। দেওয়ানা হয়ে শিরিন এসেছিল দিল্লী। কাশীতেই তার কানে পৌঁছেছিল এক আশ্চর্য ফকীরের কথা।

সে ফকীরের গায়ের রঙ সোনার মত। চুল দাড়ি গোঁফ তাতেও সোনার বর্ণের ছোঁয়াচ। চোখ দুটি পিঙ্গল। আর সে উলঙ্গ। সারা দেহের মধ্যে এক টুকরা কাপড় নেই।

আর তার সঙ্গে আছে এক লৌণ্ডা!

সে নাকি এক বানিয়ার লেড়কা। আশ্চর্য সুন্দর। নাম তার অভয়চান্দ। তাকে মেয়ের পোশাকে সাজালে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সুন্দরীও হয়তো শরমাবে মহারানা।

মহারানা, কত বড় পাপ অনাচার এ কি বলতে হবে? আপনি স্বীকার করবেন বলেই আমি বিশ্বাস করি।

এই লোক নাকি সিদ্ধপুরুষ! ঈশ্বরকে জানা মহাপুরুষ! দিন-দুনিয়ার সমস্ত তত্ত্ব জানা পয়গম্বর যোগী! লোকটাকে দেখতে নাকি সারা দিল্লি ভেঙে পড়ে প্রতিদিন! লোকটা জন্মেছিল ইহুদীর ঘরে—তারপর হয়েছিল মুসলমান। শুনেছি দুই শাস্ত্রেই তার অসাধারণ অধিকার। মুখস্থ রয়েছে।

দুনিয়ার মানুষ বড় কুৎসিত মহারানা। তারা উলঙ্গ মানুষের মধ্যে মাহাত্ম্য দেখে। পুরুষের চেয়ে মেয়েরা ছুটে আসে অধিক আগ্রহে। বেশী দলে দলে।

শিরিন ছুটে এসে মোহিত হয়ে গেল।

লুটিয়ে পড়তে চাইলে উলঙ্গ ফকীরের পায়ে।

লোকটার নাম এখন সারমাদ। ওই নামেই সারা হিন্দুস্তান তাকে চেনে।

তুঘলকাবাদের পুরানা ভাঙা কিল্লার এলাকার মধ্যে এই উলঙ্গ সাধুকে আর ওই ছোকরীবেশী লৌণ্ডা অভয়চান্দকে দেখবার জন্যে সারা দিল্লী ভেঙে পড়ে।

লোকটা বলে—মক্কাশরীফে কাবায় কালো পাথরখানিও যে কালো পাথর সেই কালো পাথর থেকেই হিন্দুদের মন্দিরে মন্দিরে বিগ্রহমূর্তি তৈরী হয়েছে। তুইই সেই এক কালো কষ্টিপাথর। কোন কোন মন্দিরের মূর্তি গড়া হয়েছে কাঠ থেকে।

খুদাই হোন আর দেবতাই হোন সারমাদের কাছে তিনি হয় কালো পাথর নয়তো কাঠ!

অথবা বলে—মুসাফের, কেন ঘুরে মর খুদা কি ঈশ্বরের সন্ধানে? বস—চেপে স্থির হয়ে বস। সে যদি খুদা হয় তবে সেই আসবে।

নইলে নির্লজ্জের মত বলে—আমি জানি না আমার খুদা কে? আমার ঈশ্বর কে? আমার খুদা আমার ঈশ্বর অভয়চান্দ না আর কেউ?

নাম-ই-দানম্ দারীন চর্খ-ই-কাঁহা দেয়র্
খুদাইমানে অভয়চাঁন্দস্ত ইয়া খয়ের

মহারানাজী, সারা হিন্দুস্তানে আজ শয়তান এসে তার পয়গম্বর হয়ে দাঁড়াতে চাচ্ছে। শাহজাদা দারাসিকো তার কাছে নিজেকে বিক্রি করেছেন।

* * * *

আপনি আমার পরমহিতাকাঙ্ক্ষিণী বড়িবহেন দিদিজী! আপনার ব্যাকুলতা আমি বুঝতে পারি। কিন্তু আমি নিশ্চিন্ত বসে নেই। দিবারাত্রি ভরসা রাখি যাঁর উপর তিনি দিনদুনিয়ার মালেক। কিন্তু অতি বিচিত্র তিনি—বিচিত্রতর তাঁর এই সৃষ্টি। এখানে শুধু [illegible] ঘাসই সৃষ্টি করেন নি—ঘাস খাবার জন্যে হরিণ তৈরি করেছেন—আবার হরিণ খাবার জন্যে বাঘও তৈরি করেছেন। হরিণ ঘাস খায়—ঘাসও খুদাকে ডাকে, খুদা বাঘকে পাঠান। বাঘ হরিণ মেরে খায়। হরিণও ডাকে—খুদা আমাকে বাঁচাও। খুদা বাঘের হাত থেকেও হরিণকে বাঁচান বিচিত্র উপায়ে। হয়তো সিংহ এসে দাঁড়ায়। কিংবা মানুষ আসে।

এয় খুদাতায়লা!

আমি তাঁকে ডাকি। তাঁর উপর ভরসা রাখি। কিন্তু তাতেই নিশ্চিন্ত থাকি না। আমি জেগে আছি। আমি সব খবর রাখি। সব খবরে আপনাকে ওয়াকিবহাল রাখা সম্ভবপর হয় না।

তবে বহেনজী, খুদার বিচার নির্ভুল নিখুঁত। যার যা আহার প্রাপ্য, যতটুকু প্রাপ্য ততটুকু তাকে নিশ্চয় তিনি দেন, বাঘকে হরিণ মিলিয়েও দেন কিন্তু তাতে হরিণ মরে না, মরে বাঘ।

একটা খবর আপনি জানেন কিনা আমি জানি না।

মেবারের রানার সঙ্গে লড়াই যখন মিটল—যখন শাহজাদা দারাসিকোর অনুরোধেই বাদশাহ মহারানা রাজসিংহকে মাফ্ করলেন তখন তিনি কি বলেছেন জানেন?

বাদশাহ শাহজাদা দারাসিকোকে বলেছেন—শাহজাদা শাহবুলন্দ ইকবাল তোমার দিল বহুৎ বড়—তোমার মহত্ত্বের ঐশ্বর্যও বিপুল। লেকেন মন্দ লোকের কাছে ভালো আর ভালো জনের কাছে মন্দ হবার দৃষ্টান্তের আর হিসাব-নিকাশ নেই।

সম্ভবতঃ তিনি মহারানার মন বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি হয়তো শাহজাদার অনুরোধ মত অক্ষত মেবারই ছেড়ে দিতেন মহারানাকে। কিন্তু খানখানান সাদুল্লা খাঁ সহজ মানুষ নন। তাঁকে তিনিও ভয় করেন।

থাক। সাদুল্লা খাঁর কথা থাক।

রানার কথা বলি।

মহারানাকে দীর্ঘ পত্র লিখে খেলাত দিয়ে আমার দূত পাঠিয়েছি। আমার বিশ্বস্ত হিন্দু কর্মচারী ইন্দর ভট্ট আর খাজা ফিদাইকে উদয়পুর পাঠিয়েছি। এক হীরার আংটি আর একটি দক্ষিণী মর্দানা হাতী পাঠিয়েছি খেলাত হিসেবে।

মহারানা খুব সম্ভ্রমের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন।

ইন্দর ভট্ট খুব কুশলী এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধি বিচক্ষণ কর্মচারী। সে মহারানাকে প্রশ্ন করেছিল—মহামান্য মহারানা, শাহজাদা সুলেমান-

সিকোর সঙ্গে মির্জারাজা জয়সিং বাহাদুরের ভাগ্নীর সাদি হচ্ছে এ
এক আনন্দের কথা। বাদশাহ জাহাঙ্গীর পর্যন্ত শাহীবেগমের মসনদ
পেয়ে এসেছেন রাজপুত মেয়েরা। এ নিয়মকে নাকচ করেছেন শাহান-
শাহ বাদশাহ সাজাহান। তাঁর বেগম মমতাজমহল খাস ইসলামের
মুরীদা। তাঁর ছেলেদেরও সাদি হয়েছে খাঁটি তুর্কী তুরানী ইরানী
আমীর বংশের মেয়ের সঙ্গে। এতদিন—পুরো দু পুরুষ পর, আবার
শাহজাদা দারাসিকোর বড় ছেলে শাহজাদা সুলেমান সিকোর সঙ্গে
বিবাহ হচ্ছে রাজপুত রাজকুমারীর। নিঃসন্দেহে রাজপুতরা খুশী হবে।

মহারানা ভ্রূকুটি করে বলেছেন—ভট্‌জী, মেবারের মহারানা এর
জবাব কি দেবে? এর জবাব মহারানা প্রতাপসিং মহারানা মানসিংকে
দিয়ে রেখেছেন।

আরও খবর এনেছে ইন্দর ভট্‌।

রাজপুতানার রানারা সর্দারেরা বলে—অন্য ধর্মের সঙ্গে সংস্পর্শদোষ
ঘটলে আমাদের বিধি হল, যে-অঙ্গের সঙ্গে দুষ্ট সংস্পর্শ ঘটবে সেই
অঙ্গকে কেটে বাদ দেওয়া। রাজপুত কুমারী যখন এমন করে
অন্যধর্মীর বাড়িতে যায় তখন আমরা ভাবি সে মরে গেছে। একসময়
কিছু মোহ ছিল। এখন তাও নেই, কেটে গেছে।

বহেনজী রৌশনআরা বেগমসাহেবা, সুলেমানসিকোর সঙ্গে এই
রাজকুমারীর সাদি ইসলামের গৌরব বৃদ্ধি করুক। কিন্তু এতে দারা-
সিকোর লাভ হয় নি, হবে না। তার জোর বাড়ে নি।

আমি মেঝোভাইসাহেব শাহ সুজার কন্যা গুলনেয়ারের সঙ্গে
মহম্মদ সুলতানের বিয়ের প্রস্তাব করে রেখেছি। জানি না এর জোরে
আমরা দুজনে শাহজাদা দারাসিকোর আক্রোশ উদ্যত হলে কতটা
রুখতে পারব। তবে সে সম্ভাবনাকে আমি উপেক্ষা করি নি। এখন
মর্জি খুদার, আর খেল নসীবের, আমি খুদা আর পয়গম্বর রসুলের দীন
সেবক মাত্র। এতে একবিন্দু ছলনা নেই। দিদিজী, আপনি অন্ততঃ
আমার কথা বিশ্বাস করবেন।

বিয়াল্লিশ

"শাহজাদা ঔরংজীবের দৃষ্টি অসাধারণ তীক্ষ্ণ—তার দীপ্তি বহুদূর-প্রসারী এবং নিশ্চয় করে সুদূর-সন্ধানী।"

শাহজাদার সেই সুদীর্ঘ পত্রখানি হাতে নিয়ে বসে ভাবছিলেন তাঁর প্রিয় ভগ্নী—সারা বাদশাহী মহলে তাঁর শ্রেষ্ঠ হিতাকাঙ্ক্ষিণী শাহজাদী রৌশনআরা বেগমসাহেবা। তাজা ইরানী গুলাবের রঙের মত তাঁর গায়ের রঙ। চোখ দীর্ঘ টানা কিন্তু আয়ত যাকে বলে তা নয়। নাকের গড়ন তীক্ষ্ণ—ধারাল অস্ত্রের মত। তাঁর মসৃণ গোলাপী কপালে মধ্যে মধ্যে চিন্তার রেখা জেগে উঠছে।

"সেই দূর দক্ষিণে বসে শাহজাদা ঔরংজীব—তাঁর প্রিয়তম ভাই-সাহেবের আশ্চর্য চোখদুটি যেন দুটি জ্বলন্ত সন্ধানী আলোর মত জেগে রয়েছে—নিজেকে জ্বালিয়ে রেখেছে। এই বিশাল হিন্দুস্তানে কখন কোথায় কি ঘটল তার প্রতিটির উপর তার রোশনি পড়ছে এবং জেনে রাখছে, বুঝে রাখছে, চিনে রাখছে।

"হিন্দুস্তানের কোন্ দিগন্তে কোন্ আলো জ্বলল—তার কোন্ রঙ, কোথায় কোন্ আলো নিভল—কোথায় গাঢ় অন্ধকারের মধ্যেও বনে জঙ্গলে বা মাটির নীচে কি নড়ছে, কে নিশ্বাস ফেলছে—সে নিশ্বাস কত উত্তপ্ত তার আশ্চর্য নিখুঁত হিসেব ধরা পড়েছে তার চোখে।

"নিখুঁতভাবে শাহজাদা সারা রাজস্থানের রাজপুত রাজাদের মন জেনেছেন। তিনি যা জেনেছেন তাই সত্য তাই খাঁটি—দারা যা জানেন, বাদশাহ যা আশা করেন তা বিলকুল ঝুট—ভুল।

"মহারানা রাজসিংহ, মহারানা জয়সিংহ এবং সারা রাজস্থানের,—তাই বা কেন, সারা হিন্দুস্তানের সব রাজপুত, তাই বা কেন, রাজপুত, ব্রাহ্মণ, লালা কায়স্থ, শেঠ বানিয়া, আহীর, বাভন, জাঠ—তামাম হিন্দু একদিক থেকে শাহজাদা দারাসিকোর এই মতের বিরোধী। বাদশাহ আকবর ভগবানদাসের বেটীকে সাদি করেছিলেন—ছেলে

সেলিম বাদশাহ জ'হাঙ্গীরের সাদি দিয়েছিলেন বিহারীমলের বেটীর সঙ্গে—তার জন্যে রাজা মানসিংহের দিল খুশী হয় নি—বিহারীমল্ল ভগবানদাসেরও নিশ্চয় হয় নি। হলে রাজা মানসিংহ যেচে ওই চিতোরের গোঁয়ার মহারানা প্রতাপসিংহের কাছে উপযাচক হয়ে এক সঙ্গে বসে খানা খাবার জন্যে রোটি নিমক চেয়ে খেতে যেতেন না। মহারানা প্রতাপসি'হ বিলকুল অপমান করে রাজা মানসিংহকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। এবং তার জন্য মানসিংহ মহারানাকে পাহাড়ে পাহাড়ে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছিলেন। তাই বেড়িয়েছিলেন প্রতাপ-সিংহ। তাজ্জবের কথা, তাতে মহারানা প্রতাপসিংহের ইজ্জত ক্রমান্বয়ে বেড়েই গেছে, কমে নি এবং প্রবল প্রতাপ মুঘল বাদশাহের প্রধান সেনাপতি মহারানা মানসিংহের হেঁটমাথা এতটুকু উঁচু হয় নি। শাহজাদা ঔরংজীব বলেছেন আজও তাই আছে। সম্ভবতঃ বেড়েছে এই ভাব ; তা অস্বীকার করতে পারবেন না রৌশনআরা।

"মহারানা রাজসিংহ মহারানা প্রতাপসিংহের বংশধর আজও সারা রাজস্থানের, সারা হিন্দুস্তানের রাজপুত রাজাদের শিরোমণি। চিতোরের গড় মেরামতি নিয়ে তাঁর সঙ্গে মোকাবিলা করতে গিয়ে-ছিলেন শাহজাদা ঔরংজীব। চিতোরগড় ধ্বংস হয়ে যেত—রক্ষা করেছেন শাহজাদা দারাসিকো। কিন্তু মহারানা রাজসিংহ গোপনে আনুগত্য জানিয়েছেন শাহজাদা ঔরংজীবের কাছে। শাহজাদা দারা-সিকোর কাছে নয়। মহারানা রাজসিংহ শাহজাদা দারাসিকোর প্রীতিকে ভয় করেন। সন্দেহের চোখে দেখেন। বাদশাহ আকবর শাহ হিন্দুর মনের জোর ভেঙে দিয়েছিলেন কেবল অনুগ্রহ বিলিয়ে। হিন্দু আর মুসলমানের মধ্যে ধর্মের যে ঝগড়া মিটবার নয়, যার কলহ আকাশস্পর্শী তাকে তিনি ঘুষ দিয়ে বন্ধ করতে চেয়েছিলেন। আগুনকে ছাই চাপা দিয়ে নেভাতে চেয়েছিলেন। মহারানা জয়সিংহের ভাগ্নী রাও অমরসিংহের বেটীর সঙ্গে শাহজাদা সুলেমানসিকোর সাদি এ সন্দেহকে আরও সতর্ক করে তুলেছে। এ কথা সত্য। মহারানা

জয়সিংহও মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়েছেন। শাহজাদার এ খবরে এতটুকু ভুল নাই।" সারা রাজস্থানে রাজপুত রাজা এবং সর্দারদের মধ্যে এ নিয়ে কানাকানি চলছে। শাহজাদী রৌশনআরা এ খবর নিয়েছেন, যাচাই করেছেন।

অত্যন্ত অস্বস্তির মধ্যে নড়ে চড়ে বসলেন শাহজাদী রৌশনআরা। এসব জেনে, যাচাই করেও মনের মধ্যে একটা কিন্তু যেন অহরহ মাথা উঁচু করে জেগে রয়েছে।—"কিন্তু এই কি সব? না, এই তো সব নয়। এই দুনিয়া কি শুধুই মাটি, জল, মাটির তলদেশ, বনে জঙ্গলেই শেষ? এই সীমানার মধ্যেই সারা? শেষ? মন বলছে—না।

"আগে তা বলত না। আজ বলছে। বলছে—না, শেষ তো নয়। দুনিয়া মাটিতে, জলে, মাটির তলদেশে, বনে জঙ্গলেই শেষ নয়। এর পরেও আছে, আরও আছে।

"আছে—আসমান। ওই সীমানাহীন আসমান। নীল আসমান। দিনে যার বুকে সূর্য আফতাব রোশনি দেয়—রাত্রে যে আসমানের রঙ আরও গাঢ় হয়—এবং কড়োর কড়োর নক্ষত্রের আলোয় ঝলমল করে, যেখানে চাঁদ ওঠে, যেখানে ছায়াপথ দেখা যায়, সেই আসমান আছে।"

শহর দিল্লী। আগ্রা শহর নয়।

বাদশাহ আগ্রা থেকে শাহী দরবার উঠিয়ে নিয়ে এসেছেন নতুন শহর দিল্লীর সাজাহানাবাদে। যমুনার কিনারার উপরেই তাঁর নতুন শাহী কেল্লা লালকেল্লা তৈরী শেষ হয়েছে, জুম্মা মসজেদ পুরা হয়েছে—দিল্লী ফটক, লাহোর ফটক, আজমীর ফটক, কাশ্মীর ফটক তৈয়ার করে শহরের চারিদিকে পাঁচিলবন্দীও পুরা হয়েছে। এ ফটকগুলি ছাড়াও আরও ফটক আছে। এইগুলি প্রধান। চাঁদনী চৌক গড়ে উঠেছে বিপুল ঐশ্বর্য এবং সমারোহ নিয়ে। দেশদেশান্তর—সে ইরান ইরাক তুর্কীস্তান উজবেগীস্তান বলখ

বদাকশান—গোটা ফিরিঙ্গী মুল্কের আংরেজ, ফরাসী ওলন্দাজ পোর্তুগীজ থেকে সওদাগরী মাল আমদানী হয়ে দিল্লীর চাঁদনী চৌকে থরে থরে সাজানো আছে। রাত্রে যখন মোমবাতি আর কাচঘেরা লণ্ঠনের মধ্যে প্রদীপ জ্বলে তখন তার রোশনীতে চোখ ধেঁধে যায় মানুষের। পথের ওপর নাচওয়ালীর দল কোথাও নাচগান জুড়ে দিয়ে পয়সা কামাচ্ছে, কোথাও জাতুকরের দল জাতুর আসর পেতেছে, কোথাও কসরতের খেলা চলছে।

এই নয়া সাজাহানাবাদ দিল্লীতে যা মিলবে না, তা সারা তুনিয়া ঢুঁড়ে মিলবে না। তেমনি হয়েছে লালকেল্লা জুম্মা মসজিদ এবং অন্যান্য শাহী ইমারতগুলি। দেওয়ানী আম দেওয়ানী খাস দেশ বিদেশের রাজদূত এবং সওদাগরদের বিস্ময়ের আর শেষ থাকে না। তেমনি বাদশাহের ময়ুর সিংহাসন। এই ময়ূর সিংহাসনে যখন বাদশাহ মাথায় কোহিনূর বসানো তাজ পরে বসেন তখন সারা তুনিয়া সেলাম বাজায় মুঘল বাদশাহকে।

ঝরোকার অন্তরালে বসে রৌশনআরা এই ঐশ্বর্য দেখেন আর হিসাব করেন। তিনি শতরঞ্জ খেলার ছকের সামনে বসে ছকের অবস্থার কথা জানান শাহজাদা ঔরংজীবকে, ঔরংজীব আছেন দক্ষিণে। সেখান থেকে ঔরংজীব তাঁকে বলে দেন, এই চালের পর এই চাল হবে। ঔরংজীবের চালের খুঁত ধরেছিলেন রৌশনআরা। দারাসিকোর বড়ছেলে সুলেমানসিকোর সাদি হয়ে গেছে মহারানা জয়সিংহের ভাগ্নীর সঙ্গে। এবং শাহজাদা ঔরংজীবকে বাদশা পাঠিয়েছিলেন চিতোরের মহারানকে ধ্বংস করতে—শাহজাদা দারা-সিকো মহারানার সঙ্গে বাদশাহের মিটমাট করে দিয়েছেন। এই কারণে রৌশনআরা ঔরংজীবকে অনুরোধ করে চিঠি লিখেছিলেন। লিখেছিলেন—চালে তোমার ভুল হচ্ছে ভাইজীউ। ঔরংজীব হুঁসিয়ার শতরঞ্জ খেলোয়াড়। তিনি বিস্তারিত বুঝিয়ে বেগমসাহেবাকে জানিয়েছেন চালে তাঁর ভুল হয় নি। বেগমসাহেবা

নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। এবং তিনি যা লিখেছেন তা সমঝে দেখতে অনুরোধ করেছেন।

সমঝে দেখেছেন রৌশনআরা। এবং ভাই ঔরংজীবের তারিফ করেছেন। আজ শতরঞ্জের ছকের উপর গুটির সাজান দেখে বেশ বুঝছেন, ঔরংজীব এখন আত্মরক্ষা করে চলেছেন বটে কিন্তু তাতেই তিনি দিন দিন শক্তিমান হয়ে উঠছেন।

দারাশিকোর পিছনে বাদশাহ নিজে থেকেও তাঁর শক্তিকে যেন বাড়াতে পারছেন না। ঔরংজীবকে পরাজয়ের দায়ে দায়ী করে কান্দাহার থেকে সরিয়ে এনে বাদশাহ দক্ষিণে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর জায়গায় পাঠিয়েছিলেন দারাসিকোকে। সঙ্গে দিয়েছিলেন বাদশাহের সর্বোৎকৃষ্ট ফৌজ কামান এবং সব থেকে বিচক্ষণ সেনাপতিদের। তার সঙ্গে দারাসিকো দৈবশক্তির প্রসাদ নিয়েছিলেন। অনেক তুকতাক করেছিলেন, কিন্তু তিনিও শেষ পর্যন্ত ইরানীদের কাছে হেরে ফিরলেন। বাদশাহ তাঁর পরাজয়কে পরাজয় বলেও বললেন না। কৌশলে তাঁর পরাজয়ের লজ্জাকে মুছে দিলেন। নতুন খেতাব দিলেন নতুন মনসব দিলেন। তাঁকে অভ্যর্থনার জন্য সমারোহ করলেন।

এতেও দারাসিকোর জিত হয় নি—ভবিষ্যতের জন্যও কোন লাভ হয় নি। সে কথাও রৌশনআরা মানেন এবং জানেন। তিনি দরাকার আড়ালে বসে সেদিন অত্যন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে প্রতিটি আমীর মনসবদারের মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছিলেন। এবং তাদের ঠোঁটের রেখার লেখায় কি কথা ফুটে উঠেছিল তা মনের খাতায় লিখে নিয়েছিলেন। এবং তা ভাই ঔরংজীবকে জানিয়েছিলেন।

"মহারানা জয়সিংহের ঠোঁটের দুই কোণেই এমন বাঁকা বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠেছিল যে মনে হচ্ছিল মহারানা জয়সিংহ হয়তো নিজেকে সামলাতে পারবেন না। হা হা করে হেসে উঠবেন। সে হাসিতে

দরবার ঘর চমকে উঠবে। এবং বাদশাহ নিজে হাতে তুলে যে খেলাত শাহবুলন্দ ইকবালকে দিতে যাচ্ছিলেন তা তাঁর হাত থেকে খসে পড়ে যাবে। এতে কি ফল হত তা বলতে পারি না। কিন্তু একটি বিশ্রী কিছু ঘটত তাতে সন্দেহ নেই।

"আমীর রুস্তম খাঁ, মহবৎ খাঁ, কুলজী খাঁ, ইখলাস খাঁ এঁদের মুখে হাসি দেখেন নি রৌশনআরা। কিন্তু মুখ দেখে মনে হয়েছিল দিল্লীর আকাশে সন্ধ্যার দিকে গরমীর সময় আঁধি উঠলে যেমন চেহারা হয় ঠিক তেমনি হয়েছে তাঁদের মুখের চেহারা। তাঁরা কেউ খুশী নন এ-কথা বাদশাহ বুঝেও তাকে উপেক্ষা করেছেন এবং দারাসিকোকে সারা হিন্দুস্তানের সামনে একরকম ভাবী বাদশাহ বলে ঘোষণাই করে দিয়েছেন।"

ঔরংজীব উত্তরে লিখেছিলেন—বাদশাহের এমন ঘোষণাকে বলব আমি বেওকুবী ঘোষণা। এ ঘোষণাকে কেউ মেনে নেয় নি। এবং এতেও দারাসিকোর কোন মুনাফা হয় নি। বরং নুকসানই হয়েছে।

এ সব কথার প্রত্যেকটিই ঠিক।

যা যা ঘটল তার একটাও সত্য হল না, ভবিষ্যতেও হবে না। ঔরংজীব যা ব্যাখ্যা করেছে—এই সব ঘটনাকে ঔরংজীব যেমনটি দেখেছে তাই ঠিক। এ শাহজাদী অস্বীকার করতে পারেন না। করেন না। কিন্তু—।

ওই একটা কিন্তু তাঁর মনের মধ্যে মাথা তুলে রয়েছে সর্বক্ষণ।

মাটি জল জঙ্গল অন্ধকার এই ছাড়া আরও একটা বিরাট এলাকা রয়েছে। আসমান। সেই আসমানের দিকে ঔরংজীব তাকায় না। রৌশনআরাও তাকান না। কিন্তু হঠাৎ যেন তাঁর একটা ধাঁধা লেগে গেছে মনের মধ্যে।

দারাসিকো আকাশের দিকে তাকিয়ে মাটির বুকে হাঁটে। আকাশের তারাদের সঙ্গে সে কথা কয়। এর জন্য কোনদিন না

কোনদিন সেই গল্পের জ্যোতির্বিদের মত কোন কুঁইয়ার ভিতর পড়বে এই কথাই ভাবতেন এবং মনে মনে হাসতেন। কিন্তু অকস্মাৎ বেগমসাহেবা মত পালটাতে বাধ্য হয়েছেন।

শাহজাদা দারাসিকো হিন্দুস্তানের ফকীর দরবেশ সাধুসন্তদের নিয়ে কামকারবার করেন; অনেক ভণ্ডামি বুজরুকির মধ্য দিয়ে জাহির করেন যে তিনি বাদশাহ আকবর শাহের মত নতুন ধর্ম প্রচার করবেন। সেইটেই খাঁটি ইসলাম। সে ইসলামের সঙ্গে কোন ধর্মের বিরোধ নেই। এই নিয়ে এক নাঙ্গা ফকীর সারমাদের সঙ্গে তাঁর এখন দারুণ মাখামাখি। গুজব শোনা যাচ্ছে যে এই নাঙ্গা ফকীর সারমাদ শাহজাদা দারাসিকোর জন্যেই দুনিয়ায় এসেছেন, পয়দা হয়েছেন খুদাতয়লার হুকুমতে। শাহজাদার নতুন ইসলাম প্রচারে তিনিই হবেন তাঁর প্রধান সহায়।

শাহজাদা দারাসিকো ফকীর সারমাদকে গভীর শ্রদ্ধা করেন—এবং ফকীর সারমাদ শাহজাদাকে পিয়ার করেন আবার শ্রদ্ধাও করেন। শাহানশাহের অনুমতি নিয়ে এই নাঙ্গা ফকীরের সঙ্গে শাহজাদার মুলাকাৎ হয়, মজলিস বসে। এবং ধর্ম নিয়ে আলোচনা হয়। সে সব নাকি আশ্চর্য তত্ত্বকথা।

এই তত্ত্বকথা শোনবার জন্য নাকি বেহেস্ত থেকে দেবদূতরা এসে অদৃশ্যভাবে অবস্থান করেন। এবং বড় বড় উলেমা মৌলভী হিন্দু পণ্ডিত যোগী আশ্চর্য হয়ে শোনে। আর শোনে হাজারে হাজারে সাধারণ মানুষ।

হাজার হাজার মানুষ।

আকাশে যেমন রাত্রিকালে দেখা যায় অজস্র অসংখ্য নক্ষত্র ঠিক তেমনি অসংখ্য মানুষ এই দুজন মানুষকে ঘিরে নিঃশব্দে বসে শোনে।

কাবার মসজেদে পবিত্র কালো পাথরখানি আর মন্দিরের মধ্যে বিগ্রহ গড়া হয়েছে যে কালো পাথরে তার মধ্যে কোন ফরক নেই।

যে হিন্দুর ভগবান সেই মুসলমানের খুদা—দুইয়ে কোন বিভেদ নেই—দুই এক।

হিন্দুর দেহের মধ্যে খুন যেমন লাল মুসলমানের খুনও তেমনি লাল—তার থেকে কমও না বেশীও না।

মানুষের মধ্যেই ঈশ্বরের সন্ধান মেলে। মানুষের মধ্যেই মুসলমান আছে।

এই সব আলোচনা হয়, অভয়চান্দ বলে একটা ছেলে—সে বৈরং সেজে গান গায়। অপূর্ব তার কণ্ঠস্বর। সেই গান শুনে মানুষেরা জয়ধ্বনি দেয়, আওয়াজ উঠায়—

শাহবুলন্দ ইকবাল জিন্দাবাদ!

দিল্লীর আকাশে নাকি তারারা ঝিকমিক করে ওঠে। চাঁদ নাকি হাসে। জ্বলজ্বলিয়ে দীপ্যমান হয়ে ওঠে।

সারমাদ আর শাহজাদা দারাসিকোর মধ্যে কথাবার্তা হয়—গোপন কথাবার্তা। তাতে এমন বুঁদ হয়ে ফেরে শাহজাদা দারা যে মনে হয় কড়া সিরাজী খেয়ে বুঝি হুঁশ হারিয়েছে।

প্রথমে বিশ্বাস করেন নি রৌশনআরা।

তারপর অবিশ্বাস করেও নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন নি। তিনি বোরকায় আপাদমস্তক ঢেকে একটা ডুলি করে গোপনে দেখতে গিয়েছিলেন। দেখেও তিনি এসেছেন এবং বিশ্বাস করে এসেছেন যে মাটি জল মাটির বুকের জঙ্গলেই সব শেষ নয়। মাথার উপরে আর একটা বিরাট এলাকা আছে, তার নাম আসমান। মাটির আদি অন্ত আছে—আসমানের আদি অন্ত নাই। দুনিয়ার অন্ধকার আছে মাটিতে—আলো আছে আসমানে। সব আলো আসমানে। সে আলো দুনিয়ার বুকে নামলে অন্ধকার তাকে রুখতে পারে না ঠেকাতে পারে না। সেই আসমানে যে ছায়াপথ দেখা যায় রাত্রে, সেই ছায়াপথের এক প্রান্ত নাকি তারা নামিয়ে এনে দুনিয়ার বুকে ঠেকিয়ে দেবে।

তেতাল্লিশ

শাহজাদা দারাসিকো এবং ফকীর সারমাদকে নিয়ে সারা দিল্লী শহরে আর গুজবের অন্ত নেই।

দিল্লী শহরের উত্তর দিকে—তার মানে পুরানো কালের সেই কাফেরদের আমলের দিল্লী, তুঘলকাবাদ দিল্লী, ফিরোজশাহী শহর, শেরশাহী শহর, সব শহরকে দক্ষিণে রেখে বাদশাহ সাজাহান যে সাজাহানাবাদ তৈয়ার করিয়েছেন, যার চারিদিক বহুৎ মজবুদ্ পাথরের পাঁচিল দিয়ে ঘিরে দিয়েছেন; একদিকে—সেটা পূবদিক, পানিতে কানায় কানায় ভরা বিশাল যমুনা নদী বয়ে গেছে; সেই দিল্লীশহরের ভিতরে এসে এখন মহাসমারোহে বাস করছেন এই নাঙ্গা ফকীর সারমাদ।

সাজাহানাবাদ তৈয়ারী শেষ হয়েছে। লালকিল্লা, জামা মসজেদ, চৌক বাজার, লালকেল্লার প্রধান ফটক লাহোরী ফটক, ফটকটি খাড়া পূর্বমুখী। পূর্বমুখে কেল্লায় ঢুকতে হয়। এই কেল্লার ফটকের সঙ্গে পশ্চিম দিকে সোজা সরল রেখার মত পূব থেকে পশ্চিমে চলে গেছে চৌক সড়ক; সড়কের পাশে পাশে চলে গেছে যমুনার নওহর। দুই পাশে বাজার। হাজারও রকমের দোকান—লাখো কড়োর রূপেয়ার মাল খরিদ বিক্রী চলছে হররোজ।

তুনিয়ায় এমন মুল্ক বোধ হয় নেই, যে মুল্কের উৎপন্ন মাল এখানে মেলে না, এমন মুল্ক নেই যে মুল্কের মানুষ এখানে এই সোনার হিন্দুস্তানের মালের জন্য আসে নি। কালো কাফরী হাবসী, একদম সাদা হারমাদ—আংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজ, রুশ, আরমানী, জর্জিয়ান, ইরাকী, ইরানী, বলখী, বাদাকশানী, আফগানিস্তানী, মানুষ এখানে দলে দলে এসেছে রোটির জন্যে।

শহরের আর এক রাস্তা মথুরা সড়ক—সে সড়ক চলে গেছে উত্তর থেকে দক্ষিণে। চৌক সড়ককে ঠিক লালকেল্লার সামনে কেটে,

দিল্লী ফটকের মধ্য দিয়ে শহরের বাইরে বেরিয়ে ফিরোজশাহ কোটলাকে, শেরশাহী কেল্লাকে পূবে রেখে পুরানো শহরের মাঝবরাবর বাদশা হুমায়ুনের সমাধি এবং নিজামউদ্দিন আউলিয় সাহেবের দরগার পাশ দিয়ে চলে গেছে মথুরা হয়ে আগ্রা। এই সড়কের পাশেই তুঘলকাবাদের ভাঙা কেল্লার এবং শহরের এক জায়গায় আগে ফকীর সারমাদের আস্তানা ছিল। এখন ফকীরের নাম বেড়েছে, ইজ্জত বেড়েছে, খাতির বেড়েছে; বেড়েছে শাহজাদা দারাসিকোর জন্য। তিনিই এই ফকীরের খাতির বাড়িয়েছেন শাহজাদা বলেন—এই পীরসাহেব সাক্ষাৎ ঈশ্বরের মহিমা। লজ্জা ঘৃণা ভয় হিংসা বিদ্বেষ লোভ সমস্ত কিছু থেকে মুক্ত মানুষ।

পাথর আর মাটির মধ্যে থেকে হঠাৎ মেলে যেমন একটি হীরা কি নীলা কি জহরত, মানুষের মধ্যে এরা ঠিক তেমনি মানুষ। আবার হীরা জহরতের মধ্যে কচিৎ মেলে যেমন কোহিনূরের মত হীরা, যা শাহানশাহ বাদশাহ এখন তাঁর তাজের মাঝখানে পরছেন, যার দিকে তাকালে চোখ ধেঁধে যায়, সারমাদ পীরসাহেব ঠিক তেমনি প্রদীপ্ত মানুষ। যে জহরত চেনে সে তার কিম্মৎ বোঝে, সে তার জলুস চেনে—যে চেনে না তার কাছে তার দাম কাচের থেকে বেশী নয়, বুঝতে পারবে না ফরক কোথায়। সমস্ত দুনিয়াদারির খবর পীরসাহেবের কাছে দিনের আলোর মতই স্পষ্ট।

ফকীর সারমাদ বলেন—যে শাহজাদা বাদশাহ হলে বেহেস্তে খুদা খুশী হন, ধরতি সুখে থরথর করে কেঁপে ওঠে আদরিণী দুলারীর মত, মানুষেরা ধন্য হয়ে যায়, দিনদুনিয়ার মালিক আপন ইচ্ছায় যাঁকে পাঠান শাহজাদা মহম্মদ দারাসিকো সেই শাহজাদা।

নাঙ্গা সারমাদ ফকীর এখন তাঁর মজলিস বসান সাজাহানাবাদের ভিতরে। বাদশাহ সাজাহান তাঁর কথা জানেন। তবু এই নাঙ্গা অপরাধের তিনি বিচার করেন না।

সাজাহানাবাদ তৈয়ারী হয়ে যাওয়ার পর থেকেই আগ্রা থেকে বাদশাহী দপ্তরখানা একের পর এক এসে এখানে পৌঁছে যাচ্ছে। সাজাহানাবাদই হবে এখন হিন্দুস্তানে মুঘল বাদশাহীর রাজধানী। এখানেও শাহজাদা দারার নতুন হাবেলী তৈরী হয়েছে—তার নামও হয়েছে মঞ্জিল-ই-নিগমবোধ। এই মঞ্জিলে মাথা নেড়া কাফের ব্রাহ্মণ এবং জটাধারী সন্ন্যাসী, সুফী ফকীর দরবেশ, ইহুদী রাব্বাই, ফিরিঙ্গী পাদরীরা সে এক হরদম হুল্লাহুল্লি লাগিয়ে রেখেছে।

কেন?

—নতুন দুনিয়ার ছক তৈয়ারী হচ্ছে। তৈয়ার করাচ্ছেন শাহজাদা মহম্মদ দারাসিকো।

ওই আগামী নতুন দুনিয়ায় নিত্য জিন্দাবাদ ওঠে ওই বিধর্মী নাস্তিক ইহুদী ফকীরটার মজলিসে।

তার ধ্বনি জুম্মা মসজিদের গায়ে গিয়ে লাগে, এদিকে এসে লাগে লালকেল্লার গায়ে। লাহোরী ফটক দিয়ে সোজা পৌঁছোয় কেল্লার ভিতরে। চাঁদনী চৌক সড়ক আর মথুরা সড়ক যেখানে মিলেছে সেখানে পূবমুখে দাঁড়ালে লাহোরী ফটকের ভিতর দিয়ে কেল্লার ভিতরের নহবতখানার নিচে দিয়ে মীনাবাজারের মধ্যে দিয়ে নজরে পড়বে শাহানশাহ বাদশাহের আমদরবারে সারি সারি থাম আর থামের মাথায় মাথায় খিলান দিয়ে গড়া দেওয়ানী আম। দেওয়ানী আমের একেবারে পূর্বদিকে এবং ঠিক মধ্যস্থলে ফিরিঙ্গীদের দেশের মূল্যবান মার্বেল পাথর বসানো উঁচু বেদীর উপর খুদ বাদশাহের মসনদ দেখা যাবে। ঘোড়ার উপর হোক, উটের উপর হোক, পাল্কিতে হোক, তাঞ্জামে হোক, যে যাতে সওয়ার হয়েই চলুক দরবারের সময় ওইখানে এসেই তাকে নামতে হয়, শাহানশাহকে কুর্নিশ করে তবে যেতে পায়।

যা নাই দিল্লী সাজাহানাবাদে তা নাই কাবুল সমরখন্দ বোখারা বল্‌খ বাদাকশান ইরান তুরান বাগদাদ বসোরায়। ফিরিঙ্গীস্তানের

সাদা মানুষগুলো এখানে এসে পড়ে আছে। তারা বলে—হিন্দুস্তানের ধুলোয় ছড়ানো আছে সোনার গুঁড়ো—নদীর বালি চালুনি দিয়ে ছেঁকে সোনা পায় লোকে, পাহাড়ে অঞ্চলে যেখানে পাথর ছড়ানো আছে তার মধ্যে আছে জহরত হীরা পান্না নীলা পোখরাজ, হিন্দুস্তানের জমিনে লুটিয়ে পড়ে আছে তামাম দুনিয়ার পেট ভরানোর মত ফসল। এই হিন্দুস্তানের বাদশাকে এখানকার লোকে বলে দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা!

বাদশা সাজাহান তৈরী করেছেন সেই হিন্দুস্তানের উপযুক্ত রাজধানী এই নয়া দিল্লী সাজাহানাবাদ। নিজে বয়েৎ তৈরি করে দেওয়ানী খাসের মাথায় কারুকার্যের সঙ্গে মিলিয়ে লিখে দিয়েছেন—

"দুনিয়ার মধ্যে যদি স্বর্গ থাকে তবে সে এইখানে এইখানে এইখানে।" "হামেনস্ত হামেনস্ত হামেনস্ত।"

এই নতুন দিল্লীতে বাদশাহ তাঁর রাজধানী নতুন করে গড়লেন। বাদশাহ এখন এইখানেই বেশীর ভাগ থাকছেন। তাঁর সঙ্গে হারেমও এসে গেছে। বাদশাহজাদীরা এসেছেন। শাহজাদাদের মধ্যে এক শাহজাদা দারাসিকো ছাড়া বাকী সকলেই বাইরে। বাদশাহের প্রতিনিধি হয়ে এক একটা মুল্কের সুবাদারী নিয়ে বসে আছেন। সুবা বাংলায় রাজমহলে আছেন শাহজাদা সুজা; তামাম দক্ষিণের সুবাদার হয়ে বুরহানপুরে রয়েছেন শাহজাদা ঔরংজীব; গুজরাটে সুবাদার হয়ে রয়েছেন শাহজাদা মুরাদবক্স। মধ্যে মধ্যে তাজমহলের জন্য মন উতলা হলে বাদশাহ যান আগ্রায়।

দিল্লীর সারা আমলাশাহীর মধ্যে মোটামুটি চারটে দল—বাদশাহী রঙমহলেও চারটে দল থাকা উচিত ছিল। কিন্তু তা নেই। তার বদলে দল হয়েছে দুটো। এক দল জ্যেষ্ঠ শাহজাদা দারাসিকোর দল—অন্য দল বাকী তিন ভাইয়ের দল। কিন্তু তিন ভাইয়ের মধ্যে শাহজাদা ঔরংজীবই প্রধান। কথাটা দিল্লীর তামাম লোক জানে। সারা হিন্দুস্তানই প্রায় জানে। বাদশাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র শাহজাদা

দারাসিকোর পিছনে আছেন খুদ বাদশাহ এ কথাও সকলে জানে। তার সঙ্গে আছেন হজরতবেগম শাহজাদী দিদি বেগম জাহানআরাজী।

আর বাকী তিন দলের প্রধান দল শাহজাদা ঔরংজীবের। শাহজাদা সুজা শাহজাদা মুরাদের দল নিতান্তই নগণ্য নিতান্ত ছোট এবং মোটামুটি তারা ঔরংজীবের দলের সঙ্গেই মিলে মিশে কাজ করে যায়। অবশ্য অতি গোপনে—ভিতরে ভিতরে তাদের স্বতন্ত্র সত্তা একটা আছে, তবে তা নিতান্তই দুর্বল এবং ক্ষীণ।

আগ্রা থেকে রাজধানী দিল্লী আসবার পর থেকেই এ তৎপরতা যেন বেড়ে উঠেছে। বিশেষ করে দুটি ঘটনা সমস্ত আমীরদের ভিতরে একটা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে চলেছে। একটি—শাহজাদা সুলেমানসিকোর সঙ্গে জয়পুরের মহারানা মির্জারাজা জয়সিংহের ভাগ্নী, রানা রাও অমরসিং রাঠোরের বেটীর বিবাহ; দ্বিতীয়—কান্দাহার দুর্গ এবং এলাকা, যা চিরদিন হিন্দুস্তানের এলাকাভুক্ত, সেই দুর্গ এবং এলাকা ইরানের শাহের হাত থেকে ছিনিয়ে আনতে গিয়ে হেরে ফিরে এসে বাদশাহের কাছে শাহজাদা দারাসিকোর বিজয়ীর সম্মান লাভ।

তা ছাড়াও আছে অন্য ঘটনা। অনেক ঘটনা সে সব। সামান্য তুচ্ছ কিন্তু তার অর্থ খুব স্পষ্ট। সে সব থাক।

* * *

কান্দাহার জয় করতে গিয়ে শাহজাদা ঔরংজীব কৃতকার্য হন নি। বাদশাহ তাঁকে রূঢ় আদেশে ফিরিয়ে এনে দূর দক্ষিণের সুবাদার করে পাঠিয়ে দিয়েছেন। ঔরংজীব কান্দাহার জয় করতে পারেন নি কিন্তু বল্‌খ্‌ বাদাক্‌শান জয় করে এসেছিলেন। দুপহরের সময় নামাজের বখ্‌ত্‌ হওয়ায় সেই যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যেই নামাজ পড়ে খোদার অনুগ্রহেই যুদ্ধ জয় করেছিলেন; খোদার প্রতি শাহজাদার অনুরক্তি ভক্তি দেখে বল্‌খ্‌ বাদাক্‌শানীরা সসম্ভ্রমে এবং সভয়ে তাঁর বশ্যতা

স্বীকার করেছিল। তবু কান্দাহারে অকৃতকার্যতার জন্য তাঁকে বাদশাহ তিরস্কার করে সরিয়ে এনেছেন। সেইখানে শাহজাদা দারাসিকো কান্দাহারে গিয়ে হার মেনে ফিরে এসে বিজয়ীর সম্মান পেলেন বাদশাহের কাছে।

খুদ বাদশাহ লাহোর থেকে হুকুম পাঠিয়ে ফিরিয়ে আনলেন শাহজাদাকে। লিখলেন—"কাজ নাই কান্দাহারে। তুমি ফিরে এসো। তুমি যখন পার নি তখন খুদাতায়লার ইচ্ছা নয়।"

এখানেই শেষ নয়। লাহোর থেকে পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে দিল্লী এসে নিজে দিল্লী ঢুকলেন কিন্তু পুত্রকে রাখলেন দিল্লী থেকে কিছুটা দূরে। এবং নিজে দিল্লীকে তাঁর রুচিমত সাজিয়ে ফটক বানিয়ে বিরাট দরবার করে পুত্রকে সম্মান দিলেন।

কান্দাহারের যুদ্ধে শাহজাদার সঙ্গে মির্জারাজার মনান্তর হয়েছিল। মনান্তর কেন ঝগড়া হয়েছিল। খানখানান মহাবৎ খানের সঙ্গেও শাহজাদার মনান্তর হয়েছিল। তাঁরা কোন খেলাৎ পেলেন না। খেলাৎ পেলেন দারাসিকোর অনুগ্রহভাজনেরা। মনান্তর এবং বিরোধ সত্ত্বেও মির্জারাজার ভাগ্নীর সঙ্গে সুলেমানসিকোর সাদি হয়ে গেল।

* * *

এইখানেই শাহজাদী রৌশনআরার দুশ্চিন্তা।

শাহজাদা ঔরংজীব পত্রে জানিয়েছে যেসব বিবরণ সেসব সত্য। শাহজাদা ঔরংজীবের কৃতিত্ব অসাধারণ। তার বুদ্ধি ক্ষুরধার তা রৌশনআরা জানেন। তার বিশ্লেষণী শক্তি দেখে বিস্ময়ে প্রায় স্তম্ভিতও তিনি হয়েছেন। কিন্তু তবু তাঁর দুশ্চিন্তা শাহজাদা দারাসিকোর সৌভাগ্যের শক্তি দেখে।

ভাগ্যের শক্তি এত বড় হয়?

সাম্রাজ্ঞী নূরজাঁহা বেগমের কথা মনে পড়ে। বেগম নূরজাঁহা তাঁর আম্মাজানের পিসীমা। তাঁর বাবা মির্জা ঘিয়াস আসছিলেন হিন্দুস্তানে। সঙ্গে স্ত্রী ছিলেন, তিনি তখন পূর্ণগর্ভা। কান্দাহারের

কাছে মরুভূমিতে তিনি প্রসব করেছিলেন এক কন্যা। তখন তাঁরা ভাগ্যহত। অর্থ নেই খাদ্য নেই লোকবল নেই যানবাহনের সংস্থান নেই; কি করবেন সেই অবস্থায়? ফেলে এসেছিলেন নবজাত কন্যাকে। পিছনে ফিরে তাকান নি। কিন্তু ভাগ্য সেই কন্যার। তারপরেই আসছিলেন এক সম্পন্ন যাত্রীদল। তাঁরা এই অপরূপ লাবণ্যময়ী নবজাতাকে তুলে নিয়ে এসেছিলেন হিন্দুস্তানে। যারা বিচক্ষণ যারা বিজ্ঞ যারা উলেমা তারা বলে ওই কন্যার ভাগ্য ওই যাত্রীদলকে বাধ্য করেছিল আনতে। কেউ কেউ বলে একটা শকুন এসেছিল ওই পরিত্যক্ত শিশুকে ছিঁড়ে খেতে কিন্তু তার অপরূপ লাবণ্য দেখে সেই শকুন তাকে খেতে পারে নি। তার মুখে রোদ লাগছিল। মরুভূমির সূর্যকিরণ। সেই কিরণকে সে রোধ করে ডানা মেলে তাকে রক্ষা করেছিল। ভাগ্য। মেহেরউন্নিসা যে সুলতানা নূরজাহান হবেন!

এমনই কথা আছে বাহমনী রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হুসেন গঙ্গুর সম্পর্কে। হাটে বিক্রী হওয়া গোলাম। এক কাফের ব্রাহ্মণের বাড়িতে রাখাল ছিলেন। একদিন দুপুরে মাঠে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। তাঁরও মুখে পড়েছিল রোদ। সেই রোদ থেকে তাঁকে বাঁচাবার জন্যে একটা বিষধর সাপ ফণা মেলে শিয়রে ছত্রধরের মত দাঁড়িয়েছিল। ভাগ্যের সেই কথা পড়তে পেরেছিলেন হুসেনের মালিক ব্রাহ্মণ। তিনি তাঁকে মুক্তি দিয়েছিলন সেই দিনই। বলেছিলেন—তুমি রাজা হবে। হুসেন অকৃতজ্ঞ নন—তাঁর বংশের নাম রাজ্যের নাম রেখেছিলেন 'বাহমনী রাজ্য'।

দারাসিকোর ভাগ্য সে ভাগ্য নয়।

এক আশ্চর্য ভাগ্য—এক বিস্ময়কর ভাগ্য!

বাদশাহের পুত্রের বাদশাহ হওয়া বিচিত্র কথা নয়। কিন্তু তা নয়। এক সঙ্গে বাদশাহ এবং পয়গম্বর।

তার আয়োজন যেন আস্তে আস্তে সম্পূর্ণ হয়ে উঠছে।

কুড়ি বছর বয়স তখন শাহজাদার। শাহানশাহ সেবার শীতের সময় লাহোরে ছিলেন। শাহানশাহ নিজে গিয়েছিলেন সিদ্ধফকীর পীরতুল্য হজরত মিয়া মীর সাহেবের কাছে। এই মহাত্মা ফকীরের ছিল আশ্চর্য মহিমা।

রৌশনআরা তখন বালিকা নন। তখন তিনি যৌবনের ঘরে পা বাড়িয়েছেন—তখন তাঁর বয়স সতেরো। কাশ্মীর থেকে ফেরার পথে লাহোর কেল্লায় বাদশাহ বিশ্রাম করছিলেন। শাহজাদা দারাসিকোর তখন প্রথম সন্তান মারা গেছে। বাচ্চা নেহাত কচি একটি মেয়ে; হয়ে কয়েকদিন পরেই মারা গিয়েছিল। দারাসিকো সেই শোকেই ভেঙে পড়েছিলেন। বাদশাহ লাহোরের কেল্লায় আস্তানা নিয়েছিলেন শাহজাদার এই মুহ্যমান অবস্থার জন্যই। এবং তাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন হজরত শেখ মিয়া মীরের কাছে।

হজরত মিয়া মীর তখন বুড়ো হয়েছেন, হজরতের মুরীদ তাঁর প্রিয় শিষ্য মুল্লাশাহ বাদাকৃশানী তাঁদের অভ্যর্থনার ত্রুটি করেন নি তবে তিনি বা তাঁর গুরু পীরসাহেব মিয়া মীর বাদশাহকে দুনিয়ার মালিক বলে স্বীকার করেন নি। তাজ্জব কি বাত্! বাদশাহের লোকজন তাঞ্জাম সওয়ার পায়দল সিপাহীরা যখন লোকজনকে তফাত করছিল তখন ওই পীরের প্রধান শিষ্য বেরিয়ে এসে বলেছিলেন—"ন চিল্লানা বাবা ন চিল্লানা। পীরসাহাব এখন খুদার কাছে আত্ম-নিবেদন করছেন—এখন গোলমাল করলে খারাব হবে। বাবাসাহাব তো গোস্সা কখনও করেন না তবে তাঁর বহুৎ দুখ্ হবে।"

শুধু তাই নয় দেখা করবার জন্য বেশ একটুক্ষণ বাদশাহকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল। বাদশাহ শাহজাদাকে ভিতরে নিয়ে গিয়ে হজরতের সামনে কিছু দূরে উপযুক্ত মর্যাদার সঙ্গে বসতে দিয়েছিলেন মুল্লাশাহ কিন্তু হজরতসাহেব শেখজী মিয়া মীর চোখ খোলেন নি—তাঁর ধ্যানই ভাঙে নি।

ধ্যান যখন ভেঙেছিল তখন বাদশাহ এবং শাহজাদা তাঁকে

অভিবাদন করেছিলেন—তিনি বলেছিলেন—আমাকে নয় দিনদুনিয়ার মালেক—লা ইলাহি ইল্লাল্লা খুদা রহিমকে জানাও বাবা। আমি কে?

মুল্লাশাহ বলেছিলেন—হজরত, আপনার কাছে এসেছেন হিন্দুস্থানের বাদশাহ শাহানশাহ আর তাঁর বড়ছেলে শাহজাদা মহম্মদ দারাসিকো—

তিনি বলেছিলেন—হাঁ হাঁ। জানি। লেকেন বাদশাহ বলে তো জানি না, জানি উনি আর আমি এক এবং অদ্বিতীয় বাদশাহের বাদশাহীতে বাস করি বলে। সে অদ্বিতীয় বাদশাহ ওঁকে অশেষ অনুগ্রহ করেছেন। আর আমাকে দিয়েছেন ফকিরী। উনি তো হিন্দুস্থানে তাঁর সব থেকে বড় ইমামসাব! বাদশাহী তো সোজা কথা নয় মুল্লাশাহ—যিনি বাদশাহ হন তাঁকে তাঁর রাজ্যের তামাম লোকের জন্যে খুদার কাছে আর্জি জানাতে হয়। বলতে হয় মাফ করো আল্লা—এদের গুণাহ তুমি মাফ করো। রমজানে বাদশাহ নিজের জন্যে উপোস করেন না। করেন সব প্রজার হয়ে। পুছো মুল্লাশাহ—বাদশাহকে পুছো। ঠিক কি নেহি?

বাদশাহ মুগ্ধ হয়ে শুনছিলেন।

হয়তো বা মনে মনে অনুভব করছিলেন তিনি এই সর্বত্যাগী ফকীরের থেকে বাদশাহ হয়েও অনেক ছোট।

হজরতসাহেব হঠাৎ যেন চমকে উঠে বলেছিলেন—আরে—তুমি কে—তুমি? তুম কৌন হো ভাইয়া? আ? তুমি তো বড় মিষ্টি হে! কিন্তু তোমার এত দুঃখ কিসের? মুখে চোখে এত দুঃখের ছাপ কেন? তুম তো ভাই তাজা গুলাব হ্যায়। হিন্দুস্থানকে গুলেকমল হ্যায়। তাজা। এখনও তোমার ফোটা শেষ হয় নি। এখনও তো সূর্য তোমাকে ঝলসায় নি—ভ্রমর এসে তোমার বুকে তাণ্ডব করে নি—এখনই তোমায় শুকনো লাগে কেন? অ্যাঁ!

কথা শুনতে শুনতে দারাসিকো কেঁদে ফেলেছিলেন। চোখ থেকে

জল গড়িয়ে পড়েছিল গাল বেয়ে। বাদশাহ নিজে রুমাল দিয়ে মুছে দিয়েছিলেন সে চোখের জল। মীর সাহেব বলেছিলেন—বাদশাহ, ওই রুমালখানি আমাকে দাও। ওই যে চোখের জল ওর বহুৎ দাম। ওটা আমি আমার দুখের রক্ত এলে বুকে বুলিয়ে নেব। শাহজাদা ভাই, নিজের দুখে যেমন আজ কাঁদলে তেমনি করে তুমি পরের দুখে কেঁদো।

অবাক হয়ে শাহজাদা তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তিনি বলেছিলেন—খুদা তোমার বুকে একটা চোখের জলের দরিয়া দিয়ে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। হিন্দুস্তানের গঙ্গা যমুনার ধারার মত ধারা বয়ে যাবে। হিন্দুস্তানের হিন্দু মুসলমান সব লোক তাতে আস্নান করবে। বেটী মরে গিয়েছে তোমার, তুমি দুখ পেয়েছ, তুম রোতে হো। আঁ? আরে ভাই তুমি বাদশাহের বেটা—তুমি তো কাঁদতে জানোই না। তোমরা হাসতেই আস দুনিয়ায়। কিন্তু তুমি? তোমার বুকে কাসপিয়ান দরিয়ার মত চোখের পানির দরিয়া—আমুদরিয়া শিরদরিয়াকে তো নিকালাতে হবে।

শাহজাদা শুধু দুঃখ ভুলেই ফিরে আসেন নি। মনে মনে হজরত মিয়া মীর সাহেবের শিষ্য হয়েও ফিরেছিলেন। হজরত সাহেবের শিষ্য মুল্লাশাহ বাদাক্‌শানীর সঙ্গেও তাঁর জন্মেছিল গভীর ভালবাসা।

এর পরই দারাসিকো একদিন রাত্রে দর্শন পেয়েছিলেন হাতিফের—দেবদূতের। দেবদূত এসেছিল সে এক জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রাত্রে। শাহাজাদার প্রায় হাতের নাগালের কাছে দাঁড়িয়ে বলেছিল—"শাহজাদা দারাসিকো, খুদা তোমাকে যা দিয়ে পাঠিয়েছেন এই মাটির দুনিয়ায় তা আজও পর্যন্ত কোন রাজা, কোন বাদশা, কোন সম্রাট, কোন শাহজাদাকে দিয়ে পাঠান নি। তুমি এসেছ খুদার কাম করতে। খুদা দুনিয়া গড়েছেন—মাটি জল আসমান হাওয়া আগুন দিয়ে তৈয়ার করেছেন। তার মধ্যে ঘাস তৈয়ার করেছেন, গাছ তৈয়ার করেছেন, পাহাড় তৈয়ার করেছেন, জানোয়ার তৈয়ার করেছেন, মানুষ তৈয়ার

করেছেন। কিন্তু যা চেয়েছেন তা হয় নি। এই সমস্ত কিছু নিয়ে তোমাকে তৈয়ার করতে হবে সেই ছুনিয়া, যে ছুনিয়া দেখে খুদা খুশ হবেন।"

এরপর লাহোরে পীরসাহেব হজরত মিয়া মীরের আস্তানায় শাহজাদার জন্য দ্বার হয়ে গিয়েছিল অবারিত। শাহজাদা দারাসিকো যখন পীরসাহেব হজরত মিয়া মীরের সঙ্গে কথা বলতেন তখন এক মুল্লাশাহ বাদাকৃশানী ছাড়া আর কেউ সেখানে থাকতে পেতো না। শাহজাদাকে হাত ধরে মিয়া মীর পীর ধাপে ধাপে খুদার দরওয়াজা পর্যন্ত উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন।

পীরসাহেবের আস্তানায় লোকে বলত এবং আজও বলে শাহজাদা মহম্মদ দারাসিকো নয়া ছুনিয়া নয়া জিন্দিগী তৈয়ারের জন্য খুদ খুদাতালার দ্বারা প্রেরিত হয়েছেন—সেই কারণে তিনি একসঙ্গে হবেন বাদশাহ এবং পীর পয়গম্বর। এ কথা নাকি পীরসাহেব মিয়া মীর হজরতের নিজের কথা—কথাটা বলেছিলেন তিনি মুল্লাশাহ বাদাকৃশানীকে। হজরত বাদাকৃশানী একথা জোর গলায় বলে থাকেন।

পীর সাহেব বলে গেছেন, "বেহেস্তের ফটক সব কোইকে লিয়ে খুলি হোনা চাহিয়ে। সকলের জন্য খুলে দাও—সেই হোক তোমার খোদার দরবারে আর্জি। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, তুমি পাঁচ ওয়াক্ত নমাজ পড়বার সময় খোদার কাছে বল—'আল্লা রসুল মেহেরবান, তোমার দরবারের দরওয়াজা খুলে দাও—মুসলমানকে দাও, হিন্দুকে দাও—কেরেস্তানকে দাও, ইহুদীকে দাও; রাজাকে দাও, বাদশাহকে দাও; রাইয়তকে দাও, আমীরকে দাও, গরীবকে দাও; ফকীরকে দাও, সন্ন্যাসীকে দাও; মনসবদারকে দাও, উজীরকে দাও, গোলামকে দাও, ঝাড়ুদারকে দাও।'"

আর শাহজাদা দারাসিকো, তুমি যখন বাদশাহ হবে, সারা হিন্দুস্তানের শাহানশাহ মালেক-ই- মুল্ক হয়ে শাহী তক্তে (সাহজাহান বাদশা তখনও ময়ূরতক্ত তৈয়ার করান নি) যখন বসবে তখন মসজেদ

আর মন্দির আর গির্জা কিংবা পাহাড়ে পাহাড়ীদের গুহায় পূজাস্থানে কি বনের মধ্যে বুনো আদমীদের বিশ্বাসমত গাছের গোড়ায়—সব দরবারে তুমি বাদশাহ হিসাবে তোমার সালামৎ পাঠিয়ো, প্রণাম পাঠিয়ো, প্রার্থনা পাঠিয়ো, পূজা পাঠিয়ো। খুদা ঈশ্বর আছেন সব দরবারে—যে যেমনটি চায় তেমনি হয়ে বসে আছেন। তুমি তাঁর সকল রূপের পূজা পাঠিয়ো, সকলের আশীর্বাদ নিয়ো তোমার প্রজার জন্য। আর তোমার হিন্দুস্তানের সব ধর্মের প্রত্যেক জনকে ... দিয়ো, নাকাড়া বাজিয়ে এই ফরমন তুমি জারি করো শাহজাদা ... বাবা আদমের বালবাচ্চা লেড়কা লেড়কী, তোমরা সবাই সেই এক আদমী—সবাই মানুষ, সকলেরই সেই দুই হাত দুই পা—পায়ে ... পাঁচ পাঁচ আঙুল, সেই এক মাথা, সেই দুই চোখ দুই কান এক নাক এক জিভ, দুই পাটিতে সেই বত্রিশ দাঁত ; সবাই সেই আপন হাতের মাপে সাড়ে তিন হাত—তোমরা সবাই মানুষ, আদমের ছেলে ... আদমী। সবকোইর মাথার উপর এক নীল আসমান, এক আফতাপ, এক সুরয, এক চাঁদ, এক হাওয়া বাতাসে নিশ্বাস নাও, সেই ... পানি পিয়ো, সেই এক ভুখ এক তিয়াস, কোন ফরক নেই। কেউ কালা, কেউ পিলা, কেউ সাদা, কেউ তামাটে—সে ওই কাপড়ের রঙের মত।

তোমার রুটি তুমি ওকে খাওয়াও, ওর রোটি তুমি চেয়ে নিয়ে খাও ; তোমার বেটীর সঙ্গে ওর বেটার সাদি দাও, ওর বেটীর সাথে সাদি হোক তোমার বেটার ; বাস, এক হো যাও। এক দুনিয়া। এক ধরম। এক খুদা। দিনদুনিয়ার মালিক যিনি তাঁর অনেক নাম—ঈশ্বর আল্লা তেরে নাম—গড বলে কেরেস্তানেরা—লাখো নাম তাঁর, কড়োর নাম তাঁর—তবে আল্লা নামই সব থেকে শ্রেষ্ঠ মিষ্ট। তাঁর চোখে তুমিও যেমন আমি মহম্মদ দারাসিকো, আমি শাহানশা হিন্দুস্থান, আমিও তেমনি। কোন ফরক নেই।”

এসব উনিশ বছর আগের কথা।

উনিশ বছরের মধ্যে ঘটল অনেক ঘটনা। জীবনে পালটালো অনেক কিছু। শাহজাদা ঔরংজীব বলখ্ বাদাক্শান কান্দাহার কাবুল মুলতান লাহোর গুজরাট থেকে দক্ষিণে বুরহানপুর পর্যন্ত ঘুরেছে; সে মনে করে নিজে অসাধারণ শক্তিতে শক্তিমান হয়েছে। শাহজাদী রৌশনআরা দিল্লীতে আগ্রায় প্রাণপণ চেষ্টা করে আসছে ঔরংজীবের স্বার্থ রক্ষা করবার জন্য।

ঔরংজীব অনন্যসাধারণ মানুষ; দারাসিকোর ঠিক বিপরীত; সে বাইরে দেখতে শান্ত, ধীর। মৃদুভাষী। সে আশ্চর্য কঠিন, আশ্চর্য কঠোর, অসাধারণ তীক্ষ্ণবুদ্ধি তার, দৃষ্টি তার আশ্চর্য মর্মভেদী, এতটুকু দুর্বলতা নাই, মিথ্যা মমতা নাই,—অপরিসীম ধৈর্য, অনন্যসাধারণ বীরত্ব। ঔরংজীব ঠিক তার পরের ভাই এবং আশ্চর্য তাদের চরিত্রের মিল।

ঔরংজীব দারাসিকোকে সহ্য করতে পারে না; সে পারে না এই ভাবপ্রবণ, এই কাফেরপ্রিয় ভণ্ড বড় ভাইটিকে সহ্য করতে। তার চেয়েও অসহ্য তার কাছে তার দিদিজীউ। হজরত জাহানআরা বেগমসাহেবা। বাদশাহ সাজাহানের বহুৎ পিয়ারের বড়বেটী। সারা শাহী রঙমহলের হজরতবেগম: মালকিন; দণ্ডমুণ্ডের কর্তা; সারা হিন্দুস্তানের ঔরৎদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবতী। শাহানশাহ সাজাহান, রৌশনআরার বা-জান তুমি। তবু তোমাকে ধিক্কার দেবে। আম্মাজান মমতাজমহলের মৃত্যুর পর তোমার আরও দুই বেগম বেঁচে রয়েছে—আকবরাবাদীমহল ফতেপুরীমহল—তাদের তুমি বাঁদী বেগম পরস্তারের মত ফেলে রেখেছ; তাদের দিকে তুমি একবারও ফিরে তাকাও না; আর তোমার বেটী জাহানআরার জন্যে তোমার উদ্বেগের অন্ত নাই—তার জন্যে উৎকণ্ঠার অন্ত নাই। তাকেই দিয়েছ তুমি সমস্ত অধিকার।

এজন্যে তোমার যে কত কুৎসা কত রটনা চারিদিকে তা তুমি

জেনেও না-জানার ভান কর। বিশেষ করে ওই ফিরিঙ্গীরা বলে। শুধু ফিরিঙ্গীরা কেন, এখানকার লোকেও বলে। যাক। যা বলে তা উচ্চারণ করব না। এবং তা সত্যও নয়। তবে দোষ কি মানুষের? তোমার নারীলিপ্সা তো সকলের কাছে সুপরিচিত।

সকালেই জাফর খাঁয়ের হাবেলী থেকে পালকি বের হয়ে এসে ঢোকে লালকিল্লায়। আগ্রাতেও আসত জাফর খাঁয়ের বাড়ি থেকে পালকি। রাস্তার লোকে বলত বাদশার সকালের খাবার চলেছে। দুপুরে আবার এক পালকি আসে—এ পালকি আসে খলিলুল্লা খাঁয়ের হাবেলী থেকে। লোকে বলে বাদশাহের দুপুরের খানা চলল।

রাত্রে অসংখ্য তরুণী বাঁদী আছে। নিত্যনূতন। এমন ক্ষেত্রে বিদেশীরা কিস্যা করে। দোষ কি তাদের?

বাদশাহ আকবর শাহের আমল থেকে বাদশাহের বেটীদের বিয়ে বন্ধ। বিয়ে হয় না। বিয়ে হলে মসনদের দাবিদার বাড়বে। সে কোন্ পাঠান আমলে সুলতান আলতামাসের বেটী রিজিয়া সুলতানা হয়ে মসনদে বসেছিল। আবার জানও দিতে হয়েছিল মহব্বতির জন্যে। সেই জন্যেই বাদশাহ আকবর বাদশাহের বেটীদের বিয়ে বন্ধ করে গেছেন।

ভাই ভাইদের মধ্যেই মসনদের দাবি নিয়ে খুনোখুনি রক্তারক্তির শেষ নেই। এর উপর বোনেদের স্বামী বা ছেলেরা দাবিদারের সংখ্যা বাড়ালে শেষ পর্যন্ত খুনাখারাবির তুফান বয়ে যাবে।

হায়রে হায়! হায়রে হায়! বাদশাহের বেটিরা! তোরা রক্তমাংস দিয়ে গড়া ন'স, তোরা পাথর দিয়ে গড়া। তোদের দেহের কোন কামনা নেই। তোদের দিলের কোন তিয়াস নেই। তবুও সারা আগ্রা আর দিল্লী শহরে তোদের নিয়ে কিস্যার আর শেষ নেই। তাইবা কেন, হিন্দুস্তানের ঘরে ঘরে এক এক শাহজাদীকে নিয়ে হাজারও কিস্যা। বাজারে, চৌকে, দপ্তরখানায়, কাফিখানায়,

তাড়িখানায়, এমন কি কসবীপাড়াতেও চলছে এই নিয়ে গুলতানি।

দোষই বা দিলে চলবে কেন? শাহানশাহের পিয়ায়ের বিদুষী বড়বেটি হজরতবেগম কি বলেছেন জান?

জাহানআরা বেগম রঙমহলে মেয়েদের মজলিসের মধ্যে বলেছেন—"স্বামিবিহীনা নারী আর সূর্যহীন দিন—এই দুই সমান নিরর্থক।"

জাহানআরা নাকি ভালবেসেছেন বুন্দেলা রাজপুত রাজা ছত্রশালকে। লোকটা বিশালদেহ এবং লোকটা গানে বাজনায় বহুৎ এলেমদার। জাহানআরা তাকে আদর করে নাম দিয়েছে 'দুলেরা'।

দারাসিকো জানে। তারই জন্য সে আলাহজরতকে সুকৌশলে বলে কয়ে রাজী করে বল্‌খের সুলতানের পলাতক নজবৎ খাঁয়ের সঙ্গে তার সাদি দেওয়ার। নজবৎ এল এখানেই বাদশাহী দরবারে মনসবদার হয়ে। জবরদস্ত মনসবদার। বহুৎ দেমাক তার।

আজ যদি বাদশাহ মত না দেন তাহলে বাদশাহের পরে দারাসিকো বাদশাহ হলে জাহানআরা বেগমের সাদি জরুর হবে। জাহানআরার দারাসিকোর প্রতি ভালবাসার মানে সকল জমেই জানে। রৌশনআরাও বোঝে। রৌশনআরার আকাঙ্ক্ষা দুর্বার। জাহানআরা বেগমের এই আকাঙ্ক্ষা তুফানের মত কিন্তু রৌশনআরার আকাঙ্ক্ষা আগুন। জাহানআরার আকাঙ্ক্ষা তুফানের মত বলেই রৌশনআরার আকাঙ্ক্ষা আগুনের মত। দারাসিকো নতুন ধর্মের পয়গম্বর হতে চায় বলেই ঔরংজীব যেমন গোঁড়া মুসলমান, কঠোর সুন্নী, রৌশনআরাও ঠিক তেমনি, জাহানআরা প্রেমপিপাসিনী বলেই সে কঠোর তপস্বিনী বৈরাগিণী হয়েছে। কোন লালসাকে সে মনে এতটুকু প্রশ্রয় দেয় না।

সদাসর্বদা জাগ্রত দৃষ্টি এবং নিষ্ঠুর জ্বলন্ত হৃদয় নিয়ে বসে আছে

আর খবর সংগ্রহ করছে কোথায় কি করছে জাহানআরা আর দারাসিকো।

তার প্রধানা বাঁদী 'নাজীর' খবর এনেছিল দিদিজী জাহানআরা বেগম নিজামুদ্দিন আউলিয়ার দরগার দিকে যাবার পথে এক হিন্দু ফকীরের দেখা পেয়েছিলেন। একটা গাছতলায় বসেছিলেন নাকি নিস্পন্দের মত আর দিব্য জ্যোতি বের হচ্ছিল তাঁর দেহ থেকে।

কত মানুষ তাঁর সামনে হাত জোড় করে দাঁড়িয়েছিল, কত পয়সা, কত রূপেয়া তঙ্কা মোহর আশরফি হীরা জহরত পর্যন্ত তাঁর সামনে তারা ফেলে দিচ্ছিল; কিন্তু তিনি চোখ খুলে তাকিয়েও দেখেন নি। বাদশাজাদী দিদিজীউ জাহানআরা বেগম মুগ্ধ হয়ে তাঁর সামনে গিয়ে তাঁকে অভিবাদন করে তাঁর মৃগচর্মাসনের সামনে এক আঁজলা আশরফি ঢেলে দিয়েছিলেন। বেশ একটু শব্দও নাকি উঠেছিল। যে এ খবর রৌশনআরা বেগমসাহেবাকে বলেছে সে বলেছিল আওয়াজ হয়তো হজরতবেগম ইচ্ছে করেই তুলেছিলেন।

হিন্দু যোগী কিন্তু চোখ না খুলেই তাঁকে বলেছেন—"তোমার ওই স্বর্ণখণ্ডগুলি তুমি নিয়ে যাও মা। দরিদ্রদের বিতরণ করো। তোমার আত্মা তোমার কামনার চেয়ে অনেক বেশী মূল্যবান। দেহের কামনা পূর্ণ করতে তোমার আত্মা দেহ ধারণ করে নি।"

এর নাকি অনেক ব্যাখ্যা হয়েছে।

শাহজাদা দারাসিকোর সব ধর্ম মিলিয়ে নতুন এক ধর্ম পরিকল্পনার সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে এই গল্পকে।

লোকে বলছে এর অর্থ হল শাহজাদা দারাসিকো হবেন এই ধর্মের প্রধান। আর জাহানআরা হবেন প্রধান সর্বময়ী দেবী। এই চিন্তা যখন রৌশনআরাকে পেয়ে বসে তখন দিনের পর দিন সে যেন বর্ষার মেঘের মত পুঞ্জ পুঞ্জ হয়ে মনের আসমানের দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্যন্ত ঢেকে দিয়ে ঘন থেকে ঘনতর হয়ে ওঠে; পুরু হয়ে ওঠে মেঘ, ম্লানতর হয়ে আসে দুনিয়ার বুকের আলো, মধ্যে

ধোঁয়া সারা অন্তরকে ঝাপসা করে বেদনাবিধুর হতাশার কান্নার বর্ষণ নামে।

ঔরংজীব তাঁকে বার বার ভরসা দিয়ে চিঠি লিখেছেন—এর জন্য দিদিসাহেবা যেন চিন্তিত হবেন না। আমি অধার্মিক নই; আমি ধার্মিক মুসলমান; খাঁটি মুসলমান, সুন্নী মুসলমান। ইরানের নই আমি। আমি অবতারে বিশ্বাস করি না। কাফেরকে ঘৃণি—আমি খুদাতায়লার উদার মতের বিরুদ্ধবাদী—তারা পাপী—তারা শয়তানের মোহে মায়ায় আচ্ছন্ন। একমাত্র তাদের উচ্ছেদেই আল্লাহতায়লার অভিপ্রায় পূর্ণ হতে পারে। সারা দুনিয়া মানুষের জিন্দিগী পয়গম্বর রসুলের কোরানের কানুন কায়েমেই তা হতে পারে। আমি জানি সুফী ফকীর মিয়া মীর ঝুট—মুল্লাশাহ ঝুট—শাহফানি ঝুটের উপর ঝুট—সে একজন তহবিল তছরুপের আসামী ফকীর সেজে কাশ্মীরে বসেছে,—আর তার সেই নির্লজ্জ প্রেমানুরাগিণী নাচওয়ালীটা আমাদের জানা—সে সেই শিরিন বাঁদী। কোন সংশয় আপনি রাখবেন না। শুধু শক্ত হয়ে খাড়া থাকুন।

রৌশনআরাও শক্ত, রৌশনআরাও কঠিন, তিনি নারী হলেও তাঁর নারীহৃদয় সেই উপাদানে গড়া নয় যে উপাদানে গড়া হয়েছে হজরতবেগমের হৃদয়। পিতার আদরিণী এই কন্যা ভাবপ্রবণ বড়ভাই, কাফেরদের অবতার দারাসিকোর পরম শ্রদ্ধার দিদি এই জাহানআরা বেগম প্রেমপিপাসায় ব্যাকুল হয়ে রঙমহলের প্রকাশ্য মজলিসে যখন বলেন, স্বামীহীনা নারী আর সুখহীন দিন দুই-ই সমান বিষণ্ণ সমান নিরর্থক, তখন সারা দিল্লী শহর মুচকি হেসে শিস দিয়ে ওঠে। রৌশনআরা তা নন। তিনি কঠিন। দিল্লীর লোক নিন্দুক—তারা বলে রৌশনআরা দেখতে কঠিন, পুরুষালী মেয়ে—সহজে কেউ তাঁর প্রেমে পড়বে না, তাই জাহানআরার উপর তার রাগের আর শেষ নেই। এবং এই জাহানআরা বেগমসাহেবাকে বেশী শ্রদ্ধা পেয়ার

করেন বলে খুদ বাদশাহ আলাহজরত এবং শাহবুলন্দ ইকবাল দাদাজীউয়ের প্রতিও তার আক্রোশের শেষ নেই। হয়তো কিছুটা সত্য। হ্যাঁ, কিছুটা সত্য তা সে অনুভব করে। কিন্তু সবটা তা নয়।

সাক্ষী খুদা। সাক্ষী পয়গম্বর রসুল।

ইসলামের গরীব মুরীদা এই রৌশনআরা। সে অধর্মকে জয়লাভ করতে দিতে পারবে না।

ঔরংজীব দূরে থাকে। সে সব সময় গুরুত্ব বুঝতে পারে না। দিল্লীর পুরানো কিল্লার একটা ঘরে রৌশনআরা একবার একটা মস্ত গোখুরা সাপের খোলস দেখেছিল। তার প্রধানা বাঁদী নাজীর একবার একটা গোপন খবর বিক্রি করে এসেছিল জাহানআরা দিদিজীউকে। রৌশনআরা বাঁদীটাকে বলেছিল—"দেখ পুরানো একখানা নিশানে দেখছি ওই কেল্লার ওই কামরায় খুন হয়েছিলেন হুমায়ুন বাদশার এক পিয়ারের বাঁদী—তার হাতে ছিল লাখো লাখো রুপেয়ার দামের একটা পাথরবসানো আংটি। অনেক অলংকার ছিল। বাদশাহ তাকে দেওয়াল গেঁথে মেরে ফেলেছিলেন। পরে দেওয়াল ভেঙে গহনাগুলো আর কঙ্কালটা বের করা হয়েছিল, পাওয়া যায় নি শুধু আংটিটা। খবরটা আমি সংগ্রহ করেছি কিন্তু আমি তো গিয়ে খুঁজতে পারব না। তুই পারবি? যদি ওটা তুই আমায় উদ্ধার করে এনে দিতে পারিস তবে এই আমার আঙুলের আংটিটা আমি তোকে দেব। আর বাঁদীগিরি থেকে তোর ছুটি মিলবে।" গরীবেরাও মানুষ। হাঁ, খুদা তাদের দয়া করেন—ধনীদের সঙ্গে সমান দয়া করেন। কিন্তু লোভের বশে যদি না জেনে বুঝে সাপের গর্তের মধ্যে হাত পুরে সাপের বিষে জ্বলে মরে তাতে কি খুদা এসে তার হাতে ধরে বারণ করবেন, বলবেন—এরে গরীব, হাত দিস নে গর্তে।

বাঁদীটা অবশ্য মরে নি। খোদা তাকে বারণ করেন নি কিন্তু

হয়তো নসীব তার প্রসন্ন ছিল—যার জন্য মেয়েটা সাপের গর্তে ঠিক হাত দেয় নি—অথবা সাপটাই ওঘর থেকে বেরিয়ে চ'লে গিছল। কিন্তু বিচিত্রভাবে রৌশনআরার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছিল। যে লোকটা স ঙ্গ গিছল বাঁদীটার সে একটা খোজা, সে লোকটা ভাঙা কেল্লার সিঁড়িতে পা হড়কে পড়ে গিয়ে মারা পড়েছিল। যার জন্য বদনামী দিয়ে তাকে বরখাস্ত করে বাঁদীটাকে পাঠানো হয়েছিল কয়েদখানায়।

ঔরংজীবের এ সাহস দুঃসাহস।

বাঁদীটার মত সাপের মুখে পড়ে নি—সেটা হয়তো অসম্ভব সম্ভব হওয়ার মত হয়ে গেছে কিন্তু জেনে শুনে যে সে সাপটাকে নিয়েই একঘরে বাস করছে। সে ধরে নিয়েছে সাপটা সাপই নয়—একটা মোটা দড়ি; অথবা সাপটার বিষই নেই—নির্বিষ একটা নিরীহ সাপ—দেখতেই শুধু ভয়ংকর। হয়তো বা এ জাতের সাপ বুনো মানুষের প্রিয় খাদ্য।

যোগযাগ তুকতাক, কাফের কেরেস্তান সুফী ফকীর যোগী দরবেশদের কবচে তাবিজে ঘি পুড়িয়ে যাগ করাটা খোদার হয়তো প্রীতিকর নয়। কিন্তু এই সৃষ্টিতে খুদার দৃষ্টির আড়ালে শয়তান আছে। শয়তান পাপ, শয়তান দোজখের শয়তান অন্ধকারের সওদাগর, হয়তো বা বাদশাহ সুলতান, কিন্তু তার শক্তিকে তো মানতে হবে।

ঔরংজীব, ইমাম হোসেনকে খুন করেছিল শয়তানের গোলামেরা সিপাহীরা। পয়গম্বর রসুলকে মক্কা মদিনায় কম দুঃখ পেতে হয় নি! কারবালার পালা কারবালাতেই শেষ হয়ে যায় নি ঔরংজীব, সারা দুনিয়ায় কারবালার লড়াই আজও চলেছে। দিল্লী থেকে চিঠি লিখে এ সত্য তোমাকে আমি বোঝাব কি করে?

* * * *

পালকির মধ্যে বসে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত বেগম রৌশনআরা সাহেবা

কুঞ্চিত ললাটে একেবারে যাকে মগ্ন হয়ে যাওয়া বলে তাই হয়ে ছিলেন।

একখানা সাধারণ পালকি,—পালকিতে ছজন বাহক আর সঙ্গে দুজন মাত্র সিপাহী ; বেরিয়ে এল লালকিল্লার পশ্চিম-দক্ষিণ কোণের ফটক দিয়ে। দরওয়াজার সিপাহীরা পালকি চিনত—সিপাহীটাও পরিচিত। একজন হাবসী খোজা। খানখানান সায়েস্তা খান বাহাদুরের হাবেলীর পালকি। খানখানান বাদশাহের মেহমান। তাঁর বাড়ির পালকিতে বাড়ির জেনানারা প্রায় এসে থাকেন শাহাজাদীদের সঙ্গে দেখা করবার জন্য, মেহমানী করবার জন্য। কেল্লার মধ্যে হারেমে যাবার জন্য পাকা হুকুমনামা পাঞ্জা এ দেওয়াই আছে। পালকি সায়েস্তা খানের হারেমের কিন্তু তার মধ্যে চলেছিলেন শাহজাদী রৌশনআরা বেগমসাহেবা। সুচতুর ব্যবস্থা করে এই পালকি খানসাহেবের বাড়ি থেকে আনিয়ে নিয়েছেন তিনি।

পালকিখানা বেরিয়ে গেল। পথে জামা মসজেদের সামনে সেই পালকি থেকে নামলেন একজন বিবিসাহেবা—আপাদমস্তক বোরকায় ঢাকা, শুধু দেখা যাচ্ছিল পায়ের পাতার সামান্য অংশ। সে অংশের রঙ আশ্চর্য সাদা। বিবিসাহেবা মসজিদের মধ্যে গিয়ে ফিরে এসে কিন্তু সে পালকিটায় চড়লেন না—অন্য একখানা পালকি ঠিক এই পালকিখানার পাশেই ছিল, সেইটেতে গিয়ে চড়ে বসলেন।

বাহকেরা পালকিখানা কাঁধে তুলে নিয়ে চলতে শুরু করল।

শাহজাদী রৌশনআরা চলেছেন সাধু নাংগা ফকীর সারমাদের সন্ধ্যার মজলিসে। আজ কিছুদিন থেকে শাহজাদা দারাসিকো এখানে ঘন ঘন আসছেন। কিছুদিন ধরে চিঠি চলেছিল। এই নাংগা ধর্মহীন শীলতাহীন অশ্লীল লোকটাকে দারাসিকো পীর-উ-মুরশীদইমান বলে সম্বোধন করে। আজকাল নিজে আসছে।

সারমাদের সঙ্গে নির্জন ঘরে বসে আলাপ চলে।

কি আলাপ চলে ?

কি করে তারা ?

তাই দেখতে সন্ধান করতে চলেছেন শাহজাদী। ব্যবস্থা করে এই পালকি আনিয়েছেন। পালকিতে এসেছিল সায়েস্তা খানের একজন বাঁদী। সে সঙ্গে এনেছিল সাধারণ গৃহস্থী ঘরের উপযুক্ত একপ্রস্থ বোরকা আর সাধারণ ঘরের মেয়েদের ব্যবহারের উপযুক্ত একজোড়া চটি। সেই পরে এই পালকিতে সওয়ারী হয়ে মাঝপথে জামা মসজেদে আবার সে পালকি বদল করে আর একখানা পালকিতে চড়ে চলেছেন। ওখানে অর্থাৎ ফকীরসাহেবের আস্তানায় প্রকাশ্যে জানিছেন এক অতি হতভাগিনী দুঃখিনী মেয়ে আসবেন—ফকীরসাহেবের পায়ে কদমবুচি করে আশীর্বাদ মেগে নেবেন। এ ছাড়া গোপনেও বন্দোবস্ত করেছেন শাহজাদার সঙ্গে যখন ফকীর সাহেবের কথা হবে তখন ঠিক পাশের ঘরে যেন তিনি বসে অপেক্ষা করতে পান।

*　　*　　*　　*

আশ্চর্য! একজন বিশালকায় রূপবান উলঙ্গ মানুষ।

গায়ের বর্ণ এককালে সোনার মত ছিল এ দেখবামাত্র বোঝা যায় কিন্তু এখন যেন একটা ছোপ বা ছায়া পড়েছে। মানুষটা বিকারহীনের মত ঘুরছে ফিরছে বসছে কথা বলছে হাসছে। মাথায় পিঙ্গল রুক্ষ চুল, তেমনি দাড়ি তার সঙ্গে গোঁফ। তীক্ষ্ণদৃষ্টি উজ্জ্বল নীলাভ দুটি চোখ, উজ্জ্বল দাঁতের সারি।

হাজার হাজার মানুষ জমেছে। যেন একটা মানুষের মৌমাছির একটা মৌচাক। মৌচাকে মধু পরিপূর্ণ থাকলে মাছিগুলি যেমন ওড়ে না নড়ে না—ক্ষুব্ধ হয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে মুহূর্তে ভনভন করে যেমন আকাশময় ছড়িয়ে পড়ে না, ঠিক তেমনিভাবেই হাজার হাজার মানুষ যেন এক পরিপূর্ণ মধুভাণ্ডের উপর চাপ বেঁধে স্থির স্তব্ধ হয়ে বসে আছে।

পরিপূর্ণযৌবনা অপরূপ সুন্দরী একটি মেয়ে গান গাইছিল।

রৌশনআরা বিস্মিত হলেন গানের কথাগুলি শুনে।—"ঘিনি

রাজাকে বসিয়েছেন রাজসিংহাসনে তিনিই দিয়েছেন আমাকে গাছতলা; যিনিই দিয়েছেন তোমাকে অপার সুখ তিনিই দিয়েছেন আমাকে সীমাহীন চিন্তা আর ভাবনা। তিনিই তাদেরই পরিয়েছেন কত না পরিচ্ছদ, কত না পোশাক, যাদের শরীরে এবং অন্তরে লেগেছে কলুষের কালি—তিনিই আমাকে বলেছেন—নির্মল অন্তর তোর, তাই প্রয়োজন নেই তোর কোন আবরণের।"

চমকে উঠলেন রৌশনআরা।

এ কি ফকীর তাঁর মনের তিক্ত প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন? সঙ্গে সঙ্গে যেন মনে হয়েছিল এক আশ্চর্য দিব্যজ্যোতি ওই ফকীরের সর্বাঙ্গ থেকে বিচ্ছুরিত হতে আরম্ভ করেছে। উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল তাঁর চারিপাশ।

অপরূপ রূপসী যে মেয়েটি নাচছিল সে মূর্ছিত হয়ে পড়ে গিয়েছিল।

অভয়চান্দ! মেরা অভয়চান্দ—!

ফকীর তার উপর ঝুঁকে পড়ে বলেছিলেন—অভয়চান্দ—!

রৌশনআরা এতক্ষণে বুঝতে পেরেছিলেন যে, যে নাচছিল সে মেয়ে নয়, এ সেই লৌণ্ডা।

এই সেই বানিয়ার ছেলে অভয়চান্দ।

সারমাদ যার জন্য বলে এই দুনিয়া আর সারা আসমানে যে লাখো লাখো দুনিয়া তার মধ্যে আমার খুদা অভয়চান্দ না সে ছাড়া আর কেউ হতে পারে থাকতে পারে, তা আমি জানি না।

*

মেরা পীর—আমার পথ দেখানেওয়ালা হজরত—বলে দিন আমি কে? আমিই কি সে? হিন্দুরা যাকে বলে সোঽহং! সে কি সত্য? আমি যদি সেই হই তাহলে আমি যা চাই, আমার অন্তর যে জন্যে কাঁদে, যা কামনা করে, তা পাই না কেন, তা হয় না কেন? কারণ শাস্ত্র বলে খোদা যা করেন তা মঙ্গলের জন্য। এবং তাঁর যা

ইচ্ছা তা কোনমতেই রোধ করা যায় না। খোদার ইচ্ছাই অদৃষ্ট—তাই নির্ধারিত, তাই নিয়তি।

প্রশ্ন শুনে অবাক হয়ে গেলেন রৌশনআরা। শাহজাদা দারাসিকো উলঙ্গ ফকীর সারমাদ সাহেবকে এই প্রশ্ন করলেন। কই, হিন্দুস্তানের মসনদ নিয়ে তো কোন কথা নেই এর মধ্যে?

মেরা পীর-উ-মুরশীদই মাঃ হজরত আমি বুঝতে পারি না—আমার বিস্ময় লাগে—পয়গম্বর রসুল কাফেরদের সঙ্গে নাস্তিকদের অবিশ্বাসীদের সঙ্গে খুদার ঝাণ্ডা নিয়ে লড়াই করতে গিয়ে হারলেন কেন?

রসুল-ই-সোখতার বা জং-এ কাফর মিরাফ্‌ত্‌
সিকস্ত বার লস্কর-এ-ইসলাম-মুফতাদ-সাবাবচিস্ত!

উষ্ণ রক্তস্রোত বয়ে গেল রৌশনআরার শিরায় শিরায়! কি উদ্ধত এবং সংশয়পূর্ণ প্রশ্ন! খুদ শয়তান ভর করেছে দারাসিকোর উপর! একদম কাফের হয়ে গেছে এই আদরের দুলাল বাদশাহ সাজাহানের বড় ছেলেটি!

নিভৃতে আলাপ হচ্ছিল ফকীর সারমাদ এবং শাহজাদা দারাসিকোর মধ্যে। লোকজন সব অনেকক্ষণ চলে গেছে। অল্প কিছু লোক এখনও আছে; তার মধ্যে ফকীরসাহেবের আস্তানার লোকই বেশী। আর কিছু আছে বড় শাহজাদা—শাহজাদা শাহবুলন্দ ইকবালের বিশ্বস্ত অনুচর এবং সিপাহীর দল আর তাঁর সঙ্গে আগে আছেন কয়েকজন হিন্দু পণ্ডিত, সুফী সাধক দরবেশ। দুজন রাব্বিও আছেন। আর একজায়গায় ভিড় করে রয়েছে বেশ একদল ফিরিঙ্গী। যেমন উগ্র সাদা রঙ তাদের তেমনি তাদের বিচিত্র পোশাক—তেমনি বিচিত্র তাদের আচার আচরণ ব্যবহার। নিজেদের মধ্যে গুলতানি জুড়ে দিয়েছে তারা। এরই মধ্যে শাহজাদী রৌশনআরা রয়ে গেছেন, রয়ে গেছেন বিচিত্রভাবে—সুকৌশল

চাতুরীর সঙ্গে এই ব্যবস্থাটা তিনি সুসম্পন্ন করেছেন। কোন লোকই বিন্দুমাত্র সন্দেহ করতে পারে নি বা করে নি।

ফকীর সাহেবের মজলিস শেষ হবার অব্যবহিত পূর্বে জেনানাদের বসবার জায়গায় একজন জেনানী অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। তার সঙ্গের লোকেরা বিপন্ন বিব্রত হয়ে পড়ে ফকীরসাহেবের মুরীদদের সাহায্য প্রার্থনা করেছিল। তারা সহানুভূতির সঙ্গে সব সাহায্য দিয়েছিল এবং একজন মুরীদ ব্যস্তসমস্ত হয়ে একজন হেকিমসাহেবকে ডেকে এনেছিল মেয়েটিকে দেখবার জন্য। সঙ্গের মেয়েরা রোগিণীর বোরকা খুলতে দেয় নি, শুধু হাত দেখতে দিয়েছিল। হেকিম নাড়ী পরীক্ষা করে বলেছিলেন রোগিণী বহুৎ দুবলা হয়ে গেছে। শক্ত বেমারী। এ বেমারীর দাওয়াই হেকিমীতে নাই। এ ভাল করতে পারেন এক যিনি দিনদুনিয়ার মালিক তিনি। মুখে চোখে জল দাও। আর বরং ফকীরসাহেবকে বল—যদি ওঁর মর্জি হয়—!

সেই কারণেই ফকীরসাহেবের মজলিস মঞ্চের ঠিক পাশের ঘরেই বিবিকে শুইয়ে রাখা হয়েছিল। আশে-পাশে বসে ছিল সঙ্গের তিনজন জেনানী। আর দূরে অপেক্ষা করছিল তাঁর পালকি বেহারা আর সঙ্গের বর্কআন্দাজ।

জেনানী রৌশনআরা। হেকিম এবং ফকীরসাহেবের আস্তানায় সহানুভূতিশীল মুরীদটি সকলেই রৌশনআরার খাস গোপন চক্রের লোক।

ক্ষীণচেতনা দুর্বলা রোগিণী সেজে পড়ে থাকা প্রায় অসহ্য হয়ে উঠেছিল রৌশনআরার। তাঁর মন অত্যন্ত তীক্ষ্ণ; মেজাজ অহরহই একটা প্রচ্ছন্ন ব্যর্থতার ক্ষোভে ক্ষুব্ধ। কিন্তু তিনি কঠোরভাবে সংযত। তাঁর জীবনে যৌবনধর্মের উন্মাদনা নেই, দখিনা কি পশ্চিমা বাতাস তাঁর দেহে কোন চাঞ্চল্যের সঞ্চার করে না। অন্ততঃ উতলা তো করেই না। বুলবুলের শিস, কোয়েলাকোকিলের গান তাঁর কানে মধু ঢালে না। তাঁর মন উন্মনা হয় না কোন কারণেই। হজরতবেগম

জাহানআরা দিদিজী যখন গজল রচনা করেন—যখন বিবাহবাসরের স্বপ্ন দেখেন তখন তিনি দেখেন ঠিক তার বিপরীত। তাঁর যেটুকু স্বল্প জায়গীর আছে তার হিসাব দেখেন। একটা বাগিচার পত্তন করেছেন তিনি—সেখানে কোন্ গাছ লাগালে ভাবীকালে তা থেকে আয় হবে তা চিন্তা করেন। দিদিজী রঙমহলের মেয়ে-মজলিসে মৃদু মৃদু হেসে একদিন বলেছিলেন—আমি মনে মনে আমার বিবাহবাসরের স্বপ্ন দেখি। আকাশ আমার বিবাহবাসরের চাঁদোয়া—দুলেরা এসেছে—সে পরম সুন্দর—কিন্তু তাকে দেখতে কেউ পাবে না আমি ছাড়া। সে অশরীরী চাঁদোয়ার নিচে পূর্ণিমার চাঁদ আর অসংখ্য উজ্জ্বল তারা দিয়ে সাজানো হয়েছে হিন্দুস্তানের শাহানশাহের বড়কী বেটীর সাদির আসর—বাতাসে বাতাসে গুলাব আর খুসবয়ের পিচকারি ছুটছে—।

কাব্য করতে জানেন জাহানআরা—যারা শোনে তারা শুনতে শুনতে অভিভূত হয়ে যায়। রৌশনআরা কিন্তু অভিভূত হন না। তিনি থাকেন এসব মজলিসে। সে সময় তিনি স্থিরদৃষ্টিতে যমুনার দিকে কি দিল্লী শহরের হাবেলী মঞ্জিল মিনার গাছপালার মাথার উপর দিয়ে দৃষ্টি প্রসারিত করে দিয়ে ঠিক এর বিপরীত দৃশ্য দেখেন।

দেখেন দিল্লী শহর রক্তাক্ত হয়ে গেল।

দিল্লীর লালকেল্লার মধ্যে ভয়ে থরথর করে কাঁপছে ওই স্বপ্নবিলাসী মূর্খ দারাসিকো। জাহানআরার চোখ থেকে দুটি জলের ধারা অনর্গল গড়িয়ে পড়ছে গুলাবের মত দুই গণ্ডদেশ বেয়ে। বৃদ্ধ সাজাহান তখন থাকবেন না।

না। তিনি যেন থাকেন। রৌশনআরা কামনা করলেন তিনি যেন থাকেন। তিনি যেন তাঁর অবিচারের মূর্খতার অন্ধতার অবশ্যম্ভাবী ফল দেখে যান।

সারা দিল্লীতে কোলাহল উঠছে। ভয়ার্ত মানুষ—ওই যে মানুষগুলো জানোয়ারের মত দুনিয়াতে জন্মায় আর দুঃখে কষ্টে ভোগে

এবং কতকগুলো সন্তান উৎপাদন করে অবশেষে মরে, তারা মরবার ভয়ে ভয়ার্ত চীৎকার করছে।

দক্ষিণ থেকে এসেছে শাহজাদা ঔরংজীব।

গুজরাট থেকে এসেছে মুরাদবক্স।

বাংলা সুবা থেকে এসেছে শাহ সুজা।

প্রচণ্ড গর্জন করে তোপের গোলা এসে পড়ছে শহরের মধ্যে। দিল্লী ফটকে হানা পড়ছে। আজমীড় ফটকে ঘা পড়ছে—তুর্কমান ফটক ভেঙে পড়ছে।

*

শাহজাদা দারাসিকো শাহবুলন্দ ইকবাল, তুমি পুণ্যবান—তুমি পবিত্রাত্মা। মালিক তোমাকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন হয়তো তাঁর সেই বিশেষ কাজের জন্যে যা সৃষ্টির আদিকাল থেকে তিনি চাচ্ছেন তার জন্যে। শাহজাদা, তিনি চান তাঁর এই দুনিয়া আঙুর-ভরা ক্ষেতের মত ফলবতী হয়ে—চন্দ্রমল্লিকা ফুলের ক্ষেতের মত, গোলাবের বাগিচার মত সুন্দর ফলবতী হয়ে উঠুক। অথচ তা বার বার বরবাদ হয়ে যাচ্ছে—করে দিচ্ছে কেউ। কে সে তা জানি না। হয়তো তিনি নিজেই বরবাদ করেন। তাঁর বাইরে কে আছে শাহজাদা?—আমি জানি না। শাহজাদা দারাসিকো, তাছাড়া আরও একটা কথা শোন—

দুর চে খোমান্দেম ফ্রামোশ কার্দেম—

ইস্তা হারদিথ-ই-দোস্ত-কে তকরার মিকুনেম।

শাহজাদা, বচপন থেকে এককালে শাস্ত্র আমি অনেক পড়েছি। কিন্তু শাস্ত্র যা আমি পড়েছিলাম তা আজ সব কিছু ভুলে গিয়েছি শাহজাদা। ইচ্ছে করে ভুলে গেছি, কারণ কিছুর সঙ্গে কিছু মেলে নি। আমার কাছে আজ ঈশ্বর নেই দেবতা নেই শাস্ত্র নেই ন্যায় নেই অন্যায় নেই পাপ নেই পুণ্য নেই—বিশাল নাস্তির মধ্যে অস্তি শুধু একটি বাচ্চা—ওই অভয়চাঁদ। যাকে আমি ভালবাসি।

শাহজাদা দারাসিকো, আজ আমার কাছে মক্কার মসজেদের কাল পাথরখানিতে আর হিন্দু মন্দিরের কাল পাথরে গড়া পুতুল দেবতায় কোন ফরক নেই।

শাহজাদা, তোমার কাছে, দুনিয়ার কাছে বলছি, 'খুদাইমান অভয়চান্দস্ত ইয়া দিগর।' এ ছাড়া আদি পেলাম না, অন্ত পেলাম না। সুখের হদিস পেলাম না, দুখের হদিস পেলাম না; তবে জানি, সুখ দিয়ে হোক, দুখ দিয়ে হোক নতুন করে গড়া এক দুনিয়া সে গড়তে চাইছে, গড়ছে—কিন্তু সে ভাঙছে, ভেঙে দিচ্ছে, ভেঙে পড়ছে বার বার। বার বার।

কথা বলতে বলতে পিঙ্গলবর্ণ উলঙ্গ ফকীর সামনে দূর আসমানের দিকে নিষ্পলক দৃষ্টি নিবদ্ধ করে অভিভূতের মত হয়ে রইলেন। একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—কুয়াশার মত একটা আস্তরণ, একটা মসলিনের পর্দা যেন সব ঢেকে রেখেছে, তবু মনে হচ্ছে শাহজাদা, ওই ওর ওপারে আছে এক সুখের জিন্দিগী—এক আশ্চর্য ঐশ্বর্যের দুনিয়া—সেখানে ধর্ম নিয়ে বিরোধ নেই, জমিন নিয়ে জমিদারি নিয়ে, রাজ্য নিয়ে কাড়াকাড়ি নেই, সেখানে কেউ ঝোবড়াতে বাস করে না, কেউ বস্তিতে থাকে না, কেউ হাবেলী মঞ্জেলে থাকে না—সেখানে কিল্লা নেই, সেখানে প্রজা নেই রাজা নেই, আমীর নেই গরীবান নেই, সেখানে আছে শুধু মহব্বতি আর মহব্বতি আর মহব্বতি। দোস্তি দোস্তি আর দোস্তি। গানা আছে বাজা আছে—ঠাণ্ডা পানি আছে—খুসবু আছে; গোটা দুনিয়াটা সেখানে এক মসজেদ বল মসজেদ, মন্দির বল মন্দির, গির্জা বল গির্জা—তাই বনে গেছে। গুগগুল পুড়ছে, লাবান পুড়ছে, ধূপ পুড়ছে, লাখো লাখো বাতি জ্বলছে, আর কেউ পড়ছে কলেমা, কেউ পড়ছে স্তোত্র, কেউ পড়ছে বাইবেল।

হাঁ শাহজাদা; এ পর্দার ওপারে ওই নয়া জিন্দিগী আর নয়া দুনিয়ায় আমি পৌঁছুব, আমি যাব বলেই আমি দূর কাশান থেকে এসেছিলাম ইরানে তেহরানে। সেখান থেকে গিয়েছিলাম মক্কাশরীফ।

সেখান থেকে ফিরেছিলাম বসরা বাগদাদ। বসরা বাগদাদ থেকে পথে দেখা পেয়েছিলাম এক দেবকন্যার। সে বাঁদী হয়ে আছে। তাকে মুক্ত করব বলে এসেছিলাম হিন্দুস্তান। হিন্দুস্তানের মাটিতে আছে সোনা—পাথরের রাজ্যে ছড়িয়ে আছে হীরা জহরত। খাট্টাতে পেতেছিলাম গদি। রূপেয়া কামাব। কামিয়ে নিয়ে ফিরে যাব ইরান। সেখানে মুক্ত করে নেব সেই হুরীকে। শাহজাদা, এখানে হঠাৎ দেখলাম এই বাচ্চাকে। অবিকল সেই মুখ সেই চোখ সেই রূপ। শুধু তাই নয় শাহজাদা, এই বালক আমাকে বলে, 'সারমাদজী, তোমার মনে যা হচ্ছে, বুকে যা হচ্ছে তা শুধু তোমার কথা নয়। এ কথা সারা দুনিয়ার মানুষের কথা—সেই কথা তুমি বল। হোক সে কোরানবিরোধী—হোক সে শাস্ত্রবিরোধী—হোক সে বাইবেলবিরোধী। তুমি ফর্দ তৈয়ার করো, তুমি রুবাই রচনা করো, গজল বানাও—আমি তাতে সুর দিয়ে গান গেয়ে সারা দুনিয়াকে শুনিয়ে দি। তার সঙ্গে সঙ্গে বলি—ফকীর সারমাদ, তোমার সামনে মসলিনের পর্দা-ঢাকা ওই যে দুনিয়া, যে-দুনিয়ার পর্দার অন্তরালে নিত্যই আজকের দুনিয়া, আজকের জিন্দিগী পিছনে চলে যায় এবং মোটা কালো পর্দা ঢাকা পড়ে, সে দুনিয়ার ওই সামনের পর্দা তুলে দেবার জন্যে তোমার চেষ্টা তো নতুন নয়। তুমি জন্মান্তর মানো না। না মানো। পূর্বজন্মের তুমিই হও আর তোমারই মত আর কোন লোকই হোক—তার সঙ্গে তোমার মত আরও অনেক লোক এই দুনিয়ার ওই সামনের পর্দা তুলে ওই সুখের দুনিয়াকে ওই এক ধর্ম-মন্দিরের মত দুনিয়াকে সামনে আনবার কত চেষ্টা যে করেছে, বার বার কত মানুষ যে নিজের জান করেছে কুরবানি, কত লড়াই যে হয়েছে তার কতটুকু তুমি জান? এক কারবালার কথা জান তুমি সারমাদ। কিন্তু কত কারবালায় কত লড়াই হয়েছে তা তুমি জান না। হিসাব কেউ রাখে না।

সারমাদ—।'

থেমে গেলেন সারমাদ। একটি আশ্চর্য কণ্ঠ চীৎকার করে বলে উঠল; না, চীৎকার নয়—গান।

পাশের ঘরে সে অস্বস্তিকর বোরকাটার মধ্যে নিজেকে আবৃত করে শুয়ে ছিলেন রৌশনআরা। যে ঘরে শাহজাদা দারাসিকোর সঙ্গে সারমাদের কথাবার্তা হচ্ছিল ঠিক তার পাশের ঘরেই অসুখের ভান করে শুয়ে শুয়েই কথাবার্তা শুনবার চেষ্টা করছিলেন। ফকীরের একজন শিষ্যকেই তিনি অনেক অর্থ দিয়ে নিজের কাজে লাগিয়েছেন। সব ব্যবস্থা সেই করেছিল। কথাবার্তা প্রায় স্পষ্টই শোনা যাচ্ছিল। এবার সেই আশ্চর্য কণ্ঠের উচ্চ স্বর শুনে রৌশনআরা বুঝলেন, এ সেই বানিয়ার ছেলে লৌণ্ডা অভয়চান্দ। যে গান গাইতে গাইতে অজ্ঞান হয়ে গেছে। সারমাদের শিষ্য বলেছেন তাঁকে,—এমন সমাধি অভয়চান্দের মধ্যে মধ্যে হয়। দু ঘড়ির আগে ঠিক চেতনা হয় না। দু ঘড়ি তো কম-সে-কম। অধিকাংশ সময় বেশী সময়ই লাগে। পুরা সারাদিন—চার প্রহর কেটে যায়। দু একবার পুরা দিনরাত লেগেছে তার চেতনা হতে। এ সময় তাকে ডাকলে সাড়া মেলে না, তাকে কিছু খাওয়ানো যায় না, তবে মধ্যে মধ্যে আপনার মনে কথা বলে ওঠে—গান গেয়ে ওঠে।

"রাম যুদ্ধ করে রাবণকে বধ করেছিল সবংশে।
কুরুক্ষেত্রে কুরুপাণ্ডবের লড়াইয়ে কৌরব হয়েছিল ধ্বংস
মক্কায় মদিনায় পয়গম্বর রসুল ধ্বংস করেছিলেন অধার্মিকদের।
আবার লড়াই হল কারবালায়।
কুরবানির জন্য ধর্ম উজ্জ্বল হল।
যুদ্ধ তো কতই হল দুনিয়াতে।
সবাই বলে—খোলো নয়া দুনিয়ার শেষ বড় ফটক—
রংচটা পুরোনো দুনিয়ার সব দুঃখে আগ জ্বালা দো।
প্রতিবারেই আসে কতকগুলি মানুষ তারা জান দিয়ে যায়—
নিজেদের খুন ঢেলে দিয়ে যায়।

হায় হায় হায়—কত জন্মজন্মান্তর তারা কেবলই
আসছে আসছে আসছে—
জান কোরবানি করছে করছে করছে—
এয় খোদা, তবু কি এখনও কুরবানির দরকার ?
এখনও কি সময় আসে নাই ?
আমি দেখছি—আমি দেখছি—"

এবার সে আর্তস্বরে কেঁদে উঠল যেন।—ও কত রক্ত। কত রক্ত! রক্তের নদীতে লাল গুলেকমলের মত ভেসে যাচ্ছে ছুটি মানুষের মুখ। এয় খোদা—!

হা হা করে কেঁদে উঠল সে বাচ্চা তার সেই বিচিত্র ধ্যানমগ্নতা বা জ্ঞানহীন অবস্থার মধ্যে।

রৌশনআরা আর থাকতে পারলেন না। ধড়মড় করে উঠে বসলেন। নিজের বাঁদীকে ডেকে বললেন—চল্, জলদি এখান থেকে বেরিয়ে চল্, জলদি !

বাঁদী বললে—আমি দেখে আসি পাল্কির বেহারাগুলো—

মধ্যপথে বাধা দিয়ে রৌশনআরা বললেন—নেহি নেহি। ময় খুদ যাউঙ্গী। পাল্কির বেহারা না থাকলে আমি হেঁটে চলে যাব। এখানে থাকতে আমি পারব না। না—না—না।

চুয়াল্লিশ

ওই বানিয়া লৌণ্ডা অভয়চাঁদের সে মর্মান্তিক কাতর কণ্ঠস্বর রৌশনআরার মত অসাধারণ বুদ্ধিমতী এবং অপরিমেয় ধৈর্যশালিনী তার সঙ্গে নিষ্ঠুর ও কঠোরচিত্ত ব্যক্তিত্বকেও বিচলিত করে তুলেছিল। রৌশনআরা নারীত্ব বা পুরুষত্ব এই দুইকে অতিক্রম করে একটি ব্যক্তিত্বকে আয়ত্ত করেছিলেন। দুনিয়ার সব কিছুকে তিনি সেই ব্যক্তিত্ব দিয়ে বিচার করেন। এক্ষেত্রে তাঁর সেই ব্যক্তিত্বও যেন বিভ্রান্ত এবং চঞ্চল না হয়ে পারলে না।

দুনিয়ায় যুক্তি দিয়ে অনেককিছু অলৌকিককে অনায়াসে মিথ্যা ভুয়া বলে প্রমাণ করা যায়; অনেক ক্ষেত্রে শাহজাদী রৌশনআরা তা করেছেন। এই কাফেরী বুজরুকির অনেক ভণ্ডামিকে তিনি ধরেছেন এবং প্রমাণ করেছেন।

শুধু ইসলামের সুন্নীমতে প্রগাঢ় বিশ্বাসের জোরেই নয়, নিজে তিনি পরখ করে দেখে দৃঢ়বিশ্বাসে উপনীত হয়েছেন।

সারা হিন্দুস্তানে কাফেরদের কম মন্দির আর কম ওই ঠাকুরপুতুল তো ভেঙে চুরমার করা হয় নি! কি হয়েছে তাতে!

অনেক জনে অনেক রকম ব্যাখ্যা করে। করুক। সব মিথ্যা সব ঝুট্। কিন্তু রমণীবেশী ওই অভয়চাঁদ বিভোর হয়ে গান করতে করতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যে কান্না কাঁদলে আর যে মর্মান্তিক কথাগুলি বললে তা রৌশনআরা বেগমসাহেবার কঠিন কঠোর চিত্তকেও বিচলিত করে দিয়েছে। যেন একটা কঠিন কঠোর রুক্ষ পাথরের স্তূপ ভূমিকম্পে নাড়া খেয়ে কেঁপে গেছে এবং সেই কম্পনের মধ্যে ভিতরের কোন অজ্ঞাত উৎস থেকে একটি সজল সরসতা আত্মপ্রকাশ ঘোষণা করেছে। কোন ফাটল ফাটে নাই—কোন একটি রন্ধ্র দেখা দেয় নাই—শুধু সমস্ত রুক্ষ শুষ্ক প্রস্তরময় আবরণীটা অকস্মাৎ কোন জাদুর

স্পর্শে যেন সজল হয়ে উঠছে। সমস্ত পাথরখানা চুঁয়ে চুঁয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে ; যেন পাথরখানা কাঁদছে !

কানে বাজছে, দুনিয়ার সেই আদিকাল থেকে খুদাতায়লা এক আনন্দের দুনিয়া—মহব্বতের জিন্দিগী—ফুল এবং ফসলে ভরা—রঙে এবং গন্ধে উজ্জ্বল—গানে এবং আবেশে বিহ্বল এক দুনিয়াকে তৈয়ারী করবার চেষ্টা করছেন। তৈয়ারী হয়েছেও সব কিছু। আনন্দ তাও রয়েছে—মহব্বৎ তাও রয়েছে—রঙ গন্ধ গান আবেশ সব আছে, কিন্তু তবু সে কায়েম হচ্ছে না। তিনি আলো জ্বালছেন আর সে আলো কে নিভিয়ে দিচ্ছে। সেই অন্ধকারের ত্রাসে সেই আনন্দ মহব্বতি ধ্বংসের বেদনায় সারা দুনিয়ার বুক চিরে এক কান্না উঠেছে।

দুনিয়া রোতি হ্যায়।

তামাম মানুষের কলেজায় দুখ যেন গুমরে গুমরে উঠছে ; সারা আসমান এই দুঃখের মেঘে ছেয়ে যায় আর হায় হায় করে কেঁদে সারা হয়।

একদল মানুষ আসে তারা সেই চিরকাল নিজেদের জান কোরবানি দিয়ে চেষ্টা করছে আর বলছে—কায়েম করো খুদা, কায়েম করো সেই দুনিয়া যে দুনিয়ায় সব আদমী শুধু আদমী। বাবা আদমের লেড়কা আর লেড়কী ভাই আর ভাই বহেন আর বহেন ; পিয়ারা আর পিয়ারী। সব মানুষের এক ধরম এক করম। ফরক নেহি হ্যায়। হিন্দু বলছে মুসলমান বলছে কেরেস্তান বলছে—ওই বনের মধ্যে বুনো মানুষেরা তারাও বলছে। কিন্তু তবু হচ্ছে না। তবু হচ্ছে না। এই নিয়েই মারামারি আর কাটাকাটিতে খুনের দরিয়া বইছে।

* * *

"সেই খুনের দরিয়া আবার বইবে।

হায় হায় হায়! আঃ রে আঃ! দুটি মানুষের শির দুটি

গুলেকওল—হিন্দুরা বলে পদ্ম—সেই গুলেকমলের মত দুটি মানুষের মুণ্ড ভেসে গেল।"

কি কি কাতরতা অভয়চান্দের কণ্ঠস্বরে

বিচিত্র অভয়চান্দ। জন্ম দেওয়ানা। হিন্দুরা বলে দেবঅংশে জন্ম। মুসলমানেরাও বলে দেবদূত।

সে তার এই ঘোরের মধ্যে বলে সে কাঁদতে জন্মেছে। এত কান্না এসেছে যে এত কান্না সে আর আগে কোন জন্মে কাঁদে নি।

রৌশনআরা বেগমসাহেবা কঠিন কঠোর।

তাঁরও বুকের ভিতরটায় কলেজা যেন গুমরে গুমরে উঠছে। একটা অফুরন্ত কান্নার আবেগ যেন ভিতর থেকে ঠেলে ঠেলে উঠছে।

মিথ্যা নয়। ওই বানিয়া লোণ্ডার কথা তো মিথ্যা নয়। এমনি এক আনন্দের দুনিয়াই খুদা তৈয়ারি করতে চেয়েছিলেন, চেয়েছেন এবং করেছেনও, কিন্তু কে যেন তাকে প্রকাশ হতে দিচ্ছে না। বাতিদানে তেল দেওয়া হয়েছে, সলতে দেওয়া হয়েছে, শামাদান পরানো হয়েছে, আলোও জ্বালানো হচ্ছে, কিন্তু বার বার আলো নিভে যাচ্ছে। নিভে যাচ্ছে। আলো জ্বলছে আর সঙ্গে সঙ্গে একটা আশ্চর্য কালো ঝড় উঠছে। প্রচণ্ড দমকায় আলো নিভিয়ে তামাম দুনিয়াকে অন্ধকারে ঢেকে দিচ্ছে।

পয়গম্বর আলো জ্বেলেছিলেন।

কারবালায় শয়তানেরা নিভিয়েছিল আলো। খুনের দরিয়ায় হোসেন হাসানের মুণ্ড লাল দরিয়ায় দুটি পদ্মফুলের মত ভেসে গিয়েছিল।

আবার বইবে খুনের দরিয়া। আবার দুটি মানুষের মুণ্ড দুটি লাল পদ্মের মত ভেসে যাবে।

এইখানে রৌশনআরার দুঃখ বেদনা হয়ে উঠছে দুরন্ত ভয় এবং নির্মম নিষ্ঠুর ক্রোধ। সে কি তবে শাহজাদা ঔরংজীবের আর মুরাদের অথবা সুজার অথবা তাঁর?

বুকের ভিতরে যেন আগ্নেয়গিরি গর্জে উঠে আগুন ওগরাতে থাকে।

খুদা মালেক—বিনা খুদাসে মাবুদ নেহি—বিনা মহম্মদসে পয়গম্বর রসুল নেহি—এয় খুদা লা ইলাহি ইল্লাল্লা মহম্মদে রসুলাল্লা তুমি জান। তুমি সর্বত্রবিরাজমান; তুমি সর্বশক্তিমান্; তুমি সূক্ষ্মদর্শী। লা ইলাহা "ইল্লাল্লা হো শোভানাল লাতিফেল খাবিরে।" তোমার কাছে কিছু অজ্ঞাত নেই। তুমি সব জান। তুমি জান, তোমার হুকুমৎ, পয়গম্বর রসুল মহম্মদের ইসলামের বাণী, কোরানের ফতোয়া ছাড়া আর কিছু মানে না তোমার এই গরীব বান্দা আর বান্দী ঔরংজীব আর এই দীনা রৌশনআরা। বিনা ইসলাম ধর্ম নাই, বিনা আল্লা খুদা তোমার আর নাম নাই, বিনা সরিয়ৎ পবিত্র জীবনের কোন কানুন নাই।

তোমার বাঁদী রৌশনআরা কোনদিন সাদির কথা ভাবে নি। মনে মনে সে কোন কাফের রাজপুত রাজা কি যুবরাজকে কি কোন মনসবদারকে রাত্রে—। মাফ করো দয়াল করুণাময় "শোভানার রাউফের রাহিমে"—ঝুটা বাত বলবে না রৌশনআরা—কাফেরকে স্বপ্ন দেখলেও সে স্বপ্নকে কোন দিন প্রশ্রয় দেয় নি। সে কখনও তোমার উপাসনালয় মসজেদ এবং পুতুলপূজার মন্দিরকে সমান করে না। কি কেরেস্তানের গির্জাকেও না। কখনও কোন কাফের সাধু বা কেরেস্তান পাদরী কি ইহুদী রাব্বির কাছে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে সালামৎ জানায় না। খুদা তুমি সাক্ষী—রৌশনআরা কোন দিন ওই লালবাবার কাছে তার দয়া কি আশীর্বাদ ভিক্ষা করতে যায় নি।

তুমি জান খুদা, বেগম রৌশনআরার দান বিলকুল বিলি হয় মুসলমান ফকীর আর গরীবানদের মধ্যে।

রমজানে সে রোজা রাখে। পাঁচ ওয়াক্ত সে তোমাকে ডাকে।

শাহজাদা মহীউদ্দীন ঔরংজীব রৌশনআরার চেয়েও নিষ্ঠাবান।

"লা ইল্লাল্লা হো শোভানাল আলমেল গায়্বে"—হে সর্বজ্ঞ তোমার কাছে তো কেউ কিছু গোপন করতে পারে না—তুমি তো সকল গুপ্ত বিষয়ের জ্ঞাতা; তুমি তো জান রৌশনআরা শরাপ পান

করে—এ গুনাহ তার আছে—সে গানাবাজানা ভালবাসে—কিন্তু শাহজাদা ঔরংজীব এ বিষয়ে নির্মল। সে শরাপ স্পর্শ করে না। সে গানাবাজানা নিয়ে, নাচনেবালী নিয়ে মেতে উঠে তোমাকে ভুলে যায় না। আর রৌশনআরাও বার বার তোমার দরবারে তার এই গুনাহের জন্য মার্জনা চায়।

সারা তুনিয়ায় খুদা মেহেরবান আল্লাহতালা শোভানাল্লা, তোমার ইসলামের একচ্ছত্র বিস্তারের জন্য আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। হিন্দুস্তানে তার বনিয়াদ গাড়বে তারা। সারা ইরাক ইরাণ তুর্কীস্থান তোরান বল্‌খ বদকশান উজবেগীস্থান কাবুল কান্দাহার আফগানেস্থান থেকে সারা হিন্দুস্থানে তোমার পবিত্র রাজ্য গড়ে তোলবার জন্যই আমাদের চেষ্টা।

ঐ যে বানিয়া লৌণ্ডা বললে ভরের ঘোরের মধ্যে, যা শুনে সমস্ত দেহ ঝিম ঝিম করে উঠল বুক শুকিয়ে গেল; ঐ যে বললে—"খুনের দরিয়া বয়ে যাচ্ছে—সেই দরিয়ার তুফানে ভেসে যাচ্ছে তুটি মানুষের মুণ্ড। লাল পদ্মের মত।"

ঐ অভয়চান্দ, ও বিধর্মী কাফের, বেশরমী ঘৃণিত লৌণ্ডা, গুণাহের এক আগমকুঁইয়া—এসব ঠিক সব সত্য। কিন্তু খুদা মেহেরবান তোমার তুনিয়ায় শয়তান ঘুরে বেড়ায়, তোমার প্রহার খেয়েও সে মরে না; সে বেঁচে আছে; তার আশ্চর্য জাতুবল আছে। ওই আশ্চর্য জাতুবল পেয়েছে ওই অভয়চান্দ; সে এইভাবে বেহোঁশীর মধ্যে ঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করে যায়। যা বলে তাই ফলে।

তাহলে খুনের দরিয়ায় সে ভেসে যেতে দেখলে যে তুটি মানুষের মুণ্ডকে সে কার?

সে কি শাহজাদী রৌশনআরা এবং শাহজাদা ঔরংজীবের?

একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে শাহজাদী রৌশনআরা পালকির মধ্যেই জ্ঞান হারিয়ে ঢলে পড়লেন। ভাগ্য ভাল যে পিছন দিকেই হেলে পড়লেন। ঘেরাটোপঘেরা পালকির বাহকেরা একটা মৃত্যু

ঝাঁকি অনুভব করলে মাত্র, তার বেশী কিছু না। তারা হনহন করে তাদের শব্দ তুলে এগিয়ে চলল।

বিব্রত হয়ে উঠল আমিনা, শাহজাদীর সঙ্গে যে বাঁদী তাঁর পালকির মধ্যেই তাঁর সামনে বসে ছিল।

*

নাঙ্গা ফকীর সারমাদের সন্ধ্যার উপাসনাসভা থেকে ফিরছিলেন শাহজাদী রৌশনআরা। ছদ্মবেশে গিয়েছিলেন তিনি। তাঁদের মামা মমতাজমহল বেগমের ভাই খানখানান সায়েস্তা খাঁ শাহজাদা দারাসিকোর বিরুদ্ধবাদী। তিনি ঔরংজীব ও রৌশনআরার বিশ্বাসের পাত্র, সমর্থক এবং তাঁদেরই অন্তরঙ্গ। তাঁর বাড়ির পালকির বেগমমহলে যাওয়া আসার ছাড়পত্র আছে। খানখানানের বেগমদের পালকি আসে, তাঁর অন্য অন্য মেহমানেরাও আসা যাওয়া করে, বাঁদীরা আসে—খানখানানের বেগমমহল থেকে শাহী রঙমহলে নিশান আনে খবর আনে। উপহার উপঢৌকন আনে। খানখানানের হাবেলী থেকে এমনই একটা পালকি এসেছিল—সেই পালকিতে বোরকা পরে এসেছিল এক বাঁদী, সে বাঁদী রঙমহলে থেকে গিয়েছিল—তার মত বোরকা পরে শাহজাদী রৌশনআরা নিজে বেরিয়ে গিয়েছিলেন ফকীর সারমাদ সাহেবের মজলিসে; নিজের কানে শুনতে গিয়েছিলেন ওই বানিয়া লৌণ্ডা তার ওই বেহোঁস অবস্থায় ভরের মধ্যে কি বলে। দেখতে গিয়েছিলেন আসলে কাণ্ডকারখানাটা কি। শাহজাদা দারাসিকো নিজে ফকীরের কাছে যান—ফকীর তাঁকে তাঁর পাশে বসবার আসন দেন, শাহজাদাকে নাকি বলেন নয়া ধর্মের পয়গম্বর, হিন্দুদের রামচন্দ্রের মত এক রাজ্য স্থাপন করতে দুনিয়ায় পয়দা হয়েছেন। পাঠিয়েছেন তাঁকে দিনদুনিয়ার মালিক আল্লাহতালা খুদাতায়লা। সারমাদ নাকি বলেন সয়তানের সঙ্গে এক বড়া ভারী লড়াই হবে। ভারী লড়াই। কারবালার মত লড়াই। এবার লড়াইয়ে শয়তানের হার হবে।

সামান্য সাধারণ একটা বোরকা পরে সাধারণ গৃহস্থী ঘরের মেয়েদের মধ্যে বসে নিজে সব দেখে শুনে তিনি ফিরছিলেন। এবার ফিরছিলেন খানখানান খলিলুল্লা খানের হারেমের পালকিতে। খানখানান খলিলুল্লা খান বাহাদুরের হারেমের পালকির খাতির অসাধারণ খাতির। খানখানানের বেগমকে লোকে বলে বাদশাহের 'নাস্তা'। সকালের খানা। শাহজাদা দারাসিকো শাহজাদী জাহানআরা বাপের এই অনাচারের প্রতিবাদ করতে পারেন না কিন্তু তাঁর উপর তাঁরা বিরূপ বিরক্ত। মধ্যে মধ্যে শাহজাদা দারাসিকো প্রকাশ্য দরবারে খলিলুল্লা খানের অন্তরকে কথার চাবুকে রক্তাক্ত করে দেন। সুতরাং খানখানান দারাসিকোর বিরোধী। তাঁর বাড়ির পালকি রৌশনআরা বেগমকে আসবার সময় নিয়ে আসছিল। কেল্লার ভিতরে সরাসরি রৌশনআরা বেগমের মহলের খাস কামরার দরজায় নামবার কথা।

রৌশনআরা বেগম এই ফেরার পথে ওই বানিয়া লৌণ্ডার কথা ভাবতে ভাবতে যেন কোন্ এক অথৈ দুশ্চিন্তার তুফানের মধ্যে ডুবে যেতে যেতে পালকির মধ্যেই জ্ঞান হারালেন।

শাহজাদীর সঙ্গে এসেছিল এক প্রৌঢ়া বাঁদী। বয়স পঞ্চান্নর কাছাকাছি। হাতফের হয়েছে তা পাঁচ সাতবার। শেষ এসে ঢুকেছিল বাদশাহী হারেমে হজরত মমতাজমহল বেগমসাহেবার কাছে। সেও কম দিন হল না। রৌশনআরার জন্মের আগে। রৌশনআরার জন্মের পর থেকেই তাকে রৌশনআরার খেদমতে নিযুক্ত করা হয়েছে। বুরহানপুরে জন্ম শাহজাদীর, জন্মের ঠিক পরদিন থেকেই বেগমসাহেবা আমিনাকে ডেকে মেয়ের ভার দিয়েছিলেন। আরও দুজন বাঁদী ছিল—তারা কেউ আর জীবিত নেই। সেই ছিল সকলের ছোট—সে আজও আছে এবং রৌশনআরার সকল কিছু ভালোতে মন্দতে আজকের প্রায় চল্লিশ বছরের শাহজাদীকে সেই ছোট মেয়ের মতই বুক দিয়ে আগলে রাখে। অন্ততঃ রাখতে চায়।

শুধু তাই নয়, শাহজাদীর কাছে যা ভালো তার কাছে তাই ভালো— তাঁর কাছে যা মন্দ তার কাছে তা মন্দ। সকলে বলে শাহজাদী রৌশনআরা দিনকে রাত বললে সূর্যের দিকে তাকিয়ে তৎক্ষণাৎ আমিনা বাঁদী বলে ওঠে—রাত আলবৎ!

সংসারে একধরনের হিতৈষী আছে ভালবাসার মানুষ আছে যারা নিজের ভালমন্দ বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী পরামর্শ দিয়ে থাকে হিত করে থাকে। আমিনার ভালবাসা কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য ধরনের—সে রৌশন-আরার মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে দিয়ে ভালবাসে। হিতকামনা তার রৌশনআরার বিচারের ভালোকে ভালো বলে মন্দকে মন্দ বলে। রৌশনআরা যদি বিষের বাটি তুলে দিয়ে আমিনাকে বলেন—আমিনা, এ শরবত বহুৎ মিঠা—তুই খা। আমিনা তাই খাবে। এবং মরবার সময় আমিনা যে যন্ত্রণা অনুভব করবে তাকে যদি রৌশনআরা বলেন—এ কি আরাম আমিনা বল তো? তাহলে আমিনা সত্যিসত্যিই আরাম অনুভব করবে। শাহজাদা দারাসিকো শাহজাদী জাহানআরা তার কাছে আজ তার শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছেন। আজ সে বাদশাহী রঙমহলে শাহজাদা ঔরংজীব শাহজাদী রৌশনআরার যে গোষ্ঠী আছে তার একজন প্রধান। তার উপমা রামায়ণে কৈকেয়ীর কিঙ্করী মন্থরার সঙ্গে।

*　　　　*　　　　*

রৌশনআরা জ্ঞান হারিয়ে ভাগ্যক্রমে ঢলে পড়লেন পিছনের দিকে; এপাশে ওপাশে ঢলে পড়লে পালকির খোলা দরজার ঘেরাটোপের ঢাকা তাঁর পড়ে যাওয়া আটকাতে পারতো না। রৌশনআরা ঢলে পড়লেন—তাতে পালকির পিছন দিকের দেওয়ালের কিংখাব ঢাকা কাঠে তাঁর মাথায় ধাক্কা লেগে গোটা পালকিটাকেই একটু ঝাঁকি দিল। আমিনা অন্যদিকে বহুদর্শিনী এবং বুদ্ধিমতী। বহু দুর্ভাগ্য সৌভাগ্যের জিন্দগী সে

দেখেছে। বাদশাহ সাজাহান যখন শাহজাদা খুরম তখন শাহজাদা তাঁর বাপ বাদশাহ জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে গোটা ভারতবর্ষ পালিয়ে বেড়িয়েছেন; সেই রাজপুতানার ধূপ আর তেতে-ওঠা বালির উপর দিয়ে, সেই দক্ষিণের জঙ্গল পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে; কোথায় থেকে কোথায়—সারা দক্ষিণে সেই কুতুবশাহী সুলতানের গোলকুণ্ডা হয়ে আবার পূর্ব-উত্তর মুখে মুল্ক উড়িষ্যা মুল্ক বাংগাল ঘুরেছেন আর পিছনে তাড়া করেছেন খানখানান মহাবৎ খাঁ। তখন আমিনা কিশোরী, কিন্তু বেগমসাহেবা মমতাজমহলের সঙ্গছাড়া হয় নি। বুদ্ধি তার অনেক। সে মৃদু ঠেলা দিয়ে শাহজাদীকে নেড়েই বুঝতে পারলে শাহজাদী জ্ঞান হারিয়েছেন। শাহজাদীরা বহুবেগমেরা এমনিভাবে জ্ঞান হারান। সে জানে। হাত দিয়ে সে বোরকার মধ্যে শাহজাদীর ঠোঁটের উপর থেকে অনুভব করে নিলে দাঁত দুপাটি শক্ত হয়ে লেগে গেছে কিনা।

হ্যাঁ, লেগেই গেছে। এ জ্ঞান ফিরতে হয়তো সময় লাগবে। হয়তো শুশ্রূষার প্রয়োজন হবে। মুখে চোখে জলের ছিটে দেওয়ার প্রয়োজন। আমিনা পালকির কাঠের দেওয়ালের গায়ে আঙুলের কয়েকটা টোকা দিয়ে সংকেত করলে। শব্দ হল টুক্ টুক্ টুক্ টুক্। একবার, দুবার; দুবারের বার পালকির বাহকেরা শরীরের তন্ত্রী দিয়ে অনুভব করলে সে শব্দ। তারা হাঁক বন্ধ করলে। আবার সংকেত দিলে আমিনা। এবার একজন সঙ্গী খোজা প্রহরী পালকির দরজার পাশে এসে দাঁড়াল, বললে—কি বলছেন?

তুমি কে? ক্যা নাম তুমহারা? খানখানানের খোজা সর্দার কি তুমি?

—হাঁ। আমার নাম হবিব।

—ঠিক হ্যায়। পালকির অন্দরে শাহ—;—জিভ কেটে আত্মসংবরণ করে আমিনা বললে—বেগমসাব বেহোঁশ হয়ে গেছেন পালকির

ভিতর। কোথাও একটু পালকি নামাতে হবে শেখজী—কিছু সেবাশুশ্রূষার দরকার।

—দেখছি।. কিন্তু তুমি আমার কাছে মিথ্যে লুকোচ্ছ। আমি জানি—

—কি জান?

—জানি পালকির অন্দরে শাহজাদী রৌশনআরা রয়েছেন।

একটু মৃদু হাসির শব্দ শুনতে পেলে আমিনা। একমুহূর্তে রাগে তার কপালের দুই রগ দপদপ করে উঠল। দাঁতে দাঁত টিপে মৃদু শব্দ করে আমিনা মনে মনে বললে—শয়তান তোর বুকে যেন আজই রাত্রে চেপে বসে জিভখানা টেনে ছিঁড়ে নেয়—হারামী খোজা কোথাকার! শাহজাদী রৌশনআরা আছেন পালকিতে তা জেনেছ তুমি—এর মাসুল দিতে হবে বেওকুফ কোথাকার!

হবিব মৃদুস্বরে বললে—পাশে কোন গাছের তলায় নামাতে বলব পালকি?

আমিনা এক মুহূর্ত চিন্তা করে নিয়ে বললে—না।

এই খোজাদের একটা গুপ্ত চরিত্র আছে—সে তার অজানা নয়। ওদের লালসা যত কদর্য সেই লালসা পূরণের ব্যর্থ প্রয়াস তার থেকে বেশী বীভৎস। এমনই গোপনতার ক্ষেত্রে এরা এর সুযোগ নেয় বা নিয়ে থাকে সে-কথা সে জানে।

—তাহলে কি করবে? শেষ পর্যন্ত কোন বিপদ ঘটলে কিন্তু আমি ঝক্কি নিতে পারব না।

—লাল কিল্লা কত দূর?

—দূর খুব বেশী নয়। দরিয়াগঞ্জের ইলাকায় চলেছি আমরা। নদীর কিনারা ধরে ধরে চলেছি, বড় সড়ক দিয়ে যাচ্ছি না। একটু ঘুর তো হবেই।

—ডাহিনা তরফ একটা আলো জ্বলছে—মনে হচ্ছে একটা বাগিচা হবে—

—ও এক কাফের যোগীকে আস্তান।

—কাফের যোগী ?

—হাঁ। কিন্তু বিবি কি পর্দা ফাঁক করে দেখছ নাকি ?

হবিবের বস্তাপচা রসিকতার কোন জবাব না দিয়েই আমিনা বললে—এই আস্তানের মধ্যেই নিয়ে চল পালকি।

* * *

—বল কি ? মহর্ষি বশিষ্ঠ এবং মহারাজ রামচন্দ্র শাহজাদাকে দর্শন দিয়েছেন ?

—হাঁ! খুদ শাহজাদা নিজের মুখে একথা পীরসাহেবকে বলেছেন—আমি শুনেছি। আমি ছিলাম সেখানে। পীরসাহেব সারমাদ বললেন—আমার সামনে বিল্‌কুল সব আঁধিয়ারা শাহজাদা—এর উত্তরে আমি তোমাকে কি বলব ? কিন্তু তুমি তোমার সামনেটা দেখতে পাচ্ছ শাহজাদা ? শাহজাদা বললেন—

আশ্রমের ভিতর কথা বলছিল একজন 'হিন্দু পণ্ডিত' আর একজন পরমাসুন্দরী যৌবনবতী মুসলমান বাঈ; দেখেই বোঝা যায় সে নর্তকী বিলাসিনী তার মুখের পানের সঙ্গে সুরভিত জর্দার খুসবয় সারা ঘরখানাকে আমোদিত করে রেখেছে।

এরা দুজনে নূতন কেউ নয়। এদের একজন সেই দিওয়ানা শায়ের সুভগ—অন্যজন তার সেই এককালের প্রিয়তমা শিরিন।

শায়ের অথবা কবি সুভগ এখন পরিব্রাজক। সেই যে আগ্রায় শাহজাদা দারাসিকোর মঞ্জিল নিগমবোধ থেকে বেরিয়ে গিয়ে আগ্রা শহরের প্রান্তভাগে কয়েকজন সশস্ত্র ব্যক্তির দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল তার থেকে কোন রকমে রক্ষা পেয়ে পদব্রজে ঘুরে বেড়াচ্ছে সারা দুনিয়া। খুঁজে বেড়াচ্ছে কোথায় শান্তি কোথায় সুখ—ধর্মই বা কি ঈশ্বরই বা কে ? কিন্তু কোন ক্রমেই সে হিন্দুত্বের এলাকার বাইরে যেতে পারছে না।

শিরিনকে সে প্রাণের চেয়েও অনেক বেশী ভালবাসে—হয়তো বা

ঈশ্বরের চেয়েও বেশী ভালবাসে (তাই তার মনে হয় মধ্যে মধ্যে) কিন্তু কিছুতেই সে তাকে জীবনে গ্রহণ করতে পারে না। বরং যে কিছুদিন বারাণসীতে তারা শাহজাদা দারাসিকোর কল্পনা অনুযায়ী একই ঘরের মধ্যে আধখানাকে মন্দির এবং আধখানাকে মসজিদ করে তুলে বাস করেছিল তারই জন্য আজও তার অনুতাপের পালা শেষ হয় না। তাদের সন্তান হয়েছিল—সে সন্তান জীবিত নেই। বিরোধ আরম্ভ হয়েছিল তাকে নিয়েই কিন্তু সে বিরোধের মীমাংসা হল না আজও। কবি সুভগ অনুভব করে সব ঝুট সমস্ত মিথ্যা। মিথ্যার পিছনেই তারা দুজনেই ছুটছে কিন্তু কিছুতেই সে মিথ্যার আঁকড়েধরা বাহুবন্ধন থেকে মুক্তি পাচ্ছে না।

শিরিনেরও ঠিক তাই। সে কিছুতেই সুভগকে তার ধর্মসম্মত স্বামী ভাবতে পারে না। যে আল্লাকে আল্লা বলে ডাকে না ঈশ্বর বলে ডাকে—যে নামাজ পড়ে না কলমা পড়ে না—যে পুতুল পূজো করে তাকে সে তার আল্লার মঞ্জুর-করা স্বামী বলে গ্রহণ করতে পারে না। সে সেই ক্ষোভেই হয়েছিল গানেওয়ালী বাঈ। সে স্বামীকে পরিত্যাগ করে নিয়েছিল নাচগানের পেশা। কিন্তু তাও তার ভাল লাগে নি। সেই জন্য সে সে-পেশাও ত্যাগ করে এসে সেবিকা হতে চেয়েছিল কোন সিদ্ধ সাধকের, ইসলামের কোন পীরের। প্রথম সে মুগ্ধ হয়েছিল সারমাদ পীরসাহেবকে দেখে। কিন্তু সে তাঁকে যে-ভাবে সর্বস্ব দিতে পেতে চেয়েছিল, রাধার সর্বস্ব সমর্পণের মত, তা সে পায় নি। চেষ্টা সে অনেক করেছিল। শিষ্যার মত পরিচারিকার মত কিঙ্করীর মত সেবা করবে সে। পীরসাহেবের গীত কণ্ঠে নিয়ে সে ঘুরে বেড়িয়েছিল প্রায় সারা হিন্দুস্তান। সেইই প্রথম শাহজাদা দারাসিকোকে শুনিয়েছিল এই আশ্চর্য সাধকের আশ্চর্য জীবনসংগীত। কিন্তু ফকীর সারমাদের অভয়চান্দকে নিয়ে মগ্নতার তুলনা ধ্যানে সমাধির সঙ্গে। কেউ বলে প্রেমমত্ততা। কেউ বলে লালসা। কেউ বলে হিন্দুদের তন্ত্রের মত কোন বিচিত্র বীভৎস পন্থা।

তবে সবাই স্বীকার করে একে অস্বীকার করা যায় না। অতিগুহ্য অতিদুর্গম দুরূহ এক ভীষণ পথ।

শিরিন তৃপ্ত হতে পারে নি। সেবিকা হয়ে, কিঙ্করী হয়ে, গুরুর সেবা করে তার তৃপ্তি হয় নি।

তার সে অতৃপ্তি পূর্ণ করেছিলেন আল্লা খুদা মেহেরবান। তার জীবন যৌবন হৃদয় মন উপচারে পূজা গ্রহণের পাত্র তাকে তিনি দিয়েছিলেন। কাশ্মীরের মেয়ে শিরিন কাশ্মীরের সুবাদার খানখানান জাফর খানের নিমন্ত্রণে গাওনা করতে এসে পেয়ে গিয়েছিল কাশ্মীরের পীর হজরত মহশীন ফানিকে। হজরত মহশীন ফানি হাউজখানা বাগিচার মধ্যে তাঁর আশ্রমে গীত গাইছিলেন। তাঁর দর্শনার্থী হয়ে শিরিন—তখন তার নাম 'নাজি', নাজি বাগিচায় প্রবেশমুখে তাঁর সে গান শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিল। এমন গীত সে কখনও শোনে নি।

হায় দিন দুনিয়ার মালিক—
তাই আমি কি জানি?
তুমিই আমার ভালবাসা—
তুমিই আবার আমার দোরে
শূন্য আঁচল পেতেছিলে—বলেছিলে
ভালবাসার তুমি ভিখারিনী!

বুকের ভিতরটা তার উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল। প্রিয়তমের মধ্যে সে ইসলামের আশীর্বাদ পেয়েছিল। আর কোন বাধা হয় নি—সে গড়িয়ে পড়ে নিজেকে সঁপে দিয়েছিল এই পরম প্রেমিক মানুষটির পায়ে।

মহশীন ফানি তার মুখখানি দুই হাতে ধরে তুলে মুগ্ধদৃষ্টির সম্মুখে এনে বলেছিলেন—তুমি কেন ভালবাসার ভিখারিনী পিয়ারী? তুমিই তো ভালবাসা। পিয়ারী, গুলাব আওর খুসবয় এই দুই কি পৃথক্?

শিরিন অথবা নাজি? নাজি। এখন থেকে সে নাজিই। নাজি

হজরত মহশীন ফানির সঙ্গে অভিন্ন। যদি দেহবাদের প্রশ্ন কেউ তোলে তাহলে সেখানেও কোন কুয়াসা নেই; একেবারে সুপ্রসন্ন ঈষদুষ্ণ বসন্তপ্রভাতের মতই উজ্জ্বল ও বর্ণাঢ্যরূপে তার উত্তর স্পষ্ট। নাজি ফুলের মালা—হজরত ফানি সুন্দর কণ্ঠ এবং প্রশস্ত বক্ষ; হজরত ফানি দুই তীর—নাজি তার মধ্যে বহমানা কলকল্লোলিনী জলস্রোত। সাধারণ মানুষ পর্যন্ত জানে। তবুও তারা বলে ওরও আড়ালে কিছু আছে। কিন্তু দেহবিলাস কিছু নয়। পার্থিব জগতে দেহধারণ করার মত, নিদ্রাঘোরে রাত্রিযাপনের মত, আহার গ্রহণের মত স্নানের মত পানের মত একটা বাহ্য ক্রিয়া মাত্র। সাধারণ মানুষ এর ভিতরের গভীর তত্ত্ব বুঝতেও পারে না আবার অস্বীকারও করতে পারে না। এর আভাসকে তারা বিহ্বল হয়ে চিন্তা করে মাত্র। কখনও তর্কের মুখে উত্তেজনাবশে চরম ঘৃণায় মুখ বিকৃত করে, কখনও সসম্ভ্রম বিস্ময়ে বলে—এ এক মহাতত্ত্ব। উলঙ্গ সত্য। ও নাঙ্গা ফকীর সারমাদের মত। হিন্দুস্তানের যোগীদের মত। শিরিন বলে আমি তত্ত্ব জানি না, সত্য বুঝি। আমি তৃপ্তি পেয়েছি। হজরত বলেছেন আবার আমি আমার পিয়ার আমার মাসুক কবি সুভগকে পাব। আমি তা বিশ্বাস করি।

সেই নাজি আজ বিচিত্রভাবে দূর কাশ্মীর থেকে এই সাজাহানাবাদের ওই কবি সুভগের আশ্রমে এসেছে। কথাবার্তা হচ্ছে তাদেরই মধ্যে।

আজ আর দুজনের মধ্যে কোন বিরোধ নেই কোন বেদনার দরিয়া নেই; তুমি সুখী কবি সুভগ—আমি শিরিন আমিও সুখী। একটা নদীর দুই পারে আমরা রয়েছি—থাকি না কেন? মেনে নিই না কেন? ভালবাসতে মন চায়—দেহ দেহকে চায় মন মনকে চায়—তোমাকে আমি চাই আমাকে তুমি চাও এ সত্য কথা। এ মানি।

শাহ্‌জাদা দারাসিকো তার উপর সেতু বাঁধবেন।

নাজি, না আজ সে নাজি নয় আজ সে শিরিন। দিল্লীতে সুভগের আস্তানায় যে বসে আছে সে আজ শিরিন। সে কাশ্মীর থেকে দিল্লীতে এসেছে কাশ্মীরের যুবরাজ মেদিনী সিংহের সঙ্গে। শ্রীনগরের মহারাজা পৃথ্বীচাঁদের প্রতিভূ হয়ে এসেছে শাহজাদা দারাসিকোর আশ্বাস পেয়ে। হজরত মহশীন ফানি শাহজাদাকে বলেন খুদার অনুগ্রহভাজন মহাপুরুষ। দোস্তের মত প্রীতির চক্ষে দেখেন। মহশীন ফানিই নাজিকে পাঠিয়েছেন তাঁকে কতকগুলি অনুরোধ জানিয়ে। মেদিনী সিংহের প্রার্থনা পূর্ণ করার অনুরোধই প্রধান অনুরোধ। বাদশাহী ফৌজ কাশ্মীরে এসে ঢুকেছে। খানখানান খলিলুল্লা খাঁ পাহাড়ী রাজা সৌভাগ্যপ্রকাশ আর কুমাউনের বাহাদুর চাঁদকে নিয়ে দূরে ডেরা পত্তন করে শ্রীনগর এবং কাশ্মীরে হানা দিয়েছে।

মহারাজা পৃথ্বী সিংহের পুত্র এসেছে নজরানা নিয়ে আর্জি দরখাস্ত নিয়ে মহামান্য বাদশাহের দরবারে; তার সঙ্গে মহশীন ফানি পাঠিয়েছেন নাজিকে; তার মারফত বলে পাঠিয়েছেন—"হিন্দুস্তানের শাহজাদা দারাসিকো, তোমাকে হিন্দুদের আদর্শ রাজা হিন্দুদের ঈশ্বরের অবতার রাজা রামচন্দ্র এবং তাঁর গুরু মহর্ষি বশিষ্ঠ স্বপ্নে দেখা দিয়েছেন। এ কথা আমি জানি শাহজাদা শাহবুলন্দ ইকবাল! আমি জানি তুমি এমন এক বাদশাহীর স্বপ্ন দেখ যে বাদশাহীতে ধর্ম নিয়ে কোন বাধা থাকবে না, কোন বিরোধ থাকবে না। রাজা রামচন্দ্র অবতার ছিলেন—তবুও তাঁর রাজ্যে প্রজারা তাঁর হৃদয়ের দুঃখ বোঝে নি। তোমার বাদশাহীতে শাহজাদা দারাসিকো, তামাম হিন্দু মুসলমান গরীবান দৌলতওয়ালা গৃহস্থী সব কোই লোক তোমার জন্যে তাদের জান কুরবানির জন্যে ব্যাকুল হয়ে থাকবে। শাহবুলন্দ ইকবাল, আজ মহারানা পৃথ্বী সিংহের বড়ছেলে মেদিনী সিংহ জীউকে পাঠালেন রাজাসাহেব তোমার কাছে। কাশ্মীর শ্রীনগর এবং তার এলাকার মধ্যে হিন্দু মুসলমান সুখে বাস করে। রাজাসাহেব বাদশাহকেই তামাম হিন্দুস্তানের মালিক শাহানশাহ

বলে মানে। খানখানান খলিলুল্লার মত গোঁড়া মুসলমানেরা উজীর-এ-আজম খান-ই-খানান সাদুল্লা খান বাহাদুরের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে স্রিফ কাশ্মীর শ্রীনগরের সোনার খনির জন্যে কাশ্মীরকে ছিনিয়ে নিতে চাচ্ছে। শাহজাদা, রাজা দশরথের কাছে রামচন্দ্র যত প্রিয় ছিলেন তার থেকেও তুমি শাহানশাহ সাজাহানের কাছে অধিক প্রিয়। আমি জানি—আল্লাহতায়লার এই গরীব খাদেম একান্ত গুণহীন সেবক হিসাবেই আমি জানি, খুদ বাদশাহ তোমাকে বলেছেন—'বেটা—আমার কলেজার তুল্য প্রিয়তম পুত্র মহম্মদ দারাসিকো, আমি জানি তুমি খুদার অনুগৃহীত একজন মহাত্মা। তুমি আমার জ্যেষ্ঠপুত্র এ আমার অসীম সৌভাগ্য। আজ থেকে দরবারের সময় আমার ডানদিকে এই সোনার তক্তের উপর বসবে; সারা হিন্দুস্তানে চাঘতাই সরকার থেকে যাই করা হবে তা তোমার অগোচর থাকবে না। তোমার সঙ্গে সল্লা পরামর্শ না করে কোন কাজ করা হবে না।' দিল্লী দরবারের সারা ওমরাহীর উপর এই হুকুমৎ তিনি জারি করেছেন।

উজীর সাদুল্লা খাঁ খানখানান খলিলুল্লা দক্ষিণে শাহজাদা ঔরংজীব এরা এতে বিরক্ত তাও জানি। কিন্তু হোক বিরক্ত—এরা শয়তানের সহচর, এদের সে তাগৎ নেই যে খুদার মর্জিকে রুখতে পারে—ইচ্ছাতে বাধা দিতে পারে। তুমি রামচন্দ্রের মতই দয়ালু। গরীবপরবর। একাধারে তুমি ইসলামের নতুন দিনের পয়গম্বর, অন্যদিকে তুমি হিন্দুদের কাছে অবতার বলে গণ্য হবে।

এ মুল্কের তামাম লোক জানে জৌনপুরের খান-ই-খানান আমীর-উল-উমরা মুতাক্কিদ খানসাহেবের মত এত বড় একজন মানী আমীর বাদশাহী সরকারের সঙ্গে বেতমিজি করে তার মনসব হারিয়ে আজ আট আট বছর স্রিফ ঘরের মধ্যে ঢুকে বসেছিল আর খুদাকে ডাকছিল বলছিল—এ জিন্দগীর খতম করো মেহেরবান। ইজ্জত যাবার পর এ জানের এ জিন্দগীর কি দাম কি কিস্মৎ! আমি জানি শাহজাদা এই ওমরাহ যার মাথার চুল দাড়ি গোঁফ বিলকুল সফেদ হয়ে গেছে

তার দুঃখ কলেজার উত্তাপ তোমার কোমল হৃদয়কে বিচলিত করেছিল। আট বছর পর তুমিই শাহানশাহ বাদশাহের কাছে দুনিয়ার সব হিসাব চুকানেবালা এই বৃদ্ধ আমীরের বুকের এই দর্দ দিলের এই তাপ জুড়িয়ে দেবার জন্যে আর্জি পেশ করেছিলে এবং মেহেরবান বাদশাহ সে মেহেরবানি করেছেন। শাহবুলন্দ ইকবালের আর্জি মঞ্জুর করে তার মনসব ফিরিয়ে দেবার হুকুম দিয়েছেন—পাঁচ হাজার জাঠ আর চার হাজার সওয়ারের মনসব ফিরে পেয়ে দুই হাত তুলে বলেছে—শাহবুলন্দ ইকবাল শাহাজাদা দারাসিকো জিন্দাবাদ।

এমন কি—জিহন আলি খাঁ আফগান সর্দার মালিক জিহন খাঁর মত যে আদমী পাওয়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত খ্রিক বদমাশি আর গুণ্ডাবাজির মতলবে মতলববাজ তার প্রতিও তোমার মেহেরবানির কার্পণ্য নেই। সারা হিন্দুস্থান জানে তুমি তাকে দিল্লী কোতওয়ালীর কোতলখানা থেকে বাঁচিয়ে দেশে ফিরে পাঠিয়েছ। বাদশাহের কাজী তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছিল। কোতওয়ালীর কয়েদখানায় সে মরণের দিন গুণছিল। তোমার দিল তার মত বদমাশের জন্যও দর্দ অনুভব করেছিল। শাহজাদা তোমাকে আমি এক গুহ্যকথা জানাই।”

* * *

শিরিন আশ্চর্য রূপসী হয়েছে।

যত তার রূপ হয়েছে অসামান্য তত আশ্চর্য একটি রহস্যময়তা তাকে আশ্রয় করেছে। তার প্রকাশ রয়েছে যেমন তার রূপে তেমনি তার কথায়বার্তায় হাবেভাবে সব কিছুতে।

কবি সুভগ—; না সুভগ আর কবি সুভগ নয় সে-পরিব্রাজক সুভগ। পরিব্রাজক সুভগ বিস্মিত হয়ে শুনছিল শিরিনের কথা।

শিরিন বললে—মেরি পিয়ার মেরি মাসুক! আশ্চর্য হাসি হেসে শিরিন বললে—দেখ কি আশ্চর্য কথা দেখ—আজ তোমাকে আবার আমার পিয়ার বলে মাসুক বলে ডাকতে ইচ্ছে হচ্ছে; আমার দিলের

মধ্যে তোলপাড় চলেছে একটা। হজরত ফানি জাহু জানেন সুভগ—উনি তিন-কালকে জানেন। দেওয়ালের এপাশ থেকে ওপাশে কি হচ্ছে দেখতে পান। তোমার কলেজার কথা তাঁর অজানা নেই।

কবি সুভগ বললে—তা হলে তিনি ত্রিকালজ্ঞ এবং সর্বজ্ঞ দুইই?

—হ্যাঁ সুভগ। তিনি দুইই। হজরত শেখ নাজিরের কথা তো শুনেছ?

—শুনেছি। হজরত নাজির যখন নামাজ পড়তেন তখন কালো চুল সাদা হয়ে যেত। কখনও কখনও তাঁর মাথা দেহ থেকে আলাদা হয়ে অনেক দূর আকাশে উঠে আজান দিত।

—হাঁ হাঁ। তাঁর মরজিতে পানির গেলাসের ভিতর থেকে কবুতর উড়ে যেত। হজরত ফানি তেমনি সিদ্ধপুরুষ। তাঁর কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য মেরি পিয়ার মেরি মাসুক!

চমকে উঠল সুভগ। এতকাল পর এসব কি বলছে শিরিন?

শিরিন একটা গাঢ় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—আমাকে হজরত বলেছিলেন পিয়ার—বলেছিলেন—তোমাকে পাঠাচ্ছি শিরিন—পাঠাচ্ছি—দুনিয়ার হাওয়ার বদল হয়েছে। সেই হাওয়াতে খবর এসেছে শিরিনের সময় হয়েছে সুভগের কাছে যাবার। সুভগ, আমি হজরতকে জিজ্ঞাসা করলাম—কি বলছেন হজরত, আমার সমঝএর মধ্যে যে আসছে না। তা হজরত বললেন—পুরা সমঝাতে এখান থেকে পারবে না শিরিন। দিল্লীতে সাজাহানাবাদে যাও তুমি—শাহজাদা দারাসিকোর কাছে যাও আমার এই চিঠ্‌ঠি নিয়ে। এ চিঠ্‌ঠিতে আমি শাহজাদাকে যুবরাজ মেদিনী সিংহকে নিয়ে শাহানশাহ বাদশাহের কাছে হাজির করতে অনুরোধ করেছি। আর সঙ্গে সঙ্গে শাহজাদাকে এও লিখেছি যে এই যে চিঠ্‌ঠি নিয়ে চলল মেরি খত পঁহুছানেবালি শিরিন—এ তোমার সেই শিরিন যাকে তুমি কবরস্তানে পাঠিয়ে ফের তাকে ভুলে [illegible] শায়ের

সুভগের সঙ্গে মিলিয়ে নয়ি দুনিয়া নয়া জিন্দিগী তৈয়ার করতে চেয়েছিলে—যাদের ঘরের আঙিনার মধ্যে মসজেদ আর মন্দিরে এক করে দিতে চেয়েছিলে— কিন্তু কবি সুভগও স্বীকার করতে পারে নি, শিরিনও না। শিরিন ইসলামকে জড়িয়ে ধরে হয়েছিল তয়ফাবালী। শাহজাদা, কসবী হতেও তার আপত্তি ছিল না তখন কিন্তু আপত্তি ছিল একজন কাফেরকে—যে জাত পালটায় নি এমন কাফেরকে তার খসম বলে মেনে নিতে। সেই শিরিনকে আমার খত নিয়ে তোমার কাছে পাঠাচ্ছি। হাওয়া বদল হয়েছে শাহবুলন্দ ইকবাল। আমি বুঝতে পারছি একটা হাওয়া বদল হয়েছে। তুমি তো নিশ্চয় জান। তুমি মেদিনী সিংকে বাদশাহের কাছে দাখিল করো। বাঁচিয়ো। তুমি দেখবে শিরিনের হঠাৎ দেখা হবে সুভগের সঙ্গে এবং দুজনেই দুজনের জন্যে ব্যাকুল হবে।

একসঙ্গে এতগুলি কথা বলে শিরিন সুভগের দিকে তাকিয়ে নীরব হল। তার নিষ্পলক চোখে বিচিত্র দৃষ্টি। সুভগও তার দিকে তাকিয়ে অনুভব করছিল তার সারা অন্তরলোকটা সমুদ্রের মত উথালপাতাল করে উঠছে। অথবা কাশ্মীর উপত্যকায় একদা শীতের রাত্রে অকস্মাৎ বাতাসের তীক্ষ্ণহিম জলকণাগুলি জমে শ্বেতশুভ্র তুষারপুষ্পের মত ঝরঝর করে ঝরে পড়ছে।

সুভগ বললে—শিরিন, তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি আবার পারছি না।

শিরিন বললে—সুভগ, তুমি কি আমার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করছ না? যে শিরিনকে তুমি ধর্মের জন্যে ছেড়ে চলে গিয়েছিলে—যার কোন আকর্ষণই ছিল না তোমার কাছে তাকে কি আজ নতুন করে পেতে ইচ্ছে করছে না? তার প্রতিটি অঙ্গের জন্য তোমার দেহের প্রতিটি অঙ্গ প্রতি রোমকূপ প্রতি রোমকূপের জন্ম লালায়িত হচ্ছে না? বুঝতে পারছ না হাওয়া বদলের কথা?

—হাওয়া বদল? জানি না শিরিন। তবে হ্যাঁ এতকাল পর

এতদিনের দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর আমার বুকে তোমার জন্য নতুন ক'রে বাসনা জেগেছে। তোমাকে পেতে ইচ্ছে হচ্ছে। সে ইচ্ছা সে অভিলাষ দরিয়ার তুফানের মতই অস্থির—অথবা আঁধির মত। কিন্তু সে তো হয়। হয়ে থাকে। হ্যাঁ, ওই বিচিত্র ফকীর ইহুদীবংশের ছেলে আজ সাজাহানাবাদের চৌকে চৌমাথায় নাঙ্গা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এও সত্যি শিরিন যে নাঙ্গা ফকীর এক বানিয়া লৌণ্ডার মহব্বতিতে পাগল। সে বলে—আমার খোদা অভয়চান্দ না আর কেউ একথা আমি জানি না। এ সব সত্যি। কিন্তু—

—কিন্তু কি বল আমার পিয়ার আমার মাস্তুক!

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সুভগ বললে—শাহজাদা দারাসিকোকে বাদশাহ সাজাহান তাঁর ডাহানা তরফ সোনার তক্তের উপর বসিয়েছেন এ কথা হজরত ফানি আগেই জেনেছিলেন?

—হ্যাঁ সুভগ। আমাকে তিনি বলেছিলেন সে কথা। তারপর হজরত শাহমুল্লার এক মুরীদ এসে বলে গেল শাহজাদা হজরত মুল্লাকে লিখেছেন—বাদশাহ আর আমাকে জিজ্ঞাসা না করে কোন কাজ করবেন না। আমাকে ডেকে হজরত ফানি বললেন—শোন পিয়ারা এ কথা তোমাকে বলেছিলাম না? আমি তাঁর পায়ে গড়িয়ে পড়লাম। তিনি সমাদর করে আমাকে দু'হাতে জড়িয়ে তুলে নিলেন।

সুভগ একটু চুপ করে থেকে যেন হঠাৎ প্রশ্ন করলে—শিরিন?

—বল।

—শিরিন, গুলাবেরই হোক আর চামেলী বেলারই হোক মালা যখন একজনের বুকে ওঠে তখন তার মধ্যে যে খুসবয় আর জলুস আর কোমল স্পর্শ থাকে তা কি দুসরা জনের গলায় ওঠবার সময় বজায় থাকে?

—সুভগ!

—শিরিন!

—হজরত ফানিকে এ কথা আমিই জিজ্ঞাসা করেছিলাম সুভগ। যখন হজরত সারমাদের বাঁদীগিরি করেও তাঁকে ছুঁতে পেলাম না তখন হলাম তয়ফাবালী—নাম নিলাম নাজি। কাশ্মীর গেলাম সুবাদার জাফর খানের বায়না নিয়ে গাওনা করতে। ফেরবার পথে দর্শন পেলাম হজরত মহশীন ফানির। সে কাশ্মীরের দু'পহর বেলা। হজরতের হাউজখানা আশ্রমের মধ্যে আশ্চর্য ফুলের বাহার—একলা বসে আছেন হজরত—পরম কান্তিমান পুরুষ—দেখবামাত্র আমার মনে হল হজরতের ভিতর থেকে আরও কিছু বা কেউ যেন উঁকি মারছে। একবার মনে হল সে তুমি। তুমি হাসছ সুভগ?

—হাসছি! হ্যাঁ হাসছি। মনের খেলা এমনই বিচিত্রই বটে শিরিন তাই হাসছি। মন এমনই করেই মিল যেখানে চায় সেখানে আবিষ্কার করে নেয়।

—আশ্চর্য সুভগ! কি আশ্চর্য বল তো?

—কি আশ্চর্য শিরিন?

—হজরত ফানি সে-দিন ঠিক এই কথাগুলিই বলেছিলেন আমাকে।

—কি বলছ? শিরিন? ইয়ে তুম ক্যা বোলতি হ্যায়? ইয়ে সচ্ হ্যায়?

—সচ্ হ্যায় সুভগ! খুদা কসম! পরম্‌আত্‌মা দোহাই!

অনেকক্ষণ স্তব্ধ স্তম্ভিত হয়ে একদৃষ্টে সুভগ তাকিয়ে রইল শিরিনের দিকে। তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—বল শিরিন, অবিকল কথাগুলি কি ভাবে বলেছিলেন আর কেন বলেছিলেন?

স্থির দৃষ্টি তার চোখের দিকে রেখে শিরিন প্রদীপ্ত হয়ে উঠল, বললে—আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখছিলাম—মনে হচ্ছিল হজরতের ভিতর থেকে যে আর একজন উঁকি মারছে সে তুমি। আমার দৃষ্টির সেই বিস্ময় দেখে হজরত বলেছিলেন—কি দেখছ তুমি

নওজোওয়ানী? আমি বললাম—হজরত, আমি আমার পিয়ার আমার মাসুক আমার খসম—যাকে আমি খসম বলেই মেনে নিয়েছিলাম তাকে যেন দেখতে পাচ্ছি আপনার মধ্যে। কেন পাচ্ছি হজরত? হজরত তোমারই মত হেসেছিলেন আর বলেছিলেন—এ তুনিয়াতে মনের খেলা এমন বিচিত্রই বটে শিরিন। মন, এমনই করেই, মিল যেখানে চায়, সেখানে আবিষ্কার করে। তাই হাসছি। সুভগ, আমি হজরতের পায়ের উপর গড়িয়ে পড়েছিলাম। হজরত ফানি তাঁর সেই হাতীর শুঁড়ের মত নমনীয় অথচ সবল তুখানি হাত দিয়ে আমাকে ধরে তুলে বুকে জড়িয়ে নিষ্পেষিত করেছিলেন। আমার মুখ চুমায় ভরে দিয়েছিলেন। বিশ্বাস কর সুভগ তখন আমি নিজেকে অপরাধিনী বোধ করে বলেছিলমাম—হজরত, আমি উচ্ছিষ্টা, আমি অশুচি। যে ফুলের মালা পিয়ারের গলায় কি হজরতের গলায় ওঠে তার সে পবিত্রতা আমার নেই—আমার খুসবয় বাসী হয়ে এসেছে—আমার রঙ মলিন হয়েছে—সব থেকে লজ্জা আমি অন্যজনের বুকে উঠে দলিত হয়েছি। আমাকে ছেঁড়া মালার মত ধূলায় ফেলে দিন হজরত। আমি আমার চোখের জল ধুলোয় মিশিয়ে লজ্জার হাত থেকে বাঁচি। সুভগ—।

বলতে গিয়ে থেমে গেল শিরিন।

সুভগ বললে—শিরিন—

—বিশ্বাস করো যেন আমার কথা।

—আমার মধ্যে থেকে কি অবিশ্বাস উঁকি মারছে শিরিন?

—মারছে সুভগ। একটা যেন বাঁকা হাসির আভাসের চেহারা তোমার ঠোঁটে দিগন্তে বিদ্যুচ্চমকের মত চমকে উঠছে। বিশ্বাস হল আগুনের মত। যতক্ষণ জ্বলে ততক্ষণ সে তেজ, নিভে গেলে যা পড়ে থাকে তা কয়লা—ছাই। বিশ্বাসের মধ্যে মানুষ বেশীক্ষণ জ্বলতে পারে না সুভগ, কয়লা হয়ে বেঁচে থাকার মধ্যেই সে পরিত্রাণ খোঁজে। অথচ বিশ্বাসে যে স্থিত হয়ে যায় সে দেখে তাই সত্য হয়ে যায়, আবার

যা সত্য তাকেই সে দেখে—অসত্যকে মিথ্যাকে সে দেখে না। হুজরত আমার বুকে ওই বিশ্বাসের নিরন্তর দহনকে জ্বেলে দিয়েছেন। তাই হজরত ফানি যখন মালার মত তাঁর কণ্ঠে ধারণ করেছেন তখন তিনি তুমি হয়ে গিয়েছেন সুভগ—।

অবাক বিস্ময়ে সুভগ তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

শিরিন বললে—বল তো সুভগ, তুমি কি এ কয় বছরের মধ্যে আশ্চর্যভাবে বেহোঁশ হয়ে যেতে না? এবং সেই অবস্থার মধ্যে মনে হত না যে তুমি আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরেছ?

সুভগ চঞ্চল হয়ে উঠল, বললে—এ কথা কি হজরত ফানি বলেছেন?

—তিনি বলেছেন। এবং আমি যে অনুভব করেছি সুভগ। আমি বার বার তোমার বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চেয়েছি কিন্তু পারি নি। তুমি আমাকে বলেছ, চল তাহলে বিচারকের কাছে চল। কাজী নয় মোল্লা নয় পুরুত নয় পণ্ডিত নয়—চল তোমাকে নিয়ে যাই আশ্চর্য পবিত্র বিচারালয়ে। তুমি আমার হাত ধরে নিয়ে গেছ এক আশ্চর্য উজ্জ্বল মণিময় দরবারে—সেখানে আমি দেখেছি পাশাপাশি মণিময় মসনদে বসে আছেন তুই দেবকান্তি বাদশাহ। না, সুভগ, একজন বাদশাহ না, মহারাজা মহারাজাধিরাজ মাথায় হীরা জহরত মতির মালা জড়ানো শিরপেঁচ, কাঁধে ধনুর্বাণ, অন্যজন শাহজাদা, ইসলামধর্মাবলম্বী বাদশাহের পুত্র; সুভগ, তিনি শাহ-ই-বুলন্দ ইকবাল মহম্মদ দারাসিকো; আর ওই মহারাজাধিরাজ হলেন রঘুপতি রাঘব রাজা মহারাজাধিরাজ রামচন্দ্র। আর তাঁদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন একজন দিব্যকান্তি বৃদ্ধ; কাঁচা সোনার মত গায়ের বর্ণ; মাথায় সাদা রেশমের মত লম্বা চুল—নাভি পর্যন্ত নেমেছে শ্বেতশুভ্র কোমল একরাশি দাড়ি। তিনি ধরে আছেন একখানি সোনার থালা। তার উপরে রয়েছে লাড্ডু মিঠাই। মহারাজাধিরাজ রামচন্দ্র আর শাহ-বুলন্দ ইকবাল তুজনেই সে মিঠাই তুলে নিয়ে খাচ্ছেন আর হাসছেন।

সুভগের দুই চোখ থেকে জল বেরিয়ে তার গাল বেয়ে মাটিতে ঝরে পড়তে লাগল।

শিরিন তার সেই অশ্রুপ্লাবিত মুখের দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল। আবেগে তারও বুক তোলপাড় করে উঠল। তারও দুই চোখ অকস্মাৎ একমুহূর্তে জলে ভরে গেল। কয়েক মুহূর্ত পর আত্মসংবরণ করে সে বললে—আমি তোমাকে মিথ্যা বলি নি সুভগ। বিশ্বাস কর!

সুভগ অকস্মাৎ থরথর করে যেন কেঁপে উঠল, বললে—আমি জানি—আমি জানি শিরিন—আমি জানি!

—সুভগ!

—আমিও যে দেখেছি। দিনের আলোতে দেখার মতই দেখেছি। শিরিন. মধ্যে মধ্যে আমার বাইরের চেতনা হারায়—আমি মৃগীরোগীর মত পড়ে থাকি। দীর্ঘক্ষণ। তারই মধ্যে এ সব আমি দিনের আলোর মত দেখেছি।

—সুভগ! সুভগ! আমার জন্মজন্মান্তরের স্বামী—আমার প্রিয়তম—

* * *

পাশের কামরায় যাবার জন্য একটা দরজা ছিল মাঝের দেওয়ালে। সে দরজাটা খুলে গেল। শুধু খুলে গেল না—সশব্দে খুলে গেল। এবং সেই খোলা দরজায় বোরকাপরা একজন মহিলা দাঁড়িয়ে তীব্র-কণ্ঠে বললে—ঝুট! ঝুট! বিলকুল ঝুট হ্যায়। তুম কাফের তুম কাফের—

পিছন থেকে আর একজন বোরকাপরা মহিলা এসে তাকে জড়িয়ে ধরে বললে—নেহি! নেহি! অর্থাৎ, না—না—না! চলে এস—তুমি চলে এস। হোঁশ করো—।

তার মুখের আবরণটা সরে গেল।

সবিস্ময়ে নাজি বা শিরিন বললে—আমিনা! তুমি আমিনা নও?

মুহূর্তে মুখ ঢেকে নিয়ে বাঁদী বললে—নেহি; আমার নাম খাদিজা। আমি দরিয়াগঞ্জের গৃহস্থী ঘরের জেনানী। ফকীর সারমাদের দরবারে গিয়েছিলাম আমার এই বেটীর বেমারীর জন্যে। মাঝে মাঝে এর কি যে হয় কেউ ধরতে পারে না। হকিম না কবিরাজ না ওঝা না। আবোলতাবোল বকে। ফিরছিলাম ফকীরসাহেবের আস্তান থেকে—পথে বেটী আমার হোঁশ হারালে। তাই তোমাদের এই আস্তানায় দাঁড়িয়েছিলাম একটুখানি। জ্ঞান ফিরেছে তবে এখনও ঠিক সুস্থ হয় নি। তা হোক আমরা এবার চলে যাচ্ছি। তোমরা কিছু মনে করো না।

—পণ্ডিতজী, এই নাও কিছু প্রণামী। বলে একটা আশরফি সে বের করে দিতে গেল।

বোরকাবৃতা রৌশনআরা বললেন—পহেলে মুঝে হিঁয়াসে চলা যানে দে। পিছে দে বকশিস!

রৌশনআরা পিছন ফিরলেন। এবং ধীর পদক্ষেপে ওদিকের দরজা দিয়ে ওপাশের বারান্দায় অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

পঁয়তাল্লিশ

মঝ্‌লি শাহজাদী! মঝ্‌লি শাহজাদী! বেটী রওশনআরা! ঠহর যাও।—পিছন থেকে শঙ্কিত উৎকণ্ঠিত কণ্ঠস্বরে বলে উঠল নাদিরা দাই অর্থাৎ ধাত্রীবাঁদী। তার ভয় হচ্ছিল যে, রৌশনআরা বেগম হয়তো পয়দল অর্থাৎ পায়ে হেঁটেই বেরিয়ে পড়বে এই সাধুর আস্তানা থেকে। শিরিনকে সে চিনেছে। সুভগকে সে চেনে না—দেখে নি কখনও, তবু কথাবার্তার আঁচ থেকে আন্দাজ করে নিয়েছে যে এই সেই কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ কবি যে বাদশাহের "কালো পাখীটি উড়ে গেল" হেঁয়ালির সমস্যা পূরণ করে গজল বানিয়ে শাহী ইনাম লাভ করেছিল। এই শিরিনই গোপনে তাকে সমস্যাপূরণের খবর যুগিয়েছিল। এবং এই হিন্দু কবি আর হিন্দু থেকে মুসলমান হওয়া এই বাঁদী নিয়ে শাহজাদা দারসিকো যা করেছেন সে এক স্বয়ং খুদাতায়লা ছাড়া আর কেউ করে নি। বাবা আদম আর ইভের মত এই কাফের আর মুসলমান-ধর্ম-নেওয়া এই বাঁদীকে এক দুনিয়া গড়ে দিতে চেষ্টা করেছিলেন—'বানারসে'। হিন্দু এলাকায়। খাস হিন্দু এলাকা। নামেই চাঘতাই বংশের বাদশাহী। না-হলে আকাশ ঠেলে উঠে রয়েছে কাফেরদের মন্দির, দিনরাত্রি সেখানে বাজে কাঁসর আর ঘণ্টা।

আমিনার মনের মধ্যে চিন্তার ঝড় বয়ে চলেছিল। বাঁদী শিরিন আর ওই হিন্দু সন্তের এখানে এসে তাদের কথা শুনতে শুনতে যা ঘটল তার জন্য সে প্রস্তুত ছিল না। সারমাদ ফকীরের ওখানে অজ্ঞান অবস্থায় ভয়ের মধ্যে হিন্দু লৌণ্ডা অভয়চাঁদের মুখে "রক্তবন্যায় দুটি মুণ্ড ভেসে যাওয়া"র কথা শুনে চঞ্চল হয়ে উঠেছিল সে। তার সঙ্গে রৌশনআরাও। রৌশনআরা প্রায় পালিয়ে এসে পালকিতে উঠেছিল। এবং পথে পালকির মধ্যেই অজ্ঞান হয়ে ঢলে পড়েছিল। বহুদর্শিনী আমিনা ছিল পাশে। সে বুঝতে পেরেছিল। রৌশনআরাকে সুস্থ করে তুলবার জন্য পথের ধারে যমুনাকিনারায় এই আস্তানটি

পেয়ে সে যেন বেঁচে গিয়েছিল। দুরন্ত ভয় ছিল কোথায় কোন্ আমীর বা গুণ্ডা বদমাশেরা কি বাদাকশানী কালাপোষ* বা তুর্কী সিপাহীরা হেঁকে বসবে—কার পালকি? কোথায় যাবে? এবং টানাহেঁচড়ার মধ্যে সব ফাঁস হয়ে যাবে। বেইজ্জতির আর শেষ থাকবে না। বাদশাহের সামনে জাহানআরা বেগমের চোখ মুখ লাল হয়ে উঠবে দুরন্ত ক্রোধে; তীক্ষ্ণ চীৎকার করে রৌশনআরাকে তিরস্কার করে বলবে—মুঘল বাদশাহীর কোহিনূর তাজ আর ময়ূরতক্তের গৌরবকে শাহজাদী হয়ে পথের ধুলোয় লুটিয়ে দিয়ে এলে। তুমি বেশরমী—তোমার শরম নাই ইজ্জতবোধ নাই। তুমি কোন্ এক অপরিচ্ছন্ন—হয়তো কোন ব্যাধিগ্রস্ত গৃহস্থী ঔরতের বোরকা কিংবা কোন বাঁদীর বোরকা পরে পয়দলে বেরিয়েছিলে এই শহর সাজাহানাবাদের পথে পথে। লোকে জনে কিস্সার আর বাকী রাখবে না।

হয়তো এরই মধ্যে শাহজাদা দারাসিকোর ফিস-ফিস কথা জাহানআরা বেগমের কানে ভেসে আসবে—শাহজাদী রৌশনআরা আর শাহজাদা ঔরংজীব নাকি গোঁড়া সুন্নী। তারা কোন গুনাহের কাম করে না। শাহজাদী রৌশনআরা তবু ফিরিঙ্গীদের দেশের সরাব পান করে, ঔরংজীব কখনও ছোঁয় না। শোনা যাচ্ছে আমাদের মৌসীর সন্তান—মেসোর এক হিন্দু বেগম হীরাবাঈকে নিকা করে সরাবে নাকি ডুবে আছে। হীরাবাঈ নাকি সরাবের পেয়ালা তুলে ধরে মুখের কাছে আর ঔরংজীব সে পেয়ালা শেষ করে খেয়ে নেয়।

রৌশনআরার আর সহ্য হবে না—সে সম্ভবত চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবে। শাহজাদীরা, বড় বড় উমরাহ ঘরের মেয়েরা এ পারে। তারপর একটা লাঞ্ছনা হয়ে রৌশনআরা পরিত্রাণ পাবে। কারণ সে বাদশাজাদী—তার কিস্সা যথাসম্ভব চাপাই দেওয়া হবে। কিন্তু তার কি হবে? আমিনার? সে তো বাদশাই

* কালাপোষ—মিলিটারী পুলিস জাতীয় পাহারাদার।

ঘরের বাঁদী। এসেছিল আফগান মুল্ক থেকে; দশ বারো বছর বয়সে তার গরীব বাপ মা তাকে বেচে দিয়েছিল গোলাম কারবারীদের কাছে। তারা হাট ঘুরে ঘুরে এসেছিল দিল্লী। এখানে তাকে কিনেছিল বাদশাহের লোক। তখন বাদশাহী তক্তে তক্তনসীন ছিলেন শাহানশাহ জাঁহাগীর গাজী। তখন বাদশাহ জাঁহাগীর গাজীর জিন্দগী একেবারে মৌরস বন্দ্‌বস্ত হয়ে গেছে। মির্জা ঘিয়াসের বেটী মেহের উন্নিসা বিবি তখন নূরজাহান বেগমসাহেবা হয়েছেন। বাদশাহী মোহর সিক্কার উপর নূরজাহান বেগমের ছাপ উঠেছে। নূরজাহান বেগমের প্রথম স্বামী শের আফগানের বেটীর সঙ্গে শাহজাদা শাহরিয়ারের সাদি হয়েছিল। বাদশাহ জাঁহাগীর তাকে পাঠিয়েছিলেন নূরজাহান বেগমের কাছে; বেগমসাহেবা তাকে দিয়েছিলেন তাঁর বেটীকে—শাহজাদা শাহরিয়ারের বেগমকে। বিচিত্র নসীবের খেলা—আর আশ্চর্য বদনসীব এই আমিনা বাঁদীর, যে সে পড়ে গেল শাহজাদা শাহরিয়ারের নজরে। শাহজাদার নজরে পড়া মানেই···, লোকে বলে, নসীবের দোর খুলে যাওয়া কিন্তু তার নসীব খোলে নি। সে হল গর্ভবতী এবং তার গর্ভের সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েই আঁতুড়ে মারা গেল। নূরজাহানের বেটী তার উপর গোস্সা করলে। গোস্সার কারণ তার সন্তান—যে সন্তান তার আঁতুড়েই মরে গেল—সে বেগমের সন্তান থেকে অনেক বেশী সুন্দর হয়েছিল। এর জন্যে নূরজাহানের বেটী তাকে ফিরে পাঠিয়ে দিলে তার মায়ের কাছে। নূরজাহান বেগমের কাছে।

নূরজাহান তাকে পাঠিয়ে দিলেন তাঁর ভাইঝি মির্জা আসফ খাঁ সাহেবর বেটী—শাহজাদা খুররমের বেগম আরজমন্দ বেগমসাহেবের কাছে।

বাদশাহ এবং শাহজাদা খুরম তখন গুজরাটে। মালিক অম্বরের সঙ্গে লড়াই চলছে। লড়াই ফতে করে বাদশাহ গুজরাটে থাকতে চান নি। গুজরাটের খরা আর ধুলোতে বাদশাহী মেজাজ আর

ভবিষ্যৎ যত বে-খুশ তত বে-আরামী হয়ে উঠেছিল। শাহজাদা খুরম তো বদখদ্‌ বুখারে পড়েছিলেন। সেই অবস্থায় গুজরাট থেকে আগ্রা ফেরার পথে বেগম আরজমন্দ বানুর ছেলে হল—শাহজাদা ঔরংজীব। বাদশাহী ছাউনি পড়েছিল তখন 'দৌহাদ' বলে একটা জায়গায়। সেখান থেকে উজ্জয়িনী শহরে এসে শাহজাদার জন্মোৎসব হয়েছিল। সেই দিন নূরজাহান বেগম তাকে এই আমিনা বাঁদীকে উপঢৌকন দিয়েছিলেন বেগম আরজমন্দ বানুকে। রৌশনআরা তখন ঠিক এক বছরের মেয়ে। তার বুকে ছিল তার মরে যাওয়া সন্তানের বরাদ্দ দুধ। সেই দুধ দিয়ে সে এতটা বড় করে তুলেছে রৌশনআরাকে। রৌশনআরা তার সন্তানের মত। তার জীবনের সমস্ত কিছু ওই রৌশনআরা। রৌশনআরার জন্য তার যা হয় হোক, সহ্য হবে, সব সহ্য হবে। হজরতবেগম জাহানআরা যদি তাকে সারাজীবনের মত মাটির নীচে তৈরী কয়েদখানায় পাঠায় তা সে সহ্য করবে। যদি, যদি শাহজাদীর নামে কুৎসিততম বদনামী দিয়ে তাকে সাহায্য করার জন্য তাকে কোমর পর্যন্ত পুঁতে ডালকুত্তা দিয়ে খাওয়ায় তাও সহ্য হবে কিন্তু রৌশনআরার কিছু হলে সে বাঁচবে না। পাথরে মাথা খুঁড়ে মরবে। সেই কারণেই সে বাঁদী শিরিনের এবং ওই কাফের কবি সুভগের সামনেই চীৎকার করে ডেকে উঠল—মঝ্‌লি শাহজাদী। বেটী। রওশনআরা—। বেটী।

সুভগ সবিস্ময়ে তাকালে শিরিনের মুখে দিকে।

শিরিন বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছে। সে তাকিয়ে আছে শাহজাদী রৌশনআরা এবং শাহজাদীর আয়ী খাদিমন আমিনা যে-পথে চলে গেল সেই পথের দিকে।

সুভগ ডাকলে—শিরিন!

শিরিন মৃদুস্বরে উত্তর দিল—বল।

—শাহজাদী রৌশনআরা?

—হাঁ। শাহজাদী রৌশনআরা।

—কিন্তু কি ব্যাপার?

—বলতে পারি না সুভগ। বলতে বলতে সে চঞ্চল হয়ে উঠল এবং তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে ছুটল বাইরের দিকে। সে ছুটে বেরিয়ে গেল রৌশনআরা এবং আমিনা বাঁদী এর পর কি করে তাই দেখতে।

সুভগ শান্তভাবেই যেমন বসে ছিল তেমনি বসে রইল। কিছুক্ষণ পর শিরিন ফিরে এসে বললে—শাহজাদী গিয়েছিলেন হজরত সারমাদের আস্তানায়।

—হজরত সারমাদের আস্তানায়? সুভগের বিস্ময় সীমাকে ছাড়িয়ে গেছে—বিস্ময়ে সে স্তম্ভিত হয়ে গেল।—হজরত সারমাদের আস্তানায় কেন গেলেন শাহজাদী রৌশনআরা?

শিরিন বললে—সংসারে যারা সাধু এবং সজ্জন তারা যতক্ষণ সিদ্ধিলাভ না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের মত অসহায় আর কেউ নেই সুভগ। তারা মানুষের অন্ধকার দিক দেখতে পায় না—সে দিক দিয়ে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে তাকায় তারা সামনের দিকে—যেদিকে আছে আলো সেই দিকে। কিন্তু সেই দৃষ্টিরই বা দৌড় কত দূর? কত দূর তুমি দেখতে পাও?—যা পাও তার সঙ্গে অনুমানকে জুড়েও কিছু বুঝতে চাও না তোমরা।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সুভগ বললে—হেঁয়ালি করো না শিরিন—কি বলছ বুঝিয়ে বল।

—বুঝিয়ে বলব কিন্তু তুমিও যেন বুঝবার চেষ্টা করো।

—তা নিশ্চয় করব।

—মানুষের কালো দিকটা দেখিয়ে দিলে সেটাকে বিশ্বাস করো। 'না' বলো না।

চুপ করে রইল সুভগ।

শিরিন বললে—বড় শাহজাদা শাহবুলন্দ ইকবাল আজকাল ঘনঘন হজরত সারমাদের আস্তানায় তশরীফ নিয়ে যাচ্ছেন—সেখানে

এসে হজরত সারমাদের সঙ্গে তাঁর আলাপ হচ্ছে ঘরের দরজা বন্ধ করে। মধ্যে মধ্যে হজরত সারমাদের ওই পিয়ারের অভয়চান্দ অজ্ঞান হয়ে গিয়ে ভরের ঘোরের মধ্যে নানান কথা বলছে। তাজ্জবের কথা। শাহানশাহ সাজাহান সত্যকারের বাদশাহ এবং বিচারক এ কথা ঠিক—তবু তুমি জান বাদশা মনে মনে কড়া সুন্নী। সেই বাদশাহ শাহজাদা দারাসিকোর কথায় উঠছেন বসছেন—যা বলছেন শাহজাদা দারাসিকো তাই মঞ্জুর হয়ে যাচ্ছে—এতে সারা দিল্লীর ঘরে-ঘরে লোকেরা বলছে, এইবার সব একাকার হয়ে যাবে। আর হিন্দু বলে কিছু থাকবে না, মুসলমান বলেও না, কেরেস্তানও না। একদল বলছে—শাহজাদা এক দেবতাত্মা—ভগবানের অংশ—এবার দুনিয়ায় এসেছেন—ধর্ম নিয়ে মারামারি কাটাকাটি এসব মুছে দিয়ে নয়া জিন্দিগী নিয়ে আসবেন। অন্যদল বলছে—সর্বনাশ হল। জাত গেল ধর্ম গেল। হিন্দুও বলছে মুসলমানও বলছে। সুভগ, কাশীতে আমাদের সন্তান হল যখন তখন তার ধর্ম কি হবে এই নিয়ে তোমার আমার কি ভেদ হয়েছিল ভাব।

সুভগ বললে—বুঝলাম তোমার কথা শিরিন। সে দ্বন্দ্ব আজও ঘুচে গিয়েছে কি যায় নি তা বলতে পারব না। আমাদের সন্তান মরে গেল—আমি পাগল হয়ে ঘুরলাম। তুমি সান্ত্বনা খুঁজতে বাঈজী হয়েছ—তারপর কসবীগিরিও করেছ। তারপর হজরত ফানির কাছে সান্ত্বনা পেয়ে সুস্থ হয়েছ। বলছ, হজরত ফানির মধ্যে আমাকে পেয়েছ। আমি কি করে জানি না ধর্মের দ্বন্দ্ব ভুলে তোমাকে দেখে আবার ভুলেছি—আবার তোমাকে সেই কালের মত গাঢ় ভালবাসায় বুকে জড়িয়ে ধরেছি—তার মধ্যে কোন কাঁটার খোঁচা অনুভব করি নি। কিন্তু সে কি নতুন জিন্দিগী আসছে বলে? সে কি বলছ ভগবানের ইচ্ছায় হয়েছে?

শিরিন বললে—লোকে তো তাই বলছে। তোমাকে তো একটু আগেই বলছিলাম হজরত ফানিকে শাহজাদা লিখেছেন—বাদশাহ

বলেছেন তাঁকে জিজ্ঞাসা না করে কোন কাজ তিনি করবেন না। আরও লিখেছেন—হজরত, আমার পীরসাহেব শাহ ফানা, আপনাকেই শুধু জানাই যে এ সমস্তই হল খুদা মালেকের ইচ্ছা—আল্লাহতায়লার মরজি। এই ভবিতব্য। খুদা এবং পয়গম্বর রসুলের মেহেরবানিতে আমি দর্পণে মুখ দেখার মত স্বপ্নের মধ্যে আমার আসল রূপ দেখে বুঝতে পেরেছি আমাকে খুদা দুনিয়ার চাঘতাই বংশে শাহানশাহের পুত্র করে পাঠিয়েছেন ঠিক যেমন ভাবে রামচন্দ্রজী মহারাজ দশরথজীর ঘরে জন্মেছিলেন। হিন্দুদের শাস্ত্রে, গীতায় আছে—গুনাহগারীরা যখন গনতিতে বেড়ে যায়—তারা যখন দুর্দান্ত হয়ে সাধু সৎ মানুষদের পীড়ন করে তখন পরমাত্মা এমনি ভাবেই দুনিয়াতে আসেন। যখনই কোথাও কোন অন্যায় অত্যাচার দেখবেন তখনই আমাকে জানাবেন। আমি বললেই শাহানশাহ আমার কথা জরুর মেনে নেবেন। সেই কারণেই তো কাশ্মীরের রাজার উপর জুলুমবাজির জন্য আমাকে পাঠালেন হজরত। বললেন—নাজি তুমি যাও—তোমারও ছুটির সময় হয়েছে—তোমাকে ছুটি দিচ্ছি আমি ; যাও দিল্লী সাজাহানাবাদ, সেখানে শাহজাদা দারাসিকোর কাছে গিয়ে বল রাজা পৃথ্বী সিংয়ের কোন কসুর নাই। তবু কেন তার মুল্কের উপর হামলা। কেন তার মুল্ক ছিনিয়ে খাস বাদশাহীর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হবে। জানি কাশ্মীর শ্রীনগর দুনিয়ার স্বর্গ। কিন্তু পৃথ্বী সিং তো বাদশাহকে কর দিয়ে থাকে। আমি জানি শ্রীনগর আর কাশ্মীরের উপর মুসলমান মনসবদার আমীর বাদশাহের উজীর নাজির সবারই লোভ আছে। আগের কাল হলে মেনে নিতাম—জোর যিস্কা হ্যায় মুল্ক উস্কা হ্যায়—কিন্তু আজ দারাসিকো নয়া জিন্দিগী আনছেন—আজ আর তা কেন হবে ? সঙ্গে সঙ্গে বললেন—যাও—তোমারও লাভ হবে পিয়ারী। যদি নয়া জিন্দিগী সত্যই এসে থাকে তবে ঠিক তুমি তোমার সেই বচপনের সেই চিরকালের পিয়ারকে মাসুককে ফিরে পাবে। ঠিক

দেখবে যা কিছু সংশয় উঠে থাক একদিন সে সব সূর্য উঠলে কুয়াসা যেমন কেটে যায় তেমনিভাবে বিলকুল কেটে গিয়েছে। দেখবে সব হিম কেটে গিয়েছে—কলেজা উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে, দুজনের বুক দুজনের জন্য আকুল হয়ে উঠেছে। সবই তো সত্য হয়ে উঠেছে সুভগ! বল—তোমার সকল সংশয় কি কাটে নি? তুমি কি আকুল হও নি আমার জন্য?

সুভগ একটুক্ষণ চুপ করে রইল। শিরিনের সমস্ত কথাগুলি তার মনের মধ্যে পাহাড়ের গুহার মধ্যে সমুদ্রের খাড়ির জলের মত তরঙ্গ তুলে তুলে আছাড় খেয়ে খেয়ে ফিরছিল। ধ্বনির প্রতিধ্বনি উঠছিল, যেন কোন উত্তর ছিল। সুভগের মন ছিল নীরব নিস্তব্ধ। কিন্তু উত্তর সে জানে না। দীর্ঘদিন প্রায় দশ বৎসর সে শিরিনের মহব্বতিতে পাগল হয়েও নিজেকে হারিয়ে দিতে পারে নি—শিরিনের সঙ্গে ঘর বেঁধেও তার আপনার হতে পারে নি—তাকেও আপনার করতে পারে নি। অলৌকিকের অনেক সন্ধান সে করেছে; সেই অভিপ্রায়ময় ইচ্ছাময় মহাশক্তির ধারাকে স্পর্শ করবার অনেক চেষ্টা করেছে—সেই অনির্বচনীয়কে পরমানন্দময়কে অনেক ডেকেছে—কিন্তু তার স্পর্শ পায় নি সন্ধান পায় নি—পেয়েছে শুধু আঘাত—হয়েছে শুধু হতাশ আর হয়েছে পাথরের মত কঠিন। যেটুকু চেতনা তার আছে তাতে সে কঠোর হিসেবী হয়ে উঠেছে। স্বার্থান্ধ হিসেবী নয়—সত্যসন্ধানে বাস্তববাদী হিসেবী। তার মনের মধ্যে শিরিনের কথাগুলি শুধু ধ্বনিই তুলছিল। তার মন বা হৃদয় কোন প্রতিধ্বনি তোলে নি; কোন উত্তর দিতে চায় নি। শুধু নিরাসক্তভাবে স্থিরদৃষ্টিতে সম্মুখের দিকে তাকিয়ে কান পেতে শুনেই যাচ্ছিল। তবু সে দৃষ্টির মধ্যে ছিল অতি সকরুণ এক হতাশার প্রকাশ। একটি বাতির নিষ্কম্প শিখাকে কেউ যেন হতাশার এক মলিন বর্ণের কোন ফানুস দিয়ে ঢেকে দিয়েছে।

শিরিন অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে সেই দৃষ্টি দেখে হাঁপিয়ে উঠল,

বললে—সুভগ, কথা বল! এমন করে তাকিয়ে আছ কেন? কি দেখছ তুমি? সুভগ!

সুভগ একটু বিষণ্ণ হেসে বললে—কি দেখব শিরিন? মধ্যে মধ্যে মৃগীরোগ আমার হয়। তার মধ্যে অনেক কিছু দেখি। কিন্তু—তা—কি?

কথা সে শেষ করলে না।

শিরিন বললে—আজ ক'দিন থেকেই নাকি হজরত সারমাদের পিয়ারের পিয়ার অভয়চাঁদ বেহোঁশ হয়ে গিয়ে সেই বেহোঁশ অবস্থাতেই বলছে—হায়রে হায়রে—আবার খুনের দরিয়া বয়ে যাচ্ছে রে—আর তার স্রোতে লাল পদ্মের মত দুটি রক্তাক্ত মুণ্ড ভেসে যাচ্ছে। হায় হায় হায়!

—জানি। শুনেছি।

—তুমি ওই যে সামনে তাকিয়েছিলে তাতে কি তা দেখতে পাও নি? কি পাও না? এত সাধনা তুমি করেছ—মহশীন ফানি বলেন কবি সুভগ সিদ্ধপুরুষ। নইলে এত দুর্ভোগ কেউ যেচে ভোগ করে না। বল সুভগ তুমি কি দেখ?

—না শিরিন। তা আমি পাচ্ছি না—কোনদিন পাই নি, সম্ভবতঃ কোনদিন পাব না। আমি হয়তো অভয়চাঁদের দৃষ্টি কোনদিন পাব না। শোন শিরিন, শাহজাদা দারাসিকোর সৌভাগ্যকে আমি দেখতে পাই না। আমি দেখছি শাহজাদার আপাতঃ-সৌভাগ্যের পিছনে তাঁর সৌভাগ্যের চেয়েও আকারে অনেক বড় একটা কালো ছায়া দাঁড়িয়ে আছে—সম্ভবতঃ সেটা তাঁর দুর্ভাগ্য।

ঠিক এই সময়েই বাইরে যেন মানুষজনের সাড়া উঠল। কোন একটা পালকি এসে নামল। বাইরে থেকে একজন শিষ্য এসে প্রণাম করে সুভগকে বললে—গোস্বামীজী, শর্মা সাহেব এসেছেন।

সুভগ বললে—শর্মা সাহেব? এত রাত্রে?

—কিল্লা থেকে তলব এসেছে। শাহানশাহের ভবিষ্যৎ খারাব হয়েছে। তুরন্ত নিয়ে যাবার হুকুম। তা আপনার আশীর্বাদ নিয়ে তবে যাবেন।

—নিয়ে এস তাহলে এখনি নিয়ে এস।

বলতে না বলতে ভিতরে প্রবেশ করলেন শর্মাজী। সাজাহানাবাদের একজন কবিরাজ। সাধু সুভগের উপর অগাধ ভক্তি।

বাদশাহ সাজাহানের বর্তমানে শরীর ভাল যাচ্ছে না। মধ্যে মধ্যে প্রায়ই পেটের যন্ত্রণায় কষ্ট পান—কোষ্ঠবদ্ধতা এবং মূত্রকৃচ্ছ্র তার জন্য নিষ্ঠুর যন্ত্রণা হয়; এই কবিরাজ শর্মাজী তাঁকে আরাম করেন। শর্মাজী রাজপুতানার চিকিৎসক। জয়পুরের লোক। মহারানা জয়সিংহের বিশ্বস্ত কবিরাজ।

প্রতিবারই কবিরাজ যাবার সময় সুভগের আশীর্বাদ নিয়ে যান এবারও এসেছেন আশীর্বাদ নিতে।

সুভগ বললে—এস শর্মা। বাদশাহের আবার অসুখ? সেই অসুখ? না কি?

—হ্যাঁ। সেই অসুখ। আবার কি? শাহানশাহ দারু সরাপের ভক্ত নন কিন্তু ঔরতের নেশা তো ছাড়তে পারবেন না। যত তেজী দাওয়াই খাবেন তার ফল এই বয়সে ফলে মূত্রাশয়ে আর মলস্থলীতে। মনে হচ্ছে হয়তো—

—হয়তো কি শর্মা?

—আর কি সাধুজী? দুনিয়ার শেষ নিয়মে যা হয় তাই। গোটা ওমরাহী মহলে নাকি হৈ হৈ পড়ে গেছে। সওয়ার ছুটছে এ হাবেলী থেকে ও হাবেলী। হয়তো বা বাংলা দক্ষিণ গুজরাত সুবাতে শাহজাদাদের কাছেও ছুটল সওয়ার। শাহজাদা দারাসিকোর পল্টন পাহারাদারেরা তো তৈয়ার হয়ে রয়েছে। সাজ সাজ রব উঠেছে।

প্রণাম করে আশীর্বাদ নিয়ে চলে গেলেন শর্মাজী। শিরিন

বললে—আল্লা মেহেরবান—হে ভগবান শাহজাদা দারাসিকোকে জয়যুক্ত করো। শাহজাদার জয় হলে আমাদের জয়। দুনিয়ায় অন্ততঃ হিন্দুস্তানে আর রক্তারক্তি অশান্তি ভেদ বিভেদ থাকবে না; হে ভগবান!—সুভগ—!

সুভগ বললে—ছায়াটা যেন ঘন হয়ে উঠছে শিরিন!

—না না, ও কথা বলো না। চীৎকার করে উঠল শিরিন। ছুটে এসে সুভগের প্রায় বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মুখে হাত দিয়ে বন্ধ করে বললে—না।

ছেচল্লিশ

সারা দিল্লী শহরে গুজবের আর শেষ ছিল না। এবং সে গুজব ঘড়িঘড়ি পালটাচ্ছিল। বাজারে, দোকানে-দোকানে, কাফিখানায়, আমীর-মনসবদার উজীর-নবাবদের বাড়িতে, গৃহস্থদের ঘরে-ঘরে, তাই বা কেন—জুম্মা মসজেদ এবং সাধারণ মসজিদের চারিপাশে সিঁড়ির নীচে যে সব ভিক্ষুকরা আড্ডা গেড়ে ভিক্ষা করে এবং দল পাকায় তাদের ওই আড্ডাখানায় পর্যন্ত প্রতি ঘড়িতেই এই বদলানো গুজব নিয়ে উত্তেজনার যেন এক একটা দমকা হাওয়া বয়ে যাচ্ছিল।

শাহানশাহ বাদশাহের ভারী বেমারী।

পেটে অসহ্য যন্ত্রণা। মলমূত্র এমনভাবে বন্ধ হয়ে গেছে যে বাদশাহের মলস্থলী পাকস্থলী ফুলে উঠে বুক ছাতির চেয়েও উঁচু হয়ে উঠেছে। নিশ্বাস ফেলতে পারছেন না।

বহু যুদ্ধক্ষেত্রের বিজয়ী সেনাপতি বাদশাহ সাজাহান। বাল্যকালে পনের ষোল বয়স থেকে শাহানশাহ জাহাঙ্গীর বাদশাহের অধীনে মনসবদারী করেছেন—যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাপতির দায়িত্ব পালন করে যুদ্ধ জিতেছেন, আহত হয়েছেন; ষোল বছর বয়সে বাদশাহ জাহাঙ্গীরের সঙ্গে শিকারে গিয়ে একটা বাঘের সঙ্গে একলা লড়াই করে তার বুকে তাঁর তলোয়ার আমূল বিদ্ধ করে দিয়ে সেটাকে মেরেছিলেন। বাপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন—বাদশাহ তাঁকে বন্দী করে আনবার জন্য সৈন্যাধ্যক্ষ মহাবৎ খাঁকে পাঠিয়েছিলেন বাদশাহী ফৌজ সঙ্গে দিয়ে। খানখানান মহবৎ খাঁ তাঁকে উত্তর থেকে মধ্যভারত হয়ে দাক্ষিণাত্যে সুদূর গোলকুণ্ডা পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন—গোলকুণ্ডা থেকে আবার উত্তরপথে ওড়িষা হয়ে বাঙ্গাল মুল্ক হয়ে ফিরেছিলেন তিনি। ঘোড়ার উপরেই দিনরাত্রি কেটেছে। সেই মানুষ বলেই তাঁর কাতর চীৎকার কেউ শুনতে পায় নি; না-হলে, কোন সাধারণ মানুষ হলে কাতর চীৎকারে সারা লালকেল্লা

মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত—তাই বা কেন লালকেল্লার বাইরের বাতাস পর্যন্ত ভারী করে তুলত। সুগৌর মুখবর্ণ যন্ত্রণায় রাঙা হয়ে উঠেছে পাকা-দাড়িমের রঙের মত। হাত দুখানা মুষ্টিবদ্ধ করে চোখ বন্ধ করে শুয়ে ছিলেন বাদশাহ। দীর্ঘক্ষণ নিথর হয়ে থাকলে বান্দা বান্দী মহলের নানান কর্মচারীদের চোখের ইশারায় ইশারায় কথাটা চলে গেছে; চলে গেছে শাহজাদী রৌশনআরার মহলে; সঙ্গে সঙ্গে রৌশনআরা এসেছেন দেখতে। তারপর কোন একজন বিশ্বস্ত লোক চলে গেছে কেল্লার বাইরে। সেখান থেকে চলে গেছে উজীরের কাছে—মনসবদার এবং বাদশাহের শ্যালক খানখানান সায়েস্তা খাঁয়ের কাছে। আবার অন্য লোকদের মারফত চলে গেছে শাহজাদা মুরাদ এবং শাহজাদা সুজার তরফের আমীরদের কাছে। সঙ্গে সঙ্গেই বিচিত্রভাবে কাফিখানায় ফিসফাস করে এ ওকে বলেছে—ক্যা? শাহানশাহ একেবারে বেহোঁশ হয়ে গেছেন?

—বল কি?

—হ্যাঁ। বলছে, পুরা তিন ঘড়ি এতটুকু সাড়া নাই। বলছে—।

—কি বলছে? দুজনেই দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে—মুখে যে-কথা বের হতে ভয় পায় সে-কথা চোখের দৃষ্টি থেকে বেরিয়ে আসে। যার অর্থ—বোধ হয় বাদশাহ নেই।

তারপরই নানান রকম অনুমান বা কল্পনা মুখে মুখে তিল থেকে তাল হয়ে বেরিয়ে আসে। দুজনের মধ্যে থেকে তৃতীয় চতুর্থজনের মারফতে এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত চলে যায়। ওপ্রান্তের কোন গাছতলায় দুজন ফিসফাস করে বলে—"শাহজাদা দারাসিকো আর হজরতবেগম ঢেকে রেখেছে আসল সত্য। দেখ না, কিছুক্ষণের মধ্যেই সারা দিল্লী শহর জুড়ে ধরপাকড় শুরু হয়ে যাবে।"

আবার বাদশাহ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পাশ ফিরে শোবার সময় খোদার নাম নেবামাত্র সে খবরও চলে গেছে ঠিক এই ভাবেই।

—তাজ্জব কি বাত ! মরা বাদশাহ বেঁচে উঠেছেন।

—বল কি ?

—হাঁ—বেহোঁশ পঙ্গু বাদশাহ আল্লার নাম নিয়ে একদম উঠে বসেছেন বিছানার উপর। সব শাহজাদা দারাসিকোর কেরামতি। শাহজাদা দারাসিকো আর শাহজাদী জাহানআরাজীউ ফকীর সারমাদের কাছে আরজ জানিয়েছিলেন। ওদিকে আজমীরে লোক গিয়েছে—তারপর লোক গিয়েছে কাশ্মীরে হজরত মহসীন ফানীর কাছে। হিন্দু সাধু লালবাবার কাছে লোক গেছে—তাঁরা সকলে একসঙ্গে যোগযাগ তুকতাক করেছেন—তারই জোরে বাদশাহ বেঁচে উঠেছেন।

—ঝুট্‌ বাত। সমস্ত ব্যাপারটাই উলটো। বাদশাহের এ বেমারীর সৃষ্টিই করেছে শাহজাদা দারাসিকো।

—কি বল ? এসব কথা বলো না পাপ হবে।

—কেন বলব না ? শাহজাদা দারাসিকোকে তুমি যে পুণ্যাত্মা দেখ তা আমি দেখি না। শাহবুলন্দ ইকবাল নিজেকে বলে নতুন পয়গম্বর, কখনও বলে কাফেরদের অবতার। রাম রাজা কিসণজীর সঙ্গে নিজেকে সমান মনে করে। আবার অন্যদিকে আজও হাটে হাটে তার দালাল ঘুরছে খুবসুরত কচি কচি বাঁদীর জন্যে। রাস্তার নাচওয়ালীকে দেখে পাগল হয়। বাপকে জাদু করে তার সমস্ত শক্তি হাত করে নেওয়া তো চোখের উপর দেখলে ! দেখ নি ? আজ তো দরবারে বাদশাহের মসনদের পাশে তার জন্যে অলগ সোনার তক্ত্‌ পড়ে। কেন ? বাদশাহের চার লড়কা। ইসলামে কাফেরদের মত বড়া লড়কাই রাজ পায় না। শরিয়তে এর কোন নির্দেশ নেই। বাদশাহকে জাদু করে শাহবুলন্দ ইকবালই এই সব করেছে। এখন বাদশাহের ইন্তেকাল হলেই দারাসিকো লাফ দিয়ে গদীনসীন হবে। সুতরাং বাদশাহকে যোগযাগ করে বেমারীতে ফেলেছে বড়া শাহজাদা। দুসরা কোই নেহি।

হরজতবেগম শাহজাদী জাহানআরাজীউ বাপের মাথার শিয়রে বসে আছেন প্রদীপশিখার মত। তাঁর চোখের আলো হৃদয়ের উত্তাপ বাশাহের মুখের উপর নিবদ্ধ হয়ে রয়েছে। তিনি বসে আছেন তাঁর আসনে, কয়েকজন বাঁদী বাদশাহের পরিচর্যায় নিযুক্ত রয়েছে। শাহজাদা দারাসিকো খানিকটা অস্থির হয়ে পড়েছেন। বাদশাহের শয়নকক্ষের দরজায় তাঁর পায়ের শব্দ উঠছে মধ্যে মধ্যে। শব্দ উঠলেই শাহজাদী কখনও নিজে কখনও বাঁদীদের কাউকে পাঠিয়ে শাহজাদাকে বলছেন—অস্থির হয়ো না—ধীরভাবে প্রতীক্ষা করো। অস্থিরতার সময় নয়। বাদশাহ ভাল না হোক সেই একভাবে আছেন। তুমি কড়া নজর রাখো ওমরাহীর উপর। কোতায়ালকে বল সে যেন গুজব ছড়াতে না দেয়। হুঁশিয়ারির সঙ্গে তোমার লোকদের বলে দাও—কোথায় কোন্ মতলব চলছে খবর পাওয়ামাত্র যেন তোমায় জানিয়ে দেয়। মসজেদে মসজেদে ইমামসাহেবরা খুদার দরবারে দোয়া প্রার্থনা করুন। আর হজরত সারমাদকে তুমি খুদ জানাও যেন তিনি নিজে বাদশাহের এই বেমারী যাতে আরাম হয়ে যায় তাই করেন।

শাহজাদী রৌশনআরা সে-দিন রাত্রে সেই সুভগের আশ্রম থেকে প্রায় বিভ্রান্তের মত বেরিয়ে এসেছিলেন।

ফকীর সারমাদের আস্তানায় অভয়চান্দ তার অজ্ঞান অবস্থার মধ্যে আর্ত চীৎকারে বলেছিল—রক্তের স্রোত বইছে—সে স্রোতে ভেসে যাচ্ছে দুটি মুণ্ড। হায়রে হায়—।

সেখান থেকে বেরিয়ে পথে পালকির মধ্যে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন, বাঁদী নাদিরা বুঝতে পেরে তাঁর শুশ্রূষার জন্য তাঁকে নিয়ে গিয়েছিল সুভগের আশ্রমে। সেখানে চেতনা হতেই রৌশনআরা শুনতে পেয়েছিলেন শিরিন বলছিল—শাহজাদাকে হিন্দুদের অবতার রাজা রামচন্দ্র স্বপ্নে দেখা দিয়েছেন। বলেছেন—তুমি আমারই মত

অবতার। তুমি রাজা বাদশাহ—তুমি পরমপূজ্য পয়গম্বর, ঈশ্বরের প্রতীক—একাধারে তুমি সব।

শুনে বিভ্রান্ত হয়ে বেরিয়ে এসেছিলেন সেখান থেকে, চীৎকার করে বলে এসেছিলেন—ঝুট হ্যায়—বিলকুল ঝুট। এ কখনও সত্য নয়—এ হতে পারে না সত্য। এ হয় না।

আমিনা পিছন পিছন এসে তাঁকে কোনরকমে পালকিতে চড়িয়ে কেল্লায় মহলে এনে তুলেছিল। যখন তারা ফটকে ঢুকছিল তখনই কেল্লার ফটক থেকে ভিতর পর্যন্ত সর্বত্র হাল যেন বিলকুল বদল হয়ে গেছে। বাদশাহ তখন অকস্মাৎ বেহুঁশ হয়ে গেছেন। শাহজাদী জাহানআরাজীউ খবর পাঠিয়েছেন শাহজাদা দারাসিকোর কাছে মহলের দারোগার মারফত। হারেমের নাজির হারেমের প্রবেশপথে-পথে কড়া পাহারার ব্যবস্থা করেছে। প্রত্যেক পালকি ডুলি নিয়ে তারা নানান প্রশ্ন করে তবে ঢুকতে দিচ্ছে। শাহজাদী রৌশনআরা বাদশাহী হারেমের পালকিতে আসছিলেন না, আসছিলেন খানখানান খলিলুল্লা খানের হারেমের পালকিতে। খানখানান খলিলুল্লা খানের হারেমের পালকি বাদশাহী কেল্লায় আসত অদৃশ্য একটা বিশেষ ইঙ্গিতের ছাপ নিয়ে। সে ছাপ অত্যন্ত নিরাপদ ছিল সাজাহান বাদশাহের বাদশাহীতে। কিন্তু সেদিন সিপাহীরা আটকেছিল পালকি। তুর্কস্থানী সিপাহীটা রসিকতা করেই ডুলি আটক করে বলেছিল—নেহি নেহি! ফিরে নিয়ে যাও ডুলি। শাহানশাহের ভবিষ্যৎ খারাপ। আজ খানখানান খলিলুল্লা খানসাহেবের হারেমের পালকি যেতে দিতে হাকিমসাহাবনে বহুৎ কড়াসে মানা কর দিয়া হ্যায়। যাও যাও। বাদশাহ কুছু নেহি খায়েঙ্গে।

অর্থ টা শ্লীল ছিল না।

শাহানশাহ সাজাহান বাদশাহের সঙ্গে খানখানান খলিলুল্লা সাহেবের বেগমের সম্পর্ক সম্পর্কে লোকে বলত খাদ্য খাদক সম্পর্ক। সকালে বিকালে এই বয়সেও বাদশাহ নারীদেহ নিয়ে বিলাস

করতেন। অন্তত: শতরঞ্চ খেলতেন খলিলুল্লা খানের বেগম এবং খানসাহেব সায়েস্তা খানের বেগমের সঙ্গে। মহলের আঙিনায় দাবাখেলার ছক তৈরি করিয়েছিলেন বিভিন্ন রঙের মার্বেল পাথর দিয়ে। সেই ছকে দাবা বোড়ে বা ঘুঁটি হত সুন্দরী বাঁদীর দল। খেলা ভাঙত যখন তখন বাদশাহ বৃদ্ধবয়সেও তরুণ যৌবনের উত্তেজনা অনুভব করতেন। এর সঙ্গে তিনি নিয়মিত সেই যৌবনকাল থেকে এই সুখভোগকে দীর্ঘস্থায়ী করবার জন্য নানান ধারক ওষুধ এবং মোদক ব্যবহার করতেন। বর্তমান এই ব্যাধিটি তারই ফল কবিরাজ এবং হকিমেরা এ কথা অনেকবার সবিনয়ে নিবেদন করেছে। কিন্তু বাদশাহ অবুঝের মত এ নিষেধ জেনে শুনেই অমান্য করেছেন। মধ্যে মাঝে বাদশাহের এই ধরনের মূত্রবদ্ধতা এবং কোষ্ঠবদ্ধতা হয়ে থাকে; কিন্তু তার জন্য ওষুধের ব্যবস্থা আছে—সেই ওষুধ ব্যবহার করলেই উপশম হয়; তারপর দু চার দিন কিছুটা সংযত ভাবে থাকেন বাদশাহ; দু চার দিনের পর আবার যথা পূর্ব তথা পর। আবার চলে সেই দেহবিলাস—সেই অশোভন ভোগ—কটু লালসার লজ্জাহীন প্রকাশ।

এবার সেই ব্যাধি দেখা দিয়েছে আগের দিন ভোররাত্রি থেকে; সকালেই উপশমের ওষুধ ব্যবহার করেছেন, আবার দুপুরে করেছেন—বিকেলেও আর এক খোরাক ওষুধ খেয়েছেন কিন্তু কিছুতে কিছু হয় নি। সন্ধ্যার ঠিক পূর্ব পর্যন্ত বাদশাহ আচ্ছন্নের মত হয়ে পড়েন। রাত্রি এক প্রহর নাগাদ বেহোঁশ হয়ে পড়েছেন। শাহজাদী জাহান-আরা হজরতবেগমসাহেবা সতর্ক হয়ে খবর পাঠিয়েছেন শাহজাদা দারাসিকোর কাছে। তিনি তখন হজরত সারমাদ ফকীরসাহেবের ওখানে। তার সঙ্গে সারা কেল্লার ফটকে ফটকে বিশ্বস্ত কড়া পাহারার ব্যবস্থা করেছেন। হজরতবেগম শাহজাদী জাহানআরাজীউ মনে-প্রাণে কবি; এবং খুদাতায়লায় সমর্পিতপ্রাণা ও কোমলচিত্ত হলেও হিন্দুস্তানের শাহজাদী; রাজনীতিতে তিনি পারদর্শিনী।

তিনি একথা মানেন যে, ভগবানের ইচ্ছাই জয়যুক্ত হয় ; কিন্তু তার সঙ্গে এটাও জানেন যে বিনা খাদিমে পীরের অভ্যুদয়ও সম্ভবপর হয় না। খুদার ইচ্ছা থাকলেই ক্ষুধার্তের মুখে অন্ন আপনি এসে ওঠে না। দুনিয়ায় তাঁর ইচ্ছাকে পূর্ণ করবার জন্য সেবক চাই পয়গম্বর চাই। সঙ্গে সঙ্গে বাদশাহ-কন্যা এও জানেন যে, বাদশাহ সাজাহানের অকস্মাৎ কিছু হলে সারা হিন্দুস্তান তছনছ করে দক্ষিণ পশ্চিম এবং পুব তরফ থেকে তুফান এসে সারা দিল্লীর উপর আছড়ে পড়বে। তিন শাহজাদা ছুটে আসবে তিন দিক থেকে। এই কেল্লার মধ্যেই মহলে মহলে চাঘতাই বংশের রক্ত যাদের মধ্যে আছে তারা এরই মধ্যে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। প্রতি বাগিচায় গাছের তলায় প্রতি গলি-ঘুঁচিতে বান্দারা গোলামেরা শাহী কর্মচারীরা এরই মধ্যে গুজগুজ শুরু করে দিয়েছে। এখানে রৌশনআরা বিরাট ষড়যন্ত্র ফেঁদে বসে আছে এ কথা প্রকাশ্য গুপ্ত কথা। বাইরে দিল্লী শহরে সমস্ত সুন্নী মুসলমানেরা—সে উজীর থেকে মনসবদার এমন কি সাধারণ তুর্কী তাতার সিপাহী পর্যন্ত রৌশনআরা ঔরংজীবকে মনে করে মুসলমান সম্প্রদায়ের রক্ষক। তারা কোনমতেই হিন্দুদের সংস্পর্শ এবং সমকক্ষতা সহ্য বা স্বীকার করবে না। কিছুতেই মানবে না যে সব মানুষই সমান—সব মানুষই এই ধরতীমাতার বুকের সন্তান—সর্বময় কর্তা সকল সৃষ্টির সৃষ্টিকর্তা খুদাতায়লা তাদের পিতা। খুদা শুধু মুসলমানের।

জীবনে এককালে তাদের বাল্যকালে তারা পরস্পরের মধ্যে তর্ক করেছে তকরার করেছে। যত বড় হয়ে উঠেছে তত এই বিশ্বাস এই মত বীজ থেকে অঙ্কুর, অঙ্কুর থেকে শিশুবৃক্ষ, বৃক্ষ থেকে আজ সে পরিণত হয়েছে মহীরুহে। না। মহীরুহে মহীরুহে মাটির রস নিয়ে আকাশের আলো নিয়ে কাড়াকাড়ি আছে কিন্তু পরস্পরকে নিষ্ঠুর আক্রোশে আক্রমণ তারা করে না। উদ্ভিদের পর জানোয়ার। জানোয়ারের মধ্যে আক্রোশ আছে আক্রমণ আছে প্রকাশ্য উলঙ্গ

কিন্তু তাদের ধর্মের দোহাই নেই। আল্লাহ্‌তায়লা ভগবান তাদের স্বভাব দিয়েছেন—ক্ষুধা তৃষ্ণা দিয়েছেন—কামনা লালসা দিয়েছেন—দাঁত দিয়েছেন নখ দিয়েছেন—খুনজখমের প্রবৃত্তিই দিয়েছেন, জ্ঞান দেন নি। আল্লাহ্‌তায়লার কাছে তারা উপাসনাও করে না—তাঁর কাছে তারা দোয়াও মাঙে না—তারা জন্মায়, কিছুদিন বাঁচে তারপর মরে। এই তাদের নিয়তি। তাদের জন্য ভগবানের এই বিধান। মানুষ খুদার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, সে তার স্রষ্টাকে চেনে জানে—তাঁর আদেশ শুনতে পায় সে। সেই মানুষ ঠিক ওই জন্তুর মত অথবা জন্তুর চেয়েও হিংস্রভাবে পরস্পরকে আক্রমণ করে বিরোধ করে। আর বিরোধের সব থেকে বড় কারণ হল খুদা নিয়ে মামলা—ভগবান নিয়ে বিরোধ। এ বিরোধের মীমাংসা নেই। এ মামলায় আপোষ নেই। এক পক্ষের নাশ না হওয়া পর্যন্ত এর নিবৃত্তি নেই। উপর থেকে আল্লাহতায়লা এই ভ্রান্তির দুনিয়ায় ফকীর দরবেশ সাধু সন্তদের পাঠাচ্ছেন। তাঁরা আসছেন, বলছেন—এ ভুল, এ ভুল, এ ভুল। কিন্তু সে কেউ শুনবে না, শুনছে না। হিন্দুদের মধ্যে অবতারেরা জন্মেছেন। রাজা রাম কিষণজী। মহারাজ অশোক। ইসলামের বাদশাহদের মধ্যে আকবরশাহ জন্মেছিলেন। দীন-ই-ইলাহী ধর্ম প্রবর্তন করেছিলেন। কিন্তু কেউ তাঁর আহ্বানে কান দেয় নি। না হিন্দু না মুসলমান। দারাসিকো জন্মেছেন আবার। তাঁর মহত্ত্ব তাঁর উদারতা কিছুতেই বুঝবে না তাঁর ভাইয়েরা। কিছুতে না। ঔরংজীব গোঁড়া সুন্নী হয়ে ধর্মের দোহাই দিচ্ছে। রৌশনআরা তার সমর্থনকারিণী। সুজা মুরাদ বিলাসী মগুপ—রাজ্যের জন্য তারা দারার বিরোধী। প্রতি শাহজাদা এক একদল ওমরাহ নিয়ে সারা হিন্দুস্তান জুড়ে চক্রান্ত ফেঁদে বসে আছে। এর মধ্যে ভয়ংকর ঔরংজীব। সব থেকে ভয়ংকর। সব থেকে কুটিল। দারাসিকো ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষ। চারজন শাহজাদাই তাঁর সহোদর কিন্তু দারাসিকো তাঁর প্রিয়তম ভাই; তিনি উদার তিনি প্রেমিক—তিনি

সেই স্বপ্ন দেখেন যে স্বপ্ন রচনা করেন স্বয়ং খুদাতায়লা পুণ্য এবং পবিত্রতার স্বর্ণসূত্র দিয়ে।

বাদশাহ সাজাহান নিজে নিষ্ঠাবান মুসলমান। এক নারী-বিলাস ছাড়া আর কোন অপরাধে তাঁকে অপরাধী কেউ করতে পারবেন না। তিনি পিতা এবং দেশের মালিক বাদশাহ; তিনি পণ্ডিত তিনি উদার; তিনি ইসলামের সঙ্গে অপর কোন ধর্মকে সমান ভাবেন না। কিন্তু তিনিও দারাসিকোর উদারতার মধ্যে সেই পরম পবিত্র সত্তাকে দেখতে পেয়েছেন—উপলব্ধি করেছেন, যার জন্য তিনি চান যে তাঁর পর হিন্দুস্তানের মসনদে শাহজাদা মহম্মদ দারাসিকো তক্তনসীন হন 'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা'—এ নাম তিনিই অর্জন করেছেন—হিন্দু কবিরা এই বলে তাঁর প্রশস্তি গান করেছে। কিন্তু তারও মূলে দারাসিকো। বৃন্দাবন গোকুলে শাহজাদা দারাসিকোই বাদশাহী সনদে পূজোর জন্য ভূমিসম্পত্তি দান করিয়েছিলেন। সেই কারণেই হিন্দু কবিরা হিন্দুস্তানের বাদশাহকে বন্দনা করেছিল 'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা' বলে। রাজা যিনি হবেন তিনি হবেন সূর্যের মত উদার। তাঁর কিরণ সমভাবে বিতরিত হয় সব কিছুর উপর। অন্ধকার যে অন্ধকার, সে অন্ধকারও মরে না, সে আলো হয়ে ওঠে। আলোর মধ্যে নবজীবন লাভ করে। রাজা সূর্যের মত পৃথিবী থেকে খাজেনা গ্রহণ করেন কিন্তু তাকে অজস্র ধারায় আবার দুনিয়াতেই ঢেলে দেন।

এই হল দারার কথা।

এই কথা শুনে বাদশাহ যে বাদশাহ তিনি মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বলেছিলেন—জাহানআরা, দারাসিকো জিন্দাবাদ। বেটী, এ কথা শাহানশাহ বাদশাহ পীর গাজী জালালউদ্দিন আকবরশাহ বাদশাহও এমন করে ভাবেন নি। বলেন নি। ফকীর সারমাদের সংস্পর্শে এসে দারা যেন দিনে দিনে শুক্লপক্ষের চাঁদের মত উজ্জ্বল এবং পূর্ণ হয়ে উঠছেন। খুদা দারাকে দীর্ঘজীবী কর।

কথাটা রৌশনআরার গুপ্তচর রৌশনআরাকে গিয়ে জানিয়েছিল। রৌশনআরা সঙ্গে সঙ্গে খত্‌ ভেজেছিলেন দক্ষিণে। পত্রবাহক ধরা পড়ে গিয়েছিল। পত্রে লেখা ছিল—"চন্দ্র পূর্ণিমার দিকে চলেছে। আফতারের মত বাদশাহ চাঁদকে আশীর্বাদ করছেন। আমি শাহজাদাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি যে চাঁদে গ্রহণ লাগে পূর্ণিমা তিথিতেই। অত্যন্ত সতর্কভাবে সেই গ্রহণ যাতে লাগতে পারে তার ব্যবস্থা অবশ্যই করা উচিত।"

সংবাদটা জাহানআরা বাদশাহকে জানিয়েছিলেন। দারাকে বলেন নি। দারা বড় বেশী আবেগপ্রবণ। তাঁর করুণার আবেগ যত প্রবল সাময়িক ক্রোধের আবেগ তার থেকে কম নয়। সেই কারণেই বাদশাহকেই কথাটা প্রথম জানিয়েছিলেন। বাদশাহ বলেছিলেন—সাবধান হতে হবে জাহানআরা, সাবধান হতে হবে। কিন্তু এ কথা এখন তুমি দারাকে বলো না। এ নিয়ে কোন আলোড়ন না হয় বেটী। আমি বুঝতে পারি নি। দোষ বোধ হয় আমারই—অথবা এ আমার দুর্বলতা। বেটী, ঔরংজীবকে দক্ষিণে পাঠিয়েছিলাম, অশান্ত দক্ষিণ। এদিকে গোলকুণ্ডায় কুতুবশাহী ওদিকে বিজাপুরের আদিলশাহী সুলতানেরা, আর দিকে পাহাড়িয়া মারাঠী কাফের জমিদার রাজাদের দল। ভেবেছিলাম ঔরংজীব বিব্রত থাকবে। কিন্তু ঔরংজীব এরই মধ্যে বিজাপুরের সুলতানের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিয়ে আশ্চর্যভাবে তাদের কায়দা করেছে। এখান থেকে মহাবৎ খাঁকে পাঠিয়েছিলাম—মীরজুমলাকে পাঠিয়েছিলাম—ঔরংজীব আশ্চর্যভাবে তাদের আপন করে নিয়েছে। চাঁদে গ্রহণ লাগাবার জন্য প্রয়োজন হয় রাহুর। রাহুর মত নিষ্ঠুর কুটিল শক্তি সে সঞ্চয় করেছে। আমি চিন্তিত। কিন্তু এ কথা দারাসিকোকে বলো না এখন। আমি ধীরে ধীরে ব্যবস্থা করব বেটী। আমি রাহুকে ভয় পাচ্ছি। রাহু তো শুধু চাঁদকেই গ্রাস করে না সূর্যকেও গ্রাস করে। তবে তুমি সাবধান থেকো। নজর রেখো

রৌশনআরার উপর। কড়া নজর, তবে সুকৌশলে। সে যেন ঠিক ধরতে না পারে, বুঝতে না পারে।

সাবধান জাহানাআরা হয়েছেন। তবে রৌশনআরা তাঁর থেকেও সাবধান—তা ছাড়া তিনি আরও কিছু যা তিনি নন—যা তিনি কিছুতেই হতে পারবেন না এই জিন্দিগীতে। জটিল এবং কুটিল। আশ্চর্য তাঁর কূটনৈতিক তৎপরতা। আশ্চর্য তৎপরতার সঙ্গে তিনি হিন্দুর মুসলমান বিরোধিতা ও আক্রোশ এবং মুসলমানের হিন্দু বিরোধিতা ও বিদ্বেষকে কাজে লাগিয়েছেন।

ঠিক এই কারণেই বাদশাহকে বেহোঁশ অবস্থায় দেখে শাহজাদী জাহানআরা বাদশাহের পাঞ্জা এবং সীলমোহর সমস্ত কিছু সাবধানে সামলে রেখে রঙমহলের দারোগাকে নাজির খোজা সর্দারকে বলেছিলেন—ফটকে ফটকে পাহারা বদল করে এমন লোক দেবে বেছে বেছে যাদের আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারি। সেই কারণেই ফটকের লোকে খানখানান খলিলুল্লা খানের বাড়ির পালকি দেখে আটকও করেছিল, রহস্যও করেছিল—বলেছিল—বাদশার বেমারী, সব লোক জানে কি খলিলুল্লা খানসাহেবের হারেমের পালকিতে তাঞ্জামে বাদশাহের খানা আসে। লেকেন বাদশাহের তবিয়ৎ বহুৎ খারাব। খানা তো নেহি খায়েঙ্গে জাহানপনা শাহানশাহ। ঘর লে যাও।

সঙ্গে সঙ্গে পালকির দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছিলেন শাহজাদী রৌশনআরা। আজ যেন তাঁর সকল ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেছে। নেমেই সিপাহীটার সামনে গিয়ে সোজা দাঁড়ালেন মূর্তিমতী অলঙ্ঘনীয় এক আদেশের মত। সে দাঁড়াবার ভঙ্গিই আলাদা। এমনভাবে দাঁড়াতে সেই পারে যে জন্মের সঙ্গে সঙ্গে এমনি একটা অধিকারের ফরমন নিয়ে জন্মায়।

প্রহরীটা আশঙ্কামিশ্রিত আশঙ্কায় যেন কেমন হয়ে গেল।

এমনভাবে আশ্চর্য দর্পিত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বেরিয়ে এমন সোজা শক্ত সমুন্নত মহিমায় কোন নারীকে দাঁড়াতে সে কখনও দেখে নি। সে ভয়ে দু পা পিছিয়ে গেল।

রৌশনআরা এক পা এগিয়ে গেলেন।

লোকটা কুর্নিশ জানাল। তার মনে হল এই বোরকাধারিণী যদি হুকুম করেন—"তুই মরে যা এখনি", তাহলে নিজের জানটা সে নিজের হাতে খতম করতে বাধ্য।

রৌশনআরা বললেন—বেতমিজ হো তু! তরিবৎ জানিস নে তুই?

—মাফ কিজিয়ে বেগমসাহেবা!

—বাদশাহী হারেমে পাহারা দিতে এসেছিস, জানিস না, বাঁদী সেজে মেহমান সেজে বেগম শাহজাদীরাও বাইরে যায়! যেতে হয় তাদের!

—কসুর হো গয়া জনাব—

রৌশনআরা একটা আংটি তার হাতে দিয়ে বললেন—মঝলি শাহজাদী রৌশনআরজীউর খাদিমানকে এটা দিলে সে তোমাকে খুশী করে দেবে। আমিনা—। পহ্চান দে।

নাদিরা মুখের আবরণ তুললে।—মঝলি শাহজাদীর মহলের যে কাউকে হোক এই আংটি দেখিয়ে বলবে আমিনা বানুকে ডেকে দাও।

ততক্ষণে রৌশনআরা পালকিতে উঠেছেন। ভিতর থেকে হুকুম শোনা গেল—চলো ভিতর। জলদি।

পরক্ষণেই বেহারাদের বললেন—থোড়া সবুর। ফিরে দাঁড়িয়ে সিপাহীকে ডেকে বললেন—সিপাহী! তুমি না বললে বাদশাহের বেমারী? কখন থেকে? কি হয়েছে? জান?

—হাঁ, মহামান্যা শাহজাদী।

—চুপ্। মৃদুস্বরে প্রায় ধমক দিয়েই তিনি বললেন—বেওকুফ তুম।...শাহজাদী কে? ও-কথা বলতে নেই। বললে তার জিভ কেটে দেওয়া হয়।

শিউরে উঠে সিপাহী বললে—বুঝেছি। মহামান্যা শাহ্—

একটা শব্দ করে উঠলেন এবার। সিপাহীটা থেমে গেল। তিনি বললেন—কি অসুখ বাদশাহের?

—ঠিক জানি না। তবে শুনছি হোঁশ নেই। আমাদের উপর হুকুম—

বাধা দিয়ে রৌশনআরা বললেন—হোঁশ নেই? একটু থেমে ভেবে নিয়ে আবার জিজ্ঞাসা করলেন—শাহজাদা দারাসিকো কোথায়? তিনি তো কেল্লার মধ্যে নেই?

—এই কিছু আগে শাহবুলন্দ ইকবাল বড়া-শাহজাদা এসে পৌঁছেছেন। এই আপনি এসে এখানে যতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন আরও এতক্ষণ আগে তিনি এসেছেন। হজরতবেগম বড়ীশাহজাদী তাঁকে খবর পাঠিয়েছিলেন।

—শোন।

—ফরমাইয়ে—

—এক ঘড়ির মধ্যে এক বান্দা বেরিয়ে যাবে। সে এসে তোমাকে বলবে 'মঝলি শাহজাদী জিন্দা রহে'। তুমি তাকে ছেড়ে দেবে। তোমার উপর নিশ্চয় হুকুম হয়েছে বিনা তল্লাসীতে কোন আদমীকে ছাড়বে না।

—হুজুরাইন মালিক!

—হাঁ। আমিও নিশ্চয় মালিক। আমার হুকুম তামিল করলে খুদা তোমাকে মেহেরবানি করবেন।

নিজের কানে গোঁজা আতরমাখানো তুলোর একটা টুকরো তার হাতে দিয়ে বললেন—ধরো।

লোকটা মুহূর্তে যেন বিহ্বল হয়ে গেল।

রৌশনআরা পালকিতে চড়ে বসলেন। পালকি চলে গেল কেল্লার ভিতরে। লালকেল্লার যমুনার ধারের পাঁচিলের গায়ে গায়ে রাস্তা ধরে বাদশাহী হারেমের পাশ দিয়ে চলে গেলেন আপনার

মহলে। তখনও 'শাওন-ভাদো' তৈরী হয় নি। এ দিকটা নির্জন ছিল।

কেল্লার ভিতরে যেন একটা চঞ্চলতা চাপা দেওয়া রয়েছে। যেটাকে চোখে স্পষ্ট দেখা যায় না কিন্তু অনুভব করা যায়।

রৌশনআরা আপন মহলে ঢুকেই সেই সাধারণ গৃহস্থঘরের ব্যবহার করা পুরনো বোরকাটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। তারপর মুখ হাত ধুয়ে একটু পরিচ্ছন্ন হয়ে পোশাক বদলে মহল থেকে বেরিয়ে পড়লেন। মহলের বাইরে তখন প্রধানা বাঁদী আমিনা অন্য বাঁদীর কাছে প্রশ্ন করে জানছিল তাদের অনুপস্থিতিতে কি কি ঘটেছে। বড়ীশাহজাদীর কাছ থেকে কোন ইত্তালা এসেছিল কি না? কিংবা বড়শাহজাদা শাহবুলন্দ ইকবালের মঞ্জিল নিগমবোধ থেকে কোন কেউ কোন অজুহাতে এসেছিল কি না?

রৌশনআরা থমকে দাঁড়ালেন। বললেন—বে-ফয়দা জিজ্ঞাসা করছিস আমিনা। ওতে আর লাভ নেই। এখন সোজা মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে। 'ওয়াক্ত' আ গয়া। এখন সব ঢাকনা খুলে ফেলে দাঁড়াতে না পারলে সবকুছ বিলকুল বরবাদ হয়ে যাবে। ডরো মৎ। খুদা মালিক। মরজি তাঁর। পয়গম্বর জানের্ন ইসলামকে ওরা জাহান্নমে পাঠাবে। তুই লোক ঠিক করে রাখ। শাহানশাহের অবস্থা আমি দেখতে চললাম। এসেই সওয়ার পাঠাব ঔরঙ্গাবাদে। ঠিক করে রাখ সব।

* * * *

বাদশাহ বেহোঁশ হয়ে শুয়ে আছেন। তবুও শ্বাসপ্রশ্বাসের মধ্যে যন্ত্রণাভোগের একটা স্পষ্ট পরিচয় রয়েছে। চেতনা থাকাকালীন বহু যুদ্ধের নায়ক বীর বাদশাহ যে কষ্ট নীরবে সহ্য করেছেন—যার মধ্যে তাঁর এই মহান পদমর্যাদার পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে, চেতনা বিলুপ্ত হয়ে গিয়ে সেই পরিচয়টুকু যেন হারিয়ে গেছে। অস্ফুট একটি উঃ উঃ শব্দ করছেন তিনি।

শাহজাদা দারাসিকো তাঁর পায়ের দিকে দাঁড়িয়ে আছেন। একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন পিতার রোগক্লিষ্ট মুখের দিকে। শিয়রের দিকে একখানি আসনে বসে আছেন শাহজাদী জাহানআরা। দুই পাশে দুজন বাঁদী বাদশাহকে বাতাস দিচ্ছে, পাংখা চালাচ্ছে।

শাহজাদা দারাসিকো রৌশনআরার দিকে ফিরে তাকালেন—চোখ দুটি মুহূর্তের জন্য জ্বলে উঠল। রৌশনআরাও স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন; দৃষ্টি তিনি নামালেন না। বড়াবহেনসাহেবা বললেন—রৌশনআরা বহেনের তবিয়ৎ ভাল ছিল না—অসময় পর্যন্ত ঘুমিয়েছ। দুবার খোঁজ করেছি আমি। এখন ভাল বোধ করছ?

রৌশনআরা তাঁর দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন—ঘুম থেকে উঠেছি আমি অনেকক্ষণ। উঠে গিয়েছিলাম একজন ফকীরসাহেবের কাছে। জানতে গিয়েছিলাম খুদাতায়লার অনুগৃহীত পয়গম্বর রসুলের খিদমদগার ইসলামের মেহেদী শাহানশাহ বাদশাহ সাজাহান গাজীর এমন বেমারী হল কেন? এ কি কোন কাফের জাদুবালার কি ওঝার তুকতাক বা বাণ মারামারি? বাদশাহ এমনভাবে ঘায়েল হলে হিন্দুস্তানে ইসলামের কোন্ হাল হবে?

দারাসিকো বললেন—ভয় নেই—ব্যাকুল হয়েও লাভ নেই। বাদশাহ দু একদিনের মধ্যেই সেরে উঠে বসবেন।

রৌশনআরা বললেন—হাঁ, তিনিও তাই বললেন। তবে—।

—কি তবে?

—তবে—বললেন—তুফান একটা বইবে। সেই তুফানে দুটো পদ্মফুল—লাল পদ্মফুল ভেসে তলিয়ে যাবে।

শাহজাদা দারাসিকো চমকে উঠলেন। তিনি আবার স্থিরদৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন বোনের মুখের উপর। রৌশনআরার চাপা ঠোঁট দুখানির বক্ররেখাটির উপর যেন বেশী একটু চাপ পড়ল। চাপলেন তিনি নিজেই। তবুও ব্যঙ্গহাস্যের প্রকাশকে তিনি পুরোপুরি ঢাকতে পারলেন না।

শাহজাদা দারাসিকো মর্যাদাবোধের প্রখরতায় একটু বেশী উগ্র; সে উগ্রতা সম্প্রতি বেড়েছে। তিনি অসহিষ্ণু হয়েই উঠেছিলেন; কিন্তু অসহিষ্ণু হয়ে কিছু বলবার পূর্বেই বাইরে থেকে হারেম দারোগা খোজা সর্দার এসে অভিবাদন করে বললে—কবিরাজজী এসেছেন—হকিমসাহেবের পালকিও এসে নেমেছে।

শান্ত হয়ে দারাসিকো বললেন—নিয়ে এসো তাঁদের।

কবিরাজ এবং হকিম দুজনেই বাদশাহকে দেখতে বসলেন। এরই মধ্যে থেকে রৌশনআরা কিছুক্ষণ পরেই আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দ্রুতপদে চললেন নিজের মহলের দিকে।

তিনি বুঝে এসেছেন বাদশাহের অবস্থা।

অবস্থা ভাল নয়। না—সোজা কথাই বলা ভাল—অবস্থা খারাপ। কথাটা এখনই জানাতে হবে ঔরংজীবকে। রাত্রি দু-পহরের ঘড়ি বাজবার আগেই তাকে বিদায় করে কেল্লা থেকে বের করে দিতে হবে। শহরের ফটক খুলবার সঙ্গে সঙ্গে সেই যেন প্রথম বেরিয়ে যেতে পারে। সেই লোকই খবর দিয়ে এল খানখানান সায়েস্তা খাঁয়ের বাড়িতে এবং উজীর মীরজুমলা খাঁয়ের ছেলে মহম্মদ আমীনের কাছে। উজীর মীরজুমলা এখন দক্ষিণে, শাহজাদা ঔরংজীবের সঙ্গে রয়েছেন। বিজাপুরের আদিলশাহী সুলতানের সঙ্গে সেখানে লড়াই চলছে। শাহজাদী রৌশনআরা তাঁদের বলেছেন তাঁরাও যেন আপন আপন সওয়ার পাঠান। তিন তরফ থেকে তিন সওয়ার যাবে—তাতে অন্ততঃপক্ষে একজন সওয়ারও শেষ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছুবে শাহজাদা ঔরংজীবের কাছে। এ ছাড়া তাঁরাই দিল্লী শহরে সব মনসবদারদের কাছে খবর পৌঁছে তাদের হুঁশিয়ার করে দেবেন। প্রস্তুত থাকতে বলবেন—কখন কি হয় কে বলতে পারে? খলিলুল্লা খানের বাড়িতেও খবর গেল। সে খবর নিয়ে গেল খানের বাড়ির পালকির রক্ষক বর্কআন্দাজ সর্দার। খানসাহেব খলিলুল্লার বেগম বাদশাহের

প্রিয়সখী, এই বয়সেও তিনি এসে বাদশাহের চিত্তবিনোদন করে যা'ন। শাহজাদা দারাসিকো এতে মনে মনে কিছু বিরক্ত। কিন্তু তা বলে বাদশাহের এই মরজিতে বাধা দেন না। শাহজাদী জা'হানআরাও না। মোটামুটি খাতিরই করে থাকেন। তবুও এই খলিলুল্লা খাঁ সাহেবও শাহজাদা দারাসিকোর সমর্থক নন। সঙ্গে সঙ্গে জানালেন—"আগের চিঠি জাহানআরা বহেনজীউয়ের লোক ধরে ফেলেছিল। এবার তারা আরও সতর্ক হয়েছে—আরও সজাগ হয়েছে। কিন্তু কোনও ভয় করো না। ভয় করলেই সর্বনাশ হবে। সাহস যার বেশী সেই জিতবে।"

*   *   *

সাতদিন পর বাদশাহ চোখ মেললেন।

দেহের উত্তাপ কমল, কোষ্ঠবদ্ধতা মূত্রকৃচ্ছ্র তার উপশম হল, হাত পা ফুলেছিল সে ফোলা কমল। বাদশাহ চোখ মেলে মৃদুস্বরে বললেন—খুদা মেহেরবান।

মাথার শিয়রে শাহজাদী জাহানআরা একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিলেন—তিনি চকিতভাবে সোজা হয়ে বসলেন—ডাকলেন—পিতা!

পায়ের দিকে আসনে বসে ছিলেন দারাসিকো, তিনিও সজাগ হয়ে বসলেন। আসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন তিনি।

—জাঁহাপনা।

মুহূর্তে বাদশাহের চোখ দুটি সজল হয়ে উঠল। ঠোঁট দুটি অল্প একটু কেঁপে উঠল। একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আত্মসংবরণ করলেন তিনি। তারপর একটু হেসে বললেন—খুদার মেহেরবানির আর শেষ নেই। বাদশাহ সাজাহানের প্রতি তাঁর অশেষ করুণা। জাহানআরার মত কন্যা এবং দারার মত পুত্র তিনি আমাকে দিয়েছেন। তোমরা কি এইভাবেই বসে রয়েছ? বিশ্রাম কর নি? যাও যাও, বিশ্রাম করগে।

—সূর্যোদয় হচ্ছে জাঁহাপনা—আর এখন বিশ্রামের সময় নেই।

—সে কি! তোমরা সমস্ত রাত্রি এইভাবে জেগে আছ!

জাহানআরা তাঁর মুখের কাছে মুখ এনে বললেন—আপনি এমন করে কথা বলবেন না। আজ ছ' দিন আপনি বেহোঁশ হয়ে ছিলেন। কি যে উৎকণ্ঠার মধ্যে আমাদের দিন রাত্রি কেটেছে সে জানেন একমাত্র দিনদুনিয়ার মালিক যিনি—তিনি।

চমকে উঠলেন বাদশাহ—ছ' দিন! ছ' দিন বেহোঁশ হয়ে আছি!

—হাঁ বাজান।

—ছ' দিনই কি তোমরা এইভাবে আমার শিয়রে আর পায়ের কাছে বসে আছ?

শাহজাদী এবং শাহজাদা ভাই বোন দুজনেই নীরব হয়ে রইলেন। বাদশাহের পুরানো খিদমদগারনী বয়সে প্রবীণা, সে কুর্নিশ করে বললে—মা বাপে যেমন করে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন ঠিক তেমনি করে ওঁরা অসুস্থ জাঁহাপনার মুখের দিকে তাকিয়ে জেগে বসে আছেন এই ছ' ছদিন।

—এয় খোদা—! এর বেশী আর কথা উচ্চারণ করতে পারলেন না বাদশাহ। কণ্ঠস্বর তাঁর আবেগে অবরুদ্ধ হয়ে এল।

—আপনি কি এখন বেশ সুস্থ বোধ করছেন পিতা? জাহানআরা জিজ্ঞাসা করলেন।

—হাঁ বেটী। মনে হচ্ছে শরীর খুব হালকা। তবে হ্যাঁ, দুর্বল মনে হচ্ছে। আমাকে ওজু করবার জন্য পানি দাও। আমার কাপড়-চোপড় বদলে দাও। নামাজের জন্য ফরাশ পাত। হ্যাঁ। আজ আমাকে দর্শনঝরোকায় নিয়ে যাবে। আমি আজ সেখানে গিয়ে দাঁড়াব।

—আজ নয় জাঁহাপনা। একটু সুস্থ হয়ে নিন—

বাধা দিয়ে বাদশাহ বললেন—না না—তোমরা জান না। দারা জাহানআরা তোমরা এই দিল্লী শহরে লালকিল্লায় বসে আছ—

আমি সুস্থ হয়ে উঠেছি—তোমরা আশ্বস্ত হয়েছ। এখনও ঠিক অবস্থা সমঝাতে পার না। আমি পারি। আমি পারি। শাহানশাহ বাদশাহ জাহাঙ্গীর গাজীর ইন্তেকাল হল বাজৌরীতে। আমি তখন দক্ষিণে। বাদশাহ যখন থেকে অসুস্থ হয়েছেন তখন থেকে আমরা তৈয়ার হচ্ছিলাম। তোমরা দিল্লীতে আমার কাছে বসে আছ—আমার সমস্ত সমর্থন তোমরা পেয়েছ, পাচ্ছ—তোমরা বুঝতে পারবে না। আমার মনে পড়ছে—।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন—খবর রাখ সারা হিন্দুস্তানে কি হচ্ছে? জান? দক্ষিণের খবর জান? ঔরঙ্গাবাদ? গুজরাটের? বাংলার? রাজমহলের?

—এখনও কোথাও কোন চিন্তার কারণ ঘটে নি জাঁহাপনা—আপনি আশ্বস্ত থাকুন। নিশ্চিন্ত হোন।

—আশ্বস্ত হতে বলছ? হুঁ। চিন্তার কারণ নেই? আচ্ছা। শোন। সায়েস্তা খাঁ, খলিলুল্লা খাঁ, মীর জুমলার ছেলে মহম্মদ আমীন, মহারাণা জয়সিংহকে খবর দাও—আমি সুস্থ হয়েছি, আমি কথা বলব তাদের সঙ্গে। হারেমের মধ্যে এখানেই দেখা করব আমি।

* * *

হাজারে হাজারে কাতারে কাতারে লোক জমায়েত হয়েছিল দর্শনঝরোকার নীচে। শাহানশাহ বাদশাহ সেরে উঠেছেন। দর্শনঝরোকায় দর্শন দেবেন। বাদশাহ একদিকে তাঁর প্রিয়তম পুত্রের কাঁধে অন্যদিকে পৌত্র শাহজাদা সুলেমানের কাঁধে ভর দিয়ে এসে দাঁড়ালেন দর্শনঝরোকার সামনে। বাদশাহকে দেখে দিল্লীবাসী হিন্দু মুসলমান তাঁর জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল। বাদশাহের মুখে একটি স্মিতহাসি ফুটে উঠল, অন্তরে অন্তরে তাঁর তৃপ্তির আর অন্ত ছিল না। দিল্লীর প্রজা দিল্লীর মানুষ তাঁকে এমন গাঢ় ভালবাসায় ভালবাসে।

সহস্র জয়ধ্বনির মধ্যেও তিনি সেই ধ্বনিটি শুনেছেন, কোন বা কয়েকজন ধ্বনি দিয়েছে—দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা।

সেখান থেকে ফিরে এসে বাদশাহ ওমরাহদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তাঁরা বাদশাহের তলব মত বাদশাহের মহলে বাইরের কামরায় অপেক্ষা করছিলেন। বললেন—আমি সেরে উঠেছি, সুস্থ হয়েছি। শরীরের খানিকটা দুর্বলতা আর একটা অঙ্গের যেন খানিকটা অসাড় ভাব—এ ছাড়া আর কোন রোগ আমার নেই। কিছু দিনের মধ্যেই আমি বোধ হয় দরবার করতে পারব।

আমীর এবং মনসবদারেরা সম্রাটকে অভিবাদন করে বললেন—শাহানশাহ দীর্ঘজীবন লাভ করুন। হিন্দুস্তানে অখণ্ড শান্তি বিরাজ করুক। আমরা বাদশাহের সেবা করে ধন্য হই।

বাদশাহ বললেন—আমি জানি, আমি জানি। শাহানশাহ বাবরশাহ থেকে একাল পর্যন্ত হিন্দুস্তানের আমীরলোক আর রাজপুত রানালোকের ইমানদারির উপর মুঘল বাদশাহী কায়েম হয়েছে, দিনে দিনে বেড়ে চলেছে, আয়তনে বেড়েছে। তামাম মুল্কের সুখ শান্তি দিনে দিনে মজবুদ হয়েছে। বাদশাহেরা তার জন্য মনসবদারদের আমীর উমরাহদের সামন্ত রাজাদের বহুৎ বহুৎ সম্মান করেছেন; খেলাত দিয়েছেন। আমরা কৃতজ্ঞ। এখন আমার বলার কথা, আমার আরজ আপনাদের কাছে—আমার কিছু বিশ্রাম চাই। খানখানান সায়েস্তা খাঁ তুমি আমার আপনজন—মেহমান আমার, মহারানা জয়সিং আপনি বাদশাহীর স্তম্ভ। আপনাদের উপর ভরসা রেখে আমি কাজকর্মের সব ভার দিতে চাই শাহবুলন্দ ইকবাল শাহজাদা দারাসিকোর হাতে। আমার বিশ্বাস এতে সকলেই আপনারা সানন্দে সম্মতি দেবেন। আর শাহবুলন্দ ইকবালের যোগ্যতা সর্বজনস্বীকৃত। পথের ভিক্ষুক থেকে ফকীর থেকে আমীর পর্যন্ত সকল লোকেই তাঁকে খুদাতায়লার আশীর্বাদধন্য মানুষ বলে মানে। তিনি আসমানে থাকবেন প্রসন্ন সূর্যের মত, আর তাঁর রৌদ্রছটায় হিন্দুস্তান শান্ত প্রসন্ন সমুদ্রের মত ঝলমল করবে।

ওমরাহেরা একবাক্যেই সম্মতি জানালেন—কিন্তু সে সম্মতি নিষ্প্রাণ অপ্রসন্ন। শুধু একটা ধ্বনির মত। তার বেশী কিছু নয়।

বাদশাহ জিজ্ঞাসা করলেন—কই, মহারানা জয়সিং তো কিছু বললেন না!

মহারানা জয়সিংহ অভিবাদন করে বললেন—শাহবুলন্দ ইকবাল আমার মেহমান জঁাহাপনা। আমার বাড়ির বেটী শাহজাদার বড়াবেটার বড়িবহু।

—ঠিক ঠিক।

শাহজাদা দারাসিকো এসে বাদশাহের কাছে দাঁড়ালেন; সসম্ভ্রমে ঈষৎ নত হয়ে বললেন—দিদিজীউ তাঁর আরজি পেশ করেছেন জঁাহাপনা।

—জাহানআরা?

—হাঁ আলমপনা। বলেছেন—জঁাহাপনা শরীরের উপর বেশী জুলুম করছেন।

বাদশাহ একটু হেসে বললেন—অনেককাল আগে—তখন আমি শাহজাদা খুরম—আমি গিয়েছিলাম শীতকালে শিকারে। মাঠের পাকা গহুঁ তখন সব কেটে চাষীরা ঘরে তুলছে। হঠাৎ বিকেলে মেঘ এল। তার সঙ্গে হাওয়া। আমি এক চাষীর ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলাম, চাষীর বাড়ির মালিক বৃদ্ধ এবং রুগ্ণ। কিছুক্ষণের মধ্যেই বৃষ্টি পড়তে লাগল। তখন সে রুগ্ণ বৃদ্ধ বিছানা থেকে উঠে হুমড়ি খেতে খেতে গিয়ে চাটাই টেনে নিয়ে ফসল ঢাকতে আরম্ভ করলে। আমি তাকে বারণ করলে সে আমাকে বলেছিল—মুসাফের তুমি আমীরের ছেলে। আমার সামনে আমার চাষের ফসল বরবাদ হতে চলেছে—এর জন্যে বেদনা তুমি ঠিক বুঝবে না। ওর থেকে আমার মৃত্যু ভাল। বারণ আমাকে করো না বরং পার তো হাত লাগিয়ে আমাকে সাহায্য কর।

একটু থামলেন, তারপর আবার বললেন—এই হিন্দুস্তানের বাদশাহী, এ বাংলার বর্ষার মত জল ঝড় বন্যায় তুরন্ত তুফানে ভরা বাদশাহী, গুজরাট মরুভূমির ঝড়ের মত ঝড়ে বিপর্যস্ত বাদশাহী। চাঘতাইবংশের জবরদস্ত জঙ্গ্ বাহাতুর বাবরশাহ এসে এ মসনদ দখল করেছিলেন। তারপর চার পুরুষ ধরে আমরা এই মরুঝড়কে থামাতে চেষ্টা করেছি—বর্ষাবাদলা তুফানকে কাটাতে চেষ্টা করেছি। জালালুদ্দিন আকবরশাহ রাজপুত রাজাদের সঙ্গে মেহমানি করেছিলেন। তাদের বাড়ির বেটী তারা খুশী হয়ে বাদশাহদের ঘরে পাঠিয়েছে। তুশমনি দোস্তি হয়েছে। মরুভূমিতে ফসল ফলেছে। দূর দক্ষিণ থেকে পুরব তরফে আসাম কামরূপ পর্যন্ত, ওদিকে পশ্চিমে কান্দাহার কাবুল পর্যন্ত মুঘল বাদশাহীর এলাকা—ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেতিখামারের দৌলতের ফসলে ভরে রয়েছে। মানুষে মানুষে সদ্ভাব শান্তি মিঠাপানির ঝনার মত ঝরছে, বেয়ে যাচ্ছে। এ দেশ যদি—

থেমে গেলেন তিনি। অনেকক্ষণ কথা বলে তিনি যেন হাঁপাচ্ছিলেন। শাহজাদা দারাসিকো তাকালেন পাংখাদারের দিকে। একটা ইঙ্গিতও দিলেন। সে পাংখাখানা জোরে আন্দোলিত করতে লাগল। ঘরখানা থমথম করছিল। বাদশাহ বললেন—এই অসুখের মধ্যে বেহোঁশ হয়েছিলাম। কিন্তু তার মধ্যেও যেন এই হিন্দুস্তানের ভাবনা ভেবেছি। মধ্যে মধ্যে এমন হয়েছে যে মনে কিছুই নেই। সে একটা পুরু থমথমে নিস্তব্ধ অন্ধকারের মত। মধ্যে মধ্যে দেহের কষ্ট কিছু অনুভব করেছি—তখন ভেবেছি; নিজের বেমারীর কথা নয়—ভেবেছি হিন্দুস্তানের কথা। ওই বুড়ো চাষীর মত আমার ইচ্ছে হয়েছে কোনমতে উঠে আমার হিন্দুস্তানের ক্ষেতির ফসল সামলাই। ভয় পেয়েছি। মনে পড়েছে বাদশাহী নিয়ে ঝগড়ার কথা। মনে পড়েছে হুমায়ুন থেকে আকবরশাহ জাহাঙ্গীরশাহ আমি সাজাহান কেউ এই তুর্ভাগা থেকে

বাদ পড়ি নি। আমি জানি আমার 'ভরোসা' কেবল আমার প্রিয়তম পুত্র শাহজাদা দারাসিকো।

মহারানা জয়সিংহ অভিবাদন করে বললেন—শাহানশাহ বাদশাহ হিন্দুস্তানের মালিক। মুসলমানেরা তাঁকে বলে মেহদী—হিন্দুরা বলে দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা। বাদশাহ যাকে মসনদে তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে বসাবেন—বাদশাহী পাঞ্জা আর সীলমোহর যার হাতে দেবেন—আমরা নোকর, তাঁকেই আমরা মান্য করব। তাঁরই হুকুমৎ আমরা বাদশাহের হুকুমৎ বলে তামিল করব। তবে অন্যান্য শাহজাদা যাঁরা—! কথা শেষ না করেই চুপ করে গেলেন মহারানা জয়সিংহ।

সায়েস্তা খাঁ বললেন—শাহজাদাদের কথা 'অলগ'। তাঁদের কথা তাঁরা বলবেন। কিন্তু আমরা শাহানশাহের নিমক খেয়েছি। তাঁর বাদশাহীতে ইনাম পেয়েছি কাম পেয়েছি জমীন পেয়েছি মনসব পেয়েছি জায়গীর পেয়েছি—আমরা জরুর তাঁর হুকুমৎ তামিল করব। বাদশাহ যখনই হুকুম করবেন যে শাহজাদা দারাসিকোকে বাদশাহের মত মান্য করতে হবে, আমরা জরুর তাই করব।

—শুধু আমার হুকুম নয় সায়েস্তা খাঁ। একে তুমি খুদার অভিপ্রায় বলে মেনে নিয়ো। সেই হিসেবে তুমি তামিল করো। একটা কথা তোমাদের বলি শোন। হজরতবেগম মমতাজমহলও তখন বেঁচে। শাহজাদা শাহজাদীরা তখন ছোট। এক ফকীর এসে আমাকে একটি পাকা আপেল দিয়েছিলেন, বলেছিলেন— বাদশাহ, এই আপেল তুমি খেয়ো। এ আপেল খেলে তোমার হাতে পাকা আপেলের খুসবয় উঠবে। যতদিন উঠবে ততদিন জেনো যত কঠিন অসুখই হোক তোমার তুমি বাঁচবে। আজও আমার হাতে সে গন্ধ উঠছে। আমি বাঁচব। আর বলেছিলেন —তোমার এই জ্যেষ্ঠপুত্র এই দারাসিকো তোমার সৌভাগ্য সমৃদ্ধি আর বাদশাহীর শ্রেষ্ঠ শুভগ্রহ। এর প্রতাপে মহিমায় তোমার

প্রতাপ এবং মহিমা। আর বলেছিলেন—ইনি ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষ। ইনি নির্মল আকাশে যতদিন সূর্যের মত আসীন থাকবেন ততদিন রাজত্ব বাদশাহী থাকবে শান্ত প্রসন্ন সমুদ্রের মত।

বাদশাহ আর একবার থেমে একটু দম নিয়ে বললেন—শাহজাদা দারাসিকো তুমি আমার এই খাসকামরাতেই ছোট দরবার ডাকো। আমি ভালো হয়ে উঠেছি—সেই উপলক্ষে আমি খেলাত দেবো, খেতাব দেবো, জায়গীর মনসব দেবো। মসজেদে মসজেদে তুমি ইমামসাহেবদের কাছে খুত্‌বা নামাজ পড়বার জন্য টাকা পাঠাও। বড় বড় ফকীর সাধু সন্ত হজরত সারমাদ হজরত মহশীন ফানী আজমীঢ়ে ফকীরসাহেবের কাছে আমাদের বহুৎ বহুৎ সালামৎ আর নজরানা পাঠাও।

হাঁ—দরবারের দিন দরবারে খুদার নামগান হবে। 'গৌনসমুদ্র' লাল খাঁ সাহেব মহাকবিরায় জগন্নাথ রায়কে খবর দিয়ো। তার সঙ্গে বীনকার সুরসেন, আর রবাবী সুখসেনকেও নিমন্ত্রণ করো। বাঁদী বাঈদের অনেক নাচ গান শুনেছি—এবার খুদার নাম হবে। এই মহলেই হবে। ছোট মজলিস।

তারপর উজীর মীরজুমলার পুত্র মহম্মদ আমীনকে বললেন—আমীন, তুমি তোমার দফ্‌তর থেকে হুকুমনামা লিখে আন। তোমার আব্বাজান উজীর-এ-আজম মীরজুমলা সাহেবের নামে আর খানখানান মহব্বৎ খানের নামে।

উজীর মীরজুমলা এবং খানখানান মহব্বৎ খাঁ এখন সুদূর দক্ষিণে, বিজাপুরের আদিলশাহী এবং গোলকুণ্ডার কুতবশাহী সুলতানদের সঙ্গে লড়াইয়ে নিযুক্ত রয়েছেন। কিছুদিন আগে শাহজাদা ঔরংজীব এই যুদ্ধের অজুহাত বের করে এই লড়াইয়ের অনুমতি চেয়ে পাঠিয়েছিলেন। শাহজাদা দারাসিকো বিজাপুর এবং গোলকুণ্ডার সুলতানদের সঙ্গে যুদ্ধের বিরোধী ছিলেন কিন্তু বাদশাহ সে কথা শোনেন নি। তিনি ঔরংজীবকে অনুমতি দিয়েই ক্ষান্ত থাকেন নি,

তাঁকে সাহায্য করবার জন্য পাঠিয়েছিলেন উজীর মীরজুমলা এবং মনসবদার মহাব্বৎ খাঁকে। মীরজুমলা গোলকুণ্ডার উজীর ছিলেন। গোলকুণ্ডার সমস্ত রন্ধ্রপথ তিনি জানেন। মহব্বৎ খাঁ সর্বাপেক্ষা বিচক্ষণ সেনাপতি। বিজাপুর এবং গোলকুণ্ডার সুলতানশাহী বিলুপ্ত হলে উত্তরে কাশ্মীর থেকে দূর দক্ষিণে সমুদ্রতট পর্যন্ত তামাম ইলাকা চলে আসবে মুঘল বাদশাহীর মধ্যে। তার একটা মানচিত্র বাদশাহের মনে ছিল। মনে মনে চার ছেলের মধ্যে এই বিস্তীর্ণ বাদশাহী ভাগ করে দেবার ছক আঁকতেন।

মীরজুমলা এবং মহব্বৎ খাঁ এখন দক্ষিণে। বিজাপুর এবং গোলকুণ্ডায় যুদ্ধ চলছে।

আজ বাদশাহ বললেন—মহম্মদ আমীন হুকুমনামা লিখে আন—উজীর-এ-আজম মীরজুমলা এবং খান-খানান মহব্বৎ খাঁ আপনারা শাহানশাহ বাদশাহ হিন্দুস্তানের জরুরী হুকুমৎ জানো; তোমরা অবিলম্বে তোমাদের ফৌজ নিয়ে যত তুরন্ত হয় চলে এসো দিল্লীতে খাস সাজাহানাবাদে।

—সে কি জাঁহাপনা—দক্ষিণের লড়াই—

—ঔরংজীব শাহজাদাকে হুকুমনামা লেখ—লড়াই মিটিয়ে ফেল। জীবনে আর লড়াই চাই না। শেষ কটা দিন শান্তি চাই। তাই বা কেন? দুনিয়া থেকে যাবার আগে দুনিয়াকে শান্তির দুনিয়া দেখে যেতে চাই!

*　　　*　　　*

সেই দিনই সন্ধ্যার সময় শাহবুলন্দ ইকবাল মহাসমারোহ করে উপস্থিত হলেন হজরত সারমাদের আস্তানায়।

হজরত সারমাদের আস্তানা সেদিন লোকে লোকারণ্যে পরিণত হয়েছে। শাহবুলন্দ ইকবাল মহম্মদ দারাসিকোকেই বাদশাহ নিজের জীবিতকালেই মসনদে বসাচ্ছেন। এরপর যতকাল বাদশাহ বাঁচবেন তিনি মালা জপ করেই কাটাবেন।

নয়া জিন্দিগী কায়েম হবে।

কারণ এ খুদার মরজি—ভগবানের ইচ্ছা। এরই জন্যে দুনিয়ায় পয়দা হয়েছেন শাহজাদা দারাসিকো।

তাঁকে সাহায্য করতে এসেছেন বড় বড় সন্ত সাধু দরবেশ ফকীর। হরজত সারমাদ। লালবাবা মহারাজ। হজরত মহসীন ফানী। হিন্দু মুসলমান ইহুদী কেরেস্তান বলে অলগ-অলগ কিছু আর থাকবে না। সব এক হয়ে যাবে।

এরই জন্যে দলে দলে লোক ছুটে চলছে হজরত সারমাদের আস্তানায়।

—

সাতচল্লিশ

এক পৃথিবী, এক তুনিয়া কায়েম হল হিন্দুস্তানে। সুখের তুনিয়া। আনন্দলোক। তুমি হিন্দু হও আর মুসলমান হও, ক্রীশ্চান হও কি জেসুইট হও কোন ফরক নেই—কোন প্রভেদ নেই। কোন ঝগড়া নেই। সব মিল হয়ে যাবে। গঙ্গাজীর পানির সঙ্গে যমুনা মাইয়ার পানি যেমন বিলকুল মিশ খেয়ে গেছে—সরস্‌তিয়ার ধারা যেমন মিশে এক হয়ে গেছে ঠিক তেমনি। পূরব আকাশ যেমন নীল পশ্চিম আকাশও তেমনি মিল—উত্তর দক্ষিণ যেদিকে তাকাও সব দিকেই আকাশ সেই এক আকাশ—রঙ তার এক, সেই নীলবর্ণ। ঠিক তেমনিই, ধর্ম তোমার যাই হোক, শাস্ত্র তোমার যাই হোক, তুমি সব মানুষের সঙ্গে এক। তুনিয়ার ইনসান বিলকুল এক; কোন ফরক নেই। ঈশ্বর আর আল্লায় বিরোধ নেই, প্রভেদ নেই। যিনি আল্লা তিনিই ঈশ্বর।

কাবার মসজেদে আর হিন্দুর মন্দিরে কালো পাথরখানি আর কষ্টিপাথরের বিগ্রহমূর্তির মধ্যে আসলে তিনি সেই এক—সেই কালো পাথর।

গান হচ্ছিল হজরত সারমাদের আশ্রমে।

"তুমি যেমন আছ কাবার পবিত্র মসজিদে তেমনিই আছ তুমি সোমনাথের মন্দিরে—শাহজাদা দারাসিকো বলেন—আমি জানি। আমার কাছে তোমার সাড়া আসে তুই জায়গা থেকেই।"

*　　　*　　　*

শাহানশাহ সাজাহান শাহজাদা দারাসিকোর হাতে তাঁর পাঞ্জা এবং তাঁর সীলমোহর তুলে দিয়েছেন দিল্লীর তামাম আমীর মনসবদারদের সম্মুখে।

উজীর মীরজুমলার ছেলে, মহারাজা মির্জা জয়সিং, মহারানা যশোবন্তসিং এবং অন্যান্য আমীরদের ডেকে, সকলকে প্রায় সাক্ষী

রেখে তাঁর পাঞ্জা এবং মোহর শাহজাদার হাতে তুলে দিয়ে বলেছেন—শাহবুলন্দ ইকবাল শাহজাদা দারাসিকো যা করবেন—যে ফরমন যে হুকুমনামা সহি করে জারি করবেন তা খুদ বাদশাহেরই করা হবে। এ কোনদিন নাকচ হবে না।

বাদশাহ খানিকটা সেরে উঠেছেন—তাঁর রোগের বিপদ কেটে গেছে কিন্তু সম্পূর্ণ সুস্থ নন। যতদিন তিনি সুস্থ না হয়ে উঠছেন ততদিন শাহবুলন্দ ইকবাল শাহজাদা মহম্মদ দারাসিকোই বাদশাহের হয়ে হিন্দুস্তান শাসন করবেন। তাঁর হুকুমতের ওজন মূল্য বাদশাহের নিজের হুকুমতের তুল্য হবে। দুয়ের মধ্যে কোন তফাত থাকবে না।

শাহজাদা দারাসিকো শান্তির স্বর্গীয় দূত। তিনি তামাম হিন্দুস্তানে শান্তি চেয়েছেন—যেখানে যত লড়াই হচ্ছে সব বন্ধ করবার জন্য বাদশাহকে আরজি জানিয়েছিলেন—বাদশাহ তা মঞ্জুর করেছেন।

যুদ্ধ চলছিল দক্ষিণে।

বিজাপুরের সুলতানের সঙ্গে এবং গোলকুণ্ডার সুলতানের সঙ্গে বাদশাহের প্রতিনিধি, দক্ষিণ মুল্কের সুবাদার শাহজাদা ঔরংজীব যুদ্ধ করছেন দীর্ঘদিন ধরে। বাদশাহ দিল্লী থেকে উজীর মীরজুমলা, সেনাপতি মহাব্বৎ খাঁ এবং রাজপুত সর্দার রাও ছত্রশালকে পাঠিয়েছিলেন শাহজাদাকে সাহায্য করবার জন্য। শাহজাদা ঔরংজীব যুদ্ধ প্রায় শেষ করে এনেছেন। বিদর দুর্গ এবং অঞ্চল অধিকার করে 'কল্যাণ' দখল করেছেন। বাকী বিজাপুর পড়তে আর কয়েকটা মাসের অপেক্ষা। ওদিকে গোলকুণ্ডাও যে কোন মুহূর্তে পড়তে পারে; এতদিন পড়ে নি এই আশ্চর্য; কারণ এককালের গোলকুণ্ডার উজীর, খানখানান আমীর-উল-উমরা মহম্মদ মীরজুমলা তার বিখ্যাত তোপখানা এবং গোলন্দাজ নিয়ে গোলকুণ্ডা ঘিরে বসে আছে। এখন মহম্মদ মীরজুমলা বাদশাহের উজীর। গোলকুণ্ডা জয় করবার জন্যই বাদশাহ তাকে দিল্লীর দরবার থেকে দূর দক্ষিণে

পাঠিয়েছেন। গোলকুণ্ডা হল দক্ষিণের দৌলতখানা। সোনার খনি রয়েছে গোলকুণ্ডায়—হীরার খনি রয়েছে গোলকুণ্ডায়। গোলকুণ্ডার মণিমাণিক্য দিয়ে পৃথিবীর সাম্রাজ্য কেনা যায়। হিন্দুস্তানের আজকের উজীর-এ-আজম মীরজুমলা ইরান থেকে ভিখ্‌মাঙোয়ার মত নিঃস্ব হয়ে এসেছিল ভারতবর্ষের দক্ষিণে। সেখানে গোলকুণ্ডায় হীরা যাচাইয়ের কাজ করতে করতে আজ তুনিয়ার শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্যশালীদের মধ্যে একজন; খান-খানান মীরজুমলার তোশাখানায় হীরাজহরত আছে বস্তাবন্দী, যার ওজন চার চার মনেরও বেশী। একখানা হীরা নজরানা দিয়েই মীরজুমলা দিল্লীর উজীরি পেয়েছে। বাদশাহ সে হীরাখানাকে বাদশাহী তাজের ঠিক মাঝখানে বসিয়ে নিয়েছেন। সে হীরাখানার এমনই জলুস যে তার দিকে তাকানো যায় না—চোখ ঠিকরে যায়, ঝলসে যায়। বাদশাহ হীরাখানার নামজারি করেছেন 'কোহিনূর'। সুতরাং হিন্দুস্তানের বাদশাহীর পক্ষে গোলকুণ্ডা শুধু দৌলতখানা নয় ইজ্জতখানাও বটে। সেই গোলকুণ্ডার লড়াই এখন ফতে হবার মুখে, এই এমন সময়েও বাদশাহ শাহবুলন্দ ইকবাল দারাসিকোর আরজি শুনে লড়াই বন্ধ করে দিলেন।

ওই দিনই হুকুমনামা চলে গেছে দক্ষিণে ঔরঙ্গাবাদ শহরে; এক হুকুমনামা গেছে শাহজাদা মহীউদ্দিন ঔরংজীবের নামে, এক হুকুমনামা গেছে উজীর মীরজুমলার নামে, এক হুকুমনামা গেছে মনসবদার মহাব্বৎ খাঁয়ের নামে আর একখানা জারি হয়েছে রাজপুত সর্দার রাও ছত্রশালের নামে।

"হিন্দোস্তানের বাদশাহ শাহানশাহ সাজাহান আবুল মজঃফর সাহিবুদ্দিন মহম্মদ সাহেব কিরান সানি দক্ষিণের সুবাদার মহীউদ্দিন ঔরংজীবের উপর এই হুকুম জারি করেছেন যে সুলতানশাহী গোলকুণ্ডার সুলতান মহম্মদ কুতবশাহ এবং সুলতানশাহী বিজাপুরের আদিলশাহী সুলতান আদিল শাহের সঙ্গে হিন্দুস্তানের বাদশাহের আর কোন লড়াই বা জঙ্গীবাজির কোন কারণ নাই। হিন্দুস্তানের

বাদশাহ কঠিন রোগ থেকে খুদার মেহেরবানিতে আরোগ্যলাভ করবার সময় এই সত্য অনুভব করেছেন যে শান্তি মৈত্রীর চেয়ে বাঞ্ছনীয় কিছু নেই ; বাদশাহ তাঁর রোগযন্ত্রণার উপলক্ষে যে সোয়াস্তি এবং শান্তি ও কল্যাণ সুখ অনুভব করেছেন তার থেকেও অধিকতর সুখ শান্তি ও কল্যাণ হবে যুদ্ধের পরিসমাপ্তিতে—এই সত্য তাঁকে উপলব্ধি করিয়েছেন কোন এক স্বর্গীয় দেবদূত এই রোগভোগ ও রোগ উপশমের মধ্যে। যুদ্ধের মধ্যে বাদশাহের হৃদয়ের নন্দনকানন দুর্যোগের ঝঞ্ঝায় এবং বজ্রাঘাতে ছারখার হয়ে যাবে—এই কথা দেবদূত তাঁকে বলেছেন বলে বাদশাহের ধারণা। সুতরাং বাদশাহের হুকুম যে বিজাপুর গোলকুণ্ডার সুলতানদের সঙ্গে সমস্ত বিরোধের অবসান হল। যুদ্ধ অবিলম্বে স্থগিত কর। এবং উজীর খানখানান মীরজুমলা সাহেব ও মনসবদার মহাব্বৎ খাঁ সাহেবকে ফৌজ নিয়ে অবিলম্বে দিল্লীতে পাঠিয়ে দাও। রাজপুত রাজা সর্দার ছত্রশাল রাওকেও ফিরে আসবার হুকুম দেওয়া গেল।"

* * *

দক্ষিণে শহর দৌলতাবাদের বাদশাহী প্রাসাদের একখানি নিভৃত কক্ষ। শাহজাদা ঔরংজীব তাঁর সামনে খোলা কোরান রেখে সযত্ন হস্তাক্ষরে কোরান নকল করছিলেন। সমগ্র ইসলাম জগতে কোরান নকল করা ছিল পবিত্রতম কাজগুলির অন্যতম। বাদশাহ সুলতানদের সন্তানেরা শাহজাদা সুলতানজাদারা বাল্যকাল থেকে এই কাজ করবার জন্য অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে হস্তাক্ষর সুন্দর করবার চেষ্টা করতেন। এবং সমস্ত জীবনের প্রতিদিনই কিছুক্ষণ এই কাজে নিজেকে নিযুক্ত রাখতেন। শাহজাদা সুলতানজাদা বাদশাহ সুলতানেরা এক একখানি কোরান নকল শেষ করে বিক্রী করতেন। এই বিক্রির টাকা কেউ জমা করে রাখতেন নিজেদের কাফন এবং কাফনে ব্যবহারের কাপড়ের জন্য। কেউ বা সেই অর্থ দান করতেন। শাহজাদা ঔরংজীব গোঁড়া সুন্নী মুসলমান। এই কোরান নকলের

কাজ কোন দিন তাঁর বন্ধ থাকে না। তাঁর নকল করা কোরানে কোথাও একটি কাটাকুটি থাকে না। কোন লোক—সে খাস বেগমসাহেবারা থেকে কোন আমীর বা কোন গোলাম বান্দার যত জরুরী কাজই থাকুক, সে সময় তাঁর কামরায় ঢুকতে পায় না। আজ তাঁর হাতের কলম হাতেই ধরা আছে। যে কাগজের পাতাখানায় তিনি নকল করছিলেন সেখানা সামনে চৌকির আকারের লিখবার আসবাবের উপর পড়ে আছে। চার ছত্র মাত্র লিখেছেন তাও পুরা চার ছত্র নয় সাড়ে তিন ছত্র; এরই মধ্যে চারটে-চারটে চুক হয়ে গেছে, দুটো চুক কলমের ডগায় বেমালুম সংশোধন হয়েছে কেবল হরফের দাগ একটু মোটা দেখাচ্ছে। তৃতীয় ছত্রের চুকের উপর কাটা দাগ রয়ে গেছে। সাড়ে তিন ছত্রের শেষ বা চার দফা চুক কেটে তিনি কাগজখানাকে সরিয়ে রেখে দিয়েছেন; কারণ এ কাটাকুটি চুকের এমন চিহ্ন রেখে দেবে যে দেখবামাত্র লোকে বুঝবে যে নকলনবীসের মন কোরানের পাতায় ছিল না বা নকল করার হরফে ছিল না, ছিল দুসরা কোন কিছুতে।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আংরাখার জেবের ভিতর থেকে একখানা চিঠ্‌ঠি বা নিশান বের করে খুলে ধরলেন চোখের সম্মুখে। এ চিঠি লিখেছেন বহেন রৌশনআরা বেগমসাহেবা।

"বাদশাহ তাঁর জীবিতকালেই শাহজাদা দারাসিকোকে হিন্দুস্তানের তক্তে বসিয়ে তাকে কায়েম করে দিচ্ছেন। বাদশাহের মোহর পাঞ্জা এখন সব দারাসিকোর হাতে। একবার এক জাদুওয়ালা জাদু দেখিয়েছিল। একটা আমের আঁটি মাটি খুঁড়ে বসিয়ে দিয়ে ঢাকনা ঢাকা দিয়ে তার জাদুদণ্ড ঠেকিয়ে মন্ত্র পড়ে ঢাকনাটা খুলে দেখিয়েছিল ওই সময়ের মধ্যেই গাছ জন্মেছে। তারপর একটা প্রশস্ত ঢাকনা ঢাকা দিয়ে জাদুদণ্ড ঠেকিয়ে খুলে দেখিয়েছিল ওই সামান্য সময়ের মধ্যে গাছটা প্রায় মানুষের কোমর পর্যন্ত বড় হয়েছে। তারপর সে একটা বেশ বড় কাপড়ের ঘের দিয়ে ঘিরে দিয়েছিল যার মধ্যে অন্তত পাঁচ

সাত হাত একটা গাছ ঢাকা পড়ে। জাদুদণ্ড ঠেকিয়ে এরপর যখন ঘেরটা খুলেছিল তখন ওই গাছটা এতখানিই বড় হয়েছিল এবং তাতে আমও ধরেছিল। সে আম আমি আস্বাদন করেছি। তেমনি একটা খেলা দেখাতে চাচ্ছেন বাদশাহ সাজাহান। তাতে তাঁর সহকারিণী হয়েছেন বেগম জাহানআরা—আমাদের দিদিজীউ। তফাত একটু আছে—সে তফাত হল এই যে জাদুকর আবার ঘের দিয়ে দিয়ে গাছটাকে ছোট করে এনে আবার আঁটিতে পরিণত করেছিল, আর বাদশাহ ও তাঁর বড়ী বেটীর এই খেলায় ওই গাছটা দিল্লীর লালকিল্লার দেওয়ানী আম দরবারে কায়েম হয়ে শিকড় গেড়ে বসে গেল। ও গাছটা আর সরবে না, নড়বে না, দিনে দিনে শাখা-প্রশাখা মিলে সারা হিন্দুস্তানে ছড়িয়ে দেবে। এবং ওই গাছটির শিকড় চালাবার জায়গার প্রয়োজনে এবং শাখাপ্রশাখা মেলার প্রয়োজনে তার চারিপাশে যে আর তিনটি গাছ আছে তাদের নির্মূল করে কেটে ফেলা হবে।"

বাদশাহ সাজাহান চিরদিনই পক্ষপাত করে আসছেন। স্নেহান্ধ এই বাদশাহ তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং কন্যার প্রতি চিরদিনই অন্ধভাবে আসক্ত। নিজে মুসলমান হয়েও তিনি তাঁর এই অপদার্থ দাম্ভিক ভণ্ড এবং কাফেরের মত ধর্মভ্রষ্ট পুত্রটির প্রতি আসক্তিবশতঃ ইসলামের ক্ষতিও সহ্য করে আসছেন। এখন তিনি তাঁর এই কঠিন রোগের মধ্যে সমস্ত জ্ঞান বুদ্ধি এবং বিবেচনাশক্তি নিঃশেষে হারিয়ে বসে আছেন। এখন তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ও জ্যেষ্ঠা কন্যার হাতের পুতুল ছাড়া আর কিছু নন। সারা হিন্দুস্তানের ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিরা আজ শঙ্কিত হয়ে উঠেছেন। সকলেই চিন্তিত। সে কি মুসলমান কি হিন্দু। সকলেই বলছেন—সকলেরই এক কথা। পাপাচারে হিন্দুস্তান পূর্ণ হয়ে যাবে। হিন্দু চিন্তিত—তার হিন্দুত্ব থাকবে না। মুসলমানের কথা শাহজাদা নিজে বুঝতে পারেন। তাঁর ভগ্নী রোশনআরার চোখেও এর জন্য নিদ্রা নাই। খানখানান

সায়েস্তা খাঁ চিন্তিত। ইসলামের যাঁরা বিশ্বস্ত অনুচর তাঁরা সকলেই চিন্তিত। রৌশনআরা লিখেছেন—"বাদশাহ বেঁচে আছেন এই ঘটনাটা সত্য হলেও সম্পূর্ণ মিথ্যা। এ বাঁচা বাঁচাই নয়। এ বাঁচা মৃত্যুর চেয়ে অনেক বেশী। শাহজাদা দারাসিকো তুকতাক ঝাড়ফুঁকে বিশ্বাসী, কাফেরী বিদ্যাতে তাঁর আস্থা আছে। সেই ধরনের কোন বিদ্যায় হয়তো নিজের কাজ হাসিল করবার জন্য বাদশাহের আত্মাকে এমন করে ধরে রেখেছেন। সে কাম হল, তাঁর হিন্দুস্তানের মসনদ দখলের কাম। যদি তাও না হয় তাহলেও একথা অত্যন্ত সত্য যে হিন্দুস্তানের বাদশাহীর সব এখতিয়ার তাঁর কবজায় যে মুহূর্তে এসে যাবে সেই মুহূর্তেই এই বৃদ্ধ অক্ষম পঙ্গু বাদশাহকে সরিয়ে দিতে এতটুকু বেগ পেতে হবে না।

"তখন, শাহজাদা ঔরংজীব, প্রতিকার করবার আর কোন পথ থাকবে না। শাহজাদা ঔরংজীব, মসনদ প্রাপ্তির জন্য আমি তোমাকে উত্তেজিত করছি না। তুমি মসনদ পেলে দিল্লীর হারেমে জাহানআরা বেগমের এখতিয়ার আমার হাতে আসবে—এর জন্যে আমি উৎসুক নই। আমি চিন্তিত পয়গম্বর রসুলের প্রবর্তিত পবিত্রতম ধর্ম ইসলামের জন্য।

"কাফের দারাসিকো আমাদের সহোদর এবং জ্যেষ্ঠভ্রাতা হয়েও কাফের। দাম্ভিক। লালসের তার আর শেষ নেই। স্পর্ধার তার আর সীমা নেই। সে মুসলমানে কাফেরে প্রভেদ করে না। হিন্দু কেরেস্তান তার কাছে মুসলমানের সঙ্গে এক। সে নিজে পয়গম্বর হতে চায়।

"ঔরংজীব, প্রথমেই তোমাকে সে দুর্বল করবার জন্য বিজাপুর গোলকুণ্ডার লড়াই বন্ধ করালে। তুমি ওখানে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করে শক্তিশালী হচ্ছ তার জন্যই তার চিন্তা। উজীর মীরজুমলা খানখানান মহাব্বৎ খাঁ সর্দার রাও ছত্রশালকে হুকুমৎ পাঠান হল দক্ষিণ থেকে সরাসরি দিল্লী চলে আসবার জন্য। তার অর্থ

তোমার কাছ থেকে তাদের সরিয়ে এনে দারাসিকোর খাস্ তাঁবে রাখা।

সুতরাং শাহজাদা ঔরংজীব—।"

একজন বান্দা এসে কামরার দরজার মুখে দাঁড়িয়ে অভিবাদন করলে।—জনাবআলি আলিজাঁহা!

মুখ তুলে তাকালেন শাহজাদা।

দ্বিতীয়বার অভিবাদন করে বান্দা বললে—উজীর-এ-আজম আমীর-উল-উমরা খান-ই-খানান মীরজুমলা সাহেব।

শাহজাদার পিঙ্গলাভ চক্ষুতারকা দুটি এতক্ষণ দুটি মরা পিঙ্গল-রঙের পতঙ্গের মত স্থির নিষ্পন্দ হয়ে অর্থহীনভাবে সম্মুখের দেওয়ালের গায়ে নিবদ্ধ ছিল, এবার নড়ে উঠল। এরপর কপালে জেগে উঠল কয়েক সারি চিন্তাকুল রেখা। আবার সেগুলি মিলিয়ে গেল। একটা নিশ্বাস্ ফেলে শাহজাদা বললেন—আসতে বল।

তাঁর কোরান নকলের সরঞ্জাম তিনি সরিয়ে রাখলেন। মীরজুমলা ঘরে প্রবেশ করে তাঁকে অভিবাদন করে বললেন—আমার উপর ফরমান জারি হয়েছে—

শাহজাদা উজীরের কথার মাঝখানেই বললেন—তার আগে যদি আমি খান-ই-খানানকে বন্দী করে তাঁর দিল্লী যাওয়ার পথ বন্ধ করে দিই তাহলে কি খান-ই-খানান আমার উপর নারাজ হবেন? একটি বিচিত্র হাসি তাঁর মুখে ফুটে উঠল।

মীরজুমলা প্রশ্নকুঞ্চিত দৃষ্টিতে শাহজাদার দিকে তাকিয়ে নিরুত্তর হয়ে রইলেন। নিরুত্তর নীরব উজীর-এ-আজমের চোখে চোখ রেখে শাহজাদা বললেন—খানখানানের সিপাহীর উপর দখল পুরা কায়েম থাকবে খান-ই-খানানের; খান-ই-খানান তাঁদের সঙ্গেই বাস করবেন। মীরজুমলার তোপখানাই খান-ই-খানানের সব থেকে বড় দৌলত, সেও আপনার থাকবে; আমার খাজাঞ্চীখানা থেকে

পুরা তনখা যাবে খান-ই-খানানের হাতে। খান-ই-খানান সিপাহী বর্কআন্দাজ গোলন্দাজ মনসবদারদের তলবানা আপন হাতে বিলি-বন্দোবস্ত করবেন। তারা যেমন আছে আপনার ফৌজে তাই থাকবে; শুধু লোকে জানবে উজীর-এ-আজমকে ঔরংজীব নজরবন্দ্ করে রেখেছে। তাঁর পুরা ফৌজকে সে নিজের ফৌজ দিয়ে ঘেরাও করে রেখেছে।

মীরজুমলা এখনও কোন কথা বললেন না। ঠিক পূর্বের মতই দৃষ্টিতে প্রশ্ন তুলে শাহজাদার দিকে তাকিয়ে রইলেন। শাহজাদা ঔরংজীব অসাধারণ তীক্ষ্ণধী, মানুষের মুখ থেকে তার অন্তরের কথা পড়ে নিতে পারেন। তিনি বলে গেলেন—খোদা মালিক; কার নসীবে তিনি কি লিখেছেন জানেন তিনি। তবে আমি বিশ্বাস করি, যে খাঁটি মুসলমান, ইসলামে যে বিশ্বাসী, পয়গম্বর রসুল যার ইমান তাকেই তিনি জয়যুক্ত করেন। সুতরাং দিল্লীতে মসনদে যে কায়েম হবে সে যদি পয়গম্বর রসুলের অনুগত খাদিম হয় তাহলে উজীর ও আজম সসম্মানে মুক্ত বলে ঘোষিত হবেন এবং উজীরিতে কায়েম থাকবেন। আর যদি—।

আবারও একটুক্ষণ নীরবে উজীরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন শাহজাদা। চোখের দৃষ্টি যেন কাচের মত স্বচ্ছ এবং স্থির হয়ে গেল। উজীরের পার্থিব দেহ ভেদ করে সে দৃষ্টি যেন দূর ভবিষ্যতের দিকে প্রসারিত করবার চেষ্টা করছিলেন তিনি। দেহ নিস্পন্দ, দৃষ্টি নিষ্পলক এবং এমনই স্বচ্ছ ও স্থির। মনে হচ্ছিল মানুষটির চেতনা—তাই বা কেন, তার সমস্ত সত্তা তার ওই পার্থিব দেহ থেকে নিঃসারিত হয়ে দূর দিগন্তে যেখানে বর্তমান মুহূর্তে মুহূর্তে অতীতে পরিণত হচ্ছে এবং ভবিষ্যৎ এক চিরউষার মত স্বল্প আলো এবং স্বল্প অন্ধকারের মধ্যে জন্ম নিচ্ছে সেই দিগন্তমুখে পক্ষ বিস্তার করেছে। ভয় পেলেন এবার মীরজুমলা। মৃদুস্বরে ডাকলেন—আলিজাঁহ।

আবার ডাকলেন—হুজুরআলি!

এবার পলক পড়ল ঔরংজীবের। তিনি বললেন—মানুষ ভবিষ্যৎ দেখতে পায় না খান-ই-খানান। আমি অন্ততঃ বিশ্বাস করি না। আধ আলো আধ অন্ধকার মিশে সে এক রহস্যময় ঝাপসা এলাকা—তার উপর কুয়াশার মত একটা আবরণ পড়ে আছে। নড়াচড়া দেখা যায় কিন্তু কে নড়ল কে পড়ল এ চেনা যায় না। ভবিষ্যৎ দেখছি কুয়াশায় ঢাকা। তাই বলছি যদিই এমন হয় যে ইসলামে বিশ্বাসহীন, পয়গম্বর রসুলে ভক্তিহীন কোন দাম্ভিক উদ্ধত শাহজাদা জয়যুক্ত হন তাহলে উজীর-এ-আজম অবশ্যই বলতে পারবেন তিনি কোনদিন শাহজাদা ঔরংজীবের বিশ্বাসভাজন বা দলভুক্ত ছিলেন না, বাদশাহ সাজাহানেরই হুকুমতে তিনি দিল্লী থেকে দক্ষিণে এসেছিলেন গোলকুণ্ডার লড়াইয়ে বাদশাহের সুবেদার ঔরংজীবকে সাহায্য করতে; কিন্তু যখন দিল্লী থেকে ফরমান এল দক্ষিণের লড়াই মিটিয়ে ফেলে দিল্লী ফিরতে তখন উজীর-এ-আজম দেখলেন শাহজাদা ঔরংজীব তাঁকে নজরবন্দ্ করে ফেলেছেন—সারা ফৌজকে ঘেরাও করে দিয়েছেন। তাদের হাতিয়ারবন্ধ্ পর্যন্ত আটক হয়ে গেছে। তিনি বেওকুফি হয়তো করেছেন ঔরংজীবকে বিশ্বাস করে কিন্তু নিমকের ইমানকে তিনি বরবাদ করেন নি। বেইমানি নিমকহারামি তিনি করেন নি।

মীরজুমলা বললেন—শাহজাদার চেয়ে বিচক্ষণ ব্যক্তি মীরজুমলা তার জিন্দগীতে দেখে নি। তাঁর বিচক্ষণতা গভীর—সমুদ্রের মত। পারস্য উপসাগরের একটা জায়গায় মহামূল্য মোতি পাওয়া যায় যা কবুতরের ডিমের মত নিটোল এবং এমনি আকারের। কিন্তু এখানে যে মোতি তুলতে ডুব দেয় সে জীবন্ত উঠে আসে না। ক্বচিৎ এক আধজন আসে। আলিজাঁহার শল্লা খুবই মূল্যবান। শুধু একটি কথা হুজুরআলিকে জানাই। সে হল এই যে, খান-ই-খানান মহাব্বৎ খাঁ আর রাও ছত্রশাল বুন্দেলা এরই মধ্যে তাদের ছাউনি তুলে দিল্লী রওনা হবার ব্যবস্থা করেছে। এমন ক্ষেত্রে এই কৈফিয়ত—

—কৈফিয়ত আপনাকে কোনদিন কাউকে দিতে হবে বলে আল্লাহতায়লা এবং পয়গম্বর রসুলের এই খাদিম মনে করে না। ঔরংজীব জিতবে। কারণ তার জয়েই খুদা খুশী হবেন। পয়গম্বর রসুলের হুকুমৎ বহাল থাকবে হিন্দুস্তানে। কিন্তু সে পরের কথা—এখন আপনি যা বলছেন তার জবাব আমি দিই। খানখানান মহাব্বৎ খাঁ এবং রাও ছত্রশাল বুন্দেলাকে ছেড়ে দিয়ে তবেই ঔরংজীব মীরজুমলাকে আটকাতে পারে। আপনি একজন গুপ্তচরকে পাঠিয়ে দিন দিল্লী। লিখে পাঠান—শাহজাদা ঔরংজীবের ফৌজ ভেঙে কোনমতে আমি পালাতে পারি কিন্তু ভারী ভারী তোপ নিয়ে—যে তোপখানার জন্য মীরজুমলা অজেয়—সে তোপখানা নিয়ে পালানো অসম্ভব। তাই আমি বাধ্য হয়ে নজরবন্দীত্ব স্বীকার করেছি। ভরসা রাখি দিল্লীর বাদশাহী ফৌজের সঙ্গে প্রথম সংঘর্ষেই শাহজাদা নাজেহাল হয়ে পালাবেন বা ধরা পড়বেন। তখন এই তোপখানা নিয়ে মীরজুমলা শাহবুলন্দ ইকবালকে অভিবাদন করবে।

মীরজুমলা সপ্রশংস দৃষ্টিতে শাহজাদার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। ঔরংজীব বলেই গেলেন—আপনি একবার নয় বার বার বলেছেন, আপনার জিন্দগীর দামে আপনি শাহজাদা ঔরংজীবকে মসনদে বসাতে চান। আপনার জীবন আপনার দৌলত আপনার সব কিছু তার জন্য উৎসর্গ করতে প্রস্তুত। আপনি আমার পক্ষে থাকলে আর কাউকে আমার প্রয়োজন নেই। একদিকে দিল্লীর তামাম উমরাহী অন্যদিকে একা খান-ই-খানান মীরজুমলা।

মীরজুমলা আসন ছেড়ে উঠে শাহজাদাকে কুর্নিশ করে বললেন—হিন্দুস্তানের ভাবী বাদশাহ এবং ইসলামের রক্ষাকর্তা পয়গম্বর রসুলের জিন্দাপীরকে আমি অভিবাদন জানাচ্ছি। মীরজুমলার বাত এক ইমান এক—কখনও বদল হয় না। আমি প্রকাশ্যেই আপনার সঙ্গে যোগ দিতাম। কিন্তু বাদশাহ সাজাহানের হুকুমৎ প্রকাশ্যে

লঙ্ঘন করা ঠিক হবে না। আজই এই কামরা থেকে যখন আমি বের হব তখন আমার হাত শেকলে বেঁধে বের করে সকলকে দেখিয়ে বন্দী করে রাখুন আমাকে। খবর ছড়িয়ে পড়ুক। হাওয়ায় হাওয়ায় চলে যাবে দিল্লী পর্যন্ত। ইতিমধ্যে আমি কিছু খবর পেয়েছি। আমার দেওয়ান খবর দিয়েছে যে আমার পুত্র আমীনকে শাহজাদা দারাসিকো গিরিপ্তার করে কয়েদ করেছেন। খলিলুল্লা খাঁকে নতুন মনসব দেওয়া হয়েছে—কাসিম খাঁয়েরও মনসব বেড়েছে। শোনা যাচ্ছে খানখানান সায়েস্তা খাঁয়ের মালোয়ার সুবাদারি কেড়ে নিয়ে কাসিম খাঁকে দেওয়া হবে। খানখানান সায়েস্তা খাঁকে দিল্লী তলব হয়েছে। সম্ভবতঃ পেঁৗছুবামাত্র তাঁর হাতেও জিঞ্জির পড়বে। গিরিপ্তার হবেন তিনি।

শাহজাদা ঔরংজীবের বিশেষত্ব হল তিনি কথা শোনেন—কিন্তু সে কথা যেমনই হোক তার প্রতিক্রিয়ায় মুখের ভাবের কোন পরিবর্তন হয় না। মীরজুমলার কথা শেষ হতেই তিনি বললেন—আমীন মুক্তি পেয়েছে। শাহজাদা দারাসিকোই তাকে ছেড়ে দিয়েছেন। আল্লাহতায়লার মত সূক্ষ্ম বিচার তাঁর—তিনি আমীনের বিরুদ্ধে সঠিক প্রমাণ পান নি। পয়গম্বর রসুল থেকেও নিজেকে তিনি মহান প্রতিপন্ন করবেন।

সূক্ষ্ম ব্যঙ্গের একটি বাঁকা রেখা তাঁর মুখে ফুটে উঠল। একমুহূর্ত স্তব্ধ থেকে বললেন—সায়েস্তা খাঁ মামাজীউও দিল্লীতে পৌঁছে নিরাপদ থাকবেন বলেই আমি মনে করি।

মীরজুমলা বললেন—খানখানান সায়েস্তা খাঁ একখানা ইস্তাহার খত লিখে নানান জনের কাছে পাঠিয়েছেন—শাহজাদা নিশ্চয় জানেন।

ঔরংজীব প্রশ্নের সুরে বললেন—ইস্তাহার ?

মীরজুমলা সাহেব একখানা কাগজ শাহজাদার সামনে ধরলেন।

আটচল্লিশ

"লা-এলাহা-ইল্লাল্লাহ শোভানাল মালেকেন কুদ্দুসে"—আল্লাহ্ ভিন্ন কোন মাবুদ নাই—তিনি পবিত্র তিনি বাদশাহ তিনি পবিত্রতম। পয়গম্বর রসুল মহম্মদ তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রিয় এবং অনুগৃহীত জন। তাঁদের নাম নিয়ে ইসলামের যারা খাদিম যারা মুসলমান তাদের জানাবার জন্যই এই ইস্তাহার আমি পাঠাচ্ছি। হিন্দুস্তানে বাদশাহ, ইসলামের রক্ষক এবং সেবক, শাহানশাহ সাজাহানের ইন্তেকাল হয়েছে। বাদশাহ আর জীবিত নাই। শাহানশাহের জ্যেষ্ঠপুত্র শাহজাদা দারাসিকো আর জ্যেষ্ঠপুত্রী বেগম জাহানআরা সাহেবা এই জরুরী খবর একদম গায়েব করে রেখেছেন; রেখেছেন মসনদ কবজা করে মসনদ দখল করবেন বলে। কিন্তু শাহজাদা দারাসিকো মুসলমান পিতার সন্তান হয়েও অবিশ্বাসী কাফের; সে পৌত্তলিকতায় বিশ্বাসী তামাম হিন্দুস্তানের লোক জানে যে এই দারাসিকো হিন্দু কাফেরদের পাথরে গড়া পুতুলের সঙ্গে কাবার মসজিদের পাথরের কোন ফরক দেখে না। তার স্পর্ধা সে ইসলাম হিন্দু কেরেস্তানী ধর্মকে সমান সত্য বলে। এবং দজ্জাল আকবরশাহ বাদশাহের এলাহী ধর্মকে নতুন করে জাগিয়ে সে নিজে তার পয়গম্বর হতে চায়।

পয়গম্বর রসুলের কোরানের সে বরবাদ করে। কোরানকে ইসলামকে সে মানে না। হিন্দুস্তানের মসনদ দখল করে এই এলাহী ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করে সে একসঙ্গে বাদশাহ এবং পয়গম্বর হয়ে বসতে চায়, শুধু ইসলামকে বরবাদ করবে না, একসঙ্গে হিন্দু মুসলমান কিরিস্তান ইহুদী সব ধর্মকে বরবাদ দিতে চায়।

এর নজীর তোমার কাছে হাজির করছি। তুমি দিল্লীতে এসো। শহর দিল্লীতে—মুঘল বাদশাহের খাস আস্তানা যে শহরে সেই শহরের তুমি যে কোন মুসাফের বা রাহীকে বা ভিখ্‌মাঙোয়া বা পাল্কীওয়ালা কি একাওয়ালাকে কি যে কোন কাফিখানায় কি

শরাপখানায় জিজ্ঞাসা করো—নাঙ্গা ফকীর সারমাদকে চেনো? দেখিয়ে দিতে পার তার আস্তানা? ওই প্রশ্নের জন্য সে তোমাকে বলবে বুড়বক কিংবা গিদ্ধড়। কেন না তামাম হিন্দুস্তানের মধ্যে ফকীর হজরত সারমাদের মতো মানুষ আর নাই। যে খাঁটি মুসলমান সে বলবে লোকটা আকণ্ঠ গুনাহের পাঁকে ডুবে আছে, ঘৃণিত কাফের অপেক্ষাও ঘৃণিত সে, কারণ কাফেরের একটা ধর্ম আছে এর কোন ধর্ম নাই। কোন ধর্মকেই সে মানে না। কোন গোঁড়া কাফেরকে জিজ্ঞাসা করো সে তাকে বলবে নরকের কৃমিকীট। যে কোন কেরেস্তানকে প্রশ্ন করো সে বলবে লোকটা মহাপাপী। জন্মেছিল সে ইহুদীর বংশে—ইহুদীদের শাস্ত্র পড়ে তাতে ব্যুৎপত্তি লাভ করে সে রাব্বি হবে স্থির করেছিল। কিন্তু তাতে তার বিশ্বাস হয় নি। সে কোরান পড়েছিল। কোরানকে সে কণ্ঠস্থ করেছিল, কিন্তু আশ্চর্য কি জানো—যে কোরান খুদ খুদাতায়লা বলেছিলেন পয়গম্বর রসুল হজরত মহম্মদকে তাও তাকে তৃপ্তি দেয় নি। কেন দেয় নি জানো? এক হিন্দু বানিয়ার লেড়কাকে দেখে সে হল দেওয়ানা। এত বড় একটা লেখাপড়াজানা আদমী একটা বানিয়া লৌণ্ডার খুবসুরত মুখ দেখে এমনই পাগল হল যে সে ইসলামকেও ছাড়লে। সে লজ্জাকেও ত্যাগ করলে। সে বললে কি জানো—'খুদা-ই-মান অভয়চান্দস্ত ইয়া দিগর'। সে সকলের সামনে উচ্চকণ্ঠে বললে—"আমি জানি না আমার কাছে অভয়চান্দ ছাড়া আর কোন খুদা আছে কিনা।" শোভানআল্লা! সঙ্গে সঙ্গে সে তার পরনের সমস্ত আবরণ পোশাক ফেলে দিয়ে নাঙ্গা অর্থাৎ উলঙ্গ হয়ে দাঁড়াল। লোকে জিজ্ঞাসা করলে—এ কি? কোন্ ধর্ম অনুসারে তুমি এমন নাঙ্গা হলে? নির্লজ্জ এবং গুনাহে নির্ভয় সারমাদ বললে কি জানো? বললে—"আমি রাব্বি আমি কাফের আমি মুসলমান—আমি সব। আমি সন্ন্যাসী আমি সন্ত আমি ফকীর আমি পুরোহিত—আমি সব।"

"হম রাব্বি ইহুদীনাম কাফিরাম মুসলমানম।" শুনে খুব তাজ্জব

লাগে। মনে হবে এই বুঝি এক মহাশাস্ত্রজ্ঞ সাক্ষাৎ স্বর্গীয় দেবদূত। তুমি যদি তার আস্তানায় যাও তাহলে দেখবে ওই যে খুবসুরত বানিয়া লৌণ্ডা সে এই লোকটার জাতুতে একদম আওরত হয়ে পালটে গেছে। দেখবে সে স্বর্গের হুরীর মত এক রূপসী যুবতী। কখনও দেখবে সে কাফেরদের নওলকিশোরের মত কিশোর। লোকে বলে সে দেবদূত হোক বা না হোক সে জাতুকর। কিন্তু বাদশাহ সাজাহান এনায়েৎ খাঁকে সরজমিন তদন্ত করতে পাঠিয়েছিলেন—সঙ্গে ছিল এক হিন্দু পণ্ডিত। তারা দেখে এসে বলেছে—"উলঙ্গ ফকীর সারমাদের মধ্যে অলৌকিক কিছু নাই। থাকলে ওই নগ্নত্বই তার অলৌকিকত্ব। লোকটা পাপী এবং নির্লজ্জ।"

লোকটাকে পাপী বললেই কি সব বলা হল?

লোকটা শয়তানের অনুচর।

তার একটা রুবাই শোন। "সারমাদ, তুই কাবার মসজিদ কি হিন্দুর মন্দিরে যে সব কথা বলে তা বলিস নে। তুই সন্দেহের ময়দানে মাঠে মিথ্যে ভবঘুরের মত ঘুরিস নে। চলে যা শয়তানের কাছে; তার কাছে শিখে আয় কেমন করে খুদা বা ঈশ্বরের নামাজ আর পূজা করতে হয়। ওই এক দীক্ষা ছাড়া আর দুসরা দীক্ষা তুই নিস নে।"

তার ওই অভয়চান্দই বহুৎ মিঠা আওয়াজে গেয়ে দুনিয়াকে শোনায়—"রউ শিউয়া ই বন্দেগী জে শয়তান আমোজ এক কব্‌লা গুজিন সাজ্‌দা বাহার ঘয়ের মাকুম।"

শাহজাদা দারাসিকো এই সারমাদের মুরীদ। শাহজাদা দারাসিকো সারমাদকে বলে—"হামরা পীর। হরজত। পীর-উ-মুরশিদ-ই-ইমান।"

শাহজাদা দারাসিকো এই সারমাদের রুবাই থেকেই ভাব নিয়ে রুবাই তৈয়ার করেছে—

"কাবার মসজেদে আর হিন্দুর মন্দিরে কালো পাথর এবং

কষ্টিপাথরের বিগ্রহের মধ্যে আসল সত্য হল সেই এক কালো পাথর; দুইয়ের মধ্যেই তিনি আছেন।

কিংবা দুয়ের মধ্যেই তিনি নেই।

সমঝদার পণ্ডিত পুরোহিত মৌলভী মোল্লা আমীর রাজা তুমি এর সারমর্ম 'সমঝ' নাও। বুঝে উপলব্ধি কর।"

সারমাদ নাস্তিক—সে শয়তানের পন্থায় ভজনা করে—কার ভজনা করে তুমি বুঝে নাও—কারণ তার বানানো গানে সে বলেছে কি শোন।—"আমি হিন্দুর ঈশ্বর নাম শুনেছি, ইসলামের খুদার নাম আমি ভজনা করি কিন্তু শয়তানের ঈশ্বরের নাম কি তা আমি জানি না। আমীর তুমি মুসলমানই হও আর হিন্দুই হও—তুমি কি জান? আমি সেই নাম-না-জানা শয়তানের ঈশ্বর। আমীর, একটা কথা মনে রেখো—বনের মধ্যে বাঘও থাকে হরিণও থাকে। বাঘেরও ঈশ্বর আছে হরিণেরও ঈশ্বর আছে। যে ঈশ্বর বাঘকে হরিণ মিলিয়ে দেয় সে ঈশ্বর হরিণের যম। যে ঈশ্বর ক্ষুধার্ত বাঘের মুখ থেকে হরিণকে কেড়ে নিয়ে হরিণকে বাঁচায় সে ঈশ্বর বাঘের কাছে যম না হলেও নারাজ ঈশ্বর; দুশমন ঈশ্বরও বলতে পার।"

সারমাদ শয়তানের ঈশ্বরকে ভজনা করে।

তাই গুনাহে তার অরুচি নাই। তাই সে মুসলমানেরও কেউ নয়, হিন্দুরও কেউ নয়, ইহুদীরও কেউ নয়, কেরেস্তানেরও নয়; মোটমাট আদম আর ইভের যে বংশাবলী জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়ে ন্যায় অন্যায় তৈয়ার করেছে, খুদা যাদেরকে কোরান দিয়েছেন, অন্য অন্য শাস্ত্র দিয়েছেন তাদের সে কেউ নয়। সে তাদের কাছে শয়তান। আদম ইভের কাছে সে সাপ হয়ে দেখা দিয়েছিল—এবার সে হিন্দুস্তানে সারমাদ নাম নিয়ে হাজির হয়েছে।

হুঁশিয়ার মুসলমান। শুধু মুসলমান কেন, হিন্দু কেরেস্তান, তোমরাও হুঁশিয়ার।

দারাসিকো এই সারমাদের মুরীদ। সারমাদ তার কাছে পরম পবিত্র। সে তার হজরত। পীর-উ-মুরশিদ-ই-ইমান।

* * *

সারমাদ ফকীরের ওই লালসের আস্তান থেকে আরও খানিকটা এগিয়ে যাও তুমি। সাজাহানাবাদের দক্ষিণ তরফ পুরানি কিলার কিছু উত্তরে ফিরোজসা কোট্‌লার কাছাকাছি আর এক আস্তান পাবে।

সেখানে পাবে এক আধা সাধুকে; হিন্দু সাধু। পণ্ডিত। কাশ্মীরী ব্রাহ্মণের লেড়কা। এক সময় তাকে লোকে জানত উচ্ শায়ের সুভগ বলে।

সে দেওয়ানা হয়েছিল।

তার গজল রুবাই শুনে একসময় মানুষের কলিজার ভিতর দুখ আর দর্দে খুন নিকলাতো, যেমন করে দুনিয়ার বুকে পাথর ফেটে ঝর্ণা বেরিয়ে আসে ঝিরঝির করে। কেন জান? এক কাশ্মীরী ছোকরীর মহব্বতিতে পড়েছিল সে। কিন্তু দুনিয়া মানুষের ইচ্ছায় চলে না। সে চলে খুদার মর্জিতে তাঁর হুকুমতে। কিসের জন্য যে কোন্ হুকুমৎ তা জানেন পয়গম্বর রসুল। খুদার মর্জিতে এই লেড়কী এল বাদশাহী হারেমে, এল শাহজাদা ঔরংজীবের বেগম কাশ্মীর রাজার বেটী সাহেবাঈমহলের সঙ্গে এবং কলেমা পড়ে হল মুসলমান। সুভগ মুসলমান হওয়ার চেয়ে মৃত্যু ভাল মনে করে। এই হিন্দু লেড়কী মুসলমান হয়ে মনে করে মুসলমান ছাড়া আর কারুর স্ত্রী সে হতে পারে না।

শাহজাদা দারাসিকো নয়া পয়গম্বর তার নতুন ধর্মের।

সে বললে—কুছ পরোয়া নেহি হ্যায়। সাদির জরুরৎ নাই।

পুরুষ আর প্রকৃতি, মর্দানা আর জেনানা, আদমী আর ঔরৎ যার সঙ্গে যার মহব্বতি মিলে যাও। কে হিন্দু কে মুসলমান কে কেরেস্তান দেখবার দরকারই নাই। মিলে যাও জুটে যাও, খানাপিনা

গানাবাজানা করো। আনন্দ রহো আনন্দ রহো। বাস্। আমার ধর্মে আমার বাদশাহীতে কোন বাধা নেই। ঘর বেঁধে দিয়েছিল দারাসিকো এই ঔরৎ শিরিনের আর এই আদমী সুভগের। কিন্তু তারা তবু মিলতে পারে নি। সুভগ হল দেওয়ানা—শিরিন বাঈ মুজরাওয়ালী। তারপর হল কসবী। শাহজাদা দারাসিকো যখন বাদশাহ সাজাহানকে জাদুতে ভুলিয়ে তাঁর পাঞ্জা আর সীলমোহর পেলেন, তখন শাহজাদা তাদের ফের মিলিয়ে দিয়ে আস্তানা বেঁধে দিয়েছেন সাজাহানাবাদের দক্ষিণে যম্‌নার কিনারায়। নয়া দুনিয়া আর নয়া বাদশাহীর নমুনা তৈয়ার হয়েছে সেখানে।

ইতিমধ্যে বাদশাহের জীবনের শেষ হয়েছে।

এখন তোমার রায় কি বলো আমীর।

শাহজাদা ঔরংজীব ধার্মিক মুসলমান। হিন্দুদের তিনি কাফের মনে করেন কিন্তু তিনি অহংকারী নন দাম্ভিক নন। তিনি কোন নতুন ধর্মের কথা ভাবতেও পারেন না। নতুন ধর্মের মানেই হল ধর্মহীনতা—অধর্ম। পাপ। তাতে ইসলাম বরবাদ যাবে, হিন্দুত্ব বরবাদ যাবে, কেরেস্তান ধর্ম তাও হবে বরবাদ। থাকবে শুধু যথেচ্ছাচার।

যাও গিয়ে দেখে এসো দারাসিকোর পীর-উ-মুরশিদ-ই-ইমান নাঙ্গা ফকীর লম্পট ব্যভিচারী ওই ইহুদীবংশের আরমেনিয়ান লোকটাকে। শুনে এসো কি গান হচ্ছে সেখানে।

"কাবার মসজিদে আর হিন্দুর কোন মন্দিরে ওই যে কালো পাথরখানি আর কষ্টিপাথরের বিগ্রহ ওই দুই আসলে এক। যা বলবে সেই এক অদ্বিতীয় তিনি। অথবা সেই চিরন্তন কালো পাথর। দারাসিকো বলে—মুসাফের তোমরা মিথ্যে ভেদ তৈরি করে অশান্তির সৃষ্টি করো। সংসারকে উত্তপ্ত করো।"

যাও দেখে এসো। দেখবে উলঙ্গ সারমাদ দাঁড়িয়ে আছে বেশরমীর মত। বেশরমী বেধরমী শয়তান।

আর নাচছে এক খুবসুরতি নওজোয়ানী।

কিন্তু না নওজোয়ানী সে নয়—সে এক লৌণ্ডা!

আরও এক আরজি তোমার কাছে পেশ করি। ধর্ম তোমার যাই হোক শাহজাদা ঔরংজীব তাকে খাতির করবে। আর তুমি তার ঝাণ্ডার তলায় এলে জরুর তোমার মনসব বাড়বে, খেলাত মিলবে। জায়গীরও জরুর মিলবে।

বাদশাহ সাজাহান নাই। তিনি গত হয়েছেন। এ-খবর শাহজাদা দারাসিকো চেপে রেখেছেন।

হিন্দুস্তানের মসনদ তিনি কুটিল এক চক্রান্ত করে দখল করছেন।

* * *

মীরজুমলা বললে—এই ইস্তাহার।

ঔরংজীব বললেন—এ ইস্তাহার মামা সায়েস্তা খাঁ সারা হিন্দুস্তানে পাঠিয়েছেন। বে-সহি এই ইস্তাহার আপনি কোথায় পেলেন?

—এরই উত্তর শাহজাদা আমার কাছে চাচ্ছেন অথবা অন্য কোন প্রশ্ন করছেন?

—উজীরসাহেবের বুদ্ধি ক্ষুরধার। আমার প্রশ্ন—এমনি ইস্তাহার আপনার সহি নিয়ে জারি হল না কেন? আমি অন্তত তাই আশা করেছিলাম। তাতে এ ইস্তাহারের জোর আরও অনেক বাড়ত।

মীরজুমলা বললে—এ ইস্তাহার খুদ শাহজাদার মুসাবিদা এ আমি ধারণা করি নি। দিল্লী থেকে বে-সহি ইস্তাহার এবং নিশান এল; নিশানে লেখা—উজীরসাহেব খাঁটি মুসলমান—নিষ্ঠাবান সুন্নী। এ ইস্তাহার তিনি সহি করে অন্যান্য মনসবদার আমীরদের কাছে পাঠালে পয়গম্বর রসুল খুশী হবেন। খুদা মঙ্গল করবেন। আমি ভেবেছিলাম এ ইস্তাহার শাহজাদী রৌশনআরা বেগমসাহেবা মুসাবিদা করে পাঠিয়েছেন। কিন্তু—।

ঔরংজীব অপেক্ষা করে রইলেন। মীরজুমলা একটু নীরব থেকে

বললে—না, এ মুসাবিদা আপনার তা আমি ধারণা করি নি। কারণ আপনি আমাকে নিজমুখে বলতে পারতেন। দিল্লী হয়ে ঘুরে এল। তার মানে পুরা বিশ্বাস করতে পারেন নি আমাকে।

—সে কি আমি ভুল করেছি খান-ই-খানান? আপনি সহি করে ভবিষ্যৎকে বিপদাপন্ন করতে চান নি? সত্য নয়?

—অস্বীকার করব না শাহজাদা। আপনার মামা খানখানান সায়েস্তা খাঁ আপনাদের মেহমান। তার উপর খানখানানের নবীনতমা বেগমসাহেবা বাদশাহের প্রিয়পাত্রী। তিনি যে ঝামেলা ঝঞ্ঝাট সইতে পারবেন সে সইতে মীরজুমলা কেমন করে পারবে বলুন। তা ছাড়া—

—তা ছাড়া—?

—আপনি তো এখনও এ খবর ঘোষণা করেন নি কি বাদশাহের ইন্তেকাল হয়েছে।

—আজই এই প্রহরেই করব।

—তার পরও আছে শাহজাদা। বাদশাহ না হয় মারা গেলেন কিন্তু আপনি নিজেকে বাদশাহ বলে ঘোষণা করছেন কখন? সে না করলে তো শাহবুলন্দ ইকবাল কি দিল্লীর সঙ্গে কি অন্য শাহজাদাদের সঙ্গে আপনার কোন ঝগড়া লড়াই নাই। কি প্রয়োজন আপনার দিল্লী যাবার?

—নিজেকে বাদশাহ বলে আমি ঘোষণা এখন করব না খানখানান।

—করবেন না?

—না। কারণ ভাই মুরাদ ইতিমধ্যেই নিজেকে বাদশাহ বলে জাহির করে দিল্লী যাবার জন্য তৈয়ার হচ্ছে। ভাই মুরাদের সঙ্গে আমি হাত মেলাচ্ছি। দিল্লীর বাদশাহী ফৌজের বিরুদ্ধে একলা কোন ভাইয়ের ফৌজ দাঁড়াবে না। তা ছাড়া উজীর-এ-আজম, আমি কাফের স্বার্থপর দাম্ভিক ভণ্ড ওই দারাসিকোকেই মসনদ থেকে

উপড়ে ফেলতে চাই মূলসুদ্ধ একটি গাছের মত। ইসলামের পক্ষে তো বটেই সঙ্গে সঙ্গে খুদাতায়লার এই সারা দুনিয়ার বাগিচায় কাফের দারাসিকো ভীষণতম বিষবৃক্ষ। তার বিষে তামাম দুনিয়া বিষাক্ত হয়ে যাবে।

মীরজুমলা স্থির মনোযোগের সঙ্গে শাহজাদার কথা শুনছিল; কথাগুলি শুনতে শুনতে তার কপালে দুটি একটি রেখা জেগে উঠল। মীরজুমলা দৃষ্টি আনত করে মাটির উপর নিবদ্ধ করলে। শাহজাদার কথা শেষ হয়ে গেল—মীরজুমলা মাথা তুলে শাহজাদার দিকে তাকালে—তার কপালে তখন কয়েকটি রেখা একসঙ্গে জেগে উঠেছে। সে বললে—একটি কথা আমি জিজ্ঞাসা করলে শাহজাদা যেন রাগ করবেন না। শাহজাদা মুরাদ নিজেকে বাদশাহ বলে নাম জারি করেছেন বলছেন। কিন্তু তাঁর উজীর খান-ই-খানান আলিনকী খাঁ সাহেব কি তাতে মত্ত দিয়েছেন? এ আমার তাজ্জব মনে হচ্ছে।

—খানখানান আলিনকী খান সাহেব বেঁচে নেই। শাহজাদা মুরাদ নিজে তাঁকে বিশ্বাসঘাতকতার জন্য হত্যা করেছেন। তাঁর নিজের বর্শা আলিনকীর পেটে বিঁধে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়েছেন।

—শোভানআল্লা! এ খবর—

—এ খবর অতি সত্য উজির সাহেব। আপনি আমি এই দাঁড়িয়ে কথা বলছি এ যেমন সত্য, ঠিক তেমনি সত্য। বা তার থেকেও অধিক সত্য।

—আলিনকী খাঁ বেইমান?

—আলিনকী খাঁ সাহেব মৃত। বাদশাহ সাজাহানের যারা সত্যকারের ইমানদার কর্মচারী এবং খাঁটী মুসলমান, আমীরদের মধ্যে আলিনকী খাঁ প্রথম চার পাঁচ আদমীর মধ্যে একজন। তার নামে কলঙ্ক মিথ্যা করে ঔরংজীব দেবে না। বাদশাহ বুদ্ধিহীন গোঁয়ার সাহসী

ছোট শাহজাদার ভার দিয়ে তাঁকে গুজরাটে মুরাদের কাছে পাঠিয়েছিলেন। আলিনকী খাঁ কোনদিন সে ইমান মনে মনেও বরবাদ দেন নি। কিন্তু এসব দুঃসাহসী সৎলোকের দুশমনের তো অভাব নেই। তার উপর মুরাদ নিজেও খানখানান আলিনকীর পরামর্শ ছাড়া কাজ করত না। সে বিশ্বাস তার ছিল। ঔরতের আর সরাবের সম্পর্কে খানখানানের পরামর্শ সে নিত না। তাছাড়া—

মীরজুমলা বললে—সে আমি জানি জনাবআলি। আমার সর্বাপেক্ষা দুশ্চিন্তা ছিল খানখানান আলিনকী।

—পাটনের ফৌজদার কুতবউদ্দীন খান ষড়যন্ত্র করে আলিনকীকে খতম করিয়েছে। কুতবউদ্দীন ছিল আলিনকীর দুশমন আর উজীরীর উপর তার লোভও ছিল। সে এক জাল চিঠি তৈয়ার করে। অবিকল আলিনকীর সহি তার মোহর-দেওয়া চিঠি—লিখছে শাহজাদা দারাসিকোকে। জানাচ্ছে যে, "মহম্মদ আলিনকী খাঁ বাদশাহ সাজাহানের নিমক খেয়েছে এবং সে জানে বাদশাহ শাহানশাহ সাজাহানের অন্তিম ইচ্ছা কি। সে জানে বাদশাহ খুদ তাকে বলেছেন—আলিনকী হিন্দুস্তানের বাদশাহী মসনদে আসার পরে যেন শাহজাদা দারাসিকো নাশীন হন এই আমার একমাত্র ইচ্ছা। আমি খুদার কাছে এর জন্য প্রার্থনা করি। শাহজাদাকে যখন শাহবুলন্দ ইকবাল খেতাব দেওয়া হয় তখন তিনি বলেছিলেন এর মধ্যেই আমার ইচ্ছার প্রকাশ রইল আলিনকী। একে তোমরা যেন মেনে চলো। বাদশাহের নিমক খেয়েছে আলিনকী। সে মুসলমান। সে নিমকহারামি কখনও করবে না। শাহবুলন্দ ইকবাল, বাদশাহ সাজাহানের জ্যেষ্ঠপুত্র আপনি—আপনি খুদাতায়লার অনুগ্রহভাজন, আপনার প্রতি আমার আনুগত্যের উপর আপনি ষোলআনা নির্ভর করবেন। এবং যথাসময়ে এর প্রমাণ আপনি পাবেন।" এই চিঠি নিয়ে একজন লোক ধরা

পড়েছিল সেদিন এবং তাকে হাজির করা হয়েছিল শাহজাদা মুরাদের সরাবপানের আসরে। নাচওয়ালীরা নাচছিল। মুরাদ এই চিঠি পড়ে আলিনকীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেছিল—বেইমানির নিমক-হারামির সাজা কি উজীরসাহেব খানখানান আলিনকী খাঁ? আলিনকী বলেছিল—একমাত্র সাজা মৃত্যু। উত্তর শুনে ওই জাল চিঠিখানা আলিনকী খানের হাতে দিয়ে বলেছিল মুরাদ --তাহলে এবার চিঠি পড়ে দেখো। তারপর সঙ্গে সঙ্গে নিজের বর্শাখানা আলিনকী খানের পেটে বসিয়ে দিয়েছে। আলিনকী খানের তামাম টাকাকড়ি সোনারূপা বাজেয়াপ্ত করেছে। এবং আলিনকীর ওই রক্তমাখা জায়গাটার উপরই তক্ত আনিয়ে উপরে চাঁদোয়া খাটিয়ে তার উপর বসে নিজের নামজারি করেছে মহম্মদ মুরাদবক্স শাহানশাহ গাজী বাদশাহ হিন্দুস্তান।

মীরজুমলা উঠে দাঁড়াল। সসম্ভ্রমে ঔরংজীবকে অভিবাদন করে বললে—এ গোলাম আপনাকে অভিবাদন করছে হিন্দুস্তানের বাদশাহ বলে।

কুর্নিশ জানিয়ে, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললে—আর বিলম্ব করবেন না শাহজাদা। আপনি অবিলম্বে তামাম ফৌজীর মধ্যে খবর জাহির করে দিন যে বাদশাহ সাজাহান জীবিত নেই—বাদশাহ মৃত। দারাসিকো সংবাদ গোপন করে রেখেছেন। সারা দিল্লী শহরে ইসলাম এরই মধ্যে বরবাদ হয়ে গেল। সারমাদ ভণ্ড ফকীরের আস্তানায় গান হচ্ছে—"হিন্দু মুসলমান ইহুদী কেরেস্তান কারুর পক্ষেই দিল খুশী হয় না—খুদা মেলে না। এস মুসাফের আমার সঙ্গে—আমি চলেছি শয়তান যে রাস্তায় চলে খুদা বরাবর সেই রাস্তায়। দিল খুশী হবে। তুমি শেষ জবাব পাবে।" এবং ঘোষণা করুন—এরই প্রতিকারের জন্য, এই বেধর্মীগিরি বন্ধ করবার জন্য খোদার মুরীদ হিসেবে আমার সমস্ত শক্তি নিয়ে দিল্লী যাচ্ছি।

দিন কুড়িক পর। সেদিনও ফকীর হজরত সারমাদের আস্তানায় জমায়েত মজলিসে ওই গানটিই হচ্ছিল। হজরত সারমাদের অতি সুকণ্ঠ দুজন তরুণ শিষ্য গাইছিল—কাবার কথাও তুলো না, মন্দিরের কথাতেও কাজ নাই। মুসাফের, তুমি এটা সত্য কি ওটা সত্য এই সন্দেহে ভবঘুরের মত গোলকধাঁধায় ঘুরো না। তার থেকে চলো মন, শয়তানের কাছে চলো—সে যে পথে খোঁজে দিনদুনিয়ার মালিককে সেই পথ ধরেই চলো। এপথে ওপথে সেপথে ঘুরে ঘুরে পথ হারিয়ে নিজেকে হারিয়ে দিয়ো না। অন্যে যে ভোলে সে ভুলুক শয়তান তো খুদাকে ভোলে না।

গোটা জমায়েত এক বিচিত্র ভাববোধে প্রায় বিভোর হয়ে গিয়েছিল। গান শেষ হল। জয়ধ্বনি উঠল—হজরত সারমাদের জয়! জিন্দাবাদ! হজরত সারমাদ কিন্তু স্থির অচঞ্চল ভাবমগ্নের মত বসে আছেন। তাঁর কোলের কাছে বেহুঁশ অবস্থায় শুয়ে আছে অভয়চান্দ। মৃদুস্বরে বিড়বিড় করে বকে যাচ্ছে। "রক্তের দরিয়া বয়ে যাচ্ছে। হায়রে হায়—হায়রে হায়। রাত্রের আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখো। সেখানে শরৎকালের রাত্রে ছায়াপথ দেখেছ? এক জ্যোতির স্রোতের মত। শান্তির তরঙ্গ। তারই মধ্যে মধ্যে আলোর বিন্দু। নক্ষত্র ওরা। ওরা নেমে আসে দুনিয়ার বুকে মধ্যে মধ্যে। ওই ছায়াপথকে নামিয়ে আনতে চায়, বইয়ে দিতে চায় মাটির দুনিয়ায়। সেই স্রোত বইতে শুরু করেছিল। আকাশ থেকে ঝরে মাটির উপর পড়ে সারা দেশকে শান্ত করে স্নিগ্ধ করে বয়ে চলছিল। কিন্তু হায় হায় হায়। এ কি হল? লাল হয়ে গেল সে স্রোত। রক্তের ধারা মিশে মিশে টকটকে লাল। যেন খুনের দরিয়া। ওই দরিয়ায় হাঙর কুমীর বোয়াল মাছেরা রক্ত এবং মাংসের টুকরোর জন্যে ছুটে বেড়াচ্ছে। এই স্রোতে দুটি পদ্মফুলের মত দুটি মানুষের কাটা মাথা ভেসে যাচ্ছে। হায় হায় হায়। দেখো সারমাদ, হজরত সারমাদ, তুমি দেখো—সামনে তাকিয়ে

দেখো। দুটি মানুষের কাটা মাথা। দেখতে পাচ্ছ? চিনতে পাচ্ছ?"

সারমাদ বিস্ফারিত স্থিরদৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে আছেন।

বাইরে এসে থামল শাহজাদা দারাসিকোর দেহরক্ষী এবং সঙ্গীসাথীর মিছিল। শাহজাদা এসেছেন হজরত সারমাদের শুভেচ্ছা আশীর্বাদ নিতে। সংবাদ উদ্বেগজনক। দক্ষিণ থেকে শাহজাদা ঔরংজীব এবং শাহজাদা মুরাদবক্স তাঁদের সৈন্যসামন্ত নিয়ে দিল্লীর পথে যুদ্ধযাত্রা করেছেন। এগিয়ে আসছেন। তাঁরা ঘোষণা করেছেন—"শাহানশাহ বাদশাহ জীবিত একথা মিথ্যা। তিনি গত হয়েছেন। শাহজাদা দারাসিকো সত্য গোপন করে বলেছেন যে, বাদশাহ বেঁচে আছেন। দর্শনঝরোকায় বাদশাহ দর্শন দিচ্ছেন এও সত্য নয়; বিলকুল ঝুট—সম্পূর্ণ মিথ্যা। একজন বুড়া বান্দার সঙ্গে অনেকটা বাদশাহের চেহারার একটা মিল আছে; সেই লোকটাকে বাদশাহী পোশাক পরিয়ে দর্শনঝরোকায় এনে খাড়া করে দেওয়া হয় আজকাল।"

শাহজাদা ঔরংজীব ঘোষণা করেছেন, "বাদশাহ গত হয়েছেন বলেই তিনি শাহজাদা মুরাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে দিল্লীতে আসছেন। ওদিকে বাংলা থেকে আসছেন শাহজাদা শাহসুজা। যদি বাদশাহ জীবিত থাকেন—যদি তাঁদের অনুমান ভুলই হয় তবে তাঁদের থেকে বেশী সুখী কেউ হবে না। তাঁরা আলাহজরতকে তাঁদের সালামৎ জানিয়ে পদচুম্বন করে কদমবুচি জানিয়ে আবার ফিরে আসবেন আপন আপন সুবায়।

তাঁদের জেহাদ শাহজাদা দারাসিকোর এই মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে। শাহজাদা দারাসিকো হিন্দুস্তানে শুধু ইসলামকে বরবাদ করছেন না, জাহান্নমে পাঠাচ্ছেন না, তার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুধর্মকে কেরেস্তানধর্মকে দুনিয়ার সব ধর্মকে জাহান্নমে পাঠাচ্ছেন বরবাদ করছেন।"

শাহজাদা দারাসিকো এসেছেন হজরত সারমাদের আশীর্বাদ নিতে। তিনি রওনা হবেন সসৈন্যে দক্ষিণের দিকে। মহারানা যশোবন্তসিংহ তাঁর সঙ্গে যাবেন।

পূর্বমুখে শাহসুজাকে বাধা দিতে চলেছেন শাহজাদা সুলেমান সিকো। তাঁর সঙ্গে যাবেন মহারানা জয়সিংহ। সুলেমান সিকোর মামাশ্বশুর।

শাহজাদা দারাসিকোর মুখখানা থমথম করছে।

হজরত সারমাদের সামনে এসে হাঁটু গেড়ে বসে শাহজাদা হজরতের হাঁটু দুটি ধরে ঈষৎ নত হয়ে বললেন—হজরত!

উনপঞ্চাশ

হজরত সারমাদ নির্বাক নিস্পন্দ। শাহজাদা দারাসিকোর আহ্বানে কোন সাড়া দিলেন না। মনে হল যেন শুনতেই পেলেন না। শাহজাদা দারাসিকো আবার ডাকলেন—হজরত! হে আমার গুরু, আমার পীর!

হজরত সারমাদ তবুও নীরব। যেন কোন দূরদূরান্তে হয়তো বা কালে কালান্তরে কোন গ্রহ গ্রহান্তরে তিনি তখন কোন ধ্যানযোগে সমাহিত।

শাহজাদা দারাসিকো কিছুটা চঞ্চল হয়ে উঠলেন। তাঁর মাথার উপর বিক্ষুব্ধ হিন্দুস্তানের ঝামেলা ঝঞ্ঝাট ঝড়ে মেঘে বৃষ্টিতে তুফান-ওঠা আকাশের মত ভেঙে পড়তে চাচ্ছে। তাঁর সময় নেই।

শাহজাদা একজন চ্যালাকে ইশারায় কাছে ডেকে বললেন—হজরতকে কোনরকমে সংবিতে ফিরিয়ে আনবার ব্যবস্থা করা যায় না?

শিষ্য বললে—না। ঠিক এই এমন ভাবেই রয়েছেন আজ সারা দিন রাত। অভয়চান্দও পড়ে আছে ঠিক সেইরকম বেহোঁশ হয়ে। মধ্যে মধ্যে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে আর বলছে ঠিক সেই কথা। রক্তের দরিয়ায় দুটি মানুষের মুখ ভেসে যাচ্ছে মৃণাল থেকে ছিঁড়ে ফেলা দুটি লাল পদ্মফুলের মত।

—তা হলে? শাহজাদা যেন নিজেকেই প্রশ্ন করলেন। তাঁর সম্মুখে অনেক কাজ, অনেক কাজ; তার জটিলতা যত মর্মান্তিক যন্ত্রণা তত, উদ্বেগ তার থেকে অনেক বেশী। ফৌজ আজ ভোরেই রওনা হবে দক্ষিণাপথে। বড় বড় জ্যোতিষীরা যাত্রার জন্য শুভলগ্ন নির্ধারিত করে দিয়েছেন। আজ ভোরের নির্দিষ্ট লগ্নে রওনা না হলে পরপর চার দিন আর যাত্রার উপযোগী শুভলগ্ন নেই। চার দিন অপেক্ষা করতে হলে ওদিকে শাহজাদা ঔরংজীব এবং মুরাদবক্সের

মিলিত ফৌজ কতটা এগিয়ে আসবে কে জানে! এখান থেকে বাদশাহ এবং বাদশাহী পরিবারবর্গ যাবে আগ্রা। সেখানে তাদের রেখে শাহজাদা রওনা হবেন দক্ষিণ।

তাই মুখ থেকে আপনাআপনি প্রশ্ন বেরিয়ে এল—তা হলে? এ প্রশ্নের উত্তর কে দেবে? শাহজাদা একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চারিদিকে প্রায় অর্থহীনভাবে তাকিয়ে দেখলেন। তারপর বিনম্রভাবে বললেন—আমি উঠলাম। আজই ভোরে আমার রওনা হবার কথা। এরপর হজরতের যখন এই আশ্চর্য সমাধি ভঙ্গ হবে তখন তুমি আমার কথা বলো। বলো নর্মদার তীরে ধারমাতের যুদ্ধে শাহজাদা ঔরংজীব যশোবন্ত সিং রাঠোরকে পরাজিত করে এগিয়ে আসছে। তাকে আমি রুখতে চাই। যাত্রার পূর্বে হজরতের দয়া আশীর্বাদ নিতে এসেছিলাম। হজরত ধ্যানস্থ থাকলেও তারই মধ্যে নিশ্চয় তিনি আমাকে আশীর্বাদ করেছেন। বিজয়ী হয়ে ফিরে এসে হজরতের কাছে তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে বাদশাহীর সকল ভার গ্রহণ করব।

বলতে বলতেই শাহজাদা দারাসিকো চকিত হয়ে উঠলেন। হজরত সারমাদের সেই বিচিত্র অর্থহীন শূন্যদৃষ্টির মধ্যে যেন অতিক্ষীণ সচেতনতা জেগে উঠেছে বলে মনে হল। দিনান্তে আকাশের বুকে ক্ষণে ক্ষণে হারিয়ে যাওয়া নক্ষত্র-স্পন্দনের মত স্পন্দিত হচ্ছে যেন।

শাহজাদা স্তব্ধ হয়ে গেলেন। দেখতে পেলেন হজরতের আশ্চর্য পিঙ্গল চোখদুটি ধীরে ধীরে জলে ভরে উঠছে। চোখদুটির কোন গভীর অন্তস্তল থেকে সে জল যেন নিয়ত উৎসারিত হয়ে উঠে চোখের কিনারা ছাপাতে চলেছে।

ছাপানো জল চোখের কিনারা ছাপিয়ে সারমাদের গাল বেয়ে তাঁর দাড়ি গোঁফের মধ্য দিয়ে হারিয়ে গেল। তারপর সে জল পড়ল মাটিতে।

বিস্ময়ের আর অবধি রইল না দারাসিকোর। এ আর কখনও তিনি দেখেন নি। হজরত সারমাদকে তিনি কখনও কাঁদতে দেখেন নি। অহরহ আনন্দময়তায় হজরত সারমাদ যেন একটি চিরপুষ্পিত গুলমোর বৃক্ষ। গুলমোর গাছে ফুলের সমারোহ বড়জোর দুটো মাসের—এ যেন বারো মাসের ফুলে ভরা একটি গুলমোর বৃক্ষ। মনে হচ্ছে সেই চিরপুষ্পিত গাছের সমস্ত ফুল যেন ওই অশ্রুধারার বেগে ঝরে মাটিতে পড়ে যাচ্ছে, ধুলোয় মিশিয়ে যাচ্ছে। মনে হল সারা হিন্দুস্তান—তাই বা কেন—সারা দুনিয়া যেন এই চোখের জলের তুফানে ডুবে যাবে। শাহজাদা শিউরে উঠলেন—সঙ্গে সঙ্গে তাঁরও যেন ছোঁয়াচ লাগল এই চোখের জলের। তাঁরও চোখ থেকে জল বেরিয়ে এল। তিনি বুঝতে পারলেন তাঁর হৃদয়ের কোন গভীর অন্তস্তল থেকে একটি আবেগ বিমুক্ত হয়ে তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে। সঙ্গে সঙ্গে অবারিত ধারায় উৎস থেকে উৎসারিত হচ্ছে চোখের জল।

হজরত সারমাদের দৃষ্টিতে সচেতনতা ফিরে এল; ক্রমে ক্রমে পূর্ণ সচেতন হয়ে উঠলেন তিনি। শাহজাদা দারাসিকোর পরিচ্ছদের দিকে তাকিয়ে তাঁর দৃষ্টিতে বিস্ময় ফুটে উঠল। সে বিস্ময় বিপুল বিস্ময়। শাহজাদা দারাসিকো তাতে কম বিস্মিত হলেন না। তিনি বললেন—হজরত! আমার পথপ্রদর্শক—আমার পীর—

হজরত সারমাদ অকস্মাৎ যেন বেদনায় অভিভূত হয়ে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—এই রকম বেশভূষায় তুমি কেন সেজেছ শাহজাদা? এমন বেশে তো তোমাকে কখনও দেখি নি!

শাহজাদা বললেন—হজরত, আমি আপনার ভক্ত, আপনার অনুগত—আপনার কাছে কখনও ঐশ্বর্য দেখাতে আসি নে। অথবা যার মধ্যে ঐশ্বর্য আমার থেকেও প্রকট হয়ে ওঠে তা করি নি। কিন্তু আজ আমি চলেছি দক্ষিণের অভিমুখে বাদশাহী সৈন্যবাহিনী নিয়ে। দক্ষিণ থেকে শাহজাদা ঔরংজীব আর মুরাদ তাদের মিলিত বাহিনী

নিয়ে দিল্লী দখল করতে আসছে। ওদিকে বাংলা থেকে সসৈন্যে আসছে শাহজাদা সুজা। বাদশাহের হুকুমে আমি যাচ্ছি শাহজাদা ঔরংজীব আর মুরাদকে রুখতে। ধারমাতের যুদ্ধে তারা রাঠোর যশোবন্ত সিংকে হারিয়ে এগিয়ে আসছে। ওদিকে শাহজাদা সুজাকে রুখতে গিয়েছে আমার পুত্র শাহজাদা সুলেমন সিকো। সেখানে সুজা হটে গিয়েছে। আমি বিদায় নিতে এসেছি হজরতের কাছে। এসেছি আমি অনেকক্ষণ। কিন্তু হজরত যেন কোন ধ্যানে মগ্ন ছিলেন—যেন কোন দুসরা দুনিয়া কি দুসরা কালকে দেখছিলেন।

সারমাদ একটি গভীর নিশ্বাস ফেললেন। কোন উত্তর দিলেন না। দারাসিকো বললেন—হজরত—

সারমাদ বললেন—শাহজাদা, তুমি ঠিক ধরেছ। বিচিত্রভাবে আমি এক বিচিত্র দুনিয়ার বার্তা পেলাম। শাহজাদা, তুমি সাধনপথে হজ যানেবালে আদমী। তুমি দিনদুনিয়ার মালিকের অনুগৃহীত মানুষ—তুমি কি দেখতে পেয়েছ আমি কি দেখলাম ?

দারাসিকো বললেন—না হজরত—তা আমি দেখতে পাই নি। তবে এ আমি দেখেছি এবং এ আমি বুঝেছি যে আপনি যা দেখেছেন তা নিশ্চয় বড় মর্মান্তিক।

—বড় মর্মান্তিক শাহজাদা। যদি অস্বীকার করি তা হলে আমি ঝুটা আদমী হয়ে যাব।

—কি দেখলেন হজরত ?

—দেখলাম শাহজাদা, আমার কাটা মুণ্ড একটা রক্তের নদীতে রক্তের স্রোতে ভাসতে ভাসতে চলেছে একটা গভীর অন্ধকার লোকের দিকে।

শিউরে উঠে অস্ফুট একটা আর্তনাদ করে উঠলেন দারাসিকো। তারপর যথাসাধ্য চেষ্টায় আত্মসংবরণ করে বললেন—হজরত, শুনেছি অভয়চান্দ—। বলতে গিয়ে বলতে পারলেন না শাহজাদা, মুখে যেন আটকে গেল তাঁর সে কথা।

সারমাদ বললেন—হ্যাঁ শাহজাদা। ঠিকই শুনেছ তুমি। আজ বেশ কিছুদিন থেকে অভয়চান্দ মধ্যে মধ্যে ভরগ্রস্তের মত বেহোঁশ হয়ে পড়ে যায়, হয়তো সারাদিন নয়তো দীর্ঘক্ষণ বেহোঁশ হয়ে পড়ে থাকে। পড়ে থাকে আর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। বলে—হায় হায় হায়—রক্তে তুফান বয়ে যাচ্ছে। রক্তে রক্তে একটা দরিয়া হয়ে গেল।

দারাসিকো বললেন—জানি হজরত—প্রথম যেদিন এই ভর হয় অভয়চান্দের উপর সেদিন খুদ আমি মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। হজরত জানেন কি না জানি না—সেদিন এ মজলিসে ছদ্মবেশে বোরখা পরে শাহজাদী রওশনআরাও উপস্থিত ছিল। তার সঙ্গে ছিল তার আয়ী। রওশনআরাকে কেউ মনে মনে বুঝিয়েছে সে মাথা দুটি ঔরংজীব এবং মুরাদের অথবা তার। রওশনআরা ভয় পেয়ে এখান থেকে পালিয়ে যায়। যাবার সময় পালকির মধ্যে জ্ঞান হারায়। তার আয়ী তাকে নিয়ে যমুনার ধারে এক সাধুর আস্তানায় যায়। সে আস্তানা, আমার পরম প্রিয় কবি সুভগ আর তার প্রেমিকা শিরিনের। হজরত তাদের জানেন। তারা একথা রওশনআরার মুখে শুনেছে এবং রওশনআরাকে তারা সেদিন দেখেছে—নিশ্চিত করে চিনেছে। সুতরাং সেই রক্তের দরিয়ায় যে মুণ্ড ভেসে গেছে বলে অভয়চান্দ দেখেছে তা আপনার হতে পারে না হজরত।

সারমাদ বললেন—সে তো জানি না শাহজাদা। তুমি তো জান আমি অলৌকিকে বিশ্বাস করি না। আমার ফর্দে আমি বলেছি—"হম মেত্তি-এ ফরকানাম হম কাশিশ ও রুহ বানাম; রাব্বি ইহুদীনাম কাফিরম মুসলমানম।" একসঙ্গে আমি সব—রাব্বি কাফির মুসলমান। অথবা কিছুই নই। আমি সব ভুলেছি। সে আমি ঝুট বাত বলি নি। খুদা জানেন এই বাচ্চা অভয়চাঁদের আশ্চর্য দুটি চোখের দিকে তাকিয়ে আমি সব ভুলে গিয়েছি। আমার দৌলত আমি বিলকুল দুনিয়ার পথের ধুলোয় ফেলে দিয়েছি—সমুদ্রের জলে

ফেলে দিয়েছি। শাহজাদা, তোমার গলায় ওই যে দুর্লভ, নীলাভ, পায়রার ডিমের মত নিটোল এবং বড় মুক্তার মালা যা ইরানের দরিয়া ঢুঁড়ে ঢুঁড়ে সংগ্রহ করা হয়েছিল—ও মালা বাদশাহ সাজাহানকে বিক্রী করবার জন্য আমি আনিয়েছিলাম ইরান থেকে। কিন্তু বাদশাহকে দিই নি। এই অভয়চাঁদকে পরিয়েছিলাম। অভয়চাঁদ গলার মালা ছিঁড়ে মোতিগুলোকে দরিয়ার তুফানে ফেলে দিয়েছিল—আমি তাদের একটা একটা করে ডুবে যেতে দেখেছি। আজ সেগুলো দেখছি তোমার গলায়। কি করে উঠে এল জানি না। আমি কোন জাদুকে মানি না। কোন খোদার সাড়া আমি পাই নি। আমি অস্তিবাদকে অস্বীকার করে পাপপুণ্যকে তুচ্ছ করে নাস্তিবাদকে মেনেছি। আমি অভয়চাঁদকে ভালবেসে পিয়ার করে বুঝেছি দুনিয়াতে এক জিন্দগী আসবে, এক নয়া আস্তান কায়েম হবে—নয়া জমানা নয়া জাহান যে-জমানায় যে-জাহানে থাকবে শুধু মানুষ আর তার কলেজার দর্দ। সে-জিন্দগী সে-আস্তান সে-জমানা সে-জাহান না হিন্দুকা না মুসলমানোকা না ইহুদীকা না কেরেস্তানকা। সারমাদ নামে এক বান্দা এসেছে দুনিয়ায় সেই আস্তান আর সে জিন্দগীতে পৌঁছবার জন্যে সড়ক তৈয়ার করবার জন্যে। পাপপুণ্যের বিচার এখানে বিলকুল ঝুট। সারমাদ ধর্মের জাদু দেখাতে জানে না। বিশ্বাস করে না। ধর্মের নামে কোন কানুন সে জারি করে না। তাই জন্যে সে নাঙ্গা। সারমাদ জানে—"খুদা সত্য হলে খুদা নিশ্চয় আসবেন।" তাই বার বার আমি আমাকে বলেছি শাহজাদা তোমাকেও বলেছি—"ঝুটমুট কেন খুঁজে মরছ তাকে মুসাফির। বৈঠ যাও। সে যদি খুদ্-আ হয় তাকে আসতে হবে।" আসতে হবে ভালবাসা হয়ে—নতুন কাল নতুন জমানা হয়ে। শাহজাদা, হঠাৎ পেলাম ওই বানিয়ার ছেলে অভয়চান্দকে। ওর দুই চোখের মধ্যে দেখলাম সেই নতুন কাল নতুন জমানার রোশনি। তাই আমি বলি। আমি জানি না এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আমার খুদা কে? অভয়চান্দ না

আর কেউ? অভয়চান্দ যেন গগনকিনারে কাউকে কিংবা কিছুকে দেখতে পায়। কিন্তু তাও আমি বিশ্বাস করি নি। তাকে ভালবাসি, সে ভালবাসাকে অস্বীকার করবার ক্ষমতা আমার নাই। কিন্তু তবুও আমি তার এই গগনকিনারের ওপারের কিছু দেখাকে বিশ্বাস করি নি। শাহজাদা, তুমি আমাকে বলেছ তুমি জ্যোতি দেখেছ—তুমি বলেছ স্বপ্নে তোমাকে দেবদূত দর্শন দিয়েছেন—তুমি বলেছ কাফিরদের রামচন্দ্রকে তুমি দেখেছ—ঋষি বশিষ্ঠকে দেখেছ; এসব আমি শুনেছি—আমি চুপ করে থেকেছি—কথা বলি নি। তোমার কাছে তোমার খোয়াব সত্য—আমার কাছে তা সত্য কি মিথ্যা সে নিয়ে কোন রায় আমি কোনদিন দিই নি।

চুপ করলেন হজরত।

শাহজাদা অপেক্ষা করে রইলেন। তারপর বললেন—হজরত—

সারমাদ বললেন—শাহজাদা! এবার অভয়চান্দ আমাকে তার জাদু দেখা চোখের সুর্মা কি ভাবে যে আমার চোখে পরিয়ে দিল তা আমি জানি না। কিন্তু একসময় তার সঙ্গে সঙ্গে আমিও দেখতে পেলাম গগনকিনারার সেই জাহান যেখানে আকাশের সেই বিচিত্র ছায়াপথ এসে নেমেছে এই মাটির জাহানে, সেখানে কি ঘটছে স্বচক্ষে দেখতে পেলাম। শাহজাদা!

—হজরত—

—শাহজাদা, অভয়চান্দের সঙ্গে সঙ্গে আমিও দেখলাম রক্তের নদী। স্রোত বইছে। যমুনার পানি লাল হয়ে গিয়েছে। সেই পানিতে ভেসে যাচ্ছে দুটি মানুষের মুণ্ড। শাহজাদা, আমি চিনতে পারলাম।

—হজরত!

—হামারা শির—শাহজাদা, এই ফকীর সারমাদের মাথা একটি

—আর—

—আর একটি—

—আর একটিকে চিনতে পারলাম না শাহজাদা। কাদায়, ধুলোয়, গর্দায়, লাঞ্ছনায়, ছিঁড়ে-যাওয়া পিষে-যাওয়া পদ্মফুল তুমি দেখেছ কখনও?—ঠিক তেমনি। চেনা যায় না। আমি চিনতে পারি নি। আমি জানি না সে কার শির। তবে শাহজাদা আমার কাটামুণ্ড ভেসে যেতে দেখে আমি বিচলিত হই নি কিন্তু এই মুণ্ডটি দেখে আমার চোখে জল এল। ওঃ, সে কোন্ এক হতভাগ্যের শির শাহজাদা যার তুনিয়ায় কেউ নেই। তুনিয়ার সকল মানুষ দাঁড়িয়ে দেখেছে তার মুণ্ড কাটা যাওয়া কিন্তু একটি কথাও বলে নি। ছেঁড়া তার কাপড়, ময়লা তার পোশাক—পথের গর্দা তার সর্বাঙ্গে। বড় মায়া লাগল। তাই চোখ ফেটে জল এল। ভাল করে চিনতে চেষ্টা করলাম কিন্তু তার আগেই তার মুণ্ড খুনের দরিয়ায় ডুবে গেল। আর—

শাহজাদা প্রশ্ন করলেন—আর?

—আর দেখলাম ওই যে নয়া জমানা নয়া জাহানের পথ, যেটা আকাশের গায়ে গায়ে চলে গেছে সেই অনন্ত ভবিষ্যতের দিকে সেই পথে ওই রক্তের ঢেউ গিয়ে লাগছে—রক্তাক্ত হচ্ছে। আর কতকগুলি বিচিত্র মানুষ এসে সেই রক্ত মুছে দিচ্ছে। তাদের চোখ থেকে জলের ধারা বেরিয়ে আসছে। সেই জল দিয়ে তারা ওই নীল আসমানে ওই যে মসলিনের মত সফেদ নরম ছায়াপথ তার গায়ের রক্তের দাগ মুছে দিচ্ছে। তারা সবাই ফকীর, সন্ন্যাসী আর বৈরাগী। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—তোমরা কারা? শাহজাদা, তাদের একজন বললে—আমি এই হিন্দুস্তানের এক রাজার ছেলে। আমার বিস্ময় লাগল। রাজার ছেলের সন্ন্যাসীর ফকীরের পোশাক কেন? সে হেসে বললে—অদ্ভুত সে হাসি শাহজাদা, বললে—রাজার পোশাকে রাজার ছেলের পোশাকে কোন মানুষ এ পথ সাফা রাখবার ভার পায় না; এ অধিকার খুদা তাদের দেন না। জিজ্ঞাসা কর

ওঁকে। শাহজাদা, তাকে চিনলাম। প্রকাণ্ড ক্রুশ কাঁধে নিয়ে মেরীর ছেলে যীশু সে।

শাহজাদা দারাসিকোর বুকের মধ্যে একটা উদ্বেগ যেন বহুকালের রুদ্ধদ্বার ঘরের গুমোটের মত অসহনীয় হয়ে উঠল। তিনি অকস্মাৎ চীৎকার করে বলে উঠলেন—হজরত সারমাদ, আপনি থামুন আপনি থামুন—

সারমাদ নীরব হলেন।

শাহজাদা প্রশ্ন করলেন—ওই দুসরা শির সে কার?

—চিনতে পারি নি শাহজাদা। তবে একটি আমার।

—তাহলে এসব কথা আমাকে শোনাচ্ছেন কেন?

—তুমি যে শুনতে চাইলে বলে আমার মনে হল। তুমি আমার মুখের দিকে যে সজল দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলে প্রশ্ন নিয়ে। তুমি তোমার দৃষ্টি দিয়ে আমাকে প্রশ্ন কর নি শাহজাদা?

—করেছিলাম।

—হ্যাঁ। তাইতো আমি এসব কথা বলছিলাম তোমাকে শাহজাদা দারাসিকো। তুমিও তো সেই নয়া জমানা নয়া জাহানকে পুরানো জমানা পুরানো জাহানের উপর কায়েম করতেই জন্মেছ শুনেছি। তুমি তো বার বার আমাকে বলেছ। তুমি পয়গম্বরের পর নতুন পয়গম্বর।

শাহজাদা বললেন—হজরত সারমাদ, সেই নয়া জমানা নয়া জাহান এবার কায়েম হবে দুনিয়ায়। সেই জন্যেই আজ আমি চলেছি দূর দক্ষিণ থেকে সাদা সাপ ঔরংজীব আর অসুস্থমস্তিষ্ক মুরাদকে রুখতে—তাদের কুটিল স্বার্থবুদ্ধি এবং হিংসাকে দমন করতে। আপনাকে তো আমি বলেছি আমি স্বপ্নে দেখেছি হিন্দুদের মহর্ষি বশিষ্ঠ আমাকে রামচন্দ্রের সঙ্গে জানপহছান করিয়ে দিয়ে বলেছেন—ইনি তোমার মতই সারা দুনিয়ার বাদশা হয়ে পাপীদের দমন

করবেন, পুণ্যাত্মাদের প্রতিষ্ঠা করবেন। আবার রামরাজ্যের নয়া রাজ নয়া জাহান নয়া জমানা কায়েম করবেন।

—কিন্তু শাহজাদা ওই সব সূক্ষ্মদেহধারী ফকীরেরা বললেন—

—কি বললেন—

—রক্তপাত করে এ জাহান এ জমানা কায়েম হবে না।

—আমি সেই জন্যেই জন্মেছি ফকীরসাহাব হরজত সারমাদ। আমি আপনাকে বলছি ফকীরসাহাব তার সূর্যোদয় আসন্ন—তার পাখীর ডাক আমি শুনতে পাচ্ছি।

—আমি তা শুনতে পাচ্ছি না শাহজাদা। বরং আমার ভিতর থেকে কেউ যেন বলছে—শাহজাদা দারাসিকো তুমি বাদশাহের চেয়ে বড় হও, তুমি বাদশাহীকে মাটির মুঠোর মত ফেলে দাও। তুমি ফকীর হও। তোমার অপেক্ষায় রয়েছে ছায়াপথের মত ওই নয়া জমানা নয় জাহানের পথ—তুমি তার বুকের যত রক্তমাখা দাগ মুছে দাও। যত জায়গা ভেঙে গেছে তুমি তা নতুন করে গড়ে দাও। তুমি ফকীর সেজে সামনে দাঁড়াও।

শাহজাদা উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর মুখ লাল হয়ে উঠেছে। এমন কথা তিনি ফকীর সারমাদের কাছে কোনদিন শুনবো বলে ভাবতে পারেন নি। তাঁর জীবনে নানান কারণে তাঁর দৃঢ়প্রত্যয় যে তিনি দিন-দুনিয়ার যিনি মালিক স্রষ্টা তাঁর প্রত্যক্ষ করুণাধন্য মানুষ—তিনি তাঁর দ্বারাই এই দুনিয়াতে প্রেরিত হয়েছেন—দুঃখের দুনিয়াকে সুখের দুনিয়াতে রূপান্তরিত করবেন। তিনি উদার, তিনি হৃদয়বান, তিনি বার বার তাঁর কল্পনার মধ্যে ঈশ্বরের জ্যোতিকে বা অন্য কোন বিভূতিকে স্পর্শ করেছেন এবং তার দ্বারা অন্তরে অন্তরে উৎসাহিত হয়েছেন। আজ তাঁর সেই স্বপ্ন সফল হতে চলেছে। তিনি কনিষ্ঠ ভাইদের পরাজিত করে বন্দী করে নিয়ে আসবেন দিল্লী শহরে। বাদশাহ সাজাহানের পায়ের তলায়

ফেলে দেবেন। এবং তিনিই বলবেন তাদের মাফ করতে। তাঁর মহত্বে তারা বিনত হবে—তারপর তিনি দেখাবেন তাদের ঐশ্বরিক বিভূতি—শাস্ত্রের জ্ঞান—তার দ্বারা তারা অভিভূত হবে এবং লুটিয়ে পড়বে। হয়তো ক্রূর কঠিন ইস্পাত বা পাথরের মত অমননীয় ঔরংজীব বিনত হবে না। না-হলে তাকে কোন দুর্গের মধ্যে বন্দী করে রেখে দেবেন। বাদশাহের পুত্র শাহজাদা—শাহজাদার মতই থাকবে কিন্তু বন্দী হয়ে থাকতে হবে। তিনি দেখতে পাচ্ছেন চোখের সম্মুখে নতুন হিন্দুস্তান নতুন জমানা যেখানে হিন্দুর ছুৎমার্গ নাই জাতি ভেদের ঘৃণা নাই, ঔরংজীব রোশনআরার মত ইসলামীর গোঁড়ামি নাই, মন্দিরের উপর বিগ্রহের উপর নিষ্ঠুর আক্রোশ নাই; কাফেরীর মনগড়া অপরাধে হিন্দু রাজ্য গ্রাসের কুটিল লোভ নাই,—এমন এক হিন্দুস্তান অথবা নতুন এক জাহান জাদু বাগিচার মত ফুলে ফলে মুহূর্তে তৈয়ারী হয়ে যাবে যেমন তিনি মসনদে বসবেন তেমনি, অর্থাৎ সেই পুণ্যমুহূর্তেই 'পিঁঢ়ি' বদল যায়েগী—সব কিছু বদলে যাবে। এ সত্যে তিনি অন্তরে অন্তরে বিশ্বাস করে এসেছেন—কল্পনায় তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। স্বপ্নে তিনি সে-জাহান সে-জমানার আশ্চর্য আনন্দ এবং সুখ উপভোগ করেছেন।

হিন্দুস্তানের বড় বড় যোগী বড় বড় সাধু সন্ত তাঁর কাছে এ সব কথা শুনে তাঁকে বিশ্বাস করেছেন—তাঁর তারিফ করেছেন শ্রদ্ধা করেছেন। এর জন্য তিনি তপস্যা সাধনা কম করেন নি। দুনিয়ার সকল শাস্ত্র পড়বার জন্য ভাষা শিখেছেন, তাদের শাস্ত্র পড়েছেন—তাই নিয়ে কত চর্চা করেছেন। কত বড় বড় আলোচনা সভা বসেছে। শাহজাদা দারাসিকো সর্বশাস্ত্রসারতত্বজ্ঞ বলে সকলে স্বীকার করেছেন। লালবাবার মত যোগীর কাছে তিনি রামচন্দ্র বশিষ্ঠ সম্পর্কিত স্বপ্নবৃত্তান্ত জ্ঞাত করে প্রশ্ন করেছিলেন—এর অর্থ কি? এর অর্থ কি এই নয় যে আমি শ্রীরামচন্দ্রের মতই একআদর্শ রাজ্য সৃষ্টি করবার জন্যই এই পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছি হিন্দুর ঈশ্বরের দ্বারা

এবং মুসলমানের খুদার দ্বারা? পয়গম্বরের অনুগ্রহ এবং আশীর্বাদ কি অহরহই আমার উপর বর্ষিত হচ্ছে না? লালবাবা বলেছেন— তোমার ভবিষ্যৎ, সত্য তোমার বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে। তুমি যা দেখেছ তা স্বপ্ন নয় সত্য বলে তুমিই সে বিশ্বাসে উপনীত হতে পার। এবং ভবিষ্যৎকালে আপনাআপনিই তা কর্মযোগের দ্বারা প্রমাণিত হবে।

হজরত সারমাদ আজ বিশ্বাস হারিয়েছেন।

তাই তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না।

হায় হজরত সারমাদ! হায় রে হায়! বরবাদ হয়ে গেলে তুমি।

শাহজাদা দারাসিকো আর একবার ফকীর সারমাদের দিকে তাকালেন। দেখলেন সারমাদ আবার সেই আগের মত যেন চেতনা চৈতন্য সব হারিয়ে কেমন যেন শূন্যদৃষ্টিতে বেহোঁশের মত হয়ে যাচ্ছেন। দারাসিকো একটু ঝুঁকে পড়ে তাঁকে বললেন— হজরত সারমাদ, আপনি অসুস্থ হয়েছেন। আপনি বিশ্রাম করুন, সুস্থ হোন। আমি যাচ্ছি যুদ্ধের জন্য। আপনি আমাকে আশীর্বাদ করুন। কোন কারণে আপনার মগজ উত্তপ্ত হয়েছে। আপনি শান্তিবাদী স্বস্তিকামী দরদী মানুষ! আপনার কলেজায় মানুষের জন্য গভীর ভালবাসা। তাই এই যুদ্ধবিগ্রহের নামে আশঙ্কায় আপনি শঙ্কিত হয়েছেন। হয়তো জাগ্রত অবস্থায় এই অভয়-চান্দের দেখা ছবি কল্পনা করতে গিয়ে দেখেছেন যে মুণ্ড রক্তের দরিয়ায় ভেসে যাচ্ছে সে মুণ্ড আপনার। আমার পরনে এই যুদ্ধের পোশাক দেখে আপনি ভীত হয়েছেন। ভীত হয়েছেন কুটিলচরিত্র ঔরংজীবকে মনে করে। কিন্তু শঙ্কিত হবার কোন কারণ নেই হজরত। আমি শাহানশাহ বাদশাহের জন্য লড়াই করতে চলেছি। মসনদ তাঁর। আমি পিতার আদেশ পালন করতে চলেছি। সুতরাং আমার দিকেই ন্যায় আমার দিকেই পুণ্য। আমার সঙ্গে চলেছে

দুর্ধর্ষ রাজপুত বাহিনী। ছত্রশাল চলেছেন সেনাপতি হয়ে। আমি হিন্দু মুসলমানকে সমান চক্ষে দেখি। সুতরাং ঈশ্বরের দয়া খুদার করুণা একমাত্র আমারই প্রাপ্য। গোঁড়া ঔরংজীবের নয়, বিকৃত-রুচি মুরাদের নয়, বিলাসী সুজারও নয়। আমি জানি জয় আমার জন্যই তোলা আছে। আমি জিতবই। সেই যুদ্ধ জয় করবার জন্যই আমি চলেছি। বাদশাহকে দিদিজাউ এবং নাদিরাদের আগ্রায় রেখে চম্বলের পথে রওনা হব আমি। জয়লাভ করে ফিরে আমি দিল্লী এসে সর্বাগ্রে নামাজ পড়ব জামা মসজেদে, তারপরই সালামৎ জানাতে আসব আপনাকে। আপনি আশীর্বাদ করুন।

হজরত সারমাদ হাত তুললেন। কোনমতে সে হাত শাহজাদার মাথায় স্পর্শ করেই আবার যেন সর্ব চেতনা হারিয়ে ধীরে ধীরে ঢলে পড়ল তাঁর ফকিরী মসনদের উপর।

শাহজাদা দারাসিকো একবার একটি সকরুণ দৃষ্টিতে এই উলঙ্গ ফকীর—বিচিত্রভাবে যাঁকে দেখে একটি শিশুর মত মনে হয়—যার কাছে এসে আশ্চর্য শান্তির স্পর্শ মেলে—উত্তপ্ত ক্ষোভের মধ্যেও আশ্চর্যভাবে অপরূপ একটি সান্ত্বনা মেলে; সেই বিচিত্র উলঙ্গ ফকীর মানুষটির দিকে তাকিয়ে বেদনার্ত মনেই আস্তানা থেকে বেরিয়ে এলেন।

ওদিকে লালকেল্লায় বাদশাহের আগ্রা যাত্রার জন্য আয়োজন সম্পূর্ণ। সিপাহী শিবিকা ঘোড়সওয়ার হাতী উট বাদশাহী তাঞ্জাম বাদশাহী হারেম—সব সেজে তৈয়ার হয়ে আছে।

ঠিক নির্দিষ্ট সময়ে বাজনা বাজতে লাগল। রওনা হল বাদশাহী বাহিনী। তারই সঙ্গে চলেছেন দারাসিকো তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে। রাস্তার দুই ধারে কাতারে কাতারে লোক জমায়েত হয়েছে। বাদশাহী জলুস চলেছে। বাদশাহী ঝাণ্ডা উড়ছে। বিশালকায় হাতীর উপর সওয়ার হয়েছেন শাহজাদা দারাসিকো। সামনের

দিকে তাকিয়ে আছেন। শূন্যলোকের মধ্যে প্রসারিত দৃষ্টির সম্মুখে আকাশের গায়ে তিনি কল্পনায় ছবি আঁকছেন।

নয়া জমানা নয়া জাহান।

নূতন কাল নূতন পৃথিবী।

সঙ্গীতধ্বনি উঠছে—শান্তির সঙ্গীত। সমৃদ্ধির সঙ্গীত। প্রেম-প্রীতির সঙ্গীত। তারই মধ্যে তিনি বসে আছেন দেওয়ানী আমে ময়ূরসিংহাসনে। তাঁর গলায় সেই মুক্তার মালা, যা আজই পরে গিয়েছিলেন ফকীর সারমাদের ওখানে। এখনও সে-মুক্তার মালা তাঁর গলায় রয়েছে। শাহজাদা হাত দিয়ে মালাটাকে স্পর্শ করলেন। সামনে নৃত্য করছে অসামান্য রূপবতী নর্তকীরা। এরা ছদ্মবেশিনী দেববালা; তারা তাঁর মনোরঞ্জনের জন্যই পৃথিবীতে মানবী হয়ে জন্মগ্রহণ করেছে। অপূর্ব সে সঙ্গীত। অতুলনীয় সে আনন্দ!

কে আসছে?—

শিবিকা একখানি।

শিবিকায় কে? ফকীর সারমাদ। ফকীর সারমাদকে তিনিই আনবার জন্য শিবিকা পাঠিয়েছিলেন।

মসনদ থেকে উঠে গিয়ে তাঁকে সংবর্ধনা করবেন তিনি।

বিস্মিত হবেন সারমাদ।

শাহজাদা বলবেন—হজরত—আমার পীরসাহেব—আমি আপনাকে নয়া জমানা নয়া জাহানে অভ্যর্থনা জানাচ্ছি।

শাহজাদা দারাসিকো প্রায় ধ্যাননিবিষ্ট তন্ময়তার মধ্যে তাঁর কল্পনার ভবিষ্যৎ এঁকে এঁকে চলেছিলেন। তাঁর যে-মন যে-ধ্যান অতীতকালে বার বার নানা অলৌকিক কাল্পনিক রহস্যকে প্রত্যক্ষ করেছে—আপনার মনের মত করে গড়েছে সেই মন এবং সেই ধ্যান তাঁর জাগ্রত মুক্ত দৃষ্টির সম্মুখে আকাশের গায়ে ভবিষ্যৎকে মূর্ত করে তুলে তাঁকে দেখাচ্ছিল।

তিনি দেখছিলেন—দেওয়ানী আমে তিনি ময়ূরতক্তে বসেছেন। শূন্যলোকে সঙ্গীতধ্বনি উঠছে। দেববালার মত কন্যারা নৃত্য করছে। সুখের হিন্দুস্তান আনন্দের হিন্দুস্তান। তিনি বুঝতে পারছেন যুগযুগান্তর ধরে এই হিন্দুস্তানে যে সব হিন্দু-মুসলমানেরা—সে সুলতান নবাব বাদশাহ মৌলানা মৌলভী এবং রাজা মহারাজা পণ্ডিত ব্রাহ্মণ ভ্রান্তির পথে হিংসার পথে বিরোধ করে অনির্বাণ রাবণের চিতার মত অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়ে গেছেন সেগুলি সব নিভে গেল। তিনি তাতে নিক্ষেপ করলেন শান্তিজল। প্রসন্ন হয়ে উঠল পরলোকবাসী মানুষগুলির ভ্রূকুটি। কল্পনা করছিলেন—তিনি প্রথম উৎসব করবেন শাহজাদী দিদিজীউ জাহানআরার সাদি দিয়ে। দিদিজিউ ভালবাসেন এক রাজপুত সর্দারকে। তাঁরই সঙ্গে তাঁর সাদি দেবেন আর তাঁর ছেলে সিপর সিকোর সাদি দিয়ে ঘরে আনবেন রাজপুত ঘরের বেটী। এই সবের মধ্যেই প্রতিটিতে আসবেন ওই ফকীর সারমাদ।

ওই নাঙ্গা ফকীর সারমাদ।

তিনিও বিস্মিত হবেন। বলবেন—এ আমিও ঠিক কল্পনা করি নি শাহজাদা। তুমি সত্যই অবতার।

হজরত সারমাদ!

কল্পনা করেই তাঁকে ডাকলেন শাহজাদা। এবং তাঁর পালকির ঘেরাটা সরিয়ে দিলেন।

একটা অস্ফুট আর্তনাদ বেরিয়ে এল তাঁর মুখ থেকে। পালকির মধ্যে ও কি রয়েছে? ও কি? কোথায় হজরত সারমাদ? একখানা তামার বড় থালার উপর রয়েছে শুধু দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হজরত সারমাদের মুণ্ড। বিচ্ছিন্ন খণ্ডিত সেই মুণ্ডের মুখে তাঁর সেই আশ্চর্য প্রসন্ন হাসিটুকু ফুটে রয়েছে।

শাহজাদা দারাসিকো যতই ভাবপ্রবণ হোন তিনি শাহজাদা। যুদ্ধবিদ্যায় পারঙ্গম। বাল্যবয়স থেকে সৈন্যবাহিনীর মধ্যে অশ্বারোহণে প্রায় সারা হিন্দুস্তান ঘুরেছেন। কান্দাহারে তিনি সৈন্যবাহিনী নিয়ে গিয়ে যুদ্ধ করে এসেছেন। তিনি দুই হাত দিয়ে বার বার চোখ কচলে নিলেন। এ তিনি কি দেখছেন?—

বুঝতে পারলেন না কি দেখছেন। কিন্তু তামার পাত্রের উপর সেই কাটামুণ্ডটা তাঁকে যেন বললে—তিনি যেন স্পষ্ট শুনলেন—শাহজাদা, মসনদ ছেড়ে ফকীর হয়ে পথের ধুলোর উপর নেমে আসতে পার না?

শাহজাদা ক্ষুব্ধ হয়ে ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন—না! খুদা আমাকে হিন্দুস্তানে নয়া জমানা কায়েম করবার জন্য, 'পিঁড়ি' বদল করে নয়া জাহান তৈয়ার করবার জন্য বাদশাহীর উপর জন্মগত অধিকার দিয়ে শাহানশাহ বাদশাহ সাজাহানের জ্যেষ্ঠপুত্র হিসেবে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। আমার পথ ফকীরীর পথ নয় সাধু সারমাদ!

শাহজাদার দেহরক্ষীর উৎকণ্ঠার আর সীমা ছিল না। হাতীর পিঠের উপর সোনার হাওদার মধ্যে শাহজাদার পাশেই সে বসে ছিল। ওপাশে ছিল শাহজাদার কনিষ্ঠপুত্র সিপর সিকো। বাদশাহী পিলখানার সব থেকে বিপুলকায় ও শক্তিশালী দাঁতাল হাতীর উপর সওয়ার হয়ে চলছিলেন তাঁরা। সোনার হাওদার মধ্যে সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বিধিব্যবস্থার ত্রুটি ছিল না, সাটিনের মসনদ বা তাকিয়ার গায়ে ঠেস দিয়ে বসে শাহজাদা দারাসিকো তাঁর ওই গভীর চিন্তা ও একাগ্র কল্পনার মধ্যে মগ্ন হয়ে সম্ভবতঃ ঘুমিয়ে পড়ে স্বপ্ন দেখছিলেন, অথবা ধ্যানমগ্ন অবস্থায় অন্তর্লোকের মধ্যে কোন অলৌকিক দৃশ্য প্রত্যক্ষ করছিলেন।

সিপর সিকো এবং শাহজাদার দেহরক্ষী দুজনেই উৎকণ্ঠিত হয়ে পরস্পরের দিকে তাকাল। মৃদুস্বরে দেহরক্ষী বললে—শাহজাদা

বোধ হয়—; কথা সে শেষ করতে পারলে না। তার ভয় হল। কি বলতে কি বলবে।

সিপর সিকোও উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছিল। পিতা তার অর্ধ-নিমীলিত চোখ চেয়ে রয়েছেন ঘুমন্তের মত। চোখের তারা স্থির। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ তাকে আকৃষ্ট করতে পারছে না। অথবা ক্লান্তি ও অবসাদে তাঁর সর্বশক্তি আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। তারই মধ্যে তিনি কোন দুঃস্বপ্ন দেখছেন।

ঠিক এই সময়েই তিনি ক্রুদ্ধ স্বরে চীৎকার করে উঠলেন—না! তারপর বিড়বিড় করে কতকগুলি কথা বলে গেলেন। শেষের কথা কটি কানে এল।—"সাধু সারমাদ!"

ওঃ হো! শাহজাদা দিল্লী থেকে রওনা হওয়ার ঠিক আগেই হজরত সারমাদের সঙ্গে দেখা করে এসেছেন। এসেছেন গম্ভীর বিষণ্ণ মুখে। সাধু সারমাদ নাকি মৃগীরোগের রোগীর মত পড়ে আছে। আবেলতাবোল বকছে। বোধ করি শাহজাদা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছেন—সেই তন্দ্রার মধ্যে সেই সারমাদের সঙ্গে সাক্ষাতের জের টেনে স্বপ্ন দেখছেন।

দেহরক্ষী সিপর সিকোকে বললে—আপনি ওঁকে ডাকুন। ওঁর কষ্ট হচ্ছে।

সিপর ডাকলে—আব্বাজান! জনাবআলি! আব্বাজান! সে তাঁর গায়ে হাত দিলে।

চমকে চোখ মেললেন শাহজাদা দারাসিকো। চারিদিক তাকিয়ে দেখে বললেন—ওঃ এ কি দুঃস্বপ্ন! এয় খোদা!

কিছুক্ষণ পর তাঁর দেহরক্ষীকে বললেন—তোমাকে দিল্লী ফিরে যেতে হবে। সরাসরি তুমি চলে যাবে হজরত সারমাদের আস্তানায়। আমি তাঁকে মৃগীরোগে বেহোঁশ অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে এসেছি। তুমি হজরতের চ্যালাদের বলবে—যে কোন উপায়ে হোক হজরতের হোঁশ ফেরাও। না ফেরে তুমি বেহোঁশ হজরতের কানের কাছে

বলবে—শাহজাদা জিজ্ঞাসা পাঠিয়েছেন হজরতের কাছে। রক্তের দরিয়ায় দুটি মানুষের মুণ্ড ভেসে যাচ্ছে, একটিকে হজরত আমাকে দেখিয়েছেন চিনিয়েছেন। আর একটি মুণ্ড, সে কার? বলো, আমার সঙ্গে ধ্যানের মধ্যে কথা বলতে।—যা অনুমান করছি তা সত্য হলে জবাব দিতে বলো—কেন? কেন এমন হবে? দুনিয়ায় কি বিলকুল সবকুছ ঝুট হয়ে গেল? কেন? কেন হয়ে গেল? আমি জবাবের অপেক্ষায় প্রহর গুণব, ক্ষণ গুণব।

পঞ্চাশ

এক বৎসর চার মাস পর। দেড় বছরের উপর চলল এই ভাইয়ে ভাইয়ে নৃশংসতম যুদ্ধ। দারাসিকো এবং ঔরংজীব লড়লেন ধর্মকে জয়যুক্ত করবার জন্য। সুজা মুরাদ লড়লেন শুধু মসনদের জন্য। এক বছর চার মাস পর হজরত সারমাদ শাহজাদা দারাসিকোর প্রশ্নের জবাব দিলেন।

আকাশের দিকে মুখ তুলে যেন শূন্যলোকে সঞ্চরমাণ কোন জনের সঙ্গে কথা কয়ে বললেন। শাহজাদা দারাসিকোর প্রাণদণ্ড হয়ে গেছে আগের দিন। সারা দিল্লী মুহ্যমান। হজরত সারমাদ শূন্য লোকে দৃষ্টি তুলে বলছিলেন—শাহজাদা, সেদিন আমি দেখেছিলাম রক্তের দরিয়ায় দুটি মানুষের মাথা ভেসে যাচ্ছে পদ্মফুলের মত। সে দৃশ্য প্রথম দেখেছিল ওই বিচিত্র বালক অভয়চান্দ। সে দেখিয়েছিল আমাকে। তুমি আমার সামনে বসে ছিলে—আমাকে প্রশ্ন করেছিলে—সে মুণ্ড কার? শাহজাদা, আমি বলেছিলাম একটি মুণ্ডকে আমি চিনতে পারছি—সে মুণ্ড আমারই কাটা মুণ্ড। অন্যটির কথা তোমাকে বলি নি—বলতে পারি নি। আমার জিহ্বা উচ্চারণ করতে পারে নি। বলেছিলাম আমি চিনতে পারছি না। তার বদলে বলেছিলাম—শাহজাদা, তুমি খুদাতায়ল্লার অনুগৃহীত মানুষ। দেবদূতেরা তোমাকে দেখা দেন, তুমি পবিত্র পথের পথিক—তোমার অঙ্গে যুদ্ধের সাজ কেন? তোমাকে যুদ্ধ থেকে আমি নিরস্তই করতে চেয়েছিলাম। কারণ ওই দ্বিতীয় মুণ্ডটি যেটি আমার মুণ্ডেরও আগে ভেসে যাচ্ছিল সে মুণ্ড তোমার। এ আমি ঠিক দেখেছি কিনা জানি না শাহজাদা তবে যেন দেখেছি বলে মনে হয়েছে। সেও আমি নিজে দেখি নি—দেখিয়েছে আমাকে অভয়চান্দ—আমার জিন্দগীর রৌশন—আমার জমানার নিমক—আমার সকল সাধন ভজনের পীর।

আমি এই সব অলৌকিক কিছু কখনও দেখি নি শাহজাদা; আমি তোমাকে বলেছিলাম, তোমার মনে আছে, বলেছিলাম—আমি আমার জীবনে যত কিছু শাস্ত্র পড়েছি, যা কিছু সাধনাই করেছি, শাহজাদা, সে সব ভুলে গিয়েছি। আমি পাপ মানি না, পুণ্য মানি না, শাস্ত্র মানি না। তা বলে নিষ্পাপ হয়েছি এ কথা বলব না, এও বলব না যে কোন নূতন শাস্ত্র আমি তৈরি করেছি। না; সমস্ত অস্তিকে অস্বীকার করে নাস্তিবাদে এসে দাঁড়িয়েছিলাম। এক সম্বল আমার ছিল—সে আমার মহব্বতি, আমি ভালোবেসেছিলাম এক ঔরৎকে। শাহজাদা, সে ছিল এক বাঁদী। তাকে দেখেছিলাম মক্কা থেকে বাগদাদ বসরা হয়ে তেহরান ফেরার পথে ইরাকের মরুভূমির কোল ঘেঁষে যে সড়ক চলে গেছে তারই পাশের এক সরাইখানায়। শাহজাদা, তাকে কিনে তাকে নিয়ে ঘর বাঁধব বলে সওদাগরি করতে এসেছিলাম হিন্দুস্তানে। দৌলতখানা তৈয়ার করব। দৌলত আমি পেলাম—কিন্তু ওই ঔরৎ ওই বাঁদী সে যে এই দুনিয়ার হাটে কোথায় হারিয়ে গেল তার পাত্তা আর হল না। আমি হিন্দুস্তানে থাট্টায় হায়দ্রাবাদে ব্যবসায়ে বানিয়াগিরির মৌজে বুঁদ হয়ে গেলাম। বিদ্যা আমার ছিল। ঝুট্ হয়ে গেল। মনে দুঃখ ছিল না। দুনিয়ায় দৌলতের মৌজের দারুণ মোহ—দুনিয়ায় এসে এই মোহে পড়লে দেবদূতও আর বেহেস্তে ফেরে না, ফিরতে চায় না।

সে অনেক কথা শাহজাদা।

সে কিস্সা তোমার শুনে কাজ নেই। তুমি পবিত্রাত্মা শাহজাদা। *হিন্দুস্তানের বাদশাহের সর্ব-জ্যেষ্ঠ পুত্র*—তোমার ভাগ্য মহৎ, তোমার বংশ উচ্চ, তোমার আত্মা পবিত্র। তুমি বলেছ যে বাল্যকাল থেকে দেবদূত তোমাকে দর্শন দেয়—আমি তা অবিশ্বাস করি না।

তুমি নিজেকে বল অবতার তারও প্রতিবাদ আমি করি না। আমি দেবদূত দেখি নি—অবতার আমি বিশ্বাস করতাম না। আমি বিদ্যার বলে সকল আস্তিক্যবাদকে খণ্ডন করে বস্তুবাদকে সর্বস্ব করেছিলাম

—আমি একদিন যাত্রার পথে এক কবীরপন্থী সাধুর দলে দেখলাম এক আশ্চর্য বালককে। এই অভয়চান্দকে। শাহজাদা, তার সুরত সকলেই দেখেছে কিন্তু তার সেই এক আশ্চর্য সুরত আছে যা আমি দেখলাম—সে আর কেউ দেখতে পেলে না। পায় নি। তার মুখের সঙ্গে আশ্চর্য মিল সেই ঔরতের সেই বাঁদীর যাকে দেখে আমি দিল হারিয়েছিলাম। যাকে না-পাওয়ার জন্য সমস্ত আস্তিক্যবাদ আমার কাছে ঝুট্ হয়ে গেল। কিন্তু ওই মুখের মিলই অভয়চান্দের সে আশ্চর্য সুরতের উৎস নয়। শাহজাদা, সে আসমানের কিনারার দিকে মুখ তুলে সত্যিই কোন এক নতুন দুনিয়া নতুন আস্তান দেখতে পেত। আমি দেখেছি। নিজের চোখে দেখেছি। সে সেই দুনিয়ার মানুষের সঙ্গে কথা বলে। দুনিয়ায় সব অবিশ্বাস করতে পারি—সব কিছুকে ঝুট্ বলে উড়িয়ে দিতে পারি, পারি না শুধু এই বিশ্বাসকে উড়িয়ে দিতে। অভয়চান্দ সূর্যের মত, সবটাই আলো—সবটাই জ্বলন্ত। সে মাটির প্রদীপ নয়, তেল সলতে মিলিয়েই তার মুখেই সে জ্বলে না। শাহজাদা, এই অভয়চান্দকে নিয়ে পড়লাম বিচিত্র বন্ধনে। তাকে আমি ডাকাতদের হাত থেকে উদ্ধার করে তার মায়ায় বাঁধা পড়লাম। সেই মায়ায় বিচিত্রভাবে একে একে সব দৌলত ছেড়ে দিলাম—কিসের নেশায় ফকীর হলাম, শেষ পর্যন্ত নাঙ্গা হলাম; তবু অভয়চান্দের বন্ধন কাটাতে পারলাম না। ধর্ম, সে যে কোন ধর্মই হোক না কেন আজও আমি মানি না—কিন্তু বিচিত্র, অতি বিচিত্র শাহজাদা, অভয়চান্দ বলে, আমি সব ধর্ম মানি।

থাক শাহজাদা—সময় নাই। তোমার সময় নাই। হয়তো আমারও নাই। তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করে পাঠিয়েছিলে—আমি যে দুই মানুষের মুণ্ডকে রক্তের দরিয়ায় ভেসে যেতে দেখেছি তার একটি আমার, অন্যটি কার?

তুমি নিজে স্বপ্নের মধ্যে এ দৃশ্য দেখেছ। তুমি চিনতে পার নি। শাহজাদা, তার একটি তোমার। অন্যটি আমার।

তোমার দূতকেও এ কথা বলতে পারি নি। বললে হয়তো তোমার পক্ষে তুমি সাবধান হতে পারতে। কিন্তু ঠিক তোমার দূত যখন আমার কাছে এল তখন আমার আস্তানার ঠিক দরওয়াজার মুখে দুই দিকে দুটি কাটা মুণ্ড কেউ সাজিয়ে রেখে গিয়েছিল।

একটি মুণ্ড পুরুষের, অন্যটি নারীর। একজন কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ কবি সুভগ, অন্যজন কাশ্মীরের ফকীর শাহফানির এক পিয়ারের কসবী পিয়ারী—নাম তার নাজি—কেউ কেউ বলে আগে তার নাম ছিল শিরিন, তখন সে ছিল তোমাদের বাঁদী। একজন আমাকে বলেছিল, শাহজাদা দারাসিকো, এরা দুজনেই ছিল তোমার আশ্রিত এবং স্নেহের পাত্র পাত্রী।

ওই দুই মুণ্ডের সঙ্গে একখানা কাগজ ছিল। তাতে লেখা ছিল শাহজাদা দারাসিকোর নতুন দুনিয়ার প্রথম আদমী আর ঔরতের মুণ্ড রক্তের দরিয়ায় ভেসে গেল।

সেদিন ধাঁধায় পড়েছিলাম। বুঝতে পারি নি। শাহজাদা, এ কাজ করিয়েছেন শাহজাদী রৌশনআরা। শাহজাদী রৌশনআরার হুকুমে যে এই কাজ করে মুণ্ড দুটোকে আমার আস্তানার ফটকে রেখে গিয়েছিল সেই লোক নিজে এসে আস্ফালন করে আমাকে বলে গেল কিছুক্ষণ আগে। শাহজাদী রৌশনআরা একদিন ছদ্মবেশে তোমাদের মামাসাহেব খানখানান সায়েস্তা খানের বাড়ির পালকি করে এই দীন ফকীর সারমাদের আস্তানায় এসেছিলেন; শুনতে এসেছিলেন কোন্ ভবিষ্যদ্বাণী আমি করছি তোমাদের এই মসনদ নিয়ে ঝগড়ার ব্যাপারে। তিনি শুনে গিয়েছিলেন ওই বিচিত্র বালক অভয়চান্দ কাঁদছিল আর বলছিল—হায়রে হায় হায়রে হায়, রক্তের স্রোত বয়ে গেল ধরতির বুকে—যমুনার পানি লাল হয়ে গেল। সেই স্রোতে ভেসে গেল দুটি মানুষের মুণ্ড। রৌশনআরা ভয় পেয়েছিলেন; ভেবেছিলেন বালক বুঝি বলছে সেই স্রোতে ভেসে যাচ্ছে তাঁর মুণ্ড আর শাহজাদা ঔরংজীবের মুণ্ড। ভয় পেয়ে চলে গিছলেন।

যাবার পথে বেহোঁশ হয়ে পড়েছিলেন পালকির মধ্যে। তাঁর আয়ী তাঁকে নিয়ে তুলেছিল এক বিবাগী উদাসীর আস্তানায়। সে আস্তানা কবি সুভগের। কবির কাছে তখন ফিরে এসেছে শিরিন। তারাও সেখানে তখন নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিল এই কথা। তারাও অনুমান করেছিল রক্তস্রোতে ভেসে যাবে যে দুটি মুণ্ড তার একটি নিশ্চয় শাহজাদা ঔরংজীবের। শিরিন বলেছিল তাহলে সম্ভবতঃ দ্বিতীয়টি হবে তার অর্থাৎ তোমার মঝলি শাহজাদী বহেন রৌশনআরার।

রৌশনআরা চলে গিছলেন তাঁর আস্তানা থেকে; পাগলের মত উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে চলে গিছলেন। তাঁর মনে গভীর আক্রোশ জেগে উঠেছিল।

নিষ্ফল আক্রোশে অন্য কোন পথ না পেয়ে দিল্লী থেকে যেদিন বাদশাহকে নিয়ে তোমরা আগ্রা রওনা হলে—যেদিন তুমি যুদ্ধের সাজে সজ্জিত হয়ে আমার সামনে এলে—যেদিন আমি আশ্চর্যভাবে ওই রক্তের দরিয়ায় দুটি মুণ্ড ভেসে যেতে দেখেছিলাম, সেইদিন রাত্রে শাহজাদী রৌশনআরার নিযুক্ত এক ঘাতক কবি সুভগ আর শিরিনকে হত্যা করে তাদের দুটি মুণ্ড আমার আস্তানার দরজার দুই দিকে সাজিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। তার সঙ্গে একটা চিরকুটও ছিল, তাতে লেখা ছিল—কাফের সারমাদ, এর পর তোমার এবং ওই বানিয়া লৌণ্ডা অভয়চান্দের মুণ্ডও রক্তের দরিয়ায় ভেসে যাবে। তোমরা ভুল দেখেছ। মুণ্ড দুটো নয়, চারটে। 'সে হস্তাক্ষর স্বয়ং রৌশনআরার। সে-কথা আমাকে আজই বলে গেল শাহজাদীর সেই বহুৎ পেয়ারের গোলাম, যে শাহজাদীর হুকুমত তামিল করেছে নিজ হাতে। লোকটার নাম সুলেমন। লোকটা বাংগাল মুল্কের আদমী, হিন্দু ব্রাহ্মণ ঘরের ছেলে; হিন্দুরা তাকে জাতে ঠেলেছে বলে সে মুসলমান হয়েছে এবং ডাকাতের দল গড়ে নিজের হাতে সহোদর ভাইদের কেটে এসেছিল থাট্টায়। আমি জানি না কিন্তু সুলেমন বলে

গেল আমি তার একদিন অপমান করেছিলাম বলে সে আমার জান নেবার জন্য কসম খেয়েছে। সে এখন শাহজাদী রৌশনআরার বিশ্বস্ত গোলাম। সে সব পারে। রৌশনআরা নিষ্ঠুর ক্রোধে সুভগ আর শিরিনের মুণ্ড চেয়েছিলেন—সে হুকুম তামিল করেছিল সুলেমন। এবং শাহজাদীর হুকুমমত আমার আস্তানার দরওয়াজার দুই পাশে সাজিয়ে বসিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। এবং শাহজাদীর হাতের লেখা চিরকুট রেখে গিয়েছিল পত্থল চাপা দিয়ে। সে খবর তোমার সওয়ারকে আমি দিয়েছিলাম—কিন্তু সে খবর তুমি পাও নি আমি জানি। তোমার সে সওয়ার আর ফিরে গিয়ে তোমার কাছে পৌঁছতে পারে নি। শাহজাদীর চর আর তার সিপাহী সুলেমন তাকেও খুন করেছে দিল্লী থেকে আগ্রা ফেরার পথে। শাহজাদা, আজ তুমি নাই। তুমি পরাজিত হয়ে—হিন্দুস্তানে হিন্দু মুসলমান রাজা নবাব সুলতান আমীর উমরাহ সব লোকের নিষ্ঠুর বেইমানির ফলে তুমি পরাজিত হয়ে বন্দী হয়ে শেষ পর্যন্ত মুল্লা মৌলবীর বিচারে কাফেরীর গুণাহের দাম হিসেবে তোমার শির দিয়েছ।

শাহজাদা, তোমার শির তুমি কুরবানি করেছ।

আজ সকালবেলাতেই শাহজাদী রৌশনআরার সিপাহী শেখ সুলেমন এসেছিল আমার কাছে। তখনও কেউ জাগে নি, কারুর ঘুম ভাঙে নি। এসে দাঁড়াল আমার সামনে রক্তমাখা হাত নিয়ে। বললে—ভণ্ড ফকীর—কাফেরর মধ্যে সব থেকে ঘৃণিত কাফের এবার আসছে তোমার পালা!

আমার আস্তানার চারিদিকে সিপাহীর পাহারা বসে গেল। আমি আকাশের দিকে তাকিয়ে খুঁজছি তোমার আত্মাকে। তোমাকে আমি দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু অভয়চান্দ বলছে তুমি পৃথিবীর সকল দুঃখ দুর্দশা লাঞ্ছনার পালা শেষ করে খুদাতায়লার দরবারের দিকে যেতে যেতে আমার আস্তানার আকাশে দাঁড়িয়ে আমাকে বিদায় সম্ভাষণ জানাচ্ছ। বলছ—আমার পীর ফকীর সারমাদ তুমি আমাকে

এ কথা বল নি কেন? বিশ্বাস কর শাহজাদা আমি দেখেও বিশ্বাস করতে পারি নি। তা ছাড়া এ দেখা আমার কাছে সত্য হয়েও সত্য নয়। আমি ভেবেছিলাম শাহজাদী রৌশনআরা যেমন ভেবেছে মুণ্ড দুটোর একটা হল তার নিজের অন্যটা হল শাহজাদা ঔরংজীবের ঠিক তেমনিভাবেই প্রাণের ভয়ে আমিও দেখেছিলাম একটা মুণ্ড আমার অন্যটা তোমার। তার জন্য তোমারও আফসোস নাই আমারও আফসোস নাই। তুমি দিয়েছ তোমার শির আমিও দেব আমার শির। আমি পালাব না। সেই বিচারের অপেক্ষায় রইলাম। আসুক বাদশাহ ঔরংজীবের কাজীর মৌলভী পরওয়ানা।

শাহজাদা, বিচিত্র বালক অভয়চান্দ আমাকে বলেছে এর জরুরৎ ছিল। এ হল কুরবানি। হিন্দুরা বলে বলিদান। সে বলে বলিদান না হলে কোন যজ্ঞ সফল হয় না। এ থেকে মহান সত্য আর নেই শাহজাদা। বকরীদের কথা মনে পড়ছে। খুদাতায়লার যে শ্রেষ্ঠ ভক্ত সে তার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ তার সন্তানকে কুরবানি করতে গিয়েছিল। খুদা সন্তানকে রক্ষা করে দুম্বাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আজ খুদার দরবারে তোমার জান কুরবানির জরুরৎ হয়েছে। আল্লা ভিন্ন মামুদ নাই। তিনিই দিন রাত্রিকে সৃষ্টি করেছেন। আকাশ মৃত্তিকা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তিনিই প্রতিপালক পরিচালক। আল্লা ভিন্ন কোন মামুদ নাই। লা-এলাহা ইল্লালা হো শোভানাল হাবিবেশ শাহীবেশ, তিনিই মানুষের শ্রেষ্ঠ সুহৃদ। তিনিই সমস্ত মিথ্যার মধ্যে পরম সত্য—মৃত্যুর অনন্ত হতাশার মধ্যে শেষ ভরসা। গত জীবনে এই হতাশার অন্ধকারেই তাদের অস্তিত্ব শেষ হয়ে গেছে। মানুষ তোমাকে কল্পনা করে হয়তো আবিষ্কার করে আর একটা লোকের খবর পেয়েছে।

দেশভেদে ভাষাভেদে ধর্মভেদে তাঁর বহু রূপ বহু নাম। তাঁর রূপ নাই তবু তাঁর অনন্ত বৈচিত্র্য। তাঁর সেই বহু রূপ অনন্ত

বৈচিত্র্য বহু নামকে এক করে প্রকাশ করতে চেয়েছিলে। হল না। তা তুমি এ জীবনে এ জন্মে পারলে না।

এ কথা অনেক আগেই আমাকে বলেছিল ওই বিচিত্র বালক অভয়চান্দ।

সে মাঝে মাঝে বলত—হায়! শাহজাদা দারাসিকো কেন শাহজাদা হয়ে জন্মাল? রামচন্দ্রজী কিষণচন্দরজী এ পথে সব পেরেও কিছু পারে নি।

থাক। সে সব কথা।

আজ তোমার জীবন শেষ হয়ে গেল। জহ্লাদ তোমার শির দেহ থেকে ছিন্ন করে সোনার থালার উপর রেখে শাহজাদা ঔরংজীবের সামনে হাজির করে বকশিস নিয়েছে।

অয়ভচান্দ বলেছে এর জরুরৎ ছিল। বাদশাহ ঔরংজীব তোমাকে কোতল করায় নি—তুমি তোমার জান কুরবানি করেছ।

এর জরুরৎ ছিল। ইতিহাসের তুমি মহাবলি।

আমি ভাবছি শাহজাদা। বুঝতে চেষ্টা করছি। অভয়চান্দের কথা আমার কাছে খুদার প্রত্যাদেশের মত সত্য।

আমার কাছে অন্য সত্য নাই।

সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই আমার কাছে মিথ্যা—ঝুট, সত্য শুধু ওই বালকটি। অসীম নাস্তির মধ্যে ওই আমার একটি অস্তি বিন্দু।

আমার কাছে তোমার জীবন-সত্য অসংখ্য প্রশ্নে ভরা।

শাহজাদা, তুমি তোমার প্রথম যৌবন থেকে অনেক অলৌকিক দর্শন পেয়েছ—স্পর্শ পেয়েছ, অনেক বাণী শুনেছ। অনেক স্বপ্ন দেখেছ।

শাহজাদা, আজ থেকে তোমার আত্মা দেহ থেকে মুক্ত হয়ে খুদার দরবারের সেই শেষ বিচারের দিনের প্রতীক্ষা করবে। আজ তুমি আমাকে সত্যকথা বলে যাও শাহজাদা, বলে যাও সে সব কি তুমি

সত্যই দেখেছ শুনেছ বুঝেছ অথবা মনে মনে গড়ে নিয়েছ মনোমত ঘটনা ?

আমি সংশয়ী. তাই বা কেন ? আমি নাস্তিতে নিঃশেষে বিলুপ্ত হবার অপেক্ষা করছি। এই একবিন্দু অস্তিতে স্থিতির অস্তিত্ব নিষ্ঠুরতম নাস্তি অপেক্ষাও নিষ্ঠুর। আজ মন বলছে সব ঝুট্ হ্যায়—বিলকুল সবকুছ ঝুট্ হ্যায়।

তুমি হাসছ। হয়তো এও আমার কল্পনা যে তুমি হাসছ। মন আমার ভ্রম দেখছে। কারণ অভয়চান্দ আমাকে বলেছে যে, তুমি জান কুরবানি করে আগামী কালে নয়া জমানার আজান দিয়ে গেলে। মন্দির মসজিদ গির্জা একসঙ্গে গড়া হবে যে ইমারতে তার ভিত পত্তন হল তোমার ওই পবিত্র সুন্দর দেহের কবরের উপর। আমি সেই কথায় বিশ্বাস করতে চাই বা করি বলেই তোমার অদেহী মূর্তিকে আমি দেখতে পাচ্ছি। দেখছি তুমি হাসছ। শাহজাদা, আমি বলেছিলাম,—

হম মোতিয়ে ফরকানম হম কাশিসে রুহবানম
রাব্বি ইহুদানম কাফিরম মুসলমানম।

বলেছিলাম আমি সব। আজ বলছি, না, আমি কিছুই নই—আমি মুসলমানও নই, কাফিরও নই, রাব্বি ইহুদীও নই। হিন্দু মুসলমান ক্রীশ্চান ইহুদী পারসী আমি কিছুই নই। আমি শুধু দেহধারী মানুষ জীব। জন্তুও বলতে পার। সদ্য-সন্তান-প্রসব-করা গরু মায়ের মত আমি অভয়চান্দের মায়ায় অন্ধ মানুষদেহধারী জীব। শাহজাদা, আমি যা শিক্ষা করেছিলাম তা ভুলে গিয়েছি। কোন্ সাধনা করেছি—কি ফল তাতে হয়েছে তাও আমি জানি না। সারা জীবন নাঙ্গা হয়ে থাকলাম। অথচ নিজেকে তিরস্কার করে বলেছি—সারমাদ, হয় তুমি তোমার এই দেহকে নিয়ে তোমার পৃথিবীকে তোমার ভালবাসার জনকে ভোগ কর নয়তো তোমার জনকে তুমি কুরবানি কর ঈশ্বর-সাধনার পথে। আমি নাঙ্গাই থাকলাম। কুরবানি

দিতে পারি নি। আমি ধর্মসাধকদের চরম অনিষ্ট করে গেলাম। নিজেকে এই মুহূর্তে কি বলছি জান? আমার নতুন গান আজকের গান তুমি শুনে যাও।

"সারমাদ কি ক্ষতি তুমি করলে সাধনপথের তুমি জানো না। হায় সারমাদ, গভীর রহস্যভরা মাদকতাময় দুটি চোখের নেশায় তোমার শাস্ত্রবিশ্বাস বিদ্যা তোমার ধনসম্পদ নিয়ে কাফেরী করে ছিনিমিনি খেলে গেলে। জলে বিসর্জন দিয়ে গেলে। শুধু অপূর্ব সুন্দর নেশায় মাতাল দুটি চোখের জন্য।"

সারমাদ দার দী-ন আজব শিকস্ত কার্দি—

তাতে আমার আফসোস নেই। সে চোখ দুটি দেখেছিলাম আরবদেশে মরুভূমির এক প্রান্তে এক সরাইখানায় এক পূর্ণিমা রাত্রে। সে ছিল এক রমণী। তার সর্বাঙ্গ ঢাকা ছিল বুরখায়। হাতে ছিল আলো। হঠাৎ সে তার মুখের ঢাকনাখানি খুলেছিল আর অনাবৃত মুখের উপর পড়েছিল আলো। আমি দেখেছিলাম তার চোখ। আর কিছু দেখি নি। আমারও নাকি জান যাবে। বিচার নাকি আমারও হবে। সুলেমন ঔরংজীব রৌশনআরার কাছে জহ্লাদের কাজ নিয়েছে। সে তার কুঠার শাণিত করছে। আমার আত্মা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হবে। সে তার মুক্তি কি না জানি না। তবে আমার প্রাণহীন দেহের যেখানে কবর হবে সেই কবরের উপর আসন করে আমার আত্মা সেই চোখ দুটির ধ্যানে সমাধিস্থ হবে।

সালাম তোমাকে। তোমাকে সালাম।

হায় শাহজাদা তুমি যদি মসনদের দিকে হাত না বাড়িয়ে ফকীরী নিতে পারতে! হায় হায়! হিন্দুশাস্ত্র আমি পড়েছি শাহজাদা। রামচন্দ্র রাবণকে বধ করে কি জন্মান্তরে কংস শিশুপালের আবির্ভাবকে বন্ধ করতে পেরেছিলেন? তুমি মসনদ ছেড়ে যদি ফকীর হতে পারতে তাহলে কে বলতে পারে আজ তোমার ধ্যানাসনের সামনে শাহজাদা

ঔরংজীব হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকত না? কে বলতে পারে কঠোর রুক্ষ সৌন্দর্যের অধিকারিণী রৌশনআরা আজ ধ্যানস্থ তোমার আসনের সামনে লাবান গুগগুল ধূপ আগরবাতি জ্বেলে নতজানু হয়ে তোমার চোখ মেলার প্রতীক্ষায় বসে থাকত না?

ওঃ শাহজাদা আমি মিথ্যা আক্ষেপ করছি।

দুনিয়ায় যা ঘটে তা অনিবার্যভাবেই ঘটে। তার পিছনে এর জন্য অনেক সংঘটন আছে। এবং এর জন্য আপসোস করে লাভ নেই।

তবু তুমি কুরবাণী করে নয়া জমানাকে দাগ দিয়ে গেলে। তার আজান করে গেলে।

* * *

এপ্রিল থেকে আর এক এপ্রিল—তারপর অগস্ট, এদেশের বৈশাখ থেকে চৈত্র এবং আবার বৈশাখ থেকে পরবর্তী ভাদ্র এক বছর কয়েক মাস। ইংরিজী খ্রীষ্টাব্দ ১৬৫৮-১৬৫৯। সমস্ত হিন্দুস্তানে দক্ষিণে ঔরঙ্গাবাদ দৌলতাবাদ পশ্চিমে গুজরাট পূর্বে বাঙ্গলাদেশের রাজমহল থেকে দিল্লী আগ্রা পর্যন্ত এবং আগ্রা দিল্লী থেকে দূর পশ্চিম সীমান্তের পার্বত্য প্রদেশের মালিক জিওন খাঁর গ্রাম পর্যন্ত মাটির ধুলো আকাশ পর্যন্ত গিয়ে স্পর্শ করল যুদ্ধোন্মত্ত সৈন্যবাহিনীর পায়ে পায়ে।

দূর দক্ষিণ দৌলতাবাদ থেকে শাহজাদা ঔরংজীব উত্তরাপথের পথ ধরে নর্মদাতীরে ধারমাদের প্রান্তরে এসে শাহজাদা মুরাদের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে মিলিত হলেন। তাঁদের বাধা দিতে এসেছিলেন মহারানা যশোবন্তসিং তাঁর রাজপুত বাহিনী নিয়ে—তাঁর সঙ্গে ছিল মনসবদার কাসিম খাঁ।

ধারমাদে হল প্রথম সংঘর্ষ।

কাসিম খাঁ তার বাহিনী নিয়ে সত্যকারের সহযোগিতা করে নি। মহারানা যশোবন্তসিংহ হয়তো মৃত্যুভয়হীন মহাবীর। কিন্তু ঔরংজীব

একসঙ্গে বীর যোদ্ধা এবং বিচক্ষণ সেনাপতি—তার উপর গোঁড়া মুসলমান। কাসিম খাঁ হিন্দু-মুসলমানের এক দুনিয়ার প্রবর্তন পরিকল্পনা প্রণেতা দারাসিকোর জয় কামনা করে নি। মহারানা যশোবন্ত গোঁড়া রাজপুত, হিন্দু-মুসলমানের এক দুনিয়া তিনিও চান না। কিন্তু তিনি রাজপুত ধর্ম অনুযায়ী প্রাণপণ করে যুদ্ধ করেও শাহজাদা ঔরংজীব-মুরাদের মিলিত বাহিনীর কাছে নিষ্ঠুরভাবে পরাজিত হন। যশোবন্তসিংহ পালালেন।

ঔরংজীবের বাহিনী অগ্রসর হল আগ্রার পথে।

দারাসিকো এবার চতুরঙ্গ বাহিনী নিয়ে আগ্রা থেকে বাদশাহ সাজাহানের আশীর্বাদ নিয়ে অগ্রসর হলেন বাধা দিতে।

ওদিকে শাহজাদা সুলেমন সিকো পূর্বমুখে গেলেন শাহ সুজাকে বাধা দিতে। শাহ সুজা বাংলাদেশের রাজমহল থেকে সসৈন্যে এগিয়ে আসছিলেন আগ্রার দিকে। বেহার সীমান্ত পার হয়ে বারাণসীর দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন তিনি। তিনি রাজমহলে নিজের অভিষেক সমারোহ করে নাম নিয়েছেন আবুল ফৈজ নাসিরুদ্দিন মহম্মদ তৈমুর সেকেন্দরসানি শাহ সুজা বাহাদুর গাজী। বাংলা বেহারের মসজিদে মসজিদে ওই নামে খুত্‌বা পড়া হচ্ছে।

সারা হিন্দুস্তানের মানুষেরা বিস্ময়ে এবং সভয়ে তাকিয়ে ছিল মসনদ নিয়ে কাড়াকাড়ির এই কুৎসিত ভয়াল রক্তাক্ত সংঘর্ষের দিকে।

পৈতৃক সম্পত্তির অধিকার নিয়ে ভাইয়ে ভাইয়ে দ্বন্দ্ব নূতন নয়। চিরপুরাতন। এ শুধু মুসলমানের কলঙ্ক নয়; হিন্দুও এতে পিছিয়ে নেই। সহোদর না হোক জ্ঞাতি ভাইদের মধ্যে ভারত সাম্রাজ্য নিয়ে কুরুক্ষেত্র হয়ে গেছে। লোকে বলে সম্রাট অশোক, প্রিয়দর্শী অশোক তাঁর বৈমাত্রেয় ভাইদের বধ করে-ছিলেন। সাধারণ গৃহস্থ ঘরে কত হত্যা কত সংঘর্ষ হয়েছে

তার সীমা কেউ নির্ণয় করতে পারে না। কিন্তু তবুও এমন তীব্র হিংসায় হিংস্র এবং কঠিনতম আক্রোশে নিষ্ঠুর এমন ভ্রাতৃ-দ্বন্দ্ব আর কখনও হিন্দুস্তানে অনুষ্ঠিত হয় নি। মসনদের জন্যে পাঠান সুলতান জুনা খাঁ সুলতান মহম্মদ তোগলক কৌশলে পিতৃহত্যা করিয়েছিলেন। সুলতান আলাউদ্দীন খিলজী পিতৃব্য জালালউদ্দীন খিলজীকে হত্যা করিয়েছিলেন। আরও বহু হত্যা করেছেন তিনি দেবগিরি গুজরাট চিতোর যুদ্ধে। বহু কুটিল পন্থায় যুদ্ধগুলিকে ভয়ংকর করে তুলেছিলেন। কিন্তু এমন কুটিল এবং ভয়ংকর হিংস্রতা যাকে তুলনা করা যায় অজগরের পাক দেওয়া আক্রমণের সঙ্গে—এমন ভয়ংকর এবং কুটিল সে যুদ্ধগুলি ছিল না।

ধীর শান্ত ভাবে শাহজাদা ঔরংজীব অগ্রসর হচ্ছেন দক্ষিণ থেকে উত্তরে। তাঁর মধ্যে আশ্চর্য ভয়ংকর নিষ্ঠুরতার সংকল্প। নর্মদা পার হয়ে ধারমাদ। নর্মদা পার হবার আগেই শাহজাদা মুরাদবক্স সসৈন্যে তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। শাহজাদা ঔরংজীব বলেছেন দিল্লীর মসনদের দিকে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ নয়। তিনি তাকিয়ে আছেন মক্কার দিকে। কিন্তু হিন্দুস্তানের মসনদে কাফের দারাসিকোকে বসতে দেবেন না।

না। কখনও না।

আল্লাহ্ তায়লার এই হল নির্দেশ। পয়গম্বর রসুলের ঝাণ্ডার রং এতটুকু বিবর্ণ হতে দেবেন না তিনি। ম্লান হয়ে নুয়ে ঝুঁকে পড়তে দেবেন না তিনি।

কভি না।

তাঁর কপিশ চক্ষুতারকার মধ্যে একটা ক্রুদ্ধ অগ্নিশিখা যেন অহরহ জ্বলছে।

সাজাহান বাদশাহের চার পুত্রের বুকেই জ্বলছে হিংসার অগ্নি-কুণ্ড। সে অগ্নিকুণ্ডের আগুনের উত্তাপ সারা হিন্দুস্তানকে যেন দিল্লীর

বৈশাখী খরার দুপুরের লু বাতাসের মত বাতাসে দগ্ধ করে দিচ্ছে। এর মধ্যেও শাহজাদা ঔরংজীবকেই যেন বেশী ভয় লাগছে মানুষের।

হত্যার আদেশ দিতে তাঁর মুখের পেশী কাঁপে না। মুখের ভাবের এতটুকু পরিবর্তন হয় না। কানের পাশ দিয়ে বন্দুকের গুলি ছুটে গেলে তিনি চকিতের জন্যও ফিরে তাকিয়ে দেখেন না।

তাঁর ইসলামের এই হুকুমত।

ইসলামের হুকুমত পালন করেই তিনি মক্কা চলে যাবেন। সুরা তিনি স্পর্শ করেন না—নারীর দিকেও তাঁর লালসা উগ্র নয়। নর্তকীর লাস্য তাঁকে মুগ্ধ করে না। সংগীতের সুরে তিনি মোহাবিষ্ট হন না।

মুসলমানেরা তাঁর ধর্মনিষ্ঠায় ভীতভাবে মুগ্ধ।

শাহজাদা ঔরংজীব হিন্দুদের বলেছেন—হিন্দু হিন্দু থাক, মুসলমান মুসলমান। হিন্দু মুসলমানের ভেদ তুলে দিয়ে হিন্দুর ধর্মকেও জাহান্নমে পাঠিও না ইসলামেরও সর্বনাশ করো না। দজ্জাল জালালউদ্দিন আকবরশাহের ইলাহী ধর্মের নতুন পয়গম্বর দারাসিকো ছদ্মবেশী শয়তান। বিশ্বাস করো না।

তবুও ধারমাদের প্রান্তরে মহারানা যশোবন্ত সিং তাঁকে বাধা দিলেন। রাজপুতের মতই বাধা দিলেন। যুদ্ধে তাঁর বীর্য এবং অসমসাহসিকতা বিস্ময়কর। তবু ধীর তীক্ষ্ণবুদ্ধি শাহজাদা ঔরংজীবের কৌশল এবং বিচক্ষণতার কাছে যশোবন্তের সেই অসমসাহসিকতা এবং অসাধারণ বীর্যমত্তা পাহাড়ের গায়ে জলোচ্ছ্বাসের মত পরাজিত হল। মহারানা নিজে আহত হয়ে রণক্ষেত্র ত্যাগ করলেন। কোনক্রমে প্রাণ নিয়ে ফিরে গেলেন যোধপুর।

ভেরীনাদ ধ্বনিত হল।

শাহজাদা ঔরংজীবের বিজয়বাহিনীর বিজয়বাদ্য আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে গেল।

আগ্রায় খবর এল।

শাহজাদা দারাসিকো চঞ্চল হলেন কেঁপে উঠলেন।—এ কি হল? কেন এমন হল? কেন? এয় খোদা এয় আল্লা—পয়গম্বর রসুল—হে ভগবান হে ঈশ্বর হে রামচন্দ্র—কেন এমন হল? হিন্দুস্তানের হে পরমেশ্বর—যিনি বহু ঈশ্বরের উপর অধিষ্ঠিত এক এবং অদ্বিতীয় অবাঙ্‌মনসোগোচর ঈশ্বর, তুমি বল কেন এমন হল?

আগ্রা কেল্লার অভ্যন্তরে বিষণ্নমুখে বড়ি শাহজাদী হজরতবেগম জাহানআরা এসে দাঁড়ালেন বাদশাহের কাছে। রুগণ দুর্বল দেহ বিশীর্ণ মুখ কোটরগত চক্ষু শাহানশাহ বাদশাহ তখন নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন সম্মুখের দিকে। তিনি ভাবছিলেন অতীত-কালের কথা। শাহানশাহ বাবরশাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্রদের মধ্যে কলহের কথা। হুমায়ুন কামরান আসকারি হিন্দাল।

তাঁর পিতা শাহজাদা সেলিমের সঙ্গে তাঁর ভাইয়ের কলহের কথা।

তাঁর সঙ্গে ভাইদের কলহের কথা।

শাহজাদী জাহানআরা তাঁকে সাহস করে ডাকতে পারেন নি। বাদশাহ নিজেই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেছিলেন—তোমাকেই যেন মনে মনে চাচ্ছিলাম জাহানআরা।

—ফরমায়েস করুন হজরত। তবিয়ৎ কি খারাপ মালুম হচ্ছে?

—না জাহানআরা। শরীর যদি একেবারে ধ্বংস হত তবে আমি নিশ্চিন্ত হতাম। দুশ্চিন্তা যে সহ্য করতে পারছি না মা।

—কিসের এত দুশ্চিন্তা হজরত?

—চাঘতাই বংশে কি ভাইয়ের চেয়ে ভাইয়ের বড় শত্রু আর দ্বিতীয় নেই? এর থেকে কি নিষ্কৃতি নেই?

চুপ করে রইলেন জাহানআরা।

বাদশাহ বললেন—দারা কোথায়? তাকে বলো সমস্ত রাজ্যের

ভার আমি তার হাতে দিয়েছি। সে রাজ্য রক্ষা করার দায়িত্ব তার। ঔরংজীব ধারমাদে শাহী ফৌজকে হারিয়ে দ্রুতবেগে আসছে আগ্রার দিকে। ঔরংজীব কাউকে ক্ষমা করবে না।

জাহানআরা বললেন—আমি যতদূর জানি শাহবুলন্দ ইকবাল তারই আয়োজনে ব্যস্ত আছেন।

—রাজকোষ উন্মুক্ত করে আয়োজন করতে বল। শাহী ফৌজ কামান সওয়ার পয়দল হাতী নিয়ে আয়োজন করতে বল। শাহজাদাকে কিছু কঠিনচিত্ত হতে বল। বাস্তববাদী হতে বল। যুদ্ধক্ষেত্রে ঈশ্বর থেকে কিছু দূরে থাকতে বল। পরামর্শ শলাহের জন্য তাঁর দিকে না তাকিয়ে—।

থেমে গেলেন বাদশাহ। তাঁর জিভের ডগায় এসেছিল—"শয়তানের দিকে তাকাতে বল,—যুদ্ধক্ষেত্রে শয়তানের শল্লাহের দাম অনেক বেশী।" কিন্তু সে-কথা তিনি উচ্চারণ করতে পারলেন না। চুপ করে রইলেন।

জাহানআরা প্রশ্ন করলেন—পিতা?

বাদশাহ কন্যাকেই বললেন—ঔরংজীবকে আমি শাস্তি দিয়েছিলাম—তাকে সকল অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত করে নজরবন্দ করে রেখেছিলাম এই আগ্রায়। তোমার রোগমুক্তির সময় তুমিই আমাকে বলেছিলে—আজকের দিনে ঔরংজীবকে আপনি মার্জনা করুন আব্বাজান। দারাও আপত্তি করে নি। আমি তাকে ক্ষমা করে-ছিলাম। ঔরংজীব কিন্তু আমাদের ক্ষমা করবে না জাহানআরা। বানারসে হুকুমনামা পাঠাতে বল—শাহজাদা সুলেমন যেন মহারানা জয়সিং আর দিলীর খাঁকে নিয়ে দ্রুত চলে আসে আগ্রার দিকে।

আবার এক মুহূর্ত নীরব থেকে বাদশাহ বললেন—মহারানা জয়সিং কি আসবে? আমি বলেছিলাম দারাকে—দারা, রাজপুত যতক্ষণ তোমার কর্মে নিযুক্ত যতক্ষণ তোমার নিমক সে খায় ততক্ষণ নিশ্চিন্ত থেক তার সম্পর্কে। সে তার শেষ রক্তবিন্দু পাত করবে

তোমার জন্যে। কিন্তু তার সঙ্গে মেহমানি পাতাতে যেয়ো না। সে ভাবে তাতে তার জাত যায় ধর্ম যায়। সে কন্যাদান করেও পরমশত্রু হয় জামাতা। মহারানা মানসিং রাজা ভগবানদাস বাধ্য হয়ে আকবরশাহের অনুগত ছিল। মহারানা প্রতাপসিংহ যদি মহারানা মানসিংহের সঙ্গে একসঙ্গে এক পঙ্‌ক্তিতে বসে খানাপিনা করতেন তাহলে মহারানা মানসিংহের তলোয়ার চাঘতাই বংশের মূলে সর্বপ্রথম সব থেকে কঠিন আঘাত দিত। এতদিন হয়তো থাকত না মুঘল বাদশাহী। মহারানা জয়সিং—। ওঃ জাহানআরা, শাহজাদা দারাসিকো যতজন আমীরকে সিপাহীকে আদমীকে আমার দণ্ড থেকে রক্ষা করেছে আজ মনে হচ্ছে তারাই হবে তার সব থেকে বড় বিরোধী। আমি খবর পেয়েছি চিতোরের মহারানা রাজসিংহ ঔরংজীবকে কথা দিয়েছে সে দারাসিকোকে একটি আঙুল তুলেও সাহায্য করবে না। জাহানআরা, দারাসিকো তার অনেক কাল আগে জন্মগ্রহণ করেছে। এই দুনিয়ায় তার জন্মানো উচিত হয় নি। নসীব? না, নসীব নয়। আল্লার বিচিত্র ইচ্ছা।

গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আবার বললেন—শক্ত হতে বলো—নিষ্ঠুর হতে বলো—কুটিল হতে বলো—মিথ্যা কথা বলে প্রতারণা করতে শিখতে বলো—আর বলো—কাউকে যেন বিশ্বাস না করে। কাউকে না।

* * *

বিশাল বাদশাহী বাহিনী—'

তুর্কী ইরানী উজবেগী আফগান বেলচাই জাঠমুসলমান রাজপুত হিন্দুজাঠ ভূমিহার থেকে নানান জাতির হিন্দু নিয়ে গঠিত বাদশাহী বাহিনী। পঞ্চাশ হাজার সৈন্যের সঙ্গে আরও হাজার কয়েক, অন্ততঃ আট দশ হাজার খিদমৎগার। পাচক নাপিত নোকর্—জীবনের কাজে লাগবার জন্য অনেক লোক—ঝাড়ুদার সহিস মাহুত আরও কত কে বলবে। এদের মধ্যে গণৎকার আছে নাচওয়ালী আছে

বাঁদী আছে বেগম আছে কসবী আছে—কি নেই? তার সঙ্গে আছে হাতী, উট, ঘোড়া, বয়েল গাড়ীর বয়েল, দুধের জন্য গাই, মাল বইবার জন্য খচ্চর ভেড়া ছাগল গরু। জীবনের প্রয়োজনে কি না লাগে।

আগ্রার জনসাধারণ রাস্তার দু ধারে দাঁড়িয়ে দেখলে সে অভিযান। তারা জয়ধ্বনি দিলে—বহু গৃহের সম্মুখভাগ সুসজ্জিত হয়েছিল। বিশাল সৈন্যবাহিনীর মধ্যে চলন্ত পাহাড়ের মত বিরাটকায় ঘনকৃষ্ণবর্ণ হাতীর উপর সোনার হাওদায় স্বর্ণখচিত রেশমের ঢাকনা রূপোর বাঁট ছাতার তলায় বসে ছিলেন শাহজাদা দারাসিকো। তিনি ভাবতে ভাবতে চলেছিলেন হিন্দু পুরাণের যুদ্ধের কথা। বিশাল সৈন্যবাহিনীর পিছনে আগ্রা শহর আগ্রা কিল্লা ক্রমশঃ ছোট এবং ঝাপসা হয়ে আসতে আসতে একসময় বৃক্ষসমাবেশের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেল। বাদশাহের পিতার আশীর্বাদ তাঁর মাথায় বর্ষিত হয়েছে—বহেন জাহানআরা তাঁকে আশীর্বাদ করেছেন। মসজেদে মসজেদে তাঁর জয় কামনা করা হয়েছে। হিন্দুর মন্দিরে মন্দিরে প্রার্থনা পূজা পাঠ হয়েছে। তিনি নিজে ধ্যান করেছেন খুদাকে ব্রহ্মাকে পয়গম্বর রসুলকে রাজা রামচন্দ্রকে, তিনি ঈশ্বরপ্রেরিত। তিনি সূর্য, ঔরংজীব অন্ধকার—তাঁর আবির্ভাবমাত্র ঔরংজীব পালাবে। তাঁর চমক ভাঙল; আগ্রা আর দেখা যাচ্ছে না।

এবার তিনি তাকালেন সামনের দিকে।

চম্বলের দিকে চলেছে বাহিনী।

রমজান আরম্ভ হয়েছে গেল কাল। এবার রমজান পড়েছে হিন্দুস্তানের নিদারুণ বৈশাখ মাসে। লু বইছে। ধুলো উড়ছে। জ্বলন্ত চুল্লীর মধ্য থেকে যেন হাওয়া ছড়িয়ে দিচ্ছে প্রকাণ্ড একটা হাপরের সাহায্যে।

দুপহরের সূর্য মাথায় করে চলেছে বাহিনী।

চলেছিল সামুগড়ের দিকে। সামুগড় আগ্রা থেকে মাত্র কয়েক

ক্রোশ দূর। চম্বল নদীর মুখ আগলে শাহজাদা দারাসিকোর বাহিনী ছাউনি গেড়েছিল। ওদিক থেকে শাহজাদা ঔরংজীব এবং মুরাদের বাহিনী এসে পৌঁছুল। আগ্রার অধিবাসীরা রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষা করে রইল। শহরের ঘরে ঘরে মানুষেরা দু'ভাগ হয়ে গেছে। আগ্রা কেল্লার মধ্যে বান্দা বাঁদীর দল ফিসফিস করে কথা কইতে শুরু করলে। বাদশাহের মগজে উঁচু কথার শব্দ সহ্য হচ্ছে না। এক একটি রাত্রি পার হচ্ছে আর বাদশাহের বয়স বেড়ে যাচ্ছে দশ বৎসর। শাহজাদী জাহানআরা স্তব্ধ নির্বাক। শুধু তাকিয়ে থাকেন পিতার মুখের দিকে আর কান পেতে থাকেন কোলাহলের দিকে। কোন কোলাহল শুনলেই চমকে ওঠেন। আর তাকিয়ে দেখেন রৌশনআরার মুখের দিকে। ধারমাদের যুদ্ধের খবর আসার পর থেকেই রৌশনআরা আর সে রৌশনআরা নেই। এ রৌশনআরা আর এক রৌশনআরা। উদ্ধত উত্তপ্ত দর্পিত। কিছুদিন আগে শাহজাদী জাহানআরা এক সাপুড়ের সাপের খেলা দেখেছিলেন। তারই মধ্যে একটা সাপকে দেখেছিলেন যে হঠাৎ ফণা তুলে ঝাঁপি থেকে বের হয়ে আর ফণা নামালে না। ক্রুদ্ধ সাপুড়ে তাকে ধরতে গিয়ে পিছিয়ে এল ভয়ে। অনেক কষ্টেই শেষ পর্যন্ত সে সাপটাকে ঝাঁপিবন্দী করেছিল। রৌশনআরা অকস্মাৎ যেন সেই সাপটার মত ফণা তুলেছেন। আর গোপন নেই যে তিনি শাহজাদা ঔরংজীবের সাহায্যকারিণী সমর্থনকারিণী। খুদ বাদশাহ পর্যন্ত এই রক্তাভ গৌরবর্ণা অতি-উগ্রদর্শনা কন্যার মুখের দিকে তাকিয়ে যেন বিহ্বল হয়ে যাচ্ছেন। আগ্রার এত বড় কেল্লাটার মধ্যে তার তীক্ষ্ণ উচ্চ হাসির আওয়াজ যেন কুলুচ্ছে না।

বাতাসে আকাশে একটা অমঙ্গলের আশঙ্কা অনুভব করছেন বাদশাহ এবং জাহানআরা।

প্রথমদিন রমজানের প্রথমদিন। যুদ্ধ হয় নি সেদিন। জ্যোতিষীরা বলেছিল এই দিনে যুদ্ধযাত্রা প্রশস্ত নয়। দ্বিতীয় দিন শনিবার

—সেদিনও যুদ্ধ হয় নি। ওই জ্যোতিষীদের উপদেশ মত প্রস্তুত বাহিনীকে বসিয়ে রেখেছিলেন। তৃতীয় দিন ভোরবেলা শাহজাদা ঔরংজীব তিনবার তোপ দেগে যুদ্ধ আরম্ভ করলেন।

যুদ্ধ হল। সে যুদ্ধে দারাসিকো পরাস্ত হলেন।

তাঁর হাতী পালাল। দশ হাজার সিপাহী যুদ্ধক্ষেত্রে মরল। তিরিশ হাজার পল্টন নিয়ে খানখানান খলিলুল্লা যুদ্ধশেষে শাহজাদা ঔরংজীবের বাহিনীর সঙ্গে যোগ দিল।

ধূলাধূসরিত দেহ নিয়ে কোনক্রমে দারাসিকো পালিয়ে এলেন আগ্রায় কিন্তু কেল্লার মধ্যে প্রবেশ করলেন না, পিতার সম্মুখে এলেন না, মঞ্জিল নিগমবোধে এসে আছড়ে পড়লেন।

আগ্রা শহরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল।

তারপর শাহজাদা দারাসিকো তাঁর স্ত্রী পুত্র কন্যাদের নিয়ে পালালেন। আগ্রা থেকে দিল্লী। দিল্লী থেকে লাহোর। মুলতান।

পাঞ্জাব গুজরাট সিন্ধুদেশের এক দুর্গ থেকে আর এক দুর্গে আশ্রয় নিতে নিতে চলেছিলেন দারাসিকো। ওদিকে মুরাদকে বন্দী করে শাহাজাদা ঔরংজীব নিষ্কণ্টক হলেন। সুজা শাহজাদা সুলেমন সিকোর কাছে বারাণসীর কাছে পরাস্ত হয়ে পালিয়েছিলেন মুঙ্গের। ঔরংজীবের কাছে আবার পরাজিত হলেন খাজুয়ায়। দারাসিকোর সেনাপতি এবং কুটুম্ব মহারানা জয়সিংহ ঔরংজীবের আনুগত্য স্বীকার করেই ক্ষান্ত হলেন না, সসৈন্যে ছুটলেন পলাতক দারাসিকোকে বন্দী করে আনতে।

দারাসিকো আবেদন জানালেন রাজপুত রানা রাজসিংহের কাছে, একদা বাদশাহ সাজাহানের ক্রোধ থেকে তাঁকে রক্ষা করেছিলেন। মহারানা ফিরিয়ে দিলেন দূতকে।

পাঞ্জাব রাজস্থানের হিন্দু মুসলমান প্রতিটি জন বিচিত্রভাবে মুখ ফেরালো। শাহজাদা দারাসিকো শেষ গিয়ে বন্দী হলেন সীমান্ত প্রদেশে। সীমান্তের এক পাঠান সর্দার জিওহন আলি খাঁ তাঁকে

বন্দী করে পাঠিয়ে দিলে দিল্লী নতুন বাদশাহ ঔরংজীবের কাছে। একদা শাহজাদা দারাসিকো মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত জিওহন আলি খাঁকে নিশ্চিন্ত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন।

মৃত্যুদণ্ড থেকে অব্যাহতিই শুধু নয় সম্পূর্ণ মার্জনা করিয়েছিলেন শাহজাদা।

জিওহন আলি খাঁ সেদিন শাহজাদার পদচুম্বন করে কেঁদেছিল।

ফকীর সারমাদ এই এক বৎসর একান্তভাবে পরিত্যক্তের মত দিল্লী সাজাহানাবাদে তাঁর আশ্রমে বাস করছেন। আর তাঁর আশ্রমে ভিড় হয় না। শিষ্যেরা অধিকাংশই তাঁকে ত্যাগ করে চলে গেছে। বহুজনে তাঁকে উপদেশ দিয়েছে—তুমি চলে যাও ফকীর, তুমি দিল্লী থেকে চলে যাও।

সারমাদ হেসেছেন।

দু' একজন প্রশ্ন করেছেন—ফকীর, তবে কি এই দান ওলটাবে? পাকা ঘুঁটি কাঁচবে? শাহজাদা দারাসিকো আবার ফিরবেন?

সারমাদ বলেছেন—জানি না।

—তবে?

—কি তবে?

—তুমি এখানে রয়েছ কেন?

—কোথায় যাব? সমস্ত সৃষ্টিই আমার কাছে বিরাট নাস্তি। মিথ্যা। সত্য শুধু ওই বালক অভয়চান্দ। অভয়চান্দ আমাকে বলে—যেয়ো না সারমাদ, কোথাও যেয়ো না। সব কিছুর জবাব তোমাকে এখানেই পেতে হবে—এখানেই দিতে হবে।

—অলৌকিক কিছু ঘটবে?

—অলৌকিকে আমি বিশ্বাস করি না। অলৌকিক কিছু ঘটে না এ দুনিয়ায়।

অভয়চান্দ এক বৎসর ধরে ধীরে ধীরে নির্জীব হয়ে শুকিয়ে

আসছে। অধিকাংশ সময়ই সে মৃগীরোগে হতচেতন হয়ে পড়ে থাকে আর কাঁদে।

কাঁদো তুমি, হাজারোবার কাঁদো। এ দুনিয়া এই ধরতি, মাটি আর পাথরের, সে বোবা এবং চেতনাহীন। মাথার উপরে সূর্য ধরতিকে আলো দেয় কিন্তু সে বড় প্রখর এবং ক্ষমাহীন। এরই মধ্যে মানুষ করছিল প্রেমের দুনিয়া গড়ার আয়োজন—সে আয়োজনের সব রক্তের স্রোতে ভেসে গেল ভেস্তে গেল। জানি বার বার ভেঙে যায়; সে জেনেও আমি কাঁদি, তুমিও কাঁদো। হৃদয় তো পাথর নয়—তুমি কাঁদো। তবে দেখ তো ভিতটা রইল কি না?

এরই মধ্যে শাহজাদা দারাসিকোর লোক তাঁর কাছে এসেছে একবার; বেগম রানাদিলের কাছ থেকে লোক এসেছিল একবার।

শাহজাদা দিল্লী থেকে রওনা হবার সময় তাঁর লোক পাঠিয়েছিলেন—প্রশ্ন করেছিলেন—পীর, তুমি বলো আর একটা মুণ্ডকে যে রক্তস্রোতে ভেসে যেতে দেখেছ সে কার?

সারমাদ বলেছিলেন—জানি না।

বেগম রানাদিল।

অপরূপ সুন্দরী রাজপুত নর্তকী। সে দারাসিকোর পিয়ারের বেগম। লাহোরে দারাসিকো পরাস্ত হয়ে পালালেন মুলতানের দিকে—রানাদিলকে ফেলে যেতে বাধ্য হলেন লাহোরে। রানাদিল এবং জর্জিয়ান ক্রীশ্চান উদিপুরী বেগম। তাঁদের পাঠানো হয়েছে সাজাহানাবাদে। শাহজাদা ঔরংজীবের কাছে। রানাদিল লোক পাঠিয়েছিলেন সারমাদের কাছে—বলো বলো পীরসাহেব সে মুণ্ড:কার?

সারমাদ উত্তর দিতে পারেন নি।

দীর্ঘকাল পর—এক বৎসর কয়েক মাস পর শাহজাদা দারাসিকো প্রাণ দিলেন শির দিলেন। সারমাদ শূন্যলোকের দিকে তাকিয়ে বললেন—বলতে পারি নি। দেখেছিলাম তোমারই মুণ্ড। বিশ্বাসও করি নি। আজ দেখলাম সত্য হল—তোমার মুণ্ডই রক্তস্রোতে ভেসে গেল। কিন্তু প্রশ্ন জাগছে—এ কি সত্য? হঠাৎ মিলে যাওয়া সত্য?—না আরও কিছু আছে? কোন অর্থ? নাস্তির গভীরে কি অস্তি আছে?

*   *   *   *

আরও কিছু দিন পর।

ফকীর সারমাদ নিজেই নিজের প্রশ্নের উত্তর দিলেন। সারা বিশ্বসংসারকে শুনিয়েই যেন উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন—এই কি তুমি? হ্যাঁ। হ্যাঁ। এই তো তুমি! পেয়েছি, এবার তোমাকে পেয়েছি! লা ইলাহি ইল্লালা—হে ভগবান, হে সকল অস্তির উৎস—এই তো তুমি।

চীৎকার করে উঠলেন ফকীর সারমাদ। এক নিবিড় জনসমাবেশের মধ্যে সে এক অতি বিচিত্র এবং বিস্ময়কর পরিবেশ। দিল্লীর বাদশাহী কোতলখানা। মৃত্যুদণ্ড দেবার স্থান। জায়গাটার চারিদিকে লোক এসে জমায়েত হয়েছে। একদল এসেছে, কঠিন কঠোর মনোভাবসম্পন্ন মানুষ তারা, তারা এই প্রাণদণ্ডের আদেশে খুশী হয়েছে, দু হাত তুলে খুদাকে ডেকে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছে—নতুন বাদশাহ ঔরংজীবের তারা জয়ধ্বনি তুলেছে। নতুন বাদশাহ, জিন্দাপীর শাহানশাহ আলমগীর গাজী জিন্দাবাদ!

উলঙ্গ ফকীর সারমাদের উপর উলঙ্গ থাকার অপরাধে এবং ইসলামের কদর্থ করে তাকে ভ্রষ্ট করার জন্য বাদশাহের নিযুক্ত মৌলভী এবং মোল্লারা তাঁকে প্রাণদণ্ড দিয়েছেন। প্রকাশ্য স্থানে বাদশাহের নিযুক্ত ঘাতক দায়ের আঘাতে তাঁর শিরশ্ছেদ করবে।

অভিযোগ অনেক। সারমাদ কিন্তু কোন অভিযোগের বিরুদ্ধে কোন বাদ বা প্রতিবাদ করেন নি।

ওই শাহজাদা দারাসিকোর প্রাণদণ্ডের পর ফকীর সারমাদ আকাশের দিকে তাকিয়ে হয়তো বাতাসের সঙ্গে নয়তো শাহজাদা দারাসিকোর ঊর্ধ্বগামী আত্মার সঙ্গে কথা বলেছিলেন।

বলেছিলেন—"ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখার মতই জেগে-থাকা অবস্থায় স্পষ্ট দিবালোকের মধ্যে টুকরো টুকরো ছবি ভেসে উঠেছিল; তাতে দেখেছিলাম, রক্তের স্রোত বয়ে যাচ্ছে—সে স্রোতে ভেসে যাচ্ছে দুটি মুণ্ড। প্রথমটি মনে হয়েছিল যেন তোমার। দ্বিতীয়টি স্পষ্ট আমার। তোমার মুণ্ডটি ঠিক চিনতে পারি নি আর বিশ্বাসও করি নি। আজ দেখলাম সত্যই তোমার মুণ্ড রক্তস্রোতে ভেসে গেল! এ কি সত্যসত্যই সত্য?—না হঠাৎ মিলে যাওয়া সত্য? বলে যাও শাহজাদা, এ কি সত্য?"

কথাটা ছড়িয়ে পড়েছিল।

নতুন বাদশাহের কানেও পৌঁছেছিল।

কানে পৌঁছে দিলেন বেগমসাহেবা রৌশনআরাজী। তিনি নাকি ছদ্মবেশে সেই আগের মতই ফকীরের সন্ধ্যার মজলিসে গিয়ে স্বচক্ষে সব দেখে এবং স্বকর্ণে সব শুনে এসেছেন।

শাহজাদা দারাসিকো সামুগড়ে পরাজিত হয়ে পলাতক হলে প্রথম দিকটায় ফকীর সারমাদের মজলিসে লোকসমাগম বিরল হয়ে এসেছিল। সকলেই অনুমান করেছিল ফকীর সারমাদও দারাসিকোর ধর্মজীবনের অন্য সব অন্তরঙ্গদের মত পালিয়ে যাবেন। কিন্তু তা তিনি যান নি। দারাসিকোর সঙ্গে দেখা করতেও তিনি যান নি, দারাসিকোও আসেন নি।

দারাসিকোর মুহূর্তের অবকাশ ছিল না। সামুগড় থেকে আগ্রায় পৌঁছেছিলেন একপ্রহর রাত্রির পর। তারপর প্রহরখানেকের মধ্যেই আগ্রা ছেড়েছিলেন বেগমদের এবং একদল বিশ্বস্ত সৈন্য নিয়ে। পরম স্নেহময় পিতা বাদশাহ সাজাহানের সঙ্গে দেখা করতে পারেন নি

যা করেন নি। সেখান থেকে দিল্লীতে এসে বাধা দেবার সংকল্প ক'রেও তা পারেন নি। তখন দারাসিকোর স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে।

এ পৃথিবী বাইরে থেকে সবুজ এবং কোমল। কিন্তু ভিতরে ভিতরে সে কঠিনা এবং কুটিলা। পাথর বালু এবং ধুলা মাটির এই ধরতি যে-তৃষ্ণায় যে-আগ্রহে আকাশ থেকে ঝরা জল পান করে ঠিক সেই আগ্রহ এবং তৃষ্ণায় পান করে মানুষের বুকের রক্তধারা, নিষ্ঠুর কঠিন দুঃখে ঝরে পড়া মানুষের চোখের জল। মাথার উপরের যে সূর্য আলো দেয় রাত্রির অবসান করে সেই সূর্যই তোমাকে দহন করে জ্বলন্ত আগুনের মত। তাদের কাছে ঔরংজীব দারাসিকোতে কোন প্রভেদ নেই। গুনাহ কার অপরাধ পাপ কার—ঔরংজীবের না দারাসিকোর সে বিচার তারা করে না। যার মাথায় রাজছত্র বা ছত্র থাকে সূর্য তাকে বাধ্য হয়ে ছায়া দেয়; ধরতির মসনদে যে বসে তারই প্রজার লাঙলের মুখে সে শস্য উৎপাদন করে কর দেয়। তারই কাছে হীরা জহরতের ভাণ্ডার খুলে দেয়। সেই ধরতির যারা সন্তান তারা কেন হৃতশক্তি এবং পরাজিত জনের পক্ষে থাকবে। তিনি যেন বুঝতে পারছিলেন, দিল্লীর ওমরাহদের সকলেই সাগ্রহে ঔরংজীবের পথ চেয়ে আছে। সুযোগ পেলে তাঁকে বন্দী করে ঔরংজীবের হাতে দিয়ে নতুন বাদশাহের কাছে ইনাম জায়গীর মনসব অর্জন করবে। সারা দিল্লী শহরের সুন্নী সম্প্রদায় অকস্মাৎ যেন নখ দাঁত বের করে হিংস্র চিতাবাঘের দলের মত নিষ্পলক ক্রূর দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। দিল্লী শহরে বাদশাহী সেরেস্তার সমস্ত লোকের ভোল পালটে গেছে।

এই কারণে শাহজাদা দিল্লী এসে সাজাহানাবাদে লাল কেল্লায় ঢোকেন নি। পুরানো বাবরশাহী কেল্লায় আশ্রয় নিয়ে ওমরাহদের সঙ্গে কথাবার্তা চালাচ্ছিলেন। শাহজাদার পক্ষের লোক যাঁরা তাঁরা গোপনে এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করে আরও দূরে গিয়ে ঘাঁটি

গাড়তে পরামর্শ দিয়েছিলেন। কেউ কেউ বলেছিলেন—আমরা বলব, হিন্দুস্তানেই নয়, হিন্দুস্তানের বাইরে চলে যান। হিন্দুস্তানের বাবুরশাহী বাদশাহীর মধ্যে সমস্ত সুবাদার মনসবদার এখন ঔরংজীবের ঝুটার জন্য লোলুপ হয়ে উঠেছে। কেউ আপনাকে সাহায্য করবে না, আশ্রয় দেবে না। দিলেও, ঔরংজীব হাজারো গোলাম মনসবদারকে শিকারী চিতা কি শিকারী বাজের মত শাহাজাদার দিকে শিসের ইসারা দিয়ে ছেড়ে দেবে। পিছনে পিছনে নিজে ছুটে আসবে।

ইট পাথর বালির ছুনিয়ায় সবুজ ঘাসের কারবার মাত্র আধা হাত মাটির উপর শাহজাদা। ওটুকু খুঁড়ে তছনছ করে দিতে কতক্ষণ? করে দিলে আর রক্ষা থাকে না; রাক্ষসীর তৃষ্ণা ক্ষুধা নিয়ে ছুনিয়া ভয়ংকরী হয়ে ওঠে। আপনার উদারতার কথা, আপনার মানুষকে ভালবাসার কথা, আপনার এলাহী ধর্মের কথা মুসলমানেদের ভালো লাগবার কথা নয়—হিন্দুরও ভালো লাগে নি। সব ঝুট হয়ে গিয়েছে। এ হয় না—এ হবে না। তাই হল না। আপনি চলে যান হিন্দুস্তান থেকে। আপনার যারা গুণমুগ্ধ অনুগত তাদের একদল ভোল পাল্টেছে, একদল পালিয়েছে।

শুধু সাধারণ মানুষেরা নয়, রইস আমীরেরাই নয়, ফকীর দরবেশ হজরতেরাও চলে যাচ্ছেন দূরদূরান্তে।

সাক্ষাৎ পীর পয়গম্বর তুল্য মিয়া মীর সাহেবের শিষ্য আপনার প্রথম গুরু পীর মোল্লাশাহ আজমীর দরগা ছেড়ে চলে গেছেন কাশ্মীরের ছুর্গম অঞ্চলে।

আপনার পরাজয় সংবাদ শুনে আপনার স্নেহময় পিতা অক্ষম বাদশাহ সাজাহান যেমন সজল চোখে বলেছিলেন—"এয় খোদা তেরি রেজা—"। ঠিক তেমনি ভাবেই তিনি বলেছিলেন—হে ঈশ্বর তোমার ইচ্ছা। শাহজাদা—একান্ত অসহায় মানুষের সঙ্গে তাঁর কোন তফাতই নেই।

কাশ্মীরের শাহফানি সেও কোন গর্তের মধ্যে ঢুকেছে। নাজি নাচওয়ালী দিল্লীতে এসে খুন হয়েছে।

হিন্দু সাধু লালবাবা তিনি কোথায় কোন্ পাহাড়ের কাঁদরায় (কন্দরে) কি কোন্ জঙ্গলের কোন্ গাছতলায় গিয়ে আসন গেড়েছেন কেউ জানে না। শোনা যায়, তিনি বলে গেছেন—"মহাভারতের কিষণজী কুরুক্ষেত্র করে পাপীদের ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন। পুণ্যাত্মা মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে রাজ দিয়েছিলেন। কিন্তু দেখো ভাই সেই কিষণজী এক ব্যাধের তীরসে জখম হয়ে জান দিলেন; তাঁর ছত্রিশ কোটি যদু-বংশের বাল বাচ্চা বুঢ়া জোয়ান বিলকুল আপনা-আপনি লড়াইয়ে খতম হয়ে গেল। তাদের বহু বেটীদের লুঠে নিয়ে গেল ছোটা আদমী ছোটা জাতের মানুষেরা। অর্জুন যে অর্জুন সেও কিছু করতে পারলে না। এমন হয় ভাই—এইসা হোতা হ্যায়—কখনও কখনও শয়তানের আরজিও তাকে মনজুর করতে হয়। এ তাই হল। আসল কথা ওয়াক্ত হয় নি। বেহেস্ত আর মিট্টির দুনিয়ার মধ্যে যে পথ গড়তে চেয়েছিল শাহজাদা তা হল না, ভেঙে গেল। এ পথ শাহজাদা বাদশাহ রাজা মহারাজা গড়তে পারে না।

সব শেষে নাকি বলেছিলেন—হায় আমার শাহজাদা!

থাকবার মধ্যে একমাত্র আছেন ফকীর সারমাদ। অনেকে তাঁকে বলেছিল—হজরত চলে যান আপনি দিল্লী থেকে। কিন্তু তিনি যান নি। তিনি এখন আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকেন আর বিড়বিড় করে বকেন। অসংখ্য মানুষ সাধারণ মানুষ তারা ঔরংজীবের ভয় সত্ত্বেও আসে। লোকে বলে তিনি ওই আসনে বসে আপনাদের এই ভাইয়ে ভাইয়ে লড়াইয়ের সব চোখের উপর দেখেছেন। তাঁর পিয়ারের অভয়চান্দ আজ একবছর নিঃশেষিত-তৈল প্রদীপের মত শুধু পলতের মুখের অগ্নিকণার মত মাত্র নামেই বেঁচে আছে।

মধ্যে মধ্যে অপরূপ একখানি গান তাকে ক্ষীণ কণ্ঠে গাইতে শোনা

যায়। "তুমি আমায় চেয়েছিলে—আমায় তুমি ডেকেছিলে। তোমার কাছে আমি এলাম বার বার—এলাম নানান রূপে—তুমি আমায় তবু চিনলে না। আমি বুঝতে পারলাম না তুমি কোন্ রূপে আমাকে চাও। বল তো—তুমিই এবার বল তো। কাবাতে তুমি আমাকে দেখে বললে কালো পাথর; মন্দিরে আমাকে দেখে বললে—এও তো সেই কালো পাথর। আমার রক্তমাংসের গড়া এই দেহ দেখে তাকে বল তুমি অভয়চান্দ। তাকে তুমি কত যত্নই না কর। কত সাজেই না সাজাও। কিন্তু তবু আমাকে খুঁজছ—বলছ 'পেলাম না'—'দেখা দিলে না'। এবার আমার যাবার সময় হয়েছে। যাবার সময় নতুন বহুড়ী যেমন ঘোমটা তুলে শেষবারের জন্য বচপনের মহব্বতির পিয়ারকে দেখা দিয়ে যায় তেমনি করে দেখা দিয়ে যাব।"

সারমাদ শোনেন স্তব্ধ হয়ে। ভাম হয়ে বসে থাকেন। যেন ধ্যানমগ্ন। এরই মধ্যে এক এক সময় চঞ্চল হয়ে উঠে বিড়বিড় করে বকতে শুরু করেন। সামুগড়ের লড়াইয়ের দিন—প্রচণ্ড গ্রীষ্মের উত্তপ্ত অপরাহ্ণবেলা—সারমাদ স্থিরদৃষ্টিতে ধূসর ধূলাচ্ছন্ন দিগন্তের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে চীৎকার করে উঠেছিলেন—খলিলুল্লা খানকে বিশ্বাস করছ শাহজাদা? হায় হায় হায়! হাতীর পিঠ থেকে নেমে পড়ছ? নেমো না। নেমো না। আঃ, এ তুমি কি করলে দারাসিকো! আর একবার রাত্রি দ্বিপ্রহরে চীৎকার করে উঠেছিলেন—রাজ্যের জন্য বাদশাহীর জন্য পলাতক হয়ো না দারাসিকো। এবার শেষ মুহূর্ত এসেছে। তুমি শাহজাদার পোশাক ফেলে দিয়ে ফকিরী পোশাক তুলে নাও।

এর পর মধ্যে মধ্যে এইভাবে চীৎকার করেছেন—হায় জয় সিং, হায় হায়! হায় মহারানা রাজসিংহ, হায় হায়!

কখনও বলেছেন—পালাও শাহজাদা, পালাও!

এ সব খবরের প্রত্যেকটি ঔরংজীব অবশ্যই রাখেন কিন্তু তিনি রাখেন বিশ্বস্ত চর অনুচরদের মুখ থেকে। শাহজাদী রোশনআরা

গুপ্তচরদের মুখ থেকে এ সংবাদ সংগ্রহ করেও কিন্তু তার উপর নির্ভর করেন নি, তিনি সাধারণ গৃহস্থী ঔরতের ছদ্মবেশে ময়লা বোরকা পরে একটা সাধারণ ডুলিতে সওয়ারী হয়ে সেই আগের মত ফকীরের আস্তানায় এসে সব স্বকর্ণে শুনে এবং চোখে দেখে এসেছেন। সে সমস্তই ভাই ঔরংজীবকে জানিয়ে বলেছিলেন—নতুন বাদশাহকে শলাহ দেবার বুদ্ধির গৌরবে নয়, বহেনের উৎকণ্ঠার কথা হিসেবেই বলি—বাদশাহ যখন মসনদ নিরাপদ করছেন তখন সারা শহর দিল্লীর হৃদয়ে সে আপন তক্ত কায়েম করে নিচ্ছে। আমি চোখে দেখে এসেছি।

ঔরংজীব বলেছিলেন—আপনার চোখের দৃষ্টি নির্ভুল। কিন্তু দৃষ্টির অতীত একটা জাহান অর্থাৎ জগৎ আছে দিদিজীউ। সেই জাহানেই খোদার মর্জির খেলা চলে। তারই তু একটা খবর আপনার বলি শুনুন। খুদার উপর আমার বিশ্বাসে খাদ নেই, কোরানের ব্যাখ্যা আমার নির্ভুল—পয়গম্বর রসুলের খাদিম আমি—মুসলমানের অন্তর আমি বুঝি। আবার দিল্লী শহরের বাসিন্দাদের হৃদয়ও আমি জানি। বড় নরম মাটি দিদিজী—ওখানে কেউ শক্ত আসন পেতে বসতে পারে না। যতক্ষণ দারাসিকোর বিচার না হয় ততক্ষণ তার পীরদের বিচার হয় না। হলে তাতেই বিপদ আছে। দারাসিকো সেই নিয়ে তাদের কাঁচা মাটির উপর আগুন জেলে তাকে শক্ত করে নিতে পারবে। ওরা ক্ষেপে উঠবার জন্যে চেষ্টা করে চায় ক্ষেপে উঠতে—তখন যদি কেউ শক্ত আদমী এসে দাঁড়িয়ে সেই ক্ষ্যাপামির আগুনে হাওয়া দিতে পারে, ছড়িয়ে দিতে পারে তবেই তাতে কাজ হয়। খুদা মানুষকে কাঁচা অবস্থায় দিয়েছিলেন কলেজা দিল আর শক্ত অবস্থায় দিয়েছেন মগজ। ধর্মের বিচার হৃদয় দিয়ে করলে কাঁচা বিচার হয়। মগজ দিয়ে বিচারই শ্রেষ্ঠ বিচার। বহেনজীকে আমি অপেক্ষা করতে বলব—আমি মগজ খাটিয়ে বিচার করি। শাহজাদা দারাসিকোর পরিণাম যাই

হোক আমার সঙ্গে লড়াইয়ে, তার জন্য ফকীর সারমাদ ফরিয়াদ করবে খোদার কাছে। দিল্লীর মানুষদের কাছে কোন নালিশ রাখবে না। তাদের বলবে না—এর বিচার করো। শাহজাদা দারাসিকোর আগে সারমাদের কিছু ঘটলে কাফের দারা সারা হিন্দুস্তানে সোর তুলবে।

* *

বাদশাহের অনুমান নির্ভুল।

শাহজাদা দারাসিকোকে বন্দীদশায় শিকলে বেঁধে হাতিতে চড়িয়ে দিল্লী ঘোরানো হল, লোকে হায় হায় করলে; তারপর শাহজাদা দারাসিকোকে যে ধরিয়ে দিয়েছিল—পাঠান সর্দার জিওহন আলি খাঁ—তার উপর ক্ষিপ্ত হয়ে চড়াও হল—কিন্তু বাদশাহী সিপাহীর দল আসবামাত্র তারা দিল্লীর অলিতেগলিতে অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপর শাহজাদার প্রাণদণ্ড হল; মুণ্ডহীন দেহটাকে আবার হাতির পিঠে চড়িয়ে সারা শহরের বড় বড় পথ ধরে ঘোরানো হল বাদশাহী ফৌজের পাহারার অধীনে। বুক চাপড়ে মোহরমের দিনে হাসান হোসেনের জন্য যেমন কেঁদেছিল সেকালের মুসলমানেরা লোকে এবার ঠিক তেমনি করে প্রায় ততখানিই কেঁদেছিল, কিন্তু নীরবে নিঃশব্দে,—অনেক বাড়িতে সেদিন রান্না চড়ে নি—মানুষ উপবাস করে থেকেছে এটা সত্য কিন্তু সে সত্য শুধু সত্যই, তার বেশী কিছু নয়। বাদশাহের বলখ বাদাকশানী এবং ইরানী সিপাহীরা দীর্ঘ ও শাণিত ঝকঝকে বর্শা বল্লম নিয়ে হাতিটাকে ঘিরে নতুন বাদশাহের জয়ধ্বনি দিয়ে ধীর কদমে দিল্লী শহর ঘুরে বাদশা হুমায়ুনের সমাধিস্থলে নিয়ে গেছে দারাসিকোর দেহ, তাতে কোথাও কোন বাদ-প্রতিবাদের দুর্ঘটনা ঘটে নি। ফকীর সারমাদ সেদিন ওই আকাশের দিকে তাকিয়ে যেন শাহজাদা দারাসিকোর পরলোকগামী আত্মার সঙ্গে কথা কয়েছেন।

শাহজাদী রৌশনআরা নিজের চোখে দেখে এসেছেন এবং নিজের

কানে শুনে এসেছেন। ফকীর সারমাদ নিজে প্রশ্ন করেছেন ওই সর্বলোকচক্ষুর অন্তরালে অবস্থিত উর্ধ্বলোকগামী আত্মাকে—বল এ যা দেখছি এ কি সত্য? নিঃসীম শূন্যতার নাস্তির মধ্যে তোমার অস্তিত্ব এ কি সত্য? কিন্তু রৌশনআরার কোন সংশয় নেই এতে। তিনি বিশ্বাস করেছেন।

আর যদি অসত্যই হয় নতুন বাদশাহ, তা হলেও এর প্রতিকার এই মুহূর্তে প্রয়োজন। সত্য এবং অসত্য দুইকে একসঙ্গে প্রশ্রয় দেওয়া যায় না। হে ইসলামের রক্ষক জিন্দাপীর, মুসলমান হয়ে যে আদমী ইসলামকে বিকৃত করে—কাফেরীকে কাফেরকে নিজের সমকক্ষভাবে ইসলামের সমান মর্যাদা দেয় তাকে কি তুমি ক্ষমা করতে পার?

দুনিয়াতে খুদা তোমাকে হিন্দুস্তানের বাদশাহের ঘরে পয়দা করেছেন—সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে ইসলামের পবিত্রতা এবং মর্যাদার জিম্মাদারিতে নিযুক্ত করেছেন। ওই জিম্মাদারির জন্যে তোমাকে হিন্দুস্তানের মসনদের খেলাত, খেলাত বলো খেলাত, ইমান বলো ইমান, তোমাকে দিয়েছেন। সে তুমি পালন করো।

বাদশাহ ঔরংজীব লালকিল্লার ভিতর দ্বিপ্রহর রাত্রে মালা জপ করছিলেন তসবীখানায়। তাঁর সামনে রাখা ছিল সেই সোনার থালাখানা যে-থালার উপর রেখে দারাসিকোর ছিন্ন মুণ্ড আনা হয়েছিল তাঁর সামনে। এখন অবশ্য থালাখানার উপর মুণ্ডটা নাই কিন্তু সে রক্তের দাগ এখনও আছে। বাদশাহ ঔরংজীব সেখানা তাঁর সামনে রেখে মালা জপ করছেন। কারণ তাঁর যেন মধ্যে মধ্যে মনে হচ্ছে থালার উপর দারাসিকোর ছিন্ন মুণ্ডটা এখনও রয়েছে এবং তার ঠোঁট যেন নড়ছে।

মনে হয়েছে সে মুণ্ড বলছে—আমার পরম সমাদর স্নেহের ছোটভাই—হিন্দুস্তানের নতুন শাহানশাহ বাদশাহ, সকল নবাব

সুলতান রাজা মহারাজার অধীশ্বর তোমাকে জানাই যে হিন্দুস্তানের বাদশাহীর মোহ আর আমার নাই। তোমার এবং তোমার সন্তানদের কল্যাণ কামনা করি—তোমাদের সৌভাগ্য উথলিত হয়ে উঠুক। এই প্রার্থনা করবার জন্য আমাকে বেঁচে থাকতে দাও। শুধু একটি কুটীর আমাকে দিয়ো আর একটি দাসী আমাকে দিয়ো আর দিয়ো রুটি কয়েক টুকরো। আমি প্রার্থনা করব—বাদশাহ আলমগীর গাজী জিন্দাবাদ।

তিনি জপ করতে করতেই বলে উঠেছেন—হয় না হয় না—তা হয় না।—তুমি সারাজীবন পরস্বাপহারীর মত আমাদের সকল প্রাপ্য অপহরণ করেছ—তারপর সারাজীবন তুমি মুসলমানের বিরোধিতা করেছ। খুদার হুকুমত কাজীর বিচার কোরান হদিশের নির্দেশ—তোমার ক্ষমা নাই তোমার ক্ষমা নাই।

তবু নির্লজ্জের মত দারার ছিন্ন মুণ্ডের ঠোঁট যেন আবার নড়ে উঠেছে। আবারও কিছু বলতে চেয়েছে। বাদশাহ ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলেছেন—আহ্ বদবক্ত যতদিন তুমি বেঁচেছিলে ততদিন ইসলামবিরোধী কাফের দারাসিকো আমি তোমার মুখের দিকে কখনও তাকাই নি। খুদার হুকুমত কোরান হদিশের নির্দেশ অনুযায়ী গর্দান দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করার পরও তোমার মুখের দিকে আমি তাকাতে পারব না—চাই না তাকাতে। হঠাও—থারিয়া হঠাও।

নিজের তলোয়ারের আগা দিয়ে মুণ্ডটাকে আঘাত করে ঠেলে দিতে গিয়ে চমকে উঠেছিলেন, কোথায় মুণ্ড ?। কোথায় গেল !

এই দৃষ্টিবিভ্রম থেকে মুক্তি পাবার জন্যই রক্তের দাগ সমেত থালাখানা সামনে রেখে তিনি সূক্ষ্ম বিচারকারী, অভয়ের আধার, খুদার নাম জপ করছিলেন। এই সময়ে এসে রোশনআরা তাঁর সামনে দাঁড়ালেন। তিনি যেন প্রজ্বলিতা হয়ে উঠেছেন। তাঁর পিঙ্গল রঙে যেন লালচে একটা আভা যুক্ত হয়েছে। চোখদুটিও তাঁর পিঙ্গল। সে চোখদুটি যেন জ্বলছে। এসে দাঁড়িয়ে বললেন—বাদশাহ;

তোমার নাম জয়যুক্ত হোক। তোমার বাদশাহীতে ইসলাম কলঙ্ক এবং গ্লানিমুক্ত হোক।

ঔরংজীব তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—দিদিজীউ?

রৌশনআরা বললেন—তৈমুর বংশের কন্যা আমি—ঔরংজীবের বড়িবহেন এ ঠিক কথা, কিন্তু আমি এসেছি ফরিয়াদ নিয়ে। নালিশ আছে আমার। খুদাতায়লা যে মুল্ক তাঁর নিষ্ঠাবান সেবক বাদশাহ আলমার গাজীকে দিয়েছেন ইসলামকে জয়যুক্ত করতে, সেই মুল্কে এক নাঙ্গা ফকীর কোরান হদিশ অমান্য করে নাঙ্গা হয়ে চলাফেরা করবে আর বলবে—"কাবার মসজেদে তোমাকে খুঁজতে গিয়ে মানুষ দেখতে পাবে তুমি যে কালো পাথর—হিন্দুর মন্দিরে কাফেরের দেবতাকে ফেলে দিতে গিয়েও দেখতে পাবে সেও সেই কালো পাথর।" হায় বাদশাহ, এই কামার্ত ব্যক্তি তার এক পিয়ারের পাত্রকে বলে—"খুদা-ই-মান অভয়চান্দস্তয়া দিগর"! বাদশাহ! এই হিন্দুস্তানে খুদা কি এই কারণেই তোমাকে বাদশাহ করেছেন? এখানে শুনতে হবে এক ভণ্ড নাঙ্গা ফকীর বলছে—আমার খুদা অভয়চান্দ না অন্য কেউ আছে তা আমি জানি না?

বাদশাহ ঔরংজীব তাঁর দৃষ্টিবিভ্রম থেকে রেহাই পেলেন। তাঁর সামনের থালাখানার উপর থেকে দারাসিকোর ছিন্ন মুণ্ডের ছায়া বা ছবি মুছে গেল। তিনি একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন তারপর বললেন—ঠিক বলেছ দিদিজীউ। খুদার বান্দা পয়গম্বরের খাদিম হিসেবে আমার গাফিলতি হয়ে গেছে। ভণ্ড ফকীর সারমাদ—দারাসিকোর পীর তার মন্ত্রণাদাতা—তার নতুন দুনিয়ার এক পয়গম্বর আজও বেঁচে রয়েছে। শুনেছি অন্য সকলে পালিয়েছে কিন্তু এই সারমাদ পালায় নি। সে নাকি দারাসিকোর আত্মার সঙ্গে আকাশের দিকে তাকিয়ে কথা বলছে।

রৌশনআরা বললেন—লোকে কানাকানি করছে এই ফকীর একদিন কবর থেকে হয়তো দারাসিকোকে বাঁচিয়ে তুলবেন—

—সে হয় না। কিন্তু তা না হোক, তাকে ভয় আমি করি না কিন্তু তার যে ইসলাম-ভ্রষ্টতা, তার যে গুনাহ তার বিচার অবশ্যই করতে হবে। করাতে হবে। তামাম হিন্দুস্তানকে আমি দেখাতে চাই যে ইসলামের সম্ভ্রম ক্ষুণ্ণ করলে সহোদর হলেও তার নিষ্কৃতি নাই। ফকীর সাজলেও তার রেহাই নাই—তাদের প্রতি সহানুভূতি যারা দেখায় তারা পিতা ভগ্নী হলেও তারা ক্ষমা পায় না। আমার জপ শেষ করেই আমি সারমাদকে গিরিফতারনামা জারি করব। তুমি মেহেরবানি করে একটু বস। তুমি থাকলে ওই থালার মধ্যে যে জাদু আছে সে জাদু আমাকে বিচলিত করতে পারবে না।

* * *

সেই বিচার শেষ হয়েছে।

শ্রেষ্ঠ উলেমাদের নিয়ে কাজী সারমাদের বিচার শেষ করেছেন। বিচারে ইসলামের অবমাননাকারী এবং পৃথিবীর অনিষ্টকারী হিসাবে সারমাদের প্রাণদণ্ড হয়েছে। তাঁকে বন্দী করে কাজী এবং উলেমাদের সামনে উপস্থিত করা হয়েছিল—নাঙ্গা দীর্ঘকায় মানুষ—পিঙ্গল দেহবর্ণ—চোখে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি—হাতে শিকল দিয়ে বাঁধা ফকীর সারমাদকে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল কোতোয়াল। কাজী তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন—তুমি নাঙ্গা থাক কেন?

ফকীর সারমাদ মুহূর্তে উত্তর দিয়েছিলেন—যিনি তোমাদের পোশাক দিয়েছেন পরিয়েছেন—পরবার মত মন মেজাজ দিয়েছেন তিনিই আমাকে নাঙ্গা রেখেছেন—পোশাক আমাকে দেন নি—পোশাক পরবার মেজাজ মন আমাকে দেন নি—কারণ তোমাদের অনেক কলুষ আছে গ্লানি আছে গলতি আছে—আমার তা নেই।

—তিনি কে? কাফেরের ঈশ্বর? না ওই অভয়চান্দ?

—না। তিনি কে তা জানি না। মুসলমান যাকে বলে আল্লা কেরেস্তান বলে গড হিন্দু বলে ঈশ্বর এদের কাউকে আমি জানি না,

চিনি না। কাবার মসজিদে হিন্দুর মন্দিরে যা আছে সে কালো পাথর। এর অতিরিক্ত ঈশ্বরের কোন খবর আমি আজও জানি না। সারা জীবন জানবার চেষ্টা করেও জানলাম না। তবে আমার ভিতরে থেকে কেউ বলেছিল—সারমাদ নিজেকে গ্লানিহীন করেছ যখন সকল পোশাক পরিত্যাগ কর। তোমার তো প্রয়োজন নেই। অভয়চান্দ শুনে বলেছিল—পীর, এই তো আসল সত্য। আমি তা মেনে আমার শরীরের সমস্ত আবরণ ত্যাগ করেছি। নাঙ্গা থাকতে আমার কোন লজ্জা বোধ হয় না। কোন সংকোচ আসে না—আমি এসেছি নাঙ্গা হয়ে, যাব নাঙ্গা হয়ে, তাই থাকিও নাঙ্গা হয়ে।

—তুমি কি পাগল?

—কেউ কেউ বলে আমি পাগল, কেউ বলে আমি পাপী, কেউ বলে লুচ্চা, কেউ বলে আমি মহাজ্ঞানী।

—শাহজাদা দারাসিকো তোমাকে কি বলত?

—পীর বলতেন।

—শাহজাদা দারাসিকোকে তুমি বলেছিলে হিন্দুর ঈশ্বর আর মুসলমানের আল্লার মধ্যে কোন ফরক নেই? দুইয়েই এক? একই দুই?

—আমি তাদের দুইকেই দেখি নি। দুইকেই খুঁজছি। একদিন পাব। দারাসিকোকেও তাই বলেছিলাম। আমি যা পড়েছিলাম, যে জ্ঞান অর্জন করেছিলাম তা ভুলে গিয়েছি। অন্তহীন নাস্তিবাদের মধ্যে একবিন্দু অস্তি আমার অভয়চান্দ—ওই বিন্দুটুকুতে প্রেম আর স্নেহ নিয়ে ভাসছি। তবে অভয়চান্দ হিন্দু, আমি মুসলমান—আমাদের দুজনের দুজন নইলে চলে না, চলবে না। অনন্ত দুঃখের অন্ধকারে জীবন ডুবে যাবে! অন্ধকার চাই না, চাই আলো—আলোভরা দুনিয়া। সে আলো জ্বলবে আমার আর অভয়চান্দের মহব্বতির মধ্যে। তাজ্জবের বাত অভয়চান্দকে ভালবেসে জানলাম হিন্দুই বা কে, মুসলমানই বা কে, কেরেস্তানই বা কে—সবই মানুষ। এক

মানুষ। সব যদি এক মানুষ হয় তবে সব মানুষের ভগবান আল্লার এক, গডও এক। ওই কাবার পাথর আর মন্দিরে কাফেরদের দেবতার পাথর যেমন এক, কালো পাথর ঠিক তাই। আমি এ তথ্য অভয়চান্দকে ভালবেসে শিখেছি আর শাহজাদা দারাসিকো এই জ্ঞান নিয়ে জন্মেছিলেন। তাই সব শাস্ত্র পড়ে নিয়ে এক মহব্বতির ছুনিয়া গড়তে চেয়েছিলেন। তিনি বলতেন তিনি জ্যোতি দর্শন করেছেন, বলতেন ফারিস্তা এসে তাকে দেখা দিয়ে গেছেন; তাঁর কথা তিনি জানতেন—আমি তাঁকে ভালবেসেছিলাম—তাঁকে ধরে আমি নাস্তিবাদ থেকে অস্তিবাদে আসতে চেয়েছিলাম। শাহজাদা নেই। মধ্যে মধ্যে মনে হয় তাঁকে দেখি। কিছুক্ষণ পরেই মনে হয় সবই মনের ভ্রম। আসল সত্য তার মধ্যে এক বিন্দু নেই। সারা জিন্দগী যা করলাম তা সত্য কিনা এ প্রশ্নের উত্তর পেলাম না।

এবার কাজীসাহেব উলেমাদের সঙ্গে পরামর্শ করে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—ফকীর সারমাদ—

সারমাদ তাঁর মুখের দিকে তাকালেন।

—তুমি ভণ্ড ফকীর। এ ভণ্ডামি তুমি ইচ্ছাপূর্বক করেছ।

—না। সারমাদের মুখে আশ্চর্য হাসি ফুটে উঠল।

—তুমি ইসলামের অপমান করেছ।

—না। সেই হাসিমুখে বললেন সারমাদ।

—করেছ। ইসলামের সঙ্গে ছুনিয়ার অন্য ধর্মকে তুমি সমান বলে ঘোষণা করেছ। এমনই এক ছুনিয়া এক জিন্দগী কায়েম করতে চেয়েছিল কাফের দারাসিকো। তুমি তাকে সমর্থন করেছিলে।

—করেছিলাম।

—তুমি কি তার জন্য অনুতপ্ত?

—না। আমি যতদিন বাঁচব তাই মনে করব এবং তাই বলব।

—সে অপরাধ অমার্জনীয় অপরাধ। খুদা তার জন্য তোমার উপর নারাজ হয়েছেন ক্রুদ্ধ হয়েছেন।

সারমাদ বললেন—ন্যায়বান তত্ত্বদর্শী ঈশ্বর-জানিত কাজী। তাঁর সেই ক্রুদ্ধ মুখ যদি আমি দেখতে পেতাম তাহলে নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করতাম। নাস্তি থেকে আমি অস্তিতে এসে পঁহুছ যেতাম।

বাধা দিয়ে কাজী বললেন—আল্লা মেহেরবান রাহমানে রহিমে—তিনি দাতা তিনি দয়ালু—তিনি শাস্তিদাতাও বটেন আবার রক্ষকও বটেন। তাঁর অনুগ্রহে অনুগৃহীত বাদশাহ আলমগীরের বাদশাহীতে হিন্দুস্তানে এতটুকু গুনাহ করেও কেউ পরিত্রাণ পাবে না। সেই কারণেই শাহজাদা দারাসিকো দণ্ডিত হয়েছে। সেই কারণে তোমাকেও আমি দণ্ড দিচ্ছি। তবে তুমি যদি এখনও এই নাঙ্গা থাকা গুনাহ বলে স্বীকার করে নিজের নগ্নতাকে আবরিত কর তাহলে আল্লার মেহেরবানিকে স্মরণ করে আমরা তোমাকে অব্যাহতি দেব। ফকীর সারমাদ।

সারমাদ তাকিয়ে রইলেন কাজীর দিকে।

মুখে তাঁর আশ্চর্য স্থিরতা। নিষ্পলক চোখে সে এক আশ্চর্য দৃষ্টি।

—ফকীর সারমাদ!

সারমাদ উত্তর দিলেন এবার—'না'।

—না?

—না।

—তাহলে তোমার উপর কোরান হদিশের কানুন অনুযায়ী প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলাম। জহ্লাদ!

সামনে এগিয়ে এল সেই সুলেমন। থাট্টার সেই দুর্দান্ত মাল্লা। হাতে তার একখানা বাংলাদেশের দাও। রামদাও।

আভূমি নত হয়ে সে কুর্নিশ করে দাঁড়াল। তৃপ্তির হাসিতে তার মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

কাজী বললেন—বধ্যভূমে নিয়ে যাও। অবিশ্বাসী ভণ্ড ফকীরের মুণ্ড এনে আমাকে দেখাবে।

* * *

হাজারে হাজারে মানুষ এসে জমায়েত হয়েছিল। হরেক রকম মানুষ। ধার্মিক অধার্মিক আস্তিক নাস্তিক হিন্দু মুসলমান পণ্ডিত মূর্খ বোবা প্রগল্‌ভ—সুফী শিয়া সুন্নী সন্ন্যাসী ফকীর ভিক্ষুক গৃহস্থ হাজারে হাজারে এসেছিল বিস্ফারিত দৃষ্টি নিয়ে, বুকের মধ্যে নানান প্রশ্ন নিয়ে, সবিস্ময় কৌতূহল নিয়ে।

বধ্যভূমির চারিধারে তারা প্রায় চাপ বেঁধে জমায়েত হয়ে দাঁড়িয়েছিল যেন দেওয়ালের মত। এত বড় জনতা কিন্তু কোন প্রগল্‌ভতা বা কণ্ঠস্বরের গুঞ্জনধ্বনি ছিল না। সকলে স্তব্ধ হয়ে প্রতীক্ষা করে দাঁড়িয়ে আছে। একটা উদ্বেগকর নিস্তব্ধতা মানুষের বুকে যেন চেপে বসেছে।

তাদের সামনে বধ্যভূমিটিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে বাদশাহের সর্বশ্রেষ্ঠ তুর্কী সিপাহীর সারি। অশ্বারোহী এবং পদাতিক সারিবন্দী হয়ে ঘিরে রয়েছে। একজন পয়দল সিপাহীর পরই একজন সওয়ার দাঁড়িয়ে আছে। পয়দল সিপাহীর হাতে সুদীর্ঘ বর্শা—তার শাণিত ফলক সূর্যালোকে ঝকমক করছে। সওয়ার সিপাহীর হাতে খোলা তলোয়ার। যেন কোন একটা আশঙ্কা অদৃশ্য লোকে আকাশসঞ্চারি বাজের মত প্রতীক্ষা করে আছে—যে কোন মুহূর্তে ঝলকে উঠবে।

কিছু দিন আগে শাহজাদা দারাসিকোর কবন্ধ হাতীর পিঠে চাপিয়ে যখন শহর ঘোরানো হয়েছিল তখন আশঙ্কা হয়েছিল যে হয়তো বা মানুষ ক্ষেপে উঠবে। তখন এমনই আয়োজন হয়েছিল। ফকীর সারমাদের জন্য ঠিক তেমনি আশঙ্কা তেমনি সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে।

শহরে যে গুজবের অন্ত নেই। নানান জনে নানান কথা

বলছে। বলছে একটা অঘটন ঘটবে। সে অঘটন আশ্চর্য। মানুষ নাকি তা কল্পনাও করতে পারে না।

কেউ বলে—জহ্লাদের খড়্গ উদ্যত হবামাত্র প্রচণ্ড ভূমিকম্প হবে। জহ্লাদ মাটির ফাটলের মধ্যে সেঁধিয়ে যাবে।

কেউ বলে—না না না—সকলে চাপা পড়বে ভূমিকম্পে, শুধু সারমাদ দাঁড়িয়ে থাকবে।

কেউ বলে—না। ঠিক সেই মুহূর্তে আকাশ থেকে দুটি হুরী এসে সারমাদকে উঠিয়ে নিয়ে চলে যাবে।

কেউ বলে—না—না—না। এ সব না। সারমাদ ঘাড় পাতবেন, খাঁড়া পড়বে কিন্তু তাতে সারমাদের মুণ্ড ছিন্ন হবে না। খাঁড়া ভেঙে যাবে। বর্শা দিয়ে খোঁচালে তাও ভেঙে যাবে। সারমাদ দাঁড়িয়ে হা-হা-হা-হা শব্দে অট্টহাসি হাসবেন—সেই হাসির সঙ্গে আকাশে ঝড় উঠবে।

শিয়া হোক সুন্নী হোক সুফী হোক হিন্দু হোক মুসলমান হোক এই ধরনের আশঙ্কা সকলেরই আছে। কেউ বলে—খুদার পরম ভক্ত সারমাদ। তিনি ভক্তের লাঞ্ছনা সহ্য করবেন না। কেউ বলে —ভণ্ড পাপী গুনাহের আসামী সারমাদ কোনদিন আল্লার উপাসনা করে নি—সে করেছে শয়তানের উপাসনা। শয়তানের অনেক জাদু, সেই জাদু নিশ্চয় অঘটন ঘটাতে পারে। তার জন্য জপের মালা হাতে উলেমারা এই ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন এবং শয়তানের জাদু যাতে নিষ্ফল হয় তার জন্য খুদার নাম জপ করছেন। মনে মনে কলেমা পড়ে যাচ্ছেন।

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ তখন। নাস্তিক্যবাদ সকল কালেই আছে কিন্তু সেকালের নাস্তিক্যবাদের ভিত্তি যে দুর্বল ছিল তাতে সন্দেহ নেই। শয়তান এবং ঈশ্বর দুইকেই মানুষ ভয় করত। শয়তান সম্পর্কে ভয় ছিল বেশী। ঈশ্বরে বিশুদ্ধ আস্থার দৃঢ়তা ছিল দুর্লভ কিন্তু যেখানে সে আস্থা ছিল সেখানে সে ছিল অবিনশ্বর। সেই

আস্থার দৃঢ় দণ্ডটিকে ধরে মানুষ শয়তানের সঙ্গে যুদ্ধ করত। হিন্দু মুসলমান শিয়া সুন্নী কেউই এর আওতার বাইরে যেতে পারতেন না। বোধ করি তার বাইরে মানুষের জন্য কোন ভূমিতল তখনও রচিত হয় নি।

সারমাদ নিজে? নিজেও কি তিনি এর বাইরের মানুষ?

না। তিনি শূন্যলোকের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে মনে মনে কল্পনায় অনুমান করতে চেষ্টা করছিলেন সেই অসীম বা একটি বিন্দুরও অস্তিত্বহীন শূন্যতা বা নাস্তিত্ব যেখানে অবস্থান নাই আমি নাই নিঃশ্বাসের বায়ু নাই স্পর্শের উত্তাপ বা শৈত্য নাই বা ঝিল্লীর ধ্বনিহীন যে স্তব্ধতার অস্তিত্ব তাও নাই বা কোন বধের আভাস নাই, যেখানে শুধু নাই নাই নাই আর নাই—যেখানে এই কথা কয়টিও নাই এবং আমি অনুভবও করি না যে এই কথাও নাই এবং আমিও নাই, এমনই যে নাস্তিত্ব তাকে অনুমান অনুভব করতে চেষ্টা করছিলেন। বুকের স্পন্দনের মধ্যে একটি আশ্চর্য ক্রন্দন যেন ধ্বনিত হচ্ছিল। সে এক আশ্চর্য হাহাকার।

না—মৃত্যুভয়ে নয়, জীবন যাবে, তাঁর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে এজন্য নয়। এ হাহাকার অন্য কিছুর জন্য। আর কারুর জন্য।

জীবনের একমাত্র প্রশ্নের একমাত্র উত্তরের জন্য।

নিরুত্তরতার মধ্যে সে প্রশ্নের উত্তর নাই নাই নাই। সব ঝুট হ্যায়—বিলকুল সব কুছ ঝুটা হ্যায়।

আলো নিভিয়ে দাও। আলো নিভিয়ে দাও। অন্ধকারকে ডুবিয়ে দাও—আলো অন্ধকার দুই যেখানে হারিয়ে যায় সেইখানে হারিয়ে দাও।

সমস্ত জনতা সমস্ত সশস্ত্র সিপাহী সান্ত্রী আশ্চর্য কৌতূহলের সঙ্গে তাকিয়ে আছে সারমাদের মুখের দিকে।

আপাদমস্তক অনাবৃত উলঙ্গ স্বর্ণাভ গাত্রবর্ণ পিঙ্গল কেশ পিঙ্গল চক্ষু এই বিচিত্র ফকীর যে একটুকরা কটিবস্ত্র উপেক্ষা করার

জন্য প্রাণ দিতে চলেছে—চোখে একবিন্দু জল নেই শঙ্কা নেই কিন্তু আছে এক আশ্চর্য দৃষ্টি। সে দৃষ্টি আকাশের নীলকে ভেদ করে চলে গিয়েছে। ওই দৃষ্টি দেখে সমস্ত জনতা যেন সম্মোহিত।

জহ্লাদ সুলেমন গিয়ে দাঁড়াল তার খাঁড়া নিয়ে; দাঁড়াল বধ্যমঞ্চের এক পাশে—বধ করবার জন্য যে প্রকাণ্ড পাথরখানি বসানো আছে সেই পাথরের এক দিকে। অপরাধীকে এনে এই পাথরখানার উপর হাতে পায়ে বেঁধে ফেলে দেওয়া হয় হিন্দুদের বলির পশুর মত। হতভাগ্য দণ্ডিত জন উপুড় হয়ে মুখ গুঁজে পড়ে থাকে; কেউ আর্তচীৎকারে কেঁদে ওঠে, কেউ চেতনা হারায়, কেউ নিঃশব্দে অশ্রুবিসর্জন করে। জহ্লাদ দুই হাতে তার খড়্গা মাথার উপর তুলে প্রাণপণ বল প্রয়োগ করে ঘাড়ের উপর আঘাত করে। মুণ্ডটা বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিটকে পড়ে; ফিনকি দিয়ে রক্ত ছোটে। কবন্ধটা পাথর থেকে পিছলে মাটির উপর পড়ে অবরুদ্ধ আক্ষেপ নিঃশেষ করে হাত পা ছোঁড়ে।

দর্শকেরা সভয়ে চোখ বোজে।

কতজন মূৰ্ছিত হয়ে পড়ে। কাতর আর্তনাদের একটা রোল ওঠে।—এয় খোদা! হে ভগবান! মেহেরবান করুণাময়!

সকলে সেই মুহূর্তের জন্য শ্বাস রুদ্ধ করলে। বধ্যভূমে প্রহরী-বেষ্টিত সারমাদ প্রবেশ করলেন। এখনও চোখে সেই বিচিত্র সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি ওই নীল আকাশলোকে নিবদ্ধ।

হঠাৎ জহ্লাদ তাঁকে ডেকে বললে—ফকীর, চিনতে পারো আমাকে? আমি সেই সোলেমন—ধাট্টায়—

সারমাদ প্রসন্ন হাসি মুখে তার দিকে তাকালেন।

জহ্লাদ তার খড়্গাখানা তুলে নিজের বুকের কাছে ধরলে। তার শাণিত দীপ্তির ছটা সোলেমন যেন ইচ্ছে করেই ফেললে সারমাদের চোখের উপর। সারমাদের স্বর্ণাভ গায়ের মুখের রঙ তাতে ঝলক দিয়ে উঠল। সোলেমনের ক্রূরতায় কোতোয়াল পর্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে

উঠলেন—কিন্তু তার এক আশ্চর্য প্রতিক্রিয়া ঘটল সারমাদের মধ্যে। ফকীর সারমাদ চীৎকার করে উঠলেন উল্লাস উচ্ছল কণ্ঠস্বরে—পেয়েছি, আমি পেয়েছি। এই তো তুমি। হ্যাঁ, এই তো তুমি। হে ঈশ্বর, এয় খোদা, এয় মেহেরবান। এই তো এই তো এই তো এই তো তুমি।

সারা জনতা চমকে উঠল।

ঈশ্বর আল্লা। কোথায়। কি বলছে উন্মাদ ফকীর।

সারমাদ বললেন, বললেন ঠিক নয় ঝরনা-ধারা-ঝরার মত সুরের সঙ্গে ধ্বনিকে মিশিয়ে তাঁর অভ্যাসমত গান গেয়ে উঠলেন—

সারাটা জীবন তোমাকে খুঁজেছি বনে কান্তারে অহর্নিশ—তুমি আছ কি নেই, নেই কি আছ কোন হদিস পাই নি। অথচ কারুর পায়ের ধ্বনি যেন বেজেছে আমাকে ঘিরে আমার আশেপাশে—পেয়েছি স্পর্শ হৃদয়ে মনে, দিয়েছে কেউ তার নিশ্বাসে নিশ্বাসে।

আজকে তুমি দেখা দিলে উদ্যত খড়্গের ছদ্মবেশে। আশ্চর্য। এতকালের মধ্যে একটি বারের জন্যও আমি তোমার এই অহরহ আমার আশেপাশে ঘোরার অস্তিত্ব বুঝতেই পারি নি। আজ তোমার সঙ্গে আমার মিলন ক্ষণে যেমনই তুমি ওই খড়্গারূপ ধরে সামনে দাঁড়ালে অমনি তোমাকে আমি চিনতে পারলাম। দেখলাম তোমাকে দুচোখ ভরে। এবার পাব তোমাকে আমি আমার হৃদয়

সারা জনতা—সে স্বপক্ষীয় বিপক্ষীয় সিপাহী সান্ত্রী সকলে স্তম্ভিত হয়ে গেল। কি বলছে এই উন্মাদ।

অথচ ওই উন্মাদ যে কিছু বা কাউকে দেখছে তাতে এতটুকু অবিশ্বাস, মাত্র একটি লোক ছাড়া কারুর মনে উদিত হল না। সে ওই জহ্লাদ সুলেমন।

সে তার খড়্গা উদ্যত করে বললে—ফকীর সারমাদ, সকলকে

তুমি তোমার জাদুতে ভোলাতে পারবে, শুধু আমাকে তুমি পারবে না।

উলঙ্গ ফকীর সারমাদ সান্ত্রীর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সবল দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে এসে মাথা রাখবার পাথরখানার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন—স্থলেমন, তুমি জন্ম-জন্মান্তর আমার পিছনে আছ, শাহজাদা দারার পিছনে আছ। বার বার আমাকে তুমি হত্যা করেছ। তবু তুমি আমার পরম মিত্র। বার বারই এইভাবে তোমার উদ্যত খড়্গের মধ্য থেকে বেরিয়ে এসে সামনে দাঁড়িয়েছ আমার পরম কামনার ধন পরম তপস্যার দেবতা। গত জন্মে তোমার গুপ্তছুরিকায় আমার মৃত্যু হয়েছিল। সেবার কামনার ধন এসেছিল বোরকা পরে নারীর বেশে। এবার এসেছে সে যোদ্ধার বেশে। জাদু নয়। এ পরম সত্য। নাও, তোমার কাজ তুমি শেষ কর।

বলে ফকীর সারমাদ নিজের দেহখানা বেঁকিয়ে মাথা এবং ঘাড় পেতে দিলেন বধ্যমঞ্চের উপর রক্ষিত সেই বহু রক্তে অভিষিক্ত কালো পাথরখানার উপর।

লোকে চোখ বন্ধ করলে।

সোলেমনের খড়্গ তার দুই হাতের আস্ফালনে রৌদ্রদীপ্ত শূন্যমণ্ডলে একবার ঝলকে উঠল।

* * *

দিল্লীর এক প্রান্তে একটি নির্জন স্থানে একটি গাছের তলায় একটি সুকুমার তনু দেহ পড়েছিল।

দেহটি অভয়চান্দের। তখনও তার ঠোঁট দুটি নড়ছিল।

অস্ফুট কণ্ঠে বলছিল—ফকীর, তোমার ডাকে আমার ঘুম ভেঙেছিল। হায়, কেন ঘুম ভাঙালে? এ তো দেখি হিংসা আর বিদ্বেষে মানুষ গর্জন করছে জানোয়ারের মত। আমি চোখ বুজলাম ফকীর—তুমিও চোখ বোজো—তবে আসবে সময়। আসবে। সে দিন আসবে। নিশ্চয় আসবে। তবে দেরি আছে। অনেক

রক্তস্রোতে দুনিয়া ভাসবে—অনেক মুণ্ড ভেসে যাবে। সারমাদ! মনে হবে যে দিন আমরা চেয়েছিলাম সে দিন আর আসবে না। না। আসবে। আসবে? এখন হল না—না হোক—এখন ঘুমোও। আমার সেই বিকিয়ে যাওয়া বাঁদী এহেন—সেও চোখ বুজলে তুর্কীস্থানে। আমিও চোখ বুজব। তুমি ঘুমোও।

স্তব্ধ হয়ে গেল অভয়চান্দ।

॥ সমাপ্ত ॥